"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ ২য় খণ্ড } পৌষ, ১৩৫[illegible] [illegible] সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলার অবস্থা

রাজনীতির মূলমন্ত্র রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনসাধারণের অভাব মোচন, নিরাপত্তা ও প্রগতি। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিচালনে উচ্চতম অধিকারীর পদ লাভ করেন তাঁহার বা তাঁহাদের ঐ মূলমন্ত্রের দিকে খর দৃষ্টি না রাখিলেই বিপদ আসে। জনগণের অসন্তোষ রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান উপাদান এবং নিরাপত্তা ও প্রগতির অভাব রাষ্ট্রধ্বংসের বীজ। যে দেশের বা যে অঞ্চলের জনসাধারণ অন্নবস্ত্রের সমস্যা পূরণে ক্রমেই ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, যেখানে নিরাপত্তার অভাব চতুর্দ্দিকে দেখা দেয়, সে দেশে বা সে অঞ্চলে প্রগতির প্রশ্ন অবান্তর হইয়া পড়ে। অন্নবস্ত্রের চিন্তায় জর্জ্জরিত এবং নিরা-পত্তার অভাবে শঙ্কিত জনসাধারণের মানসিক ও দৈহিক অবস্থা অবনতির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে একথা ত সর্ব্বজনবিদিত।

এমত অবস্থায় জনসাধারণের প্রথম আক্রোশ গিয়া পড়ে শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের উপর এবং ঐরূপ বিপরীত অবস্থাই বিপ্লববাদী ও রাষ্ট্রধ্বংসকারীর সুবর্ণ সুযোগ। অবস্থা আরও ঘোরালো হয় যদি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা-লোলুপ পেশাদার বুদ্ধিজীবীর দল একে অন্যের ছিদ্র অন্বেষণে অসন্তোষের বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, ঐরূপ অপচেষ্টার ফলে দুই দলই ক্রমে সাধারণের অনাস্থাভাজন হন এবং সেই সুযোগে রাষ্ট্রধ্বংসের চক্রান্তকারী নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়। বাংলায় আজ সেই অবস্থা প্রায় আসিয়াছে।

স্বাধীন দেশে জনসাধারণ যদি একবার স্বাতন্ত্র্যের আস্বাদ লাভ করে তবে তাহার পর স্তোকবাক্যে বা দমননীতির প্রয়োগে তাহাদের করায়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এক দল যদি জনসাধারণের বিরাগভাজন হয় তবে সেই একই গোষ্ঠীর অন্য দলকে তাহারা সহজে স্থান দিতে চাহিবে না। তাহারা চাহিবে সম্পূর্ণ পৃথক দল—ভাল, মন্দ বা মামুলী। পরে হয়ত ইহা প্রমাণিত হইবে যে, "খাল কাটিয়া কুমীর" আনা হইয়াছে কিন্তু অসন্তোষ ও নিরাপত্তার অভাবজনিত আন্দো-লনের মধ্যে সে বিষয়ে চিন্তা করে কয়জন ?

পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত অধিবাসী যাহারা তাহারা এখন সর্ব্বহারা হইতে বসিয়াছে। এই প্রকৃত অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা রাষ্ট্রের কল্যাণ, প্রগতি ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য সত্যসত্যই শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লড়িয়াছে তাহাদের—অর্থাৎ মধ্যবিত্ত চিন্তাশীল পর্য্যায়ের ব্যক্তিদের—এখন প্রায় সম্বলহীন অবস্থা। ভদ্রস্থতা রাখা দূরের কথা, পরিবার-পরিজনের অভাব মোচনই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এদেশে এমন কয়েকটি অর্ব্বাচীন আছে যাহারা ইহাদেরও "বুর্জ্জোয়া" বলিয়া অবজ্ঞা ও অবহেলা করার প্রশ্রয় দেয়। তাহাদের এইটুকুমাত্র জ্ঞান নাই যে, সমস্ত পৃথিবীতে উন্নতি, কৃষ্টি ও প্রগতি যাহা কিছু হইয়াছে, মনুষ্যসমাজের কল্যাণ ও শৃঙ্খলার যত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সকলের জন্য জগৎ ঋণী সমাজের ঐ শ্রেণীর কাছে। এ বিষয়ে তর্কের অবসর নাই।

পশ্চিমবঙ্গে যদি কেহ আজ সুখে থাকে তবে সে বিদেশী বা ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবী, ফন্দিবাজ, পেশাদার রাষ্ট্রনীতিজীবী। আজ বরঞ্চ সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক—যাহার অধি-কাংশই ভিন্ন প্রদেশবাসী—ও গৃহস্থ কৃষক সচ্ছল অবস্থায় আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে চলিয়াছে। চোরাবাজারীতে তাহার সর্ব্বস্ব লইয়াছে, বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশীয় কারবারী তাহাকে পেষণ করিতেছে, তাহার সন্তান-সন্ততির জীবিকা অর্জ্জনের পথ ভিন্নপ্রদেশীয় ও তথাকথিত "বাস্তুহারা" রোধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, শিক্ষা বা প্রগতির প্রশ্নের উত্তর "টাকা নাই"। পুনর্বসতি তো বাস্তুহারার একচেটিয়া এবং জীবিকানির্বাহের প্রশ্নে শুনা যায় প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে ভীষণ চীৎকার।

সকলের চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের উচ্চতম অধিকারীবর্গ প্রায় সকলেই এই প্রদেশের প্রকৃত অধিবাসী জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র হারাইয়া-ছেন। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের কথা বলাই বাহুল্য। সেখানে বাংলা বা বাঙালীর সকল সমস্যাই অকিঞ্চিৎকর, বাংলার সকল কথাই অগ্রাহ্য। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিও দুই জন মাত্র। এই ত দেশের অবস্থা।

বিদ্যালয়ে কম্যুনিষ্ট সংগঠন

কলিকাতার বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাতঃকালীন শাখায় কম্যুনিষ্ট সংগঠন বিষয়ে আমরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম। ইহার পর দেখিতেছি দৈনিক সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু গবর্মেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েই নির্ব্বিকার। আমরা জানিতে পারিলাম, গত এক মাসে "উন্নতির"(!) মধ্যে এই-টুকু হইয়াছে যে বিদ্যালয়ের যে শিক্ষয়িত্রীরা স্কুলের মধ্যে কম্যুনিষ্ট প্রচারকার্য্যের বিরোধিতা করিতেছিলেন তাঁহাদেরই বিতাড়িত করিবার আয়োজন হইতেছে। তাঁহাদের উপর উৎপীড়নের বিষয় গবর্মেণ্টকে দরখাস্তের দ্বারা জানাইয়াও কোন প্রতিকার হয় নাই। কম্যুনিষ্টদের আহ্বানে ১৫ই নবেম্বর যে ধর্ম্মঘট হয় তাহাতে শুনা যায় সেক্রেটারী মহাশয় প্রকাশ্যেই সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর স্বামী ও পুত্র পিকেটিং করিয়াছিলেন একথাও অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছেন। ময়দানের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষয়িত্রীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ক্লাস হইতে মেয়েদের ডাকিয়া লওয়া হইয়াছে, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে ইহা জানাইয়াও প্রতিকার হয় নাই, স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসকে জানাইলে তিনিও দিবানিদ্রা দানই সুবিধাজনক মনে করিয়াছেন। ক্লাসের দেওয়ালে—"কংগ্রেসী দালালদের হত্যা করা হউক" এই কথা লিখিবার সময় একজন শিক্ষয়িত্রী দুইটি ছাত্রীকে ধরেন এবং প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে জানান, কিন্তু মেয়ে দুটি শাস্তি পাওয়ার বদলে যিনি তাহাদের ধরিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে গিয়া-ছিলেন তাঁহাকেই লাঞ্ছিতা হইতে হয়। পণ্ডিত নেহরুর কলিকাতা আগমনের সময় "খুনী নেহরু ফিরিয়া যাও" স্লোগান দিয়া ধর্ম্মঘট করাইবার চেষ্টা হয় এবং উহাতে বাধা দিলে কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী অপমানিতা হন। একদিন ধর্ম্মঘটে বাধা দিতে গিয়া জনৈক শিক্ষয়িত্রী একটি কম্যুনিষ্ট ছাত্রী কর্ত্তৃক প্রহৃতা হন এবং তারও কোন প্রতিবিধান হয় নাই। এই সমস্ত ঘটনাই স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসকে লিখিতভাবে জানানো হইয়াছে।

প্রচারকার্য্যের কিছু নমুনা আমরা স্কুলের পত্রিকা "উষা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম। উষার পরবর্ত্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও একই ধারা অব্যাহত রহিয়াছে, তবে একটু সাবধানে। এবারকার কয়েকটি নমুনা—

"দশম শ্রেণীর একটি ছাত্রী একটি কাল্পনিক রাজ্য খাড়া করিয়া বর্ত্তমান শাসকদের আলোচনা করিয়াছে এইভাবে—'অজয়গড় রাজপুতানার অন্তর্গত ছোট একটি দেশ। সম্প্রতি সেই দেশ পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্তিলাভ করেছে।... কিন্তু সে স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ আছে অজয়গড়ের বড় বড় নেতৃ-স্থানীয় লোকদের মধ্যে। জনসাধারণ সামান্য স্বাধীনতাও পায় নি। এখনও দেশে হচ্ছে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, বিনা বিচারে বন্দী। গুলি এবং লাঠির প্রয়োগ এখনও সেখানকার সরকারকে করতে হয় অন্নবস্ত্র এবং শিক্ষার জন্য আকাঙ্ক্ষী জনসাধারণের মিছিল ভাঙ্গতে।... মিহির ডায়েরী লিখছে—১৯৪৯ সালের ৬ই মে ফিরে আসছেন দেশনেতা সুপ্রকাশ রায় অজয়গড়কে ব্রিটিশ চক্রান্তের চাকা কমনওয়েলথে বেঁধে। নিজে সমস্ত সাউথ ইষ্ট এশিয়ার গণতন্ত্রকে চেপে মারবার জন্য তিনি নিয়েছেন চিয়াং কাই-শেকের পর সে পদ। সমগ্র দেশ জুড়ে তাই বিক্ষোভের ঢেউ। কিন্তু ধনীদের হয়েছে আনন্দ। কারণ তারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জনসাধারণকে অত্যন্ত আতঙ্কের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। তাই সে আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রয়োজন আমেরিকা আর ব্রিটিশের মত শক্তির। নির্লজ্জ সুপ্রকাশ বিশ্বাসঘাতকতা করেও আবার কি করে বলছেন আমি আমার শপথ রক্ষা করেছি। শপথ রক্ষা করার এই কি নমুনা? চলছে অজয়গড়ে নারী, কৃষক, ছাত্র, মজুর, হত্যা।...সেখানকার হত্যার বীভৎসতা হিটলারের ফ্যাশিষ্ট নীতিকেও হার মানায়। সেখানে বর্ত্তমান ফ্যাশিষ্ট সরকারের পুলিস গর্ভবতী স্ত্রীলোককেও পেটে লাথি মেরে হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করে নি।"

এর পরের অংশ আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না।

"একটি রাজপথের আত্মকাহিনী' নামক প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে—আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু তাহা কেবলমাত্র হাতবদল ইংরেজ হইতে কয়েকজন গর্ব্বিত, আত্মাভিমানী, অর্থপিশাচ ব্যক্তিদের সহিত।...যারা এতদিন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে তারাই আজ বুঝিয়াছে যে দেশ স্বাধীন তাহাদের জন্য হয় নাই হয়েছে তাদের জন্য যারা টাকার গদীতে বসে টাকার স্বপ্ন দেখে। দেশবাসীর আজ ভুল ভাঙ্গিলে তাহারা তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিবার প্রস্তাব করিলে তারা এমন কি শিশুকেও আমারই বুকে লাঠি ও বন্দুকের আঘাতে শয্যা লইতে হয়। সত্যের জন্য আজ বহু নরনারীকেও আমারই বুকের উপর দিয়া কারাগার অভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়।"

অষ্টম শ্রেণীর একটি বালিকা 'পোষ্টার' শীর্ষক রচনাটিতে বে-আইনি পোষ্টার লাগাইবার যে অপূর্ব্ব কৌশল লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহাতে কৃতিত্ব ও নূতনত্ব উভয়ই আছে। "কালা কানুনকে ফাঁকি দেবার উৎসাহে চঞ্চল" দুটি ছেলে ঘুমন্ত কনেষ্টবলকে ফাঁকি দিয়া পোষ্টার লাগাইতেছে, "একটার পর একটা জলন্ত অক্ষর কালা কানুনকে যেন মুখ ভেঙচাচ্ছে", কনেষ্টবল উঠিয়া তাহাকে ধরিলে তাহাকে ধাক্কা দিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিসের গাড়ী হইতে সার্জ্জেণ্ট সাহেব নামিলেন, তাঁহার হাতের "দেড় হাতি লম্বা টর্চ্চ লাইট বাঘের চোখের মত জ্বল জ্বল করে উঠল, আর সেই আলোতে দেখতে পেল

আইনকে মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে বে-আইনি পোষ্টার"—ইত্যাদি। সুশিক্ষা বটে!

জনৈকা শিক্ষয়িত্রী মাঞ্চুরিয়ায় কম্যুনিষ্ট শাসনের মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। পত্রিকাটির দুই সংখ্যাতেই টাস এজেন্সির সংবাদ আছে। দ্বিতীয় সংখ্যাতেও প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর আশীর্ব্বাণী আছে তবে এবার আগের মত অতটা অসতর্ক এবং বেফাঁস কথায় পূর্ণ নয়।

কেবলমাত্র বক্তৃতা, পত্রিকা এবং ধর্ম্মঘটের দ্বারা বালিকাদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে মনে করা ভুল হইবে, এবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মারফতও প্রচারকার্য্য সুরু হইয়াছে। নবম শ্রেণীর গত বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজীর দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে নিম্নলিখিত একটি মাত্র অনুচ্ছেদ বাংলা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে দেওয়া হইয়াছে—

"রুশিয়ার ভলগা নদীর তীরে ছিল সিনবিরস্ক নামে একটি শহর। এই শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭০ সালে লেনিনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন জার সম্রাটের অধীনে একজন স্কুল ইন্সপেক্টর। লেনিন আইন পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। ছোটবেলা থেকে তিনি জার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কাজে যোগ দেন। তার এক ভাইকে জার সম্রাট ফাঁসি দেন। এই লেনিনের নেতৃত্বে অত্যাচারী সম্রাটের শাসন শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকরা ধ্বংস করে। রুশিয়ার শ্রমিকদের এই বিপ্লব পৃথিবীর একটা অদ্ভুত ঘটনা। যারা লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, আজীবনই বড়লোকের জুতো লাথি খেয়েছে, যাদের বড়লোকেরা কথায় কথায় ছোট লোক বলে গালি দেয়, তারা দেশের সম্রাট ও বড়লোকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং শেষ পর্য্যন্ত ওদের তাড়িয়ে নিজেরা শাসন কর্ত্তার গদীতে বসল। এরাও শাসনকার্য্য চালাবে? কিন্তু ঠিক তারা চালিয়েছে। সবাই অবাক হয়ে ভাবে—এত তাড়াতাড়ি দেশ এত উন্নত হ'ল কি করে? বর্ত্তমানে সোভিয়েটের লোকদের হাতে একটা গোপন অস্ত্র আছে, যার দ্বারা এ সম্ভব হয়েছে। এই গোপন অস্ত্রটি হচ্ছে—বিজ্ঞান।"

কম্যুনিষ্ট শোভাযাত্রার সঙ্গে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের ঘুষি বাগাইয়া "রুখতে হবে, ভাঙ্গতে হবে, চলবে না"—ইত্যাদি শ্লোগান আওড়াইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে দেখিলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা খুব আশান্বিত হইয়া উঠিতে পারি না। বিদ্যায়তনগুলিই যদি এই সব কুশিক্ষার তালিম কেন্দ্র হইয়া উঠে তবে তো রীতিমত চিন্তার কথা। এই সমস্ত কুশিক্ষা বন্ধ করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েরই অত্যন্ত অবহিত হওয়া উচিত। "কম্যুনিজম আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু" বলিয়া চিৎকার এক দিকে করিয়া অথচ অন্যদিকে উহার তালিম কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেওয়া মোটেই সুস্থ রাষ্ট্রনীতির পরিচয় নহে। গবর্ন্মেণ্টকে এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন দেখিয়া আমাদিগকে ইহা লইয়া এতটা বিশদ ভাবে আলোচনা করিতে হইল। সোস্যালিষ্ট এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়ায় কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কারখানা অঞ্চলসমূহে কম্যুনিষ্ট প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে, এবার তাহারা সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনে। শ্রমিকেরা পাওনাগণ্ডা বেশী বুঝে, তাদের কাছে আগে মজুরী পরে রাজনীতি। কাজেই সেখানে এখন সুবিধা হইতেছে না। কিন্তু বাংলার ছাত্রছাত্রীরা সহজ দাহ্য পদার্থের মত অল্প উস্কানীতেই উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজিত হইলে পরে তাহাদের অপরিণত বুদ্ধির সুযোগে তাহাদের দ্বারা সব কুকাজই করাইয়া লওয়া যায়। এইজন্য কম্যুনিষ্টরা এখন এই দিকে ঝুঁকিয়াছে এবং স্কুল-কলেজে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী হইয়া ঢুকিয়া পড়িতেছে। সময় থাকিতে এ বিষয়ে সতর্ক না হইলে বিপদের সময় শুধু আর্ত্তনাদই সার হইবে।

১লা ডিসেম্বরের শিক্ষক ধর্ম্মঘট

আশুতোষ কলেজের একটি কম্যুনিষ্ট অধ্যাপককে কলেজ গবর্নিং বডি পদচ্যুত করিয়াছেন। তাঁহার পুনর্নিয়োগ দাবি করিয়া প্রথমে ঐ কলেজে ছাত্র ধর্ম্মঘট হয় এবং ১লা ডিসেম্বর ঐ অধ্যাপকের পুনর্নিয়োগের দাবির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য অন্যান্য কলেজের কম্যুনিষ্ট অধ্যাপকেরা ছাত্রদের সঙ্গে একযোগে ধর্ম্মঘট বাধান এবং পিকেটিং করিয়া অন্য অধ্যাপক ও ছাত্রদের কলেজে প্রবেশ করিতে বাধা দেন। কোন কোন কলেজে এই ধর্ম্মঘট উপলক্ষে গুরুতর অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। পদচ্যুত অধ্যাপকটির পক্ষে কলেজ গবর্নিং বডির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য থাকিলে তাহা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটকে জ্ঞাপন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।

১লা ডিসেম্বরের ধর্ম্মঘট হইয়াছিল একটি কলেজের গবর্নিং বডির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং উল্টাইয়া পাল্টাইয়া জোর করিয়া কম্যুনিষ্টদের সুবিধাজনক ভাবে উহার সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে। সুখের বিষয়, আশুতোষ কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে যথোচিত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ছাত্রেরাও তাঁহাদের সিদ্ধান্তই মানিয়া লইয়াছে। সিটি কলেজেও গুরুতর গোলযোগ হইয়াছিল এবং ছাত্রদের সহায়তায় সেখানেও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে এবং ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্মঘট বিরোধী মনোভাব দূর করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। এই দিনের ধর্ম্মঘট হইয়াছিল একটি কলেজের গবর্নিং বডির বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য কলেজের কোন কোন অধ্যাপক উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ইহা

অতিশয় গুরুতর শৃঙ্খলা ভঙ্গের দৃষ্টান্ত বলিয়া আমরা মনে করি। দ্বিতীয়ত: ১৫ই নবেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বরের ধর্ম্মঘটে কম্যুনিষ্ট অধ্যাপকেরা প্রচারকার্য্যে এবং পিকেটিং-এ ছাত্রদের দলে টানিয়াছিলেন। এই কার্য্য অনেক অধ্যাপক গর্হিত বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং কোন কোন কলেজের অধ্যাপকেরা সভা করিয়া ঐ সব অধ্যাপকের সমক্ষে এই আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা গিয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট অধ্যাপকদের পিছনে অধ্যাপক সমাজ বা ছাত্র সমাজ কাহারও ব্যাপক সমর্থন নাই; একটি ছোট সঙ্ঘবদ্ধ দল গোলমাল পাকাইবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই ইঁহারা এইরূপ বিশৃঙ্খলা বাধাইতে পারিতেছেন। এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবিরোধী মনোভাব কুশিক্ষা ও কুপ্রচারের ফলে বাড়িয়া উঠিতেছে। এখন অধ্যাপকদের একটি দল যদি উহা আরও বাড়াইবার পক্ষে যোগ দেন তাহা হইলে শিক্ষার প্রসার পদে পদে ব্যাহত হইবে। কম্যুনিষ্টরা শিক্ষার উন্নতির কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু উহা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য স্কুল কলেজের আদর্শবাদী ভাবপ্রবণ তরুণ প্রাণের ডিনামাইট নিজেদের দলগত স্বার্থে কাজে লাগানো।

আমরা মনে করি এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে। রাশিয়া নিজের রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোক ছাড়া আর কাহাকেও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে সহ্য করে না। আমাদের দেশে অন্তত: শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে এই নীতি প্রবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। স্কুল-কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের অতি কঠোর ভাবে শৃঙ্খলাভঙ্গকারী শিক্ষক ও অধ্যাপকদের শাস্তি দেওয়া উচিত এবং ইহার জন্য গোলযোগ ঘটিলে বা স্কুল কলেজ সাময়িক ভাবে বন্ধ করিতে হইলে তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করা উচিত। যেখানে বৃহত্তর ছাত্র সমাজ ও অধ্যাপক সমাজের জাতির প্রতি মমত্ববোধ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কর্ত্তব্যবোধ রহিয়াছে, সেখানে বিদেশীর চর এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোককে অপসারিত করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে কালিমামুক্ত করা কঠিন নহে।

সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলারের ক্ষমতা

কয়েকদিন আগে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সেন বর্দ্ধমান জেলার সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলারের বিরুদ্ধে যে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রায়ের সারমর্ম্ম এবং ঘটনার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে বাদী অমরকৃষ্ণ বসু যে রুল জারির আবেদন করেন তাহার বিচার প্রসঙ্গে বিচারপতি এই মন্তব্য করেন। রায়ে বিচারপতি বলেন যে, বাদী কলিকাতার একজন বস্ত্রব্যবসায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ কাপড় ও সুতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ না থাকার সময় তিনি কিছু কাপড় পাইয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পানাগড় হইতে বর্দ্ধমানে মোটরযোগে ঐ কাপড় চালান দেওয়ার সময় উহা আটক করা হয় এবং মোটরযানের ড্রাইভার ও ক্লিনার গ্রেপ্তার হয়। ইহার ছয় মাস পরে পুলিস চূড়ান্ত রিপোর্টে জানায় যে, আসামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই এবং বাদীকে কাপড় ফেরত দেওয়া হউক। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ রিপোর্ট অনুসারে আসামীকে মুক্তি দেন এবং কাপড় ফেরত দেওয়ার আদেশ দেন। এই আদেশ অসামরিক সরবরাহ বিভাগের জেলা কণ্ট্রোলারের নিকট প্রেরিত হইলে উক্ত কণ্ট্রোলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালনে বাধ্য থাকিলেও উহা না করিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র লেখেন। তিনি জানান যে, মামলার পূর্ণ বিবরণ না জানিয়া এবং সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইয়া তিনি এতগুলি কাপড় ফেরত দিতে পারেন না। বিষয়টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার জন্য তিনি আদালতের নিকট মামলার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন। বিচারপতি বলেন যে, এই অফিসারের আচরণ কৌতুকজনক। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ জারী হইয়াছে, তিনি আদেশ পালন দূরে থাকুক, স্বয়ং বিচারক হইয়া বসিয়াছেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের আদেশ যে পর্য্যন্ত কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ট্রাইবুনাল স্থগিত না রাখে কিংবা বাতিল না করে, সে পর্য্যন্ত উহা ভালই হউক আর মন্দই হউক পালন করিতে হইবে। নতুবা শাসন বিভাগের পক্ষে উহা বিপজ্জনক হইবে। যিনি যতই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হউন এই নীতি স্মরণ রাখিতে হইবে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত কণ্ট্রোলারকে আদালত অবমাননার জন্য অভিযুক্ত না করিয়া অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও ঐ চিঠির একটি নকল পাইয়া বাদীর নামে সমনজারী করিয়াছেন। ইহা বেআইনী কাজ হইয়াছে।

বিচারপতি বাদীর নামে সমন জারী এবং কাপড় ফেরত দেওয়া স্থগিত রাখার আদেশ নাকচ করেন। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের জেলা কণ্ট্রোলারের প্রতি অবিলম্বে বাদীর আট গাঁইট কাপড় ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়া তিনি তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দেন। রুল বজায় রাখিয়া এই আদেশ বর্দ্ধমানের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের জেলা কণ্ট্রোলারের প্রতি জারী করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই রায়ে বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলা সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলারের যে আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতে বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের অবনতির পরিমাণ অনেকটা বুঝা যায়। মামলা হইয়াছে, মহকুমা হাকিম রায় দিয়াছেন—অত:পর হয় উচ্চতর আদালতে আপীল হইবে নতুবা রায় মানিয়া কাজ করিতে হইবে। সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলার মহকুমা হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা

মানিয়া লওয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে চূড়ান্ত দুর্ব্বলতার কাজ হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর টাকার জোর এবং লড়িবার ইচ্ছা আছে বলিয়া তিনি হাইকোর্ট পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছেন এবং সুবিচার লাভ করিয়াছেন। সহায় সম্বলহীন দরিদ্র বহু লোককে সিভিল সাপ্লাই কর্ত্তাদের তুষ্ট করিতে না পারার অপরাধে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় বলিয়া বহু লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ছোট বড় সর্ব্বশ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীর একটা বড় অংশের মধ্যে প্রণামী না পাইলে জব্দ করিবার মনোবৃত্তি যেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে অনেকের সেইরূপ অভিজ্ঞতা হওয়ায় এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে। উপরোক্ত মামলায় পুলিস অভিযোগের কারণ নাই বলিবার পরেও জেলা কণ্ট্রোলারের ঐরূপ আচরণ এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তাঁহাকেই সমর্থনের দৃষ্টান্ত জনসাধারণের এ আশঙ্কা যে অমূলক নয় তাহাই প্রমাণ করিতেছে। বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলার দুই জনকেই এই ঘটনার জন্য যথাযোগ্য শাস্তি দিয়া অবিলম্বে তাহা প্রেসনোটের মারফৎ জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ এই মামলার ফল জন-চিত্তের উপর অত্যন্ত খারাপ হইবে।

ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতা

কলিকাতায় ভারতীয় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্সের বার্ষিক সভায় ডাঃ মাথাই এবার অভিভাষণ দিয়াছেন। এই সভায় বড়লাটদের বক্তৃতা করাই ছিল পুরাতন প্রথা, পণ্ডিত নেহরুও এই সভায় অভিভাষণ দিয়াছেন। এবার আসিয়াছিলেন ভারতের অর্থসচিব ডাঃ মাথাই। সাময়িক বৈষয়িক সমস্যাসমূহের পরিচয় এই সভার বক্তৃতাটিতে পাওয়া যাইত এবং বড়লাট ঐ সম্বন্ধে সরকারী নীতি ব্যক্ত করিতেন। এবার কিন্তু তাহা দেখা গেল না। সভাপতি মিঃ এলকিন্স কয়েকটি বাস্তব সমস্যার কথা তুলিয়াছেন এবং ডাঃ মাথাই কতকগুলি মামুলী ফাঁকা কথায় কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছেন। ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতার সার কথা তিনটি, ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, উন্নয়ন পরিকল্পনার বরাদ্দ হ্রাস সাময়িক ভাবে করা হইয়াছে, প্রথম সুযোগেই আবার বাড়ানো হইবে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার আশা ভারত-সরকার এখনও রাখেন। প্রথমটির বিশেষ কোন লক্ষণ আমরা দেখিতেছি না। দ্বিতীয়টি আমরা অনাবশ্যক বোধ করি এইজন্য যে, স্বাধীনতার পর সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা ও কণ্টিজেন্সি প্রভৃতিতে যে বিপুল ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা সঙ্গত ভাবে কমাইলেই উন্নয়ন-পরিকল্পনার বরাদ্দে হাত দেওয়ার প্রয়োজন হইত না। অসামরিক ব্যয় এত বেশী বাড়িয়াছে যে, যুদ্ধের সবচেয়ে খারাপ বৎসরেও এত খরচ ছিল না। এই দিকটি সম্বন্ধে ভারত-সরকার একেবারে উদাসীন। তৃতীয়টি ভারত-সরকারের আশা মাত্র, বাস্তবের সহিত তাহার সম্পর্ক কতখানি তাহার সামান্য পরিচয় করাচীর ইসলামিক রাষ্ট্র সম্মেলনে পাওয়া গিয়াছে। "আজাদ কাশ্মীর গবর্মেণ্টে"র প্রতিনিধিকে ঐ সম্মেলনে আর সমস্ত প্রতিনিধিদের সমান মর্য্যাদা দিয়া পাকিস্থান বুঝাইয়া দিয়াছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার আসল মনোভাব কি। সুখের কথা শুধু এইটুকু যে, ভারতবর্ষ পাকিস্তানের পাট ও তুলার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া না থাকিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে এ কথাটা মাথাই মহাশয় সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছেন।

বর্ত্তমান সমস্যার সবচেয়ে খাঁটি কথা এবং মূল সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন মিঃ এলকিন্স। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা মনে করি অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বিশেষ পরিমাণে হ্রাস করার উপর সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা নির্ভর করে; খাদ্যের দাম না কমিলে জীবনযাত্রার ব্যয় কমিবে না, অতএব উৎপাদন-ব্যয়ও কমিবে না।" খাদ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের উপর সত্যসত্যই এখন সমস্ত কাজকর্ম্ম নির্ভর করিতেছে, দাম না কমা পর্য্যন্ত কোন দিকেই কূলকিনারা পাওয়া যাইবে না। অথচ আমরা বিস্মিত হইয়া দেখিতেছি বীরভূম ও চব্বিশ পরগণার কয়েকটি ভোটের লোভে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন অদূরদর্শী নেতা খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। মিঃ এলকিন্সের দ্বিতীয় কথা, শ্রমিক ছাঁটাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিল্প সম্মেলনে শ্রমিক প্রতিনিধিরা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের যুক্তি মানিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় শ্রমিকের মজুরী কম ছিল বলিয়া ভারতে শিল্পোন্নতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন উহা অত্যধিক বলিয়া শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইতেছে। আমাদের মনে হয় মজুরী বৃদ্ধির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যদি শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়িত তবে বেশী মজুরী ক্ষতির কারণ হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্য্যতঃ তাহা ঘটে নাই, বরং বিপরীত অবস্থাই দেখা দিয়াছে। মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা কাজে ঢিলা দিয়াছে, অনুপস্থিতি এবং শৃঙ্খলার অভাব বাড়িয়াছে, উৎপাদনের অনুপাত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় মজুরী বৃদ্ধির দাবি তোলা শিল্পের পক্ষে অনিষ্টকর এবং পরিণামে শ্রমিকদের পক্ষেই ক্ষতিকর ইহা অন্যান্য দেশের শ্রমিকেরাও বুঝিতেছে। ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছে যে, মজুরী বৃদ্ধির দাবি এখন বন্ধ রাখা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কিন্তু প্রতিজনে উৎপাদনের অনুপাত বৃদ্ধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়াছে। আমেরিকায় ইহা অত্যন্ত সফল হইয়াছে। ব্রিটেন, রাশিয়া, সুইডেন, সুইজারলাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশেও শ্রমিকেরা এবিষয়ে খুব মন দিয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াইতে হইলে উৎপাদন ব্যয় কমাইতে হইবে এবং মজুরী ঠিক রাখিয়া উৎপাদন ব্যয় কমাইতে হইলে মন দিয়া বেশী করিয়া কাজ করিতে হইবে এটা তাহারা বুঝিয়াছে, কিন্তু আমাদের শ্রমিকদের একথাটা এখনও ভাল করিয়া বোঝানো হয় নাই। এখানে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া শ্রমিক মহলে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের লোভে মজুরী বৃদ্ধির লড়াই এখনও চলিতেছে।

এদিকে এখন সমস্ত শ্রমিক নেতার মন দেওয়া দরকার। আমাদের নিজেদের ধারণা এই যে, যদি শ্রমিক ও কর্ম্মী প্রকৃত সততার সহিত উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাহার মন ও শক্তি নিয়োগ করে তবে ছাঁটাইয়ের কথা উঠিতেই পারে না, কেননা সকল ক্ষেত্রেই এখন সক্ষম কর্ম্মীর অভাব আছে। মজুরী ও মাগ্‌গী ভাতা বাড়াইয়া ফাঁকিবাজ ও ফন্দিবাজের পথ সহজ না করিয়া শ্রমিক ও কর্ম্মীর উচিত লাভের অংশে মন দেওয়া। উৎপাদন অধিক ও কম মূল্যে হইলে লাভ বেশী হইতে বাধ্য।

চিনির ভেল্কীবাজি

কি করিয়া চিনি—কল, গুদাম ও দোকান হইতে গত আশ্বিন মাসে উধাও হইয়া গিয়াছিল, তার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে কেন্দ্রীয় আইন সভার নিম্নলিখিত বিবরণে—গত ১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০শে নবেম্বর) তারিখের প্রশ্নোত্তরে। আইন সভার স্পীকার শ্রীমবলঙ্কার আশ্বিন মাসে চিনি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে অনুমতি দেন নাই; সেই দিন বলিয়াছেন যে শীঘ্রই আলোচনার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিবেন।

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এইরূপ মন্তব্য করেন যে চিনির দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গবর্ন্মেণ্টের হাতে এতৎসম্পর্কিত সাধারণ তথ্যও নাই; ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলেন, আলোচনার পূর্ব্বে গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে তাঁহারা সদস্যগণকেও ওয়াকিবহাল রাখিতে চাহেন; গবর্ন্মেণ্ট আলোচনার পূর্ব্বে সদস্যগণের মধ্যে তথ্যাদির একটি নোট বিতরণ করিবেন।

পণ্ডিত কুঞ্জরুর মন্তব্যের পর খাদ্যসচিব শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম চিনি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন।

শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী—খাদ্যসচিব কি তাঁহার বিবৃতিতে যে সকল স্থানে চিনি পাওয়া যাইতেছে না সে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন? (হাস্য)

শ্রীজয়রামদাস—আমি যে সকল স্থানে তদন্ত করিয়াছি সেই সকল স্থানের মূল্য উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের একটি প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যসচিব বলেন যে, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে চিনির কলের ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের মজুত আটক করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

কুঞ্জরু—আটক করার নির্দ্দেশ জারীর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের মজুত মাল ধরার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন?

খাদ্যসচিব—প্রাদেশিক সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থাবলীর বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে পারিব না।

কুঞ্জরু—আটকের নির্দ্দেশ জারীর পর প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক মজুত ধরার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে ব্যবসায়ীগণ যথেষ্ট সময় পাইয়াছে বলিয়া যে গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা কি আপনার দৃষ্টিগোচর হয় নাই?

খাদ্যসচিব—হইতে পারে।

কুঞ্জরু—ইহা কি সত্য যে আটক করার নির্দ্দেশ জারী হইবার পর ১০ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ডিলারদের চিনি দেওয়া হয় নাই।

খাদ্যসচিব—আটক করার নির্দ্দেশ দেওয়ার পর প্রদেশগুলির বরাদ্দ বণ্টনের প্রশ্ন দেখা দেয়; প্রত্যেকটি কারখানায় কি পরিমাণ মাল আছে তাহা না জানিয়া বরাদ্দ ঠিক করা যায় না। সেইজন্য কারখানাগুলির মজুত মালের পরিমাণ জানাই প্রথম প্রয়োজন।

খাদ্যসচিব বলেন যে, ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজী ও বর্ত্তমান বৎসরের উৎপাদনের একটি মোটা অংশ ইতিমধ্যেই বিক্রীত হইয়াছে এবং ফলে চিনির অভাব দেখা দিতে পারে বলিয়া সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক বিবৃতি প্রকাশের ফলেই মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সিণ্ডিকেট রপ্তানি বাণিজ্য তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে স্থানে স্থানে অনিয়ন্ত্রিত মজুত চিনির মূল্য মণ প্রতি ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে।

শ্রী আর, মালবোর প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যসচিব বলেন যে, ভারত-সরকার চিনির অভাব দূর করার জন্য বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করিতে চাহেন না।

খাদ্যসচিব শ্রীদৌলতরামের উত্তরে আমরা দুই-একটা কথা বুঝিতেছি। কলে উৎপন্ন চিনি সম্বন্ধে কোন হিসাব তাঁহারা রাখেন না; বিদেশ হইতে চিনি আনিয়া তাঁহাদের নিয়ন্ত্রাধীনে বিতরণ করিবার সাহস ও শক্তি তাঁহাদের নাই। এই অক্ষমতার কারণ সম্বন্ধে কোন গবেষণা করিব না। সর্দ্দার প্যাটেলের অনুরোধ-উপরোধে ফাটকাবাজদের মন যে গলিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ পাইলে সুখী হইতাম। এই অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, ১৯৩২ সাল হইতে চিনি শিল্পকে রক্ষা করিয়া দেশের লোকে ভুল করিয়াছে।

সেই কথাই "গণ-বাণী" পত্রিকার ১৭ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। সহযোগী বলিতেছেন:

> সতেরো বছরে এই হাজার কোটির বেশী টাকা ভারতবর্ষের ৩৫ কোটি লোক বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ছয় লক্ষ চাষী ও শ্রমিক এবং শত ছয়েক ইউ-পি, ভাটিয়া, পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী এবং ইংরেজকে ভাগ করিয়া দিয়াছে। গবর্ন্মেণ্টও ইহার এক বড় চাকলা আদায় করিয়াছেন।...

যে তথ্যের উপর এই মন্তব্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহাও আমাদের পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি:

> ১৯৩২ হইতে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত মোট ১,৬১,১৮,৩৩৩ টন অর্থাৎ ৪৩,৫১,৯৪,৯৯১ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। বাৎসরিক উৎপাদনের আলাদা হিসাব অঙ্কের বাহুল্য ভয়ে দেওয়া হইল না, যাঁহাদের প্রয়োজন তাঁহারা ১৯৪৭সালের টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টের ২২ পৃষ্ঠা দেখিয়া লইবেন। ৮ টাকা মণ ডিউটি বসানোতে ঐ পরিমাণ দাম কৃত্রিম

ভাবে বাড়ানো হইয়াছে এবং ক্রেতাদের সস্তা জাভা কিউবার চিনির পরিবর্ত্তে চড়া দামে দেশী চিনি কিনিতে হইয়াছে। ১৭ বৎসরে ক্রেতারা এই ভাবে শুধু শুল্ক-বাবদই চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য দিয়াছে—৪৩,৫১,৯৪,৯৯১ × ৮ = ৩৪৮,১৫,৫৯,৯২৮৲।···

সংরক্ষণ শুল্কের আমলে চিনির কারবারে মোট আয় এবং ভাগাভাগির একটা মোটামুটি হিসাব এইরূপ দাঁড়ায়—

চিনি লর্ড (১৬৬ মিল)—	বড়জোর ১০০
চিনি ব্যবসায়ী (উচ্চতম পাইকার)	বড়জোর ৫০৯
শ্রমিক	১ লক্ষ
আখচাষী	৫ লক্ষ

চিনির কারখানার মধ্যে বিহার যুক্তপ্রদেশের অংশ শতকরা ৮৩ ভাগ।

মোট উৎপন্ন চিনির দাম (গড়ে ১৬৲ টাকা দরে, কারখানার দাম, বাজার দর নয়) ৬৯৬,৩১,১৯,৮৫৬ টাকা

সংরক্ষণ শুল্ক বাবদ অতিরিক্ত লাভ ৩৪৮,১৫,৫৯,৯২৮ ,,

এখন প্রশ্ন এই যে, সংরক্ষণ শুল্ক রাখা আর একদিনও উচিত কিনা।

রেল-বিভাগের কার্য্য

ভারতীয় রেলসমূহের চিফ কমিশনার শ্রী কে. সি. বাগলে বোম্বাইয়ের রোটারি ক্লাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই বিভাগ যে তিনটি নীতিতে পরিচালিত হয় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রচার বিভাগের প্রধান কর্ত্তা কর্ত্তৃক পরিচালিত "যোগাযোগ" পত্রিকার গত ১৪ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহা তুলিয়া দিলাম:

> ব্যবসা সম্পর্কিত দিক হইতে বিচার করিলে এক শ্রেণীর জনসাধারণ উহাকে প্রকৃত ব্যবসা নীতির উপরে নির্ভর করিয়াই চালিত হইতে ইচ্ছা করেন; দ্বিতীয়তঃ জাতীয় সম্পদের দিক হইতে অন্য এক শ্রেণীর লোকেরা উহা সমাজতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া পরিচালিত হইবার পক্ষপাতী; তৃতীয়তঃ জনসাধারণের অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উহার শাসনকার্য্য পরিচালনায় যাহাতে সাধারণের স্বার্থ রক্ষা হয় তাহার ইচ্ছা অপর এক শ্রেণীর লোক পোষণ করেন।

এই নীতি-ত্রয় সম্বন্ধে সাধারণ নাগরিকের বর্ত্তমানে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু সমস্ত নীতির উর্দ্ধে রেলওয়ে পরিচালনায় যে সততার অভাব আমাদের সকলকে প্রতিদিন পীড়িত করে, তৎসম্বন্ধে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সজাগ থাকিলে আমাদের যন্ত্রণার লাঘব হইত। রেলগাড়ী হয়ত বেশী সংখ্যায় চলিতেছে; সময়মতও পৌঁছিতেছে। কিন্তু যে রোগের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম, তাহার কোন চিকিৎসা হইতেছে না। রেলওয়ের অধস্তন কর্ম্মচারিবৃন্দের এই বিষয় কি কিছুই করণীয় নাই? রেলকর্ম্মীকে আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞান দিবার কি কেহই নাই?

পশ্চিমবঙ্গের গণ-মনে বিক্ষোভ

"গণ-রাজ" মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র। এই পত্রিকার ১লা অগ্রহায়ণ তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে:

> ···লোকে মনে করিতেছে যে কলিকাতাই একমাত্র স্থান যেখানে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য হইবে। ফলে গ্রামগুলি আবার পরিত্যক্ত হইয়া যাইতেছে। বর্ষার সময় পল্লী অঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলি দুর্গম হইয়া যায়; কিন্তু সরকার হইতে এই সকল রাস্তার সংস্কার সাধিত হয় নাই। অথচ কলিকাতা সহরের জন্য ভূগর্ভস্থ-রেল চলাচলের পরিকল্পনা এই সরকারই গ্রহণ করিতেছেন। পল্লী অঞ্চলে ও মফস্বলের অখ্যাত জেলার সহরগুলিতে যখন রাত্রে আলোর অভাবে অমাবস্যার অন্ধকার বিরাজ করে তখন কলিকাতার হাওড়া ব্রীজকে তীব্রতর আলোকমালায় সজ্জিত করিবার সরকারী পরিকল্পনা আমাদের শুনিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান কার্য্যক্রম কংগ্রেসের সুমহান আদর্শের পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে এবং একমাত্র সেই কারণেই জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের উপর বিরক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। বিকেন্দ্রীকরণের নীতিই হইল কংগ্রেসের মূল নীতি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ একমাত্র কলিকাতা মহানগরীকেই কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেসের মূলনীতিকে বিপর্যাস্ত করিয়া দিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছি। প্রতিষ্ঠান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের এই বিষয়ে দায়িত্ব রহিয়াছে। আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কংগ্রেস-পরিচালিত হইলেও কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী সরকারের কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। সরকারের কার্য্যের ফলে জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িতেছে ও কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত কর্ম্মপন্থার প্রতি সন্দেহের ভাব পোষণ করিতেছে। দেশে এই অবস্থা ও আবহাওয়া চলিতে দেওয়া আদৌ সঙ্গত নহে।···

"গণ-রাজ" এই মন্তব্যে প্রদেশব্যাপী অসন্তোষের রূপদান করিয়াছেন। "প্রবাসী"র বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যত্র পত্রিকা

হইতে যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাও এই অসন্তোষের পরিপোষক। ভিষক্‌-শ্রেষ্ঠ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই রোগের কোন চিকিৎসার কথা ভাবিতেছেন কি?

ম্যালেরিয়া জ্বর

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ নীলরতন সরকার বলিয়াছিলেন যে, এক ম্যালেরিয়া রোগের কৃপায় বাঙালীর উপার্জ্জন প্রতি বৎসরে প্রায় ৪ কোটি টাকা কমিয়া যায়। আজও সেই অবস্থার বিশেষ প্রতিকার হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বর্দ্ধমানের "দামোদর" তার এই ব্যর্থতার কথা বলিতেছেন :

> দারুণ ম্যালেরিয়া—ঔষধ ও চিনি না পাওয়ায় জনসাধারণের কষ্টের সীমা নাই। এবারে এ-অঞ্চলে অজস্র পুঁটিমাছ পাওয়া যাইতেছে। তাহার টক যে যত খাইতেছে ততই তাহার ম্যালেরিয়া হইতেছে। রায়না হইতে একজন লিখিয়াছেন—এখানে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব সুরু হইয়াছে। অধিকাংশ বাড়িতেই কেহ সুস্থ অবস্থায় নাই। কুইনাইন এমনকি পেলুড্রিনের ট্যাবলেটও মিলিতেছে না। বাজার হইতে চিনি অদৃশ্য হওয়ায় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীরা সাগু পাইতেছে না। মানুষ মরিলে সৎকার করিবার লোক পাওয়া যায় না।

এই জনপদ-বিধ্বংসী ব্যাধির প্রতিকারের উপায় অজানা নাই। একজন চিকিৎসক-প্রধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী; তাঁহার আমলে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার যে কোন ব্যাপক উপায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহার সার্থকতার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। প্রমাণ থাকিলে বর্দ্ধমান, বীরভূম হইতে এরূপ মন্তব্য শুনিতে হইত না।

বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কট কালে যখন ধান ঘরে তুলিবার সময় হইয়াছে তখন যদি "চাষীমজুর আদি পাট-পারণে শুইয়া থাকে" তবে পশ্চিমবঙ্গে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের সার্থকতা কোথায়? অন্য দেশে এই অবস্থায় স্কুল কলেজের ছাত্রবৃন্দ ধান ঘরে তুলিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিত; শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার দায় হইতে পিতামাতাকে কথঞ্চিৎ মুক্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। আমাদের "বাবুর" দেশে তা হইবার জো নাই; পার্কে রাস্তায় স্লোগান আওড়াইয়া আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ গঠনকারীরা কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, "বিপ্লব চিরজীবী" করেন, এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবাইবার ব্যবস্থা করেন।

ভারতরাষ্ট্রদ্রোহী চোরাকারবারী

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখের "যুগান্তর" পত্রিকায় সুন্দরবন প্রজামঙ্গল সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীভোলানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি এই চোরাকারবারের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই :

"হিঙ্গলগঞ্জ হইতে একজন বিখ্যাত অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী আরও কতিপয় ব্যবসায়ীর সহিত প্রতি সোম ও শুক্রবার এই সীমান্তের কালিন্দী নদীর তীরস্থ কানাইকাটীর হাটে বিভিন্ন প্রকারের মাল লইয়া যায়। এই হাটের সামনেই একটি খেয়া আছে। খেয়ার নৌকাটি আর একটু দক্ষিণে কেলেখালির খাল ও কানাইকাটী গ্রামের সীমানায় ছিল। এখানেও একটি হাট আছে। এই সীমান্তের সাহেবখালির দুর্নীতিদমন 'অ্যান্টিস্মাগলিং' অফিসার ও থাঁটির পুলিশবাহিনী মিলিয়া··· মাল পারাপারের সুবিধার জন্য খেয়ার নৌকাটি এদিককার হাটের সামনে চালাইবার জন্য হুকুম জারী করিয়াছেন; সে কারণে এই হাটের বিভিন্ন দোকানে মালও যাইতেছে প্রচুর; হাজার হাজার টাকার মাল পার করিয়া লইতেছে।···এই হাটটি একদিকে 'পাকিস্তানে মাল চালানী হাট' বলিয়া খ্যাত এবং এই হাটের কর্ত্তা ব্যক্তিটি এখানকারই বাসিন্দা। আমি কিছুদিন আগে একদিন এই হাটে উঠিয়া খেয়ার নৌকায় মাল চালান দেওয়ার কালে ধরিয়া চালান দেওয়াইয়াছি। হাটের কর্ত্তা ব্যক্তিটিকে সাবধান করিয়া দিয়াছি। আমার সাবধান করার পরও হাটের কর্ত্তাগণ ও দোকানদারগণ আজ কয়েক মাস ধরিয়া উৎসাহ, উদ্যমের সঙ্গে মাল পারাপারের কাজে লাগিয়া গিয়াছে। এর মূলে রহিয়াছে আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা পুলিশ প্রভুদের গোপন চুক্তি ও উদ্দীপনা। হিঙ্গলগঞ্জ হইতে যে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীটি প্রচুর মাল পারাপারের জন্য এই হাটে লইয়া আসে, একদিন রাস্তার মাঝে ধরা পড়িয়া ১,১০০৲ টাকা প্রণামী দিয়া ছাড়া পাইয়াছিল···।

"গুপ্তভাবে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইলে যেসব ধুরন্ধর রাষ্ট্রদ্রোহী চালানকারী বা সাহায্যকারী ব্যক্তি আছেন, সব প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং তখনই তাহাদের একটি একটি করিয়া উৎপাটন করা গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে সহজ হইবে।

"এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি বিষয়ে সরকার ও দেশবাসীর অবগতির জন্য লিখিতেছি। কিছুদিন আগে যখন এই সীমান্তের হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ দিয়া হাজার হাজার গাঁইট কাপড়, সুতা ইত্যাদি পাকিস্থানে চোরাই চালান হইতেছিল, সেই সময়ের কিছু পরেই চালানকারী বা সাহায্যকারী সাব্যস্ত করিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী ও বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির বিখ্যাত সভাপতিকে গবর্ন্মেণ্ট এই অঞ্চল হইতে বহিষ্কার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় কাপড়ের কেনা-বেচা যাহারা করিয়াছিল তাহাদের কাপড় আটক করার সময় উক্ত সভাপতি মহাশয়ের অনুগৃহীত আপনজনের দোকান খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমানে উক্ত সভাপতি মহাশয় হিঙ্গলগঞ্জের ঠিক অপরপারে পাকিস্থানে বসবাস করিতেছেন।

"জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরবি মিত্র ও মন্ত্রীরূপে শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী যখন হিঙ্গলগঞ্জে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন সেই সময়ে ইনি সভায় পাকিস্থানের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করিয়াছিলেন। আজ যখন ইনি পাকিস্থানে বসবাস করিতেছেন তখন পাকিস্থান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে পাকিস্থানের কল্যাণই যে তাঁহার লক্ষ্য তাহা বুঝা যায়। তাহা না হইলে ঐভাবে বিষ উদ্গীরণের পরে সেই রাষ্ট্রে যে সহজে বসবাস করা যায় না তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এদিকে হিঙ্গলগঞ্জের উক্ত সভাপতি মহাশয়েরও অন্য ব্যবসার সাঙ্গপাঙ্গবর্গ বহাল তবিয়তে ঘুরাফিরা করিতেছেন, আর পুলিস (ল্যাণ্ডকাষ্টমস্)…প্রভুদের কল্যাণে হাজার হাজার টাকার মাল অপর পারে পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছে।

"হিঙ্গলগঞ্জের অতি পুরাতন ও নূতন ব্যবসায়ীরা একদিন জানিতে পারিল যে, ওখানকার একজন নবীন ব্যবসায়ী কোনও অদৃশ্য ইঙ্গিতে বা কোনও অফিসারের দ্বারায় এক আধ বস্তা নয়, একেবারে ১০০০ এক হাজার বস্তা ডালের পারমিট পাইয়া গিয়াছে এবং সত্য সত্যই প্রথম কিস্তী ৩০০ শত বস্তা একদিন হিঙ্গলগঞ্জে আনিয়া ফেলিল। অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত যেখানে ৫।১০।১৫ বস্তার বেশী ডাল আনিবার অধিকার আজ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পাইতেছে না সেখানে 'ভানুমতির'-খেলের মত এই ভাবের পারমিট পাওয়ার মধ্যে যে গোপন হস্তের খেলা চলিতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জের ব্যবসায়ী মাত্রেই জানে উপরি-উক্ত নবীন ব্যবসায়ীর পকেটে নাকি সদাসর্ব্বদা বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ পারমিট আছেই। এইসব বিশেষ পারমিট দেওয়ার অর্থ যে পাকিস্থানে পার করা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

"অদৃষ্টের পরিহাসে ইটিণ্ডাঘাট হইতে হিঙ্গলগঞ্জ এলাকা বরাবর…বিভাগ হইবার কিছু পর হইতেই ইছামতী কালিন্দী নদীর উপর এই সীমান্তে 'কারফিউ' জারী করা আছে।…

"ঐ কারফিউই উপরি-উক্ত মিলিত দলটির জীবনে মাহেন্দ্র-যোগ আনিয়া দিয়াছে। এই সীমান্তের ইটিণ্ডাঘাট, টাকী, হাসনাবাদ, রামেশ্বরপুর, কাটাখালি, হিঙ্গলগঞ্জ এবং অন্যান্য জায়গায় পুলিস দল লোকেরা জাগিয়া আছে কি না টহল দিয়া দেখে, এবং অন্য দিকে যথানিয়মে মাল পাকিস্থানের পারে চলিয়া যায়।

"যাঁহারা এদিককার অবস্থা জানেন ও ব্যবসায়ীরাও বলিয়া থাকেন যে, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জে খরিদ্দারের অভাব। যে হিঙ্গলগঞ্জে রবিবার ও বিশেষ করিয়া বৃহস্পতিবারের হাট ঘুরিতে গেলে লোকের ভীড়ে অনবরত গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগিত, সেই হিঙ্গলগঞ্জে আজ সমস্ত হাটটাই লোকাভাবে খাঁ খাঁ করিয়া থাকে। এই সব বিশেষ জায়গায় যে মাল যায়, হাটবারেও যখন খরিদ্দারের ভীড় থাকে না, তখন ঐ সব প্রচুর পরিমাণ মালের কি হয়, তাহার কোনও প্রকার হদিস্ গবর্মেণ্ট সরাসরি রাখেন কি ?…মিলিত দলটির ষড়যন্ত্রের জন্য 'সৎ-ব্যবসায়ীরা' কিছুই করিতে পারিতেছে না। ভাল লোকও ইচ্ছা থাকিলে বাহির হইতে পারে না, কেননা মাহেন্দ্রযোগ 'কারফিউ'।"

স্থানীয় সংবাদপত্র "সংগঠনী"র গত ১৬ই কার্ত্তিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যেও এই অভিযোগ সমর্থিত হইয়াছে: "গত কয়েক সংখ্যা 'সংগঠনী'তেই আমরা সুপারীর চোরাচালানের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি। আমরা এই সকল ব্যাপার হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, হাবড়া থানার এই অঞ্চলে (গোবরডাঙ্গা কিংবা মছলন্দপুর) অতিরিক্ত কাষ্টম তদন্তের স্থায়ী ব্যবস্থা না হইলে এইরূপ চোরাচালান ধরা আদৌ অসম্ভব। বর্ত্তমানে অধিকাংশ সরকারী কর্ম্মচারী, বিশেষ ভাবে কনষ্টেবল-দারোগারা ঘুষ গ্রহণ ছাড়া কোন কাজেই তেমন তৎপর নহে।"

ইহা এক কৌতুকে পরিণত হইয়াছে। "সৎলোক" সংঘবদ্ধ ভাবে কিছু করিতে গেলে পুলিসের গুলি খাইতে হয়; গবর্মেণ্ট পুলিসকে শাসনে রাখিতে পারিতেছেন না।

তন্তুবায় শ্রেণীকে হয়রান

বাঁকুড়ার "হিন্দুবাণী" পত্রিকার ১৫ই কার্ত্তিকের সংখ্যায় একজন তন্তুবায় মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিতেছি:

"মহাশয়, জনসংভরণ বিভাগের কি মাথা খারাপ হয়েছে ? লোককে অযথা হয়রান করাই ইহাদের কাজ ? কিছুদিন আগে তাঁতিদের লাইসেন্স ফালানোর (Renew) জন্য ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বহুদূর থেকে ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে ১০ টাকা খরচ করে ষ্ট্যাম্প জমা দিয়ে ফিরে বাড়ী পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম পেলাম, এক টাকায় চলবে না, পাঁচ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দাও। সুতরাং আবার ৪৲ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা দিতে খরচ করে আসতে হ'ল। আমরা গরীব লোক, খাটলে খেতে পাবো, না খাটলে বাঁধা মাহিনা তো আর কেউ দিবে না। তা আমাদের এই রকম ভাবে হয়রান করেই কি এরা দেশে কুটির-শিল্পের উন্নতি করবেন ?"

ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্ত

অল্প দিন পূর্ব্বে ভারতরাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজা-গোপালাচারী আসামের রাজধানী শিলং নগরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শিলং মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যেসব সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ আশা করি আসামের মন্ত্রীমণ্ডলী

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

"ভারতের সীমান্তের অধিবাসী হিসাবে আপনারা আপনাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। পূর্ব্বে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসনের জন্য গবর্মেণ্টকে কেবল মাত্র ভারতের পশ্চিম সীমান্ত লইয়াই মাথা ঘামাইতে হইত, কেননা সর্ব্বদাই উহা উৎকণ্ঠার কারণ ছিল। কিন্তু এখন পূর্ব্ব সীমান্ত পশ্চিম সীমান্ত অপেক্ষাও অধিকতর উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

"চীনে কি ঘটিয়াছে আপনারা তাহা জানেন। এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই একটি নূতন গবর্মেণ্ট চীন দখল করিয়া লইয়াছে। ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও বিশেষ সঙ্কটময় এবং শৃঙ্খলা স্থাপন ও শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য গবর্মেণ্টকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। শ্যাম ও মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য দেশগুলি কিরূপ শক্তিশালী তাহা আমার ন্যায় আপনারাও বেশ ভাল ভাবেই জানেন। সুতরাং এই অবস্থায় আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী না হই, আমরা যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিচার-বিমূঢ়তা মুক্ত হইতে না পারি তাহা হইলে বিদেশীদের নির্দ্দেশে পরিচালিত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সহজেই আমাদিগকে আক্রমণ করার সুযোগ পাইবে।

"রাষ্ট্রের অভ্যন্তরভাগের অধিবাসীরা সময় সময় কলহে মাতিলে উহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু সীমান্তে ঐরূপ কলহ মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ঐক্য রক্ষার জন্য আপনাদিগকে সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। আমরা যদি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য না করি এবং উহাকে দিনের পর দিন অধিকতর শক্তিশালী করিয়া না তুলি তবে কোন সীমান্তই নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারে না। আমরা যদি ভারত সরকারকে শক্তিশালী করিয়া না তুলি এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ না হই তবে আমাদের চারিপাশে যে বিরাট বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হইতেছে আমরা কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিব না।"

আসাম প্রদেশ সংহত, ঐক্যবদ্ধ নয়। ২৫ লক্ষ আদিম জাতি, ২৫।২৬ লক্ষ আহোম-ভাষাভাষী ও ২৪।২৫ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী লোকসমষ্টি আসামে বাস করিতেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা ইহাঁদের এক-তৃতীয়াংশের মতানুসারে পরিচালিত হইতেছে। ২৫ লক্ষ আদিমজাতি নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত, তাঁহারা নানা ভাষায় কথা বলেন। ২৪।২৫ লক্ষ বাঙালীকে "বিদেশী" বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। আসামের গবর্ণর পরলোকগত আকবর হায়দারী দুই বৎসর পূর্ব্বে আসাম ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশন উপলক্ষে এই শব্দটিই বাঙালীর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন; আসামের মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্মতি না থাকিলে তিনি এই বাক্য ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেন না।

এই অবস্থায় আসামের মন্ত্রীসভা "সীমান্তের অধিবাসী হিসাবে" তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে "সচেতন" এই কথার ব্যবহার তর্কের বিষয় হইয়া পড়ে। ভারতরাষ্ট্রপাল ও তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলী যদি ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তের ঐক্যবিধান সম্বন্ধে সজাগ থাকিতেন তবে বর্ত্তমান জটিলতা বৃদ্ধি পাইত না। আজ যে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার দাপটে ভারতের ঐক্যের কল্পনা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা তাঁহারা বাধা দিতে পারেন নাই। শ্রীগোপীনাথ বড়দলৈয়ের মন্ত্রীসভা গণ-ভোটের সময়ে শ্রীহট্ট জেলাকে বিসর্জ্জন দিয়াও নিরুদ্বেগে রাষ্ট্র শাসন করিতেছেন; যেসব শ্রীহট্টবাসী রাজকর্ম্মচারী ভারতরাষ্ট্রকে সেবা করিবার দায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বঞ্চনা করিয়াও পার পাইয়া গেলেন; আসামের বাঙালী বসতি অঞ্চল হইতে "পাকিস্থানীরা" খণ্ড খণ্ড স্থান ছিনাইয়া লইতেছে; এই মন্ত্রীমণ্ডলী তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। এখন প্রশ্রয় পাইয়া যদি ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চলকে তাঁহারা আরও বিপন্ন করেন তবে সেই সংবাদে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। আপনি মজিয়া লঙ্কা মজাইয়াছিল রাবণ; রামায়ণের সেই সাবধানবাণী বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উচ্চারিত হইতেছে।

ইস্‌লামিস্থান

"পাকিস্থানের" মোসলেম লীগ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি চৌধুরী খালিকোজ্জমান মোসলেম জাহানে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীব্যাপী মোসলেম দেশসমূহের শক্তি-সামর্থ্য সংগঠিত করিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকল দেশেই নাকি অনুভূত হইয়াছে; অথচ দেখিতেছি যে, কায়েদে-আজম জিন্না-প্রতিষ্ঠিত "ডন" পত্রিকা (করাচী ও লাহোরের "পাকিস্থান টাইমস্‌ও" এই কল্পনার ঘোর বিরোধী) এবং ভারতরাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহ এই কল্পনাকে হাসি-ঠাট্টা করিয়া নস্যাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্থানী সংবাদপত্রের বিরোধিতা ও আমাদের সংবাদপত্রের হাসি-ঠাট্টার প্রেরণা এক হইতে পারে না। তবুও এইরূপ একাত্মতা কৌতুকজনক।

আমরা কিন্তু এরূপ কল্পনার মধ্যে একটা ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ইঙ্গিত দেখিতেছি। ইস্‌লামপন্থীদের এই কল্পনা সদ্য-প্রসূত নয়। প্রত্যেক জাতি, সমাজ এরূপ একতার কল্পনা করিয়া থাকে। মানব-সমাজের আদি হইতে বাস্তব অবস্থার আঘাতে, মানব প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতার আঘাতে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে "রাজচক্রবর্ত্তীর"

কথা শুনিয়াছি—যাঁহারা সমস্ত হিন্দুপন্থী ও বৌদ্ধপন্থীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। খ্রীষ্টান যুগে বিশ্বব্যাপী সঙ্ঘের (Universal Church) কথা শুনিয়াছি; তাহা কল্পনা ও কথায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে। "বিশ্ব-নবীর" শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের মনেও এরূপ কল্পনা জাগিয়াছিল; উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন তুরস্কের সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরিয়াছিল তখন সুলতান আব্দুল হামিদ এই ইসলামিস্থানের বার্ত্তা প্রচার করেন। তাহার পরিণতি কি হইয়াছে তাহা আমাদের অনেকে দেখিতে পাইয়াছি।

চৌধুরী খালিকোজ্জমানের চেষ্টা অনুরূপ ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি হইবে কি? ভবিষ্যৎ তাহা স্থির করিবে। "ডন" ও "পাকিস্থান টাইম্‌সের" আপত্তি মনে হয় এই কল্পনার বিরুদ্ধে নয়; এই দুই পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় বর্ত্তমানে এরূপ কল্পনার সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন—এই যুগসন্ধির সময়ে কে এই "ইস্‌লামিস্থানকে" রক্ষা করিবে? কোনও মোস্‌লেম রাষ্ট্রের সে শক্তি নাই; সমগ্র মোস্‌লেম জগতেরও সে সঙ্ঘবদ্ধতা নাই। বর্ত্তমানে এরূপ চেষ্টা করিলে হয় মার্কিন নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর আশ্রয় স্বীকার করিতে হইবে, না হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর তাঁবেদার হইতে হইবে। এর কোন অবস্থাই সম্মানের নয়। এই আপত্তির সপক্ষে যুক্তি যে নাই, তাহা নয়। কিন্তু হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার ইহা নয়। করাচীতে অনুষ্ঠিত ইস্‌লামী অর্থনীতিক সম্মেলন এইরূপ প্রচেষ্টার পরিপোষক। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য তার একটা আছে; বিলাতের "ডেলী টেলিগ্রাফ্‌" পত্রিকা সেই কথা ভাবিয়াই বিচলিত হইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে এই সম্ভাবনার প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে।

যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বার্থক উন্নতি

ডিসেম্বর মাসের "মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকায় শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় যুক্তপ্রদেশে সর্ব্বার্থক উন্নতিকল্পে যেসব প্রচেষ্টা চলিতেছে তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাহা পাঠ করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। আমলাতন্ত্রের লাল-ফিতার প্রতি প্রীতি ও অপরাপর যে বাধা ভারতরাষ্ট্রের উন্নতির পথে দাঁড়াইয়া আছে তাহা লক্ষ্ণৌ নগরীতেও অভাব নাই; কংগ্রেসী নেতৃবর্গের ক্ষমতার প্রতি লোভ যুক্তপ্রদেশেও বিদ্যমান। তবুও সেই প্রদেশে যেসব উন্নতির কথা সতীশবাবু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে—আমাদের এই প্রদেশে তাহা সম্ভব হয় নাই কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সতীশবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া বর্ত্তমানে সেই চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম।

যুক্তপ্রদেশের কুটির-শিল্পের উন্নতি ও প্রসার করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাই সতীশবাবুর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একজন স্বতন্ত্র ডিরেক্টর আছেন; তিনি বাঙালী; তাঁহার নাম বি. কে. ঘোষাল। প্রদেশের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ; তাহাদের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক মাত্র "মহাযন্ত্র" পরিচালিত শিল্প প্রভৃতিতে নিযুক্ত; বাকী লোক পল্লীগ্রামের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক কুটির-শিল্পের সেবায় নিযুক্ত আছেন; তাঁহারা বৎসরে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকেশবদেব মালবীয় বলিতেছেন যে, আরও ৪০ লক্ষ লোককে পুরাতন ও নূতন কুটির-শিল্পে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে।

এই আদর্শের অনুরূপ চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁত-শিল্পে; তুলা, রেশম ও পশম বুনিয়া গ্রাম্য তাঁতিরা বৎসরে প্রায় ৬০ কোটি টাকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করেন। সমস্ত কুটির-শিল্পাদির উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশের উপর এই মান্ধাতার আমলের একটি যন্ত্রে উৎপাদিত হয়। মন্ত্রী মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট "মহাযন্ত্রের" মোহে আমাদের কুটির-শিল্পগুলিকে বিমাতার মত ব্যবহার করেন। মিলের রাক্ষুসী ক্ষুধা হইতে কুটির-শিল্পকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টা এখনও হইতেছে না। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি এই অবস্থাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় ৫ সের ওজনের মিলের সুতায় মিলে প্রস্তুত ৩৮ গজ মার্কিন মাল বাজারে বিক্রয় হয় ২১৲ টাকায়; তাঁতিকেও সেই পরিমাণ মিলের সুতা কিনিতে হয় ২১৲ টাকায়। সুতরাং অসম প্রতিযোগিতায় সে হটিয়া যাইতেছে। এরূপ প্রতিযোগিতায় দাপটে তাঁতি কি করিয়া টিকিয়া আছে সে এক রহস্য। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীও নিরুৎসাহ হন নাই; তাঁত শিল্পের উৎপাদন বৎসরে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের হউক, এই চেষ্টাই তাঁহারা করিতেছেন।

খাদি-উৎপাদনেও যুক্তপ্রদেশ আগাইয়া যাইতেছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালে তাহা বাড়াইয়া দেওয়া হয় ৯ লক্ষে। প্রায় ১,৫০০ গ্রামে এই অর্থপুষ্ট খাদি কার্য্য চলিতেছে; প্রায় ১৫,০০০ কাটুনি শিক্ষালাভ করিয়াছে বা করিতেছে; নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; তাহাদের সংখ্যা ৫২; তাহাদের সাহায্যের পরিমাণ ৬,৭২,৮৭০ টাকা, তাহাদের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ২২ লক্ষ বর্গ গজ; তাহার মূল্য প্রায় সাড়ে একুশ লক্ষ টাকা। খাদি শিল্পে কুশলীর সংখ্যা ১০০৭ জন।

আকের রস হইতে যে বিরাট উপার্জ্জনের পথ এই প্রদেশের লোকসমষ্টির সম্মুখে দেখা দিয়াছে তাহাও

লোভনীয়। কলের উৎপাদনে শতকরা সাড়ে সতের ভাগ মাত্র ব্যবহৃত হয়; শতকরা ৬৫ ভাগে গুড় উৎপাদিত হয়। এই গৃহশিল্পের উৎপাদনের মূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা। তাল গাছের রস হইতে গুড় উৎপাদন এই প্রদেশে একটা নূতন শিল্প। ১৯৪৮ সালে ইহার প্রসারকল্পে সরকারী চেষ্টা আরম্ভ হয়। আশা করা যায় যে, প্রায় লক্ষ লোক এই শিল্পের প্রসাদে জীবিকা উপার্জ্জনের নূতন পথ পাইবে। এই শিল্পের উৎপাদনের মূল্য হইবে প্রায় আড়াই কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজ তালের গুড় শিল্পের আদি স্থান। এই শিল্পের বিস্তারে আমাদের প্রদেশেও সরকারী চেষ্টা চলিতেছে।

সরিষার তেলের উৎপাদন যুক্তপ্রদেশের আর একটি প্রধান শিল্প। কলে উৎপন্ন হয় সাড়ে সতর মণ তেল; ঘানিতে উৎপন্ন হয় ৬০ লক্ষ মণ। ঘানির সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ হাজার; তাহা বাড়াইয়া দেড় লক্ষ করিবার কল্পনা চলিতেছে। সরিষার বীজের উৎপাদন প্রায় সওয়া দুই কোটি মণ, তাহার মূল্য সাড়ে একত্রিশ কোটি টাকা। কলিকাতার তেল কল বসিয়া আছে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সরিষার দিকে চাহিয়া। তাহাদের পরিচালকবৃন্দের না আছে সরিষার বীজ সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা, না আছে এই প্রদেশের সরকারের এই শিল্প সম্বন্ধে কোন চিন্তা; সকলেই ঘুমাইয়া আছেন।

চামড়া শিল্পে কলই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। তাহাদের উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। কুটির-শিল্পীর প্রস্তুত চামড়ার মূল্য ১০ কোটি টাকা।

প্রায় আড়াই লক্ষ কুমোর তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসায় চালাইতেছে। তাহাদের উৎপাদনের মূল্য সাড়ে সাত কোটি টাকার উপর। সমবায় পদ্ধতিতে ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। সরকারী অনুপ্রেরণায় কুমোরদের উন্নতির আভাস দেখা যাইতেছে। এই শিল্পের পরিপুষ্টি করিতে পারে "চীনামাটির বাসন" শিল্প। কলিকাতায় এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। গৃহ-শিল্পরূপে ইহার সম্ভাবনার কথা পরীক্ষা সাপেক্ষ। পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সংগঠন করিবার জন্য শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে যখন ডাকা হয়, তখন তিনি এই বিষয়ে একটা পরিকল্পনার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার সাহায্য প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং এই সম্ভাবনাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে।

ভারতরাষ্ট্রের দিকে দিকে নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সতীশবাবুর প্রবন্ধ তাহার একটা প্রমাণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ঘুমাইয়া আছে।

চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ন্মেণ্ট

চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ন্মেণ্টকে "জাতে তুলিয়া" লইবার কল্পনায় নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানগণ শিহরিয়া উঠিতেছেন; তার পররাষ্ট্রসচিব ডিন একিসন ত বলিয়া বসিয়াছেন যে মাও সে তুং-এর গবর্ন্মেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইবার আলোচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। অপরদিকে কিন্তু এশিয়ার অনেক দেশই তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষপাতী। ভারতরাষ্ট্রের প্রধান ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বলিতেছেন বাস্তবকে আর কতদিন ঠেকাইয়া রাখা যাইবে।

ব্রিটেন নাকি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন স্বীকার করিয়া লইবার জন্য; তাঁহার নাগরিকবর্গের ৪০০ কোটি টাকার মূলধন চীনের নানা ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটিতেছে; মার্কিনের মাত্র ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু আমরা মনে করি যে, টাকা-পয়সার হিসাবই এই ব্যাপারের একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। মার্কিন রাষ্ট্র চিয়াং কাই-শেক গবর্ন্মেণ্টের জন্য ৩০০।৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে।

এখন মাও সে তুং-এর পিছনে আছেন ষ্টালিন; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, চীনের কম্যুনিষ্ট নেতা ষ্টালিনের নির্দ্দেশে চলিতে বাধ্য এবং যতদিন ট্রুম্যান-ষ্টালিন ঠেলাঠেলি চলিবে ততদিন পশ্চিম ইউরোপে যেমন পূর্ব্ব-এশিয়ায়ও তেমনই শান্তি আসিতে পারে না।

ব্রিটেন মার্কিন দেশের হাতধরা। এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়াও সহজ নয়। পৌষ মাসে কলম্বো নগরীতে যে রাষ্ট্রমণ্ডলীর সম্মেলন হইবে ধার্য্য হইয়াছে, সেই সময় মার্কিনের উক্ত ও অনুক্ত নির্দ্দেশ বুঝিয়া এই বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সম্ভব। সমস্যা কঠিন সন্দেহ নাই। নিরপেক্ষতার পথে এশিয়া কতদূর যাইতে পারে ইহাই দ্রষ্টব্য।

"আশার কিরণ"

৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) তারিখের বাংলা "হরিজন" পত্রিকায় কাকা কালেলকরের গঠনমূলক কার্য্যের একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গের নিকট তাহা উপস্থিত করিতেছি:

> কোন কারণ নাই, কোনই উদ্দেশ্য নাই, অথচ লোকেরা গোটা দেশটাকে হতাশার এক মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছে। এই মরুভূমিতেও এখানে সেখানে দুই-একটি মরূদ্যান আছে। গান্ধীগ্রাম সেগুলির অন্যতম।...
>
> ৭ই অক্টোবর গান্ধীগ্রামের দ্বিতীয় বার্ষিকী ছিল। বন্ধুবর শ্রী জি. রামচন্দ্রন ঐ দিন গান্ধীগ্রামে যাইবার জন্য আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি খুশী হইয়া তাহাতে রাজি হই। শ্রীরামচন্দ্রনের স্ত্রী ডাক্তার সৌন্দরম্ গান্ধীগ্রামের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি তাহা জানিতাম। কিন্তু সে কাজ যে কিরূপ ও কতখানি তাহার কোন ধারণাই আমার ছিল না...

গান্ধীগ্রামের পূর্বে ও পশ্চিমে পাহাড়। পাহাড়ের মধ্যে গান্ধীগ্রাম স্বাস্থ্যকর কবিত্বময় জায়গা। ডিন্ডিগল ও মাদুরার মধ্যে আম্বাথুরাই নামে রাস্তার ধারের একটি ষ্টেশনের নিকটে এই গ্রাম।

এই কেন্দ্রে বুনিয়াদি শিক্ষা—কস্তুরবা কাজ সমগ্র গ্রাম-সেবা, সকল কাজই করা হয়। এখানে যেসকল কাজ করা হয় তাহার মধ্যে প্রসূতি-আগার, খাদির কাজ, চাষ, কুষ্ঠরোগীদের সম্মতি লইয়া তাহাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা, বহুমুখী সমবায় সমিতি, এইগুলিই প্রধান। আমার সব চাইতে ইহাই ভাল লাগিল যে, এখানকার কর্ম্মীরা নিজেদের কাজ ভাল করিয়া শিখিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজস্ব নিষ্ঠা, সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান লইয়া তাঁহারা অন্যদের শিখাইতেছেন। দুই বৎসরের মত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা যে ফল লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা কেবল নিজেদের জেলা হইতেই কয়েক লক্ষ টাকা তুলিয়াছেন। মাদ্রাজ গবর্ন্মেণ্ট ইঁহাদের কাজের সারবত্তা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারা গ্রামোন্নয়নের যে সকল পরিকল্পনা করিয়াছেন, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই কেন্দ্রের মারফত সেগুলি কাজে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছেন এবং ইহাকে বাড়াইবার উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। সব চাইতে আশার কথা হইল ইহাই যে, গান্ধীগ্রাম গ্রামবাসিগণের ঔদাসীন্য ভাঙ্গিয়া দিতে পারিয়াছে এবং তাহাদের মনে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করিতে পারিয়াছে।

গ্রামে যাঁহারা কাজ করিতে চান, আমি চাই, তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠান যেন দেখিয়া যান। চারি দিকের হতাশাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও এক লক্ষ্য, মন ও নিষ্ঠা লইয়া যে কি কাজ করিয়া তোলা যায় তাহা তাঁহারা যেন নিজেদের চোখে দেখিয়া যান। গান্ধীগ্রাম প্রধানতঃ মেয়েদের প্রতিষ্ঠান, কিন্তু নর, নারী ও শিশুদের সমান ভাবে সেবা করা ইঁহাদের সংকল্প।

"দেশী খেলা"

কলিকাতার প্রায় অপর পারে বালিগ্রাম বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান করিয়া লইয়াছে। সেই গ্রামের মাসিকপত্র "সাধারণী" একটা প্রশ্ন করিয়াছেন; তাহার উত্তর দেশকে দিতে হইবে। "দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কেন আমরা দেশী খেলা আরও বেশী করে খেলব না?" এই ভাবে ভাবুক হইয়াই পত্রিকাখানি বালির "বাচ্" খেলার বিবরণ দিয়াছিলেন। তার পর অন্য একটি খেলার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন:

"আমাদের গ্রামে দেশী খেলার মধ্যে কপাটীরই সব চেয়ে প্রচলন। বালিতে সাধারণতঃ এই কয়টি সমিতি নিয়মিত-ভাবে কপাটি খেলে—সরস্বতী ব্যায়াম সমিতি, মারুতি ব্যায়াম বিদ্যালয়, বালি বারাকপুর সমিতি, দক্ষিণপাড়া সম্মিলনী, কল্যাণেশ্বর সম্মিলনী, দেশবন্ধু স্মৃতিসঙ্ঘ, যুবক সমিতি, বাল্য সমিতি, বালি ইউনিয়ন ক্লাব প্রভৃতি। বালির দলগুলি কলিকাতা, আলমবাজার (কুটিঘাট), বালি, উত্তরপাড়া, বেলুড়, চন্দননগর, গোঁদলপাড়া ইত্যাদি জায়গায় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে বালির সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। বালির যে সমস্ত সঙ্ঘ নিয়মিত কপাটি খেলে তারা প্রায় প্রত্যেকেই এক বা দুইটি প্রতিযোগিতা চালায়। এর ফলে গ্রামের ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ে। প্রতি-যোগিতার পরিচালকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন নিয়মিত অনুশীলনের দিকে ঝোঁক দেন। তা হলে আগামী আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বালি থেকে আরও বেশী প্রতিযোগী নির্ব্বাচিত হবার আশা করা যাবে। কপাটি খেলার উপযুক্ত সময় শীতকাল। তাই এখন থেকে তার তোড়জোড় রীতিমত সুরু হওয়া দরকার।"

এই বিষয়ে একটা প্রশ্ন করিতে চাই। সব খেলারই অন্যতম উদ্দেশ্য সঙ্ঘ-শক্তির আয়োজন ও বৃদ্ধি। বর্ত্তমানে যে ভাবে এই প্রদেশে তাহা চলিতেছে, তাহার ফলে এই উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হয়?

বাঁশ বনাম লৌহ

"নাই নাই" করিয়া সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসই অতলে ডুবিয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রপরিচালকগণ নিঃসহায়ে এই তিরো-ধান উৎসব দেখিয়া যাইতেছেন। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, লৌহ নাই—কথা শুনিয়া শুনিয়া দেশের লোকের মনে একটা নিরাশার ভাব জমাট হইয়া বসিয়া যাইতেছে।

কৃষকের জীবনে লৌহের প্রয়োজন চাষের লাঙ্গল ও অন্য কৃষিযন্ত্রের জন্য। তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২২শে অগ্রহায়ণে প্রকাশিত বিবৃতিতে দেখিতেছি, "এই প্রদেশের নির্দ্ধারিত পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাত চাষীদের জন্য বর্ত্তমানে সংরক্ষিত আছে।" অথচ সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয় শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, বর্দ্ধমান কালনা-কাটোয়া সাব-ডিভিসনের ৬ বর্গমাইল বিস্তৃতির মধ্যে কামাররা লৌহের অভাবে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীর মুখে এই কথা শোনা গিয়াছে।

লৌহের অন্য ব্যবহারও আছে; ঘরদরজা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনে নানা রকমে লৌহের ব্যবহার হয়। সেই প্রয়োজন

মিটাইবার জন্য একটা ব্যবহার-কথা মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর হইতে শুনিতে পাইয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম। স্থপতিরা ও বিজ্ঞানসেবকেরা ইহার অনুসন্ধানে নাকি সফলকাম হইয়াছেন। শ্রী টি. এন্. বসু তাঁহাদের একজন। বিবরণ পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি সিঙ্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; নেতাজীর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। বর্ত্তমানে তিনি হিন্দুস্থান কন্‌ষ্ট্রাকশন কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই কোম্পানী মধ্যপ্রদেশের সরকারের আদেশে তাঁহাদের কর্ম্মচারীবৃন্দের ব্যবহারের জন্য প্রায় ২০০টি বাসাবাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছেন। ১৯২৭ সালে সিঙ্গাপুরে তিনি বাঁশের উপর সিমেণ্ট চড়াইয়া একটি ছাদ নির্ম্মাণ করেন। জাপানে ও চীনদেশে ইহার পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, ছাদে সিমেণ্ট ধরিয়া রাখিবার জন্য লৌহের ব্যবহার আরও কম করা যায়। নাগপুরে তাহার ব্যাপক পরীক্ষা হইয়া যাইবে।

ভারত-সরকার জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ার আনাইতেছেন আমাদের কলকারখানায় গৃহনির্ম্মাণের জন্য; কোটি টাকা ব্যয়ে তার কারখানা হইবে। এই সময়ে এই আবিষ্কার সময়োচিত হইয়াছে। বাঁশ এখনও আমাদের দেশ হইতে উধাও হইয়া যায় নাই। বাঁশ-ছনের ঘর পঞ্চাশ-ষাট বৎসর টিকিয়া থাকিতে আমরাও দেখিয়াছি। বসু মহাশয় বলিতেছেন বাঁশের আশ্রয়ে সিমেণ্টের ঘর ১০০ বৎসর টিকিবে। তাঁহার এই কল্পনার সাফল্য আমরা কামনা করি।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ম্মল আনন্দ দান একটা পুণ্য কর্ম্ম; এই আনন্দপ্রকাশ উপলক্ষে অনেক সময় চোখের জলও উপচিয়া পড়ে। কেদারনাথ আমাদের নির্ম্মল আনন্দ দিয়াছেন তাঁহার লেখার মাধ্যমে; বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-কথা কহিতে অনেক সময় চোখের জল ফেলিয়াছেন। আজ এই আনন্দের প্রস্রবণ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার কন্যা-জামাতা দৌহিত্রকে আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি।

বাংলা-সাহিত্যের দিকপাল এই লোকটির আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সরল ও সহজ ছিল। তিনি সেই কথাই দুই বৎসর পূর্ব্বে শুনাইয়াছিলেন তাঁহার ৮৬তম জন্মতিথি উপলক্ষে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের দিন-পঞ্জীতে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তাহা লোকগোচর করেন।

"এ-জীবনে দুটি কথা ছিল এ দীনের মনে
শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ, বন্ধুত্ব লাভ রবীন্দ্রের
পেয়েছি তা। আর কি আছে? ভাবিনিও এ-জীবনে;
আজ দেখি অকস্মাৎ দেখাও পেলাম তৃতীয়ের—
ছিল যাহা আশাতীত স্বাধীনতা অবশেষে
অচিন্ত্য অভাবনীয়, তারো দেখা পেলাম আজ,
এখন মোরে শ্রীপদে লও কৃপা করি রসরাজ
শেষ কথাটি ব'লে যাই স্বাধীন মোরা স্বাধীন দেশ।"

"রসরাজ" তাঁহার পদতলে কেদারনাথকে স্থান দিন।

বিনয়কুমার সরকার

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের দেহত্যাগে স্বদেশী যুগের স্মৃতিপূত আর একটি জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল। "ডন" সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে গড়া যে সব শিক্ষার্থী দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন দেশ-বিদেশে বিনয়কুমারই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কীর্ত্তিমান। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা ছিল অদম্য।

বর্ত্তমান যুগোপযোগী ভাব ও চিন্তাধারার সাধক ছিলেন তিনি এবং তাহার কষ্টিপাথরে নিজের দেশের সংস্কৃতির নানা প্রকাশকে তিনি যাচাই করিতেন। যেখানে তাহা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, সেখানে তিনি তাহার প্রচারের জন্য দেশবিদেশে ঘুরিয়াছেন; যেখানে তাহা উত্তীর্ণ হয় নাই, সেখানে তাহার নিন্দা করিয়া লোকগঞ্জনা সহ্য করিবার সাহসও তাঁহার ছিল। সেইজন্যই দেখিতে পাই যে গান্ধীবাদ গ্রহণ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তিনি স্বাধীনতালাভের পরেও যথোচিত সম্মান পান নাই।

বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তিনি। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙালীকে বাস্তব অর্থনীতিতে হাত পাকাইবার কর্ত্তব্য নিজের প্রাণের অফুরন্ত উৎসাহে তিনি গ্রহণ করেন। বঙ্গভাষার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে তিনি একটা নিজস্ব রীতি প্রবর্ত্তন করেন।

নিরভিমানী, আত্মভোলা এই জ্ঞানযোগীর তিরোধানে আমরা আত্মীয়জন বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক!

কুমারী জোসেফিন ম্যাক্‌লাউড্

পরমহংসদেবের জীবনকথায় রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে; তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাণ্ডারী। স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার কার্য্যে কুমারী জোসেফিন ম্যাক্‌লাউডের অনুরূপ একটা স্থান আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই মহীয়সী মহিলা ৯১ বৎসর বয়সে গত আশ্বিন মাসে তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিয়া গেলেন। ১৮৯৩ সালে স্বামীজী চিকাগো ধর্ম্মসভায় যোগদান করেন। ১৮৯৫ সালে কুমারী ম্যাক্‌লাউডের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। সেই অবধি ভারতবর্ষের সেবায়

কুমারী ম্যাক্‌লাউড্ মন্ত্র-প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর মন্ত্র-শিষ্যা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু "ভারতকে ভালবাসো"—স্বামীজীর এই অনুজ্ঞা তিনি ব্রতের মতন পালন করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম-প্রচেষ্টার তিনি একজন ধারক ছিলেন। এই কার্য্যের প্রয়োজনে রাজনীতি হইতে তিনি দূরে থাকিতেন; একবার মাত্র তার ব্যতিক্রম হয়। লাট লিটনের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটা রাজনীতিক বোঝা-পড়ার চেষ্টায় কুমারী ম্যাক্‌লাউডের হাত ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁহার ২৫ বৎসর পর ইংরেজের রাজ-ক্ষমতা ভারতবর্ষ হইতে অপসারণ করা হইয়াছে। কুমারী ম্যাক্‌লাউড্ সেই সংবাদ শুনিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে এই "ভারতগতপ্রাণা" নারীর মনে কি ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। সেই কথা মনে করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

হেমেন্দ্রনাথ বক্‌সী

কলিকাতার প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বক্‌সী ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজ যখন স্কুল ছিল তখন তিনি তাহার অধ্যাপক ছিলেন। সেই স্কুলের অধ্যক্ষ পদ লাভ করার সময় তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি ডাক্তারী শিক্ষার নানা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হন নাই; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বেঙ্গল ষ্টেট্ ফেকাল্টির তিনি পরীক্ষক ছিলেন। এই পরোপকারী, অজাতশত্রু চিকিৎসকের তিরোধানে কলিকাতার সমাজ একজন প্রবীণ লোক হারাইল।

জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী

৮০ বৎসর বয়সে অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী পরলোক-গমন করিয়াছেন। হুগলী কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সাহচর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয়। তারপর জ্যোতিভূষণ কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শেষজীবন কৃষ্ণনগরে কাটাইয়াছিলেন। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান এই জ্ঞানবৃদ্ধের সাহায্য ও উপদেশ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার তিরোধানে আমরা তাঁহার আত্মীয়জনের সঙ্গে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সুরেন্দ্রকুমার বসু

নদীয়া কৃষ্ণনগরের একজন নাগরিক-প্রধানের তিরোধানে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। জীবনের সকলপ্রকার পারিবারিক কর্ত্তব্য প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের সরকারী উকিলরূপে ও মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতিরূপে তিনি জেলা ও শহরের উন্নতির চেষ্টায় অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই তিনি আইন ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কর্ম্মজীবনে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তিনি লোকের উপকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; পরলোকগত আজিজুল হকের উন্নতিই তাহার একটা প্রমাণ। রাজনীতি হইতে তিনি দূরে থাকিতেন; কিন্তু ঘটনার পরিবর্ত্তনে তাঁহাকে একবার হিন্দু মহাসভার সমর্থকরূপে বঙ্গীয় শাখার বাৎসরিক সভার আয়োজনে নিবিষ্ট হইতে হয়; সেই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

শিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, বিশেষ করিয়া ব্যবহারিক শিক্ষায়। তিনি স্থানীয় ডন বসকো বিদ্যালয়ের শিক্ষার একজন সমর্থক ছিলেন। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় যখন কলিকাতা হইতে নারীশিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত "মহিলা শিল্প ভবন" ও শচীন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্প-বিদ্যালয় কৃষ্ণনগরে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন সুরেন্দ্রকুমার সংগঠক ও অভিভাবকরূপে তাহাদের সুব্যবস্থা করেন। "হিন্দু কল্যাণ প্রতিষ্ঠান" নামে একটি উচ্চ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সুপরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা তাঁহার ব্যক্তিগত পুস্তকাগার দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা কিরূপ প্রবল ছিল; বিজ্ঞানের অত্যন্ত আধুনিক গতি পরিণতি সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। আমাদের সমাজ হইতে এরূপ জ্ঞানসাধক ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছেন।

নিবারণচন্দ্র পাল

ফরিদপুরের বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র পাল দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিপৎ-সঙ্কুল পথে ১৯ বৎসর বয়সে যে জীবনের কর্ত্তব্যধারা বহিতে আরম্ভ হয় ইংরেজ শাসনমুক্ত ভারতে ৬২ বৎসর বয়সে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই বিয়াল্লিশ বর্ষকাল শাসকবর্গের নির্যাতনে, কারাগারের মধ্যে প্রায় তাঁহার অর্দ্ধেক জীবন কাটিয়াছে। কারাগারের বাহিরে আসিয়াও তাঁহার না ছিল বিশ্রাম, না ছিল শান্তি। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করিয়া রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে পদার্পণ করিলেও গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে গণ-জাগরণের বিরাট সম্ভাবনা দেখিয়া, নিবারণচন্দ্র গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত প্রত্যেক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

খিল্লবীর ভাগ্যে গার্হস্থ্য-জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব হয় না; নিবারণচন্দ্রের জীবনে ইহাই আবার প্রমাণিত হইয়াছে। শেষবয়সে তিনি হৃতসর্বস্ব হইয়া কাটাইয়াছেন; তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যবুদ্ধির হাতে ন্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রার্থিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কট

"রামকৃষ্ণ মিশন" কর্ত্তৃক পরিচালিত "নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের" সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক মহাশয় যে আবেদন জানাইতেছেন, তাহা এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। অনেক হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবার এই বিদ্যালয়ের নিকট ঋণী। তাহা অপরিশোধ্য। যখন বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কটের কথা লোকগোচর হইয়াছে, তখন শত শত বাঙালী পরিবারের উচিত এই সঙ্কট মোচন করিয়া কথঞ্চিৎ ঋণমুক্ত হওয়া।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতে যে নবজাতীয়তা উদ্বেলিত হইয়া নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেই মুক্তিস্নানের আয়োজনে নিবেদিতার অবদান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছে। বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষিত দেশবাসী সেই ইতিহাস পাঠ করেন না। সেইজন্য তাঁহারা মনে করেন যে, ভারতে নবজাতীয়তার জন্ম ১৯১৭ সালে। এই মোহের হাত হইতে তাঁহাদের মুক্ত করিতে হইলে চাই নিবেদিতার কর্ম্মগাথার বহুল প্রচার। সেই কর্ম্মগাথার মধ্যে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা; তাহার আদর্শের ও আকৃতির মাহাত্ম্য প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্মকথা বুঝিতে পারিব।

নানা অবস্থার তাড়নায় আমাদের সমাজজীবন বিপন্ন। আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় থাকিয়াই আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। নিবেদিতা জীবনে সেই মরণবিজয়ী দীক্ষা বাঙালীকে দিয়াছিলেন। গুরুদক্ষিণা দিবার দিন আবার আসিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন—সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।"

এই উদ্দেশ্যসাধনে কৃতসঙ্কল্পা ও ব্রতচারিণী, গুরুগতপ্রাণা, পরমবিদুষী ভগিনী নিবেদিতা সকলপ্রকার দুঃখদৈন্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া ভারতীয় নারীদের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার বিস্তারকল্পে প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার পূত জীবনের অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠা, ত্যাগ ও তপস্যা প্রভাবে এই শিক্ষামন্দিরে যে শক্তি সঞ্চিত আছে তাহার পরিচয় গত পঞ্চাশৎ বর্ষের কার্য্য সাফল্যে পাওয়া যাইতেছে। বহুসংখ্যক বালিকা-জীবন উহার সহায়ে বিস্তার পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। বহু অন্তঃপুরচারিণী মহিলা এই মন্দিরে প্রকৃত শিক্ষালাভে ধন্যা হইয়াছেন। দরিদ্রা কুলবধূ শিল্পাদি কার্য্য সহায়ে জীবিকা অর্জ্জনে ও সমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থা হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে আট শত ছাত্রীর মধ্যে পাঁচ শতকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত মাত্র আকাশবৃত্তি অবলম্বনে নীরবে শত শত বালিকার সেবায় রত থাকিলেও অর্থাভাবে ১৯৪৭ সাল হইতে উচ্চ-শ্রেণীগুলিতে বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ বেতন (যদিও গবর্নমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা কম) লইতে বাধ্য হইতেছেন। বলা বাহুল্য, ভগিনী নিবেদিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও গুরুকুলের আদর্শে পরিচালিত শিক্ষায়তনের পক্ষে শিক্ষার্থীর সহিত এরূপ আর্থিক সম্পর্ক অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যাহা হউক, এখনও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ঐরূপ কোনও বেতন লওয়া হইতেছে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে শিল্পবিভাগের বহু অনাথা দরিদ্রা নারীকে যথোচিত সাহায্য করা যাইতেছে না। এই সকল বিভাগকে সুচারুরূপে চালাইতে হইলে বৎসরে আরও অন্ততঃ ৬,০০০৲ টাকা প্রয়োজন; বর্ত্তমানে যথাসম্ভব ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও বৎসরে ৪,০০০৲ টাকা ঘাটতি থাকিয়া যাইতেছে।

সারদামন্দির ছাত্রী-আবাসে স্থানাভাব হেতু বহু ছাত্রীকেও স্থান দেওয়া যাইতেছে না। নিবেদিতা বিদ্যালয় গৃহটি সুন্দর কিন্তু অতি শীঘ্র গৃহছাদগুলির সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক। ইহাতে অন্যূন ২০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। এতদ্ব্যতীত ছাত্রীসংখ্যা-বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয়ের কতক অংশ পৃথক স্থানে করা একান্ত প্রয়োজন। উহার জন্য জমি ক্রয় ও গৃহ নির্ম্মাণে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা। যাঁহারা বিগত শতকের শেষভাগ ও বর্ত্তমান শতকের প্রথমাংশের ভারতের ইতিহাসের সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষা চারুকলা ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার অবদান কিরূপ মহিমময়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিলে, ভগিনী নিবেদিতা উমার ন্যায় তপস্যা করিয়া ভারতের আত্মারূপ শিবকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, সেই মহিমময়ী নারীর প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাঁহারা কি নিবেদিতার সর্ব্বপ্রধান সাধন-ক্ষেত্র ও একমাত্র স্মৃতিমন্দিরের রক্ষাকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন না?

স্বাক্ষরকারীর নিকট বা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকার নিকট (৫নং নিবেদিতা লেন, কলিকাতা) সাহায্য পাঠাইলে উহা ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে।

(স্বাঃ) স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক।

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দুইটি অধ্যায়

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

"শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণ" (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫২) নামক প্রবন্ধ লইয়া আরম্ভ করিয়া প্রবাসীর পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে যে সকল প্রবন্ধ চার বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, ইতিপূর্বের প্রবন্ধটি (সিন্ধু সভ্যতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) সেই সিরিজের শেষ প্রবন্ধ। আঠারোটি প্রবন্ধে যে সকল কথা এত দিন ধরিয়া বলা হইয়াছে তাহার মূল সূত্রগুলি গুছাইয়া পাঠকের নিকট ধরিবার প্রয়োজন আছে।

প্রবন্ধগুলিতে ভারতবর্ষের দুইটি প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা, সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতাকে, ভারতবর্ষীয়ের ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আরও বিশদ করিয়া বলিলে, সিন্ধু কৃষ্টি ও বৈদিক কৃষ্টির উৎপত্তি ও বিকাশ কোন্ গোষ্ঠীর জাতির দ্বারা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবাসীদিগের সহিত তাহাদের কি প্রকার সম্বন্ধ সাহিত্যিক, পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণের আলোচনা করিয়া তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা প্রবন্ধগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। যে সকল তথ্য ও প্রমাণ আলোচনাসূত্রে উল্লেখ ও ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশ নূতন নহে, অজ্ঞাতও নহে, তবু সেগুলি কেন উপেক্ষিত হইয়াছে তাহার উত্তর পাঠক নিজে দিবার চেষ্টা করিবেন। এই সকল তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে যে সকল সিদ্ধান্তে আসা হইয়াছে তাহা কত দূর সঙ্গত ও বিচারসহ তাহা পণ্ডিতসমাজ স্থির করিবেন। এখানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, প্রবন্ধগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পুনঃপুনঃ বলিবার প্রয়োজন আছে। সমগ্র আলোচনার ধারাটি যাহাতে সহজে দৃষ্টিতে পড়ে এজন্য এখানে প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য পর পর বলিয়া দেওয়া হইতেছে। যুক্তিতর্কের বিবরণ যাঁহারা চাহেন তাঁহারা মূল প্রবন্ধগুলি দেখিবেন। বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অংশে এই ভাবে বক্তব্য বিষয়গুলির চুম্বক দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্টির দুইটি অধ্যায়ের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দুই-চারিটি কথা বলা হইয়াছে।

১

প্রবন্ধগুলিকে দুইটি সিরিজে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম সিরিজের এগারোটি প্রবন্ধে বৈদিক ও আবেস্তিক কৃষ্টি এবং বৈদিক ও ইরাণী আর্যজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে (শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্যজাতির ভারত আক্রমণ—প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫২) এক শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্য জাতি কোন এক সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দাস ও দস্যু নামে অভিহিত অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য আদিবাসীদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া এদেশে আপনাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ও এদেশে গৃহীত এই মতবাদের আলোচনাক্রমে বলা হইয়াছে যে, ইহার সপক্ষে পুরাতত্ত্বের ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের কোন প্রমাণিত তথ্য উপস্থিত করা হয় নাই এবং ঋগ্বেদে এই মতবাদের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

উপরের মতবাদের আর একটি অংশ এই যে, আর্য জাতি দক্ষিণ রুশিয়া বা উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার খিরগিজ প্রান্তর হইতে মধ্য এশিয়ার পথে বা মেসোপটেমিয়ার পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। মেসোপটেমিয়ার পথে আর্য জাতি আসিয়াছিল যাঁহারা বলেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে আসিবার পথে আর্যজাতির সহিত সেমেটিক রক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধে (বৈদিক আর্যগণ কি সেমেটিক ?—প্রবাসী পৌষ, ১৩৫২) এই অংশের সপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হয় সেগুলি আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সকল যুক্তি অনুমান মাত্র. ঋগ্বেদ হইতে এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং আর্যজাতি যে উত্তর-পশ্চিম এশিয়া বা দক্ষিণ রুশিয়া হইতে আসিয়াছিল ইহা প্রমাণিত না হইলে মধ্য এশিয়া বা মেসোপটেমিয়ার পথের কথা উঠে না।

পরবর্তী দুইটি প্রবন্ধে (বেদের আর্য কাহারা ? এবং ঋগ্বেদে দাস ও দস্যু—প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫২, শ্রাবণ ১৩৫৩) ঋগ্বেদের সাক্ষ্য-প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদে আর্য, দাস, দস্যু—পদগুলি কি অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, ঋগ্বেদীয় সমাজের কোন্ কোন্ অংশের সম্বন্ধে এই সকল পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং দাস ও দস্যু, ভারতবর্ষের অসভ্য বা অর্দ্ধ আদিবাসী এই মতের সপক্ষে ঋগ্বেদে কোন প্রমাণ আছে কিনা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসা হইয়াছে

যে, ঋগ্বেদে আর্যপদ কতকগুলি ক্ষেত্রে কৃষ্টিমূলক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে জাতি-বাচক অর্থ দেখা যায়; এই পদ সাধারণতঃ ঋষিকুলগুলির সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। দাস ও দস্যু পদ ঘৃণা বা অবজ্ঞাপ্রকাশক, এই পদগুলির কোন জাতিবাচক সংজ্ঞা নাই, খানিকটা কৃষ্টিবাচক সংজ্ঞা মাত্র দেখা যায়। কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বৈদিক দেবদেবীর উপাসক হইলেও ঋষিকুলগুলির প্রচারিত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিরোধী বা উহাতে অনাসক্ত হইলে দাস ও দস্যু পদ তাহাদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইত।

ইহার পর একটি প্রবন্ধে (ঋগ্বেদে দেবতাদিগের মধ্যে ও ঋষিকুলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব—প্রবাসী পৌষ, ১৩৫৩) ঋগ্বেদে ধর্মমতের বিরোধ, দেবদেবীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পুরুষানু-ক্রমিক পৌরোহিত্যের উৎপত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, বৈদিক দেবদেবীগণ ঋষিকুলের প্রচারিত যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও ঋগ্বেদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

পরবর্তী পাঁচটি প্রবন্ধে বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্য জাতির মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্য—প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩) পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদ ও আবেস্তার মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য, এই দুই গ্রন্থ রচনার আনুমানিক সময়, জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম বিকাশের কয়েকটি স্তর এবং আর্যজাতির মধ্যে ধর্মমতের বিরোধ ও রাজ-নৈতিক কলহের ফলে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের অভ্যুদয় ও বৈদিক আর্যগণের ইরাণ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে প্রস্থান, এই মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনাসূত্রে বলা হইয়াছে যে, জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের বিকাশের ইতিহাস হইতে এই ধর্মের অভ্যুদয়ের ফলে বৈদিক আর্য জাতি ও আবেস্তিক আর্য জাতির মধ্যে মনান্তর হয় ও বৈদিক আর্য জাতি ভারতবর্ষমুখে প্রস্থান করে—এই মতের কোনরূপ সমর্থন পাওয়া যায় না, বরং মনে হয় যে, আবেস্তায় দেবধর্মের প্রতি যে আক্রমণ দেখা যায় তাহা ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্তরমুখী প্রসারের বিরুদ্ধে।

ইহার পরের তিনটি প্রবন্ধে প্রাচীন পূর্ব-ইরাণ ও পশ্চিম-ইরাণের ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, দেখা যায়, ইরাণী জাতি ও কৃষ্টি এবং জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের গতি পূর্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্বে নহে এবং আবেস্তার বর্ণনা হইতে প্রাচীন আর্যবসতি আইরিয়ানার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য—প্রবাসী কার্তিক, ১৩৫৩) পূর্ব ও পশ্চিম ইরাণের মধ্যে ভাষা ও জাতীয় চরিত্রের পার্থক্য, এই দুই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস, মিডিয়ান ও হাকামনী সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, গ্রীক আক্রমণ কালে পূর্ব-ইরাণের বিরোধিতার ইতিহাস উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, পূর্ব-ইরাণ হইতে ইরাণী জাতি ও ইরাণী কৃষ্টির সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল। পূর্ব-ইরাণ সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহাই ছিল আর্য জাতির দেশ বা airyao danhavo এবং এই প্রসঙ্গে আর্যদিগের এই দেশের মধ্যে ব্যাকট্রিয়া, পারশ্য ও মিডিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল—এই মত খণ্ডন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, পারশ্য ও মিডিয়া আর্যকৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু আর্য-দিগের আদি বাসভূমি নহে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য (২)—প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৩) আর্য জাতির দেশ সম্বন্ধে আলোচনা আরও অগ্রসর হইয়াছে। আবেস্তায় উল্লিখিত আহুরা-মাজদার সৃষ্ট ষোলটি আর্যবসতির বিস্তারিত ভৌগোলিক বর্ণনা দিয়া দেখান হইয়াছে যে, এই ষোলটি বসতির মধ্যে এগারোটি পূর্ব-ইরাণ, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে পড়ে। এই এগারোটি বসতি লইয়া একটি পরস্পরসংলগ্ন ভৌগোলিক অঞ্চল (compact geographical area) পাওয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচটি বসতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এই আর্যবসতির তালিকার মধ্যে ফার্শ (পারশ্য) ও মিডিয়া নাই। সুতরাং আর্য জাতির সম্প্রসারণ যে পূর্ব হইতে পশ্চিম মুখে হইয়াছিল এই মতের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য (৩)—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫) মিডিয়ার মাজি সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের বিস্তারিত ইতিহাস, হাকামনী, আরসিকিডান ও সাসানীয় যুগে তাহাদের প্রভাব ইত্যাদির আলোচনা করিয়া জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের জন্মভূমি পূর্ব-ইরাণ হইতে আর্যকৃষ্টি পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইয়াছিল প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচনার উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন ইরাণের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং কৃষ্টি-সম্প্রসারণের ইতিহাস হইতে দেখা যায়, আইরিয়ানা আর্য জাতির জন্মভূমি ও কৃষ্টিকেন্দ্র ছিল। আইরিয়ানার উত্তর সীমানা বোখারা, মার্ভ, খিবা, দক্ষিণ সীমানা সিন্ধু-গাঙ্গেয় অববাহিকা।

ইহার পরের প্রবন্ধে (আইরিয়ানা ও আর্য—প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৫) য়ুরোপীয় পণ্ডিত সমাজে কিভাবে আর্য পদের অর্থবিকৃতি ও অপপ্রয়োগ ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে ইউরোপীয় আর্যবাদের উৎপত্তির বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ভাষাবিজ্ঞানী ও পোলিটিকাল

প্রোপাগাণ্ডিষ্ট মিলিয়া এই আর্যবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। আর্যপদের অর্থ আইরিয়ানার অধিবাসী। আইরিয়ানা হইতে পরবর্তীকালে আইরান্, এরাণ ও ইরাণ নাম আসিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজ এই তথ্য বিস্মৃত হইয়াছেন বা অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে আর্যপদের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সংজ্ঞা ও ইতিহাস আছে, কোন প্রকার থিওরীর সাহায্যে এই ভৌগোলিক সংজ্ঞা উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

এই সিরিজের শেষ প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য জাতি ও অবৈদিক আর্য জাতি—প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৫৪) আর্য জাতির সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করা হইয়াছে। রমাপ্রসাদ চন্দের প্রচারিত তাকলামাকান হইতে আগত গোলমুণ্ড আর্যজাতি (যাহাদিগকে অবৈদিক আর্য জাতি বা Indo-Aryans of the Outer Band বলা হইয়াছে) এবং উত্তর-পশ্চিম এশিয়া বা দক্ষিণ-রুশিয়া হইতে আগত লম্বামুণ্ড বৈদিক আর্য জাতি সম্বন্ধে মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, দুইটি ভিন্ন গোষ্ঠী-ভুক্ত জাতিকে আর্য বলা হইতেছে। ইহার অর্থ চন্দ মহাশয় ইউরোপীয় আর্যবাদ গ্রহণ করিয়া এই মতবাদের সঙ্গে নিজের মতবাদ জুড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে গোলমুণ্ড আর্য জাতি লম্বামুণ্ড আর্যজাতির পরে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কিন্তু জানা গিয়াছে যে, তাকলামাকান হইতে আগত এই গোলমুণ্ড জাতি—চন্দের অবৈদিক আর্য জাতি—তাম্র যুগের সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল।

এই প্রসঙ্গ হইতে সিন্ধু সভ্যতা ও সিন্ধু জাতি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সিরিজের সাতটি প্রবন্ধে সিন্ধু জাতি ও সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম তিনটি প্রবন্ধে সিন্ধু সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতা ও প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার সম্পর্ক এবং সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমতের আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে (সিন্ধু যুগ হইতে বৈদিক যুগ—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪) সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে ব্যবধানকে unbridgeable gulf বলা হয় সেই ব্যবধান বাস্তবিক কি প্রকারের তাহা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়া এই দুই যুগের যে সময় নির্দেশ পণ্ডিতগণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর দেখান হইয়াছে যে, এই দুই যুগের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে এরূপ বলিবার কারণ পণ্ডিতগণ মনে করেন মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা প্রভৃতি স্থান পরিত্যক্ত হইলে সিন্ধু কৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যায়। সিন্ধু কৃষ্টি গড়িয়া উঠিতে যে সময় লাগিয়াছিল, সিন্ধু কৃষ্টির স্থায়িত্বকাল এবং সিন্ধু কৃষ্টির বিস্তার প্রভৃতি বিবেচনা করিলে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন মনে হয় যে সিন্ধু-কৃষ্টি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সিন্ধুধর্মের অনেক অঙ্গের সহিত হিন্দুধর্মের সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করা হইয়াছে—মধ্যে বৈদিক কৃষ্টি অবস্থান করিলেও এই সাদৃশ্য বৈদিক ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া বহুপরবর্তী হিন্দু-ধর্মে কি ভাবে আসা সম্ভব হইতে পারে? সিন্ধুধর্মের প্রভাব হিন্দুধর্মের উপর পড়িয়া থাকিলে সেই প্রভাব অবশ্য সিন্ধু জাতির বংশধরদিগের দ্বারা বাহিত হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের গোলমুণ্ড জাতি সিন্ধু উপত্যকার গোলমুণ্ড জাতির প্রতিনিধি, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের এই মতের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে বৈদিক কৃষ্টির অভ্যুদয়ের যুগে এই জাতি ভারতবর্ষে ছিল। রমাপ্রসাদ চন্দ ইহাদিগকে অবৈদিক আর্য জাতি বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, ধর্ম ও জাতির ডবল খিলানের সেতু সিন্ধু-যুগকে বৈদিক ও বর্তমান যুগের সহিত যুক্ত করিয়াছে। সিন্ধুযুগের সহিত বৈদিক যুগের সম্পর্ক সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধু সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়া—প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৪) সিন্ধু জাতি ও সিন্ধু কৃষ্টি মেশো-পটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল, কয়েকজন পণ্ডিতের প্রচারিত এই মতবাদের আলোচনাসূত্রে প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার ইতিহাস, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, মেশোপটেমিয়া যুগের পরে ইরাণী যুগের অভ্যুদয়, উত্তর ও দক্ষিণ মেশো-পটেমিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের অভিমত, সিন্ধু উপত্যকার সহিত দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক ও অন্যবিধ সংযোগ এবং ডাঃ হাটন প্রমুখ পণ্ডিতগণের সিন্ধু কৃষ্টিকে দ্রাবিড় কৃষ্টি বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াসের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সিন্ধু জাতি ও কৃষ্টি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল, এই মতের সপক্ষে বিচারসহ কোন প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই, এই মত সম্পূর্ণরূপে অনুমানমূলক। এই প্রসঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার সেরামিকস্, স্থাপত্য, আর্ট, ধর্ম যে তাহার নিজস্ব জিনিস পণ্ডিতগণের এই মতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তি—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫৫) সিন্ধু-সভ্যতার উৎপত্তির প্রসঙ্গে ও ইহার উপর বৈদেশিক প্রভাব প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল তথ্য ও প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা

করা হইয়াছে। সেরামিক্সের প্রমাণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সীমান্ত অঞ্চলে বৈদেশিক প্রভাব লক্ষিত হয়। সিন্ধু উপত্যকার পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তিগুলিকে অন্যান্য দেশের স্ত্রী-দেবতার সঙ্গে তুলনা করিয়া সাদৃশ্যের প্রমাণে সিন্ধু উপত্যকাতেও স্ত্রী-দেবতা ও মহাদেবীর উপাসনার প্রচলন এবং এই উপাসনা বৈদেশিক প্রভাবজাত বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু দেখান হইয়াছে যে, সিন্ধু উপত্যকার এই স্ত্রীমূর্তিগুলির সহিত প্রাচীন যুগে অন্যান্য দেশে পূজিত স্ত্রীদেবতার কোন সাদৃশ্য নাই। সিন্ধুধর্ম পূর্ব ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চল বা আনাতোলিয়া হইতে আসিয়াছিল এই মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রাচীন আনাতোলিয়ার ধর্মের বিবরণ দিয়া দেখান হইয়াছে যে, এই মত বাস্তবিক মেডিটারেনীয়ান থিওরীর অংশ। মেডিটারেনীয়ান থিওরীর বিস্তারিত আলোচনা করিয়া এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মেশোপটেমিয়া বা পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কৃষ্টির সঙ্গে সিন্ধু কৃষ্টির কোন সম্পর্ক ছিল না, ইহার সম্পর্ক ছিল সম্ভবতঃ মধ্য-এশিয়ার কৃষ্টির সঙ্গে (Bactrian Culture)।

ইহার পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম দুইটি প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে (প্রবাসী—আশ্বিন ও ফাল্গুন, ১৩৫৫) বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনার প্রধান কথা, সিন্ধু উপত্যকার পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তিগুলি দেবীমূর্তি, সর জন মার্শালের এই ব্যাখ্যা এবং সিন্ধু উপত্যকার এই দেবী পূজা পশ্চিম-এশিয়া হইতে আসিয়াছিল এই মতবাদের সমালোচনা। মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, প্যালেষ্টাইন এবং আনাতোলিয়ায় পূজিত স্ত্রীদেবতাগুলিকে শিল্পে যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার স্ত্রী-মূর্তিগুলির সতর্কভাবে তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, মার্শালের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। সিন্ধু কৃষ্টিকে মেডিটারেনীয়ান প্রভাবের এলাকার মধ্যে টানিয়া আনিবার অভিপ্রায় এই ব্যাখ্যার ভিত্তি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, স্ত্রীমূর্তির মধ্যে বা সঙ্গে যে প্রকার বৈশিষ্ট্য থাকিলে মনে করা যায় যে উহা দেবী-মূর্তিরূপে কল্পিত সে প্রকার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মাত্র দুইটি সীলিঙে, এবং ইহার মধ্যে একটি সীলিং বাহিরের আমদানী বলিয়া মনে হয়। আলোচনাক্রমে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে সিন্ধু উপত্যকার স্ত্রীমূর্তিগুলি ক্রীড়নক বা দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মূর্তি (toys or votive offerings)

তৃতীয় প্রবন্ধে সিন্ধুধর্মে পুরুষদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে (প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩৫৬) আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনার প্রধান কথা মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ত্রিমুণ্ড, যোগাসনে উপবিষ্ট পুরুষদেবতার মূর্তি শিবের প্রোটো-টাইপ, সর জন মার্শালের এই ব্যাখ্যার সমালোচনা। সিন্ধু উপত্যকার এক মুণ্ড, যোগাসনে উপবিষ্ট, পশুযূথবিহীন পুরুষদেবতার মূর্তি যে সীলিংগুলিতে পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করিয়া এই মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ধ্যানযোগ দেবত্বজ্ঞাপক চিহ্নহিসাবে সিন্ধু উপত্যকায় পরিচিত ছিল মনে হয় এবং যোগসাধনা সম্ভবতঃ একটি স্বতন্ত্র কাল্টরূপে প্রচলিত ছিল। শিব স্বতন্ত্র দেবতা নহেন, বৈদিক রুদ্র পৌরাণিক আমলে শিব বা মহাদেব নামে পরিচিত। একদিকে স্বতন্ত্র যোগসাধনা ও অন্যদিকে স্বতন্ত্র লিঙ্গোপাসনার ধারা প্রাচীন রুদ্র-উপাসনার সঙ্গে পৌরাণিক যুগে যুক্ত হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকার ত্রিমুণ্ড বা এক মুণ্ড পুরুষদেবতা শিবের বা অন্য কোন হিন্দু দেবতার প্রোটোটাইপ নহে, প্রোটোটাইপ বলিতে হইলে বরং ইহাকে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির প্রোটোটাইপ বলা যায়।

চতুর্থ প্রবন্ধে (সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) প্রথমে সিন্ধুধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লিঙ্গ ও যোনি উপাসনা, সর্প উপাসনা, পশু উপাসনা, বৃক্ষ উপাসনা এবং চক্র, ত্রিশূল, পদ্ম, স্বস্তিকা প্রভৃতি প্রতীকের উল্লেখ করা যায়। আলোচনা-প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রস্তরের নিদর্শনকে লিঙ্গ ও যোনির প্রতিমূর্তি বলিয়া মার্শাল যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যার সমালোচনা করা হইয়াছে। তারপর পরবর্তী ভারতীয় ধর্মগুলিতে যথা, বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে এই সকল বৈশিষ্ট্যের কতগুলি দেখা যায় তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার পর সিন্ধু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সর্প, পশু, বৃক্ষ উপাসনা ও প্রতীকগুলি সম্পর্কে ধারণা ও আর্টে তাহা প্রকাশ করিবার কৌশলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুদয় যাহাদের মধ্যে ঘটিয়াছিল তাহারা সিন্ধু কৃষ্টির সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী।

ইহার পরবর্তী চারিটি প্রবন্ধে সিন্ধুবাসীদিগের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণ, তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকায় আর্য-জাতির উপস্থিতি এবং যাহাদিগকে বৈদিক আর্য জাতি বলা হয় তাহারা কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত ছিল নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায়

প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হইতেছে।

প্রথম প্রবন্ধে (সিন্ধু সভ্যতার বাহকগণ কোন্ জাতি ?) মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা, মাক্রাণ এবং নালে যে সকল মনুষ্য দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ যে সকল সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন তাহার উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে। তারপর দেখান হইয়াছে যে, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুযায়ী পরীক্ষার ফলে বিভিন্ন জাতির সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেলেও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ ও অপর পণ্ডিতগণ পূর্ব সংস্কার বা মতের প্রভাবে এবং অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহাদের মধ্যে একটিমাত্র জাতিকে সিন্ধু কৃষ্টির সৃষ্টি ও বিকাশের কৃতিত্ব দিয়াছেন। এই জাতি মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্য-সাগরীয় জাতি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধু সভ্যতা ও মেডিটো-আর্মেনয়েড জাতি) সিন্ধু কৃষ্টির সৃষ্টি ও বিকাশ মেডিটো-আর্মেনয়েড জাতির দ্বারা হইয়াছিল এই মতবাদের বিস্তারিত আলোচনাক্রমে দেখান হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মতে মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীকে কোন দেশে তাম্রযুগের কৃষ্টির স্রষ্টা রূপে দেখা যায় না এবং হরাপ্পায় প্রাপ্ত একটিমাত্র আর্মেনয়েড করোটির প্রাপ্তি এই মতবাদ গ্রাহ্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইহার পর অমঙ্গোলীয় গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর করোটি-গুলিকে আলপাইন ও আর্মেনয়েড এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিবার প্রণালীতে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি দেখা যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে (সিন্ধুসভ্যতা ও ইরাণো-পামীরী জাতি) সিন্ধু উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ইরাণো-পামীরী জাতির প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থানের আলোচনা করা হইয়াছে। পামীরের অধিবাসী, তাকলামাকানের অধি-বাসী এবং উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্থান, পশ্চিম বোখারা, খোরাশান, সিষ্টান, বেলুচীস্থান ও দক্ষিণ-হিন্দুকুশের অধি-বাসীদিগের মধ্যে ইরাণো-পামীরী গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের প্রমাণ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকায় যে গোলমুণ্ড পামীরী জাতির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের জাতিগুলি যে সেই জাতির প্রতিনিধি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের এই মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকার এই ইরাণো-পামীরী জাতি ভাষায় ও ধর্মে আর্য ছিল। তাহারা মৃতদেহ দাহ করিত। সিন্ধু উপত্যকার সহিত এই জাতির ভৌগোলিক সম্পর্ক হইতে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই জাতি সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী এবং সিন্ধু উপত্যকায় অন্য যে সকল জাতির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় তাহারা বৈদেশিক আগন্তুক।

চতুর্থ প্রবন্ধটিতে (সিন্ধুসভ্যতা ও আর্যজাতি) মোহেঞ্জো-দারো ও হরাপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শন হইতে যে দ্বিতীয় লম্বামুণ্ড জাতির উপস্থিতির প্রমাণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা পাইয়াছেন এবং যাহাকে প্রোটো-নর্ডিক সম্পর্কিত বলা হইয়াছে সেই জাতির সম্বন্ধে আলোচনাক্রমে আর্য জাতি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী-ভুক্ত জাতি ছিল—এই মতবাদের বিচার করা হইয়াছে। দেখান হইয়াছে যে, এই জাতি প্রোটো-নর্ডিক বা আর্য হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবর্ষে আর্য জাতির আক্রমণ সিন্ধুযুগে হইয়াছিল, আর্য জাতির মধ্যে লম্বামুণ্ড ও গোল-মুণ্ড এই দুই গোষ্ঠীর লোক ছিল এবং এই দুই গোষ্ঠীর আর্যজাতি সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিত ছিল। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, প্রোটো-নর্ডিকগণের আর্যনামের উপর কোন দাবি নাই, এই নাম আইরিয়ানার অধিবাসীর নাম। আইরিয়ানার অধিবাসী ইরাণো-পামীরী টাইপের গোলমুণ্ড জাতি ছিল। ঋগ্বেদ ও আবেস্তায় যাহারা আপনাদিগকে আর্য বলিত, তাহারা ছিল আইরিয়ানার অধিবাসী, দক্ষিণ-রুশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার খিরগিজ প্রান্তর হইতে তাহারা আসে নাই। সিন্ধু উপত্যকা ছিল আইরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত এবং সিন্ধুকৃষ্টির সৃষ্টি ও বিকাশে তাহাদের দাবি অগ্রগণ্য।

২

সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা ভারতবর্ষের প্রাগৈতি-হাসিক সভ্যতার দুইটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইল অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকে আইরিয়ানার দক্ষিণ অঞ্চল সপ্তসিন্ধুর দেশে। এই দেশে নূতন প্রস্তর যুগের আমল শেষ হইয়া তাম্রযুগ আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত-গণের মতে প্রায় ঐ সময়ে পশ্চিম-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মেডিটারেনীয়ান গোষ্ঠীর জাতিগুলি নূতন প্রস্তর যুগের কৃষ্টি বহন করিয়া ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, ফ্রান্সে ও ব্রিটিশ দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। হিমালয় ও পামীর হইতে আল্পস্ পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তের মালভূমিগুলি (আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়া) হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি ধাতব যুগের কৃষ্টি বহন করিয়া দক্ষিণ-ইউরোপ হইতে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেই সুমের ও এলামে মধ্য-এশিয়া (ব্যাক্ট্রিয়া) হইতে আগত

গোলমুণ্ড জাতি নূতন কৃষ্টির পত্তন করিয়াছিল। উত্তর-সেমাইটগণ মেশোপটেমিয়ার উত্তর ভাগে, সিরিয়ায় ও প্যালেষ্টাইনে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিল। মিশরে হ্যামাইট ও মেডিটারেনীয়ান ও পরে মিশ্র আর্মেনয়েড জাতি মিলিয়া মিশরীয় সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ যখন মিশরীয় সভ্যতার পত্তন হইতেছিল সেই সময়ে হিমালয় হইতে আল্পস্ পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর পূর্বভাগে অবস্থিত মালভূমির অধিবাসী গোলমুণ্ড জাতি মধ্য-এশিয়ায় একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার এই সমৃদ্ধ কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল আনাউ, এলাম, মেশোপটেমিয়া, ব্যাকট্রিয়া ও সিন্ধু উপত্যকা। মধ্য-এশিয়ার কৃষ্টির বাহক জাতিগুলি পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সিন্ধু কৃষ্টির যুগ যখন আরম্ভ হইল সিন্ধু উপত্যকায় তখন ধাতুর ব্যবহার চলিতেছে। পূর্বে রাভী-তীরে অবস্থিত হরাপ্পা হইতে মোহেঞ্জোদারো, মোহেঞ্জোদারো হইতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে গৌরবোজ্জ্বল সিন্ধু কৃষ্টির অভ্যুদয়ের অপর্যাপ্ত নিদর্শন পণ্ডিতসমাজের সপ্রশংস বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। সিন্ধু কৃষ্টির নিকটতম সম্পর্ক সম্ভবতঃ মধ্য-এশিয়ার বা ব্যাকট্রিয়ার অতি প্রাচীন সমৃদ্ধ কৃষ্টির সঙ্গে। পণ্ডিতগণের মতে এই কৃষ্টি খ্রীঃ পূঃ ৫ম সহস্রক অপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে। সিন্ধু কৃষ্টির দূর সম্পর্ক দেখা যায় মধ্য-এশিয়ার কৃষ্টিকেন্দ্রের পরিধির মধ্যে অবস্থিত আনাউ, এলাম, দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া বা সুমেরের কৃষ্টির সঙ্গে। স্থাপত্যে, আর্টে ও ধর্মে সিন্ধুসভ্যতার স্বাতন্ত্র্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন, সিন্ধুলিপির স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। এলাম-সুমের-বাবিলোনীয় কৃষ্টির প্রভাব ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই প্রভাব মিশরীয় কৃষ্টির প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়া ইউরোপের প্রাচীন কৃষ্টিকেন্দ্র গ্রীসকে প্রভাবিত করিয়াছে। সিন্ধু কৃষ্টির সম্প্রসারণ ক্ষেত্র দক্ষিণে বিস্তৃত।

সিন্ধুযুগে সম্ভবতঃ বেলুচীস্থানের পথে কিছুসংখ্যক মেডিটারেনীয়ান বা উত্তর সেমাইট এবং হিন্দুকুশ বা অক্সাস উপত্যকা ও কাবুল উপত্যকা হইয়া মোঙ্গলীয় গোলমুণ্ড জাতি সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের কোন প্রভাব সিন্ধু কৃষ্টির উপর পড়িয়াছিল তাহা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই।

সিন্ধুধর্মকে প্রোটো-বৌদ্ধধর্ম বলা যায়। সিন্ধু জাতির লিপি ব্রাহ্মী লিপির জনক (প্রোঃ ল্যাংডনের মত)। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না হইলে সিন্ধু জাতির ভাষা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা যাইবে না।

সিন্ধু উপত্যকা হইতে সিন্ধু জাতি পশ্চিম উপকূলের কচ্ছ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র-কর্ণাট হইয়া তামিল দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সিন্ধু গাঙ্গেয় উপত্যকা হইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ হইতে তাহারা পূর্বে আসাম ও দক্ষিণে উৎকলে সম্প্রসারিত হয়। মধ্যভারতে এই জাতির সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব-বিহারে এই পরিচয় অধিক প্রকট। সর জন মার্শালের মতে সিন্ধু কৃষ্টি সম্ভবতঃ নর্মদা ও তাপ্তী উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন বৈদিক আর্যজাতির আক্রমণের ফলে সিন্ধু জাতি পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত হইয়া দেশের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। এই মতের পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ কথা এই যে, একটি লম্বামুণ্ড জাতি পরবর্তীকালে উত্তর হইতে পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কবে ও কোন্ স্থান হইতে ইহারা আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে নানারকম অনুমান করা হইয়াছে। এই জাতিকে বৈদিক আর্যজাতি বলিবার কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নাই। ইহারা যে সিন্ধুজাতিকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয় নাই তাহার প্রমাণ এই যে, এই লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীকে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সিন্ধুজাতি যে গোষ্ঠীভুক্ত সেই গোষ্ঠীর জাতিগুলি। ইহাদের সহিত সিন্ধু উপত্যকার লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর সম্পর্ক থাকিতে পারে।

সিন্ধু কৃষ্টির বিভিন্ন প্রাচীন কেন্দ্রগুলি কোন্ সময়ে পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু কয়েকটি কেন্দ্রে সাসানীয় আমলের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার দ্বিতীয় অধ্যায় কোন্ সময়ে আরম্ভ হইল ঠিক জানা যায় না, পণ্ডিতসমাজ নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছেন।

একদিকে সিন্ধু-সরস্বতী-দৃষদ্বতী তীরে যজ্ঞের ধূম্রজাল, ঋষিকুলের স্তোত্রগুঞ্জন ও বিবদমান রাজন্যগোষ্ঠীগুলির অস্ত্রের ঝনৎকার, অন্যদিকে অক্সাস-তীরে এক মুখে দেবধর্ম ও দেবধর্মের পুরোহিতগণের প্রতি কটূক্তি ও অভিশাপের গর্জন এবং অন্যমুখে হোমের স্তুতি, বৃত্রঘ্ন, নাসত্য, যিম, মিথ্রের স্তুতি, আহুরা মাজদার প্রতীক-অগ্নির স্তুতি, পঞ্চনদ ও ব্যাকট্রিয়ার এই দুই দৃশ্যের যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে আইরিয়ানার প্রাচীন আর্যসভ্যতার একটি সমগ্র কিন্তু অস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ঋষিকুলের বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের

রচনা, আবেস্তাও তাহাই। জরাথুষ্ট্র নাম নহে, উপাধি; ইহার অর্থ প্রধান পুরোহিত। ঋগ্বেদীয় পুরোহিত সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়াছেন অনুব্রত, অনদেব, যজ্ঞহীন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে; আবেস্তার পুরোহিত সম্প্রদায় আক্রমণ করিয়াছেন গর্বিত দেবধর্মের পুরোহিতদিগকে। কিন্তু এই দুই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ও তাঁহারা যাহাদের পুরোহিত ছিলেন তাঁহাদের পৈতৃক ধর্ম, ভাষা ও জাতি এক, দেশও এক। বৈদিক আর্যজাতি ও আবেস্তিক আর্য-জাতি বলিয়া বাস্তবিক কোন জাতি ছিল না, বেদ ও আবেস্তা বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন আইরিয়ানার আর্যজাতির দ্বারা রচিত হইয়াছিল। এই জাতির সাক্ষাৎ সিন্ধু কৃষ্টির আমলে সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ার ব্যাকট্রিয়ার কৃষ্টিও যে এই জাতির কীর্তি তাহা মনে করা যাইতে পারে।

সেরামিক্স বা স্থাপত্যের কোন নিদর্শনকে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নাই, মনুষ্য দেহাবশেষের কোন নিদর্শনকেও যুক্ত করা হয় নাই, একমাত্র সাহিত্যিক দলিল এই অধ্যায়ের ইতিহাসের অবলম্বন।

এই দলিল হইতে দেখা যায় যে দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইবার পূর্বে বংশানুক্রমিক রাজন্যগোষ্ঠী ও পুরোহিত-গোষ্ঠী সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। ঋগ্বেদ যে সমাজের চিত্র উদ্ঘাটন করে তাহা কোন নবগঠিত সমাজ নহে, এই চিত্র একটি বহুকালের প্রাচীন সমাজের। ইহার অনেকগুলি স্তরের আভাস পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদে যে সকল রাজন্যগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পরবর্তী ইতিহাসে তাঁহারা সুপরিচিত। ঋষিকুলগুলিও পরবর্তী ইতিহাসে সুপরিচিত। ঋগ্বেদের সময় হইতে ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাসের ধারা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

একদিক হইতে দেখিলে ঋগ্বেদ পরমত-অসহিষ্ণু, উগ্র, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের দেবগণের উদ্দেশ্যে রচিত ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের গৌরব-প্রকাশক স্তোত্র-সমষ্টি, অন্যদিক হইতে দেখিলে ইহা আর্যজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস, আবার ইহা অপ্রত্যাশিত-রূপে উদার দৃষ্টিভঙ্গী, উচ্চ মনোভাব, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক রচনাবলীর সমষ্টি। ইহার মধ্যে একাধারে আস্তিকতা ও সংশয়বাদিতার সমন্বয় দেখা যায়।

ঋগ্বেদের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত liturgical character রক্ষিত হইয়াছে এবং পুরোহিতসম্প্রদায় ও তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ডের গৌরব কীর্তন স্তোত্রকারদিগের প্রধান বক্তব্য মনে করা যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্তোত্রকারদিগের দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে এত অধিক পার্থক্য দেখা যায় যে, প্রাচীন আর্য জাতির মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছিল এই সন্দেহ প্রবল হয়। ঋষি বা যজমান সম্বন্ধে গাত্রবর্ণের যে সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে এই সংমিশ্রণের অনুমান সমর্থিত হয়। আরও দেখা যায় যে, আর্যপদ ক্রমে জাতিবাচক হইতে কৃষ্টিবাচক অর্থে ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আর্যজাতির প্রাচীন ধর্মের পুরোহিতসম্প্রদায়ের সমর্থিত অংশকে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই দেবতা, যজ্ঞ ও পুরোহিত, এই ত্রিপাদের উপর দণ্ডায়মান বৈদিক ধর্ম। আবেস্তা ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস হইতে অনুমান করা যায় যে, এই বৈদিক ধর্ম সমগ্র আইরিয়ানায় প্রচলিত ছিল।

সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল সপ্তসিন্ধুর দেশে। ঋগ্বেদে ও আবেস্তায় এই সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমান করা যাইতে পারে, আর্য জাতির কৃষ্টিকেন্দ্র স্থায়ী ভাবে আইরিয়ানার দক্ষিণ অঞ্চলে সরিয়া আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। নূতন নূতন জাতির প্রবাহ উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব হইতে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাচীন যুগ হইতে প্রায় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় কৃষ্টির প্রবাহের গতি ছিল উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্বমুখী। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্থান, সুগধা, পামীর, পূর্ব-মধ্য-এশিয়া, চীন ও তিব্বতে ভারতীয় কৃষ্টি বিস্তারের কথা মনে করা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্তরমুখী গতি বাধা পাইল ব্যাকট্রিয়ার বিদ্রোহ ঘোষণায়। কিন্তু এই বিদ্রোহ বিশেষ সফল হয় নাই। মনে হয়, জন্মভূমি হইতে এই বিদ্রোহী ধর্মমত নির্বাসিত হইয়া সুদূর পশ্চিমে মিডিয়ায় আশ্রয় লাভ করে। তারপর রাজশক্তির আশ্রয়ে পুনরায় পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু মিডিয়ার মাজি সম্প্রদায়ের হাতে জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের রূপান্তর ঘটিয়া পুরোহিতসম্প্রদায় অধিকতর শক্তিশালী হইয়া দেখা দিল।

আর্যজাতি ও আর্যজাতির সম্পর্কে একটি সুপরিচিত সমস্যার এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। মেশোপটেমিয়ার মিটানীও কাসাইটদিগের মধ্যে এবং উত্তর-আনাতোলিয়ার হিটাইটদিগের মধ্যে অনুমান খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে কয়েকজন বৈদিক দেবতা পরিচিত ছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তথ্যের উপর যে, সকল মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া বলা যায় যে ঋগ্বেদে যাঁহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় এইরূপ অনেক দেবতার উপাসনা ঋগ্বেদ রচনার সম্ভবতঃ বহুপূর্ব হইতে আইরিয়ানার আর্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্বদেশের বাহিরে

যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের দ্বারা এই উপাসনা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। মিটানী, কাসাইট ও হিটাইটদিগের মধ্যে আর্য জাতির সংমিশ্রণ ছিল কি না তাহার বিচার না করিয়া এবং বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্যদিগের—মনে রাখিতে হইবে যে এই নামকরণ কৃষ্টিবাচক, জাতিবাচক নহে—সহিত তাঁহাদের রক্তের সম্পর্ক ছিল এইরূপ অনুমান না করিয়া উপরে উল্লিখিত তথ্যটিকে সহজভাবে আর্যজাতির দেবতাদিগের উপাসনা কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে উত্তরে জরাথুষ্ট্রের বিদ্রোহের পরে পূর্বে মগধে আর একটি বিদ্রোহ দেখা দিল। বৌদ্ধধর্মীয় শিল্পে সিন্ধুধর্মের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য নূতন করিয়া ভারতবাসীর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সিন্ধু কৃষ্টি বৈদেশিক আমদানী নহে। বর্তমান সময় হইতে সিন্ধুযুগের ব্যবধান কয়েক সহস্র বৎসর বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম চিন্তার দিক দিয়া বেদ ও উপনিষদ অপেক্ষা ইহা হিন্দুদিগের নিকট বেশী দূরবর্তী নহে। সিন্ধুযুগে যে জাতি ধ্যানযোগের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই উপনিষদে গভীর তত্ত্বসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহারাই আর্যজাতি, রূপকথার খিরগিজ প্রান্তর হইতে আগত আর্য নহে, অক্সাস ও সিন্ধুনদের প্রশস্ত, সূর্য-কিরণোজ্জ্বল উপত্যকার, আইরিয়ানার অধিবাসী।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

গান্ধীজীর ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা বুনিয়াদী বা বনিয়াদী শিক্ষা নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মূল কথা, শিশু ও কিশোরদের কোনও শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, কারণ শিশু হাতে কাজ করিতে ভালবাসে এবং বদ্ধ ঘরের বাঁধা নিয়মকানুনের মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের পাঠ্য-তালিকার সহায়তায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ছাত্রদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। যে পরিবেশের মধ্যে শিশুর দেহ, মন ও আত্মা (আমি বলি, চরিত্র) পূর্ণ আনন্দে আপনার সুপ্ত শক্তি বিকাশের সুযোগ পায়, সেইরূপ ব্যবস্থায় শিক্ষার পদ্ধতি গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। শিশু-মন সৃজনমুখী ; যাহা তাহার প্রাণে স্বতঃই উদিত হয়, সে তাহাকে আপনার শক্তিমত হাতের সাহায্যে রূপ দিতে চায়, কাদা মাখিয়া ছবি আঁকিয়া জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সে আপনার জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতে চায়। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি পদে পদে তাহাতে বাধা দিয়া তাহার শক্তিকে ক্ষুণ্ণ ও পর্য্যুদস্ত করিয়া থাকে।

শিশু এই সৃজনীশক্তি লইয়া আসিয়াছে। তাহার সৃষ্ট বস্তু যদি কাহারও কোনও কাজে লাগে, কেহ তাহা ঘরে রাখিয়া যদি আনন্দ পায়, তাহা মূল্য দিয়া কেহ যদি ক্রয় করিয়া লইতে চায় তাহা হইলে শিশুর সৃষ্টবস্তু "উপার্জ্জনের" পথ উন্মুক্ত করিতে পারে। এখানে ইংরেজী অর্থনীতি শাস্ত্রের "productive" অর্থাৎ "commodities of exchangeable value" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা 'create' বা 'creative' অর্থাৎ যে প্রেরণা সৃজন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে—অপর কথা ভাবে না, তাহা হইতে ভিন্নার্থবোধক। সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই 'productive' না হইতে পারে, অর্থাৎ 'মূল্য' হিসাবে তাহার কোনও 'মান' না থাকিতেও পারে।

মহাত্মাজীর মতে যাহারা উৎপাদন করে না তাহাদের ভোগ করিবার অধিকার নাই। ইহাতে 'অলস' অর্থাৎ যাহারা শারীরিক শ্রম দ্বারা নিজ নিজ জীবনধারণের সহায়ক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে না, অথচ অর্থ উৎপাদন বা অন্ন-বস্ত্রাদি ক্রয়, সুখভোগের অনুপূরক শ্রম প্রভৃতি ক্রয় করিবার উপযুক্ত, অর্থ বুদ্ধি (বা দুর্বুদ্ধি) দ্বারা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ, এরূপ একটি শ্রেণী জন্মলাভ করে। ইহাতে সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য হইয়াছে, কর্ম্মবিভাগে মানুষ 'ছোট' ও 'বড়' হইয়াছে, জন্ম বা বংশগত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে এই বিভেদ স্থায়ী হইয়া বিষম অনর্থের মূল হইয়াছে। নিজের জীবনধারণ বা সুখভোগের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং সুস্থ সবল অবস্থায় আনন্দে থাকিবার জন্য যে পরিবেশ তাহা নিজ কায়িক শ্রম দ্বারা অন্ততঃ কতকাংশে সৃষ্টি করিতে না পারিলে সমাজে বাস করিবার অধিকার মানুষের নাই, অথবা সমাজ যে সকল সুযোগ-সুবিধা দান করে তাহা ভোগ করা তাহার উচিত নয়। সেরূপ মানুষ 'স্বার্থপর' বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য।

শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কোনও হস্ত-শিল্প নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। "মাধ্যম" কথাটি

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী "through the medium" শব্দ কয়টির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নির্ব্বাচিত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া শিশুর সমস্ত শিক্ষা বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বয়স অনুযায়ী প্রাথমিক এবং কাহারও কাহারও মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার কতকাংশ সম্পন্ন করিতে হইবে।

বিষয়বস্তু অর্থাৎ নির্ব্বাচিত শিল্প বা 'হাতের কাজ'গুলি এমন হইবে যাহা দ্বারা শিশুর দৈহিক ও মানসিক, এবং আত্মিক প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়। অন্ন-বস্ত্র, সুস্থ জীবন ও আনন্দময় পরিবেশ সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন, সুতরাং মহাত্মাজীর পরিকল্পনায় শিশুর উপযুক্ত কৃষি বা বাগান, শাকসব্জী, উৎপাদন, তূলা, চাষ প্রভৃতি, চরকা এবং অপর কোনও কুটীর-শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে, ছাত্রের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ভিতর দেহ ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখা, বাসস্থান ও বিদ্যালয়-গৃহ নিজের চেষ্টায় পরিচ্ছন্ন রাখা, দেহের ক্লেদ, মলমূত্র প্রভৃতি এবং বাড়ীর জঞ্জাল স্বহস্তে দূর করা অথবা প্রতিদিনের কাজের সহায়করূপে ব্যবহার করা প্রয়োজন। যাহারা চাষ করিবে তাহাদের জমির সাররূপে যাহাতে এই সকল আবর্জ্জনা ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা, শিক্ষকের নির্দ্দেশে এবং সহযোগিতায় ছাত্রদের করিতে হইবে।

শিক্ষাকেন্দ্রের পরিবেশ ছাত্রদের মধ্যে যে ভ্রাতৃভাব ও পরস্পরের প্রতি যে প্রীতির সৃষ্টি করিবে, তাহা আপনার নির্দ্দিষ্ট সীমানার বাহিরে পরিবারস্থ লোকের স্বার্থ অতিক্রম করিয়া গ্রামের ও সমাজের কল্যাণে ছড়াইয়া পড়িবে। উচ্চ-নীচ, জাতি-বর্ণ বিভেদ ভুলিয়া এক একটি গ্রাম এক একটি গোষ্ঠীর আকার ধারণ করিবে এবং সকলে স্বতন্ত্রভাবে "উপার্জ্জনের" জন্য কাজ করিয়া পরস্পর নির্ভরশীল হইবে ও আনন্দলাভ করিবে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ যে কর্ম্মের লক্ষ্য তাহা সত্য, ন্যায় ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য। এই সকল গুণ যদি শিক্ষার বনিয়াদ না হয়, তাহা হইলে উপরের কাঠামো অতিশয় ভঙ্গুর হইবে এবং স্বার্থ, অনৃত, হিংসার দ্বন্দ্বে সকলই অচিরে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। সংসারে যথেষ্ট অশান্তি বিদ্যমান এবং দিন দিন তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে; ধন, বিদ্যা, বংশগৌরব, উচ্চনীচ জাতিভেদ প্রভৃতি লইয়া মানুষে মানুষে বৈষম্য বিরাট হইতে বিরাটতর হইতেছে, সেরূপ অবস্থায় ইহার একটা প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন এবং মহাত্মা-প্রদর্শিত পন্থাই সর্ব্বাপেক্ষা কালোপযোগী ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

মহাত্মাজীর পরিকল্পনার আলোচনাপ্রসঙ্গে নানা মত, এমন কি দারুণ বিরুদ্ধ মতও সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা এই মতে বিশ্বাসী তাঁহারা মহাত্মাজীর নির্দ্দিষ্ট শিক্ষণীয় তালিকা প্রভৃতির প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধন করিয়াছেন। চরকা ও কৃষি বাদে অপরাপর কয়েকটি শিল্প শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক যাহা প্রয়োজন ছিল, তাহাও এখানে বলা হইতেছে। ইহা নিতান্তই লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া গ্রহণ করিলে ভাল হয়।

মহাত্মাজী অবশ্য একই ছাত্রের পক্ষে বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষা-প্রচেষ্টার সহিত বৃক্ষশাখা-আশ্রয়ী আরামহীন বানরের তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন বৃক্ষ, বিভিন্ন ফললোভী, আপাততুষ্টিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট বানর যেমন বাসা বাঁধে না, তেমনই ছাত্রেরা বিভিন্ন শিল্পে চেষ্টান্বিত হইলে তাহাদের সকল শিক্ষার বনিয়াদই কাঁচা থাকিয়া যাইবে; তাঁহারা কোনটাই ভাল করিয়া শিখিবে না। মহাত্মাজীর মতে চরকা ও তাঁতের সাহায্যে সকল প্রকার শিক্ষা—বর্ণ-পরিচয় হইতে সাহিত্য ইতিহাস গণিত প্রভৃতি, সব শিক্ষাই দেওয়া যাইবে। ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন পাঠ্য সংযোজিত হইয়াছে; শিল্পের সাহায্যে শিক্ষা-ব্যাপারে যে জ্ঞান অসম্পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা পূরণের জন্য পাঠ্যবিধি, বা শিক্ষকের সাহায্যে বিদ্যাদানের চেষ্টা চলিয়াছে।

এখনও মহাত্মাজীর পরিকল্পনা এবং তাহার সংশোধিত রূপ সকল শিক্ষাবিদের মনঃপূত হয় নাই। প্রধান আপত্তি, শিক্ষার মাধ্যম অর্থাৎ হাতের কাজই শিক্ষার এক-মাত্র বাহন বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য কিনা। ইহার সাহায্যে সমস্ত "শিক্ষা" সম্পন্ন হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে; কিন্তু ইহার প্রতিকারকল্পে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন লইয়া বিতণ্ডা চলিতেছে। ছাত্রদের হাতের কাজ (productive) "উৎপাদনাত্মক" (ইহা ঠিক ইংরেজী শব্দের অর্থ প্রকাশ করে না) হইল কিনা, অর্থাৎ তাহার দ্বারা বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহের কথা ভাবিয়া অগ্রসর হইতে হইবে কি না, তাহার মীমাংসা হয় নাই।

বস্তুতঃ অনেকেই মনে করেন, শিশুদের বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করাইতে হইলে তাহা অত্যাচারের নামান্তর (forced child labour) হইবে। অভিভাবকেরা শিশুদের শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারেন নাই বলিয়া শিশুকে "খাটাইয়া" তাহারই উপার্জ্জনে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে একথা মনে করিবার কারণ থাকিতে

পারে। তবে এ মতের সমর্থক বিশেষ নাই। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে শিশুর উপার্জ্জিত অর্থে তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব কি না এ বিষয়ে বহুলোকের মনে সন্দেহ আছে এবং যখন ইহা সম্ভব নয়, তখন অহেতুক অতিমাত্রায় "ছেলে খাটাইয়া" আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইলে শিশুর শিক্ষা ব্যাহত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট কতকটা এই মতের সমর্থক। তাঁহারা "বনিয়াদী" (basic) কথাটি ব্যবহার করিলেও সাধারণের প্রচলিত মতানুযায়ী বাংলায় "বনিয়াদী" শিক্ষা প্রচলনের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। এই সম্পর্কিত পুস্তক-পত্রিকাদিতে "basic" কথা ব্যবহার করিলেও মহাত্মাজী-নির্দ্দেশিত শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে যে ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া "বুনিয়াদী" কথাটি উঠিয়াছিল, তাহার সহিত বাংলা-সরকারের শিক্ষানীতির মূলগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। বনিয়াদী শিক্ষার জন্য তাঁহারা একই শ্রেণীর (one type) বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষপাতী নহেন। শিল্প-শিক্ষা অপর শিক্ষার কেন্দ্র অথবা ইহা শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র বিষয় বা অঙ্গ বলিয়া পরি-গণিত হইতেছে, তাহাও সুস্পষ্ট নহে। সর্ব্বোপরি তাঁহারা "production" বা "উৎপাদনাত্মক কাজ" অর্থাৎ অর্থকরী কাজের উপর তত জোর না দিয়া ছাত্র যে কাজ হাতে লইবে তাহাই যেন চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখার জন্য জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত মত, "Educational consideration should on no account be subordinated to those of 'production'।"

ইহাতে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার সমর্থনকারীরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। না-হইবারই কথা, কারণ যখন মূলনীতি পূর্ণ এমনকি আংশিকভাবেও সমর্থিত হইতেছে না, তখন ইহাকে basic education বা বনিয়াদী শিক্ষা না বলিয়া শিশু-শিক্ষার একটা নূতন রীতি বা বিধি বলিয়া চালাইলেই ভাল হইত।

বাস্তবিকই বাংলাদেশে এই বিষয়ের আলোচনার এক-রকম চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। কারণ গবর্ণমেণ্ট যখন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ এবং নিজেদের অর্থে তাহা পুষ্ট ও তাহার প্রচার করিবার শক্তি রাখেন তখন অপর পক্ষের মত কতকটা চাপা পড়িয়া যাইবে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা অনেকের সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কারণ শিশুর উৎ-পাদিত বস্তু যে একটা উপার্জ্জনের পথ হইবে, তাহা অনেকেই মনে করেন না। প্রথম কথা, ঐ সকল বস্তু বাজারে প্রচলিত দক্ষ লোকের হাতের কাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না, সুতরাং যাহা ছাত্রদের অভিভাবকেরা মনে করেন তাঁহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু তাহা শীঘ্রই সমাজের প্রয়োজনে অবান্তর হইয়া পড়িতে পারে; সুতরাং তাহার মূল্য হ্রাস পাইয়া স্তূপাকারে পড়িয়া থাকিতে পারে। আরও একটি মত আছে। হয়ত একই কাজ বৎসরের পর বৎসর বা বাধ্যতামূলকভাবে করিতে হইলে এবং কিশোরেরা অন্ততঃ কেহ কেহ যখন বুঝিতে পারিবে যে, তাহার আয়ে তাহার পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় তখন তাহার মনোভাব শিক্ষালাভের অনুকূল না হইতে পারে। এরূপ মত পশ্চিম বাংলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতেও শুনা গিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এই কথা সাধারণ লোকের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়।

অপরপক্ষে, যাঁহারা বনিয়াদী শিক্ষাদানকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়া থাকেন যে, শিশু এবং কিশোরের হাতের কাজ একেবারে মূল্যহীন ত নয়ই, বরং অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে হিসাব রাখিয়া দেখা গিয়াছে, বাস্তবিকই যে আয় হয়, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। যাঁহারা "উৎপাদনাত্মক" কাজে আস্থাবান তাঁহারা মনে করেন, ভবিষ্যতে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিজের ব্যয় নিজেই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও বলা যায় যে, ছাত্ররা খুবই আনন্দের সহিত কাজ করে; মানসিক "বিকার" অনুভূত হয় নাই।

বনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপারে শহরের কথা একবার ভাবিয়া দেখিতে হয়। শিল্পের মাধ্যমে, বিশেষতঃ চরকা তাঁতের সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে বিদ্যালয়-কক্ষের যেটুকু পরিসর প্রয়োজন, তাহা শহরে মিলা কষ্টকর। অসুবিধা অবশ্যই আছে, কিন্তু এখানেও অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায়, একটি ঘরকে শিল্পশিক্ষার "কেন্দ্র" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া অসুবিধা সত্ত্বেও কাজ চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু কিছু শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং তাহা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতেছে। সেগুলির কোনটিই বনিয়াদী শিক্ষার অঙ্গরূপে পরিচালিত হয় না, এই যা পার্থক্য।

তর্ক করিলে, তর্কের নিবৃত্তি নাই। কিন্তু শিক্ষা-বিস্তার তর্কের ক্ষেত্র নয়, কাজের ক্ষেত্র। সুতরাং তর্ক-বিতর্ক ছাড়িয়া প্রকৃত কাজ কিসে হয়, তাহার চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বাংলাদেশে অন্ততঃ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নানা কারণে বনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ এতাবৎ

কাল তাঁহারা মনস্থিরই করিতে পারেন নাই। ১৯৪৯ সালে ২৯শে জুন তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থির হইয়াছে। বেসরকারী কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বে কার্য্যারম্ভ করিয়াছে, তন্মধ্যে কলিকাতার দক্ষিণে হোটর ও মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহার এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী; অপরাপর প্রদেশেও কাজ চলিতেছে। নূতন পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার-কার্য্যে আর বিলম্ব হইবার কোনও কারণ নাই। কয়েকটি প্রধান বিষয়ে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি একমত হইয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র যে ছাত্রদের পক্ষে অনুপযোগী তাহা নহে, তাহা কতক পরিমাণে ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শিশুশিক্ষায় শিশুর কিছু "হাতিয়ার" প্রয়োজন; হাতের ভিতর দিয়া যে জিনিষ "মাথায়" প্রবেশ করে ("from the hand and the senses to the brain and the heart") তাহা সহজে বোধগম্য হয় এবং বহুদিন তাহা মনে থাকে। সুতরাং কেবল আমাদের দেশে নয়, অপরাপর সভ্যদেশে ছেলেদের যতদূর সম্ভব হাতের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিল্পের মাধ্যমে সকল রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কিনা, সে বিচারেরও কতকটা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। যতদূর সম্ভব শিল্প সংক্রান্ত দ্রব্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দিবার চেষ্টা চলিতে পারে। যাহা বাকী আছে বলিয়া মনে হইবে, তাহার জন্য পুস্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করিলে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

শিল্পশিক্ষায় কাহারও কোনও আপত্তি উঠে নাই। যাহাদের আপত্তি থাকিতে পারে, তাঁহাদের জন্য দেশের বহু বিদ্যালয় থাকিবে, যেখানে তাঁহারা আপন আপন পুত্র-কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইতিমধ্যে বনিয়াদী শিক্ষার উপযোগিতার পরীক্ষা শেষ হইবে এবং আশা করা যায় তাহার ফলাফল দেখিয়া বনিয়াদী শিক্ষাদানে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

একসঙ্গে অনেকে হাতে কাজ করায়, এবিষয়ে যে শ্রেণীর লোকের আপত্তি থাকিতে পারে, তাহা দূর হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে হাতের কোনও কাজ করার অনভ্যাসবশতঃ আমরা হাতের কাজকে হীন বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি, ফলে তথাকথিত ভদ্রঘরের ছেলেদের মধ্যে ত বটেই, এমন কি তাহাদের "সংস্পর্শে" আসিয়া কৃষক এবং শিল্পী ঘরের ছেলেরাও "দুপাতা" পড়িতে শিখিয়া ঘরগৃহস্থালির কাজ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান শিক্ষার এই গুরুতর দোষ বনিয়াদী শিক্ষা সাহায্যে দূর হইবে এবং ছোটবেলা হইতে এই সকল কাজে অভ্যস্ত হইয়া গেলে জীবনের কোনও অবস্থায়ই হাতের কাজকে "ছোট" বলিয়া মনে করিবার সুযোগ হইবে না।

হাতের কাজে সময় নষ্ট হইবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে শিক্ষা করা হাতের কাজ উত্তর জীবনে কাজে লাগিবে না বলিয়া একটা মত আছে। আমার কথা, বর্ত্তমানে বহু ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষালাভ সম্পন্ন না করিয়াই পড়া ছাড়িয়া দেয়, তাহারা আবার নিরক্ষর হইয়া পড়ে। যত ছাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে তাহার শতকরা কতজন বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে যায়, তাহার হিসাব লইলে এ সম্বন্ধে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না। তাহা ছাড়া হাতের কাজ একেবারে কেহ ভুলিতে পারে না। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, গরীব গৃহস্থ-ঘরের ছেলে, বাড়ীতে যে মজুর যখন খাটিত, ছুতারের কাজ, মাটিকাটা, কাঠকাটা, কোদাল পাড়া, ঘাস নিড়ানো, খড়কাটা, গোয়ালের কাজ, কাঁচা ইট (ফর্ম্মায় ফেলিয়া) তৈয়ারী, জাল ফেলা, ঘর ছাইবার জন্য খড় উপযুক্তভাবে সাজানো প্রভৃতি যে সকল কাজ শিখিয়াছিলাম তাহা আজও ভুলি নাই, অনভ্যাসের দরুন হয়ত সে দক্ষতা নাই। আমার নিজের বিশ্বাস এ সকল কাজ সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া শেখার মত; একবার আয়ত্ত হইলে কেহ ভুলে না। বার্দ্ধক্যে আর এ দুইটা কাজের কোনটাই চর্চ্চা করিবার এমন কি দস্তরমত পরীক্ষা করিবার সুযোগ-সুবিধা নাই। তথাপি মনে ভরসা আছে, ইহাদের কোনটাই ভুলি নাই। কাজে কাজেই, যাহারা বাল্যে হাতের কাজে আনন্দলাভ করিবে এবং ইহাতে কতকটা দক্ষতা অর্জ্জন করিবে, তাহারা উহা একেবারে ভুলিবে না; জীবনের কোন না কোন সময়ে ইহা তাহাদের কাজে লাগিবে।

যাহারা একবার একটা শিল্পশিক্ষার স্বাদ পাইয়াছে, তাহাদের প্রথম অসুবিধা দূর হইয়াছে—তাহা অহঙ্কার; দ্বিতীয়তঃ তাহারা পাইয়াছে, কর্ম্মে চাড়মিশ্রিত দক্ষতা; ইংরেজীতে ইহাকে "aptitude" বলা চলে। যে একটা কাজ শেখে, সে মনে মনে অন্ততঃ সাহস রাখে, অপর একটা শিখিতে পারিবে; একেবারে না জানিলেও হাত চোখ মন যখন একসঙ্গে চালাইতে শিখিয়াছে, তখন সে অপর একটা শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে বনিয়াদ শক্ত করিয়া লইয়াছে, নূতন ক্ষেত্রে সে নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ করিবে না।

ছাত্রদের আয়ে স্কুল চলিবে কিনা, তাহা লইয়াও আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না। যদি ছাত্রদের আয়ে বিদ্যালয়ের কতকটা ব্যয়ও নির্ব্বাহ হয়, তাহাতে আশা

করি, কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং এ বিশ্বাস যাঁহারা রাখেন এবং তাঁহারা যদি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত থাকেন, তাহা হইলে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাদের উপর কতকটা ভার অর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্ট যেন দ্বিধাবোধ না করেন। এ রকম বৈপ্লবিক নূতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিতে কিয়ৎ পরিমাণ অপব্যয় হওয়া সম্ভব। অন্ততঃ তাহা মনে করিয়াও এ ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করা প্রয়োজন। যতদূর জানি, যাঁহারা এই বিশ্বাসে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত—অনেকেই জনসেবা, সমাজের কল্যাণকর কার্য্য বলিয়া ইহাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; অর্থের স্পৃহা ইঁহাদের বিচলিত করিতেছে না। সুতরাং শিল্পজাত দ্রব্য হইতে আয় হইবে এই মনে করিয়া অগ্রসর হওয়া ভাল। মহাত্মাজীর সহিত কাজ করিয়া যাহারা আত্মবিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তিরাই ইহার ভার লইয়া কাজ করিতেছেন।

তাহার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্য্যপদ্ধতি সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে। তাহার কোনও পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন কিনা, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে। যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতিও শিল্পের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষাদান নয়। শিশু যে কাজটি ভালবাসে তাহাকে বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে তাহা দিয়া, নানাপ্রকার দ্রব্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে আপত্তির কারণ নাই, তবে আপত্তি আছে তাঁহাদের যাঁহারা basic education সম্পর্কে মহাত্মার ব্যাখ্যা পুরাপুরি গ্রহণ করেন।

আমার মনে হয়, এই শিক্ষাবিস্তারের প্রধান অভাব উপযুক্ত শিক্ষক। শিল্পের মাধ্যমে সকল প্রকার শিক্ষা দিবার মত জ্ঞান কত জন যুবক ম্যাট্রিক পাস করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা একটা বিরাট প্রশ্ন। বি-এ পাস করিয়াও এ জাতীয় শিক্ষা দিতে কতটা অধিকার জন্মে তাহাও বিচার্য্য; তাহার উপর শিল্প-শিক্ষাদান সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান ও তাহার প্রয়োগের অধিকার থাকা চাই।

যখন এইরূপ জ্ঞান একজন শিক্ষকের নিকট আশা করি, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দ্ধারিত প্রারম্ভিক বেতন ৩৫ টাকা (৩৫—৪।২—৭৫—৫।৩—৮০) কত জন গুণীকে আকৃষ্ট করিবে তাহা সন্দেহের বিষয়। ইহার পরিবর্ত্তন সংসাধিত না হইলে, বনিয়াদবিহীন বনিয়াদী শিক্ষা সুরুতেই বানচাল হইয়া যাইবে।

আরও একটি কথা ভাবি। অনেকে মনে করিতেছেন, বনিয়াদী শিক্ষা, বিশেষ করিয়া ইহা যখন ত্যাগীশ্রেষ্ঠ গান্ধীজী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত তখন ইহাতে বেশী খরচ পড়িবে না। এরূপ মনে করিলে, কতকটা ভুল করা হইবে। কোনও বিদ্যালয়ে একাধিক শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে কেবল যে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন তাহা নহে, তাহার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপযুক্ত পরিসর স্থানেরও আবশ্যক হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করিয়াছেন, দুই একর জমি এবং ঘর তৈয়ারী প্রভৃতির কতক খরচ স্থানীয় লোকের নিকট পাওয়া যাইবে। লোকের বর্ত্তমান আর্থিক এবং কিয়ৎ পরিমাণে মানসিক অবস্থার কথা জানা থাকায় বলিতে ইচ্ছা হয়, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাদের উপর বিশেষ ভরসা করেন তাহা হইলে বনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারে এখনও বহুদিন সময় লাগিবে।

কবির সন্ধান

শ্রীকালিদাস রায়

কবিরে খুঁজিছ কোথা, এই দেহ মাঝে সে ত নাই,
তোমাদের মত মোর এই দেহ খেলবার ঠাঁই,
আমি যবে কাব্য রচি তখনো পাবে না তার দেখা,
দেহী আমি সে কবিরে বিন্দু বিন্দু জীবন যোগাই।

তোমাদেরি মনোলোকে ভূমিষ্ঠ হ'লাম একদিন
কবিরূপে, জন্মস্থান নয় তার এ ধরা কঠিন।
তোমাদেরি প্রীতিরসে শৈশবে সে হয়েছে লালিত,
আজো সেই সেথা রহি' বাজাতেছে যৌবনের বীণ।

আমি কে? আমি ত শুধু চিরদিন সেবক তাহার,
মোর আহরণ যত তার শুধু মনের আহার
মোরে কবি বলি' কেন বৃথা বন্ধু, কর সম্ভাষণ,
তোমাদেরি চিত্তলোকে নিত্য কবি করিছে বিহার।

আমারে ধরেছে জরা, নয়নের দীপ্তি আসে নিভে।
চিত্ত হতে চিত্তান্তরে কোথা তব কবিরে ঢুঁড়িবে,
রসিকের চিত্তে তার কোন দিন নাহিক মরণ
চিত্ত হতে চিত্তান্তরে চিরদিন আনন্দে ঘুরিবে।

ভবানন্দ, মুকুন্দ আর জনার্দন।

ওরা তিন জনেই ছিল আমার সহপাঠী নিকট বন্ধু। আমরা ইণ্টারমীডিয়েট পর্যন্ত একসঙ্গেই ছিলাম, কিন্তু তারপর আমি প্রাণী-বিজ্ঞান এবং ওরা ইতিহাস ও অর্থনীতির দিকে ঝোঁকাতে আমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল, ওরা শেষ পর্যন্ত হ'ল কলেজের প্রোফেসর, আর আমি আমার পৈতৃক সঞ্চয় আর নিজস্ব বিদ্যার সাহায্যে আমার বাড়ীর বহিরঙ্গনের এক নির্জন কোণে কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা সুরু করলাম।

কিন্তু এ আমাদের নিতান্তই বাইরের পরিচয়, এতে আমাদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নি, কারণ ঐ তিন জনের চরিত্রে এমন এক মহা আকর্ষণীয় গুণ ছিল যা আমাকে মুগ্ধ করত, হয় তো ওদের প্রতি আমার যে সহৃদয় ঔদার্য ছিল তাতে আমিও ওদের মুগ্ধ করে থাকব।

ওরা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব চরিত্রের, ওদের চিন্তায় এবং কাজে একটা কৌতুককর মৌলিকত্ব ছিল যাতে ওদের চারপাশের আবহাওয়া হাসিতে হল্লাতে নাচে গানে সব সময় উজ্জ্বল হয়ে থাকত। এমন কি প্রোফেসর হবার পরেও যখন সামান্য বেতনে ওদের চলা দুঃসাধ্য হ'ল তখন বিনা দ্বিধায় মুখে রং মেখে, ঘুঙুর-পায়ে সন্ধ্যাবেলা পথে পথে নেচে গেয়ে পেটেণ্ট ওষুধ বিক্রি করতে সুরু করল, এবং দিনের ও রাতের উপার্জন মিলিয়ে সচ্ছলতার সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ সরসতা বজায় রেখে চলল।

এর মধ্যে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং ঝঞ্ঝাট দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত দাঙ্গা, কত মৃত্যু, কিন্তু তবু ওদের উচ্ছলতা কিছুমাত্র দমল না, বরঞ্চ নব স্বাধীনতার দমকা হাওয়ায় ওদের প্রাণধর্ম আরও খানিকটা মাথা তুলে সবার উপর দিয়ে দুলতে লাগল। শুধু দোলা নয়—সে মাথায় সর্বত্র গুঁতো মেরে বেড়ানোর প্রবৃত্তিটিও বেশ ভালই জেগেছিল, আর তার প্রমাণও পেলাম আমারই গবেষণাঘরে।

দমকা হাওয়ার মতোই এসে ঢুকল একদিন ওরা তিন জন—হল্লা করতে করতে। মুকুন্দ হাসতে হাসতে আমাকে দুই ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "কীটের সঙ্গে তুইও কীট হয়ে পড়েছিস, একবার বাইরে যা—বাইরে যা—দেখ্ কি আনন্দোৎসব চলছে সেখানে।" ভবানন্দ হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠল, "এ কি! আজকের দিনে তুই এতগুলো প্রজাপতিকে বন্দী করে রেখেছিস"—বলতে বলতেই আমার প্রজাপতির বাক্স খুলে সবগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। কিন্তু তারা হাওয়াতেই যেটুকু উড়ল, তার বেশি নয়, কারণ সেগুলো সবই বহুদিনের মরা প্রজাপতি। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ছিল কতকগুলো মাকড়সা, তবে তারা বন্দী ছিল না, তাদেরই জালে স্বাধীনভাবে বসে ছিল, কিন্তু জনার্দনের তা পছন্দ হ'ল না, সে সেই জাল ছিঁড়ে দিল অকারণ।

আমি বললাম, "আঃ! তোরা করছিস কি, এলি অনেক দিন পরে, স্থির হয়ে বোস্—"

ভবানন্দ চীৎকার করে বলল, "স্থির হয়ে বসব কি রে? কি সব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে তোর যে হৃদয়ঙ্গমই হচ্ছে না।"

"কি এমন ঘটে যাচ্ছে?"

ভবানন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, "স্বাধীনতা!—সবার চেহারা বদলে যাবে—যা কিছু পুরনো সব নতুন হয়ে যাবে —যা কিছু—"

মুকুন্দ আমার একখানা হাত খপ্ করে ধরে উন্মাদের মতো আমার দিকে চেয়ে বলল, "শুধু চেহারা বদলাবে না, নামও বদলাবে। তোমার ঐ হুগলী নদী আর হুগলী নদী থাকবে না—ঢাকুরিয়ার হ্রদ আর ঢাকুরিয়া হ্রদ থাকবে না —বঙ্গোপসাগরও নতুন নাম পাবে।"

আমি বললাম, "কি রকম?"

মুকুন্দ বলল, "হুগলী নদীর নাম হবে মধুমতী—কারণ সেখানে জলের বদলে বয়ে যাবে মধু—আর মধু। ঢাকুরিয়া হ্রদের নাম হবে দুগ্ধ-সরোবর। কত দুধ চাই? দুধে আর কেউ জল মেশাবে না, জলে দুধ মেশাবে, কারণ নির্জলা জলই হবে তখন দুষ্প্রাপ্য। আর মাছেরা কি করবে প্রশ্ন

তুললি না তো?—সব মাছ বাসা নেবে তখন সমুদ্রে—মাছের পাহাড়ে গুঁতো খেয়ে জাহাজ ভেঙে যাবে। আর আজ বাজারে মাংস পাওয়া যাচ্ছে না, দু'দিন পরে কি হবে ভেবেছিস? লাখ লাখ ভেড়া, পাঁঠা, মুরগী তোর দরজায় এসে ভিড় করবে—কাকে রাখবি কাকে খাবি?"

বলতে বলতে তিন ভূতপূর্ব অধ্যাপক দাঁতের মাজনের গান গেয়ে নাচতে সুরু করল, আমি সভয়ে আমার মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রটি আলমারীতে বন্ধ করলাম। ওরা বিজ্ঞান-ঘরে উল্লাসের যে ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিল, সাময়িক-ভাবে আমিও ওদের স্ফূর্তিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না। তার পর যাবার সময় আমাকে টানতে টানতে পথে বের করে বলল, "আর ঘরে ফিরিস না এখন।"

ভিতরে ভিতরে সামান্য একটু আশা বা বিশ্বাসের দানা থাকলে ওরা এই ভাবেই তাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু ফাঁপিয়ে বলতে পারে, সুতরাং দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওদের মনে যে কিছু আশা ছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। ওদের কথা শুনে তাই আমারও মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে রইল।

কিন্তু ক্রমে দিন যায়, দেখি লোকের মুখ শুকনো, তাতে নিরাশার ছায়া। বাজারে না কি চাল দুর্লভ, কাপড় পাওয়া যায় না, খবর পাই; ক্রমে চিনি, কয়লা, নুন, অদৃশ্য হচ্ছে। সরষের তেল নেই, ঘি নেই, দুধ নেই, মাছ নেই, মাংস নেই।

আর সবচেয়ে শোচনীয়, কিছুকাল ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দনেরও দেখা নেই। এই শেষের ঘটনাটিই আমার কিছু উদ্বেগের কারণ হয়ে রইল। ওরা কেমন আছে এখন, কে জানে। কি করে যে ওদের চলছে কল্পনা করতে পারি না। কলেজের বেতনে চলা অসম্ভব, হয় তো ফেরিওয়ালার কাজে বেশি মন দিয়েছে, কিংবা অন্য এমন কোনো কাজ, যাতে আর দেখা করার সময় পাচ্ছে না।

মানুষের জগৎ হতে দূরে থেকে আমার ভালই হয়েছে এ কথা চিন্তা করি মাঝে মাঝে। আমার কীটপতঙ্গের জগতে কোনো রূপান্তর নেই, তাই আমার দিন কাটে ভাল। সম্প্রতি মৎস্যভুক মাকড়সা নিয়ে একটা গবেষণায় মেতে আছি। জলাধার থেকে মাছ টেনে তুলে কি কৌশলে সেটাকে খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। কৌশলগুলো দিনের পর দিন লক্ষ্য করছি আর নোট বইয়ে টুকে টুকে রাখছি। বিষয়টি এমনই আমাকে ডুবিয়ে রেখেছে যে, আমার কাছে সংসারের আর সব মিথ্যা হয়ে গেছে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক, শুধু আমি থাকি আর থাক এই গবেষণাগারটি। আমাকে ঘিরে মধুর হাওয়া বয়ে যায়, আমার এখানে যে ফুলের গাছগুলি আছে তার উপর রোদ এসে খেলা করে, জলাধারটি ঝলমল্ করে ওঠে, মাছেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, পাখীরা গান গায়, সব মিলিয়ে আমার এই নির্জন অঙ্গনটি এক অপার্থিব আনন্দ-রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু যখন মনে পড়ে (এবং বর্তমানে মাঝে মাঝেই মনে পড়ছে) যে আমার ব্যাঙ্কের হিসাবে জমার দিকটি বেশ খালি হয়ে এসেছে তখন মনটা দমে যায়, তখন বুঝতে পারি এক দিন (এবং সে দিনের বেশি দেরি নেই) আমার এ রাজ্যটির আর অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হবে না, এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েই মিলতে হবে, জানি না নাচতেও হবে কি না। সুতরাং দেশের অবস্থা একটু তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার এ বিষয়ে মানসিক উদ্বেগ ক্রমশই অদম্য হয়ে উঠছে। এমন সময় আমার মনে আশা জাগিয়ে ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দন এসে পড়ল এক দিন ধূমকেতুর মতো। আমিই এবারে আনন্দে নেচে উঠলাম এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে ওদের অস্থির করে তুললাম।

কিন্তু ওদের খবর ভাল নয়। যা শুনলাম তা এই যে, ছদ্মবেশ ধরা পড়াতে কলেজের চাকরী গেছে তিনজনেরই। কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন, "কলেজে থাকতে হলে সান্ধ্য ব্যবসা ছাড়তে হবে, আর যদি ব্যবসা রাখতে চাও তা হলে কলেজ ছাড়।" ওরা তিন জন অনেক পরামর্শ করে কলেজ ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করেছে, কেননা মুখে রং মেখে নেচে গেয়ে ফেরি করায় উপার্জন অনেক বেশি। তা ছাড়া ছদ্ম-বেশী ফেরিওয়ালা হওয়াতে প্রোফেসর হিসাবে কলেজে যে পরিমাণ সম্মানের হানি হয়েছে, ক্রেতারা ঘুঙুর পায়ে রং-মাখা ফেরিওয়ালামাত্রকেই কোনো না কোনো কলেজের ছদ্মবেশী প্রোফেসর মনে করে সেই পরিমাণ খাতির করছে। ফলে সন্ধ্যাবেলার এই নৃত্যরত ব্যবসায়ীমাত্রেরই খুব সুবিধা হয়ে গেছে।

মুকুন্দ বলল, "তা ছাড়া ফেরিওয়ালার একটা ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু কলেজের প্রোফেসরের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বিশেষ করে বাংলা বিভাগের পর কলেজে ছাত্রের সংখ্যা আর প্রোফেসরের সংখ্যা দুই-ই বেড়ে গেছে এবং বোধ হয় প্রোফেসরের সংখ্যাই বেশি হয়েছে আর তার ফলে আগে যেখানে একই প্রোফেসর মজুরদের মত দু' শিফ্‌ট তিন শিফ্‌ট করে কাজ চালিয়ে 'এক্সট্রা' পেত, এখন আর সে সুযোগ ততটা নেই। প্রোফেসরদের মধ্যে যারা চতুর তারা সবাই খবরের কাগজে ঢুকে গেছে, আর যারা আমাদের মত বেপরোয়া তাদের দিন চলছে না।"

আমি বললাম, "কিন্তু দেশের এ অবস্থায় ফেরি করার

ভবিষ্যৎই বা কোথায়? ফেরিওয়ালার সংখ্যাও তো অনেক বেশি হয়েছে শুনেছি।"

এই প্রশ্নে ওদের তিন জনেরই মুখ থেকে নিরাশার অন্ধকার দূর হয়ে দপ্‌ করে আশার আলো জ্বলে উঠল।

ভবানন্দ বলল, "দেশের অবস্থা তো ফিরছে অল্প দিনের মধ্যেই, কাজ সুরু হয়ে গেছে, যুগান্তরকারী সব পরিকল্পনা, ভয়টা কিসের?"

মুকুন্দ বলল, "এক দামোদর বাঁধ তৈরি হলেই আমাদের সব অভাব ঘুচে যাবে।"

জনার্দন বলল, "কিন্তু তারও আগে আমাদের দুধের অভাব একেবারে মিটে যাচ্ছে, দেখ নি খবরের কাগজে পশ্চিমা গোরুর ছবি?"

আমি কাগজ কদাচিৎ পড়ি, তাই জানতাম না।

জনার্দন বলতে লাগল, "শুধু তাই নয়, ফসল বাড়াও আন্দোলন আছে এর সঙ্গে। সব যদি মিলিয়ে দেখ, তা হলে বুঝতে পারবে আমাদের মুখের রং অল্পদিনেই ধুয়ে ফেলতে হবে, তখন আর ফেরিওয়ালা সেজে নাচব না, আনন্দে নাচব।"

লক্ষ্য করে দেখলাম তিন জনেরই পা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার পর হঠাৎ দেখি মুকুন্দ এক লাফে উঠে গিয়ে আমার ফুলের গাছগুলো উপড়ে তুলে ফেলছে আর চীৎকার করে বলছে, "এখানে বেগুন লঙ্কা সিম যা হয় লাগাও, ফুল আর চলবে না।"

জনার্দন টেবিল থেকে একটি কাচের লম্বা গলা পাত্র তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি বাধা দেবার আগেই কাজটি শেষ হয়ে গেল; বলল, "এ সব আর কি কাজে লাগবে? আনন্দ কর, আনন্দ কর।"

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, যাবার সময় লক্ষ্য করলাম ওদের চোখের চারদিকে একটা কালো চক্র দেখা দিয়েছে।

বেশ বোঝা গেল ভিতরে ভিতরে ওদের মনের মধ্যে নৈরাশ্য স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, বাইরে যে আশার কথা শোনাতে চেয়েছিল তা ওদের হয় তো অন্তরের কথা নয়, তাই গাছ উপড়ে এবং কাচের পাত্র ভেঙে যে আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তার সঙ্গে ওদের মনের সুর মিলল না; কয়েক মাস আগে হলে ওদের এই ভাঙাচোরার কাজে হয় তো আমিও যোগ দিতাম, কিন্তু আজ পারলাম না বলেই আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে একটি প্রশ্ন ভেসে উঠল, অদম্য আশার সৌধ যদি এমন করে ভেঙে পড়তে পারে, তা হলে আমিই কি সংসার থেকে পালিয়ে একা বেঁচে যাব?

এর পর মাসখানেক কেটে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে, কাছাকাছি ম্যাডক্স স্কোয়ারের এককোণে মাঝে মাঝে চুপচাপ গিয়ে বসে থাকা আমার অভ্যাস। আমি যে কোণটিতে প্রায় বসি, সেদিন দেখি তিনটি কঙ্কালসার ব্যক্তি সেখানে বসে হাই তুলছে। একটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম তাদের এবং চিনে চমকে উঠলাম। আলাপের ভাষা খুঁজে পেলাম না, পুরনো কথাই তুললাম—জিজ্ঞাসা করলাম, "দামোদর বাঁধের খবর কি?"

ভবানন্দ বলল, "দামোদর বাঁধ বোধ করি এ জীবনে আর দেখা যাবে না।"

"দুগ্ধ পরিকল্পনা?"

"ফোটোগ্রাফটি রেখেছি সঙ্গে, আর কিছু জানি না।"

"ফসল বাড়াও আন্দোলন?"

"আর এক পুরুষ পরে জিজ্ঞাসা করিস।"

তার পর শুষ্ক হাসি হেসে বলল, "কিছু টাকা ধার দিতে পারিস—অবশ্য শোধ দেওয়া সম্পর্কে একটু সন্দেহ রেখেও?"

বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলাম ওদের।

ইতিমধ্যে আমার একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি নিজের কাজে মেতে থাকি সেজন্যে বাইরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ঘরের প্রতিও আমি যে এমন উদাসীনতা প্রকাশ করে এসেছি তা এত দিন খেয়াল করিনি। এক দিকের একাগ্রতা ভেঙে যাওয়াতে এত দিনে অন্য দিকেও দৃষ্টিপাতের সুযোগ এল। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী শ্রীমতী অমলা ভয়ঙ্কর রকম রোগা হয়ে পড়েছে। আমাদের বিবাহ হয়েছে পাঁচ বছর। স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিতা স্ত্রী, ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সে সর্বদা তার বিদ্যার পরিচয় ঢেকে রাখারই চেষ্টা করে এসেছে, কারণ সামান্য শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা সাধারণতঃ যে পুরুষোচিত উগ্রতা এবং রুক্ষতায় নারীধর্ম হারিয়ে ফেলে, অমলা ছিল তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। সে ছাত্রীজীবনে নীরবে দেশসেবা করেছে, কারণ তার দেশপ্রেম ছিল উগ্র রকমের আন্তরিক। আমি তাকে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি, তারই হাতে সংসারের সকল ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আমার কাজ করে চলেছি। কিন্তু তার স্বাস্থ্য হঠাৎ এমন ভেঙে পড়ল কেন? সংসার খরচে কার্পণ্য করার কথা নয়, অসুখের কথাও কখনও শুনি নি।

মাস তিনেক আগে এক দিন সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল ইকনমিক্সের তত্ত্ব। বলেছিল বিদেশ থেকে যে খাদ্য বা যা-কিছু আমদানি করতে হচ্ছে, তা যদি কিছু দিন একই ভাবে চলে তা হলে এ দেশ আরও গরিব হয়ে যাবে, সেজন্যে প্রত্যেকেরই উচিত প্রাণপণে দেশের প্রয়োজন দেশের মধ্যেই মেটাবার চেষ্টা করা। নইলে যন্ত্রপাতি কেনার টাকা থাকবে না, আর যন্ত্রপাতি যথেষ্ট কিনতে না পারলে দেশের কোন পরিকল্পনাই সফল হবে না।

কিন্তু আমি তখন গবেষণার এমন এক পর্যায়ে উপনীত যে, অর্থনীতির তত্ত্বে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি নি।

আজ হঠাৎ মনে হল এ কি সেই অভিমানের ফল?

আমি নিজের অপরাধ উপলব্ধি করে কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠলাম, আর তার ফলে যা জানা গেল তাতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম অমলা প্রথমতঃ বাজারের ইনফ্লেশন কমানোর সাহায্য হবে বলে সংসারের খরচ যথাসাধ্য কমিয়ে দিয়েছে। টাকা বাজারে বেশি ছাড়লে জিনিসের দাম কখনো কমতে পারে না, তাই আমার খাদ্যমান যথাসম্ভব বজায় রেখে নিজের এবং অন্যান্য সবার বরাদ্দ একেবারে কমিয়ে ফেলেছে। তা ছাড়া যে বিদেশী গুঁড়ো দুধ আমাদের উভয়ের বরাদ্দ ছিল তা থেকে তার নিজের অংশটি একেবারেই বাদ দিয়েছে। এই গুরুতর অন্যায়টি সে কেন করল ক্ষোভে দুঃখে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে সংক্ষেপে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, "ডলার বাঁচাচ্ছি।"

আমার গবেষণা চুলোয় গেল, আমি প্রায় ক্ষেপে গেলাম। এর পর থেকে আমি আর পুরো বিজ্ঞান-গবেষক নই, পুরোপুরি পুরুষ হয়ে উঠলাম এবং নিজ হাতে সংসারের ভার নিয়ে এই গুরু অন্যায়ের প্রতিকারে মন দিলাম। আমার সংসর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছাত্রীই রয়ে গেছে, গৃহিণী হতে পারে নি—সে দোষ সম্পূর্ণ আমারই।

দৈনন্দিন সংসার চালানোও একটা বিদ্যা এবং এর মধ্যেও একটি বিজ্ঞান আছে, আনন্দও আছে। এতদিন আমার জগৎটা ছিল নিতান্তই কীটপতঙ্গের জগৎ, এখন দেখি মানুষের জগৎও সুন্দর।

একদিন মুকুন্দ আমার মরা প্রজাপতি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে মস্ত বড় একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। আমার মনে হতে লাগল আমারই বন্দী মৃত মনটাকে সে বাইরের আলো-হাওয়ায় নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। তার পর ওরা যতবার এসেছে ততবারই আমার গবেষণাগারের আবহাওয়াকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চেয়েছে। আজ এসে যদি ওরা সব লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় তা হলেও হয়তো আর দুঃখ হবে না। কিন্তু ওদের যে অবস্থা সেদিন দেখেছি—আর কি কখনো ওরা আসবে? জীবন-যুদ্ধের প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে আর কোন্ আশা নিয়ে এখনও বেঁচে থাকবে?

কিন্তু ওরা বেঁচে ছিল, এবং ভাল ভাবেই ছিল তার প্রমাণ পেলাম মাস দুই পরে।

এক দিন ওদের সম্বন্ধেই ভাবছিলাম, এমন সময় চিন্তার অন্ধকার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তিন বন্ধু যেন একটা উগ্র আলোয় জ্বলতে জ্বলতে এসে হাজির হ'ল। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম তাদের দিকে চেয়ে। দেখলাম তাদের চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছে, চোখের চারদিকের সেই কালো চক্র আর নেই, তার বদলে কালো-চশমা—ছদ্মবেশ ধরতে যা ব্যবহার করত। হাড়ে মাংস লেগেছে, চালচলন ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ অভিনব, চেহারা উজ্জ্বল, পরনে সম্পূর্ণ জাতীয় পোশাক, এবং সবচেয়ে

বিস্ময়কর, তারা হিন্দিতে কথা বলছে। দেখেশুনে কৌতুক বোধ করলাম, আনন্দও হ'ল খুব। মনে হ'ল রাজধানী থেকে কোনো বড় চাকরি বা কোন বড় দাঁও মেরে থাকবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোনো পরিকল্পনা কি তা হলে ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে?—দেশোন্নতির কোনো বৈপ্লবিক পরিকল্পনা?"

ওরা তিন জন একসঙ্গে হেসে উঠল। ভবানন্দ বলল, "কি পরিকল্পনা?"

"যেমন দামোদর"—

"দামোদরের বানে ভেসে গেছে।"

"তা হলে 'ফসল বাড়াও'?"

"ফসল বাড়তে দেরি হবে।"

"দুগ্ধ পরিকল্পনা?"

মুকুন্দ বলল, "কোনোটাই দরকার হ'ল না। সম্পূর্ণ নতুন এক পরিকল্পনা আর সবগুলোকে মেরে দিয়েছে।"

আমি সবিস্ময়ে বললাম, "কি রকম? পরিকল্পনা হতে না হতেই তার ফল ভোগ করছ না কি?"

জনার্দন বলল, "ঠিক ধরেছ। এ পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিরাট, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর দ্রুত সাফল্য—যা একমাত্র এই পরিকল্পনাতেই সম্ভব।"

"তোমরা কি এর মধ্যে আছ?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

ভবানন্দ বলল, "আছি, এবং আমরা প্রত্যেকে মোটা বেতনে এই গুরু দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি। হাজার হাজার আপিস বসছে দেশের সব জায়গায়, হাজার হাজার লোক নিযুক্ত হচ্ছে—বক্তা, গায়ক, চিত্রকর: সবাই। একেবারে 'মাস্ কণ্ট্যাক্ট!'"

আমি উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কাজ করতে হচ্ছে তাদের?"

ভবানন্দ বলল, "জনতার মাঝখানে গিয়ে, যাদের এতকাল ঘৃণা করেছ, অস্পৃশ্য করে রেখেছ, একেবারে তাদের মধ্যে গিয়ে, তাদেরই একজন হয়ে, একেবারে তোমার গজদন্তমিনার থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসে শুধু একটি কথা বলা, একটিমাত্র বৈপ্লবিক কথা, একটি মাত্র বীজমন্ত্র উচ্চারণ করা, শুধু বলা—'কম খাও'।"

বলেই পকেটে হাত দিয়ে চট করে ঋণের টাকাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "এবারে আসি ভাই, বড্ড জরুরি সব কাজ পড়ে আছে।"

আমি শুধু বিমূঢ় স্তম্ভিত ভাবে ওদের বিলীয়মান মূর্তি-গুলোর দিকে চেয়ে রইলাম।

শ্যামদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্‌-এ.

শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কেননা, ভগবান তথাগতের বৈরাগ্য-মন্ত্রই দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির হৃদয়ে এক ঊর্দ্ধমুখী অধ্যাত্ম-চেতনার নির্দ্দেশ দিতে

অঙ্কোরথোমের অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি

সক্ষম হয়েছিল। জগতের ইতিহাসে এর মূল্য অপরিসীম। এই উচ্চ অধ্যাত্ম চেতনা শ্যাম তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জাতিদের এমন এক উন্নত সাংস্কৃতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, যা একমাত্র "হীনযান" বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষেই সম্ভব। সুদূর সেনাম চাও ফায়া এবং মেকং নদীর উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে আজও বৌদ্ধধর্ম্মের যে দার্শনিক প্রভাব দেখা যায় তা বিস্ময়কর। এই ধর্ম্মের প্রজ্ঞাবাদ যেন তাদের মনকে এক মহান্ বিশ্বজনীনতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। শ্যামদেশের অধিবাসী "তালাইং" ("মেন" এবং "কারেন্" নামেও পরিচিত), "লাও", "শান্" এবং "থাই"দের বিনয়নম্র আচরণ, ধর্ম্মভাব এবং শিল্প-নৈপুণ্যের মূলে যে গৌতম বুদ্ধের বৈরাগ্যপূর্ণ চিন্তাধারা অনেকটা কার্য্যকরী হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সিংহলের প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থ "মহাবংশ" এবং শ্যাম দেশের জন-প্রবাদ থেকে, আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে ভারতের সম্রাট্ অশোকের প্রেরিত দুই জন ভিক্ষু সোন এবং উত্তর সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় "হীনযান" বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। "থাই"দের কিম্বদন্তী অনুসারে জানা যায়, এই দুই জন ধর্ম্মপ্রচারক দক্ষিণ-শ্যামে অবস্থিত "নগর-প্রথমে" ("নাখন পাথোম") সর্ব্বপ্রথম জাহাজ থেকে অবতরণ করেন।[১] এ ছাড়া, শ্যামদেশে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্যাম দেশ পর্য্যটন করেছিলেন। অবশ্য শেষোক্ত জনপ্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সংশয় প্রকাশ করে থাকেন।

"মহাবংশে" নিবদ্ধ তথ্যাদি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শ্যামের আদি অধিবাসী "মন্" ও "খেমির"রা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে পূর্ব্ব-ভারতের ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রচারকার্য্যের ফলে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে আসে। এর পর কয়েক শতাব্দী হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, সম্ভবতঃ পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ইন্দো-চীন উপদ্বীপের শ্যামল ভূমিতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়-কেতন উড্ডীন করে। ইন্দো-চীনের বিভিন্ন স্থান যথা—আনাম (প্রাচীন "চম্পা"), কম্বোডিয়া (প্রাচীন "ফুনান"), শ্যাম (প্রাচীনকালে, 'দ্বারাবতী', 'লবপুরি', 'জয়শ্রী' নামে নানা রাজ্যে বিভক্ত) ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা এই উভয় ধর্ম্মকেই সাদরে গ্রহণ করে। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার হয়েছিল প্রেম ও মৈত্রীর দ্বারা, তরবারির সাহায্যে নয়। কিন্তু ইউরোপ আপন সভ্যতা প্রসারের জন্য ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ইউ-রোপীয় সভ্যতার নিয়ামক ছিল, পিজারো এবং ডন পেড্রো ডি আলভারাডো প্রভৃতি নৃশংস জলদস্যুগণ। স্পেনের খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকেরা আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছিলেন, বাইবেলের চেয়ে টোলে-ডোর ক্ষুরধার তরবারির উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ার দরুন। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রচারকদের সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁদের প্রজ্ঞা এবং বিশ্বমৈত্রী।

ইন্দোচীনের অনেক আদিম অধিবাসীর চোখে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। দুই

[১] Major Erik Seidenfaden—"*Guide to Nakhon Pathom*" দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব যে একই, সম্ভবতঃ সেটা তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই কারণেই বোধ হয় শ্যাম,

শ্যামদেশের কতকগুলি আধুনিক চৈত্য

কম্বোজ, চম্পা এবং লাও রাজ্যে যুগপৎ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কোন ধর্ম্মগত অথবা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হয় নি। উপরন্তু, এই সব দেশে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মের এমন এক সংমিশ্রণ হয়েছিল যার নিদর্শন আজ পর্য্যন্তও অব্যাহত আছে। শ্যামদেশের বর্ত্তমান অধিবাসী থাইরা গোঁড়া "থেরবাদ" অথবা "হীনযান" বৌদ্ধধর্ম্মে পরম আস্থাবান হলেও হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি এবং পূজা-পদ্ধতির প্রতি নিষ্ঠা তাহাদের অপরিসীম। নারায়ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীকে তারা আমাদের মতই শ্রদ্ধাভক্তি করে।

শ্যাম দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে জয়শ্রী (অপর নাম 'নগর প্রথম'), বজ্রপুরি (থাই উচ্চারণ, 'পেচাবুরি'), লবপুরি (উচ্চারণ, 'লোপ বুরি'), ভীমপুরি (বর্ত্তমান 'ফিমাই') ইত্যাদি নগরসমূহে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে এই সব নগরে অনেক মনোরম বৌদ্ধ বিহার (উচ্চারণ, 'বিহান') এবং মন্দির ('ওয়াট্') নির্ম্মিত হয়। তাদের সু-উচ্চ ভগ্নপ্রায় চূড়াসমূহ আজও তথাগতের বৈরাগ্য-মন্ত্রের জয় ঘোষণা করছে। বৃহত্তর 'থাই'-ভূমির অসংখ্য 'খেমির' বুদ্ধমূর্ত্তি আজও ভগবান বুদ্ধের আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিঃ বিকিরণ করছে সুবর্ণ-ভূমির প্রান্তরে প্রান্তরে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 'পাল' ও 'সেন' যুগে বাংলাদেশে তান্ত্রিক 'মহাযান' ধর্ম্ম প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। এই ধর্মে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের একটা অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হয় এবং এই মিলনের প্রভাব দূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, লম্বক, বোর্ণিও এবং পশ্চিম-শ্যামে এই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ঘটে। এ ছাড়া পাল ও সেন যুগের বাংলার বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য মণিপুর, ব্রহ্মদেশ এবং "শান্"-মালভূমি অতিক্রম করে শ্যামদেশে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে উত্তর এবং দক্ষিণ-শ্যামের 'থাই'-শিল্পকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে।[১] বিশেষ করে উত্তর-শ্যামের চিয়েং সেনের বৌদ্ধভাস্কর্য্য বাংলার পাল-শিল্পের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়। বাংলার মহাযান ধর্ম্ম বোধ হয় কম্বোজে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সেখানকার ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাট যশোবর্ম্মণ "অঙ্কোরথোমে" যে বিরাট মন্দিরসমূহ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন তার শিল্পকলার মধ্যে মহাযান ধর্ম্মবিশ্বাসের ছাপ সুস্পষ্ট। অঙ্কোরথোমের একটি মন্দিরচূড়ার চতুর্দ্দিকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের যে বিরাট মুখাবয়ব নির্ম্মিত আছে তা শিল্পকলা এবং আধ্যাত্মিক ভাব উভয় দিক দিয়ে বাস্তবিকই অতুলনীয়। কারও কারও মতে অঙ্কোরথোম

"ওয়াট্ পঞ্চম পবিত্র" মন্দির—ব্যাঙ্কক

মূলতঃ শৈব মন্দির। কোন কোন ঐতিহাসিক এবং শিল্পতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, রাজা যশোবর্ম্মণ সম্ভবতঃ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে মহাদেবেরই অন্যতম রূপ হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। এককালে অবলোকিতেশ্বরের পূজা চীন, জাপান, তিব্বত এবং অন্যান্য অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাস থেকে অবগত হওয়া যায় যে, খ্রীষ্টীয় ১০৫৭ অব্দে ব্রহ্মের রাজা অনুরুদ্ধ টেনেসেরিম উপকূলে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার হীনযান বৌদ্ধ-

১। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-চীনের ইয়াংসি নদীর উপত্যকা থেকে আগত 'থাই'রা শ্যামদেশ অধিকার করে সেখানকার আদি অধিবাসী মন, খেমির এবং লাওদের পরাজিত করে।
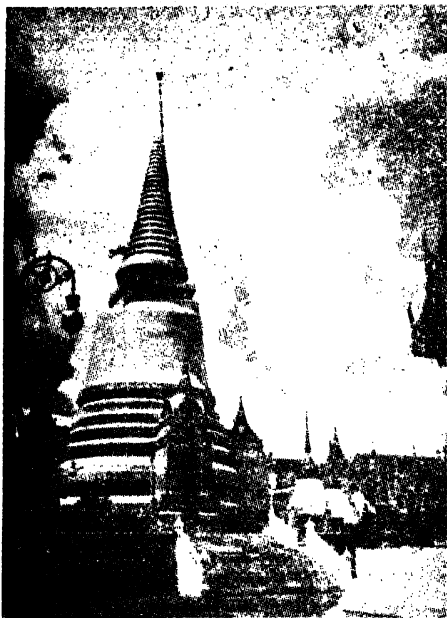
"ওয়াট্ ফ্রা কেও" মন্দিরের একটি অংশ—ব্যাঙ্কক

ধর্ম্মের কেন্দ্র ও মন্ জাতি-অধ্যুষিত থাটন জয় করেন এবং সেখানকার শিল্পীদের সাহায্যে নিজ রাজধানী পাগানের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। তিনি সেখান থেকে বহু বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থও লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিলেন। অনুরুদ্ধের চরিত্রে নিষ্ঠুরতা এবং ধর্ম্মানুরাগের অপূর্ব্ব মিশ্রণের জন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সম্রাট সার্লেমনের (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। শ্যামের পরলোকগত বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাজপুত্র দাম্‌রোং রাজানুভাবের মতে উক্ত ব্রহ্মদেশীয় সম্রাট যে নগরের সাংস্কৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন, সেটি আসলে নগর-প্রথম—থাটন নয়। স্বীয় মত সমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তি দেখিয়েছেন—তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই যে, পাগানের বিখ্যাত "আনন্দ" মন্দিরের সঙ্গে নগর-প্রথমের "ফ্রা মেরু" (উচ্চারণ "ফ্রামেন") মন্দিরের স্থাপত্যরীতির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। রাজানুভাবের মতে, রাজা অনুরুদ্ধের নির্দ্দেশে পাগানের 'আনন্দ'-মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল নগর-প্রথমের শিল্পসুষমাময় "ফ্রা মেরু" মন্দিরের প্রায় হুবহু অনুকরণে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-চীন থেকে মোঙ্গলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে থাই জাতি শ্যামদেশে প্রবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে সেখানকার প্রাক্তন অধিবাসী মন্ ও খেমিরদের পরাজিত করে সেখানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। বিজয়ী থাইরা বিজিত খেমির অথবা "খোম"দের উন্নততর সংস্কৃতি গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে নি, নবাগত থাইরা বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে "মন্-খেমির" বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। মধ্যযুগে চিয়েং সেন, সুখোদয়, স্বর্গলোক, বিষ্ণুলোক, অযোধ্যা (আয়ুথিয়া), লবপুরি, বজ্রপুরি, বাং-পা-ঈন ইত্যাদি বিভিন্ন নগরে বৌদ্ধ থাইরা অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করে। এ ছাড়া তারা পালি ভাষার বিশেষ চর্চ্চা করে এবং জাতক, পিটক ইত্যাদি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ থাই ভাষায় অথবা 'থাই' অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়। মধ্যযুগে বিশেষ করে আয়ুথিয়া আমলে (Ayuthian period, 1350-1767 A. D.) থাই ভিক্ষু এবং জ্ঞানী স্থবিরদের সাধনায় ও চেষ্টায় হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, বাস্তবিকই তা অতুলনীয়।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে থাই রাজধানী আয়ুথিয়া ব্রহ্মদেশের রাজা সিন্ বুশিনের (Hsinbyushin) অভিযাত্রী সৈন্য-বাহিনীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ব্রহ্মদেশীয় সেনা-বাহিনী আয়ুথিয়ার অধিকাংশ মঠ এবং মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এর কিছুদিন পরে পরাজিত থাইরা তাদের জনপ্রিয় রাজা ফায়া তাখ্‌সিন্ অথবা তাখসিলের (তক্ষশীলা) নেতৃত্বে তাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। শেষে নবনির্ম্মিত ব্যাঙ্কক অথবা ক্রুংথেপ (অর্থাৎ দেবতাদের শহর) নগরে বর্ত্তমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পর থাইরা নবীন উদ্যমে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসংস্কৃতির উৎকর্ষসাধনে রত হয়। ফলে ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শ্যামদেশের বিভিন্ন স্থানে নূতন স্থাপত্যরীতিতে বহুসংখ্যক মন্দির নির্ম্মিত হতে থাকে। এই সব মন্দির গঠনসৌন্দর্য্যে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ব্যাঙ্কক নগরে যে সব মন্দির নির্ম্মিত হয় তন্মধ্যে "ওয়াট্ আরুণ," "ওয়াট্ ফ্রা কেও", "ওয়াট্ বেঞ্চামা পোবিত", "ওয়াট্ ফো" এবং "ওয়াট্ রাজোপোবিত"ই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বর্ত্তমানকালে বৌদ্ধধর্ম্মই শ্যামদেশের জাতীয় ধর্ম্ম (State Religion)। খ্রীষ্টানদের ক্যাথলিক মন্দির-বিধির মত শ্যামদেশের মন্দিরগুলি নানা শ্রেণীর পুরোহিত-দের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত। যদিও "ধর্ম্মরক্ষক" (মধ্যযুগের ইউরোপীয় নৃপতিদের "Defender of Faith" উপাধির সঙ্গে তুলনীয়) হিসাবে রাজার স্থান সর্ব্বোপরি, তথাপি তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মন্দিরগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা সাধারণ মন্দির এবং রাজকীয় মন্দির। সাধারণ মন্দিরগুলির অধ্যক্ষদের "থান সোম ফান" এবং তাঁর সহকারীদের "থান মহা" বলা হয়।

"ওয়াট্ রাজপ্রাদিত্"—ব্যাঙ্ককের একটি আধুনিক বৌদ্ধ মন্দির

অপর পক্ষে রাজকীয় মন্দিরগুলির ভিক্ষু অধ্যক্ষদের "চাও খুন থাই" এই শ্রেষ্ঠতম উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

থাইদের সকলকেই অন্ততঃ চার মাসের জন্য "ওয়াট্" অথবা মন্দিরে দীক্ষিত ভিক্ষু ('ফ্রা') অথবা পর্য্যবেক্ষক হিসাবে অবস্থান করতে হয়।

প্রতিদিন প্রত্যুষে 'থাই' ভিক্ষুরা ভিক্ষাগ্রহণের জন্য লোকালয় পরিক্রমা করেন। বৌদ্ধধর্মের আদি শাখা থেরবাদ অথবা হীনযান ধর্মের এই নিয়ম। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ না করলে সাধারণতঃ ভিক্ষুদের ভোজন নিষিদ্ধ। তাই বলে শুধু ভিক্ষান্নেই যে তাদের উদরপূর্ত্তি করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই, প্রত্যহ প্রত্যুষে যখন মুণ্ডিতমস্তক ও ঈষৎ-গৈরিক চীবর:পরিহিত বালক, তরুণ, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ ভিক্ষুরা ব্যাঙ্কক ও শ্যামদেশের অন্যান্য নগরের রাজপথে মৃদুগতিতে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে পদচারণা করেন এবং বিনয়-নম্র ভক্তেরা তাঁদের খাদ্যদ্রব্য উপহার দেয় তখন প্রবাসী ভারতীয়ের মনশ্চক্ষে স্বতঃই সুদূর অতীতের একটি দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধও এমনি ভাবে বেরিয়েছিলেন ভিক্ষার উদ্দেশ্যে রাজগৃহের পথে নৃপতি বিম্বিসারের হৃদয়কে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় অভিভূত ক'রে। শ্যামদেশে

শ্যামদেশের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

কতবার আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে বৌদ্ধ থাই ভিক্ষুদের ভিক্ষাগ্রহণের দৃশ্য দেখেছি এবং ভারতীয় সভ্যতার অফুরন্ত প্রাণশক্তি কোথায় নিহিত তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ-প্রচারকদের কণ্ঠে যে প্রেম ও মৈত্রীর বাণী উদ্গীরিত হয়েছিল তারই প্রতিধ্বনি মুগ্ধ হয়ে শুনেছি দূরপ্রাচ্যের পথে ও প্রান্তরে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ২৯,৩৭০ বর্গমাইল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ যে সকল অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে, গত আদমসুমারীর (১৯৪০) হিসাব অনুযায়ী ঐ সকল অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল ২,১১,৯৬,৪৫৩ জন। ১৯৪১ সাল হইতে প্রতি বৎসর লোকসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাও কম নহে। বর্দ্ধিত লোক ও আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা হিসাব করিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সংখ্যা মোটামুটি আড়াই কোটি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে (কলিকাতা সহ) ৮৫২ জন লোক বাস করে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীসুশীলকুমার দে, আই-সি-এস, কর্তৃক সংকলিত *Prospectus of Agriculture in West Bengal* নামক পুস্তকে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের জমির পরিমাণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :

(১)	আমন ধান	৭৭৯৫০০০	একর
(২)	আউশ ধান	১৪৭০০০০	"
(৩)	বোরোধান	৫৫০০০	"
(৪)	গম	১০০০০০	"
(৫)	ডাল শস্য	৯০৮০০০	"
(৬)	আলু	৯২০০০	"
(৭)	অন্যান্য সব্জী	৭৭৬০০০	"
(৮)	ফল	২৮২০০০	"
(৯)	সরিষা	১৩৮০০০	"
(১০)	ইক্ষু	৫৪০০০	"
(১১)	অন্যান্য খাদ্যশস্য	২৪৭০০০	"
	মোট	১১,৯১,৭০০০	একর

এই হিসাবে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মাথাপিছু খাদ্যশস্যের জমির পরিমাণ সবেমাত্র ০'৪৭ একর অর্থাৎ দেড় বিঘারও কম। মাথাপিছু ধানের জমির পরিমাণ ০'৩৭ একর অর্থাৎ মোটামটি এক বিঘা।

শ্রীযুক্ত দে মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ১০ম পৃষ্ঠায় ৭ নম্বর টেবলে একরপ্রতি চালের গড় ফলনের এইরূপ হিসাব দিয়াছেন :—

আমন—	১২'৪	মণ
আউশ—	১০'৯	"
বোরো—	১৩৬	"
গড়	১২'১৭	

এই হিসাব অনুযায়ী সকল প্রকার চালের বাৎসরিক গড় ফলন মোটামুটি ৪২,০০,০০০ টন অর্থাৎ ১১,৩৪,২৪,৪০০ মণ।

কিন্তু দে মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় ২১ নম্বর টেবলে দেখাইয়াছেন যে, পাঁচ বৎসরের (১৯৪৩-৪৪ হইতে ১৯৪৭-৪৮ সাল) চালের বাৎসরিক গড় ফলন ৩৫,৪০,৭০০ টন অর্থাৎ মোটামুটি ৯,৫৫,৯০,৮০০ মণ।

দে মহাশয়ের উপরোক্ত দুইটি হিসাবের মধ্যে তারতম্য খুবই বেশী, এবং কোন্ হিসাব অনুযায়ী চালের গড় ফলন ধরা উচিত তাহা সাধারণের পক্ষে ঠিক করা কঠিন।

তাঁহার পুস্তকে গমের গড় ফলনের হিসাবেও এইরূপ তারতম্য দেখা যায়; ৭ নম্বর টেবলে একরপ্রতি গমের গড় ফলন হইতেছে আট মণ অর্থাৎ বাৎসরিক গড় ফলন ২৯,৬৩০ টন (আট লক্ষ মণ)।

২১ নম্বর টেবল অনুযায়ী গমের গড় ফলন বাৎসরিক ২৫,৮০০ টন (মোটামুটি ৬,৯৬,৬০০ মণ)।

জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের হিসাব অনুযায়ী গত ছয় বৎসরের (১৯৪৪-৪৯) চালের ফলন এইরূপ :—

১৯৪৪	৪২,২১,০০০	টন
১৯৪৫	৩৫,১০,০০০	"
১৯৪৬	২৮,৯৬,০০০	"
১৯৪৭	৩৬,৪৮,০০০	"
১৯৪৮	৩৪,১৭,০০০	"
১৯৪৯	৩২,৯৩,০০০	"

উপরোক্ত ফলনের গড় হিসাব হইতেছে ৩৪,৯১০০০ টন (মোটামুটি ৯,৪৪,২৮,০০০ হাজার মণ)। মন্ত্রী মহাশয়ের হিসাব অনুযায়ী গমের গড় ফলন ২৭,০০০ টন (৭,২৯,০০০ মণ)। এই হিসাবের সহিতও দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুযায়ী গড় ফলনেরও কিছু পার্থক্য দেখা যায়।*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্ব শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু মহাশয়ের মতে পশ্চিমবঙ্গে জোয়ার, ভুট্টা, বাজরার বাৎসরিক গড় ফলন ৪০ হাজার টন (১০,৮০,০০০ মণ)।

সুতরাং উপরোক্ত বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী চাল, গম, ভুট্টা, জোয়ার ও বাজরার ফলনের পরিমাণ বিভিন্ন। যথা :—

* এই প্রবন্ধ লিখিবার পর জানিতে পারিয়াছি যে অনেক আগে প্রতি বৎসরের শস্য-কর্তন-পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুযায়ী হিসাব করা হইয়াছে।—লেখক

(১) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুসারে

চাল	৪২০০০০০	টন	(১১,৩৪,২৪,৪০০	মণ)
গম	২৯৬৩০	টন	(৮০০০০০	মণ)
ভুট্টা ও বাজরা	৪০০০০	টন	(১০,৮০০০০	মণ)
মোট	৪২৬৯৬৩০	টন	(১১,৫৩,০৪৪০০	মণ)

(২) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুসারে

চাল	৩০৪০৪০০	টন	(৯,৫৫,৯০৮০০	মণ)
গম	২৫৮০০	টন	(৬৯৬৬০০	মণ)
ভুট্টা ও জোয়ার	৪০০০০	টন	(১০৮০০০০	মণ)
মোট	৩৬০৬২০০	টন	(৯৭৩৬৭৪০০	মণ)

(৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের হিসাব অনুসারে

চাল	৩৪৯৭০০০	টন	(৯,৪৪,২৮,০০০	মণ)
গম	২৭০০০	টন	(৭২৯০০০	মণ)
ভুট্টা ও জোয়ার	৪০০০০	টন	(১০৮০০০০	মণ)
মোট	৩৫৬৪০০০	টন "	(৯,৬২,৩৭,০০০	মণ)

বিশেষজ্ঞগণের মতে উৎপন্ন শস্যের শতকরা ১০ ভাগ বীজের জন্য এবং ক্ষয়-ক্ষতির জন্য বাদ দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং এই হিসাবে কেবলমাত্র খাদ্যের জন্য পাওয়া যায় :—

(১) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুসারে
৩৮৪২৬৬৭ টন অর্থাৎ ১০,৩৭,৭৩৯৬০ মণ

(২) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুসারে
৩২৪৫৫৮০ টন অর্থাৎ ৮,৭৬,৩০৬৬০ মণ

(৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রীমহোদয়ের হিসাব অনুসারে
৩২০৭৬০০ টন অর্থাৎ ৮,৬৬,১৩,৩০০ মণ

বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য গড় মাথাপিছু দৈনিক ৭ হইতে ৮ ছটাক (১৪ হইতে ১৬ আউন্স) চালের প্রয়োজন। আমরা মাথাপিছু দৈনিক ৮ ছটাক ধরিয়া হিসাব করিব।

বিভিন্ন সংখ্যাবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০০ জন লোকের মধ্যে গড়পড়তা হিসাবে প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ জন; কোন কোন বিশেষজ্ঞ ৮৫ জনও ধরেন; অর্থাৎ এক বৎসর বয়সের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিসহ মোট ১০০ জনকে ৭৫ হইতে ৮৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সমান ধরা হয়।

ডাঃ একরয়েডের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আড়াই কোটি লোক ২,০৯,১৩,৬৫০ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সমান; অর্থাৎ শতকরা মোটামুটি ৮৩·৬৫ জন।

আমরা ডাঃ একরয়েডের হিসাব অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সংখ্যা ধরিয়া খাদ্যের প্রয়োজনের পরিমাণের হিসাব ধরিব। এই হিসাবে প্রয়োজনের পরিমাণ এইরূপ :—
২০৯১৩৬৫০ × ৮ ছটাক × ৩৫৬৫ — ৩৫৩৪০০০ টন অর্থাৎ ৯৫৪,১৮,৫২৮ মণ।

এই হিসাব অনুযায়ী বাড়তি বা ঘাটতির পরিমাণ এইরূপ :—(১) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ৭ নম্বর টেবল অনুযায়ী বাড়তির পরিমাণ ৩০৮৬৬৯ টন অর্থাৎ ৮৩,৫৫,৪৩২ মণ।

(২) শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুযায়ী ঘাটতির পরিমাণ—২৮৮৪০০ টন অর্থাৎ ৭৭,৮৭,৮৬৮ মণ।

(৩) জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের হিসাব অনুযায়ী ঘাটতির পরিমাণ ৩২৬৪০০ টন অর্থাৎ ৮৮,০৫,২২৮ মণ।

জনসংভরণ বিভাগের সচিব মহাশয়ের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২৭৫০০০ টন (মোটামুটি ৬৪,২৫,০০০ মণ) গমের প্রয়োজন হয়; উৎপাদনের পরিমাণ ২৭০০০ টন (মোটামুটি ৭২৯০০০ মণ)। সুতরাং তাঁহার হিসাব অনুযায়ী গমের ঘাটতির পরিমাণ ২,৪৮,০০০ টন (মোটামুটি ৬৬,৯৬,০০০ মণ) এবং চালের ঘাটতির পরিমাণ ৭৮,৪০০ টন (২১,১৬,৮০০ মণ) :—

মন্ত্রী মহাশয় অন্য এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"The position in West Bengal in this respect is worse than the All India position and Prof. Mahalanobis on the basis of several pre-war diet surveys has given us an estimate of over 15 ounces per day per capita normal consumption of cereals in West Bengal. On this basis the normal requirement at present is 3·8 million tons against the net yield of 3·4 million tons, revealing a normal deficit of over 400 thousand tons."

ইহার অর্থ এই যে, সর্বভারতীয় খাদ্যাবস্থা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের অবস্থা অধিকতর মন্দ; অধ্যাপক মহলনাবিশ যুদ্ধের পূর্বের খাদ্য সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিতে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক দিন মাথাপিছু ১৫ আউন্সের (৭॥ ছটাক) উপর তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। তাঁহার এই হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের স্বাভাবিক বার্ষিক প্রয়োজন ৩৮ লক্ষ টন অর্থাৎ ১০,২৬,০০০০০ মণ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টন অর্থাৎ ৯,১৮,০০,০০০ মণ। অতএব ঘাটতির পরিমাণ চার লক্ষ টন অর্থাৎ ১,০৮,০০,০০০ মণ। এ ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন্ ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ টন এবং প্রয়োজনের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ টন ধরিয়াছেন তাহা বুঝা যাইতেছে না।

যাহা হউক, মোটামুটিভাবে বলিতে পারা যায় যে, দে মহাশয়ের ২১ নম্বর টেবল অনুযায়ী হিসাব এবং জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের প্রথমোক্ত হিসাব প্রায়

সমান এবং এই হিসাব অনুযায়ী ইহাও মোটামুটি ভাবে বলা যায়, তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ ৩½ লক্ষ টন। তবে চালের ঘাটতির পরিমাণ মোটেই আশঙ্কাজনক নহে।

জনসংভরণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় এক বক্তৃতায় সংগ্রহের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা এইরূপ :

বৎসর	উৎপাদনের পরিমাণ টন	সংগ্রহের পরিমাণ টন	শতকরা সংগ্রহের পরিমাণ
১৯৪৪	৪২২১০০০	৫৭৯০০০	১৩.৭
১৯৪৫	৩৫১০০০০	৪১৫০০০	১১.৮
১৯৪৬	২৮৯৫০০০	৩৯৭০০০	১৩.৭
১৯৪৭	৩৬৪৮০০০	৪৪৭০০০	১২.৩
১৯৪৮	৩৩১৭০০০	৪৬৭০০০	১৩.৭

উপরোক্ত পরিমাণ আভ্যন্তরিক সংগ্রহ (মোটামুটি ৪½ লক্ষ টন) ব্যতীত মোটামুটি ৩½ লক্ষ টন (চাল, গম ও গমজাত খাদ্যসহ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং ভারতের বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। সুতরাং মোট সংগ্রহের ও আমদানীর পরিমাণ মোটামুটি ৮ লক্ষ টন।

৮ লক্ষ টন সংগ্রহের ও আমদানীর সাহায্যে বিধিবদ্ধ "রেশন" (Statutory Rationing) অনুযায়ী কলিকাতা ও অন্যান্য শহরের ও বড় বড় প্রতিষ্ঠানের (রেলওয়ে, চা-বাগান ইত্যাদি) মোট ৬৪ লক্ষ লোককে নির্দ্ধারিত "রেশন" দেওয়া হইতেছে এবং ইহা ছাড়া অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলেও চাল সরবরাহ করিতে হয়। উপরোক্ত ৬৪ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮ লক্ষ লোক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন।

এই হিসাব অনুযায়ী ৬৪ লক্ষ লোক দৈনিক গড়ে প্রায় ৬ ছটাক (১২ আউন্স) চাল ও গমজাত খাদ্য পাইয়া থাকেন।

ঘাটতি অঞ্চলে চাল সরবরাহের মোটামুটি হিসাব এইরূপ :

(১) ২৪ পরগণা ৪০৬৪৫ মণ
(২) হাওড়া ৬০১০০ "
(৩) হুগলী .. ২৯৩০০ "

মোট ১৩০০৪৫ মণ (৪৮১৭ টন)

উপরোক্ত ত্রৈরাশিক হিসাবের সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, দৈনিক মাথাপিছু গড়ে ৮ ছটাক তণ্ডুল-জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় মোটামুটি ৩½ লক্ষ টন। অনেকেই বলিতে পারেন যে, যখন ৩½ লক্ষ টন খাদ্য বাহির হইতে আমদানী করা হইতেছে তখন রেশন এলাকায় দৈনিক মাথাপিছু ৮ ছটাক হিসাবে তণ্ডুল জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করা হইতেছে না কেন? সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে বলা যায় যে, সংগ্রহের পরিমাণ কিছু বাড়াইলেই রেশন এলাকায় মাথাপিছু দৈনিক আট ছটাক হিসাবে দেওয়া যায়। আবার অনেকের মতে সরকারী গুদামসমূহে অযথা অধিক পরিমাণ চাল, গম প্রভৃতি নষ্ট হইতেছে। ইহা নিবারণ করিতে পারিলেই দৈনিক মাথাপিছু আট ছটাক হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে। লেখকের ব্যক্তিগত মত এই যে, রেশন এলাকাসমূহে গড়ে দৈনিক মাথাপিছু ৮ ছটাক হিসাবে খাদ্য সরবরাহ করা অসম্ভব নহে। ইহা করিলে বর্ত্তমান অসন্তোষ অনেক পরিমাণে দূর হইবে এবং রেশন এলাকাসমূহের নিকটস্থ "কালোবাজার" খুবই মন্দ গতিতে চলিবে।

পরিশেষে এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলা দরকার। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা এই যে, চালের গড় ফলন অনুযায়ী প্রতিবৎসর ফসল পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ ছয় বৎসরের মধ্যে এক বার কি দুই বার স্বাভাবিক বা গড় ফলন হয়; এবং এক বার স্বাভাবিক ফলন অপেক্ষা বেশী ফসল পাওয়া যায়। সুতরাং গড় ফলন ধরিয়া সকল বৎসরের ঘাটতির হিসাব করিলে উহা নির্ভুল হইবে না। দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিকতর ফলন হইলেও ত্রৈরাশিক হিসাবে যদিও দেখা যাইবে যে, আড়াই কোটি লোকের খাদ্যাভাব ঘটিবে না, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্র উহার বিপরীতই দেখা যাইবে, কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফলনের সম্পূর্ণ অংশ বাজারে আসে না। ইহা জানা কথা যে, যাঁহাদের জমির পরিমাণ বেশী তাঁহারা উৎপন্ন ফসলের কতকাংশ গোলায় মজুত করিয়া রাখেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফসলের অন্ততঃ শতকরা ৭।৮ ভাগ বাজারে আসে না, বড় বড় কৃষকদের ঘরে গোলায় মজুত থাকে। এই ভাবে মজুত রাখা খুবই স্বাভাবিক, কারণ পল্লী অঞ্চলে ধানের গোলাই কৃষকদের ব্যাঙ্ক। কোন বৎসর ফসল না হইলে বা কোন বৎসর ফসলের পরিমাণ কম হইলে ধানের গোলাই তাঁহাদের রক্ষা করে; টাকার প্রয়োজন হইলেই ধান বিক্রয় করিয়া প্রয়োজন মিটানো হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় "কণ্ট্রোল" (নিয়ন্ত্রণ) ও সংগ্রহনীতির ফলে বড় বড় কৃষকেরা শতকরা ১।২ ভাগের বেশী মজুত রাখিতেছেন না। ইহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। নিজেদের প্রয়োজনমত ধান রাখিয়া যে অবশিষ্ট অংশ সরকারকে বিক্রয় করিতেছেন তাহা নহে; সরকারী সংগ্রহের আশঙ্কায় মজুত রাখিতেছেন না। গোপনে অধিকমূল্যে অন্য স্থানে বিক্রয় করিতেছেন। কোথাও কোথাও পাকিস্থানেও চালান হইতেছে।

চীনের কু-মিন-টাঙ্ দলের শেষ আশ্রয় ফরমোজার একটি উপত্যকা
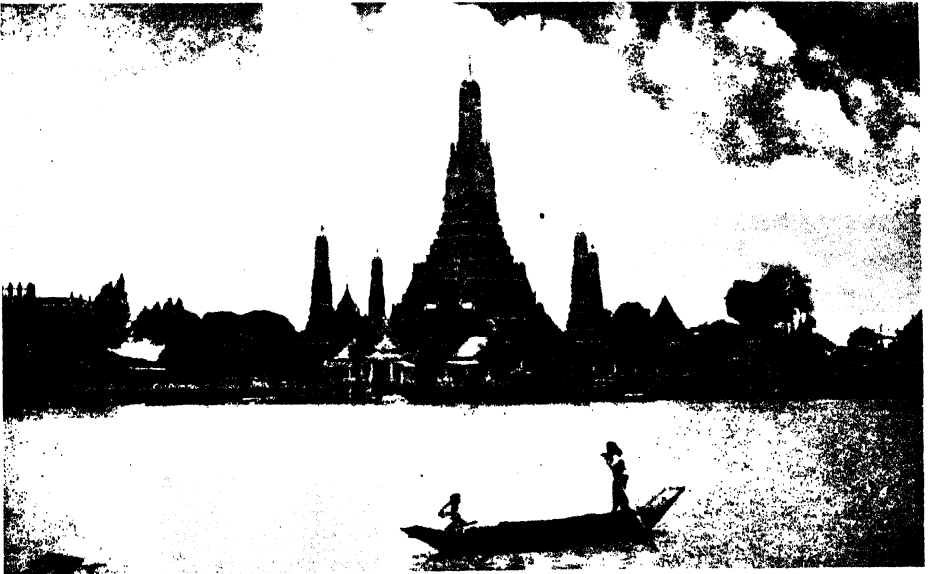
শ্যামের বৌদ্ধ মন্দির—'ওয়াট্ আরুণ'

আঙ্কোর থোম মন্দির-তোরণে অসুর-মূর্ত্তি

কম্বোজের আঙ্কোর ওয়াট্ মন্দিরের তোরণে হিন্দু দেবীমূর্ত্তি

বিস্মৃত মহানগরী অশিও

শ্রীনিরুপমা নায়ার

অনাদিকাল থেকে রহস্যময়ী প্রকৃতির নিষ্ঠুর খেয়ালে যে কত সমৃদ্ধিশালী মহানগরী জনপদ ও মানবের বিবিধ কীর্ত্তির নিদর্শন পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে তাহার অন্ত নাই। প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার একটি নিদর্শন সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হইয়াছে ইন্দোচীনে। সাইগন যাদুগৃহের অধ্যক্ষ ডাঃ লুই ম্যালারেটের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ভূগর্ভে বিলুপ্ত এই জনপদটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইন্দোচীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে মেকং ব-দ্বীপে এটি অবস্থিত। স্থানটির অবস্থিতি এবং সেখানে প্রাপ্ত বিবিধ বস্তু হইতে অনুমিত হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০ অব্দ হইতে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত জনপদটি বর্ত্তমান সিঙ্গাপুরের মত প্রাচ্যের একটি সমৃদ্ধিশালী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ-ইন্দোচীনের চাষীরা স্থানটিকে 'অশিও' বলিয়া থাকে।

উক্ত স্থানটি এখন অধিকাংশ ব-দ্বীপের মত পঙ্কিল জলাভূমিবিশেষ। বৎসরে চারটি মাস মাত্র ইহার মাটি শুষ্ক থাকে, বাকি আট মাস নিমজ্জিত থাকে তিন ফুট জলের নীচে। ধান্য চাষের পক্ষে স্থানটি বিশেষ উপযোগী, কিন্তু স্থানীয় কৃষকেরা উক্ত জমিতে ফসল বুনিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তাহাদের বিশ্বাস ঐ স্থানে বহু অপদেবতার বাস। যখনই কোন চাষী ওখানে ফসলের বীজ বপন করিয়াছে তখনই সে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সুতরাং কোন্ অজানা যুগ হইতে অশিওর সুবিশাল ১০০০ একর (প্রায় ৩৪০০ বিঘা) জমির বুকে কীর্ত্তিনাশা খেয়ালী মেকং নদী অবাধে পলিমাটি ঢালিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে জন্মিয়াছে বিবিধ তৃণগুল্ম তরুলতা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। নিকটবর্ত্তী পল্লীর চাষীরা আরও বলে যে, ঐ জঙ্গল-মধ্যে অসংখ্য, বিরাটকায় প্রস্তরখণ্ডসমূহ পড়িয়া আছে। প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট দিনে আশপাশের পল্লীসমূহের চাষীরা ফল-মূল, ঝলসানো বরাহ ও কুক্কুট লইয়া সেখানে যায় এবং সেই শিলাখণ্ডগুলিকে পূজা করিয়া দ্রব্যগুলি অপদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া চলিয়া আসে। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, অশিওর অধিষ্ঠাতা অপদেবতাদের এ ভাবে তুষ্ট না করিলে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া চাষীদের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারে। বিস্মৃত অতীতে যে স্থান সুদূর রোম, মিশর, পারস্য, ভারত ও মহাচীনের বণিকদের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল আজ সেই বিলুপ্ত নগরী অশিও সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসী, ইন্দোচীনের গরীব নিরক্ষর চাষীদের প্রমুখাৎ এই কুসংস্কারমূলক উক্তিটুকু ছাড়া আর কোন খবরই পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদের নিকট ভূতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃহৎ শিলাখণ্ডসমূহের কথা শুনিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ম্যালারেটের মনে সেগুলি পরীক্ষা করিতে দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল জন্মে।

১৯৪২ সাল। সমগ্র ইন্দোচীন তখন জাপানের কবলিত হইয়াছে। ফ্রান্সের সহিত সমুদয় যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সারা দেশে অভূতপূর্ব্ব বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। কিন্তু নানারূপ বাধাবিপত্তি সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ম্যালারেট রহস্যাবৃত অশিওর কথা বিস্মৃত হন নাই। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে কয়েকজন সহকর্ম্মী সহ তিনি অশিও অভিমুখে যাত্রা করেন। সে সময় হঠাৎ মেকং নদী বন্যায় পরিপ্লাবিত হইয়া যায়। সাইগন থেকে স্থলপথে অশিওতে পৌঁছানো অত্যন্ত বিপজ্জনক ও কষ্টকর। মেকং ব-দ্বীপের শত শত একর-ব্যাপী ধান্যক্ষেত্র আড়াই ফুট বন্যার জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়। দক্ষিণ-ইন্দোচীনে যে প্রকার ধান্য জন্মে কেবলমাত্র অনুরূপ জমি ও আবহাওয়াই তাহার উপযোগী। সেই বিশাল শস্যভূমির কিছু উত্তরে অবস্থিত এক অনতি উচ্চ শৈলশ্রেণী—নাম বোধি পাহাড়। ইন্দোচীন ও শ্যাম রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হস্তী পর্ব্বতের (Elephant Mountains) ইহা একটি শাখাবিশেষ। বোধি পাহাড় হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে দিগন্তপ্রসারী সমতল ভূমি।

ডাঃ ম্যালারেটের চাষী গাইড বলে, ইহাই সেই অপদেবতাদের আবাসভূমি অশিও। বন্ধুদের সাহায্যে খানিকটা জমি পরিষ্কার করিয়া ডাঃ ম্যালারেট দেখেন সেখানকার জমি স্থানে স্থানে ঢেউ-খেলানো—তাঁহার মনে হয় এটা সম্ভবতঃ কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফল। উঁচু স্তরগুলি অধিকাংশ স্থলেই শুষ্ক ও পঙ্কমুক্ত। চাষীদের বর্ণিত, বড় বড় শিলাখণ্ডগুলি সেই উচ্চ স্তরের জমিতে পড়িয়া আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সেগুলি সমকোণ তবে বিভিন্ন আকারের। শিলাখণ্ডগুলি যে একদা সুবৃহৎ ইমারৎ বা নগর-প্রাচীর নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ ম্যালারেটের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সামনের দিকে অগ্রসর হইতেই ঐরূপ অগণিত প্রস্তরখণ্ড তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক স্থানে খানিকটা জমি খনন করিতেই তাঁহার সকল সংশয় ঘুচিয়া গেল:

তিনি বুঝিতে পারিলেন মৃত্তিকায় অর্দ্ধপ্রোথিত সেই প্রস্তরগুলি কোন বিস্মৃত নগরীর বৃহৎ অট্টালিকার সুদৃঢ় বনিয়াদ। সেখান হইতে মৃৎপাত্রের কয়েকটি ভগ্ন খণ্ডও আবিষ্কৃত হইল। দক্ষিণে আরও কিছু দূর গিয়া দেখিলেন, গভীর অরণ্যমধ্যে পড়িয়া আছে কতকগুলি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। একটি ধ্বংসস্তূপের নীচে কারুকার্য্যখচিত একটি বৃহৎ লৌহখণ্ড তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশিওর অনেকখানি জায়গা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও ফটো লইয়া ডাঃ ম্যালারেট সেবার সাইগনে ফিরিয়া যান।

পর বৎসর জানুয়ারী মাসে তিনি অনেক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসহ অশিও যান সেখানকার মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূগর্ভে নিহিত রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার অভিপ্রায়ে। তিনি ইহার বিভিন্ন অংশে প্রায় কুড়িটি খাত খনন করেন। এক স্থানে আড়াই ফুট গর্ত্ত খনন করিতেই মৃত্তিকামিশ্রিত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণকণা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই অংশটি ধরিয়া বরাবর যে ট্রেঞ্চ খনন করা হইয়াছিল সেটি দৈর্ঘ্যে ছয়শত গজ। তাহার প্রত্যেক অংশেরই মাটির ভিতরে অনুরূপ স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। প্রথমে ডাঃ ম্যালারেট মনে করেন, হয়তো ইহা প্রাচীন কালের কোন বিলুপ্ত নদীগর্ভের স্বর্ণখনি হইবে। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রে স্বর্ণকণাগুলি পরীক্ষা করিতেই তাঁহার এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন সেগুলি স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণকালীন সোনার গুঁড়া। সুতরাং এই স্থানে একদা যে স্বর্ণকারপল্লী বিদ্যমান ছিল সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হইলেন। ম্যালারেট আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে তাঁর সহকর্ম্মীদের বলিলেন, "যেখানকার স্বর্ণকারপল্লী ছিল এতখানি জায়গা জুড়িয়া, না জানি সে জনপদ ছিল কত সমৃদ্ধিশালী।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বর্ণকণাগুলি জমির উপরের স্তরে না থাকিয়া আড়াই ফুট নিম্নে নিমজ্জিত হইল কি করিয়া? ইহার উত্তর হইল এই যে, অশিও নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর উক্ত অংশে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে এরূপ একটি ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটে যাহার দরুন সমগ্র অশিও নগরী ভারতবর্ষের নালন্দার ন্যায় ভূগর্ভে ডুবিয়া যায়। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ ডবি বলেন যে, হস্তী পর্ব্বত হইতে মেকং নদের আনীত অপর্য্যাপ্ত পলিমাটি এই দেড় সহস্র বৎসরে সমগ্র অশিওকে আড়াই ফুট পুরু আস্তরণে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অশিওর দক্ষিণাংশেও একই স্তরে বিলুপ্ত অশিওর নাগরিকদের ব্যবহৃত নানারূপ দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়; যথা: কাঁচের পুঁতি, কয়লার টুকরা, ভগ্ন রেকাবী, পানপাত্র, কড়া, খুনতি, ছুরি, শাবল ছোট বড় কৌটা ও বাক্সের ভাঙা টুকরা। এই সমস্ত দ্রব্যের নীচে দৃষ্ট হয় প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহের ভিত্তি। কয়েকটি স্থানে দুই ফুট পরিধির কতকগুলি গলিত কাঠের গুঁড়ির অবশিষ্টাংশও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি যে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহের ভিত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দোচীনের সাধারণ অধিবাসীদের ন্যায় অশিওবাসীরাও অধিকাংশই কাঠের গৃহে বাস করিত।

অশিওর উত্তরাংশে আড়াই ফুট জমির নিম্নেও কোন দ্রব্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় না; তার সমস্তটাই পলিমাটি। ভাড়া করা শ্রমিকরাও প্রথমে মিছামিছি খনন করিতে রাজী হয় নাই। শেষে ডাঃ ম্যালারেট তাহাদের পারিশ্রমিক কিছু বাড়াইয়া দিয়া স্বয়ং শাবল লইয়া তাহাদের সহিত ট্রেঞ্চে অবতরণ করেন। আলগা মাটির মধ্যে একটি কঠিন চকচকে জিনিষ হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি তাহাতে উৎসাহিত হইয়া উঠেন, অল্প খনন করিবার পর দেখা যায় সেটি একটি পূজার তাম্র-পাত্রের ভাঙা অংশবিশেষ। ডাঃ ম্যালারেট তখন শ্রমিকদের মজুরি দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিয়া আরও খনন করিতে তাহাদের আদেশ দেন। সাড়ে সাত ফুট মাটি খুঁড়িবার পর লৌহদণ্ড, লৌহনির্ম্মিত কোন বিস্মৃত যন্ত্রের চাকা, তামার পাত, ওয়াশার, টিনের টুকরা, টিনের বাক্স, লণ্ঠ, ব্রোঞ্জ, লোহার বৃহৎ চাঙর, তাম্র গলাইবার পাত্র এবং তাহার নিকট প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ চুল্লী ইত্যাদি আরও অনেক বিস্ময়কর বস্তু আবিষ্কৃত হয়। সেই বিলুপ্ত নগরীর অধিবাসীরা বিবিধ শিল্পে কিরূপ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল এই জং ধরা ভূ-প্রোথিত বস্তুগুলি তাহারই নিদর্শন। ডাঃ ম্যালারেট এই নব আবিষ্কৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীকে সুদূর প্রাচ্যের ভেনিস নামে অভিহিত করেন। অশিওর অধিকাংশ গৃহ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণার্থে প্রস্তরাদি নিকটবর্ত্তী বোধি পাহাড় হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

অশিওর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের অধিবাসীরা কেন যে প্রস্তরনির্ম্মিত উঁচু থাম বা বৃহৎ গুঁড়ি পুঁতিয়া তাহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিত তাহাও বুঝিতে পারা গিয়াছে। নগরের উক্ত অংশে অনুরূপ গৃহের নিদর্শন অনেক পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ ম্যালারেট এই সমস্ত বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে অশিও সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল। উপকূলস্থ জমি বর্ষাকালে বন্যায় প্লাবিত হইত বলিয়া এই অংশে গৃহাদি অনুরূপ পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হইত। কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানে মেকং নদীর আনীত পলিমাটি দ্বারা অশিওর উপকূল-সীমা ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায়; ফলে দুই হাজার বৎসর পরে

আজ সমুদ্র হইতে অশিওর দূরত্ব ষোল মাইল! অশিওর সমকালে শ্যাম উপসাগর আরও প্রশস্ত ছিল। অনেক প্রাচীন পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উহা মহাসমুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মেকঙের বদ্বীপক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ায় শ্যাম উপসাগরের পূর্ব্ব উপকূল-রেখা ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে আগাইয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিদগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সুবিশাল বদ্বীপের আয়তন বৎসরে আশী গজ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। মালয়ের উত্তরপ্রান্তস্থ কেলানটান জেলা হইতে ইন্দোচীনের দক্ষিণ-ভাগে জিহ্বাকৃতি বদ্বীপের দূরত্ব এখন ২৯৪ মাইল। এই বৃদ্ধি এভাবে চলিতে থাকিলে আরও ছয় হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ ৭৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান শ্যাম উপসাগর দক্ষিণ-চীন সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উত্তর-এশিয়ার উরাল হ্রদের মতই একটি বৃহৎ হ্রদে পরিণত হইবে; এবং মালয় ও ইন্দোচীনের মধ্যে প্রথম স্থলপথ রচিত হইবে।

জাপ-শাসিত ইন্দোচীনে ফরাসীদের উপর নানারূপ আইন-কানুন প্রযুক্ত হওয়ায় ডাঃ ম্যালারেটকে দ্বিতীয় অভিযান অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সাইগনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

ওদিকে, অশিওর জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমিতে আসিয়া কতকগুলি সাহেব মৃত্তিকাগর্ভ হইতে অনেক মূল্যবান জিনিষ আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে—এই গুজবটি নিকটস্থ পল্লীসমূহে প্রবেশ করিয়া নিরক্ষর চাষীদের চঞ্চল করিয়া তোলে। তাহারা মনে করে সেই স্থানে বুঝি স্বর্ণখনি বা গুপ্তধন লুকানো আছে। তাহার পর হইতে দলে দলে চাষীরা ঔৎসুক্য সহকারে শাবল কোদাল ইত্যাদি কাঁধে লইয়া অশিওর দিকে রওনা হয়। অশিওর বক্ষ খনন করিয়া বহু দ্রব্যসামগ্রী তাহারা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নিরক্ষর চাষীরা এই সমস্ত জিনিষের প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য বুঝিতে পারে নাই, এবং এগুলিকে সযত্নে রক্ষাও করে নাই—ফলে বিলুপ্ত নগরী অশিওর অতীত গৌরবের সাক্ষ্যস্বরূপ এই সমস্ত প্রত্নদ্রব্যাদি কিছু কিছু বিনষ্ট হইতে থাকে।

ডাঃ ম্যালারেট অনেক চেষ্টার ফলে জাপানীদের বন্দী-নিবাস হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং পরে জানিতে পারেন যে, অশিওর অতীত গৌরবের বহু অমূল্য নিদর্শন চাষীদের হস্তগত হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে কয়েকজন সহকর্মী সমভিব্যাহারে ঐ সকল পল্লীতে গিয়া চাষীদের নিকট প্রত্নদ্রব্যগুলির খোঁজ লন এবং সেগুলি উপযুক্ত মূল্যে কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তাহারা প্রফুল্লচিত্তে ঝুড়ি বোঝাই করিয়া রকমারি দ্রব্য তাঁহার সম্মুখে আনিয়া হাজির করে। জিনিসগুলির সংখ্যা কুড়ি হাজার। ডাঃ ম্যালারেট সবগুলিই ক্রয় করেন। সেগুলির মধ্যে গিলটি-করা একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায়; ইহা ওজনে পাঁচ পাউণ্ড এবং খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। অশিওতে প্রাপ্ত মূল্যবান্ প্রস্তরখণ্ডসমূহের কারুকার্য্য বিস্ময়কর; কিছুদিন পূর্বে উত্তর-মালয়ে কুয়ালা (টাইপিঙের নিকটবর্ত্তী) সেলিসিঙ পল্লীতে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রত্নদ্রব্যের সহিত তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সেই সঙ্গে প্রাপ্ত অনেকগুলি মৃন্ময় পাত্রের গাত্রস্থ কারুকার্য্যে তংকিঙ ও শ্যামী শিল্পীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের অলঙ্কারাদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। অলঙ্কার-গুলি এত বিভিন্ন প্রকারের যে কোন্‌টি কোন্ অঙ্গের শোভা বৰ্দ্ধন করিত তাহা ইন্দোচীনের আধুনিক অধিবাসীদের পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। সেগুলির অধিকাংশ রৌপ্য-নির্ম্মিত। ইহাদের মধ্যে নাকি অনেকগুলি স্বর্ণালঙ্কারও ছিল; কিন্তু ডাঃ ম্যালারেটের আগমনের পূর্ব্বেই চাষীরা অর্থের লোভে সেগুলি অন্যত্র বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। অলঙ্কারগুলির মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে প্রাচীন রোমের অলঙ্কারের সাদৃশ্য আছে। রোমান ভাস্কর্য্য পদ্ধতিতে নির্ম্মিত কয়েকটি প্রস্তরমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল এক যোদ্ধার মূর্ত্তি। তাহার শিরস্ত্রাণ ও অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদের সহিত পারস্যের সাসানিদদের (২১৮—৬১৯ খ্রীঃ অঃ) পোশাকের বিশেষ পার্থক্য নাই। ইহা হইতে অনায়াসেই প্রমাণিত হয় যে, সুপ্রাচীন বাণিজ্য-কেন্দ্র অশিওর সহিত সুদূর রোম ও পারস্যের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল।

বিষ্ণু ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর এমন কয়েকটি প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে যেগুলির নিম্নভাগে প্রস্তর ফলকে সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ। ডাঃ ডবি সেগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার প্রত্যেকটি গুপ্ত যুগের (৩০০—৫০০ খ্রীঃ অঃ) সমসাময়িক। ভারতের সংস্কৃতি তথা হিন্দুধর্ম্ম সুদূরপ্রাচ্যের এই অঞ্চলে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইহা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। চীন দেশের হান যুগে (১০০—২০০ খ্রীঃ অঃ) নির্ম্মিত একখানি কারুকার্য্য-খচিত রূপার ফ্রেমে আঁটা দর্পণও আবিষ্কৃত হয়। ইহা ছাড়া পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ-ভারতের শিল্পকলা ভাস্কর্য্য ইত্যাদির বহু নিদর্শন সেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কোন্ অমূল্য পণ্যদ্রব্যের সন্ধানে সুদূর রোম, পারস্য, পেকিং হইতে বণিকেরা অশিওতে আসিয়া বাণিজ্যপোত নোঙর করিত তাহা আজও সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। প্রস্তরে খোদিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ছাড়া আর কোন উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ডাঃ ম্যালারেট বলেন,

অশিওতে সম্ভবতঃ এমন কোন মূল্যবান্ বস্তু পাওয়া যাইত যাহার লোভে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা অশিও বন্দরে আসিতেন। ইন্দোচীনের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণ-ইন্দোচীনে মাছরাঙা জাতীয় এক প্রকার পাখীর বিচিত্র পুচ্ছ পাওয়া যাইত। উহা এক মূল্যবান পণ্যসামগ্রীরূপে সমগ্র পৃথিবীতে রপ্তানী হইত। চীনের হান আমলে রচিত একখানি কাব্য (তিয়েন নিও) হইতে জানিতে পারা যায় যে, "কোন এক-জন খণ্ড নাগরিক দক্ষিণ-ইন্দোচীন হইতে আনীত দুটি বিচিত্র বর্ণের নান-পে-হঙ পক্ষী মহারাজাকে প্রদান করিয়া তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন।" অধুনা উক্ত পক্ষীর বংশ লোপ পাইয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব ঐ পক্ষীর পুচ্ছ ছিল অশিওর অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় পণ্যসামগ্রী।

এখন উক্ত বিলুপ্ত নগরীটির নাম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের চাষীরা উহাকে 'অশিও' বলিয়া থাকে। এই 'অশিও' শব্দের যে কি অর্থ সে সম্বন্ধে গবেষণা হওয়া উচিত। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে যে ভারতীয়দের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। হয়তো তখন ইহার অন্য নাম ছিল। কালক্রমে ইহা অশিও নামে পরিচিত হইয়া উঠে। অশিওর বুকে বিভিন্ন রাজ্য ভাঙা-গড়ার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

মালয়ের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত কেলানটান জেলাটি বর্ত্তমান অশিও হইতে ২৯৪ মাইল দূরে। দক্ষিণ-ইন্দো-চীনের সহিত প্রাচীন মালয়ের যে কিরূপ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহা পুরাতত্ত্বানুরাগীরা অবগত আছেন। প্রাচীন ইন্দোচীন সম্পর্কে অনেক খবর আমরা জানতে পারি কেলানটানের রূপকথাসমূহ হইতে। কিন্তু অশিও নামক কোন নগরীর নাম তাহাতে পাওয়া যায় না। তবে কেলানটানের জনৈক সমর-নিপুণ নৃপতির দিগ্বিজয় কাহিনীতে অশ্বপুর নামক এক নগরের উল্লেখ আছে। কাহিনীটি এই—"সুবিস্তীর্ণ পূর্ব্বসমুদ্রের (শ্যাম উপসাগর) অপর তীরে অবস্থিত আনসেই রাজ্যের নৃপতি একদা তাঁহার সাগরতীরে নির্ম্মিত বিচিত্র নগরী 'অশ্বপুর' দর্শনার্থে কেলানটানাধিপতি মহারাজ সুপর্ব্বকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহারাজ সুপর্ব্ব রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় নিজে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে স্বীয় অনুজ সুমিত্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশ্বপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তুংকু সুমিত্র রাজ-সভায় বলিয়াছিলেন যে, অশ্বপুরের ন্যায় অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যশালী নগরী তিনি আর কোথাও দেখেন নাই,...অশ্বপুরের তিন দিক সু-উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল,...নাগরিকদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। তাহাদের গৃহগুলি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ছিল। নগরের পূর্ব্বাংশে রাজপ্রাসাদ... প্রাসাদের সুপ্রশস্ত কক্ষগুলি স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যে খচিত আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। রাজপ্রাসাদের সু-উচ্চ শিখর হইতে সমগ্র বন্দরটি দৃষ্টিগোচর হইত। বন্দরে সর্ব্বদা শত শত বাণিজ্যপোত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে, মহার্ঘ্য পণ্যসামগ্রী বহন করিয়া আনিত। সে রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা অসামান্যা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। সকল বিষয়েই তাহারা পুরুষদের সমকক্ষ।" বলা বাহুল্য, তুংকু সুমিত্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় রাজদত্ত বিবিধ উপঢৌকন সহ একটি পরমাসুন্দরী রাজ দুহিতাকেও লইয়া আসিয়াছিলেন।

মালয়ের প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ডাঃ ডবি বলেন, সম্ভবতঃ এই 'অশিও' শব্দটি সেই ঐশ্বর্য্যশালী অশ্বপুরেরই অপভ্রংশ। অবশ্য কেবল রূপকথার নজিরের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন অশ্বপুর ও বর্ত্তমান অশিওকে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা সমীচীন নহে।

তবে 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ'—রূপকথা কিংবদন্তী ইত্যাদি সব সময় একেবারে অমূলক নাও হইতে পারে। ভবিষ্যতে প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণায় একথা প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব নয় যে, ভূগর্ভে আবিষ্কৃত অশিও সেই সেই সমৃদ্ধিশালী অশ্বপুরেরই ধ্বংসাবশেষ।

সেকালের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো রচনায় অন্যান্য দেশের মতই আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখাগুলি ভারতবর্ষে যে সকল কাজকারবার করিয়া থাকে তাহা ইংলণ্ড ও মার্কিন মুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যৎসামান্য হইলেও আমাদের স্বদেশী আবেষ্টনীতে ইহাকে একেবারে নগণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করা চলে না। "চেক্" নামধারী যে বস্তুটির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ আজ আমরা পাইয়াছি, তাহারই দৌলতে টাকা-পয়সার লেনদেন ব্যাপারে আজ আর আমরা অযথা সময় নষ্ট বা চিন্তা-ভাবনা করি না। লক্ষ লক্ষ টাকার দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ যদি কাঁচা টাকায় করিতে হইত তবে কত সময় ইহার পিছনে নষ্ট হইয়া যাইত। তাহার উপর ছিল ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা। জাল নোট বা অচল টাকাও এই সকল লেনদেনে স্থান পাইত। চেকের অবিদ্যমানতায় সেকালে দেনাপাওনার কাজ ছিল এক অভিনব সতর্কতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্র।

সেকালের এই সব নিরর্থক ভাবনা আজ আর আমাদের ভাবাইয়া তুলে না। কোটি কোটি টাকার দেনা-পাওনা একখানি চেকপত্রে মিটিয়া যায়। শুধু কি তাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও আজ আমরা খাজাঞ্চীর কাজকর্ম্মগুলি নিজেদের ঘাড় হইতে সরাইয়া ব্যাঙ্কের উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি। মুদি, দর্জ্জি, ডাক্তার-বৈদ্যের মাসিক পাওনা-গুলি পর্য্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ব্যাঙ্কের উপর চেক্ কাটিয়া পরিশোধ করিয়া থাকি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, এমন কি বিবাহ-বাসরে বা বৌভাতে বর-কনেকে লাল কালিতে লেখা চেক্ দান করিয়া আশীর্ব্বাদ-পর্ব্বও সমাধান করিয়া থাকি। হয়ত আগামী দিনে চেকের প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রেজকির ব্যবহার আরও কমিয়া যাইবে। তখন পূজার পার্ব্বণী, বাজার-খরচ, মেথর-মুদ্দফরাস প্রভৃতির পাওনাগুলিও চেক্ কাটিয়া মিটান যাইবে। তখন হয়তো "আজ নগদ কাল ধার" জাতীয় প্রাচীরপত্রগুলির সতর্কতা-সূচক ঘোষণার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। অভিনব কথা নয় কি?

একালের বিদেশী শব্দ "ব্যাঙ্ক" কথাটির প্রচলন না থাকিলেও সেকালে আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। আলিবর্দ্দী খাঁর আমলের জগৎশেঠ প্রমুখ ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় মুঘল-পাঠান নবাব-বাদশাদের ঠাট বজায় থাকিত। সে ত ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব পদ্ধতিতে গঠিত বর্ত্তমানের ব্যাঙ্কিং প্রতি-ষ্ঠানগুলির সূত্রপাত হয় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এই প্রথায় সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে "হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিমি-টেড"কেই অগ্রণী বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাহার পর বহু প্রতিষ্ঠানের অভ্যুত্থান ও পতনের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লেখা রহিল। যাহা স্পষ্ট ভাষায় লেখা রহিল না আর যাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল প্রচুর তাহা হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সকল অধুনালুপ্ত অক্লান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা আর অভিজ্ঞতা, যাহার ফলে পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় মূলধনে ও তত্ত্বাবধানে বিরাট বিরাট ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা সম্ভব হইল।

সেকালের ও একালের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কি বিরাট প্রভেদ? কর্ম্মধারায়, দ্রব্যসম্ভারে এমন কি কর্ম্মচারীবৃন্দের শিক্ষাদীক্ষায়ও কি বিপুল পার্থক্য? সমস্ত জিনিসটাই এমনভাবে বদলাইয়া গিয়াছে যে দুই বা আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বেকার ব্যাঙ্কসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি আজ জীবিত থাকিতেন তবে হয়ত তাঁহার পক্ষে আধুনিক ব্যাঙ্কের কার্য্য বুঝিয়া লওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়া-ইত। ঠিক এমনই ভাবে বিংশ শতাব্দীর একজন ব্যাঙ্ক কর্ম্মীর পক্ষে উর্দ্ধতন দুই শতাব্দীর আর একজন অগ্র-গামীকে সমশ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইত।

জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ আমানত রাখা এবং ঐ টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধ করা ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কার্য্য। সেকালের তুলনায় টাকা-পয়সার রূপই কি ভাবে না পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? হিন্দু বা মুসলমান রাজাদের মূর্ত্তি-অঙ্কিত সোনার মোহর বহুকাল পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বর্ণকারের দোকানে অলঙ্কার গড়াইবার কার্য্যে কেবলমাত্র তাহাদের দর্শন মিলে। আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক আর্থিক লেনদেনের কাজ হইতে তাহারা অবসর গ্রহণ করিয়াছে। হাজার, দশ হাজার টাকার নোটগুলি পর্য্যন্ত আজ অকেজো হাতিয়ারে পরিণত। ব্যাঙ্কের বড় বড় লোহার সিন্দুকগুলি স্বর্ণমুদ্রার ঔজ্জ্বল্যে এখন আর ঝলমল করে না সেগুলি তাই যেন আজকাল একটু স্তিমিত

নিষ্প্রভ। বেশীর ভাগ নোটই এখন দশ, পাঁচ টাকার আর সবগুলি এক শত টাকার নোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমন কি, রূপার টাকাগুলিও আজ ইতিহাসের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কের ইমারতগুলি তাই আজ আর টাকার মিঠেকড়া আওয়াজে গুঞ্জরিত হয় না। টাকাগুলি নাকি এখন আর বাজে না—এগুলি একেবারেই বাজে।

সেকালে ব্যাঙ্কগুলির নজর ছিল প্রধানতঃ নোট ছাপাইয়া বাজারে বাহির করিবার দিকে। নগদ টাকা জমা রাখিতে বা আমানতী টাকা উঠাইয়া লইতে তখনকার দিনে আমানতকারীকে সশরীরে ব্যাঙ্কের দরজায় হাজির হইতে হইত। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটে এক প্রচারপত্র জারী করা হয়, তাহাতে ঘোষণা করা হয় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণ আবেদন করিলে চেকপত্র দেওয়া হইবে। আমানতকারী স্বাক্ষরিত চেকপত্র দ্বারা আপন ইচ্ছানুযায়ী ব্যাঙ্কের মারফত টাকা লেনদেন করিতে পারিবেন। চেকের সহিত আজ আমরা এমন ভাবে পরিচিত যে উহার বিশদ বিবরণ শুনিবার জন্য জনসাধারণ অপেক্ষা করে না; তাই এখন আর ইহার বিজ্ঞাপনে কোন সার্থকতা নাই। তখনকার দিনে যে কেহ খুশীমত ব্যাঙ্কের সহিত চলতি আমানতী হিসাব খুলিতে পারিত। এখনকার ন্যায় সুপারিশপত্রের প্রয়োজন হইত না। সেগুলি সুখের দিন ছিল বৈকি। চেকের মারফত জাল জুয়াচুরি এদেশবাসী তখনও শিখিয়া উঠে নাই, তাই সতর্কতার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না।

তখনকার দিনে এক জায়গা হইতে অন্যত্র টাকা-পয়সা পাঠাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। বাক্স বোঝাই করিয়া সিং, সরদার বরকন্দাজের সাহায্যে সরকার অথবা জমিদার তাহার খাজনা আদায়ী অর্থ স্থানান্তরিত করিত। জনসাধারণ কাপড়ের আঁচলে করিয়া বা কোমরে বাঁধিয়া অর্থ এধার-ওধার করিত। তবুও চুরি-ডাকাতিতে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। ক্রমে দেখা দিল "হুণ্ডি"। বিশ্বাসী কারবারীর স্থানীয় গদীতে টাকা জমা রাখিয়া অন্য স্থানীয় আড়ত হইতে অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইত। অবশ্য পারিশ্রমিক হিসাবে কারবারীকে বেশ কিছু মুনাফা বা বাট্টা দিতে হইত। ক্রমে ক্রমে দেখা দিল ব্যাঙ্কের মারফত টাকা প্রেরণের রীতি। নামমাত্র বাট্টার বিনিময়ে আজ আমরা কলিকাতা হইতে বোম্বাই টাকা পাঠাইতে পারি। জরুরী বোধে তারেও অর্থ প্রেরণ করা চলে। এখনও যে কয়খানি "হুণ্ডী" আমাদের নজরে পড়ে, কালক্রমে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সেকালে আমানতকারীরা সাময়িকভাবে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিতে পারিত না। এখন যেমন ঠেকা-বেঠেকায় ক্ষেত্রবিশেষে আমানতের তুলনায় অধিক অর্থের চেক কাটিয়া পাওনাদারের দাবি মিটান যায়, ব্যাঙ্কের পাওনা পরে শোধ করিলেও চলে—তখনকার দিনে এমনটি করা যাইত না। উপযুক্ত ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করা যাইত, কিন্তু কোনক্রমেই ঐ কর্জ্জের মেয়াদ চার মাসের অধিক হইত না।

আজকাল সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের কর্জ্জের মেয়াদ থাকে প্রথমতঃ এক বৎসরের, তার পর পুনঃপ্রবর্ত্তন দ্বারা ঐ কর্জ্জকেই বছরের পর বছর ধরিয়া জীয়াইয়া রাখা চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় ধনসম্পত্তি বলিয়া যেসব জিনিসকে গণ্য করা হইত তাহার পরিধিও বর্ত্তমানে নানাদিকে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তখনকার দিনে শেয়ার-বাজারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোম্পানীর আইন বা অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব-পদ্ধতি তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং কোম্পানীর শেয়ার গচ্ছিত রাখিয়া বর্ত্তমানে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক যে অর্থ খাটাইয়া থাকে তাহার সুবিধা তখন ছিল না। সেদিনের ব্যাঙ্কগুলির প্রধান গ্রাহক ছিলেন সরকার। প্রয়োজনবোধে সরকারী ঋণে অর্থ নিয়োজিত করিয়া ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের মুনাফা আহরণ করিত।

তখনকার দিনে সুদের হার ছিল বর্ত্তমানের তুলনায় মারাত্মক রকম চড়া। জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় এই প্রতিষ্ঠানটি এক শত টাকা কর্জ্জের উপর বার্ষিক শতকরা চব্বিশ টাকা সুদ আদায় করিত। উহার ঊর্দ্ধে ব্যাঙ্কের সুদের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা মাত্র। তখন এদেশে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পত্তন হয় নাই। সুদেরও তখন কোন মাপকাঠি ছিল না। আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা ধার্য্য হওয়ায় তালিকাভুক্ত (সিডিউল্ড) ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের নিকট হইতে শতকরা ৪৲ অথবা ৫৲ টাকার বেশী সুদ আদায় করিতে সাহসী হয় না। আমানতের উপরও তখন বেশ কিছু মোটা সুদ পাওয়া যাইত। অনেক ক্ষেত্রেই উহার পরিমাণ ছিল শতকরা আট হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত। আজ সেই আমানতের উপরই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্ক বার্ষিক শতকরা ১৲ টাকা মাত্র অথবা ১৷৹ টাকার বেশী সুদ দিতে রাজী হয় না।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যাপারে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ যেন পৃথিবীর দূরত্ব সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কালাপানি পার

হইতে আজ আর আমাদের মাসাবধি অপেক্ষা করিতে হয় না। কলিকাতা বোম্বাই তো ঘরের পাশে বলিলেই হয়।

বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা দিকে অর্থনৈতিক সুবিধাও ঘটিয়াছে। এখন প্রয়োজন বোধে পৃথিবীর যে-কোন উল্লেখযোগ্য শহর হইতে পৃথিবীর অন্য যে-কোন শহরে টাকা-পয়সা পাঠানো যাইতে পারে। নবাবী আমলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় জিনিসটা এত সহজ ছিল না। তখন তার-বেতারের বালাই ছিল না। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজগুলি পণ্য বোঝাই করিয়া বছরের প্রথম দিকে সমুদ্র-যাত্রা করিত। জুলাই, আগষ্ট মাস নাগাদ এই সকল জাহাজ ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করিত। বিলাতী মাল খালাস করিয়া ভারতের সোনা লুণ্ঠন করিয়া জাহাজ-গুলি আবার বর্ষশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। বছরের এই শেষ সময়টিতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের লেনদেন হইত। তাহার জন্য কলিকাতা গেজেটে রীতিমত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত।

সেকালে ভারতবর্ষে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না, সুতরাং ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরাই নিজেদের নিরা-পত্তার ব্যবস্থা করিত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সমগ্র মূলধনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাঁচা টাকায় জমা রাখিত। বর্ত্তমানের তুলনায় উহা ছিল নিতান্ত অনাবশ্যক। বিংশ শতাব্দীর ব্যাঙ্কগুলি আমানতের শতকরা দশ-পনর ভাগ অর্থ নগদ টাকায় জমা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ চালাইয়া যাইতে অসুবিধা ভোগ করে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে নগদ টাকার পরিমাণ আরও কমিয়া গিয়াছে। সেখানে আমানতের শতকরা আট ভাগ অর্থ নগদ টাকায় রাখিলে যথেষ্ট মনে করা যায়।

আবার অন্য কতকগুলি দিকে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়-পদ্ধতির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রগতি পরিলক্ষিত হয় না। আজকাল ব্যাঙ্ক বলিতেই আমরা ধারণা করিয়া থাকি, সেখানে থাকিবে বড় বড় হলঘর, চারিদিকে বড় বড় থাম, পিতলের উজ্জল খিলান বেষ্টনী, ভাল ভাল চেয়ার-টেবিল, বিজলিবাতি ও পাখা-আমরা শিখি নাই যে ব্যাঙ্কের সত্যিকারের নিরাপত্তা নির্ভর করে তাহার ব্যবসায়-পদ্ধতির উপর—বাহিরের চাক-চিক্যের উপর আর্থিক উন্নতি একেবারেই নির্ভর করে না। কিন্তু জনসাধারণের মন ভুলাইবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলি এই ধরণের আসবাবপত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যয়ভার বহন করা প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রথম কয়েক বৎসর আমানতের টাকা ভাঙ্গিয়া ঠাট বজায় রাখা কায়ক্লেশে সম্ভব হইলেও পরিণামে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কারবার বন্ধ করিতে হয়।

আধুনিক কায়দায় সদ্য-উদ্বোধিত একটি ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক-শাখার পক্ষে এদেশে আজকাল চাই—

ম্যানেজার বা এজেণ্ট	১ জন
একাউণ্টেণ্ট্	১
কেরানী	২
খাজাঞ্চী	১
ঐ সহকারী	১
প্রহরী	১
চাপরাসী	৪ জন

এই সকল কর্ম্মচারীর বেতন ন্যূনকল্পে মাসিক একুনে ৮৫০৲ টাকা—ইহা ছাড়া আছে বাড়ীভাড়া, কাগজপত্র, বিজলি খরচ ইত্যাদি, ইত্যাদি। কমবেশী মাসিক খরচ বাবদ ১০০০৲ টাকা ব্যয়ভার প্রতিটি শাখাকে বহন করিতে হয়। এই ব্যয় নির্ব্বাহ করা নূতন নূতন শাখার পক্ষে কষ্টকর। মনে রাখা উচিত আমাদের দেশ গরীব। বাহিরের আদব-কায়দায় অযথা অর্থ ব্যয় না করিয়া যাহাতে অল্প খরচে ব্যবসায় চালানো যায় তাহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে যখন একজন এজেণ্ট, একজন কেরানী আর একজন খাজাঞ্চী দ্বারা একটি ক্ষুদ্রায়তন শাখা পরিচালনা করা যায়, তখন আমাদের দেশেই বা কেন উহা সম্ভবপর হইবে না?

বাহিরের চাকচিক্য যদিও আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি ওদেশের কর্ম্মকুশলতা আমরা আয়ত্ত করিতে পারি নাই। ইংলণ্ড বা আমেরিকায় চেক দাখিল করিয়া পাঁচ-সাত মিনিটে টাকা তোলা যায়; আমাদের দেশে কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া, দালানের কড়িকাঠ গুনিয়াও টাকা পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ছোঁয়াচ আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মপদ্ধতিতে তেমনভাবে লাগে নাই। টাইপরাইটার মেশিন ব্যবহার সত্ত্বেও প্রেসকপি আমরা ছাড়ি নাই। হাতে লেখা হিসাবের খাতা, ব্যাঙ্ক পাসবহি আজও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করিতেছি। মোমের বাতি, গালার শিল-মোহরের মোহ আজও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। তাই ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা ব্যাপারে আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। বিদেশী প্রথায় অধিকতর যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করিলে ব্যবসায়ের অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। কাগজপত্রের অপচয়ও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে।

. বর্ত্তমানের মুদ্রাস্ফীতির চাপে জীবনযাপনের ব্যয়ভার এখন বহুগুণ বাড়িয়া যাওয়ায় ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীদের বেতনের হার বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতিরিক্ত বেতনের আকর্ষণে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে আজকাল শিক্ষিত যুবকবৃন্দ ধাবিত হইতেছে। ব্যাঙ্কের চাকুরী এখন আর অল্প-শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মস্থল বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

স্বাধীন ভারতে যে নবজীবনের সূত্রপাত হইবে তাহাতে অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ও উন্নতিলাভ করিবে। অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবে। বৈদেশিক বিনিময়-কার্য্য একমাত্র বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিরই একচেটিয়া ব্যবসায় থাকিবে না। যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আমরা ভারতবাসী এদিকেও আমাদের কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ পাইব। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে কেবলমাত্র বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরীর সুবিধা আদায় করিয়া ব্যাঙ্ককর্ম্মীর অবসর গ্রহণ করিলে চলিবে না। জনসাধারণের সেবাই ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানতম কর্ম্ম। সে আদর্শ কর্ম্মে রূপায়িত করিতে যে মনোযোগের প্রয়োজন তাহাতে শৈথিল্য প্রকাশ করিলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায় দেখা দিবে।

রাজবৈদ্য জীবক

শ্রীসুধাময়ী সেনগুপ্ত

ভগবান বুদ্ধ যখন মগধে তাঁহার করুণা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিতেছিলেন, রাজা বিম্বিসার তখন মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বিম্বিসার বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন, বৌদ্ধ সঙ্ঘে তাঁহার বিশেষ যাতায়াত ছিল। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রাজ-পরিবারেও বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া স্বাভাবিক।

রাজকুমার অভয় একদা অনুচরগণসহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। শহরের প্রান্তদেশে এক নির্জ্জন স্থান দিয়া যাইতে যাইতে সহসা এক দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, এক স্থানে অনেকগুলি কাক কোন একটি বস্তুকে ঘিরিয়া কলরব করিতেছে। তিনি অনুচরকে বিষয়টি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে বলিলেন। অনুচরটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটি সুন্দর সদ্যোজাত শিশুকে কেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কাকগুলি মাংস ভক্ষণের আশায় তাহারই চতুর্দ্দিকে কলরব করিতেছে। কুমার শিশু-টিকে তুলিয়া আনিতে বলিলেন। এবং আনিলে দেখিলেন শিশুটি তখনও জীবিত আছে, কাকেরা তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই এবং যত্ন করিলে শিশুটি বাঁচিয়া যাইতে পারে। অসহায় শিশুটিকে দেখিয়া তাঁহার মন করুণায় পূর্ণ হইল, তিনি শিশুটিকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া জীবন লাভ করিল বলিয়া শিশুটির নাম হইল জীবক। এই জীবকই উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়া পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে 'জীবক কোমার ভচ্চ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কুমার কর্ত্তৃক লালিতপালিত হওয়ায় তাঁহাকে 'কুমারভক্ত' বিশেষণে অভিহিত করা হইত।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন বৈশালী নগরী ধনে জনে সুসমৃদ্ধ ছিল। সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকশ্রেণী, প্রশস্ত রাজপথ, মনোরম উদ্যান প্রভৃতির শোভা সকলের নয়নমন পরিতৃপ্ত ও আনন্দে মুগ্ধ করিত। এই নগরীর সমৃদ্ধির খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। অপূর্ব্ব সুন্দরী নটী আম্রপালীর রূপগুণের খ্যাতিও বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল।

বৈশালীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহ সর্ব্বদাই বৈশালীর সমকক্ষতা লাভের বা বৈশালীকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টায় রত ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে রাজ-গৃহও বিশেষ সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছিল। বৈশালীর সহিত পাল্লা দিবার জন্য রাজগৃহ-রাজও শালবতী নামে এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ও সুশিক্ষিতা নটীকে আনয়ন করিলেন।

কালক্রমে শালবতী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন, কিন্তু তাঁহার জীবিকা অর্জ্জনে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া এই সংবাদ গোপন রাখিলেন। যথাসময়ে একটি সুন্দর পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু নিষ্ঠুরা জননী একটি সাজির মধ্যে করিয়া সন্তানটিকে কোন নির্জ্জন স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য দাসীকে আদেশ করিলেন। এই পরিত্যক্ত শিশুই জীবক। কাহারও কাহারও মতে রাজকুমারই জীবকের পিতা।

রাজকুমার কর্ত্তৃক সযত্নে পালিত হইয়া ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত

হইলে জীবক চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলা গমন করিলেন। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দূর-দূরান্ত হইতেও বহু রাজকুমার, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য গমন করিতেন। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিও বিশেষ মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হইত। বৌদ্ধ জাতকের বহু গল্প তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণে পূর্ণ। এই সকল জাতকের গল্প হইতেই তথাকার ছাত্রজীবনের সুন্দর সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ত্রি-বেদ, ধনুর্বিদ্যা, শস্ত্র-বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যার সবগুলিই এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। জীবক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকের নিকট সাত বৎসর ধরিয়া সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও অধিগত করিয়া ফেলিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পরীক্ষা দিতে হইল। তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে একটি কুঠার দিয়া আদেশ করিলেন, তক্ষশিলার সমীপবর্ত্তী কয়েক যোজন স্থান অনুসন্ধান করিয়া এমন কোন একটি বৃক্ষলতা বা মূল লইয়া আসিতে হইবে, যাহা মানবের কোন রোগ-প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করা যাইবে না। জীবক সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও এমন একটিও বৃক্ষলতা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না যাহা মানবের কোনই কাজে লাগে না। তিনি বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপককে তাঁহার বিফলতার কথা জানাইলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল, হয়ত তাঁহার শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হয় নাই! কিন্তু অধ্যাপক তাঁহার এই উত্তরে বিশেষ প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে প্রভূত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বৎস তোমার শিক্ষা সুসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তুমি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে পাথেয়-স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

গুরুর আশীর্ব্বাদ ও পাথেয় সম্বল করিয়া জীবক গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। তখনকার দিনে যানবাহনের বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না, পথও ছিল দুর্গম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদব্রজেই যাতায়াত করিতে হইত। তক্ষশিলা হইতে রাজগৃহের দূরত্বও নিতান্ত কম নয়। কাজেই পথি-মধ্যেই তাঁহার গুরুদত্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল। সুতরাং কিছু উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় জীবক কোন এক নগরে উপস্থিত হইয়া আপনাকে চিকিৎসক বলিয়া প্রচার করিলেন। সেই নগরেই এক মহাধনবান শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য তাঁহারা জীবককে আহ্বান করিলেন। জীবক তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ গলিত ঘৃত তাঁহার নাসামধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। গলিত ঘৃত নাসিকার মধ্য দিয়া মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিতেই ঐ রমণী তাহা মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া একজন দাসীকে ঐ ঘৃত তুলিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। এই দৃশ্য দর্শনে জীবকের সন্দেহ জন্মিল যে, ঐ নারী অবশ্যই নীচ ও কৃপণস্বভাবা হইবেন, সুতরাং তিনি সত্বর তাঁহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু উক্ত রমণী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া জানাইলেন যে, তিনি নীচমনা নহেন, পরন্তু একজন সুগৃহিণী, এবং প্রদীপ জ্বালানো অথবা অনুরূপ কোন কাজে লাগিবে বলিয়া ঐ ঘৃত তুলিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর ধীরে ধীরে ঐ মহিলা সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া চিকিৎসককে পুরস্কৃত করিলেন। উপরন্তু তাঁহার স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধূ প্রত্যেকে চারি সহস্র করিয়া স্বর্ণমুদ্রা দিলেন, তদুপরি তাঁহার স্বামী একটি ক্রীতদাস, একটি ক্রীতদাসী ও অশ্বযুগলসহ একটি শকটও উপহার প্রদান করিলেন।

জীবক রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত শ্রেষ্ঠীগৃহে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ রাজকুমার অভয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। কুমার উহা গ্রহণ না করিয়া সমুদয় অর্থ তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে রাজগৃহেই বসবাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কিছুদিন পরে রাজা বিম্বিসার একবার কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে জীবক তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করায়, রাজার অনুরোধে তিনি রাজবৈদ্যের পদ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে চিকিৎসকরূপে জীবকের খ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার অপূর্ব্ব চিকিৎসার গুণে অনেক কঠিন রোগীও সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। শিশু-চিকিৎসায় নৈপুণ্যের জন্যও তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল।

এক সময় রাজগৃহের এক ধনী শ্রেষ্ঠী কঠিন শিরঃপীড়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়লেন। নগরের সকল খ্যাত-নামা চিকিৎসকের চেষ্টায়ও পীড়া উপশম না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। ক্রমে সকল চিকিৎসকই তাঁহার আরোগ্যের আশা ত্যাগ করিলেন, অবশেষে শ্রেষ্ঠীর আত্মীয়স্বজন শেষ চেষ্টাস্বরূপ রাজবৈদ্যের শরণাপন্ন হইলেন, রাজাও জীবককে চিকিৎসা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। জীবক আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার নিজের পারিশ্রমিকস্বরূপ লক্ষ মুদ্রা ও রাজার প্রণামীস্বরূপ সমপরিমাণ মুদ্রা অগ্রিম দাবী করিয়া রোগীকে প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি প্রথমে এক

পাশে, তৎপরে অপর পার্শ্বে এবং অবশেষে চিৎ হইয়া এমনিভাবে প্রত্যেক অবস্থায় সাত মাস করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে পারিবেন কিনা। রোগী রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া উপশমের আশায় যে-কোন নিয়ম মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন, সুতরাং এই বিধানেও সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। জীবক তখন তাঁহাকে শয্যার সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া মস্তকের তালুতে অস্ত্রোপচার করিয়া মস্তিষ্কের মধ্য হইতে দুইটি পোকা বাহির করিয়া ফেলিয়া ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিলেন। এই পোকা দুইটিই শ্রেষ্ঠীর জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এত প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে চিকিৎসা-পদ্ধতি কতদূর উন্নত ছিল, এই কাহিনী হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

পোকা দুইটিকে বাহির করিবার পর হইতেই ধীরে ধীরে উক্ত শ্রেষ্ঠীর পীড়ার উপশম হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু শেষে এমন হইল যে, তিনি আর ধৈর্য্য ধরিয়া উপরোক্ত প্রত্যেক অবস্থায় সাত মাস করিয়া থাকিতে পারেন না। তখন জীবক তাহাকে সাত দিন করিয়া এক অবস্থায় থাকিতে বলিলেন। রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে পর তিনি তাহাকে কেন ঐরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া এক এক অবস্থায় থাকিতে বলিয়াছিলেন এবং ঐ নিয়ম পালন না করা সত্ত্বেও রোগী কিরূপে সুস্থ হইলেন, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। রাজবৈদ্য বলিলেন, বস্তুতঃ রোগীর এক সপ্তাহ করিয়াই এক এক অবস্থায় থাকার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গোড়ায় সাত মাস কালের কথা না বলিলে তাঁহার ঐ এক সপ্তাহও ধৈর্য্যধারণ করা সম্ভব হইত না, সেইজন্যই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই অপূর্ব্ব চিকিৎসার ফলে জীবকের খ্যাতি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। রাজা বিম্বিসারের অনুরোধক্রমে তিনি ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘস্থ ভিক্ষুকগণেরও প্রয়োজনমত চিকিৎসা করিতেন। ক্রমে তিনি বুদ্ধদেবের পরম ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। জীবক-প্রদত্ত আম্রবনে ভগবান্ বুদ্ধ মাঝে মাঝে বাস করিতেন। একবার ভগবান্ বুদ্ধ কোষ্ঠকাঠিন্যে কষ্ট পাইতেছিলেন। বিরেচক গ্রহণে পীড়ার উপশম ঘটিত, কিন্তু বিরেচক গ্রহণ করার মত শারীরিক অবস্থা তাঁহার ছিল না। এ হেন সঙ্কটকালে জীবককে আহ্বান করা হইল। সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জীবক ত্বরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একটি সুন্দর প্রস্ফুটিত পদ্ম ভগবান বুদ্ধের চরণে প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন। পদ্মটি দেখিয়া বুদ্ধ বিশেষ প্রীত হইলেন ও তাহা আঘ্রাণ করিলেন। অতঃপর কিয়ৎকাল নানারূপ আলাপ আলোচনা করিতে করিতেই তিনি সবিস্ময়ে অনুভব করিলেন যে কোনরূপ ঔষধ সেবন না করা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে একটু একটু করিয়া সুস্থ বোধ করিতেছেন। জীবককে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি জানাইলেন যে, ঐ পদ্মের মধ্যেই ঔষধ ছিল, ঘ্রাণের সঙ্গে তাহা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কার্য্যকরী হইয়াছে।

রাজা বিম্বিসারের পারিবারিক চিকিৎসা এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিক্ষুদের পরিচর্য্যা করিয়া জীবক অপর কাহারও চিকিৎসা করার অবসর পাইতেন না। অথচ কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা তাহাদের সমুদয় ধনসম্পত্তির বিনিময়েও জীবকের সাহায্য প্রার্থনা করিত। বিশেষতঃ এই সময় মগধে কুষ্ঠ,শোথ, যক্ষ্মা, গণ্ড ও অপস্মার এই পাঁচটি রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই সকল রোগী তাহাদের চিকিৎসা করার জন্য জীবককে বিশেষ অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও তিনি সময়াভাব হেতু তাহাদের প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তাহারা মনে করিল যে, জীবক ভিক্ষুদের চিকিৎসা করার জন্যই ত অপর কাহারও চিকিৎসা করার সময় পান না, অতএব ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করিলেই অপর ভিক্ষুগণ তাহাদের শুশ্রূষা করিবে এবং জীবকও চিকিৎসা করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করিতে লাগিল এবং এই উপায়ে রোগমুক্ত হইয়া পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। একবার দৈবক্রমে এইরূপ একজন গৃহপ্রত্যাগত ব্যক্তির সহিত জীবকের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া গেল। তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐ ব্যক্তি এবং অনুরূপ আরও অনেকে স্বার্থসিদ্ধির আশায় সঙ্ঘে যোগদান করে এবং রোগ মুক্তির পরেই সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে। এই বিষয়টি তিনি বুদ্ধের গোচরে আনিলেন এবং অতঃপর বুদ্ধ এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন যে, ঐরূপ কোন প্রকার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আর সঙ্ঘে গ্রহণ করা হইবে না। সঙ্ঘে প্রবেশের পূর্ব্বেই প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তাহার ঐরূপ কোন রোগ আছে কিনা, থাকিলে তাহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইবে না। রোগ গোপন করিয়া কেহ সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে তাহার প্রব্রজ্যা অসিদ্ধ হইবে এবং তাহাকে বহিষ্কৃত করা হইবে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বে তিনি চুন্দ কম্মারপুত্র নামে এক গৃহী কর্ত্তৃক প্রদত্ত শূকর মাংস ভক্ষণ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ও জীবক তাঁহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু দেহত্যাগের উপলক্ষ্য-স্বরূপই এই ব্যাধি বুদ্ধকে আশ্রয় করিয়াছিল, কাজেই এইবার জীবকের চিকিৎসায় আপাত ফল লাভ ঘটিলেও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিল না, এই ব্যাধি উপলক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ বুদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।

আধুনিকী

শ্রীসাধনা কর

সকালবেলা উঠেই দাদা-বৌদিতে এক চোট ঝগড়া হয়ে গেল। দাদা লিখে থাকেন—গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, যখন যেটা আসে। সেদিন রবিবার। সকালে উঠেই দাদার মাথায় লেখা ভর করলে। সটান গিয়ে বসলেন টেবিলের সামনে। এদিকে সকালে উঠেই বৌদি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কি বলতে এলেন—'বলি শুনছ'। দাদা বাধা দিয়ে বললেন—'না, শুনছি না, শুনব না'।—'বলছিলাম কি'…ভ্রূ কুঁচকে দাদা বললেন—'উঁ হুঁ হুঁ, এখন নয়, পরে এসো। লেখার ভাব আসছে।

বৌদি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দাদা কলম বাগিয়ে ধরে কাগজ টেনে নিলেন। খানিকক্ষণ বসে রইলেন চোখ বুজে। পা-টা একবার দোলালেন, দুবার টান করে তার পরে এক সময় হঠাৎ গুটিয়ে নিয়ে আঁটসাঁট হয়ে চেয়ারে বসলেন। লেখা আরম্ভ হ'ল। এক পাতার দু' লাইন লিখলেন, খ্যাচ করে কেটে ফেললেন। গল্পটা কেমনতর কবিতার ধরণ নিয়ে আসছে। আর এক পাতা সুরু করলেন। নাঃ, ভাবটা বড় এলোমেলো, জমাটবাঁধা নয়। ফড়ফড় করে কাগজটা ছিঁড়ে কাগজ-ফেলা বাক্সে ছুঁড়ে দিলেন। কলমটা ধরা রইল হাতেই, কাগজটা সামনে। দাদা প্রথমটা বাইরের তাকালেন, তারপরে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ছাদে। একবার ভাবটাকে ধরতে পারলে হয়। টুঁটি টিপে হিড়হিড় করে টেনে আনবেন কলমের ডগাতে। ঘণ্টাখানেক কাটল। বৌদির জরুরী কথার দরকার। অস্বস্তিতে এ ঘরের কাছাকাছি ঘুরঘুর ঘুরে গেলেন। দাদা একমনে ভাবছেনই। গল্প ভাবতে প্রবন্ধ আসে, প্রবন্ধ ভাবতে কবিতা বেরোয়। সব মিশিয়ে একেবারে জগা-খিচুড়ী। দাদা উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপরে দ্রুতবেগে পায়চারি সুরু করলেন। পা ব্যথা করে উঠল, বিষম বিরক্ত হয়ে বিছানায় শুলেন একবার। খানিক পরেই দিব্যি একটা ভাব মনে জমে এল। এক অতি-আধুনিক কবিতা।

তারপরে, তারপরে…এই যাঃ। ভাবটা গেল বুঝি পালিয়ে। দাদা সজোরে কলম কামড়ে ধরে ভাবটাকেই বোধ হয় আটকাতে চাইলেন। বৌদি কিন্তু আর থাকতে পারলেন না। একেবারে ঘরে ঢুকে পড়ে বললেন—শুনছ, এবার কিন্তু তোমায় শুনতেই হবে।

দাদা রক্তচোখে তাকিয়ে বললেন—দেখ, সপ্তাহের ছ'টা দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, আর টিউশনি। বাড়ী এসে কোথায় কয়লা, কোথায় রে কেরোসিন, কোথায় কোন্ জিনিস সস্তা—ভাবতে ভাবতে, জানতে জানতে, ছুটতে ছুটতে ত প্রাণান্ত। ছুটির দিনটা; যদিই-বা একটু নিজের কাজ নিয়ে বসলুম, অমনি এলে গোল বাধাতে?

বৌদির আঁতে ঘা লাগল। রেগে উঠে বললেন—কাজের কথা বলতে এসেছি, শুনতে ইচ্ছে হয় শোন, নয় শুনো না। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এর পরে পাওয়াই যাবে না হয়ত। খোঁজ করে ক' মণ কিনে ফেলতে হবে। আজ কাপড়ের পারমিট পাওয়া যাবে, সেখানে যাওয়া দরকার। মাসের প্রথমে কণ্ট্রোলের এবং বাজারে গিয়ে মণিহারী খুচরো সওদাও অনেক করা অত্যাবশ্যক। একবার বেরুতেই হবে।

বৌদির কথায় দাদার মাথা ঘুরে উঠল। বললেন—তার মানে সারাটা দিনের ধাক্কা। পারব না, বলছি আজ ও সব পারব না। আজ একটু লিখবই।

বৌদি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—ঘণ্টা দুয়েক ত দেখছি চোখ বুজে বসে আছ, কত কসরৎই করছ, এক পাতা লেখাও ত বেরুল না।

দাদা চটে বললেন—অত সহজে লেখা বেরোয় না বুঝেছ। লেখা একটি তপস্যা। যার ধ্যানে আহার নিদ্রা ঘুচে যায়, মন চলে যায় স্বপ্নলোকের ওপারে। সেখানে যে বেদনা, যে আনন্দ, যে শান্তি,—যে…।

বৌদি অধীর হয়ে বাধা দিয়ে বললেন—থাক্, সে সব আমার বুঝবার দরকার নেই। আমি জানি খেতে না পেলে কষ্টের সীমা থাকবে না, হাহাকারে অস্থির হয়ে উঠতে হবে। পাগল হইনি ত যে সংসার ভাসিয়ে দিয়ে স্বপ্নলোকের বেদনা অনুভব করতে বসব।

দাদা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—আমি পাগল।—নয় তো কি।

কথায় কথায় দাদা-বৌদিতে হয়ে গেল একচোট ঝগড়া। বৌদি শেষটা রাগে গুমরাতে গুমরাতে বেরিয়ে এলেন—লিখে উদ্ধার করবে সবাইকে। এদিকে সংসারটা ভেসে যাক্। মেয়েটা বছর পাঁচেকের হ'ল, লেখাপড়া না শিখে মুখ্খু হচ্ছে, কার কি। এই খুকী, বইপত্তর নিয়ে পড়তে বোস্ বলছি। নয় ত চুলের ঝুঁটিটা টেনে ছিঁড়ে ফেলব, বুঝেছিস।

বছর পাঁচেকের মেয়ে খুকুমণি বারান্দায় উঁকি-ঝুঁকি

মারছিল। মার কথায় সভয়ে একবার তার সখের রীবন-বাঁধা চুলে হাত বুলিয়ে নিলে। তারপরে প্রথম ভাগখানা নিয়ে বারান্দায় এসে বসল। বৌদিও বসলেন পাশে। পড়, গড়গড়িয়ে পড়ে যা বলছি। ও কি, অমন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিস্ কেন, দেব এক চড়।

খুকুমণি তবু উস্‌খুস্ করতে লাগল। বাপের আদুরে মেয়ে সে। সকাল থেকে বাপের অবস্থা দেখে তার অবাক লেগে গেছে। রাগারাগি করে দাদা তখন ক্ষিপ্ত-প্রায়। সশব্দে ঘরময় পায়চারি করে ছিন্নসূত্র কবিতার ভাবটার সঙ্গে প্রায় ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করে দিয়েছেন। তাকিয়ে তাকিয়ে খুকুমণি ফিস্‌ফিস্ করে বললে—বাবার কি হয়েছে মা, অমন করছেন কেন।

বৌদি একবার তাকিয়ে দেখলেন। গম্ভীর মুখে বললেন মাথায় ভূত চেপেছে, তাই ক্ষেপে গেছেন।

ভূত সম্বন্ধে খুকুমণির ধারণা অস্পষ্ট। কিন্তু তিন-চার দিন আগে পাড়াতে একটা ক্ষ্যাপা এসেছিল। সে খালি উঠত, বসত, লাফাত, পায়চারি করত, হাত-পা ছুঁড়ত। কাছে গেলে মারতে আসত।

খুকুমণির সে ব্যাপারটা মনে ছিল। ক্ষ্যাপা সম্বন্ধে ভয় ছিল নিদারুণ। বাবা ক্ষেপে গেছেন শুনে মুখ তার কালো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল—আমি কেমন করে বাবার কাছে যাব। বাবা কেন ক্ষেপে গেল…।

দাদা তখন ভাবে বিভোর হয়ে সম্ভবতঃ কবিতাটাকে মনে মনে এক রকম গুছিয়ে এনেছেন, কান্নার শব্দে সচকিত হয়ে কল্পলোক থেকে ধপ করে পড়লেন এসে কঠিন বাস্তব-জগতে। একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। ভাবলেন পড়াতে গিয়ে খুকুমণিকে বৌদি মেরেছেন। মেয়েকে মারা তিনি মোটে সহ্য করতে পারতেন না। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—যত সব অশিক্ষিতের কাণ্ড। না আছে বিদ্যেবুদ্ধি, না আছে ছেলেমেয়ে মানুষ করার শিক্ষা। শুধু জান রান্না করতে আর ঘরে বসে ঝগড়া করতে। দেখগে আজকালকার মেয়েরা কি না করছে। কবিতা লিখছে, গান গাইছে, দেশোদ্ধারে এগোচ্ছে, ঘর-সংসার গুছোচ্ছে, হাট-বাজার করছে। কেউ কি তোমার মত ঘরে বসে বসে শুধু স্বামীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকছে।…হুঁঃ, এমন সুন্দর ভাবটা জমে এসেছিল, দিলে নষ্ট করে।

টান মেরে টেবিল থেকে কাগজ কলম তুলে নিয়ে দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।…

বৌদি প্রথমটা হতবুদ্ধি। তারপরে খুকুমণিকে টানতে টানতে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। শুধু জানি রান্না আর ঝগড়া করতে। কবিতার মর্ম্ম বুঝি নে। আধুনিকা নই ?

পরক্ষণেই দুপ দুপ শব্দে এ ঘরে এসে হাজির। আমি এতক্ষণ বসে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিলাম, আর মজা উপভোগ করছিলাম দাদা-বৌদির ঝগড়াতে। শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম। অগ্নিমূর্ত্তি বৌদি ঘরে ঢুকেই হাত থেকে বইটা নিলেন ছিনিয়ে—যাবে ত চল।

ত্রস্ত হয়ে বললাম—কোথায়।—শুধু ঘরে বসে রাঁধি আর ঝগড়া করি, আর কোনো গুণ নেই, ওঃ। সংসার গুছিয়ে যুদ্ধের বাজারের এত বড় টালটা সামলাল কে শুনি ? আয় ত একেবারে ন'শ পঞ্চাশ টাকা, আমি না থাকলে শুকিয়ে মরতে হ'ত, হ্যাঁ। ওঠো, ওঠো, বাজারে যাব। আমরা যেন আর জিনিষ কিনে আনতে পারি না।

অবাক হয়ে বললাম—তুমি যাবে, রান্নার কি হবে। খুকুমণিই বা থাকবে কোথায়। দাদা ত বোধ হয় রেগে বেরিয়ে গেলেন।

—হুঁ, বেরিয়ে গেলেন। মাথায় চেপেছে ভূত, বাড়ী থেকে বেরুবে আজ ? দেখগে হয় ত গেটের পাশে আম-গাছটার তলায় বসে লিখছে। কিছু ভাবতে হবে না, তুমি ওঠ। খুকুমণির আজ পাশের বাসায় নেমন্তন্ন। আমরা ফিরে এসে ভাতে ভাত রান্না করে নেবো এখন। যাবে ত শীগগির তৈরি হও। নয় তো ভেবেছ কি—একাই আজ চলে যাব। ঘর থেকে বেরুতে জানি নে না কি। সংসারের ঝামেলায় বেরুবার সময় পাই নে, তাই না এত খোঁচা।

বৌদি সবেগেই বেরোবার জন্য তৈরি হতে গেলেন। আমি আর উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেলাম না।

বাড়ী থেকে বেরুবার মুখে দাদা ডাক দিলেন—এ কি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে।

বৌদি উত্তর না দিয়ে গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেলেন। আমি বললাম—বৌদি বাজারে বেরুচ্ছেন, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

দাদা সটান উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—বাজারে। দেখ ভাল হবে না, এখনও ফেরো বলছি। ফিরলে না, আচ্ছা। আমিও এমন এক কাণ্ড করব দেখবে এখন।

* * *

বাজার করে ফিরতে বাজল একটা। তবু কণ্ট্রোলের দোকান রইল, পারমিটের দোকানে যাওয়াই হ'ল না। শুধু বাজারের ক'টা খুচরো জিনিষ, এবং মনিহারী দোকানে পছন্দমত কিছু জিনিস কিনতেই এতখানি বেলা। ঠিক দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে এক রিক্সা বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে যখন বাসায় ফিরলাম, ক্ষুধাতৃষ্ণায় দু'জনেই

তখন বিষম ক্লান্ত। বৌদির মেজাজ সপ্তমে চড়া।—এর পরে গিয়ে রান্না করতে হবে ত? ঝি নেই, চাকর নেই, দায় যত আমার। এই ঠিক বলে রাখলাম ঠাকুরঝি তোমাকে, ঘর-সংসার ছেড়ে ছুড়ে একদিন নিশ্চয় বেরিয়ে পড়ব। আমি কেন একা ঘরে বাইরে খেটে মরব। এমন সংসার না করলে কি হয়। আজকেই গিয়ে বলছি—যার সংসার সে বুঝে নিক। আমি বাপের বাড়ী চললাম।

দু'জনে ক্লান্ত দেহে বাড়ী এসে ঢুকলাম। পাশের বাড়ীর বারান্দায় বসে খুকুমণি তার বন্ধুর সঙ্গে খেলা করছিল। বললে—ওদের বাসায় আমি খেয়েছি, মা।

—বেশ—বৌদি এদিক ওদিক তাকালেন। গাছতলায় দাদার বই খাতা ফেলা, তিনি কাছাকাছি কোথাও নেই। বৌদি নীচু গলায় বললেন—তোর বাবা কোথায় রে খুকু?

খুকুমণি বন্ধুর সঙ্গে খেলতে ব্যস্ত। বললে—বাড়ীতেই তো ছিলেন। খুঁজে দেখোগে।

খুঁজতে আর হ'ল না। ভিতরে ঢুকতেই শুনতে পেলাম রান্নাঘরে শব্দ উঠছে—ছ্যাক্, ছ্যাক্।

তীব্র কৌতূহলে সেই ধুলাপায়েই দাঁড়ালাম গিয়ে দরজায়। দেখি কাত হয়ে ভাতের হাঁড়ির মাড় ঝরছে। মাটির কলসীটা উল্টানো। ঘর জলে ভেসে গেছে। আর দাদা এদিকে কাঁচা তেলে মাছ ভাজতে দিয়েছেন। মাছ ছিটকাচ্ছে ফট্ ফট্। খুন্তি হাতে হতভম্ব দাদা থ' বনে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বৌদি আর আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলাম। দাদা চমকে উঠে বললেন—যাক্, এসে গেছিস্।

হাসি চেপে বললাম—এসে তো গেছি, কিন্তু এটা কি হচ্ছে দাদা।

দাদা খুন্তি ফেলে হাত ধুতে ধুতে বললেন—কি আর হবে? রাগ করে ফেলেছিলাম, তারই প্রায়শ্চিত্ত। জানিই তো মস্ত কর্মী সব বাজারে বেরিয়েছ, ফিরতে নিশ্চয় একটা। এমন সময় তেতে পুড়ে এসে যা রান্না হবে, সে মুখে দেওয়া যাবে না। তাই রান্নাটা সেরেই ফেলছি। এই ভাতটা তো হয়েই গেছে, মাছটাও এই এক্ষুনি করে ফেলছি। এ মাছগুলো বড় ছিটকোয়, নয় রে। আগে জানলে অন্য মাছ আনতাম। তোরা আসবার আগেই রান্না হয়ে যেত।

বৌদি আমি দু'জনেই হেসে ফেললাম। বৌদি বললেন, হাজার রকমের অন্য মাছ আনলেও কাঁচা তেলে মাছ ছাড়লে মাছ ছিটকে উঠবেই। কি যে বুদ্ধি সব!

হেসে বললাম—হায়, হায়, বৌদি, আর কথা বলো না। করেছ কি, কবিকে কলম ছাড়িয়ে শেষটা খুন্তি ধরালে। এমনি কলির কাণ্ড।

বৌদি কৃত্রিম ভ্রুভঙ্গি করে বললেন—আর ঘরের বউকে যে খোঁচা দিয়ে বাইরে যেতে বাধ্য করলে সেটা বুঝি তোমার দাদার দোষের হ'ল না?

দাদা গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে বললেন—'মোটেই না। আধুনিক কালে আপিসে রয়েছেন বড় বাবু, ঘরেতে গিন্নী। ভাববার সময় অল্প, লিখবার সময় কম। প্রেরণার বেশী রকম জোর চাই তো। খোঁচাটা দিয়ে তবু লেখার একটা প্লট পেয়ে গেলাম।' বৌদি সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে বললেন—ওমা, আমাকে নিয়ে আবার গল্প লিখতে বসবে নাকি। সেকথা আগে বলতে হ'ত। লেখার নায়িকা হবার কায়দাটা একটু না হয় জেনে নিতাম। অন্তত ঝগড়াটা তো করতাম না।

দাদা আর আমি হেসে উঠলাম। দাদা হাসতে হাসতে বললেন—আমিও আর বাপু লিখতে বসছি নে। খুব শাস্তি হয়েছে। আমার ওই আপিস আর টিউশনি আর কনট্রোলের দোকান ঘোরাই সুখের। সরস্বতীর উপাসনা করে হাঙ্গামার দরকার নেই।

বৌদি ভ্রুভঙ্গি করে বললেন—হ্যাঁ, যে কাজ যারে সাজে। শুধু শুধু আমার আট আনা দামের কলসীটা ভাঙল, কাঁচা তেলে মাছ ভেঙে গেল। ছা-পোষা জীব, তার আবার ঘোড়া-রোগ। কেরাণীর আবার লেখার বাতিক।

দাদা চটে উঠলেন—শুনেছিস্ খোঁচাটা। লক্ষ্মী বোন্, আমি যদি সময় না পাই, দোহাই তোর, দাদার অপমানের প্রতিশোধটা তুলতে হবে। লিখে ফেল্ দেখি একটা গল্প, এমনি এক বৌদির কথা।

বৌদি উজ্জ্বল মুখে চোখ নাচিয়ে বললেন—বেশ তো, লিখুক না দেখি। কোন গুণই তো নাকি আমার নেই, তবু একটা গল্পের নায়িকা হতে পারব তো।

নিম্নবঙ্গের কতিপয় প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন

শ্রীবিমলকুমার দত্ত, এম-এ

বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগস্থ বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ সুন্দরবন নামে খ্যাত। তন্মধ্যে যে অংশ চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত তাহাই পশ্চিম সুন্দরবন। পশ্চিম সুন্দরবনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে কালিন্দী ও পশ্চিমে হুগলী নদী। অসংখ্য নদীর অবস্থান হেতু এই অঞ্চলের দক্ষিণভাগ বহু দ্বীপ ও বদ্বীপে বিভক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ও হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল ছিল। এতদিন পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এই ধারণা চলিত ছিল যে, বয়সে এই অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত নবীন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় এই দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ফলে বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে।[১] এই অঞ্চল হইতে বহু প্রাচীন মন্দিরের ও অন্যান্য গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, অষ্টধাতু, পাথর ও পোড়ামাটির বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি, তাম্রপট্টলিপি, মৃৎপাত্র ও প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।[২]

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই অঞ্চলের কোন উল্লেখ দেখা যায় না কিন্তু টলেমীর মানচিত্রে কাম্বিসন ও মেঘা নামক দুই নদীর মধ্যে "পলৌরা" নামক একটি নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[৩]

প্রাচীন মুদ্রা তাম্রপট্টলিপি,[৪] বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্য,[৫] ডি ব্যারোজ,[৬] ভ্যানডান ব্রুক[৭] ও রেনেলের[৮] মানচিত্র হইতে জানা যায় যে, এতদঞ্চল দিয়া গঙ্গার প্রধান শাখা প্রবাহিত থাকায়—ইহা অন্যতম প্রধান বাণিজ্য পথ ছিল। এক্ষণে এই শাখা আদিগঙ্গা নামে খ্যাত। এই কারণেই বোধ হয় এই অঞ্চল এতাদৃশ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। কিন্তু কিরূপে এই সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ হইল তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সম্ভবতঃ ভূমিকম্প, ভূমি-অবনমন (Submergence) প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও আদিগঙ্গা ক্রমশঃ মজিয়া যাওয়াতেই এইরূপ ঘটিয়াছে।

এই অঞ্চলে ভূমি-অবনমনের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণেল গ্যাসট্রেল ফরিদপুর, যশোহর ও বাখরগঞ্জ জিলার রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে লিখিয়াছেন :—

"What maximum height the Sunderbans may have formerly attained is utterly unknown . . . But that a general subsidence has operated over the whole of Sunderbans, if not of the entire delta. is, I think, quite clear from the result of the examinations of cutting or sections made in various parts where tanks were being excavated. At Khulna, about 12 miles to the nearest Sunderban lot, at a depth from 18 ft. below the present surface of the ground and parallel to it, remains of an old forest were found consisting entirely of Sundri trees of various sizes with their roots and lower portions of the trunk exactly as they must have been existent in former days, when all was fresh and green above them."

স্বর্গীয় আর. ডি. ওল্ডহাম লিখিয়াছেন,—

"The peat bed is found in all excavations in Calcutta at a depth varying from about twenty to about thirty feet and the same stratum appears to extend over a large area in the neighbouring country. A peaty layer has been

---

(১) প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের ভাষণ।

(২) ক। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মনোগ্রাফ—৩।৪ ও ৫নং

খ। Catalogue of the Gupta coins (Kalighat). British Museum. Allan. p. xi.

গ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী, ১৯২৮-২৯, পৃঃ ২১-২২।

ঘ। এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের ঐ , ১৮৭৯, পৃঃ ২৪৫

ঙ। Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad. R. D. Banerjee. পৃ. ১৬৯।

চ। *Indian Historical Quarterly.* Vol. IX, 1933. পৃ. ২০২, ২০৭ ও Vol. X. No. 2-1934—পৃ. ৩২১।

(৩) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এফ, জি, মোনাহানের "*Early History of Bengal*" নামক পুস্তকে টলেমীর মানচিত্র।

(৪) মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের দক্ষিণ গোবিন্দপুর তাম্রলিপি··· *Inscriptions of Bengal* by Nani Gopal Mazumdar. Vol. VIII. পৃ ৯৪।

(৫) ক। বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর "মনসার ভাসান"—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩

খ। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর "চণ্ডী কাব্য"—ইণ্ডিয়া প্রেস সংস্করণ পৃঃ ২০১।২০২

গ। বাংলার পুরাবৃত্ত—শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃঃ ১৮-১৯

(৬) ডি ব্যারোজ—১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ

(৭) ভ্যানডান ব্রুক—১৬৬০ "

(৮) জেমস্ রেণেল—১৭৬৪—১৭৭৭ "

noticed at Port Canning, thirty-five miles to the south-east and at Khulna, eighty miles east by north, always at such a depth below the present surfare as to be some feet beneath the present mean tide level. In many of the cases noticed, roots of the Sundri trees were found in the peaty stratum. This tree grows a little above high watermark in grounds liable to flooding, so that in many instances roots occurring below the mean tide level, there is conclusive evidence of depression.৯

উপরোক্ত ভূমি অবনমনের দৃষ্টান্ত ও অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে ওল্ডহাম সাহেব মনে করেন সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে সুন্দরবনের এই অঞ্চল গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইহা স্বতন্ত্র ও শুষ্ক স্থানবিশিষ্ট ছিল। *Manual of Geology of India* নামক পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন :—

"The evidence (of depression) is confirmed by the occurrence of pebbles, for it is extremely improbable that coarse gravel should have been deposited in water eighty fathoms deep and large fragments could not have been brought to their present position unless the streams which now traverse the country had a greater fall or unless which is now probable rocky hills existed which have been covered by alluvial deposits. The proportion of the beds traversed can scarcely be deltaic accumulation and it is therefore probable, that when they were formed, the present site of Calcutta was near the alluvial plain, and it is quite possible that a portion of Bay of Bengal was dry land."

উপরোক্ত উদাহরণ ব্যতীতও অন্যান্য অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যাহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এতদঞ্চলে ভূমি অবনমনের ফলে বহু গৃহ ও মন্দিরাদি ভূপ্রোথিত হইয়াছে। জয়নগর থানার অন্তর্গত ২৬ নং লাটে রাইদীঘির গাঙ নামক নদী প্রবাহিত। ভাটার সময় নদীর সাধারণ সীমারেখা হইতে প্রায় ৮ ফুট নিম্নে বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

সম্প্রতি এই অঞ্চল হইতে আমি কতকগুলি প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাদের সহিত ভারত ও বহির্ভারতের অন্যান্য স্থানে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক শিল্প-নিদর্শনগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। উপরোক্ত ভূমি অবনমন, অন্যান্য ভৌগোলিক কারণ ও এই সমস্ত শিল্প নিদর্শন হইতে স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে, নিম্নবঙ্গের এতদঞ্চলের ইতিহাস অতীব প্রাচীন। হয়ত বা অনুসন্ধানের ফলে কোনদিন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত ইহার গভীর যোগসূত্র আবিষ্কৃত হইবে।

প্রথমটি একটি হস্তনির্ম্মিত মৃৎপাত্র। ইহার বহির্ভাগে "basket marks" আছে এবং ইহার আকার ৫½ × ৪ ইঞ্চি। জয়নগর থানার অন্তর্গত ৩৪নং লাটের রূপনগর নামক গ্রামে মৃত্তিকা খননকালে এই মৃৎপাত্রটি পাওয়া যায়। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার সঠিক বয়স নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু অনুরূপ মৃৎপাত্র মিশরের প্রাচীন কবরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। শবদেহের সহিত এইরূপ মৃৎপাত্রে খাদ্যপানীয় ও অন্যান্য উপকরণাদি দিবার ব্যবস্থা মিশরে প্রচলিত ছিল।১০ সম্প্রতি দক্ষিণ-ভারতে আরিকামেডু নামক স্থানে ভারত-সরকারের খননকার্য্যের ফলে এ্যারেটাইন স্তরের ও নিম্ন হইতে অনুরূপ "basket marks" সমেত পাত্রখণ্ড পাওয়া গিয়াছে।১১ অতি প্রাচীনকাল হইতে, সম্ভবতঃ নব্যপ্রস্তর যুগ হইতে সারা পৃথিবীতে এই প্রকার "basket marks" চিহ্নিত মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন চীনে১২, মোটলেকস্থ টেমসে১৩ ও অন্যান্য প্রাচীন স্থানে ইহার সন্ধান মিলিয়াছে। যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত চিহ্নের আসল উদ্দেশ্য ক্রমশঃ লোকে ভুলিয়া যায় এবং ইহা আলঙ্কারিক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

দ্বিতীয়টি একটি পোড়ামাটির মাতৃকা-মূর্ত্তি। ইহা উর্দ্ধে মাত্র দুই ইঞ্চি। আদি গঙ্গার একটি শাখা নালুয়ার গাঙের কতক অংশ মজিয়া গিয়াছে। উক্ত স্থান খননকালে প্রায় ২০ ফুট নিম্ন হইতে এই মূর্ত্তিটি পাওয়া যায়। এই মাতৃকা-মূর্ত্তির হস্ত ও নাসিকা টিপিয়া তোলা (pinched) ও চক্ষু দুইটি অতিরিক্ত খণ্ডদ্বয় যোগ দ্বারা গঠিত। চক্ষুর উক্ত অতিরিক্ত খণ্ডদ্বয় না থাকিলেও উহার চিহ্ন বেশ পরিষ্কার। হরপ্পা যুগ হইতে অদ্যাবধি ভারতের নানাস্থানে এই প্রকারের মাতৃকা-মূর্ত্তি পাওয়া যায়। পশ্চিম সুন্দরবনে প্রাপ্ত এই মূর্ত্তিটির সঠিক গঠনকাল যদিও নির্দ্ধারণ করা যায় না তথাপি ডাঃ ক্র্যামরিশের মতে এইরূপ আদিম ধরণের মূর্ত্তিগুলি খুব প্রাচীন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"The chronology of the terracottas of India has given rise to much speculation and several conculsions have been drawn from the existence of various types. Primitive

(৯) আর, ডি, ওল্ডহাম প্রণীত "*Manual of Geology of India.*" ১৮৯২।

(১০) ব্রিটিশ মিউজিয়াম পোষ্টকার্ড: নম্বর: সিরিজ "বি" ৫৬ – নং বি ৩৩৬

১১। *Ancient India,* No. 2, July 1946. Plate xxvii, fig. (B).

১২। *The Civilization of the East* (China) Rene Grousset, page 5.

১৩। *An Outline of History.* H. G. Wells, Vol. I, 61, fig. 1.

types have been assigned an early and sometimes pre-historic date." ১৪

উক্ত মূর্ত্তিটি অত্যন্ত আদিম ধরণের এবং উহা ২০ ফুট ভূগর্ভনিম্ন হইতে প্রাপ্ত। সে কারণ নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, মূর্ত্তিটি অত্যন্ত প্রাচীন।

তৃতীয়টি একটি সমচতুষ্কোণ চৌকী। ইহা বেলে পাথরের তৈয়ারী এবং চারিখানি পায়াবিশিষ্ট। ইহার আয়তন ১৫×১২×৯ ইঞ্চি। মথুরাপুর থানার অধীন কঙ্কণদীঘির ২৬নং লাটের একটি মজা পুষ্করিণী খননকালে ১৬ ফুট ভূগর্ভনিম্ন হইতে ইহা পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতের তিনা-ভেলী (ত্রিবাঙ্কুর) নামক স্থানে খননকালে প্রাগৈতিহাসিক শিল্প-নিদর্শনসমূহের সহিত অনুরূপ একটি চৌকী পাওয়া যায়।১৫ শস্যমর্দ্দনের জন্য এইরূপ দ্রব্য প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গুপ্তযুগেরও অনুরূপ চৌকী পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উহারা আকারে ক্ষুদ্র ও অলঙ্কারবহুল। ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিশরেও অনুরূপ চৌকী ব্যবহৃত হইত, কিন্তু উহাদের কোন পায়া থাকিত না।১৬

ভৌগোলিকদের মতে বঙ্গদেশ বয়সে নবীন। চব্বিশ পরগণা জিলায় ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যে সকল প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত স্থান আদৌ নূতন নহে বরং উহা এত প্রাচীন যে, ইহার ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না হইলেও প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন হুগলী, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলায় পাওয়া গিয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভি-বল গোবিন্দপুর গ্রামের ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুনকুন নামক গ্রাম হইতে ঐরূপ একটি নিদর্শন প্রাপ্ত হন।১৭ মেদিনীপুর জেলার ঝাটিবনি পরগণায় তামাজুড়ি নামক গ্রামের অধিবাসিগণ ভূমি-খননকালে তাম্রনির্ম্মিত একটি কুঠার-ফলক ভূনিম্ন হইতে আবিষ্কার করে।১৮ বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুর নামক স্থানের নিকট অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে ঐ সকল নিদর্শন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বশাখায় পরীক্ষার জন্য রহিয়াছে। সম্প্রতি পুনরায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অধীনে বামাল নামক গ্রামে নব্য-প্রস্তরযুগের কতকগুলি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।১৯

উপরোক্ত নিদর্শনসমূহ ব্যতীত পশ্চিম রাঢ়ের ষোড়শ মাতৃকা চিত্রলিপি ও বাঁকুড়াস্থ বিহারীনাথ পর্ব্বতগাত্রে যে শিলালিপি আছে তাহাদের সহিত হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক লিপির নিকট-সাদৃশ্য আছে এবং তুলনামূলক আলোচনার ফলে বোধ হয় যে, এক সময়ে উক্ত লিপি এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়ার কুঁজকুড়া গ্রামে প্রাপ্ত কয়েকটি আলিপনা-চিত্রের সহিতও প্রাগৈতিহাসিক এবং ব্রাহ্মীখরোষ্ঠী লিপির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল নিদর্শন ও লিপিসমূহের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশ আদৌ নবীন নহে। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্য হইতে জানা যায়, বহুকাল এই অঞ্চল পক্ষী ইত্যাদি নামীয় অনার্য্যগণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। বঙ্গদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য্যের দ্বারাই উদ্ধার করা যাইতে পারে।

১৪। Indian Terracottas, by Dr. Stella Kramrish, J.I.S.O.A.

১৫। *Annual Report. Archaeological Survey of India*, 1902-3, p. 139.

১৬। *An Outline of History.* H. G. Wells, Vol. I, p. 132-41.

১৭। Catalogue of the Pre-Historic Antiquities in the Indian Museum. T. C. Brown, p. 67.

১৮। *Ibid.*, p. 142.

১৯। *Science and Culture*, Vol. 14, No. 6, Dec. 1948.

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কয়েকদিন চলিয়া গেল—

ধলা জিনিষগুলি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। রিজিয়া উপস্থিত ছিল। সে কাঁকালে করিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে।

স্কুল আবার বন্ধ হইয়াছে দিন দশেকের জন্য। আপাততঃ কোন কাজ নাই। বাহিরে একটি থানায় একটা শোভাযাত্রা বাহির করিবার তোড়জোড় চলিতেছে। ধলারা কয়েকজন এবং অন্যান্য স্কুলের কতিপয় ছাত্র যাইবে স্থির হইয়াছে, কিন্তু কবে তাহার স্থিরতা নাই। স্থানীয় লোকে খবর দিবে, যখন সশস্ত্র পুলিসবাহিনী স্থানান্তরিত হইবে তখন যাইতে হইবে—শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রকৃষ্ট সময় তাহাই।

এদিকে অর্থাভাব। সত্যরা টাকার অভাবে কষ্ট পাইতেছে, প্রায়শঃই অনাহারে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইতেছে। তাহাদিগকে টাকা সরবরাহ করিবার উপায় নাই। অণিমা রায়ের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে, যে টাকা এদিক-ওদিক হইতে আসিত তাহাও আসিতেছে না। মাত্র একজন ব্যাপারী সামান্য টাকা দিয়াছেন। ধলারা গেলেও টাকার দরকার, নৌকা ভাড়া, খাওয়া, ফিরিবার ব্যবস্থা সবই প্রয়োজন। শচীনবাবু তাই কয়েকদিন চিন্তান্বিত আছেন।

ঠিক এমনই সময়ে একদিন রাত্রে পেট্রল পার্টির সহিত টাকা সরবরাহকারী অনিলের দলের একটা সংঘর্ষ হইয়াছে। তাহাতে দুইজন কন্‌ষ্টেবল আহত হইয়াছে। সে পাড়ার অনেকেই এখন হাজতে—অনিলও। অনিল সংবাদ যাহা দিয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সংঘর্ষ এড়াইতে গেলে সত্য, স্বরাজ ও বিভূতি ধরা পড়িয়া যাইত। তাহারা উহাদের সহিতই ছিল এবং মারামারির ফলে পলাইবার সুযোগ পাইয়াছে আর অনিলদের বিচারের ভার মিঃ সেনের হাতে পড়িয়াছে—এক মাসের বেশী জেল হইলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে।

শচীনবাবু চিন্তাকুল হইয়া অকারণ ঘুরিতে ঘুরিতে একটা রেস্তোরাঁয় চা খাইতে ঢুকিলেন। মণিবাবু চা খাইতেছিলেন, তাহার পাশে একজন পুলিসের জমাদার। মণিবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চা খাওয়াইলেন। শচীনবাবুকে বিষণ্ণ দেখিয়া মণিবাবু বলিলেন—কি? আপনাকে যেন একটু বিমর্ষ মনে হচ্ছে?

—হাঁ।

—কেন?

—অর্থাভাব। মাষ্টারের যা হয়—ইস্কুল বন্ধ মাইনে পেতে দেরি। ছাত্রেরা নিয়মিতভাবে বেতন দেয় না।

—তা ত বটেই। কতকগুলো ছেলের অপকর্ম্মের দরুন দেশের কত লোক কত কষ্ট পাচ্ছে!

—আপনার ভায়ের মামলার কি হ'ল? সেই ছুরিমারা ব্যাপার!

মণিবাবু একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, তার আবার কি হবে? খালাস হয়ে যাবে!

—যে ছুরি খেয়েছে, তার ত শুনলাম আড়াই বছর হয়েই গিয়েছে।

—তা ত হবেই। সেটা ত অন্য আইনে—বিপ্লবী হিসেবে—

—আজ্ঞে হাঁ।

শচীনবাবুর বাদানুবাদ করিবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি উঠিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। অন্ধকার রাস্তা, একাকীই ফিরিতেছিলেন, পথে একটা কাঠের পুল, জায়গাটা অসমান, তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতেছিলেন। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে, আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইল—

কে যেন পিছন হইতে ডাকিল, মাষ্টার মশায়।

পিছন ফিরিলেন, একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সেই অন্ধকারে আবছা দেখা গেলেও কে তাহা বুঝা যায় না। লোকটি তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া আন্দাজে হাত ধরিল। তিনি একটু বিস্মিত ও ভীত হইলেন—কে?

লোকটি তাঁহার হাতে একখানা খাম গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আপনার চিঠি।

দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া সে চলিয়া গেল। পিছনের লাইট পোষ্টের আলো বাঁকের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অস্পষ্ট। লোকটি দ্রুত চলিয়া গেল, মনে হইল যেন কোন পুলিস অফিসার।

শচীনবাবুর মনে সংশয় জাগিল, কিন্তু তবুও নির্লিপ্তভাবে সেটা পকেটে পুরিয়া বাসায় ফিরিলেন। এতদিন আত্মরক্ষার একটা ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে হাল ছাড়িয়া দিয়া অনিবার্য্য ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বাসায় আসিয়া দেখেন খামের ভিতরে দুইখানা দশ টাকার নোট এবং ছোট একটি চিঠি, নামধামহীন অপরিচিত লেখা—"সাবধান হইবেন, যে-কোন দিন খানাতল্লাস হইতে পারে।" শচীনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কোন্ অজ্ঞাত দাতার দান ও সাবধান-বাণী।

সেদিন বর্ষণ-মুখর দিবস, সকাল হইতেই বৃষ্টি হইতেছে। শচীনবাবু বাসায়ই বসিয়া ছিলেন, অদূরে গলির মোড়ে পানের দোকানে একটা লোক বসিয়া থাকে নিত্য, নিয়মিত ভাবে। মাঝে মাঝে মনে হয় ও ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করে, দিনে পঁচিশ বার পঁচিশ জায়গায় তাহার সহিত দেখা হয়, লোকটি গুপ্ত সংবাদদাতা সন্দেহ নাই—কিন্তু কে? শহরে নবাগত বলিয়া অনুমান হয়।

আজ তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিয়াছেন, সত্যর সাহিত্য-সমিতির এত কর্ম্মতৎপরতা কেন? তাহার সহিত বহু সরকারী কর্ম্মচারীর খাতির থাকাটা আজ একটা মূলধনস্বরূপ হইয়াছে, না হইলে বহুপূর্ব্বে শৈশবেই এই বিপ্লব-প্রচেষ্টার অকালমৃত্যু ঘটিত।

সারাদিন কোন কাজ ছিল না। বসিয়া বসিয়া দিন কাটিয়াছে, বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঐ লোকটি নির্ব্বিকার চিত্তে পানের দোকানে বসিয়া পান চিবাইতেছে আর দোক্তার পিক্ ফেলিয়া বৃষ্টির জলস্রোতকে শুক্কারজনক রক্তিমতায় কুৎসিত করিয়া দিতেছে। মিঃ সেনের বেয়ারা আসিয়া জানাইল, তাঁহাকে মিঃ সেনের বাড়ীতে একবার যাইতে হইবে।

শচীনবাবু অনুমান করিলেন, মেঘমেদুর সন্ধ্যায় মিঃ সেনের বোধ হয় কাব্যপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁহার সহিত সন্ধ্যাটা কাব্যালোচনায় কাটাইয়া দিতে চান। শচীনবাবু ঘরে ছটফট করিতেছিলেন, ছাতা লইয়া বেয়ারার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথে অন্ধকার। মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির কেরো-সিনের ডিবা জ্বলিতেছে—আলোর স্বল্পতায় পথের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। শচীনবাবু চলিতেছিলেন, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট্ গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। বেয়ারা গেট খুলিয়া তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বলিল। শচীনবাবু বিস্মিত হইলেন, বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইতে চাহিতেছে কেন? ভুল করিয়া নয় ত!···হয় ত মিঃ সেন ভিতরেই আছেন।

বেয়ারা শয়নকক্ষের একটা চেয়ারে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

কেহ কোথাও নাই, কেবলমাত্র শিশুকন্যাটি খাটের উপর নিদ্রিত। ডেপুটিবাবুর বাড়ীর একেবারে অন্দরে একাকী বসিয়া থাকিতে থাকিতে শচীনবাবু বিস্ময়-মিশ্রিত আতঙ্কে ঘামিয়া উঠিলেন। এমন সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি ত পূর্ব্বে কখনও পড়েন নাই।

মিসেস্ সেন একদিন মাত্র সাহিত্য সমিতির উৎসবে মিনিট পাঁচেকের জন্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয় তো হয় নাই···

ভাবিয়া ভাবিয়া শচীনবাবু কিছুই স্থির করিতে পারিতে-ছিলেন না। হঠাৎ মিসেস সেন এক প্লেট খাবার ও চা লইয়া আসিয়া টেবিলে রাখিলেন। নমস্কারান্তে অত্যন্ত সহজ সুরে বলিলেন, খেয়ে নিন্।

অবাক বিস্ময়ে শচীনবাবু তাকাইলেন, ব্যাপারটা বিশ্বাস হয় না, অথচ একেবারে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ ভাবে মিসেস্ সেন, যিনি কড়া হাকিমকে কড়া শাসনে রাখিয়া সিগারেট কণ্ট্রোল করিয়াছেন বলিয়া শহরে কুখ্যাতি।

শচীনবাবু বিমূঢ়ের মত বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, সমিতি গড়বার জন্যে এত লম্বা-চওড়া কথা বললেন আর এখন একেবারে চুপ করে আছেন?

শচীনবাবু কোন জবাব না দিয়া একটা সিঙাড়া মুখে পুরিলেন। মিসেস্ সেন একটু হাসিয়া বলিলেন, অবাক হয়েছেন বোধ হয়?

—হাঁ। এ ধরণের ব্যাপার ত নাটক-নভেলেও ঘটতে দেখা যায় না।

—কিন্তু এত অবাক না হয়ে এবার খাওয়াতে মন দিন দেখি।

শচীনবাবু জানিতেন, মিসেস্ সেন বড়লোকের মেয়ে এবং তাঁর বাবা যে হাতখরচ তাঁহাকে দেন তাই নাকি মিঃ সেনের মাহিনা হইতে বেশী। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, আমাকে কি খাবার জন্যেই ডেকেছেন?

—না। আর একটু কাজও আছে। আপনাকে একটা জিনিষ নিতে হবে। নেবেন ত?

—গ্রহণযোগ্য হলে নিশ্চয়ই নেব।

মিসেস্ সেন আঁচল হইতে দশখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন, এটা আপনি নিয়ে যান।

—আমি! টাকা নিয়ে কি করবো!

—দিলুম—যা হয় করবেন।

শচীনবাবু শঙ্কিত হইলেন—চারি পাশে গুপ্তচরের দল তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, শেষে কি ইনিও! বলি-লেন—নিতে আমার আপত্তি আছে। প্রথমতঃ, আপনার দান গ্রহণ করবো কেন? দ্বিতীয়তঃ গ্রহণ করলেও কি ইচ্ছামত খরচ করতে পারবো।

—আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব—দরকার আছে বলে করবেন। আর দ্বিতীয়তঃ, যেভাবে খুশী টাকাটা খরচ করবেন। যাই হোক্, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চটপট্ খেয়ে নিন।

শচীনবাবু কহিলেন, আপনার দান গ্রহণ করতে আমি অপারগ।

—কেন? সন্দেহ হচ্ছে? সরকারী টাকা ও নয়, ও আমার হাতখরচ থেকে দিয়েছি।

—তা'হলেও—আমাকে কেন দেবেন ?

—আমার ইচ্ছে।

—অন্যকে ত দেন না।

—আপনি কেমন করে জানলেন ?

—অন্ততঃ খ্যাতি শুনতাম তা হলে।

—খ্যাতি নেই, বরং কৃপণ বলে বদনাম আছে জানি। কিন্তু ঐ পুলিস আর ম্যাজিষ্ট্রেটদের চা খাওয়াতে আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু আপনাকে খাইয়েছি—

—আমি দরিদ্র হতে পারি কিন্তু অন্যের দান গ্রহণ করতে আমার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে—সেইজন্যেই—

মিসেস্ সেন চট্ করিয়া টাকা কয়েকটা তাঁহার বুক পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, উনি বোধ হয় আসছেন—

সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন লোকের দূরাগত কলরব কানে আসিল। বোধ হয় মিঃ সেন তাসের আড্ডা হইতে ফিরিতে-ছেন। মিসেস্ সেন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আর ইতস্ততঃ করবেন না—টাকা আপনাদের কাজে লাগাবেন। আমার সঙ্গে আসুন, পেছনের দরজা দিয়ে আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে উনি দেখে ফেললে বিপদ হবে।

মিসেস্ সেন তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন এবং শচীনবাবু যেন অপরাধ করিয়া ধরা পড়িতে যাইতেছেন এমনি একটা উৎকণ্ঠা লইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। অন্ধকার, পিছল উঠান। মিসেস্ সেন বারান্দায় লণ্ঠনটা রাখিয়া বলিলেন, আসুন—

শচীনবাবু অন্ধকারে মিসেস্ সেনের পিছন পিছন চলিলেন, এক রহস্যময় রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে তিনি পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

মিসেস্ সেন পিছনের ক্ষুদ্র দরজাটা খুলিয়া বলিলেন, এ পথের হদিস জানেন ত ? একটু এগিয়ে, পুকুরধারের রাস্তা দিয়ে ওদিকে গেলেই গলিতে পড়বেন।

—হ্যাঁ জানি—

তিনি দরজা দিতে যাইতেছিলেন···মিসেস্ সেন যেন একটু চকিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইতিমধ্যে রাস্তার কলরব নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। দুরন্ত সামান্য হাত দুই—অনিলের কথাটা মনে হইল। এক মাসের বেশী জেল হইলে সত্যই সব নিবিয়া যাইবে।

কি করিয়াই বা তাঁহাকে ডাকেন! হঠাৎ এক ঝলক বাতাসে মিসেস্ সেনের আঁচলটা শচীনবাবুর একেবারে হাতের কাছে আনিয়া দিল। তিনি তাড়াতাড়িতে তাহাই ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া কহিলেন—

—শুনুন—

—বলুন তাড়াতাড়ি—

—অনিলের কেস্‌টা মিঃ সেনের হাতে আছে, দেখবেন যেন এক মাসের বেশী না হয়।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

নিবিড় অন্ধকার। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি অবরুদ্ধ দরজার অন্তরালে বন্দী হইয়া গিয়াছে। শচীনবাবু একটু একটু করিয়া পা বাড়াইয়া পুকুরপাড়ে আসিলেন—হঠাৎ কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে কি ভাবিবে এই আশঙ্কায় একবার এদিক ওদিক চাহিলেন, তাহার পর আর একটু ভাবিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। রাস্তাটা জনশূন্য—যাহারা যাইতেছিল, তাহারা মিঃ সেনের দল নহে।

শচীনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চলিলেন।

বাড়ীতে আসিয়া শচীনবাবুর অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল, টাকা পাইয়াছেন, আপাততঃ সত্যদের দুর্গতি দু'চার দিনের জন্য কমিবে। তার উপর এই অভাবিতপূর্ব্ব সহানুভূতিতে তাঁহার অন্তরে একটা আশা জাগিয়াছিল, হয়ত এসব নিরর্থক নয়, হয়ত সত্যদের দুঃখবরণ সার্থক হইবে, হয়ত দেশ স্বাধীন হইবে। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে—সেখানে দুঃখকষ্ট থাকিবে না, শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ ও আহার্য্য মিলিবে। শাসকদের অত্যাচারে ও অবিচারে শত শত প্রাণ নষ্ট হইবে না, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবন যাত্রাকে সুষ্ঠু করিয়া তুলিবে।

মীরা যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, শচীনবাবু তখন আর গোপন করিতে পারিলেন না, সব কিছুই সবিস্তারে বলিয়া ফেলিলেন। মীরা সবিস্ময়ে কহিল, তা হলে হয়ত সত্যদের জয় হবে, না গো ? ওরাও যখন বুঝেছে—

—হ্যাঁ, হয়ত তাই—

বহুদিন পরে আজ মীরা ও শচীনবাবু অনেক গল্প-গাছা করিলেন। যেন একটা রঙীন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাইয়াছেন··· অনুদার পৃথিবীতে যেন একটু নিরাপদ আশ্রয় মিলিয়াছে।

অনেক রাত্রে তাঁহারা শয়ন করিলেন। বর্ষণক্লান্ত শীতল রাত্রি। জানালা দিয়া ভিজা বাতাস আসিয়া মশারি দোলাইতেছে। তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি দু'টার পরে অকস্মাৎ শচীনবাবু যেন অনুভব করিলেন, কে তাঁহার মাথায় ভিজা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াছে। বিছানায় উঠিয়া বসিলেন—মীরা ঘুমাইতেছে। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—কে ?

—দরজা খুলুন স্যর···নারীকণ্ঠ।

শচীনবাবু দরজা খুলিলেন—অন্ধকারে কে যেন ঘরে ঢুকিল। তিনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইতে যাইতেছিলেন, আগন্তুক কহিল, জ্বালাবেন না স্যর। আমি শ্যামলী।

—ওঃ, কি খবর বল ত!

—থলাদারা যাচ্ছে স্যর, কাল সেখানে শোভাযাত্রা হবে। আরও জন পনর আছে। টাকা অন্ততঃ এক শ' চাই, নৌকা ভাড়া হয়েছে তিরিশ টাকা—দুখানা নৌকো।

—তুমি কি করবে ?

—ওরা সব নদীর ঘাটে বসে আছে, আমি টাকা নিয়ে গেলে তবে রওনা হবে।

—তুমি পারবে ? এগিয়ে দেব।

—না—না। আপনি কখ্খনও আসবেন না। এখনও পুলিস আছে মোড়ে। আমি এমন পথে যাবো আপনি তা চিনবেন না।

—পারবে একা !

—হাঁা, একা এলাম, আর যেতে পারবো না। আরতি আছে মোড়ে দাঁড়িয়ে।

—ও আচ্ছা—

শচীনবাবু অন্ধকারে টাকা গুণিতে গুণিতে বলিলেন, কিন্তু একশত হয় না। আশি নিয়ে যাও—তিনি সত্যদের জন্য কিছু সঞ্চয় করিলেন।

—তাই দিন—

শ্যামলী হাত পাতিয়া টাকা লইয়া বলিল, স্যর আপনি সাবধান থাকবেন, আপনার নামে ওরা খুব লাগিয়েছে, কিন্তু প্রমাণাভাবে আপনাকে ধরতে পারছে না। জানেন, এস্-ডি-ও আপনার ওয়ারেণ্টে সই করেন নি—আপনি সাহিত্যিক, তাই বিশ্বাস করেন নি যে আপনি এসব হাঙ্গামার মধ্যে আছেন।

শ্যামলী অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল—শচীনবাবু দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কালো একটা অশরীরী মূর্ত্তির মত শ্যামলী বড় রাস্তায় উঠিয়া ওপারের একটা ক্ষুদ্র গলিতে ঢুকিল। অপরিসীম সাহস এই মেয়েটির ! এই অন্ধকারে এমনি করিয়া ও যেন কি এক দুরন্ত আশা বুকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শ্যামলীর অপস্রয়মান ছায়ার দিকে চাহিয়া শচীনবাবু মনে মনে বলিলেন, তোমাদের ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন যেন সফল হয়। স্বাধীন ভারতে তোমরা পুরস্কৃতহইবে, দেশের দুঃখ মোচন হইবে।

পরের দিনটা অত্যন্ত অস্বস্তিতে কাটিতেছিল—

থানার সামনেই বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ফাঁক পাইলে তাহাতে আগুনও দেওয়া হইবে। যদি গুলি চলে তবে থলাদের দুই-এক জন নিশ্চয়ই মারা যাইবে—অবশ্য মরিতে তাহাদের ভয় নাই, কিন্তু শচীনবাবু তাহাদের জন্য একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছিলেন।

বাকী চল্লিশ টাকা সত্যদের পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এখন কোনও একটা গ্রামের লোকেদের বৈপ্লবিক কর্ম্মে প্ররোচিত করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মনটা এত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল যে, শচীনবাবু আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না—একাকী বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিন শ্রীমতী অণিমার সহিত দেখা হয় নাই, একবার গেলে হয়।

পথে জনৈক দোকানদার সাদরে ডাকিয়া বসাইল, আসুন মাষ্টারমশাই বসুন, একটু চা খান।

ইহার তাৎপর্য্য তিনি বুঝেন নাই, তবে ইদানীং আশ্চর্য্য ও রহস্যময় অনেক ব্যাপারই ঘটিতেছে তাই তিনি বসিলেন। বলা যায় না—কোন সংবাদ হয়ত বা পাওয়া যাইতেও পারে।

দোকানদার বলিল, খবর শুনেছেন বোধ হয়—দারোগা খুন হয়ে গেছে। ছেলেদের উপর লাঠি চালাতে তারাও পাণ্টা জবাব দিয়েছিল, তাই মরেছে।

শচীনবাবু শুনিলেন, এবং ইহার ভয়াবহ পরিণাম কল্পনা করিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। ওখানে চলিবে এখন পুলিসের উস্কানিতে সম্প্রদায়বিশেষের গুণ্ডামি, লুঠতরাজ, বেপরোয়া মারপিট এবং নারীধর্ষণ—লাঞ্ছনায় অপমানে পীড়নে কত লোকের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে।

আর একটা কথা সুস্পষ্ট—তিনি যে ঐ বিপ্লবীদের নেতা একথা আজ প্রায় সর্ব্বজনবিদিত, তাহা না হইলে এমন সব ঘটনা ঘটিতে পারিত না। তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত, আজ হোক্ কাল হোক্ কারাবাস তাঁহার অনিবার্য্য।

তিনি উঠিতেছিলেন, দোকানী প্রশ্ন করিল—থলারা ভাল ত মাষ্টারমশাই ?

শচীনবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, আমি কি করে জানবো।

তিনি বাহির হইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস্ রায়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিস্ রায়কে সংবাদ দিতেই তিনি আসিলেন। কুশল-প্রশ্নের পর শচীনবাবু বলিলেন, তা হলে কলকাতা আর যাচ্ছেন না ত।

—যেতে আর দিলেন কই ?

—আমি দিলাম না !

—হাঁা। বললেন, থাকৃতে হবে—

—যা হোক্—আপনার উপর আমার অধিকার আছে একথা স্বীকার করলেন তা হলে ?

—আপনার কথাবার্ত্তা ক্রমশঃই ঘুর পথ নিচ্ছে—

—যাক্ সেকথা, নিশাযোগে আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন হতে পারে—তার পথটা দেখিয়ে দিতে হয়।

—রাত্রে আমার বাসায় আসবেন ?

—হাঁা ! এর মধ্যে শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানই নয় একটু রোমান্সের গন্ধও যে রয়েছে।

—কিন্তু একথা বলতে আপনার একটু কুণ্ঠা বোধ করা উচিত ছিল।

—উচিত অবশ্যই ছিল, কিন্তু সঙ্কোচ বোধ করলে আর চলছে না।

—পেছনের দরজা টপ্‌কানো আপনার পক্ষে যদি অসম্ভব না হয় তবে এই জানালায় আসাও সম্ভব এবং···

শচীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, সময় নিকট হয়েছে, বোধ হয় আর অল্প কয়দিন। কিন্তু আপনার হাতে কত আছে?

—পোষ্টাপিসে শ-পাঁচেক আছে, তা ছাড়া আর নেই।

—যাক্ যথেষ্ট মূলধন আছে—

—আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত!

—আচ্ছা, আপাততঃ খুব সলজ্জ ভাবেই উঠি তা হলে! তবে হাতে কিছু টাকা রাখতে লজ্জিত হবেন না আশা করি।

শচীনবাবু হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলেন।

পরদিন সকালে ঘুম হইতে জাগাইয়া মীরা বলিল, শীগ্‌গির ওঠ। চা খাবে। শচীনবাবু বলিলেন, এখানে দাও—

—না, রান্নাঘরে চল।

শচীনবাবু রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে বসিয়া ধলা। ধলা বলিল, স্তর যা হয় কিছু খেতে দিন। বড্ড ক্লান্ত—

—দারোগা মরলো কি করে?

—বলছি।

মীরা কয়েকটা মুড়ির মোয়া দিল—চায়ের জল গরম হইতেছে। ধলা দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর বলিতে সুরু করিল—শোভাযাত্রায় ওখানকার ছাত্র নিয়ে প্রায় দু'শ ছেলে ছিল। পতাকাবাহী লাঠিগুলো একটু শক্ত দেখেই নিয়েছিলাম, থানার নিকটবর্ত্তী হতেই বোধ হয় বেলা ১২টা হ'ল, তারা কিছু না বলেই হঠাৎ বেপরোয়া লাঠি চার্জ্জ করতে আরম্ভ করলে। কিছুক্ষণ মার খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে এক ঘা মারলাম দারোগাকে, কিন্তু এমনি চোট লাগল যে, সেই যে পড়ল আর উঠল না। দু'একজন কনেষ্টবলও ঘা খেয়েছিল, তারা পালিয়ে গেল—আমরাও ফিরে এলাম।···

খানিকটা চা পান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—নৌকো ভাড়া করা ছিল, আমরা চলে আসবো, হঠাৎ সংবাদ পেলাম পুলিসের হুকুমে দাঙ্গা আরম্ভ হবে—তারা মুসলমানদের বেপরোয়া লুঠ-তরাজ করতে হুকুম দিয়েছে—এখন মেয়েদের সরানো দরকার। দু'খানা নৌকো বোঝাই করে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, অন্য একখানি মহাজনী নৌকায় আরও কিছু এল···তখনই অপর প্রান্তে লুঠতরাজ আর নারী-হরণ আরম্ভ হয়েছে—সাহাদের বাড়ী লুঠ হয়েছে, একটা মেয়েকে···ধলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তার পর আবার সুরু করিল, আমরা দেখলাম অন্ততঃ আধঘন্টা তাদের আট্‌কাতে না পারলে এদিকে সব বেরুতে পারবে না। তাই আমরা বাজারের রাস্তায় গেলাম তাদের মোহড়া নিতে—মারামারি হ'ল, একটি জেলে মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হ'ল, তাকে পাঠিয়ে দেখি, ওরা যেন একটু ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—এদিক ওদিক পালাচ্ছে—

আমরা চলে এলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা, হেঁটে রওনা দিলাম রাস্তা ধরে। সারাদিন খাওয়া জোটে নি তবুও ছুটছি আমরা চারজন। ওরা সব ওপারের গ্রামে কোন আত্মীয়-বাড়ীতে গেল। কি বিশ্রী রাস্তা, বর্ষার জলে কাদাময় হ'য়ে গেছে, ভেঙে গেছে মাঝে মাঝে, সাঁতার-জল, অন্ধকারে পথ চিনি না, তবুও চলেছি—

নদীর ধার দিয়ে আসতে আসতে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা। তারা মাছ ধরছিল—তাদের হাতে দেশী লণ্ঠন। স্বল্প আলোয় আমাদের ভিজা কাপড় আর চলার ভঙ্গী দেখে বোধ হয় সন্দেহ করেছিল, তার উপর অত রাত্রি। তারা বললে, 'দাঁড়াও, গ্রামের চৌকিদার আর প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারবে না।' গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই অন্য সম্প্রদায়ের লোক, তারা ওখানকার ব্যাপার জানত তাই বললে, 'সেখানে মারামারি করে আসছেন ত?' বললাম—না, মায়ের বিশেষ অসুখের খবর পেয়ে যাচ্ছি। তারা ছাড়লে না, আমরাও যাব না। শেষে তারা আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাবে বললে। দেহে তখন আর তিলমাত্র শক্তি নেই, তাই বললুম, তাঁদের ডেকে নিয়ে এস, আমরা তোমাদের টং-এ অপেক্ষা করছি। তাই হ'ল, জনা ছয়েক রয়ে গেল আর দুই জন চৌকিদার ডাকতে গেল—

ধলা আবার কয়েক চুমুক চা খাইয়া লইয়া বলিল, শেষে আমরা স্থির করলাম জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। হঠাৎ সুযোগ মিলল—আমরা জলে লাফিয়ে পড়লাম—

বর্ষার নদী, দুরন্ত স্রোত—ওদের হৈ চৈ ক্রমেই দূরে সরে গেল, বুঝলাম বেশ জোরেই ভাঁটিয়ে যাচ্ছি।···সারাদিন খাই নি, তার ওপর এই পরিশ্রম, স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝলাম বাঁচবার আর আশা নেই, হাত পা শিথিল হয়ে আসছে, চারদিকে অন্ধকার, কোথায় তীর বুঝবার উপায় নেই। ভাবলাম এমনি ভাবে কত লোক মরেছে।···

হঠাৎ দেখি গায়ে কি একটা ঠেকলো—কলাগাছ। বেঁচে গেলাম। তার উপর চড়ে বসলাম, বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলাম। কিছুই জানি না—ভোরে দেখি, ষ্টীমার-ষ্টেশনের ফ্লাট দেখা যাচ্ছে আর আমি ঘুরপাক খাচ্ছি। তখন একটু চেষ্টা করে উঠে এলাম—ওয়ারেণ্ট ত আছেই—তারপর সরাসরি একেবারে বাড়ীতে চলে এলাম। মা ভাত রাঁধছে, ভাবলাম খেয়েই চলে যাব···

হঠাৎ কে যেন বাহির হইতে ডাকিল, স্তর।

শচীনবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যে কয়েকটি ছাত্র তাহাকে ও মিস্ রায়কে জড়াইয়া একটা রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের একজন দাঁড়াইয়া।

শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হে ?

—আমাদের স্কুল কবে খুলবে স্যর ?

—সোমবার।

শচীনবাবু অত্যন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিয়া আসিলেন। ধলা তখনও গোগ্রাসে মোয়া খাইতেছে। শচীনবাবু বলিলেন, শীগগির যা, ওরা ঠিক টের পেয়েছে—এসেছে কবে স্কুল খুলবে জানতে।

ক্লান্ত পা দুটিতে ভর দিয়া দরজা ধরিয়া ধলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বড় দুঃখ স্যর, যারা আমাদের এত কষ্ট দিলে তাদের একজনও ইংরেজ নয়, তারা আমাদেরই দেশবাসী, আমাদের ভাই—

শচীনবাবু বলিলেন, পিছনের দরজা দিয়ে, ময়রাবাড়ীর ভিতর দিয়ে চলে যা—নইলে বিপদ আছে।

ধলা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। শচীনবাবু রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলেন অত্যন্ত ভালমানুষ ছাত্রটি মোড়ের চায়ের দোকানে মণিবাবুকে কি যেন বলিল, তিনি হন্ হন্ করিয়া ছুটিলেন সম্ভবতঃ পুলিসে খবর দিতে।

শচীনবাবু আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মীরা শিগ্‌গির একটা কাজ কর। তুমি ধলাদের বাড়ি চেনো ত ?

—হ্যাঁ কেন ?

—শীগ্‌গির ভেতর দিয়ে গিয়ে বলে এস ধলা যেন না খেয়েই চলে যায়, নইলে দশ বারো মিনিটের মধ্যে ধরা পড়বে—

মীরা ইতস্ততঃ করিতেছিল, কেউ আমাকে চেনে না—

—তাতে কি ?

মীরা তাড়াতাড়ি রওনা হইল।

শচীনবাবু উৎকণ্ঠিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। খোকা আঙ্গিনার প্রান্তে একা একাই 'বন্দেমাতরম্‌' জুড়িয়া দিয়াছে। চীৎকার করিয়া বলিতেছে—বিশ্বাসঘাতকের বিচার হবে—ব্রিটিশ নিপাত যা—সা-রে-গামা-পাধা-নি, বোম ফেলেছে জাপানী, ইত্যাদি।

মীরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি যেতে পারতাম না, পুলিসে ঘিরে ফেলেছে ওদের বাড়ী—তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—

শচীনবাবু আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—

সারাদিন অনাহারে থাকিয়া, জীবনপণে হাঙ্গামাকারীদের প্রতিরোধ করিয়া মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে, দশ মাইল দুর্গম পথে হাঁটিয়াছে, চৌদ্দ মাইল জলে ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কিছুই খাইতে পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না। আর মায়ের রান্না ভাত ক'টিও সে মুখে দিবার সময় পাইল না, এই কি বিচার, বিধাতার ন্যায় ও সত্যের রক্ষণ ! অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে শচীনবাবুর চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মীরা বলিল, তুমি কাঁদছ ?

—ওঃ, ধলা দুটো ভাত খেয়েও যেতে পারলে না !

এই কথাটায় মীরার মাতৃহৃদয়ও কাঁদিয়া উঠিল, আহা তার খোকার মত ধলাও তার মায়ের আঁচলের নিধি, তাহাকে তিনি খাইতে দিতে পারিলেন না। মীরা ছুটিয়া গিয়া খোকাকে কোলে করিয়া অজস্র চুম্বনে তাহার স্নেহ আর আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া দিল।

ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর আবর্ত্তন নিয়মিতই চলিয়াছে—

মানুষের আইন আদালত, মামলা মোকদ্দমা, খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা—সবই চলিয়াছে সেই একই নিয়মে। ফুল ফুটিয়াছে, ঝরিয়া পড়িয়াছে, বীজে অঙ্কুর হইয়াছে, ফলে বীজ সঞ্চয় হইয়াছে, কেবলমাত্র কয়েকটি পতঙ্গধর্ম্মী প্রাণ আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, অন্ধকার জনসমুদ্রে আবর্ত্তসঙ্কুল গভীর তলদেশে ক্ষতবিক্ষত দেহে আলোড়ন সৃষ্টি করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগ নিস্তরঙ্গ, নিষ্ঠুর নীরবতায় মৌন।

শহর নীরব—নিশ্চিন্ত আলস্যে, নির্ম্মম স্তব্ধতায় দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে।

সাহিত্য সমিতির আর একটি অধিবেশন হইয়াছে মিঃ সেনেরই বাড়ীতে। অধিবেশনটি উৎসবমূলক, গান-বাজনায় বেশ জমিয়াছিল। উৎসাহে অখিলবাবু পর্য্যন্ত একটা আবৃত্তি করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শচীনবাবুর কাজ নাই—মিঃ সেন মাঝে মাঝে ডাকেন, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অনিলরা হাজতে দিনাতিপাত করিতেছে—এখনও রায় বাহির হয় নাই।

সেদিন সকালে অমনি একটা আলোচনা হইতেছিল। রবিবার, মিঃ সেন তাই আজ একেবারে বেপরোয়া, আলোচনার গতিতে মনে হয় বারটার পূর্ব্বে সমাপ্ত হইবে না। শচীনবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন সেখান হইতে পর্দ্দার ফাঁকে বাড়ীর ভিতরের সামান্য একটু দেখা যায়।

অকস্মাৎ পর্দ্দাটা ফাঁক হইয়া মিঃ সেনের সামনে দুই কাপ চা ও দুইখানি বিস্কুট রক্ষিত হইল। বোঝা গেল মিসেস সেন স্বয়ং দিয়া গেলেন—কিন্তু ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। এই আকস্মিক চা দানের ব্যাপারে পর্দ্দাটা একটু বেশী ফাঁক হইয়া রহিল।

মিসেস সেন চা লইয়া আসিলেন। চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু দেখিলেন, এবার রান্নাঘরের দরজা পর্য্যন্ত দেখা যায়। মিসেস্ সেন কয়েকবার আনাগোনা করিলেন এবং একবার চোখাচোখি হইতেই একটি আঙুল দেখাইয়া স্মিতহাস্যে চলিয়া গেলেন।

শচীনবাবু বুঝিলেন, অনিলদের এক মাসের জেল হইয়াছে।

ফিরিবার মুখে শচীনবাবু যথাস্থানে সংবাদটি দিয়াও আসিলেন।

ধলারা যে কয়জন একসঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়াছিল তাহাদের সকলেই ফিরিয়াছে, কিন্তু ফেরে নাই শুধু একজন। দুই বৎসর টেষ্টে ডিস্‌এলাউড হইয়া সে পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। শচীনবাবু ব্যথিত হইলেও বিচলিত হন নাই, আজ তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা, ইহারা আজ হোক, কাল হোক, দশ বছর বাদে হোক সকলেই ডুবিবে, কেহই বাঁচিবে না। ইহারা সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জন্মায় নাই।

আজ কয়েকদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার। শেষ ভাদ্রের রৌদ্রে বর্ষণক্লান্ত আকাশ উজ্জ্বল আর পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুক্লপক্ষের সপ্তমী হইবে, সৌখীন নরনারী সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে, রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। চলমান মেঘের ছায়ায় আলো-আঁধারে বর্ষাস্নাত পৃথিবীর শ্যামলতা আনন্দময়—

কয়েকজন মহিলা আজ শচীনবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এমনই বেড়ানটা এই ক্ষুদ্র শহরের রেওয়াজ। তাঁহার অবস্থিতি মহিলাগণের আনন্দের অন্তরায় হইবে মনে করিয়া শচীনবাবু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন একটি বধূ আসিয়া প্রণাম করিল।

মুখ দেখিয়া বুঝিলেন এটি ডাক্তারবাবুর পুত্রবধূ। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কি? ভাল বৌমা!

—হাঁ।

—তার পর সকলে ভাল আছে?

—হাঁ, আজ ন'টার পর সত্যদা আসবে সেইখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। যাবেন—

—যাবো?

—হাঁ, সোজা রান্নাঘরে চলে যাবেন, চেনেন ত?

—আচ্ছা—

শচীনবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। পথে শিক্ষকগণের সহিত সাক্ষাৎ—তাঁহারা মিস্ রায় ঘটিত ব্যাপারের সাম্প্রতিক কিংবদন্তী সম্বন্ধে মুখরোচক বহু সংবাদ জানাইলেন।

আজ অন্ততঃ তাঁহার রসিকতায় প্রবৃত্তি ছিল না, তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, অন্যত্র চাকুরীর দরখাস্ত করতে হবে—

সুরেনবাবু কহিলেন, মণিবাবু এ ব্যাপারটা নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলতে পারেন।

—উনি সম্ভবতঃ ওখানকার হতাশ প্রেমিক তাই—

শচীনবাবু জানিতেন, ক্রমাগত তাঁহাকে ও মিস্ রায়কে জড়াইয়া এই কুৎসা প্রচারের ফলে একদল ছাত্রছাত্রী তাঁহাদের উপর শ্রদ্ধা হারাইয়াছে এবং সাহিত্য সমিতিটা যে মুখ্যতঃ উক্ত প্রণয়-লীলার ক্ষেত্রবিশেষ তাহা প্রায় সকলেই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে। এদিকে ধলার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দলের সকলেই গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে খুনের চার্জ্জ দাখিল করা হইয়াছে। হয়ত ধলার ফাঁসিও হইতে পারে। এমন কত জনের ফাঁসি হইয়াছে,—হইবে।

মণিবাবুর ভাই যাহাকে ছোরা মারিয়া পেটফুটা করিয়া দিয়াছিল তাহার দুই বৎসরের জেল হইয়া গিয়াছে, এবং মণিবাবুর ভ্রাতা বেকসুর খালাস পাইয়াছে। তাহার পিতা সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণের খরচ আদায় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যৎসামান্য মুনাফাও হইয়াছে।

রাত্রি নটায় ডাক্তারবাবুর বাড়ীর সামনের গলিটা একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। শচীনবাবু একটু শঙ্কিত পদক্ষেপে একবার পায়চারি করিয়া দেখিলেন—এদিকে ওদিকে কোথায়ও কেহ নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়েই বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। রান্নাঘরের দরজায় বসিয়া আছে ডাক্তারবাবুর পুত্রবধূ, অন্য কেহই বাড়ীতে নাই, শাশুড়ী সম্ভবতঃ গৃহান্তরে। একটা কেরোসিনের ডিবার শীর্ণ শিখা মাঝে মাঝে বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পুঞ্জীভূত ধূম উদ্গীরণ করিতেছে—

বৌমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শচীনবাবুকে পাশের ঘরে লইয়া গেল। ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে ঘর স্বল্পালোকিত, সত্য শুইয়া আছে মনে করিয়া তিনি পাশে যাইয়া বসিলেন। সত্য উঠিয়া বসিল—

শচীনবাবু সত্যকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এ যেন সত্যর প্রেতাত্মা—শীর্ণ চেহারা, গায়ের রং রোদে পুড়িয়া তামার মত হইয়াছে, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, মনে হয় বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চোখে সে দীপ্তি, দৃষ্টিতে সে নির্ভীকতার অভিব্যক্তি নাই। নিষ্প্রভ কোটরগত চোখে একটা ম্লানিমার কারণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। মনে হয় যেন দীর্ঘদিন রোগে ভুগিয়া উঠিয়াছে—

—কেমন আছ?

—ভাল নয়, আজ এক মাস রক্ত আমাশয়ে ভুগছি। রাত-জাগা, পরিশ্রম অনাহার—শরীরের উপর কম অত্যাচার তো হয় নি স্যর, সুতরাং শরীরের আর দোষ কি?

কেমন করে দিন কাটাচ্ছ?

সত্য বলিয়া গেল অনেক কাহিনী, হাঁটিয়া সাঁতরাইয়া কত পথ যাইতে হইয়াছে। পুলিসের ভয়ে, গ্রাম্য লোকের ভয়ে কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়া জলে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছে। চারিপাশের অগুনতি জোঁক গায়ে লাগিয়া দেহে ছিদ্র করিয়া রক্তপান করিয়াছে। সেই সব ক্ষত

শুকাইতে দীর্ঘ দিন লাগিয়াছে। কোথায়ও গ্রামবাসী সহায়তা করিয়াছে, অনুবর্ত্তী হইয়া বৈপ্লবিক কাজ করিয়াছে, কোথায়ও আবার পুলিসে খবর দিয়া হয়রাণ করিয়াছে। কোথায়ও গ্রামবাসীরাই তাড়া করিয়াছে, ছুটিয়া বা আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে, পাটের জমিতে ভাঁপ্‌সা গরমে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন কাটাইতে হইয়াছে—

সত্য স্মিতহাস্যে নিজেদের দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়া থামিল। শচীনবাবুর মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, এত কৃচ্ছ্রসাধনের ফল কি হইল? কিন্তু সে প্রশ্ন তিনি করিলেন না।

সত্য কহিল, আর ত কর্ম্মী নেই, সবই জেলে, এখন কি করা যায়!

—কর্ম্মী থাকলেই বা কি হ'ত?

—সত্যই তাই, বাইরের চেয়ে ঘরের শত্রু এত বেশী যে মনে হয় আর যেন পারি না।

—নিজেকে বাঁচাতে হলে ধরা দেওয়া ছাড়া পথ নেই। আর কিছু করাও সম্ভব নয়।

—তবে তাই করব। আর পারছি না যেন! কিন্তু আপনি এতদিন কি করে জেলের বাইরে আছেন সেইটেই আশ্চর্য্য।

—কেন?

—সকলেই ত জানে যে আপনি আমাদের নেতা?

শচীনবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন—নেতা? বল কি সত্য, আমি ত কাজে কিছুই করি নি। ঘরে বসে কেবল হা হুতাশ করেছি একটু আধটু···

—আপনার প্রতি সকলের শ্রদ্ধাই এতদূর এগিয়ে দিয়েছে আমাদের, নইলে কি ছেলেরা এত নির্ভীক হতে পারত?

—থাক্, সে কথা।

সত্য একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—ভাগ্যিস, সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল। নইলে দু'দিনেই সব খতম হয়ে যেত। আচ্ছা এখন মেয়েদের দ্বারা কি কিছু হওয়া সম্ভব নয়?

—তারাই জানে।

বৌমা অদূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, কি করবে?

—ধরুন, যদি এখানকার পোষ্টাপিসটা পুড়িয়ে দিতে পারত?

অবশ্য একটা প্রাণ কি দুটো প্রাণ যেত, কিন্তু···

—তা অঞ্জলি শ্যামলী পারে—

শচীনবাবু বলিলেন, তার প্রয়োজন কি? তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এমন কোন ক্ষতি হবে না—

—নাই হোক্, তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো হবে, অন্ততঃ দুনিয়ার লোক জানবে এদের কৃত অত্যাচারকে জাতি মাথা পেতে নেয় নি—

ঘরের পিছনে শুষ্কপত্রে পদধ্বনির মত একটা শব্দ শোনা গেল। বৌমা ত্বরিতপদে পিছন দিক দিয়া বাহির হইয়া গেল। সত্য ফুঁ দিয়া প্রদীপটা নিবাইয়া দিল।

নিবিড় অন্ধকারে শচীনবাবু ও সত্য মুখোমুখি নিঃশব্দে রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার একটা শব্দ হইল—আবার! সত্য চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, পথে কি কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না।

বৌমা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সম্ভবতঃ গরু—ভয় নেই।

সত্য বলিল, তা হলে বরিশাল চলে যাই, সেখানে যদি সম্ভব হয় জিরিয়ে নেব, না হয় একেবারে জেলে গিয়েই বিশ্রাম।

—সে মন্দের ভাল। এমনি করেও ত বাঁচবে না। খরচের টাকা আছে?

না।

শচীনবাবু অন্ধকারে নিজের আংটিটা টানাটানি করিতে-ছিলেন, কিন্তু তাহা খুলিতেছে না। বলিলেন, আংটিটা খুলে নাও, আর ত কিছু নেই। এটা তো খুলছে না—

বৌমা বলিল, না থাক্, এই আংটিটা নিন্—সে নিজের আংটি খুলিয়া দিল।

—কিন্তু—

—পুকুরের ঘাটে হারিয়ে গেছে বললেই হবে। আর এই দুল জোড়া আপনি রাখুন ভবিষ্যতের জন্যে—

শচীনবাবু অন্ধকারে হাত পাতিয়া দুইটিই লইলেন, একটা সত্যর হাতে দিয়া অন্যটি পকেটে রাখিলেন। বর্ত্তমানে এসব দান গ্রহণ করিতে তাঁহার আর সঙ্কোচ বোধ হয় না। নিজের আংটিটাও সত্যকে দিয়া কহিলেন, এটাও রাখো হয়ত কাজে লাগবে।

শ্বাশুড়ী বৌমাকে ডাকিলেন, সে রান্নাঘরের প্রতিফলিত স্বল্পালোকে দাঁড়াইয়া বলিল, যতক্ষণ না আসি যাবেন না যেন।

সত্য বলিল, দুটো জিনিষ আপনার কাছে দেব গচ্ছিত রাখতে।

—কি?

—কতকগুলি কংগ্রেসের নির্দ্দেশ, ইস্তাহার আর—

—আর কি?

—আর একটা আগ্নেয়াস্ত্র, ও কিছু রসদ—

শচীনবাবু একটু যেন বিস্মিত হইলেন, তাহার পর বলিলেন, দিয়ো···আচ্ছা এখুনি দাও নিয়ে যাচ্ছি—

—না না, আপনি নেবেন না। কাল বৌদি গিয়ে দিয়ে আসবে—একটু সাবধানে রাখবেন যদি কোন কর্ম্মী আসে তার আত্মরক্ষার জন্যে দেবেন। অনেক সময় প্রয়োজন হয়।

—তাই হবে!

বৌমা আসিয়া শচীনবাবুকে বলিল, আপনি আসুন।

শচীনবাবু উঠিয়া আসিলেন। সদর দরজা দেওয়া ছিল, বৌমা তাহা খুলিয়া পুনরায় বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, পুলিস এসে গেছে!

—কেন?

—বোধ হয় সার্চ্চ করবে, সত্যদাকেও পালাতে হবে এক্ষুনি। দাঁড়ান দেখি—

শচীনবাবু নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সত্য পিছন হইতে আসিয়া বলিল, আপনি আর আমি একসঙ্গে ধরা পড়লে কিন্তু সত্যিই আমি আনন্দিত হই—

—তার মানে?

—লোকে জানবে, আমি আপনার সত্যিকার অনুগত ছাত্র।

—কিন্তু সে দুটি জিনিস?

—সে পুলিস পাবে না। তার জন্যে চিন্তা নেই স্যর।

বৌমা আসিয়া জানাইল, পিছনের খিড়কিতেও পুলিস দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য একটু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগছে কিন্তু, ওদের ফাঁকি দিতে পারলে বেশ একটু আমোদ হ'ত—

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। বৌমা জানালা দিয়া জানাইল, ডাক্তারবাবু বাড়ীতে নেই···না, কোন পুরুষমানুষ নেই।···না খুলব না দরজা।···ওঁকে ডিস্‌পেন্সারি থেকে ডেকে আনুন।

বৌমা আসিয়া বলিল, আপনারা খিড়কি দরজার আড়ালে থাকবেন, আমি জল আনতে যাচ্ছি। ফাঁক পেলেই চলে যাবেন—

বৌমা কলসী কাঁখে লণ্ঠন লইয়া আসিয়া খিড়কির দরজা খুলিল, লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল দুই জন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। বৌমা একটু ঘোমটা টানিয়া বলিল, একটু সরে যান, আমি জল আনতে যাব···

কনষ্টেবল দুই জন পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। সরু গলি—ঘরের বাঁকটা ঘুরিয়া একটু আগাইলেই টিউব ওয়েল। টিউব ওয়েলে শূন্যোদর কলসী পূর্ণ করিবার শব্দ হইল, এবং আলোটা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

ঘরের কোণে আসিয়া বৌমা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাপ, সাপ ওরে বাবা রে, সাপে কেটেছে"। হাতের লণ্ঠনটি ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া নিবিয়া গেল।

কনষ্টেবল দুইটি সেই অন্ধকারে টর্চ্চের আলো ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া গেল আর্ত্ত নারীকণ্ঠকে অনুসরণ করিয়া। সত্য নিঃশব্দে শচীনবাবুর হাত টানিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বাম দিকে ঘুরিয়া একটা পুকুরের পাড়ে আসিয়া শচীনবাবু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন আর রাস্তা নাই।

সত্য পুকুরের পাড়ে একটি ঘরের পিছনে গিয়া সঙ্কেত-সূচক শব্দ করিল, সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলিয়া গেল। সত্য শচীনবাবুকে লইয়া সে বাড়ীর উঠান পার হইল।

আর একটা গলির মোড়ে আসিয়া সত্য বলিল, এই পথে যান—দত্তদের দোকানের পিছন দিয়ে সদর রাস্তায় পড়বেন। সত্য চলিয়া গেল। শচীনবাবু হাতড়াইতে হাতড়াইতে সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। রাস্তার মোড়ে জনতা—তাহারা বলিতেছে, ডাক্তারের বাড়ী সার্চ্চ হচ্ছে—তার বেটার বৌকে সাপে কামড়েছে তবুও নিস্তার নেই।

(ক্রমশঃ)

আন্দামান

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্দামান অরণ্য-পরিপূর্ণ কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি। আমাদের কল্পনায় আন্দামান ঊষর, পর্ব্বতসঙ্কুল, অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়া-পূর্ণ, অবাঞ্ছিতদের নির্ব্বাসনের উপযোগী এক ভয়াবহ স্থান। আমাদের অনেকেরই ধারণা এখানকার অরণ্যে বাস করে কতকগুলি আদিমজাতীয় মানুষ। অষ্ট্রেলিয়ার মত এখানেও সভ্য মানুষ প্রথম বাস করার জন্য কয়েদীদের পাঠিয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামান ভারতের কয়েদী-উপনিবেশে পরিণত হয়। তারপর নির্ব্বাসিত কয়েদীদের পরিশ্রমে সেখানে পোর্ট ব্লেয়ার শহরটি গড়ে উঠেছে। শহরটি বাস্তবিকই মনোরম। ছোট ছোট পাহাড় আর সমুদ্র তার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করেছে। সেখানকার রাস্তাঘাট চমৎকার, আশেপাশে গ্রাম পর্য্যন্ত বাস যাওয়া-আসা করে। দোকান, বাজার, ডাক্তারখানা, ভাল হাসপাতাল, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন সবকিছুই আছে। সম্প্রতি সেখানে কয়েদী পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। পোর্ট ব্লেয়ারকে কেন্দ্র করে চার পাশে গ্রামের সংখ্যা বাড়ছে—স্বাধীন মানুষের একটা নূতন উপনিবেশ সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। একদা অবজ্ঞাত কয়েদী উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়া আজ যেমন সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে, তেমনি ওখানেও যে অদূর

ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর, সমৃদ্ধিশালী একটি ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠবে আর তা সকলের কাছে আকর্ষণযোগ্য হবে, আমরা আন্দামানে গিয়ে তার লক্ষণ দেখে এসেছি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রতিবেশী-বিতাড়িত, খণ্ডিতদেশ, ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙালীর কি আন্দামানে স্থান হবে?

আন্দামানের জেলখানা

আমাদের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এখানে বর্ণনা করব।

২৬শে সেপ্টেম্বর, সকাল সাতটা। সামনের ছোট রসদ্বীপে যাওয়ার জন্য পোর্ট ব্লেয়ারে সমুদ্রতীরে আমরা মোটর-লঞ্চের প্রতীক্ষা করছি, সঙ্গে দুই বন্ধু—সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীসুনীলাভ গুহ। চোখের সামনে ছোট ছোট পাহাড় আর সমুদ্রের বিরাট দৃশ্য। এ জায়গাটাতে সমুদ্র স্থির নিস্তরঙ্গ।

আন্দামানে মৎস্যের প্রাচুর্য্য আছে। আন্দামানের মাটি বাংলাদেশের মাটির চেয়ে বেশী উর্বর—অনেক জমিতেই দু'বার ফসল জন্মানো যেতে পারে। এমন কি, সেখানে আম গাছে পর্য্যন্ত বছরে দু'বার বউল ধরে, কিন্তু ভাল আমের চাষ এ পর্য্যন্ত সেখানে হয়েছে বলে শোনা যায় না। যদি তরি-তরকারি আর ধানের চাষ বাড়ানো যায়, তা হলে মাছের মত ধান-চাল, তরকারিও সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। উর্ব্বর জমি সেখানে আছে, কিন্তু যথেষ্ট চাষী নেই।

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারা শ্রীনিবারণচন্দ্র দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে অন্যান্য বাস্তুহারাদের সঙ্গে ওখানে গিয়েছেন। মংলুটনে তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। মুরগী-পালন ওখানে প্রচুর লাভজনক বলে তিনি অনেকগুলি মুরগী পুষছেন। তিনি বললেন, তাঁর মুরগীর ডিমগুলো আকারে হাঁসের ডিমের মত বড় বড় হয়।

বৃষ্টি মাথায় করে আমরা জাহাজ থেকে আন্দামানে নেমেছিলাম। বৃষ্টিপাত সেখানে প্রচুর পরিমাণে হয়। পশ্চিম বাংলার গড় বৃষ্টিপাত বৎসরে ৬০ ইঞ্চি, পোর্ট ব্লেয়ারে গড়ে বৎসরে ১৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। বৎসরে আট-ন' মাস ওখানে বৃষ্টি হয়, তবে সে বৃষ্টি অবিরাম নয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত সেখানে বিশেষ বারিপাত হয় না।

বৃষ্টির প্রাচুর্য্যের দরুন চাষের জমিতে জলসেচের ভাবনা চাষীদের নেই। ধানের চাষ সেখানে ভাল হয়। ভুট্টা, আখ, সুপারি, পেঁপে, কলা প্রভৃতি ভালই ফলে। নারিকেল-গাছও সেখানে প্রচুর জন্মে। বাঁশ-বেতের জঙ্গলও বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে। চা, কফিও উৎপন্ন হয়, রবার গাছও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কৃষিতত্ত্ববিদ্‌দের দিয়ে ওদেশের অকর্ষিত মাটি পরীক্ষা করিয়ে দেখা দরকার কি কি ফসল প্রচুর পরিমাণে ওখানে জন্মানো যেতে পারে। আন্দামান যখন জাপানীদের দখলে ছিল তখন জাপানীরা তাদের খাদ্যশস্য যতটা সম্ভব ওখানেই জন্মাবার জন্য চেষ্টা করেছিল। পোর্ট ব্লেয়ারের পাহাড়ের ঢালুতে পর্য্যন্ত তারা চাষ করেছিল। তারা প্রচুর পরিমাণে রাঙা আলুর চাষ করেছিল।

দশ-পনের বিঘা থেকে দু-তিন শ' বিঘা পর্য্যন্ত চাষের উপযোগী সমতল জমি পাহাড়ের সর্ব্বত্র পতিত অবস্থায় আছে। খুব উঁচু পাহাড় আন্দামানে নেই—ওখানকার উচ্চতম পাহাড় আড়াই হাজার ফুট উঁচু হবে। পোর্ট ব্লেয়ারের কাছাকাছি সর্ব্বোচ্চ পাহাড়টির নাম মাউণ্ট-হ্যারিয়েট উচ্চতা ১১৯৩ ফুট। পূর্ব্ব-উপকূলের দিকে পাহাড়গুলি অপেক্ষাকৃত উঁচু।

আমরা পাহাড়ে বহু রবার গাছ দেখেছি। জলের ধারে অজস্র সুন্দরী গাছ চোখে পড়ে। জঙ্গলে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কাঠ পাওয়া যায়। ওখান থেকে মূল্যবান কাঠ ইউরোপ, আমেরিকায় চালান যেত। রঙ গুলবার জন্য গর্জ্জন কাঠের তেল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ওখানকার দ্বীপগুলির তটরেখা আঁকাবাঁকা, ভগ্ন। বহু নিরাপদ পোতাশ্রয় ওখানে গড়ে উঠতে পারে। স্থানীয় কাঠে নৌকা তৈরি ও জাহাজ মেরামতির কাজ বেশ ভাল ভাবেই চলবে। তা ছাড়া ওখানকার কাঠ দিয়ে উৎকৃষ্ট আসবাব-পত্র তৈরি হতে পারে। ভাল ছুতার ওদেশে নেই। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ওখানে নারিকেল-তেল তৈরির একটি কারখানা স্থাপন করা—ঐ কারখানায় নারকেলের ছোবড়া থেকে বিবিধ পণ্য-দ্রব্যও তৈরি করা যেতে পারে। কোনো বিত্তশালী বাঙালী কি এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারেন না?

বর্ত্তমানে বাঙালীর সেখানে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্ভাবনা আছে। নিকোবর বাদে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মোটামুটি আড়াই হাজার বর্গমাইল স্থান আছে। এর মধ্যে ৪৭৫ বর্গমাইল একটা দ্বীপ, দক্ষিণ আন্দামানের ৩২৫ বর্গ-

মাইল অঞ্চলে জনবসতি আছে। আন্দামানের মোট জনসংখ্যা (রেশন কার্ড অনুযায়ী) ষোল হাজার—হিন্দু প্রায় সাত হাজার, মুসলমান চার হাজার, খ্রীষ্টান তিন হাজার, আর ইন্দোনেশীয় ও ব্রহ্মদেশীয়ের সংখ্যা হবে হাজার দুই। হিংস্র
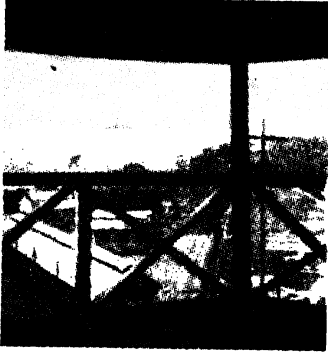
জেলখানার কেন্দ্রস্থলে তিন তলার উপরে রক্ষীরা দিনরাত সতর্কভাবে পাহারা দিত

প্রকৃতিবিশিষ্ট আদিম অধিবাসী জাবোয়াদের দেখা পাওয়া সহজ নয়, তাদের সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করাও কঠিন। তারা গভীর অরণ্যে সভ্য মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে বাস করে। দ্বীপগুলির অধিকাংশ স্থানই অরণ্যসমাকীর্ণ। ওদেশে প্রচলিত সাধারণ ভাষা হিন্দী। পোর্ট ব্লেয়ারে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীরা সকলেই বাঙালী। বহু বাঙালী সেখানে আছেন, আর বাংলা কথা অনেকেই বোঝেন। ওখানকার বাঙালীরা নবাগত বাঙালীকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙালীরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামান্য একটু উদ্যমশীল হলে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর নিজস্ব উপনিবেশ রূপে গড়ে তুলতে পারেন। আন্দামান তা হলে অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর বাংলাদেশের একটা অংশে পরিণত হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একজন বাঙালী চীফ কমিশনার এখন আন্দামানের শাসনকর্তা।

বাংলা-সরকার পোর্ট ব্লেয়ারের গ্রামাঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করার জন্য দু'বারে ১৯৯টি বাঙালী পরিবার পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে ৯টি পরিবার দেশে ফিরে এসে বহু অভিযোগ জানিয়েছেন। ১৯৯টি পরিবারের মধ্যে ৯টি পরিবারের ফিরে আসা অসম্ভব কিছু নয়। আরও কিছু কিছু লোক হয়তো সেখান থেকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী যাঁরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ওদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছেন তাঁদেরও যদি একে একে ফিরে আসতে হয়, তা হলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে।

চট্টগ্রামের শ্রীপুলিনচন্দ্র মাহিষ্য দাস আমাদের পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁর জমির ধানগাছ আমাদের দেখাতে নিয়ে গেলেন। তাঁর জমিতে ধানগাছ খুব ভাল হয়েছে। তিনি বললেন, এবার তিনি মূলা আর লঙ্কার চাষ করবেন। তাঁর সঙ্গে ২০ বৎসর বয়সের একজন যুবক আছে। তাঁরা কয়েক মাস ধরে মাসিক ৬০৲ টাকা হিসাবে সাময়িক সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন। তিনি জানালেন, তাঁর জমিতে জল দাঁড়ায় না, যদি কিছু এমন জমি পান যেখানে জল পাওয়া যায় তো ভাল হয়।

পূর্ব্ব বাংলার যে সকল চাষী নূতন দেশে নূতন পরিবেশে এসে পরিশ্রম করে জমি চাষ করেছেন, তাঁদের অনেকেই নিজেদের কাজের নিদর্শন দেখাবার জন্য আগ্রহভরে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সকলেরই মোটামুটি ধারণা ওখানকার জমি উর্ব্বর, স্বাস্থ্য ভাল। দেখলাম তাঁরা অনেকেই যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন এবং এমনি ভাবে যে পরিশ্রম করে চলবেনও তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাবলম্বী হতে না পারার আগেই পাছে সরকারের সাহায্য আকস্মিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এই ভেবে তাঁরা কতকটা দুশ্চিন্তা ভোগ করছেন।

আন্দামানের সাধারণ দৃশ্য

যে সকল মহিষ দিয়ে এখানকার জমি চাষ করা হয় সে-গুলি এক অদ্ভুত ধরণের জীব—বাছুরের মত উঁচু, অধিকাংশই বুড়ো। এরা এক ঘণ্টাও লাঙল টানতে পারে না। যে ঠিকাদার প্রত্যেকটি ৮০০৲ টাকা দামে এগুলি যোগান দিয়েছেন, আর যে সরকারী কর্ম্মচারী তাদের পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছেন, সরকারের উচিত তাদের উভয়েরই উপযুক্ত জবাবদিহি করানো। প্রত্যেকটি পরিবার মহিষ পায় নি। অবশ্য সকলের জন্যই পরে মহিষ ভাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু এসব অব্যবস্থা গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিকদের মনোবল হ্রাস করে।

সরকারী ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি চোখে পড়ল। ঔপনিবেশিকেরা অনেকে টিন পেয়েছেন, কিন্তু ঘর তৈরি

করার ব্যবস্থা না হওয়ায়, তাঁরা নিজেদের জমিতে নিজ নিজ ঘরে বাস করার সুযোগ এখনও পান নি। তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলে এক জায়গায় অনেকে মিলে আছেন।

ভগ্ন তটরেখা আর নারিকেলগাছের সারি

চট্টগ্রামের স্বাবলম্বী, উৎসাহী এবং উদ্যোগী দু'জন বাঙালী তরুণের (শ্রীপরিমল দাস আর শ্রীসুবলচন্দ্র চৌধুরী) সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল ওখানকার বাজারে। সরকারী সাহায্যে অন্য বাস্তুহারাদের সঙ্গে তাঁরাও পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়েছিলেন, কিন্তু নিজেদের উদ্যমে এবং চেষ্টায় দুই বন্ধু ওখানকার বাজারেই বৈদ্যুতিক আলোসহ একখানা ছোট ঘর মাসিক ১২৲ টাকায় ভাড়া নিয়ে কাপড় এবং মনিহারীর দোকান করেছেন। ছোট দোকানটি কয়েক মাস ধরে মন্দ চলছে না। পরিমলবাবু এতেই তৃপ্ত না থেকে দৈনিক ৩০৲ টাকায় একটা বাস ভাড়া নিয়েছেন। বাসটি পোর্ট ব্লেয়ার শহর থেকে দুপুরের পর কল্যাণপুর যায় এবং পরদিন সকালে আবার ফিরে আসে। ড্রাইভারের বেতন, পেট্রল, আর অন্য সব খরচই বাস-মালিকের। পরিমলবাবু কনডাক্টর হয়ে ঐ বাসে থাকেন। রাত্রিটা তিনি কল্যাণপুরেই কাটিয়ে দেন। তিন দিনের টিকিট বিক্রয়ের কথা শুনলাম—একদিন ৪০৲, একদিন ৫৭৲ আর একদিন ৪৬৲ টাকা হয়েছে।

নড়াইল পার্ব্বতী-বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্তীর কথাও উল্লেখযোগ্য। ভদ্রলোক এক হাঁটু কাদা মেখে ক্ষেত থেকে উঠে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে বিনয়বাবুর মত একজন করে কর্ম্মী সর্ব্বদা উপস্থিত থাকলে কেউ আর হতাশ ও নিরুদ্যম হবে না। বিনয়বাবুর স্ত্রী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, জলের কোনরকম ব্যবস্থা না হলে আমাদেরও হয়ত চলে যেতে হবে।

চাষের জন্য ওদেশে বৃষ্টির জলের অভাব নেই, কিন্তু স্থানে স্থানে গৃহস্থের জলের অভাব আছে। ওদেশে নদী নেই, নিত্য ব্যবহারোপযোগী ঝরণাও বিশেষ নেই। বর্ষার জল কোথাও কোথাও পাহাড়ে জমে থাকে, নানা ধারায় প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রেও চলে যায়। স্থানে স্থানে বসতির সন্নিকটে জল নেই। দূর থেকে জল বয়ে আনা কষ্টকর। সরকারী ভাবে কিছু অর্থ ব্যয় করে সর্ব্বত্র জলের ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। নলকূপ করে হোক, কূপ খনন করে বা পুষ্করিণী কাটিয়েই হোক অথবা পাইপ দিয়ে পাহাড় থেকে জল নামিয়ে এনেই হোক, যেখানে যেখানে নিকটে জল নেই সেই সেই স্থানে আশু জলের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। পোর্ট ব্লেয়ারে কলের জল আছে, উঁচুতে অবস্থিত অঞ্চলগুলিতে মিউনিসিপালিটির গাড়ি গিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে জল দিয়ে আসে। যে দেশে বৃষ্টিপাত বেশী, সরকারের চেষ্টা থাকলে সে দেশে অতি সহজেই জল সঞ্চয় করে রাখার কোন-না-কোন ব্যবস্থা হতে পারে। ওখানকার অনেক পরিবার ঘরের চাল বেয়ে যে বর্ষার জল পড়ে, পাত্রে ধরে তা সঞ্চয় করে রাখেন।

পোর্ট ব্লেয়ারের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই আমাদের কাছে ওখানকার হাসপাতালের বিশেষ সুখ্যাতি করেছেন, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। নূতন বসতিগুলির নিকটেই চিকিৎসকের প্রয়োজন। শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করাও অত্যাবশ্যক। ওখানে উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থা এখন নেই, কলেজ নেই। কিন্তু কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। প্রতি বৎসর ওখানকার কিছু কিছু ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। শহরে শ্রীদুর্গাদাস সাইগল নামে জনৈক ভদ্রলোকের একটা সিনেমা হাউস আছে। সরকার থেকে প্রতিদিন ছোট এক পাতা করে "প্রেস টেলিগ্রামস" ছাপান হয়। এই হচ্ছে ওখানকার সংবাদপত্র। এর চাঁদার হার মাসে বার আনা, বার্ষিক একসঙ্গে সাড়ে সাত টাকা। সমুদ্রের ধারে ধারে প্রচুর প্রবাল, শঙ্খ, ঝিনুক পাওয়া যায়। সমুদ্রতীর থেকে ওদেশে এক রকমের পাখীর বাসা সংগ্রহ করা হয়। এগুলি খুব চড়া দামে বিক্রয় হয়। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বেতারে সংবাদ পাঠানোর ব্যয় তারবার্ত্তা প্রেরণের খরচের সমান। মাসে একবার পনর-বিশ দিন অন্তর ওখানে জাহাজে চিঠিপত্র যায়। এটা বড় অসুবিধাজনক। বিমান অবতরণ-ক্ষেত্রের সংস্কারসাধন ক'রে সিঙ্গাপুরগামী কোন কোন বিমানে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়ত খুব কঠিন নয়। দক্ষিণ-ভারত থেকেও এখন ওদেশে শ্রমিক আমদানী করা হয় দেখলাম। আন্দামান যাবার পথে জাহাজে রাঁচি অঞ্চলের বহু শ্রমিককে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম—ওরা যাচ্ছিল ওখানে কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জ্জন করতে।

ম্যালেরিয়ার কোন চিহ্ন আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে প্রত্যক্ষ করি নি বটে, কিন্তু হাসপাতালে অনুসন্ধান করে জানলাম, ওখানেও ম্যালেরিয়া হয়, বনাঞ্চলে ম্যালেরিয়া আছে। তবে আমাদের দেশের চেয়ে ওখানে মোটের উপর অসুখ-বিসুখ কম।

গরমদেশ হলেও সমুদ্রের হাওয়ার দরুন কোন সময়েই গ্রীষ্মাধিক্য অনুভূত হয় না, আর আমাদের দেশে যখন শীতকাল তখনও ওখানে খুব বেশী ঠাণ্ডা পড়ে না, গরম কাপড়-চোপড়ের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

গ্রীষ্মমণ্ডলে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ২১৯ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ছোট ছোট শ-দুয়েক আর প্রধান পাঁচটি দ্বীপ নিয়ে এই আন্দামান। পোর্ট ব্লেয়ার বন্দর কলিকাতা থেকে জল-পথে ৭৮০ মাইল। মাদ্রাজ থেকে পোর্ট ব্লেয়ার ৭৪০ মাইল, আর রেঙ্গুন থেকে এর দূরত্ব ৩৬০ মাইল।

আন্দামান বেড়িয়ে আসবার মত জায়গা। ওখানে চীফ কমিশনারকে চিঠি লিখে অথবা টেলিগ্রাম করে পূর্ব্বেই যাওয়ার অনুমতি নিতে হয় আর জাহাজ ছাড়বার অন্ততঃ পনর দিন আগে কর্পোরেশন থেকে কলেরা-বসন্তের টিকা নিয়ে ছাপানো ফর্ম্মে তার একটি সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হয়। এস্. এস্. মহারাজা নামে একটা মাত্র জাহাজ আন্দামানে যাতায়াত করে। জাহাজ যাওয়া-আসার তারিখ এবং অন্যান্য সংবাদ পাওয়া যাবে 'টার্ণার মরিশস কোম্পানী'তে—টিকিটও ঐ কোম্পানীতে পাওয়া যায়। আন্দামান পর্য্যন্ত ডেকের ভাড়া কুড়ি টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর ত্রিশ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর পঁয়ষট্টি টাকা আর প্রথম শ্রেণীর একশ ত্রিশ টাকার মত। এখন সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া সাধারণ যাত্রীদের নিকট জাহাজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রয় করা হয় না। এরকম নিয়ম উঠে যাওয়া দরকার।

আন্দামানে একটা সরকারী "গেষ্ট হাউস" আছে। সেখানে খাওয়া-থাকার দৈনিক ব্যয় দশ টাকা। সাধারণ বাঙালীর পক্ষে এই ব্যয় অত্যধিক। আন্দামানে বাঙালী ভ্রমণকারীরা গিয়ে যাতে অল্প ব্যয়ে সাময়িক বাসস্থান পায়, অনতিবিলম্বে সে রকম ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের মনোযোগী হওয়া দরকার।

পোর্টব্লেয়ারের বাঙালী অধিবাসীরা বিশেষ অতিথিবৎসল। তাদের সৌজন্যই যে শুধু মুগ্ধ করে তা নয়, তাদের দ্বারা অনেক উপকারও পাওয়া যায়।

তবু থাক

শ্রীকরুণাময় বসু

একটি মেয়ের মুখ আজো মনে পড়ে,
শ্যামল কিশোরী মেয়ে কচি কচি ম্লান মুখে কাঁচা সোনা ঝরে;
বাতাসের ঢেউ লেগে এলোমেলো চুলগুলি ওড়ে,
একটি মেয়ের ছবি আজো মনে পড়ে।
আকাশের রং ছিল সেদিন সুনীল,
সবুজ বনের সাথে মোর মনে ছিল কোথা মিল!
জলের কাঁপন লেগে আলোছায়া করে ঝিলমিল,
আকাশের রং ছিল নবঘন নীল।
লাল মেঘ ছুঁয়েছিল লতার কুসুম,
হাওয়ায় সুবাস আসে চোখে মুখে আবছায়া ঘুম;
পথেতে ছড়ানো ছিল ফুলরেণু, রাঙা কুঙ্কুম,
লাল মেঘ ছুঁয়েছিল লতার কুসুম।
বলেছিলে কতো কী যে, ভুলে গেছি সব,
এইটুকু মনে আছে ধ্রুবতারা চেয়েছিল একাকী নীরব;
জলভারে কেঁপেছিল আঁখিপল্লব,
বলেছিলে কতো কথা, ভুলে গেছি সব।

মেঘলা দিনের শেষে একদিন ফুটেছিল জলে-ভেজা যুঁই,
বলেছিনু কানে কানে, আমরা ঝড়ের পাখী,
এই ছাদ মনে হয় বিদেশ বিভুঁই;—
এসো হেথা নীড় বাঁধি, মনে মনে ভালোবেসে হাতে হাত ছুঁই;
কতদূর পার হয়ে এনু মোরা ঝড়ের চড়ই।
ছেঁড়া মেঘে লাল আলো, মরি মরি কেমনে রাঙালো—
কুঁড়িজাগা করুণ চাঁপায়,
পাগল বাতাস বুঝি এলোমেলো
কচিপাতা দু'হাতে কাঁপায়;
গোধূলির লালমেঘ জেগেছিল রঙীন আভায়
কুঁড়িজাগা করুণ চাঁপায়।
তারপর পথে যেতে বলেছিলে, তবে আমি যাই,
তবে যাই, সুরে সুরে বেজেছিল শরতের করুণ সানাই;
শিশিরে চাঁদের আলো ছলছল ম্লান হ'ল, তুমি কাছে নাই,
বলেছিলে, আমি তবে ভোরের চাঁদের মত ধীরে ধীরে—
দিগন্তে মিলাই।
বলেছিনু, তবে যাও—তবু এই শরতের তারাভরা রাতে
একটি কুসুমকলি ভালোবেসে দিয়ে যেও হাতে;
তারপর চলে যেও স্মরণের সরুগলি পথে
ভালোলাগা এ জীবন পার হয়ে বহুদূর ভুলের জগতে!
তুমি তো রবে না জানি, এ জীবন মনে হবে ফাঁকা,
প্রেমের সমাধি-বেদী তবু থাক ফুলে ফুলে ঢাকা।

বিদ্যাপতির কবিতার বিভিন্ন স্তর

শ্রীসতীশচন্দ্র বক্সী

যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাহার অজস্র ধারা বাঙালীর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া' তুলিয়াছিল—তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, এই সব পদকর্ত্তার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছেন মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। চৈতন্য-পরবর্ত্তী পদাবলী সাহিত্য এমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে কবির ব্যক্তিগত প্রতিভা গোষ্ঠীগত কবি-প্রতিভার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বহু সমালোচক এই সব পদের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সব পদ এক একটি কবিগোষ্ঠীর রচনা। নামের ভনিতা এই সব কবিতায় যেন উপলক্ষ্য মাত্র। কাহার রচনায় যে কাহার ভনিতা প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সব সময় সহজসাধ্য নয়। মনে হয়, নামের ভনিতা দিবার একটা প্রথা ছিল তাই যেন ভনিতা দেওয়া হইয়াছে। বহু অপ্রসিদ্ধ বা স্বল্পখ্যাত কবি তাঁহাদের রচিত পদাবলী শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদের নামে চালাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি আত্মবিলোপ? এই আত্ম-বিলোপ কি ছিল তাঁহাদের সাধনার অঙ্গীভূত? যদি ধরিয়া লই যে ঐ সকল পদের ভাষা তাঁহাদেরই তথাপি একথা সত্য যে, ভাব তাঁহাদের মোটেই নিজস্ব নয়—ভাব ঐ কবিগোষ্ঠীরই ভাবধারা হইতে ধার করা। জনকয়েক শ্রেষ্ঠ কবি ছাড়া সাধারণ কবিদের রচিত পদাবলীতে এমন কোন ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাহার মধ্যে ভাবের স্বকীয়তা আছে। কবির ব্যক্তিসত্তা সেখানে শ্রেষ্ঠতর এক বিরাট ভাবসত্তার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তৎকালীন বৈষ্ণব পদাবলীর সমালোচনা অনেকটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তথাপি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদের রচনার মধ্যে যুগলক্ষণের অতিরিক্ত বিশিষ্ট কবি-প্রতিভার নিদর্শন খুঁজিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। চৈতন্য-পরবর্ত্তী কবিগণকে অনেকেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনাই অধিকাংশ কবির আদর্শ ছিল। পাছে রসাভাস ঘটে, পাছে* সুরসঙ্গতি নষ্ট হয় অথবা আচার্য্যগণের অনুশাসন লঙ্ঘিত হয়, এই আশঙ্কায় যেন একটা বিরাট মহা-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে দুই একজন মূল গায়েনের সঙ্গে সকল কবিই সুর মিলাইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির আবির্ভাব যখন হইয়াছিল তখন কবিগোষ্ঠীর কোন প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না—কেননা বিদ্যাপতির আবির্ভাব চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল।* সুতরাং বিদ্যাপতির রচনা কোন রসিকগোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত নহে এবং তিনি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব-বর্ত্তী বলিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্ত। বিশেষতঃ বিদ্যা-পতি বাঙালী নহেন—বাংলা ভাষায় কোন পদ তিনি রচনা করেন নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া চলিত (মৈথিলী?) ভাষায় পদরচয়িতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম পথিকৃৎ। এই হিসাবে বিদ্যাপতি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভার বিষয় বাদ দিলেও প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। বিদ্যাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। আধুনিক কালে কোন কোন বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রাহক রায়শেখরের কতকগুলি পদ বিদ্যাপতির নামে চালাইবার প্রয়াস পাইয়া-ছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহারা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অত্যন্ত স্থূল লক্ষণগুলিও বিস্মৃত হইয়াছেন। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিদ্যাপতির রচনায় ভক্তসুলভ আত্ম-নিবেদনের ভাব হয়তো মিলিতে পারে, কিন্তু চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের পদকর্ত্তাদের রচনায় সখিভাব ও দাস্যভাবের যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে বিদ্যাপতির রচনায় কোথাও সেরূপ দেখিতে পাই না। কেহ কেহ মনে করেন, শেখর ভনিতাযুক্ত

---

* চৈতন্যদেব সাধনায় মধুর ভাবের প্রবর্ত্তন করেন। মধুর ভাবের সহিত ঐশ্বর্য্য ভাব যুক্ত হইলে রসাভাস ঘটে। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

> ঐশ্বর্য্য ভাবেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
> ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥
> মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
> এই ভাবে করে যেই মোর শুদ্ধ রতি॥
> আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন।
> সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

* চৈতন্যচরিতামৃতে আছে, মহাপ্রভু বিদ্যাপতির পদ-গানে আনন্দ পাইতেন,

> চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
> কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
> স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
> গায় শুনে মনের আনন্দ॥

অন্যত্র,

> বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
> এই তিন মিলে করায় প্রভুর আনন্দ॥

'কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা" নামক পদটি বিদ্যাপতির। কিন্তু উক্ত পদের শেষের চরণ দুইটি এইরূপ,—

"যতনহি নিঃস্বরু নগর দুরন্তা।
শেখর আভরণ ভেল বহন্তা।।"

এখানে এমন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যেন কবি অভিসারিকা রাধার সহচরী হইয়া তাঁহার পরিত্যক্ত আভরণগুলি বহন করিয়া লইয়া সঙ্গে যাইতেছেন। ইহার মধ্যে যে একটা সেবাপরায়ণতার ভাব পরিস্ফুট তাহা চৈতন্য-পূর্ব্ববর্তী রচনায় কোথাও দেখা যায় না। বিশেষতঃ এই পদটি রায়শেখরের দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর অন্তর্গত। কিন্তু মিথিলার কোন পুঁথিতে দণ্ডাত্মিকা পদ পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাকে বিদ্যাপতির পদ বলা হয় কেমন করিয়া?

যাহা হউক, মোটের উপর এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মধ্যযুগে বাংলায় যে বিরাট পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার তোরণদ্বারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই যুগ্ম নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। বিদ্যাপতি যদিও পদকর্তাদের মধ্যে প্রাচীনতম ও মিথিলার অধিবাসী তথাপি বাঙালী যুগে যুগে তাঁহার কাব্য হইতে চিরন্তন বিরহ-মিলনের রস সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে আর চণ্ডীদাসের ভাবধারা মিশিয়া আছে বাঙালীর অশ্রুধারার সহিত।

বিদ্যাপতির কবিতায় বাৎসল্য বা বাল্যলীলার কোন পদ নাই—তিনি প্রধানতর মধুর রসের কবি। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা কিশোরী। বয়ঃসন্ধির পটভূমিকায় তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে অর্দ্ধস্ফুট কলিকা। প্রথম যৌবনের মোহন স্পর্শে তাঁহার দেহতট বিচিত্র অনুভূতির জোয়ারে নিয়ত স্পন্দিত। চণ্ডীদাসের রাধা প্রথম হইতেই একটি স্বতন্ত্র ভাবময়ী রসমূর্ত্তি—তাঁহার কোন ক্রমবিকাশ নাই, অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া বিদ্যাপতির রাধিকার সুপ্ত যৌবনচেতনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে,—

জব গোধুলি সময় বেলি, ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
জনু নবজলধরে বিজুরি রেহা,
দ্বন্দ্ব পাসরি গেলি,
ধনি অলপ বয়সী বালা, জনু গাথনি পুহপমালা
যোড়ি দরশনে আশ না মিটল,
বাঢ়ল মদন জ্বালা।

ইহার পর কবি আমাদিগকে এমন স্তরে লইয়া গেলেন যাহা রাধিকার বয়ঃসন্ধিকাল। রাধিকা এখন শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত—কবি এই স্তরের নানা ভঙ্গির চিত্র আঁকিয়াছেন—এই চিত্রগুলি বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তা রাধিকার দেহ-মনের নিখুঁত প্রতিরূপ।

কেলিক রভস জব সুনে আনে।
আনতহি হেরি ততই দেই কানে।।
ইথে যদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাখি হাসি দএ গারি।।

বয়ঃসন্ধির বর্ণনা কাব্যের দিক দিয়া যেমন অনবদ্য, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও তেমনি সত্য।

ইহার পর অভিসারের স্তর। বিদ্যাপতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অভিসারের প্রকরণগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবে ও ভাষায় তাঁহার এই স্তরের কবিতাগুলি অতুলনীয়। তিনি অভিসারের বিভিন্ন বিচিত্র রূপের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্যোগময়ী ঘনান্ধকার রজনীতে শ্রীমতী নীলবসন পরিধান করেন, আবার জ্যোৎস্না-বিধৌত শুক্লা রজনীতে তিনি অঙ্গে শ্বেতচন্দন অনুলেপন করিয়া শ্বেতবসন পরিধান করেন।

অভিসারের বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থানেই আছে। কিন্তু বিদ্যাপতি শ্রীমতীকে পুরুষবেশে পর্য্যন্ত অভিসারে বাহির করিয়াছেন। অভিসারিকার এই চরম দুঃসাহসিকতার নিদর্শন আর কুত্রাপি পাই নাই। বিদ্যাপতি যত প্রকার অভিসারের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে বর্ষাভিসারই শ্রেষ্ঠ,—

রয়নি কাজর সম, ভীম ভুজঙ্গম,
কুলিস পড়এ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোষে বরিখ ঘন
সংশয় পর অভিসার।।

এই অভিসারের পদগুলিতে প্রণয়ীর সহিত মিলনোৎকণ্ঠাকে অনুপ্রাস ও শব্দঝঙ্কারের সাহায্যে এবং ছন্দের ইন্দ্রজালে বিচিত্রমধুর রূপ দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী স্তর হইতেছে মাথুর বা বিরহ। বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার নিদর্শন এই স্তরের কবিতাগুলিতেই পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি এখানে প্রচলিত কবিরীতি অনুসরণ করেন নাই। অভিসারের স্তর পর্য্যন্ত আমরা বিদ্যাপতির কবিতায় দৈহিক মিলন-কামনাই লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু এই মাথুর স্তরে আসিয়া কবির দেহকামনামূলক কবিতার রূপান্তর দেখিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাই। এই স্তরে যে অশ্রুধারার ভিতর দিয়া রাধিকার দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ হইল সেখানে চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির গভীর ভাবসাদৃশ্য দেখিতে পাই। এইখানে বিদ্যাপতির রাধা দেহধারিণী হইয়াও দেহাতীত—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অধিবাসিনী হওয়া সত্ত্বেও অতীন্দ্রিয় লোকে উত্তীর্ণ, চণ্ডীদাসের রাধারই ন্যায় একটি ভাবময়ী রসমূর্ত্তিতে পরিণত। সেই লাস্যময়ী প্রগল্ভা নায়িকা যোগিনীতে পরিণত হইয়াছেন, তাই—

পিয়া বিনা পাজর ঝাঁঝর ভেল।

শ্রীমতী আরও বলিতেছেন,

হাম সায়রে তেজব পরাণ।
আন জনমে হোয়ব কান।
কান-হোয়ব জব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা।

এই বিষাদের সুরেরই প্রতিধ্বনি পাইতেছি চণ্ডীদাসের পদে,

(আমি) মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, এই "বিরহ মর্ম্মান্তিক হইলেও তাহা বিশ্বাস-মধুর ও মৃত্যু-বিভীষিকা হরণ করে।"

বিশ্বপ্রকৃতি আপন সৌন্দর্য্যভাণ্ডার হইতে অমূল্য বৈভব দিয়া তিল তিল করিয়া রাধাকে নিরুপমা করিয়া তুলিয়াছিল—কিন্তু আজ প্রণয়াস্পদ কাছে নাই, রূপ যৌবনে তাঁহার আর কি প্রয়োজন? তাই শ্রীমতী আবার বিশ্বপ্রকৃতিকে তাহার দান ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছেন। আবার বর্ষা তাহার 'মেঘময় বেণী' খুলিল, আবার ময়ুর-ময়ুরীর নৃত্য আরম্ভ হইল—কিন্তু তাঁহার বয়ঃসন্ধিকালে তাহারা আসিয়াছিল মিলনাকাঙ্ক্ষার পুলকানুভূতি জাগাইয়া, এবার আসিল বিরহ-বেদনাকে দ্বিগুণীকৃত করিয়া।

হে সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।

এ গানে শুধু একটি বিরহিণী নারীর চিত্রই ফুটিয়া উঠে নাই, শ্রীমতীর বিরহ-বেদনাকে আশ্রয় করিয়া যেন জগতের সকল বিরহিনীর বেদনা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এক চিরন্তন বিরহ-সঙ্গীতে।

এই দুঃসহ বিরহবেদনা ক্রমেই শ্রীমতীর সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। শয়নে স্বপনে সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণই তাঁহার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এই নিদারুণ বিরহ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছে, বাস্তব ও কল্পনার পার্থক্য তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন—কল্পনায় তিনি কৃষ্ণের সহিত মিলনানন্দ উপভোগ করিতেছেন,—

অনুখন মাধব, মাধব সোঙারিতে,
সুন্দরী ভেলি কানাই।

এখানে আমরা একটি অতীন্দ্রিয় মিলনের দিব্যানন্দ লাভের ব্যঞ্জনা স্পন্দিত হইতে দেখিতেছি। এই যে নিত্য বৃন্দাবনের স্বপ্ন—যে হৃদয়-বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ আর হারাইয়া যান না—ইহা যেন আত্মদর্শনেরই নামান্তর। শ্রীমতী বলিতেছেন,—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চির দিন মাধব মন্দিরে মোর॥

কাল্পনিক এই মিলনানন্দে শ্রীমতীর নিকট যেন জীবন-যৌবন সবকিছুই সার্থক বোধ হইতেছে। কৃষ্ণবিরহে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য তাঁহার নিকট ম্লান মনে হইত, আজ আবার মানস-মিলনের আনন্দানুভূতিতে সেই প্রকৃতিই তাঁহার চোখে অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাই,—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু।
পেখনু পিয় মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দা॥

প্রিয়তমের সহিত মিলনানন্দের কি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি শ্রীমতীর মুখনিঃসৃত নিম্নোক্ত কথাগুলিতে,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু।
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু।
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

গ্রিয়ারসন্ সাহেব বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "First yearning of the soul after God"। বাস্তবিকই এই সমস্ত পদে দৈহিক কামনা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ভাগবতী কামনায় রূপান্তরিত হইয়াছে। পরমাত্মার জন্য মানবাত্মার যে চিরন্তন বেদনা সেই বেদনার রসে এই কবিতাগুলি অভিসিঞ্চিত।
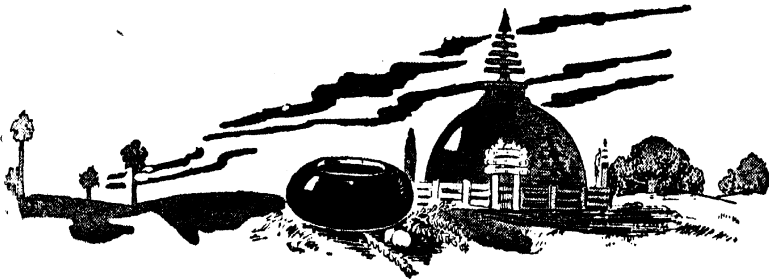
বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন

স্বদেশী যুগের প্রথম দিকে এমন একটা সময় ছিল যখন পুলিনবিহারী দাসের নাম স্বদেশী মনোভাবাপন্ন প্রত্যেক যুবকের মুখে মুখে ফিরিত। 'যুগান্তরে'র পুলিন দাসের নাম বিপ্লবী মনোবৃত্তিসম্পন্ন যুবকসম্প্রদায়ের মনে একটা সম্ভ্রম এবং গৌরবের ভাব জাগাইত। 'যুগান্তর' খ্যাতিলাভ করিয়াছিল নির্ভীক বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের জন্য, আর পুলিন দাস বিখ্যাত হইয়াছিলেন স্বকীয় সংগঠন-প্রতিভার জন্য। দেশের যুবশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুশিক্ষিত একটি বিরাট বৈপ্লবিক সংস্থায় সংবদ্ধ করিয়া তিনি যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা সচরাচর মিলে না। তিনি একক এক হাজার লোকের উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন এবং তাঁহার হাতের লাঠি যখন বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে থাকে তখন বন্দুকের গুলিও উহাতে প্রতিহত হইয়া ঠিকরাইয়া পড়ে, তাঁহার দেহ স্পর্শও করিতে পারে না, ইত্যাদি নানা রকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। নিরক্ষর এবং ধর্ম্মান্ধ মুসলমান জনতাকে বিভ্রান্ত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া ব্রিটিশরাজ যে কূটনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা প্রধানতঃ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কার্য্যকারিতার জন্যই অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছিল। তাঁহার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী হিন্দুদের বহুস্থানে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কোন অবস্থায়ই প্রতিশোধমূলক পন্থা হিসাবে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া অথবা লুঠপাট করিয়া নিজেদের শক্তির অপব্যবহার করে নাই।

ইংরেজ সরকার যে পুলিন দাসের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু তাঁহার সকল কাজ এত সুপরিকল্পিত ছিল ও তাঁহার কর্ম্মীরা এত সুশিক্ষিত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংহত ছিলেন যে, তাঁহাকে কোনপ্রকার মামলায় জড়াইবার প্রয়াস পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হইয়াছে। একবার ঢাকায় তাঁহাকে কোন এক মামলায় জড়িত করিবার চেষ্টা হয়। বেণ্টিঙ্ক সাহেব তখন ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট,—মামলাটি ইঁহার হাতে ছিল। ইনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান এবং বিবেকবান বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে পুলিনবাবুদের দায়রায় সোপর্দ্দ করিতে ইনি অস্বীকার করেন। সরকারের মান আর থাকে না দেখিয়া বেসরকারী ইংরেজ—শাসন ব্যাপারে সেকালে ইঁহাদের প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না—এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি সকলে মিলিয়া বেণ্টিঙ্ককে ধরিয়া বসিলেন যেমন করিয়াই হোক, ইঁহাদের সেসনে দিতেই হইবে। শেষ পর্য্যন্ত এই সর্ত্তে রক্ষা হইল, বেণ্টিঙ্ক সাহেব ইঁহাদের দায়রা সোপর্দ্দ করিয়া সরকারের মুখরক্ষা করিবেন, কিন্তু দায়রা জজকে ইঁহাদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। যথাকালে দায়রা আদালত হইতে ইঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন।

পুলিন দাসের সমিতি কিরূপে ভাঙিয়া দেওয়া যায় এবং তাঁহাকে হাতের মুঠার মধ্যে পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বদাই তদানীন্তন বাংলা-সরকারের একটা বড় ভাবনার বিষয় ছিল। ১৯০৮ সনে আলিপুর বোমার মামলায় যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইল তাহাতে দেশে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের একটা সুসংবদ্ধ প্রয়াস চলিতেছে ইহা কার্য্যতঃ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারের উপরোক্ত সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করার বহুবাঞ্ছিত সুযোগ মিলিল। কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া যাবতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন এবং ভারত-সচিব কয়েকজন বহুমানাস্পদ নেতাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। কেবল বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় দিনকয়েক পূর্ব্বে বিলাত যাত্রা করায় অল্পের জন্য এই নির্ব্বাসন-দণ্ড হইতে বাঁচিয়া গেলেন।

প্রকাশ্য কার্য্যকলাপ বন্ধ হইয়া গেলে মূল কর্ম্মীরা ভিতরে ভিতরে অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। এদিকে পুলিনবাবুকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য সরকার সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। বরিশালের কোন এক ডেপুটিনন্দনকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ষড়যন্ত্রের মামলা দাঁড় করানো হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিনবাবুকে সেই মামলায় জড়ানো সম্ভব হইল না। শেষ পর্য্যন্ত ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় তাঁহাকে সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে করিলেন।

* * *

১৯১১ সনের পরে (ঠিক কোন্ সনে এখন মনে পড়িতেছে না) যখন বর্ত্তমান লেখক অন্যান্যদের সঙ্গে পোর্ট ব্লেয়ার 'সেলুলার' জেলে আবদ্ধ ছিলেন তখন হঠাৎ একদিন জানা গেল মহারাজা জাহাজে নূতন কয়েকজন 'বোম্‌গোলে-ওয়ালা' আসিয়াছেন। কয়জন আসিয়াছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোন্ মামলা, বন্দীদের পরিচয় কি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উহারা কি বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া থাকিতে পারেন, ইত্যাদি নানা জল্পনা-কল্পনায় বন্দীশালার একঘেয়ে জীবন বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিল। যখন জানা গেল নবাগত বন্দীদের মধ্যে একজন ঢাকার পুলিন দাস তখন আমাদের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক্ এবং কৈশোরের

বহু বৈপ্লবিক কল্পনা এবং ভাবধারণার সহিত জড়িত এই স্বনামখ্যাত কর্ম্মীর সহিত অচিরেই সাক্ষাতের সম্ভাবনায় আমাদের তরুণ মন বিচিত্র ভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে 'বোমগোলেওয়ালা'দের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং মাঝে মাঝে উহাদের এক ওয়ার্ড হইতে অন্য ওয়ার্ডে বদলি করা হইত। ইহাতে পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিত। পুলিন দাসের সঙ্গে পরিচিত হইবার সেই সুযোগ কবে আসিবে, তাহার জন্য অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অবশেষে সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিনটি আসিল। যতদূর মনে পড়ে, আমি সেই সময়ে এক নম্বর ওয়ার্ডের নিচের তলার একটি কুঠুরিতে আছি। পুলিনবাবু সেই ওয়ার্ডে বদলি হইয়া আসিলেন। ইহার পূর্ব্বেই নানা উপলক্ষ্যে তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, এবার তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য ঘটিল। দেখিলাম এক সৌম্যমূর্ত্তি আত্মস্থ পুরুষকে, যাহার মধ্যে পরুষ ভাব নাই, যিনি কারা-জীবনকে নিতান্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, কোনরূপ চঞ্চলতা এবং বিক্ষোভ যাহার মধ্যে নাই এবং রূঢ় না হইয়াও যিনি সঙ্কল্পে বজ্রের মত কঠোর। কিছুকাল সান্নিধ্য লাভের পর বুঝিলাম মাতৃভূমিকে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সমৃদ্ধিতে মহিমান্বিত করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বস্ব হারাইয়াও তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই; তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচন রূপ মহান্ লক্ষ্যে নিবদ্ধ এবং ক্ষুদ্রতর কোনকিছুই তাঁহাকে সেই লক্ষ্য হইতে বিভ্রান্ত করিতে অক্ষম। চিন্তাধারা এবং আদর্শের মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও এই আদর্শ কর্ম্মীর প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া আসিল।

* * *

তখনকার দিনে ঢাকায় একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহার সুঠাম শরীর এবং জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল হইতে তাঁহার বয়স কত হইয়াছিল অনুমান করা সহজ ছিল না। অতিবৃদ্ধেরাও বলিতেন, উঁহাকে বরাবর ঐ একই রকম দেখিয়া আসিয়াছেন। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি ঈষৎ হাস্য করিতেন মাত্র, কিছুই উত্তর করিতেন না। খুব ফিটফাট হইয়া থাকিতেন বলিয়া ইনি বাবু সন্ন্যাসী নামে পরিচিত ছিলেন। যে রাস্তায় এঁর আশ্রম ছিল, ঐ রাস্তা 'স্বামীবাগ' নামে পরিচিত। পুলিনবাবু ইঁহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং সকল প্রকার সমস্যায় ইঁহার উপর তিনি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন বলিয়া মনে হয়। এঁর বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাও সকল সময়েই পুলিনবাবু ও তাহার দলের লোকেদের কাজে লাগিত। একবার তরবারি খেলিতে গিয়া একজনের দেহে গভীর ক্ষত হয়। স্বামীজীর নির্দ্দেশে বেগুনপাতা ছেঁচিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দু'দিনেই ক্ষত সারিয়া উঠিল। লাঠিখেলায় দেহে ক্ষত হইলে বেগুনপাতা ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদাই সুফল পাইয়াছি। পুলিনবাবুর ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে গিয়া একবার জেলে একটা মজার কাণ্ড ঘটিয়াছিল। অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আমাশয় হইয়াছিল, পুলিনবাবু ইঁহাকে শুকনো লঙ্কা খাইবার ব্যবস্থা দেন। ব্রহ্মচারী মহারাজ পশ্চিমবঙ্গবাসী, বাঙালদেশের মত লঙ্কা খাইতে অভ্যস্ত নহেন, পুলিনবাবুর ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে গিয়া মারা যান আর কি!

পুলিনবাবু সকাল বেলা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সূর্য্যপ্রণাম করিতেন। কিছুক্ষণ সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া জপ করিতেন। কাজের সময় একমনে কাজ করিয়া যাইতেন, কর্ত্তৃপক্ষকে খুশী করিবার কোন প্রয়াসও পাইতেন না, আবার নিজের কাজেও কোনরূপ ফাঁকি দিতেন না। অবসর সময়টুকু সদালোচনায় বা বই পড়িয়া কাটাইতেন। তাঁহার নিকট কালিপ্রসন্ন সিংহের একখানা মহাভারত ছিল, ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বই তাঁহার কাছে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই বইখানি তিনি সর্ব্বদা খুব নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেন। দেশের হৃত স্বাধীনতা বাহুবলে পুনরুদ্ধার করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার স্বপ্ন, অন্য কোন উপায়ের কথা তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। অস্ত্রবল ব্যতীত অন্য কোন শক্তির নিকট ইংরেজ নতি স্বীকার করিবে, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। আত্মরক্ষার ও আক্রমণের বিবিধ কৌশল, শস্ত্রবিদ্যা, রণনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দেশের বহুযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার একটা অদম্য পিপাসা ছিল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এবিষয়ে কি আলোক পাওয়া যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্ত্যের যাহা কিছু ভাল তাহা গ্রহণ করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। পাশ্চাত্ত্য সামরিক শৃঙ্খলার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার অন্ধ অনুকরণ করেন নাই; উহাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। বিপ্লবী সংস্থার গঠনপ্রণালী সম্পর্কে তাঁহার মনে একটি সুস্পষ্ট ছক ছিল। রুশীয় ইস্তাহার "(Russian Pamphlet)" নামে পরিচিত ইস্তাহারে বিপ্লবী সংস্থার যে ছক দেওয়া হইয়াছিল তাহার সহিত পুলিনবাবুর ছকের খুঁটিনাটি বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও কার্য্য-বিভাগ ও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্র সংস্থার তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত তাঁহার ব্যবস্থা ছিল উহারই ন্যায় বিজ্ঞানসম্মত, সুপরিকল্পিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁহার পরিকল্পনায় কোথাও অস্পষ্টতা ছিল না। উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপন্থা সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁহাকে কখনও গোঁজামিল দিতে দেখি নাই; ইহা কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

নূতন নূতন বিষয় শিখিবার আগ্রহ এবং উৎসাহ পুলিনবাবুর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের প্রকৃষ্ট কোন কৌশল বা অভিনব কোন প্রণালীর সন্ধান পাইলে তাহা শিক্ষার জন্য যে-কোন প্রকার কষ্ট স্বীকারেই তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। বর্ত্তমান শতকের প্রথম দিকে শ্রীরামপুরে একজন তুরস্কদেশীয় ভদ্রলোক বাস করিতেন, ইনি "প্রফেসার মূর্ত্তাজা" নামে নিজের পরিচয় দিতেন। তরবারি চালনায় ইঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। ইহা ছাড়া আত্মরক্ষার কতকগুলি বিশেষ কৌশল ইনি শিক্ষা দিতেন। ছোট লাঠি, একটি রুমাল, বস্ত্রখণ্ড, এমন কি শুধু হাতে বহু আততায়ীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার কৌশল এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন বিশেষ বিদ্যা যাঁহাদের আয়ত্ত, তাঁহারা সবটুকু সহজে অপরকে দিতে চাহেন না। পুলিনবাবু প্রোফেসার মূর্ত্তাজার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত ভাব করিয়া বহু আয়াসে তাঁহার নিকট হইতে কিরূপে এই সকল কৌশল আয়ত্ত করেন, মাঝে মাঝে তাহা বর্ণনা করিতেন। তাঁহার যাবতীয় অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অধিকতর সুষ্ঠু যে সকল প্রণালী তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যেরা যোগ্য উত্তরাধিকারীর মত সযত্নে এই সকল প্রণালী সংরক্ষণ করিলে এবং উহাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিলে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইবে।

পুলিনবাবুর মতামতসমূহ দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট ছিল। সংস্কারমুক্ত মন লইয়া সকল প্রকার বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইয়া তিনি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহা সহজভাবে এবং সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতেন বলিয়া তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে কোন অসুবিধা হইত না। সে যুগে আমাদের ধারণা ছিল যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সকলপ্রকার দুঃখবিপদ বরণ করিয়া লইবার যোগ্যতালাভের জন্য চিরকৌমার্য্য অত্যাবশ্যক। পুলিনবাবুর মত "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" কর্ম্মীদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা উপলব্ধি করি দেশের মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী হইবার পথে বিবাহিত জীবন প্রতিবন্ধকস্বরূপ নয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে পুলিনবাবু বলিলেন, "আপনারা বিয়ে করবেন। আমাদের দেশে স্ত্রীকে শক্তি বলে কেন বিয়ে না করলে বুঝতে পারবেন না। তা ছাড়া বিয়ে করলে গণ্ডী প্রসারিত হয়।" সামান্য কয়টি কথায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল। মহৎ আদর্শের জন্য দুঃখবরণ করিতে মেয়েদের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। পিতা, মাতা, স্বামী অথবা সন্তানের আদর্শকে জয়যুক্ত করিবার জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকার তাঁহারা সহজভাবেই করিতে পারেন। তামাকপাতা ব্যবহারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়া একবার স্থির করিলাম 'সুখা' (বা 'খইনি') খাইবার অভ্যাস করিব। প্রথম চেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় যখন বমনোদ্রেক হইল তখন উহার কারণ জানিয়া পুলিনবাবু বলিলেন—একাজ কখনও করবেন না। গুরুগোবিন্দ শিখমণ্ডলীতে তামাক সেবন নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। নেশাখোরদের উপর দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আর একজনকে নেশা করতে দেখলেই তারা কাজ ভুলে নেশা করতে বসে যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুলিনবাবুর স্বপ্ন ছিল নিজ বাহুবলে প্রতিপক্ষকে সম্মুখ-সংগ্রামে পরাভূত করিয়া মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন করিবেন। কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা তাঁহার নিতান্তই নিরামিষ মনে হইত। কংগ্রেসের পন্থায় যে তাঁহার আস্থা নাই, একথা তিনি খোলাখুলি বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টায় কখনও নিজের শক্তি তিনি ক্ষয় করেন নাই। যে স্বজাতিদ্রোহ এবং ঈর্ষা ও যে ক্ষমতালোলুপতা যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের অধঃপতনের কারণ হইয়াছে এবং যাহা এখনও আমাদের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন। কারান্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলেন অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার সাবেক কর্ম্মপন্থার উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাব তখন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে তাঁহার নিজ আদর্শ অনুযায়ী 'মানুষ' তৈরির কাজে লাগিয়া গেলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই সাধনায়ই রত ছিলেন। বাংলার যুবকেরা তাঁহার আদর্শের অনুসরণে সর্ব্বপ্রকার আত্মধ্বংসী মনোবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া দেশ এবং সমাজের মঙ্গলকামনাকেই একমাত্র লক্ষ্য করুন, তাহা হইলেই তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা জয়যুক্ত হইবে।

জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্পোন্নতির মূল সূত্রের সন্ধান

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

আধুনিক সভ্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে রাসায়নিক শিল্পের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। কারণ বসন-ভূষণ, কাগজ-কালি-কলম, ঔষধ-পথ্য, যান-বাহন প্রভৃতি প্রত্যেকটি জিনিষই রাসায়নিক শিল্পের দান। এমন কি টেলিফোন, টেলিভিসন, রেডিও, রাডার, মায় আণবিক বোমার উপাদানও রাসায়নিক শিল্প থেকেই উৎপন্ন হয়।

যাঁরা কলেজে পড়েছেন তাঁদের মনে রসায়ন-শাস্ত্র কথাটির সঙ্গে পচা ডিমের গন্ধযুক্ত একটি অপ্রীতিকর পরিবেশের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অনেকেই জানেন রসায়নশাস্ত্র পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর পরিচয় বহন করে। এই শাস্ত্রের কল্যাণে মানুষ জানতে পেরেছে যে, পৃথিবীতে জীব উদ্ভিদ ও মৃৎ-প্রস্তরাদি যা-কিছু আছে সেগুলি মূলতঃ ৯২টি মৌলিক পদার্থের সমাবেশে গঠিত। ভাষার অসংখ্য শব্দ যেমন বর্ণমালার কয়েকটি মাত্র অক্ষরের বিভিন্ন প্রকার সমাবেশে গঠিত, এও যেন সেইরূপ। এই শাস্ত্রই হীরক ও কয়লাকে একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ বলে সপ্রমাণ করেছে। একদিকে এই শাস্ত্র যেমন পৃথিবীর বায়ু. জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর, জীব ও উদ্ভিদ দেহের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে, তেমনই এই শাস্ত্র বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের সমাবেশে নূতন নূতন পদার্থ প্রস্তুতির কৌশলও শিক্ষা দিয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই এটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। বাংলাদেশের এক প্রকার উদ্ভিদ থেকে নীল তৈরির কথা অনেকেই শুনেছেন। গত শতাব্দীর শেষ দশকেও ভারতবর্ষ থেকে পাঁচ কোটি টাকার উপর খাঁটি নীল ইউরোপে চালান যেত, কিন্তু জার্ম্মান রাসানিকগণ উদ্ভিজ্জাত নীল বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ আবিষ্কার করার পর আলকাতরার ভিতরকার কতকগুলি পদার্থ থেকে রাসায়নিক উপায়ে অবিকল উদ্ভিজ্জ নীলের ন্যায় রঞ্জন-পদার্থ প্রস্তুত করে ফেললেন। শীঘ্রই জার্ম্মানীর রাইন নদীর তীরে লুডভিগ সহাফেনের বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডা ফাব্রিক নামক কারখানায় প্রথিতযশা রাসায়নিক হাইনরিখ কারোর তত্ত্বাবধানে এই নীল প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হতে আরম্ভ হ'ল। ফলে বাংলা ও বিহারের নীলের চাষ ধীরে ধীরে উঠে গেল। এ ছাড়া রাসায়নিক উপায়ে এমন সব পদার্থও প্রস্তুত হয় যেগুলির অস্তিত্ব ইতি-পূর্ব্বে পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের হাতে যে বেলুন দেখা যায়, সেগুলি প্রস্তুত হয় এইরূপ একটি পদার্থ থেকে। কৃত্রিম রেশম ও নাইলোনের বস্ত্রাদি, প্লাসটিকের চিরুণী, ঘড়ির ফিতা, বেল্ট প্রভৃতি এবং বেকে-লাইটের পেয়ালা, শিশির ছিপি ও আসবাবপত্রাদি এখন আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ। কৃত্রিম রেশম, নাইলোন প্রভৃতি প্লাসটিক প্রকৃতপক্ষে রসায়ন-শাস্ত্রেরই দান। সকলেই এখন এসব দেখছেন বলে এগুলির নাম উল্লেখ করা হ'ল। বস্তুতঃ কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, চর্ম্মরোগ প্রভৃতির অসংখ্য আধুনিক ঔষধ, কৃত্রিম রং, কৃত্রিম সুগন্ধি ও বিস্ফোরক পদার্থ এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সব পদার্থ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর জীবও উদ্ভিদ-জগতে কিংবা মৃত্তিকা বা প্রস্তরে কুত্রাপি দেখা যায় নি। এগুলি সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিকগণেরই সৃষ্টি।

আমরা দেখলাম যে, রাসায়নিক শিল্প রসায়ন-শাস্ত্রের জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ থেকেই জার্ম্মানীতে এমন কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনীষী জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা রাসায়ন-শাস্ত্রকে অল্পদিনের মধ্যেই সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সমর্থ হন এবং তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ অবলম্বনে জার্ম্মান জাতি রাসায়নিক শিল্পসৃষ্টিতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই সব জার্ম্মান মনীষীর নাম মানবজাতি চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

সুবিখ্যাত ফ্যারাডে, ডেভি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে ইংলণ্ডে কষ্টিক সোডা, সোডা, ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার এবং সালফিউরিক প্রভৃতি এসিড ও তৎসম্ভূত লবণ-পদার্থ প্রভৃতি অজৈব রাসায়নিক শিল্প যথেষ্ট প্রসার-লাভ করলেও জৈব রসায়নশাস্ত্রের উপর যার ভিত্তি এবং পাথুরে কয়লা যার জননীস্বরূপ—সেই জৈব রসায়ন-শিল্পের বিকাশ গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে আদৌ হয় নি। এই শাস্ত্র এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্প সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মানদেরই সৃষ্টি। আর প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত এই শিল্পে জার্ম্মানদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্পের সুতিকাগৃহ ছিল জার্ম্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক্‌পাল গবেষকগণের গবেষণাগার। এই সব মনীষীর দান মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। এঁদের কয়েকজনের বিচিত্র জীবন-কাহিনী এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে।

লিবিগ (১৮০৩-১৮৭৩)

১৮০৩ সালের ১২ই মে তারিখে জার্ম্মানীর ডারমষ্টাট শহরে লিবিগের জন্ম হয়। এঁর পিতা ছিলেন কৃষক-পরিবারের সন্তান। কিন্তু তিনি একটি ছোট ল্যাবরেটরি খুলে রং, বারনিশ প্রভৃতি তৈরি করে ব্যবসা চালাতেন। লিবিগ ছেলেবেলা থেকেই এই ল্যাবরেটরির কাজ পর্য্যবেক্ষণ করতেন এবং সুযোগ পেলেই নিজেও নানাপ্রকার পরীক্ষা করতেন। ১৮২০ সালে তিনি 'বন' বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিষ্ট্রি পড়তে সুরু

করেন। অঙ্কশাস্ত্র এবং লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইংরেজী ও ইটালীয় ভাষাতেও তাঁর বেশ দখল ছিল। কিছুদিন এরলাঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্যারিসে সুবিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক গেলুসাকের নিকট শিক্ষালাভ করে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তিনি গিসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫২ সাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ যে পদ্ধতিতে করা হয় লিবিগই তাহা আবিষ্কার করেন। লিবিগের নাম তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বিখ্যাত রাসায়নিক ভোয়েলারের নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এঁর সহযোগিতায় লিবিগ বেনজয়িক কম্পাউণ্ডগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রসায়নশাস্ত্রের শিক্ষাদানের প্রবর্ত্তনও করেন লিবিগ এবং এর ফলেই জার্ম্মানীতে দলে দলে নিপুণ রাসায়নিকের সৃষ্টি হয় আর এঁরা জার্ম্মান রঞ্জন-শিল্পের উৎকর্ষ-সাধনে আত্মনিয়োগ করাতে অল্পদিনের মধ্যেই ঐ শিল্প দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈব রসায়নশাস্ত্রে বহু মূল্যবান গবেষণা করা ছাড়া জীবন-রসায়ন এবং কৃষি-রসায়নের ভিত্তিও লিবিগই স্থাপন করে যান। লিবিগের প্রতিষ্ঠিত 'আনালেন' নামক সুবিখ্যাত রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক পত্রিকা এখনও রসায়ন-শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা।

নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার সঙ্গে একাগ্র সাধনা, তেজস্বিতা, বাগ্মিতা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল অনুপ্রেরণা জাগাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ। লিবিগের অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে হফমান এবং কেকুলের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হফম্যান (১৮১৮-১৮৯২)

১৮১৮ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ফ্রাঙ্কফুর্ট অঞ্চলের গিসেন শহরে হফম্যান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন স্থপতি এবং আদর্শ চরিত্রের লোক ছিলেন। হফম্যান শৈশবেই পিতার বিভিন্ন সদ্‌গুণের অধিকারী হন। ১৮৩৬ সালে হফম্যান গিসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ক্লাসে ভর্ত্তি হন। কিন্তু গণিত এবং বিজ্ঞানের ক্লাসেও তিনি যোগ দিতেন। ঐ সময় লিবিগ ছিলেন গিসেনের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। যুবক হফম্যান লিবিগের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে রসায়ন-শাস্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যক্রমে আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত ক্ষারধর্ম্মী এনিলিন নামক পদার্থ তাঁর প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল। নানারূপ পরিবর্ত্তন-প্রবণ এই পদার্থ তাঁর মত প্রতিভাবান রাসায়নিকের হাতে পড়ে রঞ্জন-শিল্পের প্রধান উৎপাদক বলে প্রমাণিত হ'ল। ইতি-পূর্ব্বে, ১৮২৬ সালে অটো উনফেরডরবেন নামক বার্লিনের একজন রাসায়নিক নীল 'ডিসটিল' (পরিস্রুত) করে তেলের মত একটি পদার্থ পান এবং নীল থেকে উৎপন্ন বলে এর নাম দেন 'আ-নিলিন'। হফম্যান আলকাতরাজাত বেনজিন থেকে রাসায়নিক উপায়ে নাইট্রোবেনজিন ও তা থেকে এনিলিন আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত এই দ্রব্য যে নীল থেকে প্রাপ্ত পদার্থ থেকে অভিন্ন তাও তিনি সপ্রমাণ করেন। এই এনিলিন যে নীল প্রভৃতি বিবিধ কৃত্রিম রঞ্জন-পদার্থের প্রধান উপাদান তাই নয়, বহু তেজস্কর আধুনিক ঔষধেরও ইহা মূল উৎপাদক।

১৮৪৫ সালে লণ্ডনে "রয়্যাল কলেজ অব কেমিষ্ট্রি" স্থাপিত হলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স আলবার্টের অনুরোধে হফম্যান ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। তাঁর অধ্যাপনা ও অনুপ্রেরণায় ইংলণ্ডে জৈব রসায়নশাস্ত্রের ও তৎসম্ভূত শিল্পের অপরিসীম উন্নতি হয়। হফম্যানের ইংরেজ ছাত্র পার্কিন মেজেণ্টা আবিষ্কার করে বিপুল অর্থ ও যশের অধিকারী হন। হফম্যান লণ্ডনে নিরলসভাবে গবেষণা ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন।

তাঁর ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতাশক্তি এবং অসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে বহু মেধাবী ছাত্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হফম্যানের যে সব ছাত্র পরবর্ত্তীকালে যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে পার্কিন, আবেল, নিকেলসন, ম্যানসফিল্ড, সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স, পিটার গ্রিস, জর্জ মার্ক, মারটিয়স, ফলহার্ড প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জার্ম্মানীর এত বড় একজন কৃতী সন্তান ইংলণ্ডে অধ্যাপনার রত থাকবেন এটা তদানীন্তন চিন্তাশীল জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ল। লিবিগ প্রভৃতি মনীষী সম্মিলিতভাবে হফম্যানকে দেশে ফিরে আসবার জন্য আহ্বান জানালেন। হফম্যানের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিরাট গবেষণাগার বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং তিনি ১৮৬৫ সালের মে মাসে জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে ঐ ল্যাবরেটরিতে গবেষণা আরম্ভ করলেন। হফম্যানের প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই ১৮৬৭ সালে জার্ম্মান কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টের পদে বৃত হন।

হফম্যান জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে বিজ্ঞানের সাধনা করে ১৮৯২ সালের ৫ই মে তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। জীবনে তিনি বহু দেশ থেকে প্রচুর সম্মানলাভ করেন। তাঁর সপ্ততিবর্ষ পূর্ত্তির সময় জার্ম্মান কেমিক্যাল সোসাইটি বিপুল সমারোহের সহিত তাঁর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ঐ সময় "হফমান ফাউণ্ডেশন" স্থাপিত হয় এবং তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁকে তাঁর আবক্ষ প্রস্তরমূর্ত্তি উপহার দেন।

কেকুলে (১৮২৯-১৮৯৬)

১৮২৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডামেষ্টাট শহরে অগষ্ট কেকুলে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি একজন সামরিক কর্ম্মচারীর

গণের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের রাসায়নিকগণের সহযোগিতার অভাবে রাসায়নিক শিল্প তেমন বিকাশলাভ করতে পারছে না। এদিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রসায়নের ক্ষেত্রে সত্যিকারের মৌলিক গবেষণার পরিমাণ এবং উৎকর্ষও এখন পর্য্যন্ত তেমন ভাবে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

হাইনরিখ কারোর পুস্তকে দেখতে পাই, কি সুন্দর সুন্দর বাগানসংযুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থা ছিল কারখানার কর্ম্মীদের জন্য। ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, ক্লাব, স্কুল, স্নানাগার, সমবায় সমিতির দোকান প্রভৃতিরও ব্যবস্থা কারখানা থেকেই করা হয়েছিল। বার্দ্ধক্য ও ব্যাধির জন্য কর্ম্মচারীদের সংসারযাত্রা যাহাতে অচল না হয় সেই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষই উপযুক্ত অর্থদানে ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা করে দিতেন। কর্ম্মীদের বিধবা স্ত্রী, অসহায় নাবালক পুত্র-কন্যারা কারখানা থেকে সাহায্য পেত। ফলতঃ আইন করে কারখানার কর্তৃপক্ষকে কর্ম্মীদের কল্যাণকর্ম্মে নিয়োজিত করতে বাধ্য করার প্রয়োজন গবর্ণমেণ্টের হয় নি। কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের সুবিধার জন্য এবং কারখানার ভবিষ্যৎ উন্নতির উদ্দেশ্যে কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতেন। যাঁরা শিল্প-সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাঁরা হাইনরিখ কারোর ইংরেজী অনুবাদ *Development of Coalter Colour Industry* বইখানি পড়লে সবিশেষ জানতে পারবেন।

গত বৎসর নবেম্বর মাসে ডারমষ্টাটে মার্কের কারখানা পরিদর্শনকালে রপ্তানী বিভাগের মিঃ ফিচের নিকট শুনলাম, তাঁদের কারখানার কর্ম্মীদেরও অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। ওঁদের 'কলোনি'তে ঘর খালি না থাকলে কোম্পানির কেনা জমি স্বল্পমূল্যে বিলি করে কোম্পানি থেকে নামমাত্র সুদে টাকা ধার দিয়ে কর্ম্মীদের নিজেদের বাড়ী তৈরি করার ব্যবস্থাও কোম্পানি করে দেন। মার্ক-পরিবারের প্রদত্ত অর্থদ্বারা কর্ম্মীদের অসুখ-বিসুখে স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের খরচাও মিটানো হয়ে থাকে বলে শুনলাম। মার্কের কারখানায় বার্দ্ধক্যে পেনসনের ব্যবস্থা আছে। বড়দিনের সময় বোনাস সকলকেই দেওয়া হয়। কোনো কর্ম্মীর বা কর্ম্মচারীর কারখানায় ভর্ত্তি হবার ২৫, ৪০ এবং ৫০ বর্ষ পূর্ত্তির সময় আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ উপলক্ষে সেই কর্ম্মী বা কর্ম্মচারীকে একটি বিশেষ 'বোনাস' দেওয়া হয়ে থাকে। কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির ভাব বজায় রাখবার জন্য কারখানায় খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। কারখানার অর্কেষ্ট্রা এবং গানের দলেরও সুনাম আছে। বিশাল লাইব্রেরী রয়েছে, তাতে সব রকম বই আছে। প্রায়ই বিভাগীয় এবং মাঝে মাঝে কারখানায় সকলের সমবেত প্রীতিসম্মিলনের আয়োজন করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থার দরুন ছোটবড় সকলেই সেখানে অবাধে মেলামেশা করতে পারে এবং কারখানাকে একটি বৃহৎ পরিবারের মত দরদের দৃষ্টিতে দেখতে শেখে। Krapt durch freude—অর্থাৎ—'আনন্দের সঙ্গে শক্তির বিনিয়োগ'—জার্ম্মান চরিত্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্পের এরূপ উন্নতির দুটি মুখ্য কারণ :—প্রথম, জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিভাশালী গবেষকগণের অফুরন্ত মৌলিক গবেষণা। দ্বিতীয়, জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠাতাদের মৌলিক গবেষণার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এবং তাঁদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, উদার, অপক্ষপাত পরিচালনা-কৌশল।

জার্ম্মান রাসায়নিক শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আমরা আমাদের দেশ কেন যে ঐ শিল্পে এত পিছিয়ে আছে তার হেতুটি সহজেই ধরতে পারব। আমরা সংক্ষেপে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা এখানে উল্লেখ করছি।

ভারতবর্ষে রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা এবং রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তা আর কাউকে নূতন করে বলার দরকার করে না। কিন্তু আজ জার্ম্মানীর রাসায়নিক শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে এ কথাও মনে আসে যে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মনীষার অধিকারী রাসায়নিক যদি ঐ সময়ে এডিনবরায় ক্রামব্রাউনের মত সাধারণ একজন অধ্যাপকের কাছে না গিয়ে জার্ম্মানীতে বেয়ার, এমিল ফিশার বা হফম্যানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পেতেন তবে আজ আমাদের গোটা দেশেরই চেহারা বদলে যেত। আজ বেঙ্গল কেমিক্যালের চেয়ে হয়ত বহুগুণে বড়, বিরাট রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান আমরা এদেশে দেখতে পেতাম—অত্যাবশ্যক ঔষধপত্র, রঞ্জন-পদার্থ, বিস্ফোরক প্রভৃতির জন্য তা হলে আজ আমাদের বিদেশীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হ'ত না। ইংরেজ জাতির বহু অনুকরণীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও আত্মম্ভরিতা তাদের মধ্যে বড় বেশী প্রবল। জার্ম্মান চরিত্রের দৃঢ়তা এবং thoroughness প্রশংসনীয় এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে বিরল। আচার্য্য রায় যে সময় বিলাতে কেমিষ্ট্রি পড়তে যান, সে সময় বিলাতের মেধাবী এবং উচ্চাভিলাষী, রসায়নের প্রায় প্রত্যেক ছাত্র জার্ম্মানীতে ঐ বিষয় শিক্ষা করতে যেতেন।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণ যদি মেধাবী ছাত্রদের মার্কিন মুলুকে বা বিলাতে না পাঠিয়ে জার্ম্মানীতে বা জার্ম্মান রাসায়নিক দিক্‌পালদের পদাঙ্ক অনুসরণে আজ যেখানে রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা পূর্ণোদ্যমে চলেছে সুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিখ শহরে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কারার ও অধ্যাপক রুজিকার ল্যাবরেটরিতে পাঠান তা হলে সেই সব ছাত্রের অর্জ্জিত জ্ঞানে দেশের সত্যিকারের কল্যাণ হবে।

উপসংহারে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান ও ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি যেরূপ বিকাশলাভ করেছে সে তুলনায় জৈব রসায়নশাস্ত্র বা অরগ্যানিক কেমিষ্ট্রি তেমন উন্নত স্তরে উঠতে পারে নি। অথচ শেষোক্তটিই আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের প্রাণস্বরূপ। এই শোচনীয় অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হাজার হাজার বৎসর ধরে জাতিভেদ-প্রথার বিষে জর্জ্জরিত, আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা মস্তিষ্কচালনায় ও মননশক্তিতে যত নিপুণতা প্রদর্শন করছেন, স্বভাবতঃই হাতের কাজের প্রতি তাঁদের সেই পরিমাণে অপটুতা সুপরিস্ফুট। অরগ্যানিক কেমিষ্ট্রির বা জৈব রসায়নের উচ্চাঙ্গের গবেষণায় উন্নত স্তরের মানসিক শক্তির সঙ্গে হাতের কাজ সমান তালে চালানোর প্রয়োজন হয়। আমি প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে সব জার্ম্মান রসায়নবিদের জীবনকথা বর্ণনা করেছি সেগুলোতে দেখা যায় এঁদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক ও কারিগরের ছেলে—যারা পুরুষানুক্রমে হাতের কাজে অভ্যস্ত।

স্বাধীন ভারতে জৈব রসায়নের উচ্চতর গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে ফলিত রসায়নের এবং রাসায়নিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ যদি সত্য সত্যই আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির অগৌণে সংস্কারসাধন করতে হবে। এখন শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েদের লিখন-পঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানা প্রকার হাতের কাজ শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা করতে হবে, তদ্ভিন্ন ব্যাপক সুষ্ঠু শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্বারা কৃষক এবং কারিগরশ্রেণীর অন্ধকার গৃহকোণও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করে তুলতে হবে। শুধু মস্তিষ্কের শক্তির বিকাশের দ্বারা আমরা আইন, গণিত প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে কৃতিত্ব দেখাতে পারি, কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানে সাফল্যের জন্য আমাদের মাথা, হাত ও চোখ সমভাবে চালনা করতে হবে এবং তার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার-সাধন। সমাজের সর্ব্বস্তরে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত করানো এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করা। প্রত্যেক প্রদেশের নিজ নিজ বিশ্বালয়গুলিতে মাতৃভাষার উন্নতিবিধানের সঙ্গে ইংরেজী ভাষার যথোচিত চর্চ্চা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ম্মান প্রভৃতি সমৃদ্ধ বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও সমভাবে অপরিহার্য্য।

আলোচনা

"প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা"

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার "প্রাচীন বঙ্গে ধর্ম্মপূজা" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আলোচনা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। ঐতিহাসিক বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হয়, সত্যনির্ণয়ের পথ ততই সহজ হইয়া আসে। এই আলোচনার জন্য আমি শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য এবং প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বক্তব্য-সমূহ বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া আমি উহার কোনটিকেই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

"পূর্ব্বে পূর্ব্ব এবং উত্তর-বাংলাতেও ধর্ম্মঠাকুর পূজার প্রচলন ছিল", ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সিদ্ধান্তের বিরোধী। অবশ্য ইহা আমার সিদ্ধান্ত নহে। অপরের সিদ্ধান্ত সমীচীন বোধ হওয়াতে আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি। 'রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল'-সম্পাদকদ্বয়ের ন্যায় আমি বিশ্বাস করি যে, পূর্ব্ব ও উত্তর-বাংলার পাটঠাকুর পূজার সহিত পশ্চিম বাংলার ধর্ম্মঠাকুর পূজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ধর্ম্মঠাকুর যেমন স্থানবিশেষে বিষ্ণু বা শিব, পাটঠাকুর তেমনই একাধারে শিব ও বিষ্ণু। ফরিদপুর অঞ্চলের গোধাকৃতি পাটঠাকুরের অঙ্গে উভয় দেবতার চিহ্নই দেখা যায়। ঐ অঞ্চলের মৎসংগৃহীত পাটঠাকুরের পূজাবিষয়ক একখানি পুঁথিতে 'পাট' সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

> বিশ্বকর্ম্মা দিলেন পাট নির্ম্মাণ করিয়া।
> শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চারি মুদ্রা দিয়া॥
> গাড়িলেন ত্রিশূল গোটা কাঁটা তিন সারি।...
> পাট বাণ শুদ্ধ করিলেন প্রভু ভোলা মহেশ্বর॥ ইত্যাদি।

উক্ত সম্পাদকদ্বয়ের যে বাক্যটি ভট্টাচার্য্য মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসঙ্গে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, "বগুড়ায় যোগীর ভবনে ধর্ম্মঠাকুরের গাদি এখনও বর্ত্তমান।" ইহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থক, সন্দেহ নাই। শ্রীযুত সুকুমার সেন-কৃত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "ধর্ম্মঠাকুরের পূজা এখন রাঢ়দেশে ও তৎসীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এক কালে ইহা সমগ্র বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল।" যতটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি এই ধারণা সত্য বলিয়াই মনে করি। বাংলার বাহিরেও ধর্ম্মপূজার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মঠাকুরের সহিত কূর্ম্মমূর্ত্তির কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। অপরাপর লেখকের ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধীয় রচনাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার এই প্রকার উক্তিকে আমার নিতান্তই অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত 'রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলে'র ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ৷৶০) সম্পাদকদ্বয় বলিয়াছেন, "কূর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুরের আসন এবং প্রতীক। কূর্ম্মমূর্ত্তির পিঠে প্রায়ই ধর্ম্মের পাদুকা অথবা পদ-চিহ্ন আঁকা থাকে।" অতঃপর তাঁহারা 'ধর্ম্মপূজাবিধান' এবং একখানি সংগৃহীত পুথি হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

> "উলূকবাহনং ধর্ম্মং দেবং তেজোময়াত্মকম্।
> ইদানীং কূর্ম্মপৃষ্ঠে তু দিব্যরূপ নমস্তু তে॥"
> "হাত পাতিয়ে ধর্ম্ম সৃজিলেন সৃষ্টি
> পাদুকা স্থাপিব লএ কূর্ম্মের পিষ্টি॥"

পরে তাঁহারা বৈদিক সূর্য্য-দেবতার সহিত ধর্ম্মঠাকুরের সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "কূর্ম্ম সূর্য্য-দেবতার প্রতীক। তাই কূর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক এবং পাদপীঠ" (পৃষ্ঠা ৷৶০-৸০)। পূর্ব্বোল্লিখিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৪৯৩ পৃষ্ঠাতেও অনুরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। *B. C. Law Valume, part I*-এ প্রকাশিত শ্রীযুত সুকুমার সেন-কৃত একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে,

"The emblem of Dharma—rather his *padapitha* or foot-stool on which was placed or engraved the *paduka* (boots or sandals) of Dharma—is a tortoise. In most cases it is a natural bit of stone shaped like a tortoise, *in other cases it is a chiselled stone image of the same.* In very rare cases *the image is made of brass.* A miniature temple or chariot is also known to be worshipped as emblem of Dharma."

এই সম্পর্কে 'জার্নাল্ অব্ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটী অব্ বেঙ্গল', ১৯৪২, ৯৯-১৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীযুত ক্ষিতীশ-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "Dharma Worship" শীর্ষক মূল্যবান্ প্রবন্ধের সাক্ষ্যও উল্লেখযোগ্য। কারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিম বাংলার নানা অঞ্চলে ধর্ম্মপূজার অনুষ্ঠান এবং মূর্ত্তিসমূহ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও স্থলবিশেষে প্রামাণিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

"The images of this (*i.e.*, Dharma deity known as Yatrasiddhiray worshipped in the village Maynapur in

Bankura District) and several other Dharmas are said to be of stone and shaped like a tortoise, about 4 in. to 6 in. long." "According to Sri Jogesh Chandra Ray, the images are mostly tortoiselike in shape, and all have tortoise back." "*Most of the images of Dharma which the writer of this paper observed in the districts of Birbhum, Midnapur and 24-Parganas were shaped like tortoise.* In one case, it had a tortoise back only. But the size, though generally as noted above, varied."

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিতে গিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার ১৬শ ভাগে প্রকাশিত রায়-মহাশয়ের শূন্যপুরাণ-বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সুদূরবর্তী উতকামণ্ডে বসিয়া রায়-মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী আমি পাঠ করিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু ধর্মপূজা সম্পর্কে যতগুলি গবেষণামূলক রচনা আমার পক্ষে এখানে পাঠ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, বাংলাদেশে ধর্মঠাকুর প্রধানতঃ কূর্মমূর্তির সাহায্যে পূজিত হন। এই প্রসঙ্গে আমি যাঁহাদের মতামত উদ্ধৃত করিলাম, আশা করি, তাঁহারা ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি সম্বন্ধে ভট্টাচার্য মহাশয়ের সন্দেহ নিরসন করিতে পারিবেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের তৃতীয় কথা এই যে, নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় যে আলোচ্য লিপিদ্বয়কে অভিচার-মন্ত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন তাহাই সমীচীন। আবার দ্বিতীয় লিপিতে উল্লিখিত ধর্ম কথাটিকে তিনি বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্তর্গত ধর্মরূপে গ্রহণ করিতে চান। কিন্তু ইহা যে ভট্টশালী মহাশয়ের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যের উত্তর দিতে গিয়া ঐ পাঠ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিতে যাহার পাঠ "স্বস্তি-নিশ্রেয়সায়াস্তু জিনো জনানাং" (অর্থাৎ "জিন বা বুদ্ধ জনগণের মঙ্গল এবং মোক্ষের কারণ হউন") অত্যন্ত স্পষ্ট, উহাকে ভট্টশালী মহাশয় পড়িয়াছিলেন, "স্বস্তি। শ্রেয়সায় (নিশ্রেয়সায়)। সুজিনো জনানাং॥" 'সুজিনো জনানাং' অংশের ভট্টশালীকৃত ব্যাখ্যা 'সদ্বৌদ্ধগণের'। তাঁহার মতে, লিপিদ্বয়ে সদ্বৌদ্ধগণের মঙ্গলকামনা করা হইয়াছে এবং প্রধানতঃ এইজন্যই তিনি লিপিদ্বয়কে বৌদ্ধগণের মঙ্গলার্থ প্রযুক্ত আভিচারিক মন্ত্র স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাকৃত কোন ব্যাকরণ অনুসারেই 'সুজিনো জনানাং'-এর অর্থ 'সদ্বৌদ্ধগণের' হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং অভিচারমন্ত্র বিষয়ক মতবাদটি নিতান্তই কাল্পনিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন বৌদ্ধগণের অভিচার-মন্ত্রে ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করা হইবে কেন? যাহাতে প্রথমে 'ভগবান্ বাসুদেব'-কে নমস্কার করিয়া পরে 'বুদ্ধ'-কে নমস্কার করা হইয়াছে, তাহাকে হিন্দু-বিদ্বেষী গোঁড়া বৌদ্ধ প্রযুক্ত অভিচার-মন্ত্র কোন্ হিসাবে মনে করা যাইতে পারে? দ্বিতীয় লিপিতে আমি যাহা পড়িয়াছি "মন্নুংরসর্ম্মকারীতধম্ম॥" অর্থাৎ "মন্নুংরশর্ম্ম-কারিত-ধর্ম্মঃ", তাহার ভট্টশালীকৃত পাঠ "মনরসর্ম্ম-কারা-বধ-ম্ম॥" তাঁহার মতে, ইহাতে মনরশর্ম্মা বা মনোরথশর্ম্মা নামক একজন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণের কারা বা বধের কামনা করা হইয়াছে। কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে ঐ পাঠের এই ব্যাখ্যা হইতে পারে? 'কারা' এবং 'বধ' না হয় বুঝিলাম; কিন্তু 'ম্ম' অর্থ কি? শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য এস্থলে 'ধম্ম' কে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্তর্গত ধর্মরূপে গ্রহণ করিতে চান। তাহাতে ভট্টশালী-কল্পিত 'কারা-বধ'-এর 'ধ' কাটিয়া গিয়া অর্থহীন 'কারাব' মাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং কিছুমাত্র অর্থসঙ্গতি হয় না। প্রকৃতপক্ষে, পাঠ ও ব্যাখ্যার দিক হইতে দেখিলে, 'সুজিনো-জনানাং' এবং 'কারা-বধ-ম্ম' উভয়ই সমান হাস্যকর। ইহার উপর নির্ভর করিয়া আলোচ্য লিপিদ্বয়কে অভিচার-মন্ত্র মনে করা নিতান্তই যুক্তিহীন, সন্দেহ নাই। ভট্টশালীকৃত পাঠ অনুসরণ করিলে আর এস্থানে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মরত্নকে কল্পনা সম্ভব হয় না। কারণ 'কারা-বধ' না থাকিলে ভট্টশালী মহাশয়ের অভিচার-মন্ত্র বিষয়ক কল্পনার পক্ষে উপস্থিত করিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য আমার পাঠ গ্রহণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কোন ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্ম্মরত্নের মূর্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে ধর্ম্মমূর্তির সহিত কচ্ছপের খোলের কোনই সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, তাহা হইলে আর অভিচার-মন্ত্রের কথাই উঠিতে পারে না।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের চতুর্থ কথা এই যে, ধর্ম্মঠাকুর রূপে পূজিত শিলা স্বাভাবিক শিলাখণ্ড মাত্র; উহা কখনও কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে নির্ম্মাণ করা হয় না। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য তাঁহার দ্বিতীয় মন্তব্যের উত্তরেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যিনি লিখিয়াছেন,

"In most cases it is a natural bit of stone shaped like a tortoise, *in other cases it is a chiselled stone image of the same.*" "In very rare cases, *the image is made of brass.*"

তাঁহার কাছে খোঁজ নিলেই সুনির্ম্মিত কূর্ম্মাকার ধর্ম্মশিলা এবং ধর্ম্মঠাকুরের পিত্তলনির্ম্মিত কূর্ম্মমূর্তির সন্ধান মিলিবে। ইহার জন্য অধিক দূরেও যাইতে হইবে না; কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের পত্র হইতে জানিয়াছি যে, কলিকাতা অঞ্চলেও এইরূপ মূর্তি পূজিত হইয়া থাকে। যদি কেহ দয়া করিয়া ধর্ম্মঠাকুরের কোন সুনির্ম্মিত কূর্ম্মমূর্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত করেন, তবে আমরা অত্যন্ত উপকৃত বোধ করিব।

"ন্যাশনাল লাইব্রেরী"

বি. এস. কেশবন,
ন্যাশনাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান

গত সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' ন্যাশনাল লাইব্রেরী সম্বন্ধে আপনার যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য পাঠ করিলাম। যে কোনও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ গঠনমূলক সমালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে জনসাধারণকে সচেতন করে ঐ প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের সতর্ক করে তাদের কর্ত্তব্যের প্রতি। কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনার একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে—সেটি হচ্ছে সত্যের সব দিক প্রকাশ করা। কোন্ কোন্ সমস্যা বা পরিস্থিতির জন্য জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং এই অবস্থা স্থায়ী কি অস্থায়ী তাও জনসাধারণকে জানানো দরকার। আপনার মন্তব্যে পাঠকদের অসুবিধা সম্বন্ধে যে যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের নিম্নলিখিত বক্তব্যটুকু প্রকাশিত করলে বিশেষ বাধিত হব।

বর্ত্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পাঠকদের বই পেতে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয়—এ বিষয়ে আমরা অবহিত আছি। আমরা এ জন্য বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই অসুবিধা অপরিহার্য্য। বইগুলি এস্প্লানেড থেকে সরানো হয়েছে সত্য, কিন্তু বেলভেডিয়ারে নূতন ধরণের র‍্যাক্ (পুস্তকাধার) তৈরী করার কাজ এখনও শেষ হয় নি বলে বইগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। নূতন র‍্যাক্ তৈরী করা এবং বেলভেডিয়ার ভবনটিকে লাইব্রেরীর উপযোগী করে তোলা একটু সময়-সাপেক্ষ। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে লাইব্রেরীটিকে যথাসম্ভব উন্নততর করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। পাঠ্য ও পাঠকের গভীরতর সংযোগ স্থাপনের চেষ্টার ত্রুটি করা হচ্ছে না।

যখনই কোন লাইব্রেরীকে স্থানান্তরিত ও নূতন জায়গায় পুনর্গঠিত করা হয় তখন সাধারণতঃ কিছু দিনের জন্য লাইব্রেরীটি বন্ধ রাখা হয়, কিন্তু আমরা পাঠকদের লাইব্রেরী ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ না রেখে তাঁদের চাহিদা আংশিকভাবে মিটানোর নীতি যুক্তিযুক্ত মনে করেছি এবং সেই অনুসারে আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। পুনর্গঠনের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠকদের এই অসুবিধা ভোগ করা অনিবার্য্য। তবে যাতে এই অসুবিধা শীঘ্রই দূরীভূত হয় সে বিষয়ে আমরা যত্নবান হব।

বেলভেডিয়ারে লাইব্রেরীর প্রকাশ্য উদ্বোধন এখনও হয় নি, বইগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় আছে, পুনর্গঠনের কাজের জন্য কোনও কিছুরই শৃঙ্খলা-বিধান করা সম্ভবপর হয় নি। বইগুলির নিরাপত্তার জন্য এবং সাধারণ বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য এখনও পাঠকের অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা করা যায় নি, তাই গেটে পুলিস-পাহারার ব্যবস্থা বলবৎ আছে। তবে যদি কোনও পাঠক বেলভিডিয়ারে বই পড়তে চান্, তিনি পত্র লিখলেই ডাকে পত্রযোগে প্রবেশাধিকারের কার্ড পাঠানো হয়।

লাইব্রেরীর প্রকাশ্য উদ্বোধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত আলোচনা করছি এবং আশা করি যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে সহজ হবে।

লেণ্ডিং সেকশনের সংখ্যা বাড়ানো সম্বন্ধে নিউইয়র্ক লাইব্রেরীর তুলনা আমাদের লাইব্রেরী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কারণ আমাদের লাইব্রেরী সিটি লাইব্রেরী বা মিউনিসিপাল লাইব্রেরী ধরণের নয়, এই লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেস পর্য্যায়ের—অবশ্য আকারে তাদের তুলনায় অনেক ছোট। তাই লেণ্ডিং সেকশনের সংখ্যা বাড়ানোর প্রশ্ন উঠতে পারে না। জনসাধারণের ঐ প্রয়োজন মেটাবার ভার সেন্ট্রাল মিউনিসিপাল লাইব্রেরীর, কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতায় সে ধরণের লাইব্রেরীর অস্তিত্ব নেই। এই বিষয়ে জনমত গঠন করার দায়িত্ব আপনাদের মত সুযোগ্য সংবাদপত্রসেবীদের সাগ্রহে গ্রহণ করা উচিত।

দিল্লীতে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ঐরূপ কোনও পরিকল্পনা থাকলে পুনর্গঠনের কাজে হাত দেওয়া হ'ত না এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত পুস্তকগুলি সাদরে গৃহীত হ'ত না। লাইব্রেরীর নব উদ্বোধনের পরেই আপনারা নিজেরাই আমাদের এই আশ্বাসের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আশা করি, জনসাধারণ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য

লাইব্রেরীতে বই পাইতে অসুবিধা হইতেছে ইহা লাইব্রেরীয়ান মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন এবং কারণস্বরূপ বলিয়াছেন যে, বেলভেডিয়ারে র‍্যাক তৈরি এবং বাড়িটিকে লাইব্রেরীর উপযুক্ত করিবার কাজ এখনও বাকী আছে বলিয়া এই অসুবিধা ঘটিতেছে। আমরা এই যুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। বাড়ীর কাজ এবং র‍্যাক তৈরিই যখন অসম্পূর্ণ, তখন এত তাড়াহুড়া করিয়া বই সরাইবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রায় দুই শতাব্দীর পুরানো ঐ বাড়ির মেঝে ও দেওয়াল ঠিক করিয়া না লইলে উই ধরিবার কথা; র‍্যাক তৈয়ারি হয় নাই একথা লাইব্রেরীয়ান,

নিজেই বলিতেছেন। ইতিমধ্যেই কিছু বই উইয়ে নষ্ট করিয়াছে কি না লাইব্রেরীয়ান মহাশয় জানাইবেন কি? "বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে লাইব্রেরীটাকে যথাসম্ভব উন্নততর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে"—লাইব্রেরিয়ান মহাশয়ের এই কথার পরিচয় পাইতেছি দুইটি কাজে—অনাবশ্যকভাবে চাকাওয়ালা র‍্যাক তৈরি করিতে লক্ষাধিক টাকা বেশী খরচ হইয়াছে এবং বই কেনার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চাকাওয়ালা "উন্নত ধরণের" র‍্যাক কাজের বেলায় উপযোগী হইবে কি না অনেক টাকা খরচ করিবার পর এখন সে বিষয়ে আশঙ্কা জাগিতেছে।

লাইব্রেরী স্থানান্তর এই প্রথম হয় নাই। শেষবার 'জবা-কুসুম হাউস' হইতে উহা এসপ্লানেডের বাড়ীতে যখন আসে তখন ১৫ দিন লাইব্রেরী বন্ধ ছিল এবং ঐ সময়ের মধ্যে স্থানান্তরীকরণ সম্পূর্ণ হয়। বর্ত্তমান স্থানান্তরীকরণ সেপ্টেম্বরে আরম্ভ হইয়াছে, তিন মাসের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা স্থাপন সম্ভব হয় নাই। এখন লাইব্রেরিয়ান মহাশয় বলিতেছেন, বাড়ী এবং র‍্যাক ঠিক না করিয়াই বইগুলি পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং "বইগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় আছে।"

লাইব্রেরীর প্রকাশ্য উদ্বোধনের পর পুলিস পাহারা থাকিবে না, ইহা শুভ সংবাদ।

লাইব্রেরীতে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া লাইব্রেরিয়ান মহাশয় আমাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন কিন্তু এটা আমাদের বক্তব্য ছিল না। গবর্ণমেণ্ট এবি বাস রুট প্রবর্ত্তন করিয়া বেলভেডিয়ারে যাতায়াতের সুবিধা অনেকদিন আগেই করিয়া দিয়াছেন। আমরা বলিয়াছিলাম যে, বেলভেডিয়ার হইতে এসপ্ল্যানেডের রিডিং রুমে বই আনিবার জন্য লাইব্রেরীর নিজস্ব ভ্যান থাকা উচিত। ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে দিনে অনেকবার বই আনা যাইবে।

লাইব্রেরীর 'লেণ্ডিং সেকশ্যন' বাড়ানোর প্রতিবাদ করিয়া লাইব্রেরিয়ান বলিতেছেন, উহা মিউনিসিপাল লাইব্রেরীর কাজ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা আমেরিকান লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়, যদিও আকারে অনেক ছোট। এই যুক্তিও আমরা মানিতে পারিতেছি না। লাইব্রেরীর নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানের লোক টাকা জমা পাঠাইয়া ডাকেও বই লইতে পারে। সুতরাং যে শহরে লাইব্রেরী অবস্থিত সেখানে 'লেণ্ডিং সেকশ্যনের' সংখ্যাবৃদ্ধি ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কাজ নয়, ইহা আমরা মানিতে পারি না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সহিত শুধু সংখ্যা নহে, নীতির দিক দিয়াও আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর তুলনা হয় না। লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের বই পাণ্ডুলিপি, ম্যাপ, ফটোষ্টাট প্রভৃতি লইয়া মোট সংখ্যা ২,৭০,০০,০০০। আমাদের লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা বড় জোর পাঁচ হইতে সাত লক্ষ। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন যে পৃথিবীর যে-কোন অংশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইলে তাহা এখানে রাখা হইবে। প্রধানতঃ ইংরেজদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপযুক্ত পুস্তকাদি রাখাই এই লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ছিল। এখানে বিলাতী বহু পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায়, কিন্তু গান্ধীজীর হরিজন পত্রিকা কখনও রাখা হয় নাই। বিজ্ঞানের বই, এমন কি অঙ্কশাস্ত্রের বই কিছু কিছু আছে; বেশী রাখা হয় না এই কারণে যে, ঐগুলি টেকনিকাল বই, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী টেকনিকাল বইয়ের স্থান নয়। সাহিত্যের দিক হইতেও দেখা যায় বহু বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকেরও রচনা এখানে নাই, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সব লেখকের বই পর্য্যন্ত নাই। বাংলা বই ও পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে, অথচ লাইব্রেরী পরিচালনার মূল সূত্র এই যে, যে প্রদেশের লাইব্রেরী অবস্থিত থাকিবে সেই প্রদেশের বই পত্রিকা এবং পাঠকদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই দিকটি একেবারে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বাংলার চেয়ে এখানে উর্দ্দুর দিকে বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে। লাইব্রেরীর রিডিং রুমে মিশরের আরবী পত্রিকাও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলা পত্রিকা দেখা যায় না। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নাম বদলাইয়া ন্যাশনাল লাইব্রেরী হইয়াছে সত্য, কিন্তু জাতীয়তা-বোধ উহার কোন স্তরেই প্রকাশ পায় নাই।

লাইব্রেরী দিল্লীতে সরাইবার এত চেষ্টা এত বার হইয়াছে যে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। লাইব্রেরী ব্যবহারে অসুবিধা সৃষ্টি এবং পাঠক-সংখ্যা হ্রাস হইতে দেখিলে লোকের মনে এই আশঙ্কা জাগিবেই। ইহা দূর করিবার দায়িত্ব লাইব্রেরী কর্ত্তৃপক্ষের।

দেশাবলি বিবৃতি* ও বাঁকুড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত ভূমি

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত

বিষ্ণুপুর বিবৃতির কিয়দংশ উদ্ধৃত করি :—

"বিষ্ণুপুরের সার্দ্ধ-তিন যোজন পশ্চিমে কানন-মধ্যে ছাতনা নামক রাজধানী। বিষ্ণুপুরের এক ক্রোশ পশ্চিমে বেত্রবতীর পার্শ্ব ভাগে রামসাগর। তাহার নিকট বন-মধ্যে নাপুড়াখ্য প্রাচীন শিবলিঙ্গ। ইহা হইতে তিন ক্রোশ দূরে অন্ধগ্রাম (ওঁদা)। ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে গামিত্থা গ্রাম মধ্যে বাসুলী নামে দেবী। ইহার এক যোজন উত্তরে বালিয়াতোটক গ্রাম (?)—এখানে বহু কায়স্থ জাতির বাস। রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় বাস করেন। অন্ধকগ্রামের এক যোজন পশ্চিমে কজ্জলা নদীর তীরে লোহদন গ্রাম। ইহার অর্দ্ধযোজন পশ্চিমে বাগীনদীর নিকটে কোটালপুর মহাগ্রাম। বাগীনদীর দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভূতেশ গ্রাম। ভূতেশের এক ক্রোশ পশ্চিমে বনের নিকট বাদলা গ্রাম।..."

দেখা যাইতেছে, "দেশাবলি বিবৃতি"র পণ্ডিত বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সময় বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন। বেলিয়াতোড়ের 'রাজীব' নামক কায়স্থ গোপাল সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ওন্দাগ্রাম হইতে উত্তরে গামিদ্যাগ্রামের ভিতর দিয়া বেলিয়াতোড় যাইবার কাঁচা রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ মন্ত্রী মহাশয় এই পথ দিয়া বেলিয়াতোড় গমনাগমন করিতেন। এবং দেশাবলির পণ্ডিত তাঁহার নিকট শুনিয়া উপরে উদ্ধৃত বিবৃতি লিখিয়াছিলেন। গোপাল সিংহের কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন মূল গ্রন্থটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল। সময়ের অবশ্য বিশেষ পার্থক্য হইতেছে না।

পণ্ডিত মহাশয় "গামিদ্যাগ্রাম মধ্যে বাসুলী নামে দেবী" লিখিয়াছেন, কিন্তু গামিদ্যগ্রামের অতি সন্নিকটে বাহলাড়া গ্রামের প্রাচীন মন্দিরের কথা লিখেন নাই। ছুঁকড়া জোড়ের (কজ্জলানদী) তীরে লোদ্না (লোহদন) গ্রামের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু লোদনা ও বাঁকুড়ার মধ্যবর্ত্তী দারকেশ্বরীর তীরে একতেশ্বর মন্দিরের কথা লিখেন নাই। বাগীজোড় (নদী)-এর তীরে কোটালপুর গ্রামের (মহাগ্রাম) কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু কোটালপুর ও ভূতসহর বা ভূতেশ্বর (ভূতেশ) গ্রামের মধ্যবর্ত্তী সোনাতাপলের দেউলের কথা লিখেন নাই। ইহা আশ্চর্য্য।

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৫শ ভাগ দ্রষ্টব্য।

এই ভূ-ভাগকেই কি তিনি "দারিকেশী নদী পর্য্যন্ত মলভূমি ধর্ম্মবর্জ্জিত" বলিয়াছেন? হয়ত তিনি এই মন্দিরগুলিকে বৌদ্ধ মন্দির বলিয়া শুনিয়াছিলেন।

সোনাতাপলের দেউল ও বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির দুইটি বাঁকুড়ার জৈনমন্দির বলিয়া খ্যাত। সোনাতাপলের দেউলটিকে কেহ কেহ আরও প্রাচীন মনে করেন। এই মন্দিরটি একটি ঢাপের উপর অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বদ্বারী। প্রভাতের প্রথম সূর্য্যরশ্মি এই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহার অভ্যন্তর হইতে স্বর্ণ-তপন দৃষ্ট হয়। হয়ত ইহাতে বহু পূর্ব্বে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঁকুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাহুলাড়ার মন্দিরটি বৌদ্ধমন্দির হইতে পারে।

একতেশ্বরের মন্দিরটি অতি প্রাচীন। হয়ত ইহা কোনও অসুর-রাজ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রবাদ—ইহাতে রাতারাতি স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি হইতেছিল; কোকিল ডাকিয়া দেওয়ায় সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা অসুরদের প্রচেষ্টা। কালকাজ অসুর অগ্নিবেদী করিয়া স্বর্গে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের বর্ত্তমান অনুষ্ঠানে শৈব, জৈন, বৌদ্ধ এবং মাধবধর্ম্মের মিশ্রণ দেখা যায়।

ইহা ছাড়া সোনাতাপলের দেউলের অতি সন্নিকটে সোনাদীঘির পাড়ে আর একটি ভগ্ন দেউলের স্তূপ আছে। সোনাতাপলের পূর্ব্বে, কিছু দূরে, সোনাতাপলের দেউলেরই ন্যায় আর একটি দেউল আছে। ইহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে কালো-পাথরের মারেশ্বর শিবমন্দিরও আছে। বড় বড় রাজারা মন্দির, দেউল নির্ম্মাণ করিয়া দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণ লোকে বৃক্ষতলে দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। বড়জোর সে ক্ষেত্রের প্রবেশ-পথে, রক্ষক হিসাবে অথবা দেবস্থানের চিহ্নজ্ঞাপক, ধনুকধারী মূর্ত্তি খোদিত দুইটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ড কটকের ন্যায় প্রোথিত রাখিতে পারেন। এই ভূখণ্ডে প্রাচীনকালে কোনও বড় রাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র ভুদিমন্তরীর গড় ছাড়া এ অঞ্চলে কোথাও সেরূপ গড়ের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। বাঁকুড়ার দুই মাইল পূর্ব্বে দ্বারকেশ্বরীর তীরে একতেশ্বরের মন্দির এবং সোনাতাপলের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী গড়ের বন-খোঁজায় পরিখা (দহ) বেষ্টিত স্থানকে লোকে এই গড় নির্দ্দেশ করে। গত বৎসর সরকার কর্ত্তৃক এই পরিখার কতক অংশের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান ভাদুলগ্রামের শেষ পূর্ব্বপ্রান্ত। ভাদুল বর্ত্তমানে বাঁকুড়ার প্রধান শিক্ষিত কায়স্থপল্লী। বর্ত্তমান লেখক এই গ্রামের বাসিন্দা। কায়স্থপল্লী অথচ আমার বাসবাটীর পশ্চাতে গোয়ালা পুষ্করিণী (গয়লাপখুর)। নিকটে হরিঘোষ নামক পুষ্করিণী। গড়স্থানে বর্ত্তমানে কয়েক ঘর গোয়ালার বাস। এক ঘর ব্রাহ্মণও আছেন। গ্রামের মধ্যস্থলে বহু প্রাচীন ষষ্ঠীতলা বা ধর্ম্মতলা। এই গ্রামের মধ্য দিয়া বাঁকুড়া হইতে এক্তেশ্বর যাইবার প্রাচীন রাস্তা। এক্তেশ্বরের মন্দিরের নিকট 'গাইগয়লা' পুষ্করিণী। মনে হয় ভুদিমন্তরীর গড়ে প্রাচীনকালে কোনও গোপরাজা ছিলেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন। হয়ত তিনি পুত্রকামনায় সাড়ম্বরে ধর্ম্মের পূজা দিয়া থাকিবেন।

লাপুড় শিবলিঙ্গ এখন রামসাগর গ্রামের মধ্যে শুনিয়াছি। সেখানে গাজন হয়। রামসাগর হইতে সোনামুখী যাইবার পথে, দ্বারকেশ্বরীর অপর পারে অযোধ্যা গ্রাম; তাহারও উত্তরে পাকাল। সোনাতাপলের নিকট তপোবন নামক স্থান। সেখানে রাম-সীতার বিগ্রহ আছে; মহাবীরও আছেন। রামসাগর, অযোধ্যা, তপোবন-বেষ্টিত এই ভূভাগই হয়ত লক্ষ্মণপুত্রের মল্লদেশ। সে মল্লদেশের রাজধানী 'চন্দ্রকান্তি'; মেদিনীপুরের নিকট চন্দ্রকোণা হইতে পারে। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে সুহ্মদেশের উল্লেখ আছে। সুহ্মদেশ—বর্ত্তমান দক্ষিণরাঢ়। বিষ্ণুপুরের নিকট গড়বেতায় ভীমকর্ত্তৃক বকাসুর-বধ হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জে ভীমের গড়, কীচক রাজার গড় আছে। বাঁকুড়ার পাকাল অঞ্চলে হয়ত পাণ্ডবদিগের কোনও শাখা বাস করিয়া থাকিবেন।

দণ্ডভুক্তি প্রদেশ মহারাজ শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মেদিনীপুরের দাঁতন—দণ্ডভুক্তি। বাঁকুড়ার ডক্টর অবিনাশ দাস মনে করিতেন—মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণাই শশাঙ্কের কিরণ-সুবর্ণ। শশাঙ্কের সময়ের খুব কাছাকাছি জয়নাগ নামক জনৈক নরপতি কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার তৃতীয় রাজ্যবর্ষের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল গোপচন্দ্র নামক একজন পরাক্রান্ত নৃপতির সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। গোপচন্দ্র, জয়নাগ কোন্ বংশীয় ছিলেন; এই ভূভাগেরই কোনও স্থানে তাঁহারা বাস করিতেন কিনা ভাবিবার বিষয়।

দেশাবলিবিবৃতির পণ্ডিত বাঁকুড়াকে 'বাজলাগ্রাম' বলিয়াছেন। হয়ত তাঁহার কলমে যেভাবে 'কুঁকড়া'—'কঙ্কলা' হইয়াছে, সেইভাবে 'বাঁকুড়া'ও বাজলা হইয়াছে। কিম্বা হয়ত 'বাকুলা' পাঠভ্রমে 'বাজলা' হইয়াছে। অথবা বাঁকুড়ার পূর্ব্ব নাম হয়ত সত্যই 'বাজলা' ছিল। বাঁকুড়ায় 'বাজাল' গোপ রহিয়াছে। শুশুনিয়ার শিলালিপির চন্দ্রবর্ম্মা গোপজাতীয় ছিলেন কিনা কে জানে। বাঁকুড়ার ভুদিমন্তরীর গড় এই চন্দ্রবর্ম্মার বংশীয় কোনও রাজার গড় নয় ত?

ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি এই ভূমির দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

শুধু
রসনার তৃপ্তির
জন্যই নয়
স্বাস্থ্যের
জন্যও
RASOI
VANASPATI
বনস্পতি
খাদ্যপ্রাণে পরিপূর্ণ
রসুই
দিয়ে রান্না করুন
২, ৫, ১০ ও ৩৭ পাউণ্ড
টিনে পাওয়া যায়
HDX 14
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেণ্ট
কর্পোরেশন লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্ :
চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা
ম্যানেজিং এজেণ্ট :
এন আর সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ

ভারতের পণ্যতন্ত্র—শ্রীকালীচরণ ঘোষ—বিন্দুবাসিনী বাণী মন্দির, ৬নং রাজা বসন্ত রায় রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৭৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ মাত্র।

দশ বৎসর পর এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনার মধ্যে বাঙালী শিল্পপতি ও বাঙালী ব্যবসায়ীর অনড় মনের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থমালা লিখিবার চেষ্টা না করিয়া ইংরেজী ভাষায় লিখিলে, মনে হয় অধিকতর সম্মান পাইতেন; নেতাজী নাকি এইরূপ অনুরোধই করিয়াছিলেন।

"ভারতের পণ্য"—খনিজ, তণ্ডুল ও তৈলবীজ, তন্তু—এই তিনখানি পুস্তকে গ্রন্থকার আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যে পরিচয় দিয়াছেন, নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন সেজন্য বাঙালী জাতি উত্তর-কালে তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আজও আমাদের "কার্পণ্য"-দোষ দূর হয় নাই বলিয়াই এই পুস্তকত্রয়ের আদর হইতেছে না।

ইংরেজ শাসনের কল্যাণে আমাদের দেশের কোটি কোটি লোক বৃত্তি-হীন হইয়া পড়ে; এক শত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস এই গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় যে আমদানী-রপ্তানীর হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাই এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইংরেজ-শিল্পীর গুণে ও কৌশলে যাহা সম্ভব হয় নাই; রাজশক্তির অপব্যবহার করিয়া সে এই অঘটন ঘটাইয়াছিল। এই ধ্বংসের উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল ইংরেজের ঐশ্বর্য্য। আমাদের দেশে ইংরেজের নিজের প্রয়োজনে এই গঠন কার্য্যের ছিটেফোঁটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই গঠন-কার্য্যে আমাদের দেশের লোকও সহযোগিতা করিয়াছিল; তার প্রমাণও গ্রন্থকার দিয়াছেন।

আজ দেশের পুনর্গঠনের দায় আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এই দায় মিটাইতে হইলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা বাঙালী সংগঠক গ্রন্থকারের নানা পুস্তকে পাইবেন। এই আশায়ই পুস্তকাবলী লিখিত হইয়াছে এবং আমরাও সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর এই পুস্তক অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—শ্রীসুকুমার রায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩, পৃষ্ঠা ৵৴+১৫৪।

মোট পনরটি অধ্যায়ে লেখক স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ (সিপাহী যুদ্ধ) হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত কাহিনী পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধারণতঃ যেরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া স্কুলপাঠ্য ইতিহাস লেখা হয় এ পুস্তক মোটেই সে ধরণের নহে। এতদিন পরে অবশ্য দেশের লোকের প্রকৃত ইতিহাস লেখার সুযোগ জুটিয়াছে। দেড় শত পাতায় এই বিরাট দেশের ১৮৫৭ হইতে ১৯৪৭ এই ৯০ বৎসরের ইতিহাস লেখা বিশেষতঃ স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু লেখক দক্ষতার সহিত এ কাজ করিয়াছেন। ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহের দীর্ঘ কাহিনী, দেশের রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্রমবিকাশ, কংগ্রেস, বঙ্গভঙ্গ, অগ্নিযুগ, অনুশীলন-যুগান্তর-আত্মোন্নতি সমিতি, রাজনৈতিক ডাকাতি, গুপ্ত সমিতি, ভারত-জার্ম্মান ষড়যন্ত্র, বুড়ীবালামের যুদ্ধ কিছুই বাদ পড়ে নাই। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইহাতে স্থান পাইয়াছে—যাহা এতদিন সহিংস আন্দোলন বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়াছিল। সহিংস এবং অহিংস ঘটনার সমাবেশ হিসাবে উভয়ই ইতিহাসে স্থান পাইবে। কোনটা অধিক মর্য্যাদার অধিকারী ভবিষ্যৎই তাহার বিচার করিতে পারে। বিখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। বাঙালী পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। এইরূপ গ্রন্থ প্রত্যেক গ্রন্থাগারে স্থান পাওয়া উচিত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ছন্দহারা—চার্ব্বাক লিখিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২৭৪ পৃ.। গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী ১বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য ৩৲।

উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে অনেক কথা ব্রিটিশ আমলে চাপা ছিল। স্বাধীনতালাভের পরে সে সব কথা ক্রমশঃ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কাব্যে খোলাখুলি স্থান পেতে আরম্ভ করেছে। লেখক বহু ঘাটে জল খাওয়া অভিজ্ঞ লোক। রাজরোষ ছাড়াও অপরাপর শক্তি ও ব্যক্তির রোষও তাঁর উপর পড়েছে। বেশ গুছিয়ে উপন্যাসের সূত্রে মালা গেঁথে তিনি সে সব কথা পাঠকমহলে উপস্থিত করেছেন। নূতন রকম এবং উপভোগ্য বই। চার্ব্বাক ঋণ করে ঘি খাওয়ার সমর্থন করে গেছেন। আমাদের এই চার্ব্বাক ঋণ করেছেন মনে হয়, তবে ঘিটা বেশীর ভাগই অপরে খেয়েছে।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। এ, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং। কলিকাতা ১২। মূল্য—৩৲।

রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনায় যে স্বল্প সংখ্যক লেখক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, প্রমথবাবু তাঁহাদের একজন। তাঁহার 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' ইতিপূর্ব্বে রসিকজনের সমাদর লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাটিকাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা ছয়টি অংশে বিভক্ত—গীতিনাট্য, কাব্য-নাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য, ঋতুচক্র এবং মূল কাহিনীর রূপান্তর। 'ঋতু-চক্র' অংশে স্থান পাইয়াছে 'অচলায়তন', 'বিসর্জ্জন', 'শারদোৎসব', 'ঋণ-শোধ', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী,' 'রাজা ও রাণী', রাজা, ফাল্গুনী। এই নাটকগুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে নাই। লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকখানি নাটকে একটি বিশেষ ঋতুর সুর বাজিয়াছে। প্রমথবাবুর আলোচনা মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং আক্ষরিক ব্যাখ্যানে পরিপূর্ণ নহে, তাহাতে চিন্তা, বিচার ও রসগ্রাহিতার পরিচয় আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সারেঙ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স, পি-৬, মিশন রো এক্সটেনশান, কলিকাতা। দাম ২৷৷০।

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গল্পগুলির মধ্যে আছে এমন কতকগুলি চরিত্র যাহারা নিত্য-দেখা হইয়াও অপরিচয়ের দূরত্বে বাস করে—যাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিমিত এবং সুখ-দুঃখের জগৎ সঙ্কীর্ণ। সরল, সমাজ-শাসনভীত, অবহেলিত এমন কতকগুলি মানুষকে আপন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে নূতন করিয়া লেখক প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নস্তরের জীবনে ময়লা-মাটি-ধূলা-কাদা লাগিয়াই থাকে, বাস্তববোধের দায়িত্বে সে সব পরিহার করা দুরূহ হইলেও প্রকাশভঙ্গীর সংযমে রসসৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্বাচনেও লেখকের দায়িত্ব কম নয়। এই সংগ্রহে কোন কোন গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ যশোমতী গল্পটির উল্লেখ করা যায়। রিরংসা-উদ্দীপনামূলক বর্ণনায় গল্পটির অন্তর্নিহিত করুণ রস বীভৎস রসে পরিণত হইয়াছে। এ ছাড়া প্রায় সবগুলি গল্পই ভাল হইয়াছে। সারেঙ গল্পটি এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প। স্নেহ বঞ্চিত একটি ছন্নছাড়া জীবনের করুণ কাহিনী অপূর্ব দরদের সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য মীমাংসা—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—৭০। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে রসতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ নামে যে চারিটি বিশিষ্ট মতবাদ প্রচলিত আছে আলোচ্য পুস্তিকায় মুখ্যতঃ তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ সাহিত্যের লক্ষণ ও সাহিত্যে অলঙ্কারের স্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন মতের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তিকা-মধ্যে লেখকের অলঙ্কার-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়—রচনাভঙ্গী ও ব্যাখ্যান-কৌশলও প্রশংসনীয়। তবে উপজীব্য সংস্কৃত গ্রন্থের ভাব ও ভাষার আত্যন্তিক প্রভাব সাধারণ পাঠকের নিকট ইহাকে নিতান্ত দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অক্ষরে অক্ষরে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯। মূল্য ২৷৷০।

উপন্যাস। সারদা প্রেসের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ, কিন্তু কাহিনীর জটিলতার সূত্রপাত হয় প্রকৃতপক্ষে উর্মিলার ব্যর্থ প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া। নীলকমল ও উর্মিলা গরীব বাপের ছেলেমেয়ে। সরিৎকুমার নীলকমলের বন্ধু—কবি এবং বড়লোকের ছেলে। ইহাকেই উর্মিলা ভালবাসিল, সরিৎকুমারেরও অকুণ্ঠ সাড়া মিলিল অথচ উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিতেই সে আত্মগোপন করিল। উর্মিলা প্রতিজ্ঞা করিল, সে বিবাহ করিবে না।

এদিকে নীলকমল উর্মিলার নির্বাচিত মেয়ে মণিমালাকে বিবাহ করিল এবং ভাই-বোনের মিলিত চেষ্টায় সারদা প্রেসের প্রতিষ্ঠা হইলে উর্মিলা একান্তভাবে প্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রেস চলিল উর্মিলার পরিচালনাধীনে। এমনই দিনে হঠাৎ সরিৎ দেখা দিল তার চলার পথে, উর্মিলা তাকে অনাদরে বিদায় দিল।

সহসা নীলকমল যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। আর এই সুযোগে সরিৎ পুনরায় আসিয়া উর্মিলার পাশে দাঁড়াইয়া প্রেসের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিল। সরিতের সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং মূলধন বিনিয়োগে প্রেস ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল। একদিন উর্মিলাকে সরিতের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বলিতে শোনা গেল, "কি উপায় হবে আমার?"...সরিৎ বহু-পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছে। এইরূপে ঘটনাপ্রবাহ আবার সরিৎ ও

উর্ম্মিলাকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কাহিনীর পরিসমাপ্তি হইল উর্ম্মিলার পরিণয়ে আর তাহা তারই প্রেসের হেড কম্পোজিটার হেমন্তর সহিত।

মোটামুটি উপন্যাসখানি এই। নরেন্দ্রবাবু খ্যাতিমান লেখক, কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানি তেমন জমাইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া উর্ম্মিলার হেমন্তকে বিবাহের প্রস্তাব করার দৃশ্যটি অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইল। মণিমালা-চরিত্রটি বড় ভাল লাগিয়াছে।

বিয়ের খাতা—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সেনগুপ্ত ট্রাষ্ট, পি-৯৩, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। দাম ২৷০।

উপন্যাস। ছেলের বিবাহ দিয়া যাঁহারা একই সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যালাভের স্বপ্ন দেখেন মুন্সেফ ধনগোপাল তাঁদেরই একজন। 'বিয়ের খাতা' ইঁহারই উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। ইহাতে একের পর এক বহু মেয়ের ফটো, ঠিকুজি কুলজী, স্থানলাভ করিয়াছে, কিন্তু বছরের পর বছর অতিবাহিত হইয়া যায়, নির্ব্বাচন-সমস্যাটা উত্তরোত্তর জটিলতর হইয়া দেখা দেয়। ছেলের বয়স বাড়িয়া চলে, কিন্তু মনের মত কনে' পাওয়া যায় না। যখন বিশেষ ভাবে খোঁজ করিতে অগ্রসর হন তখন দেখা যায় ইতিমধ্যে বহু মেয়েই সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া এক প্রবঞ্চকের মেয়েকে নির্ব্বাচন করিয়া বসিলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়; মুন্সেফ-নন্দন অরিন্দম বিবাহ করিল অলকাকে এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে। অলকা তার পরিচিত এবং বাঞ্ছিত। উহাকে সে এক ঝড়ের মুখে জাহাজডুবির সময় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বাঁচাইয়াছিল। ঝড়ের দৃশ্যটি চমৎকার।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দিনান্তের আগুন (নাটক)—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রাপ্তি-স্থান: শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা।

যুগলক্ষণ প্রকাশ করা সমসাময়িক নাটকের একটি মস্ত বড় গুণ। দেশবিভাগের ফলে পূর্ব্ববঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের হিন্দু ও মুসলমান বাসিন্দাদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় আলোচ্য নাটক তাহারই একটি প্রতিচ্ছবি। ভীত, সন্ত্রস্ত স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীরা সম্মান ও মর্য্যাদাহানির ভয়ে পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে চলে যেতে ব্যস্ত, অপর দিকে অপরিণতবয়স্ক মুসলমানেরা ক্ষমতালাভের উল্লাসে হঠকারী এবং উত্তেজিত, কিন্তু এই দুই দলের মধ্যেও আছেন বিষ্ণু রায়ের মত জমিদার। শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের মাটির টান ছাড়তে না পেরে তিনি গ্রামেই ফিরে এলেন। তা ছাড়া আছে করিম সর্দারের মত মুসলমান চাষী—দেশবিভাগের পরেও যার বিবেক ও শুভবুদ্ধি খণ্ডিত হয়ে যায় নি। যে বিষয়বস্তুকে উগ্র মালমশলা মিশিয়ে মেলোড্রামা করা যেত লেখক আশ্চর্য্য সংযমে সর্ব্বত্রই তার রাশ টেনে রেখেছেন। নাটক-রচনায় সংযম কম কথা নয়। চরিত্র-চিত্রণের গুণে এবং পূর্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার সংযোগে বিষ্ণু রায়, আইজদ্দি, পটল ডাক্তার, মেহের, করিম সর্দার, অতসী, ক্ষেমঙ্করী আমাদের সামনে সজীব হয়ে উঠে। প্রচলিত বাংলা নাটকের রুচি-পরিবর্ত্তনের দিক থেকেও 'দিনান্তের আগুন' উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যগীতিকা নাটকের একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হবে।

অশোক (নাটক)—শ্রীমন্মথ রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমন্মথ রায় রচিত যে কয়খানি নাটক বাংলা নাট্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, "অশোক" তাহাদের অন্যতম। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র থেকে সুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং অপরেশচন্দ্র পর্য্যন্ত বিভিন্ন সুর-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকরচনার মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র দেখতে পাওয়া যায়—মন্মথ রায়ে এসেই তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা দিল। বাস্তব জগতের ঘটনাকে মঞ্চ প্রাধান্য না দিয়ে—তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের অন্তর্লোকে যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়—মনোজগতের সেই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকেই মন্মথ রায় তাঁর নাটকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকগুলির আবেদন আধুনিক মনের কাছে আজও অক্ষুন্ন এবং অব্যাহত আছে। আর একটি জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়—মন্মথ রায়ের ভাষা। অশোক নাটকে তার চরম স্ফূর্ত্তি লক্ষণীয়। গুরুগম্ভীর শব্দযুক্ত ওজস্বিনী ভাষা নয়, অলঙ্কারের ভারে অবনত আবৃত্তিধর্ম্মী দীর্ঘ সংলাপ নয়—ছোট ছোট, সহজ অথচ সুরময় কথার সাহায্যে চরিত্রচিত্রণের এই পদ্ধতি, মন্মথ রায়ের সম্পূর্ণ নিজস্ব। রণপিপাসু চণ্ডাশোক কেমন করে ধর্ম্মাশোকে পরিণত হলেন, কেমন করে তথাগতের শরণ নিলেন—তা নানা ঘটনা-সংঘাত ও বিচিত্র নাটকীয় মুহূর্ত্তের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে "অশোক" নাটকে পশুশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শক্তি অশোকের মনে প্রভাব বিস্তার করছে, ক্রমশঃ তিনি "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" মন্ত্রে অভিভূত হয়ে পড়ছেন—মানসিক দ্বন্দ্বের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে গুপ্তশত্রুভীত অশোক গভীর নিশীথে ঘুমের ঘোরে তাঁরই আহ্বানে দর্শনার্থিনী স্ত্রী দেবীকে হত্যা করলেন। অশোকের জীবনের ট্র্যাজেডি তাঁর মনোজগতে বিপ্লব সৃষ্টি করলে। সিচুয়েশন সৃষ্টির নৈপুণ্য যে কত উচ্চ স্তরে উঠতে পারে, এই একটি ঘটনাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নাটক-রচনায় মন্মথ রায় যে নব রীতির প্রবর্ত্তন করেছেন—আঙ্গিক-নৈপুণ্য এবং সংলাপের মাধুর্য্যে অশোক তার মধ্যমণি হয়ে থাকবে।

গজকচ্ছপ (নাটক)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী। প্রকাশক: শ্রীকমলকৃষ্ণ গুপ্ত। ১৯৪বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃবিরোধের সেই পুরণো বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রচিত একখানি মামুলি নাটক। লেখকের 'জয়হিন্দ' নাটকে যে শক্তির পরিচয় ছিল, বিষয় বস্তু বা দৃষ্টিভঙ্গী কোনো দিক হইতে এই নাটকে তদনুরূপ পরিচয় খুঁজিয়া পাইলাম না।

আমার নাটক (উপন্যাস) - শ্রীহরি কাব্যতীর্থ। আলবার্ট লাইব্রেরী, নবাবপুর, ঢাকা। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

লেখক প্রথমেই নিবেদন করেছেন, "বইয়ের মত বই নিয়ে, জনসমাজের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমার নেই।...আমার এই বইখানার ছাপা-খরচ ভিন্ন সমস্ত বিক্রীর টাকা আমি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত আমার ভারতীয় ভাই-বোনদের দিব।"

লেখকের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই সাহিত্য রচনা করা চলে না। আন্তরিকতা এবং আবেগের প্রাবল্যই সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। সার্থক সাহিত্য-রচনা শক্তিসাপেক্ষ। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক মনের আবেগে শুধু কথার জাল বুনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে না আছে গল্পের বাঁধুনি, না বর্ণনার আকর্ষণ। নিজের অভিজ্ঞতা অথবা অন্তর্গূঢ় সহানুভূতির রসরূপকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে-তবেই তা রসোত্তীর্ণ হয়। দুঃখের বিষয়—লেখকের সেই ক্ষমতার কোন চিহ্নই এই বইয়ে নাই।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী
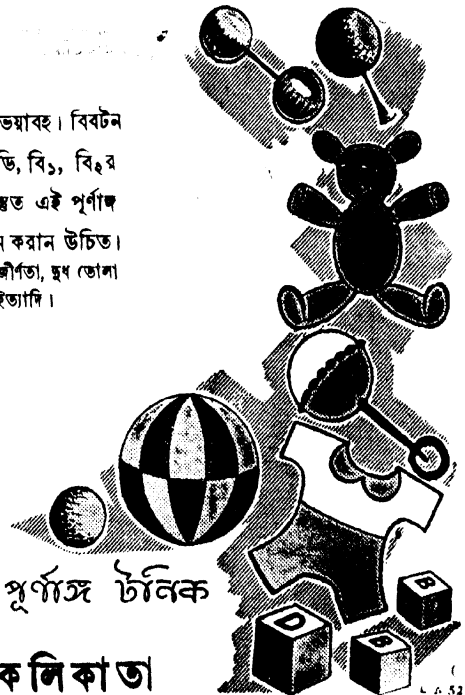
ক্যাপ্টেন সিকদার—শ্রীকালিদাস কাঞ্জিলাল। প্রাপ্তি-স্থান—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, পৃ. ২৩৭। মূল্য ৪৲

অভিমান যে প্রেমকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিতে পারিত তাহাই শেষে এক বিদেশী মেয়ের আত্মত্যাগে সফল হইয়া উঠিয়াছে। নায়ক বারীন সিকদার সৈনিকের কাজ গ্রহণ করিয়া বিদেশে নিজের জীবন লইয়া খেলা করিতে গিয়াছিল, সেখানে এক ইন্দোনেশীয় মেয়ে তাহাকে ভালবাসিয়াছিল এবং সেই মেয়েই নিজের প্রেমাস্পদের দিকে চাহিয়া তাহাকে তাহার দয়িতার হাতে তুলিয়া দিয়া চরম দুঃখ বরণ করিয়া লইল। লেখক নূতন হইলেও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

ব.

শ্রীধাম শান্তিপুর—শ্রীচণ্ডীচরণ দে। নীলমণি লাইব্রেরী, শান্তিপুর। পৃঃ ৪৫, মূল্য—৸৹

আমাদের দেশে গাইড বুক নাই বলিলেই হয়। সে হিসাবে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি একটি অভাব মোচনের চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার অল্প একটু চেষ্টা করিলে ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারিতেন। যেমন শান্তিপুরের বস্ত্র-শিল্পের ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা আরও বিশদ ও চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন। শান্তিপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কথা বলিতে গিয়া ৬।৭ মাইল দূরবর্ত্তী বাগআঁচড়াগ্রামের চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু ঐ গ্রামেরই উজ্জ্বল রত্ন ৺বৈদ্যনাথ বসু (যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন), বা তাঁহার পুত্র রায় বাহাদুর হেমচন্দ্রের কথা বলেন নাই। ঐ বংশেরই অধুনালুপ্ত বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব যতীন্দ্রনাথ বসুর কথাও উল্লেখ করেন নাই। ঐ গ্রামের হেমন্তকুমার সরকারের অনুল্লেখ আমাদের পীড়া দিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সম্বন্ধে এত কথা লিখিলাম এই জন্য যে, যাঁহারা এই শ্রেণীর পুস্তক লিখিবেন তাঁহারা যেন একটু যত্ন করিয়া স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

(১) ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(২) ভারতের অধ্যাত্মবাদ—শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম
(৩) শিশুর মন—শ্রীসুখেনলাল ব্রহ্মচারী।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জো ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেকটির মূল্য—।৹

বাৎস্যায়ন-রচিত কামসূত্রের টীকাকার জয়পুরের সভাপণ্ডিত যশোধর স্বরচিত জয়মঙ্গল টীকায় কামসূত্রে উল্লিখিত আলেখ্যের ছয় অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের শিল্পীগণ চিত্রের ষড়ঙ্গের সহিত পরিচিত ছিলেন। চীন ও জাপানের চিত্রশাস্ত্রে বর্ণিত ষড়ঙ্গের সহিত ভারতের ষড়ঙ্গের প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়, সুতরাং অনুমান করা কঠিন নয় যে, বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সহিত হিন্দু চিত্রের ষড়ঙ্গও চীন-দেশে নীত হয়। এই ষড়ঙ্গ হইতে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ চিত্রের প্রাণস্বরূপ ছন্দ ও রস নামক আর দুইটি অঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিল্পীর প্রকাশ-বেদনা বা উদয়-বাসনা ছন্দে সংবদ্ধ হইয়া রসের সাহায্যে কিরূপে আত্মা হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আত্মান্তরে সঞ্চারিত হয়, অনুপম ভাষায় শিল্পাচার্য্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'ভারতের অধ্যাত্মবাদে' প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ উদার ও ভারতের অধ্যাত্মদৃষ্টি সকল প্রকার বাধা-নিষেধ ভেদজ্ঞান ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কিরূপ সম্প্রসারিত ও মহিমান্বিত ছিল গ্রন্থকার অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ প্রধানতঃ এই তিনটি সাধনপদ্ধতিই হিন্দুশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে এবং সাধকগণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। অধিকারীভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তি-বাদকেই কেহ কেহ পরমার্থ বা মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাধনমার্গে এই তিনটির মধ্যে কোনটিরই মাহাত্ম্য অপরটি হইতে ন্যূন নহে। নিষ্কাম কর্ম্ম, অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও পরম প্রেমরূপ ভক্তি বিশ্বসভ্যতায় ভারতেরই নিজস্ব দান, বিশ্বের সহিত আত্মীয়তার যোগসূত্র স্থাপনই ভারতীয় দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এ বিষয়ে ভারতের নিকট জগতের অন্যান্য জাতির অনেককিছু শিখিবার আছে।

'শিশুর মন' লইয়া আলোচনা বর্ত্তমান যুগে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপরাধতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে আজকাল এই শিশু-মনস্তত্ত্ব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতি শৈশবকাল হইতে শিশুগণকে যথোচিতভাবে পালন ও শিক্ষা না দিলে উত্তরকালে তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের কিরূপে উৎকর্ষ বা অবনতি ঘটে, সহজ ভাষায় নানাদিক দিয়া গ্রন্থকার তাহাই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত এই বইগুলি পড়িয়া জিজ্ঞাসু পাঠক অনেককিছু শিখিতে ও জানিতে পারিবেন।

ছোটদের রামায়ণ কথা—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। দেশবন্ধু বুক ডিপো, ৮৪-এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। ১০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

সংক্ষেপে ছোটদের জন্য সাতকাণ্ড রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষের দিকে গ্রন্থকার দশানন রাবণ বধের পরে অদ্ভুত রামায়ণের সহস্রানন রাবণ বধের কাহিনী শুনাইয়া রামায়ণের কথা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকির সঙ্গে লবকুশের রামায়ণ-গান, সীতার পাতালপ্রবেশ, লক্ষ্মণবর্জ্জন ও রামচন্দ্রের সরযূর জলে দেহত্যাগের বর্ণনা সুন্দর হইয়াছে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সমগ্র কাহিনী এত স্বল্প-পরিসরের মধ্যে বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। কয়েকটি রেখাচিত্র পুস্তকখানিকে আকর্ষণীয় করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

টুনটুনি আর ঝুনঝুনি—মৌমাছি—বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

টুনটুনি আর ঝুনঝুনি মৌমাছি-রচিত শিশুদের উপযোগী যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত একটি গল্পের বই। ভূমিকায় লেখক তাঁর ছোট বন্ধুদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"আমার ছোটবেলার অমলিন স্মৃতি ও স্বপ্নকেই—মায়ের মুখের মিষ্টি ভাষায় শোনাবার চেষ্টা করেছি তোমাদের কাছে।" ছোট্ট মেয়ে ঝুনু মায়ের বুকে শুইয়া স্বপ্ন দেখিল সে, যেন টুনটুনি পাখীর সঙ্গে কোন্ অজানা দেশে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহার সেই স্বপ্নলোক-বিহারই কাহিনীটির বিষয়বস্তু। লেখকের ভাষার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, সেই জন্য গল্পটিতে খাঁটি রূপকথার আমেজ লাগিয়াছে। শিশুদের আহার-নিদ্রা ভুলাইয়া দিতে পারে বাস্তবিক এমনি চমৎকার গল্পটি—অথচ ইহাতে কেমন করিয়া শুঁয়াপোকা হইতে প্রজাপতি হয়, কেমন করিয়া ফুল ফোটে, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আসলে কি—ইত্যাদি কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যও সরস করিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে। বইখানির বহিঃসৌষ্ঠবও অনবদ্য. শিশুদের পক্ষে রীতিমত লোভনীয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী। ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা

পুস্তকখানিতে গল্পচ্ছলে দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান সংক্ষেপে আদ্যোপান্ত বর্ণিত হইয়াছে। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, উপাখ্যানের মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষার জন্য তিনি এই পুস্তিকার ভাষা একেবারে শিশুপাঠ্য না করিয়া সাধারণ পাঠক-পাঠিকার উপযোগী করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যাঁহাদের পক্ষে মূল সংস্কৃত চণ্ডী পড়া সম্ভবপর নহে তাঁহারা এই পুস্তিকা হইতে চণ্ডীর গল্পাংশ মোটামুটি জানিতে পারিবেন। ভাষা একটু গুরুগম্ভীর হইলেও কাহিনীটি অনুধাবন করিতে শিশু পাঠক-পাঠিকার অসুবিধা হইবে না। প্রচ্ছদপটে অসুরনিধনরত চণ্ডীর ছবিটি চমৎকার।

যৌবনের ডাক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত। জেনারেল লাইব্রেরী—১১৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য আড়াই টাকা

বাজারে যৌনতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকের অভাব নাই। কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তকের একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়িল। সমাজের কল্যাণ-কামনাই লেখককে এই পুস্তক রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। সেইজন্য অত্যন্ত সংযতভাবে তিনি বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক। প্রাচীন ভারতীয় কামশাস্ত্র এবং আধুনিক যৌন-বিজ্ঞান—এ দুয়ের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি বইখানি লিখিয়াছেন। লেখকের ভাষাটি বেশ ঝরঝরে; সরস করিয়া লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে—সেজন্য এই জটিল তথ্যপূর্ণ বইখানি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। নর-নারীর প্রণয়-লীলার বর্ণনা কোন কোন জায়গায় এত মধুর হইয়াছে যে তাহা পড়িয়া রস-সাহিত্য পাঠের আনন্দ পাওয়া যায়। প্রচ্ছদপটের ছবিটি কিন্তু সুরুচির পরিচায়ক নহে। উহা দেখিয়া পুস্তকখানি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে।

মেয়েদের জন্য—ফুলমালী। প্রকাশিকা—শ্রীমায়া মল্লিক। ১৮।১।১১এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৷৹।

আঠারটি নিবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বিদেশী লেখকদের রচনা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিলেও লেখিকা এই পুস্তকে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বিষয়গুলি অধিকাংশই মনস্তত্ত্বমূলক। প্রকাশভঙ্গীতে জটিলতা নাই, ভাষার আড়ষ্টতা কোথাও বক্তব্যকে অস্পষ্ট করিতে পারে নাই। লেখিকার কোন কোন মন্তব্যের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত না হইলেও স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই যে, তিনি বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিতা ও স্বাবলম্বিনী তরুণীদের ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ জটিল সমস্যার সমাধানের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বইখানি দরদ দিয়া লেখা এবং লেখিকার আন্তরিকতার পরিচয় ইহার সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। মেয়েমহলে এ ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ছড়ার ছবি—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্কলিত ও শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত। শিশু-সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বিলাতে ছাপা শিশুপাঠ্য ইংরেজী বই ছবিতে ভরপুর দেখিয়াছি। দেখিয়া দুইটি কথা মনে হইয়াছে। প্রথমতঃ শিশুদের প্রতি এমন যত্ন জাতির উৎকর্ষের একটি প্রমাণ, দ্বিতীয়তঃ কেবলই মনে হইয়াছে আমাদের দেশের জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের প্রতি কবে আমরা সজাগ হইতে ও প্রকৃষ্ট যত্ন লইতে শিখিব। আলোচ্য পুস্তকখানি হাতে পাইয়া বাস্তবিকই মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের শৈশবকালীন শেখা ছড়াগুলি এমন সুন্দরভাবে চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে যে, তাহা শিশুমনকে তো আনন্দদান করিবেই, বয়স্করাও এগুলি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। আমাদের সুপরিচিত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ লইয়া ছড়া কাটা। চিত্রে প্রত্যেকটি ছড়ার সঙ্গে পরিচিত-অপরিচিত জীবজন্তুর আকৃতি শিশুরা নব বেশে দেখিতে পাইবে, দেখিয়া আনন্দ পাইবে। হাতী-ঘোড়া, বিড়াল-কুকুর, সাপ-ব্যাঙ, মাগুর-কাতলা, গরু-পিঁপড়ে, কাক-ভোঁদড় প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর চিত্র থাকায় ছড়াগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সুচিত্রিত শিশুপাঠ্য বইয়ের অভাব দূরীকরণে প্রয়াসী হইয়া শিশু-সাহিত্য সংসদ সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

শান্তিনিকেতনে বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলন

গত ১লা ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাট্জু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং ভারতরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-সচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর সভানেত্রীর পদে রত হন। বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দকে সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলে পর সম্মেলনের উদ্যোগ-পরিষদের সভাপতি মিঃ হোরেস আলেকজাণ্ডার প্রতিনিধিদের সভা-মণ্ডলীর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন।

বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলনে উদ্বোধন বক্তৃতারত পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু

শান্তিনিকেতনে শান্তিবাদী সম্মেলনের অনুষ্ঠান সপ্তাহাধিককাল ব্যাপিয়া চলে। প্রতিনিধিগণ পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হইয়া মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার কর্ম্ম-সাধনার কথা আলোচনা করেন। সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে ইহার চেয়ারম্যান শ্রী সি. রামচন্দ্রন বলেন—"রবীন্দ্রনাথ বিশ্বশান্তির অগ্রদূত, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর আর কোনো ব্যক্তি যখন বিশ্বসমস্যা সমাধানের কোনো উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই তখন রবীন্দ্রনাথই প্রথম শান্তির বাণী প্রচার করেন।"

১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় এই সম্মেলনের একটি অধিবেশন হয়।

নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত গত ২৮শে নবেম্বর হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে ১৯০০ সনে নলিনীভূষণের জন্ম হয়। বাংলা ও ইংরেজীতে এম-এ ও অনার্স সহ বি-টি পাস করিবার পর তিনি জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্র দেব ইনষ্টিটিউশনে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, শেষে গৌহাটির বেঙ্গলী হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করেন এবং দীর্ঘকাল এই কার্য্যে ব্রতী থাকেন। গৌহাটিতে তিনি আর. এইচ. গার্লস কলেজেও অধ্যাপনা করিতেন।

শিশুদের উপযোগী গল্প কবিতা রচনায় নলিনীবাবু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শিশুসাহিত্যে তাঁহার খ্যাতি আছে। বার্ষিক শিশুসাথী ও অন্যান্য শিশুপাঠ্য নানা পত্রিকায় তাঁহার অনেক

নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

গল্প, কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। "বুলবুল", "ভূতের যুদ্ধ" প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। নলিনীবাবু অত্যন্ত সরল, অমায়িক, সদালাপী ও নিরহঙ্কার লোক ছিলেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

রসরাজ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

জন্ম ২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৭

"ন অস্য ক্রোধঃ প্রসাদশ্চ নিরর্থোঽস্তি কদাচন।"
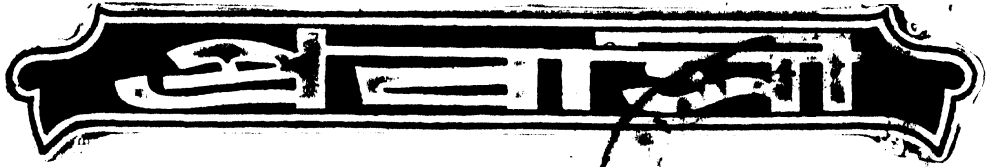
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৫৬

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ। প্রগতি বা অধোগতি ?

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি যেরূপ ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারেরও টনক নড়িয়াছে। উপরন্তু এখন পাকিস্থানের কয়লা বন্ধ হওয়ায় অন্য কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট এবং গণনা ও বিচারের অতীত অঙ্ক ঐ পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা বহু দিন যাবৎ এইরূপ পরিস্থিতির কারণ ও প্রতিকারের বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। অন্যান্য সংবাদপত্রেরও কিছুদিন যাবৎ অল্পে-স্বল্পে সুর বদলাইতেছে দেখিতেছি। কিন্তু প্রতিকারের মূল সূত্রের খোঁজ এতদিন করার কোনও বিশেষ প্রচেষ্টা আমরা দেখিতে পাই নাই। এবার দেশের কর্ণধারদিগের অন্যতম সর্দ্দার প্যাটেল স্বয়ং খোঁজ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার এই উদ্যোগের ফল কি হইবে তাহা এখন হইতেই বিচার করা অনুচিত, সুতরাং আমরা সে বিষয় এখন স্থগিত রাখিলাম। অদ্যাবধি তাঁহার সহিত স্থানীয় ব্যক্তিগণের যে আলোচনা হইয়াছে এবং তাঁহার এখানে বিচারের ক্রম ও সূচী বিষয়ে দৈনিক সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। আমরা ইহা হইতে এইটুকু তথ্যই পাইতেছি যে, এখনও রোগ নির্ণয় পর্ব্বই চলিতেছে। অবশ্য বিকারের প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইলে প্রতিকার সম্ভব হইতেও পারে :

সহকারী প্রধানমন্ত্রী কলিকাতায় পৌঁছিবার পর ১২ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহার সহিত লাটভবনে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই প্রদেশের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল এই আলাপ-আলোচনা চলে এবং এই সময় অন্যান্য বিষয়সহ প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার প্রশ্ন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের পরিস্থিতি ও উদ্বাস্তু সমস্যাগুলিও আলোচিত হয় বলিয়া প্রকাশ। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জিও ঐ আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সহকারী প্রধান মন্ত্রী ৪ দিন এখানে অবস্থান করিবেন এবং এই কয়দিবস তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থাসত্ত্বেও সর্দ্দারজী প্রদেশের বিভিন্ন স্বার্থ, দল ও জনমতের বহুসংখ্যক প্রতিনিধির সহিত প্রদেশের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিবেন।

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শুক্রবার সকালে লাটভবনে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্ম্ম-পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের এক যুক্ত সভায় মিলিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ধরিয়া এই সভা চলে।

জানা গিয়াছে যে, সর্দ্দার প্যাটেল কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কর্ম্মিগণ জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না ; এ কারণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি ঐক্যবদ্ধ না হন, তাহা হইলে দেশের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারিগণও অসৎ কার্য্যের সুবিধা পাইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, সর্দ্দার প্যাটেল কম্যুনিষ্ট উৎপাতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই উৎপাত দমন করিতে হইলে কংগ্রেস কর্ম্মিগণের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত দরকার। তাঁহাদের ঐক্যের দ্বারা কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে না পারিলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।

প্রকাশ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এই চার জন নেতা একত্রিত হইলেই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে বলিয়া জনৈক সভ্য এই সভায় পরামর্শ দান করেন। অপর একজন সভ্য বলেন যে, কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দ মিলিত হইলেই চলিবে না ; মাঝে মাঝে কংগ্রেস কর্ম্মপরিষদ,

পরিষদ দল এবং জেলা কংগ্রেসসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্র মিলিত হইয়া আলোচনা দ্বারা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

জানা গিয়াছে যে, সর্দ্দার প্যাটেল কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে নিজেদেরই তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সুবিধাজনক কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। বাহিরের কেহই তাঁহাদের সমস্যা সমাধানের পথ বাৎলাইয়া দিবে না বলিয়া তিনি জোর দিয়া বলেন। প্রকাশ যে, সর্দ্দার প্যাটেলের আবেদনক্রমে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধের মীমাংসার উপায় উদ্ভাবনের জন্য একত্র মিলিত হইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সর্দ্দার প্যাটেল বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের নিকট শহরের বর্ত্তমান গোলযোগসমূহ দমনের জন্য জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

জানা গিয়াছে যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সময়ে বিভিন্ন মহল্লায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া বিশেষ পুলিশবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা উপস্থিত করেন।

প্রকাশ যে, আলোচনাকালে কয়েকজন নাগরিক বর্ত্তমান গোলযোগের কারণ সম্পর্কে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিতে যাইয়া বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক মন্দা, শাসনকার্য্যে যোগ্যতার অভাব ও দুর্নীতি, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের স্বল্পতা প্রভৃতিকে বর্ত্তমান অসন্তোষের মূল কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহারা এই সকল ত্রুটি সংশোধনের জন্য বলেন এবং তৎসহ সরকারকে সহযোগিতা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শুক্রবার অপরাহ্নে লাটভবনে কলিকাতার ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতার অবস্থা এবং তাঁহারা ইহার প্রতিকারের জন্য কোন পরিকল্পনায় অগ্রসর হইতে পারেন কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

জানা গিয়াছে যে, সর্দ্দার প্যাটেল ছাত্রদের নিকট জানিতে চাহেন অপ্রীতিকর অবস্থার স্রষ্টিকারীদের দমনের জন্য তাহারা কি করিতে পারে। সরকারকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়া তাহারা বর্ত্তমান শিক্ষানীতির কয়েকটি ত্রুটি সম্বন্ধে সর্দ্দারজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রেরা তাঁহার নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করিয়া তাহাতে শিক্ষানীতির ত্রুটি সংশোধনের একটি পরিকল্পনা দেয় এবং ছাত্র-উদ্বাস্তু সমস্যার উল্লেখ করে। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ নগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যধিক ভীড়ের কথা উল্লেখ করিয়া জানান যে, ইহাতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটিয়াছে।

কংগ্রেস কমিটি গঠনে অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে ভুয়া সদস্য সংগ্রহ এবং মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠনে স্বেচ্ছাচার সম্বন্ধে অভিযোগ হইতেছে। কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, টেলিফোন গাইড, ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির ভোটার তালিকা নকল করিয়া "সদস্য-সংগ্রহ" এবং তাহাদের চারি আনা চাঁদা স্বার্থসংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ মেজরিটি হাতে রাখার রেওয়াজ কংগ্রেসে নূতন নয়। উহা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে বলিয়া কংগ্রেসের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে। আগে তবু একটা অসুবিধা ছিল যে, শুধু নাম লিখাইলেই হইত না, চারি আনা হিসাবে পয়সাটাও দিতে হইত বলিয়া জালিয়াতীর একটা সীমা থাকিত। এখন সে অসুবিধা উঠিয়া গিয়াছে। দুই বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে কংগ্রেসের বর্ত্তমান গঠনতন্ত্রের খসড়া যখন বেফাঁস হইয়া যায় তখনই আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছিলাম যে এবার কংগ্রেসের দুর্নীতি নিরঙ্কুশ হইবে, একনায়কত্বের রাজপথ বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। দেখা যাইতেছে তাহাই ঘটিয়াছে।

যে সমস্ত স্থানে সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কংগ্রেস-নেতারা কর্ণধার সেখানে সদস্য-সংগ্রহ কি ভাবে হইতেছে বর্দ্ধমানের পত্রিকা "দৃষ্টি"র সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে তার এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়,—"কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য-সংগ্রহ শেষ হইয়াছে; উপযুক্ত ও সক্রিয় সদস্য সংগ্রহ হইতেছে। প্রাপ্ত সদস্য তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় একই ব্যক্তির নাম একাধিক তালিকায় স্থান পাইয়াছে; একই হস্তে বহু লোকের নাম সহি হইয়াছে, টিপসহিও যথেষ্ট আছে। একই ব্যক্তি যে বহু লোকের নাম সহি করিয়াছে তাহা প্রমাণ করাও দুষ্কর হইবে না। চারি আনা হিসাবে বার্ষিক চাঁদা লইয়া যখন প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ হইত তখন জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ ও সাড়া পাওয়া যাইত এবার তাহা আদৌ মিলে নাই। বহু স্থানে সিমেণ্ট, লোহা ও চিনির প্রলোভন দেখাইয়া, স্থানে স্থানে সরকারের ভয় দেখাইয়া বহু লোককে কংগ্রেস-সদস্য করা হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের সুযোগ লইয়াও শুধু সহি বা টিপ সহি দাও বলিয়াও সভ্যতালিকা পূরণ করা হইয়াছে। জীবিত বা মৃত সে বিষয়ে কোন পরখ না করিয়াও শুধু ইউনিয়ন বোর্ড বা মিউনিসিপালিটির ভোটার তালিকা নকল করিয়াই কংগ্রেসের প্রাথমিক ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। স্বেচ্ছায় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা তুলনায় স্বল্প। কংগ্রেসের যাঁহারা সভ্য হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুসলমান, তপশীল, আদিবাসী ও নারীর স্থান উচ্চে। সজ্ঞানে কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী হইয়া যদি তাঁহারা কংগ্রেসে যোগদান করিতেন তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, জনসাধারণের উপর্য্যুক্ত

অংশগুলি ভয় ও অজ্ঞতার জন্য কুখ্যাত। তাঁহাদের ভয় ও অজ্ঞতার উপর কংগ্রেসকে বসাইবার প্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের আদর্শ ও গঠনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া সভ্য সংগ্রহের চেষ্টা স্বল্প ক্ষেত্রেই হইয়াছে। এখন কংগ্রেসের সভ্য হইলেও সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাইবেন একথাও বহু ব্যক্তি বলিয়াছেন।"

সিমেণ্ট লোহা চিনি প্রভৃতির পারমিট দিয়া এবং সরকারী অনুগ্রহ ও ভয় দেখাইয়া সদস্য-সংগ্রহের ক্ষমতা যে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেস-নেতার আছে এই গেল তাঁহাদের কার্য্য-পদ্ধতি। যাঁহারা সে ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন কিন্তু কংগ্রেসের খাতাপত্র হাতে রাখিতে পারিয়াছেন তাঁহারা কি করিতেছেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কালা ভেঙ্কট রাও কর্ত্তৃক ২০শে ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারীকে লিখিত নিম্নলিখিত পত্র তাহার প্রমাণ :

"অমৃত বাজার পত্রিকায় গত ৭ই ডিসেম্বর মহকুমা কংগ্রেস কমিটিসমূহের ঠিকানা এবং সেক্রেটারীদের নামের যে তালিকা আপনারা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক নাম ও ঠিকানা আপনাদের খুসী মত বসানো হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট অনেক অভিযোগ আসিয়াছে। একটি অভিযোগের কথা বলিতেছি। ১০ই আগষ্ট তারিখে আপনার স্বাক্ষরে এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শীল-মোহরে আসানসোল মহকুমা কংগ্রেস কমিটিকে যে সার্টি-ফিকেট দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সেক্রেটারীর নাম আছে শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ। কিন্তু অমৃত বাজারে প্রকাশিত তালিকায় ঐ কমিটির সেক্রেটারীর নাম আপনি দিয়াছেন ডা: অনাথ কুমার ভট্টাচার্য্য। বারাকপুর, বর্দ্ধমান সদর, নদীয়া এবং বনগাঁ মহকুমা কংগ্রেস কমিটিসমূহ হইতেও ঐরূপ অভিযোগ পাইয়াছি। অভিযোগগুলি আমি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। যে ভাবে আপনারা ঠিকানা এবং নাম বদল করিয়াছেন সেরূপ করিবার কোন অধিকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নাই। ফেরত ডাকে অভিযোগগুলি সম্বন্ধে আপনাদের বক্তব্য জানাইবেন; নচেৎ আমরা এক তরফা আদেশ দিতে বাধ্য হইব। আর একটি কথা, কলিকাতার ন্যায় যে সমস্ত স্থানে মহকুমা কংগ্রেস কমিটি নাই, সেখানে মহকুমা কংগ্রেসের দায়িত্ব জেলা কংগ্রেস কমিটিতে অর্শিবে। কোন অন্যথা না করিয়া এই নির্দ্দেশ পালন করিবেন।"

ডা: প্রফুল্ল ঘোষ কংগ্রেস দখল করার জন্য পাইকারী ভাবে ভুয়া সদস্য সংগ্রহ এবং অজানা সেক্রেটারী নিয়োগ করাইয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের কুৎসিত পরিকল্পনা আগেকার মতই চলে।

পশ্চিমবঙ্গে ধান সংগ্রহ

গত ২৯শে নবেম্বর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যচাষী সম্মেলন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা এবং ডা: প্রফুল্ল ঘোষ সেখানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুই জনের বক্তৃতা লইয়া বিলক্ষণ উত্তেজনা এবং বাদবিতণ্ডা হইয়াছে। একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা এবং ডা: ঘোষ দু'জনেই খাদ্যচাষীদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিতেছেন যে, তাহারা দুই বৎসরের ধান মজুত রাখুক, ধানের দাম সরকারের পরিবর্ত্তে চাষীরা ঠিক করুক এবং দরে না পোষাইলে সরকারকে ধান দেওয়ার পরিবর্ত্তে তাহারা scorched earth policy অনুসারে ধান পোড়াইয়া ফেলুক। দেশের বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের দিনে এই ধরণের পরামর্শ স্বভাবত:ই উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে। গত ১লা জানুয়ারীর হরিজনে শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :

"কলিকাতার ২৯শে নবেম্বরের সভায় শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পার বক্তৃতার রিপোর্ট আমার এক বন্ধু আমাকে পাঠাইয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা চাষীদের পরামর্শ দেন, 'গবর্ন্মেণ্ট যদি তাহাদের স্বার্থ না দেখিয়া কেবল উৎপাদন বাড়াইতে বলেন তবে তাহাদের ফসল যাহাতে গবর্ন্মেণ্টের হাতে না পড়ে তার জন্য পোড়া মাটির নীতি অনুসরণ করা উচিত।' ডা: কুমারাপ্পার এই scorched earth policy শ্রীযুক্ত সুরেশ দাশ, শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সুধীর নিয়োগীর খুব ভাল লাগে। ডা: ঘোষ সরকারের নীতির সমালোচনা করেন এবং চাষীদের ঐক্যবদ্ধ হইতে বলেন। তিনি তাহাদিগকে সরকারের নিকট হইতে ন্যায্য দাম আদায় করিতে পরামর্শ দেন এবং বলেন যে তাহা না পাইলে উৎপন্ন ফসল নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, গবর্ন্মেণ্ট যদি কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া চলিতে না পারে তবে উহা ধ্বংস হওয়াই ভাল। কুমার জানা ডা: কুমারাপ্পার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছেন; চাষীদের ঘরে ঘরে উহা পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। এই আন্দোলন সফল করিবার এবং সরকারী সংগ্রহ কার্য্যে বাধা দিবার জন্য শ্রীকুমারাপ্পা (না কুমার জানা), শ্রীদাশরথি তা এবং বীরভূমের শ্রীসত্যেন চাটার্জ্জিকে এই (ডা: ঘোষের) দল নির্ব্বাচন করিয়া চাষীদের মধ্যে কাজ করিতে পাঠাইতেছেন। ইঁহাদের একটি সম্মেলন বর্দ্ধমানে আহ্বান করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই উহা অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের পর এই দলের সদস্যেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে সত্যাগ্রহ করিতে এবং চাষীরা যাহাতে সরকারকে ধান বা অন্য খাদ্যশস্য না দেয় তার জন্য চাপ দিতে পারেন। এই সত্যাগ্রহের সময় ও তারিখ এখনও স্থির হয় নাই।

"শ্রী জে. সি. কুমারাপ্পা বা ডাঃ পি. সি. ঘোষ তাঁহাদের অতি বড় রাগের মুহূর্ত্তেও উপরোক্তরূপ উপদেশ দিতে পারেন ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। উপদেশটি এত অবিশ্বাস্তরূপে নীতিবিগর্হিত (immoral) এবং হিংস যে রিপোর্টটিকে তাঁহা মিথ্যা মনে করিবার ইচ্ছাই আমার হইতেছিল। তাঁহারা দুই জন বা যে কোন এক জন ঐরূপ উপদেশ দিয়াছেন অভ্রান্ত ভাবে ইহা প্রমাণিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, অতি সাংঘাতিকভাবে হিংস মানসিক অবস্থায় তাঁহারা উহা করিয়াছেন। দেশ আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধেও scorched earth নীতি অহিংস টেকনিক নয়; সত্যাগ্রহে উহার কোন স্থান নাই। সত্যাগ্রহী চাষী তাহার জমি, বাড়ী, ফসল ও সম্পত্তি শত্রুকেও দখল করিতে দিবে। ফসল সংগ্রহে যত অন্যায় এবং অপ্রিয় কার্য্যই করিতে হউক, আমাদেরই জনসাধারণের একাংশের জন্য গবর্মেণ্ট উহা করিয়া থাকেন। ইহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবাদের পথ খোলা থাকিতে পারে, কিন্তু একটি কণা খাদ্যশস্যও নষ্ট করা যায় না। ইহা ঈশ্বর ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপকার্য্য হয়। এরূপ পরামর্শ যিনিই দিন না কেন কাহারও শোনা উচিত নয়।"

শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালা লিখিতেছেন যে, তিনি শ্রীকুমারাপ্পা এবং ডাঃ ঘোষ দু'জনের কাছেই চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহেন যে ঐ রিপোর্ট ঠিক কিনা। তিনি বলিতেছেন, "ডাঃ ঘোষ নিজের এবং শ্রীকুমার জানার তরফে ঐরূপ কোন উপদেশ দেওয়া বা সমর্থন করার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন।" "লোকে যে সময়ে পর্য্যাপ্ত খাদ্য পাইতেছে না তখন খাদ্য নষ্ট করার কথাই উঠিতে পারে না"—কুমার জানা এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন এবং ইহা তাঁহারও মত। শ্রীকুমারাপ্পার বক্তৃতা সম্বন্ধে ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন যে তাঁহার 'যত দূর মনে পড়ে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট যদি রিজার্ভ না রাখিতে এবং তাহাদের নিকট হইতে ক্ষতিকর দামে (unremunerative price) ফসল লইতে চাহেন তবে গবর্মেণ্টকে খাদ্যশস্য না দিয়া তাহাদের উহা ধ্বংস করাই উচিত। এই উপদেশ আমি সমর্থন করি না। আমি ইহা অন্যায় মনে করি। চাষীদের উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে তাহাদের ফসল আদায় করাও আমি সমান অন্যায় মনে করি।' শ্রীকুমারাপ্পা সকলের শেষে বক্তৃতা করেন এবং তারপরেই সভা ভঙ্গ হইয়া যায় বলিয়া তিনি কোন প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।

"অতঃপর আমি শ্রীকুমারাপ্পাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে, ডাঃ ঘোষের চিঠি বা ঐ রিপোর্ট কোনটিতেই তাঁহার বক্তৃতা ঠিক ভাবে দেওয়া হয় নাই। আমাকে তিনি মুখে যাহা বলেন তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি তিনি এই কথা বলেন যে, দস্যু সম্পত্তি অপহরণে উদ্যত হইলে লোকে যেমন উহা তাহার হাতে পড়ার পরিবর্ত্তে ভাঙিয়া ফেলে, তেমনি এক্ষেত্রে তাহারা সম্পত্তি ধ্বংসে উদ্যত হইলেও তিনি আশ্চর্য্য হইবেন না। লোকে উহাই করুক একথা তিনি বলেন নাই। তিনি বলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস গবর্মেণ্টের খাদ্য সংগ্রহনীতি লুঠ ছাড়া আর কিছু নয়।

"আমি শ্রীকুমারাপ্পার কথাই বিশ্বাস করিলাম। তবে তাঁহার যে বক্তৃতা ডাঃ ঘোষ বা কুমার জানার ন্যায় লোকের মনেই ঐরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা যেখানে নিত্য সাবোটেজ হইতেছে এবং প্রকাশ্যে সাবোটেজের প্রচার কার্য্য চলিতেছে সেখানে লোকের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে এ কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত।"

পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টও এই বিষয়টি লইয়া শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন এবং ঐ সম্পর্কিত চিঠিপত্র লোকসেবক পত্রিকার রিপোর্টের ইংরেজী অনুবাদ সহ তাঁহাদের বক্তব্য পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকুমারাপ্পা গবর্মেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারীর পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন, "প্রকৃত গণতন্ত্রে গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়ে অংশীদার। গবর্মেণ্ট যদি ফসল উৎপাদনে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারে তবে তাহাতে ভাগ বসাইবার অধিকার তাহার নাই। এই ব্যাখ্যা সাপক্ষে লোকসেবকের রিপোর্ট মূলতঃ ঠিক। ডাঃ ঘোষের বক্তৃতা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না, তিনি বাংলায় বলিয়াছিলেন এবং আমি বাংলা জানি না।" লোকসেবকের রিপোর্টে শ্রীকুমারাপ্পার বক্তৃতায় scorched earth-এর কথা নাই। উহাতে আছে, শ্রীকুমারাপ্পা বলেন যে চাষীদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য দুই বৎসরের ধান সঞ্চিত রাখা উচিত। ইহার অতিরিক্ত ফসলটুকু ছাড়া আর একটুও না দেওয়ার সাহস তাহাদের থাকা উচিত। প্রয়োজন হইলে তাহাদের কারাবরণ করা উচিত।

স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পন্ন চাষীর ঘরে দুই বৎসরের ধান মজুত থাকিত এবং উহাতে গ্রামের অনটন দূর হইত, কিন্তু যুদ্ধের সময় ঐ সঞ্চয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত উহা পুনর্গঠনের সুযোগ আসে নাই। এই অবস্থায় হঠাৎ এক বৎসরে দুই বৎসরের সঞ্চয় রাখিতে গেলে দেশে দারুণ খাদ্যাভাব হইতে বাধ্য। খাদ্য বিষয়ে দেশে এখনও যে অবস্থা তাহাতে খাদ্য উৎপাদনে ও বণ্টনে বাধা সৃষ্টি হইয়া এক তিলও খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে এরূপ কাজ করা বা কথা বলা কাহারও উচিত নয়। ডাঃ ঘোষ বা শ্রীকুমারাপ্পার ন্যায় লোকদের পক্ষে ইহা আরও অন্যায়। ঝোঁকের মাথায় বা রাগের বশে লোককে বিপথে পরিচালনা করা নেতৃত্বের নিদর্শন নহে। দুই জনে কে কি বলিয়াছেন তাহা লইয়া তাঁহারা নিজেরা এবং রিপোর্টারেরা একমত হইতে পারিতেছেন না ইহা আরও

আশ্চর্য্যের বিষয়। বস্তুতঃপক্ষে, এই ব্যাপারে সত্যাসত্য সঠিক ভাবে নির্ণয় করার বাধা যাহাই হউক, একথা ইহাতে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, মহাত্মাজী "প্রফুল্ল লালছমে গিরগয়া" বলিয়া যে সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহার আজ পূর্ণ প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে। নিজের দলের স্বার্থের জন্য এবং অপরের দলের অপকারের জন্য যে ব্যক্তি দেশের সাধারণের সর্ব্বনাশের কথা ভাবিতে অবসর পায় না, ক্ষমতার লালসায় তাহার অধঃপতন কতটা হইয়াছে তাহা বলাও বাহুল্য।

খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি

এই বিষয়ে একটা আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে চলাইবার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিম-বঙ্গ গবর্ন্মেণ্ট একটি তথ্যপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্যের মূল্য—ধানচালের মূল্য—গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রয়ের সময় আরও অধিক বাড়াইয়া দিলে মাত্র শতকরা ১৫ জন লোক উপকৃত হইবে, বাকী প্রায় ৮৫ জন লোকের মধ্যে ভুমিহীন চাষী, শহরবাসী লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই বিবৃতি অনুমোদন করিয়া পশ্চিম-বঙ্গের কয়েকজন কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষক একটি বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে দিলাম :

"গত ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া যে 'প্রেস-নোট' প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের জীবনযাত্রার পথে এত প্রয়োজনীয় যে, ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অতি যত্নের সহিত আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

"আমরা গত দুর্ভিক্ষের করুণ দৃশ্য ও কঠোর শিক্ষা প্রায়ই ভুলিয়া গিয়াছি। দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের বিবরণী আমাদের স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি উক্ত বিবরণীর বিষাদপূর্ণ পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখি তাহা হইলে আমাদের স্মৃতিপথে উহার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলি উদিত হইবে। কমিশন বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রষ্টব্য বিষয়টি হইতেছে যে, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ এবং ইহা ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষসমূহের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ঘটনা। আমরা মনে করি যে, আমাদের দেশে কেহই এমন কি অধিক ধান্য উৎপাদনকারী ব্যক্তিগণ গত দুর্ভিক্ষের বিষাদময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন না।

"জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বর্ত্তমান উচ্চমূল্য আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির কত অবনতি ঘটাইতেছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। অল্প আয়-বিশিষ্ট বহু-সংখ্যক ব্যক্তিগণ জীবনধারণের নিম্নতম মানের নিম্নে রহিয়াছেন। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। দেশের স্বার্থের দিক হইতে ইহা ঘটিতে দেওয়া কোনমতেই সুবিবেচনার কাজ হইবে না। যাঁহারা অধিক ধান্য উৎপাদনকারী এবং ধান্য মজুতকারী তাঁহাদের স্বার্থের দিক হইতে দেখিলেও খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত হইবে না।

"আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, সম্প্রতি ধানের দাম বাড়াইবার জন্য কয়েক স্থানে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদির দ্বারা সমর্থন করা যায় না। পরন্তু জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান বর্ত্তমানে কমের দিকে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স-এর সভায় মাননীয় ডঃ জন মাথাইয়ের বক্তৃতা এবং ১৩ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে ভারতের খাদ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সুতরাং ধান্যের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলনের পরিণাম অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা যদি ফলবতী হয় তাহা হইলে জনসাধারণের দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছিবে।

"পরিশেষে আমরা বলিতে চাই যে, এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিবার আমাদের প্রধান ও একমাত্র অধিকার এই যে, আমরা এই দেশের জনসাধারণের একটি অংশ-বিশেষ। আমরা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নহি। আমাদের নিজের কোন স্বার্থ নাই। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দেশের সেবা করিয়াছি। আমরা জানি আমাদের দুর্ব্বল স্বর বেশী দূর পৌঁছিবে না কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদি ধানের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন সমর্থন করে না। গবর্ন্মেণ্টের প্রেস নোট আমরা মোটামুটিভাবে সমর্থন করি।

"(১) যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, আর্থিক জগৎ। (২) ভবদেব ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজিং ডিরেক্টার, বেঙ্গল ফার্মস্ এণ্ড ইন্ডাসট্রিস্ লিঃ। (৩) অমরনাথ রায়, স্বত্বাধিকারী, গ্লোব-নার্শরী। (৪) জিতেন্দ্ররঞ্জন ঘোষ, কৃষিক্ষেত্র, লস্করপুর (২৪ পরগণা)। (৫) তুলসীদাস মিত্র, কমন ম্যানেজার, মিত্র এষ্টেট। (৬) বিজয়কৃষ্ণ বসু, ব্যবসায়ী ও জমিদার। (৭) যতীন্দ্র-নাথ চক্রবর্ত্তী, আসাম কৃষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধিনায়ক। (৮) ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী কৃষি কমিশনার। (৯) সুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষ কর্ম্মচারী, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-বিভাগ। (১০) ধীরেন্দ্রনাথ সেন, মেদিনীপুর ফরেষ্ট ও এগ্রিকালচার লিঃ। (১১) অজিতকুমার রায়, ম্যানেজার, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক। (১২) বসন্তকুমার মিত্র, জমিদার। (১৩) সন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তী। (১৪) দুর্গাদাস মণ্ডল, কৃষক, আঠারবাটি। (১৫) দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, সম্পাদক, "খাদ্য উৎপাদন" পত্রিকা।"

গবর্ন্মেণ্টের বিবৃতি ও এই বিবৃতির মধ্যে চাষের ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখি। বিঘা প্রতি কৃষির ব্যয় বিভিন্ন জেলার ও অঞ্চলের নানাবিধ অবস্থার উপর নির্ভর করে;

ব্যয়ের পার্থক্য অনেক সময়েই লক্ষণীয়। কিন্তু এরূপ হিসাব নাই বলিয়াই নানাবিধ তর্কের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। গবর্মেণ্টের খাদ্যশস্য ক্রয়ের রীতি এক করিলে কোন কোনও স্থলে কৃষকের অসুবিধা হইতে পারে এরূপও শোনা যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ঘাটতি অঞ্চল হইতেও ধান চাল ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার কথা বলা যাইতে পারে। এই অঞ্চল বর্ত্তমান কৃষিমন্ত্রীর কর্ম্মস্থল ছিল। এই অঞ্চলের অবস্থা বিশেষরূপে জানিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। অথচ দেখিতে পাই যে তাঁহার অধীনস্থ ক্রয়বিভাগ এই ঘাটতি অঞ্চল হইতেও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতেছে। এই অঞ্চলে যাতায়াতের কোন সুবিধা নাই; ফলে ক্রীত শস্য রেশনের অঞ্চলে আনিতে অত্যধিক ব্যয় পড়িয়া যায়। এই অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিযোগও শোনা যায়:

> ৫৸৴০ ও ৬৴০ টাকা দরে ধান্য কিনিয়া যদি বলা হয় যে চাষীদের উৎপা ব্যয় ইহা অপেক্ষাও কম, এবং ঐ ধান্য যদি ১০৷৷০ টাকা মণ দরে মাননীয় সরকার কর্ত্তৃক বিক্রীত হইলে বলা হয় যে সরকার ক্ষতিপূরণ হইতেছে না, তবে মধ্যপথে যে রহস্য থাকিয়া যায় তাহা কাহারও বুঝিতে সময় লাগে না।

এই প্রকার অভিযোগের প্রত্যুত্তর দেওয়ার দায়িত্ব কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ের, কেননা যেখানে একদল লোক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কৃষকের মধ্যে অসন্তোষ প্রচারের অপচেষ্টা করিতেছে সেখানে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সময়মত হওয়া প্রয়োজন।

চাষের জন্য সামরিক বিধি

দুই বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে জগতের সমাজ-জীবনে সামরিক বিধিব্যবস্থা, নিয়মকানুনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ল্যাণ্ড আর্মি—কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক—এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে এ পরিচয় পাওয়া যায়। দেখাদেখি আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীগণ কৃষি কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য "গণফৌজে"র কথা বলিতেছেন। আমাদের কোটি কোটি ভূমিহীন কৃষকের মধ্য হইতে এই "গণফৌজের" রংরুট করা যায়। আমাদের ছাত্রসমাজও "কৃষক মজদুর রাজে"র প্রতিষ্ঠাকল্পে কৃষির কাজে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন বক্তৃতায় ও সংবাদপত্র স্তম্ভে। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের এই ধ্বনি রূপায়িত হইয়াছে, এইরূপ কোন পরিচয় এখনও আমরা পাই নাই।

কিন্তু বিলাতে গত দুই বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। "সত্যাগ্রহ পত্রিকা"র ২৫শে পৌষ তারিখের সংখ্যায় বিলাত প্রবাসী একজন বাঙালী ছাত্রের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাই যে ঐ দেশের ছাত্র-ছাত্রী ভাবের ও কর্ম্মের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়াছে। লেখকের নাম শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোড়ই:

> "স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাই…Land Force (ভূমিসৈন্যবাহিনীর) প্রধান সেনানী। দেশের ও জাতির খাদ্য সংরক্ষণে তাদেরও অবদান চাই। এই ভূমিসৈন্য বাহিনীতে মাত্র দু'এক সপ্তাহের জন্য হলেও যোগ দেওয়া চাই।…অনুরূপ কয়েকটি ক্যাম্পে লেখকের কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে আসিবার সৌভাগ্য ঘটেছিল।…গ্রেট ব্রিটেনের মত এই ক্ষুদ্র দেশটিতে এই বছর মোট ১,৩৩,৮৪১ জন স্বেচ্ছাসেবক…যোগ দিয়েছিল। তার মধ্যে আমরা বিদেশীয় ছাত্রছাত্রী ছিলাম ২২,৬৩০ জন।" আমাদের "বাবুর" দেশে ইহা সম্ভব কি?

আমাদের দেশের যুবকদের যেদিন শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে, যেদিন তাঁহারা উদ্দাম "শাখামৃগ বৃত্তি"র উত্তেজনা ত্যাগ করিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখিবেন, সেদিন এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে।

পাকিস্থানে ভারতবিরোধী প্রচার

ঢাকার 'আজাদ' নিয়মিত কলিকাতায় আসে, এবং এখানকার মুসলমানেরা আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিয়া থাকে। এই পত্রিকাটিতে অত্যন্ত উগ্রভাবে ভারতবিরোধী সংবাদ প্রচার করা হয়। পঞ্জাব এবং আসামে মুসলমানদের উপর "অত্যাচারে"র যে সমস্ত কাহিনী গত ২৬শে পৌষ তারিখের আজাদে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম আমরা এখানে দিলাম। আগামী আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনে বিষয়টি উত্থাপিত হওয়া উচিত; তাহার দেরি থাকিলে ভারত-সরকারের তরফ হইতে ইহার প্রতিবাদ পাকিস্থানে পাঠানো উচিত। আজাদ লিখিতেছে যে, পাকিস্থান ভারত-সরকারকে বিষয়টি জানাইয়াছে। সত্য অথবা মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, এ বিষয়ে ভারত-সরকারের নীরব থাকা উচিত নয়। এই সমস্ত প্রচারকার্য্য এমন যে প্রতিবাদ না হইলে ধর্ম্মান্ধ লোকেরা উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয় স্থানেই তাহার ফল খারাপ হইবে। আজাদের করাচী আপিস হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে "তুতে মিশ্রিত আটা খাওয়াইয়া মুসলিম মোহাজেরদের হত্যা; পূর্ব্ব পঞ্জাব কর্ত্তৃপক্ষের জঘন্য ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত; পাকিস্থানে শরণার্থী ৫৩ জন মোহাজেরের মৃত্যু ও দুই হাজার লোক অসুস্থ; পাকিস্থান কর্ত্তৃক ভারত-সরকারের নিকট অভিযোগ"—তিন কলমব্যাপী বড় বড় শিরোনামা দিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে:

"আম্বালা জেলার কুরালা আশ্রয়প্রার্থীকেন্দ্রে মুসলিম মোহাজেরদের মধ্যে তুঁতে বিষ মিশ্রিত আটা খাওয়ানো হইত। গত নভেম্বর মাসে উক্ত স্থান হইতে আসার সময় ট্রেনেই ১২ জন মোহাজেরের মৃত্যু হয় এবং দুই দিনের মধ্যে

আরও ৪১ জনের মৃত্যু হয়। তা ছাড়া প্রায় পাঁচ হাজার মোহাজেরের মধ্যে প্রায় দুই হাজার ব্যক্তিই বর্ত্তমানে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সকলই তুঁতে মিশ্রিত আটা খাওয়ার ফল। এ সম্পর্কে পূর্ব্ব পাঞ্জাব সরকার কোন জবাব না দেওয়াতে পাকিস্থান সরকার কর্ত্তৃক ভারত-সরকারের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছে।"

ঘটনাটি গত নবেম্বর মাসের বলিয়া গোড়ায় লেখা হইয়াছে, কিন্তু পরে তারিখ দেওয়া হইয়াছে নভেম্বর ১৯৪৭। সংবাদের শেষে মন্তব্য করা হইয়াছে, "পূর্ব্ব পাঞ্জাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম মোহাজেরগণকে হত্যা করার কার্য্যে লিপ্ত ছিল বলিয়া শেষ উপায় হিসাবে পাকিস্থান সরকার ভারত-সরকারের সহিত এ বিষয়ে লেখা-লেখি করিতেছেন।"

দুই বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বের এই ঘটনার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্ব পঞ্জাবে যাহারা বিষাক্ত আটা খাইল তাহাদের ভারত প্রান্তে কিছু হইল না, পাকিস্থানে ঢুকিবার পর হঠাৎ সকলে মরিতে বা অসুস্থ হইতে আরম্ভ করিল। দুই বৎসর পরে এখন আবার এই সব কাহিনী নূতন করিয়া প্রচার অর্থহীন মোটেই নয়। ভারত-সরকারের সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, উপেক্ষা করিলে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। নির্জ্জলা মিথ্যা প্রচার অকারণ করা হয় না।

আসামে মুসলিম নির্য্যাতনের কাহিনী

আসামের ব্যাপার আধুনিক এবং সমান চমকপ্রদ। উহা এইরূপ :

"মোমেনশাহী, ৮ই জানুয়ারী।—মোমেনশাহী জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত চরকুমারিয়ার জনাব আবদুল হামিদ জানাইতেছেন :—গত ৩০শে ডিসেম্বর আমরা ধানীখোলা চরকুমারিয়া হইতে ৬ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা মোট ৯ জন আত্মীয় বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। বিজনী ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছিলে কতিপয় লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আমাদিগকে ও আমাদের কামরার অন্যান্য যাত্রীকে আক্রমণ করে। বহু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও তাহারা স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে অত্যাচার চালাইতে থাকে। পুরুষদের দাড়ি চুল পুড়াইয়া দেয় ও নাক কান কাটিয়া দেয়। মেয়েদের উপরও অনুরূপ নৃশংস আক্রমণ চালাইতে তাহারা কসুর করে না।

"অতঃপর গাড়ী সারভোক ষ্টেশনে আসিলে আমাদিগকে 'জয়হিন্দ, জয়কালী' ধ্বনি করিতে করিতে কামরার বাহিরে ফেলিয়া দেয়। মরণাপন্ন হইয়া অতিকষ্টে ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট যাইয়া আমরা সমস্ত কথা খুলিয়া বলি। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের কথায় কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করে না।

"ব্যর্থ হইয়া আমরা সরভোগ থানার দারোগার নিকট যাইয়া আমাদের করুণ কাহিনী বিবৃত করিতে চেষ্টা করি। উক্ত দারোগা আবেদন শোনা ত দূরের কথা; অপর পক্ষে আমাদিগকে আটক করিয়া রাখে। যথাসর্ব্বস্ব দিয়া সেখান হইতে মুক্তি পাইয়াছি। কিন্তু অন্যান্য আট জনের কোন খবর জানি না।"

চুলদাড়ি পোড়ানো এবং নাককানকাটা অবস্থায় নয় জন স্ত্রী পুরুষকে দেখিয়া ষ্টেশন মাষ্টার বা দারোগার মন ভিজিল না, ঐ অঞ্চলে বহু সংখ্যক মুসলমান থাকা সত্ত্বেও কাহারও নজরে এই মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার পড়িল না, এ বিষয়ে ভারতীয় অন্ততঃ মুসলমান এবং ইংরেজ-চালিত সংবাদপত্রসমূহে একবর্ণ প্রকাশিত হইল না—এরূপ গঞ্জিকা ধূম প্রসূত গল্প বিশ্বাস করিতে আমাদের যতটা বাধা লাগে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের ততটা না লাগিতেও পারে। যাহা হোক পাকিস্থানে আজাদের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অতিশয় গুরুতর সংবাদ রূপে ইহা স্থান লাভ করিয়াছে।

আর একটি "ঘটনা" এইরূপ :

"রংপুর, ২৭শে ডিসেম্বর। আসাম হইতে প্রত্যাগত এক ব্যক্তি জানাইতেছেন :—প্রায় ১৫।১৬ দিন পূর্ব্বে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বিজনী থানা এলাকার সোনাইখোলা গ্রামের মুসলমানগণ সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পায়। ঘটনার দিন শুক্রবার ছিল। উক্ত গ্রামের মুসলমানগণ মসজিদে যখন জুম্মার নামাজে রত ছিল, তখন জনৈক সাব ডেপুটি কালেক্টারের নির্দ্দেশক্রমে হিন্দুগণ উক্ত মসজিদে অগ্নি সংযোগ করে। নামাজে রত মুসলমানগণ কোন প্রকারে সালাম ফিরাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়।

"উক্ত সাব ডেপুটির উপস্থিতিতে এবং তাহার নির্দ্দেশক্রমে হিন্দুগণ উক্ত থানা এলাকার বল্লমগুড়ি এবং সামুখাঘারী গ্রামদ্বয়ে যথাক্রমে ৯ ও ১৫ খানা বাড়ি এবং সামুখাঘারীর একটি মসজিদ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ ভাবে প্রত্যহ আসামে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের উপর হিন্দুর অত্যাচার বাড়িয়া চলিয়াছে।

"কোন কোন স্থানে মুসলমানের জমি খাসে আনিয়া হিন্দুদের নিকট পত্তন দেওয়া হইতেছে। অত্যাচারের ভয়ে মুসলমানগণ দলে দলে কংগ্রেসে নাম লিখাইতেছে।"

শেষ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্দ্ধমান ম্যাজিষ্ট্রেটের বিজ্ঞপ্তি

বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরে বর্দ্ধমানের "দৃষ্টি" পত্রিকায় (৩১শে ডিসেম্বর) নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"সংবাদপত্র মারফত এবং লোক পরম্পরায় সকলেই অবগত আছেন যে কিছুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের কতিপয় দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দুইটি পুলিসের রাইফেল ছিনাইয়া

লইয়াছে। বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই সব ব্যক্তি সাংঘাতিক অপরাধমূলক, বিশেষতঃ সমাজবিরোধী ও রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া এই কাজ করিয়াছে এবং সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এইরূপ দুর্ব্বৃত্তিপূর্ণ আচরণ নিশ্চিতই সকল সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তবুও আমার ধারণা তাহারা অপর দুষ্ট লোকের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াই ঐরূপ গুরুতর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এখনও সংশোধনের পূর্ণ অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং যদি এই ঘোষণার ১০ দিনের মধ্যে রাইফেল দুইটি ফেরত দেওয়া হয় তবেই অপরাধীর পক্ষে অনুশোচনা ও সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত থাকিব।"

ইহার পরবর্ত্তী অংশে "সমাজের সকল স্তরের সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের" নিকট রাইফেল উদ্ধারে পুলিসের সহায়তা করিবার জন্য আবেদন জানান হইয়াছে।

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি সম্বন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য করিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। শুধু এইটুকু জানিতে কৌতূহল হইতেছে যে, রাইফেল অপহরণের ন্যায় পিনাল কোডের গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিবার অধিকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের কবে এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে তো?

হাইকোর্ট সংস্কার

কলিকাতা হাইকোর্ট সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম। হাইকোর্টের এলাকা, গঠনপ্রণালী এবং ব্যয়বাহুল্য ইংরেজ আমলে বিদেশীদের সুবিধার জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে ভারতীয়েরা উহার সুবিধা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে দেশবাসীর সেরূপ কোন লাভ হয় নাই। বোম্বাইয়ে সিটি কোর্ট প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের লোকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা হাই-কোর্টের এলাকা এখন পূর্ব্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশে দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং দীর্ঘকাল বিচারক সংখ্যা পূর্ব্ববৎ রাখার আবশ্যকতা থাকিবে না। এটর্নী প্রথা এবং ব্যারিষ্টার ও এডভোকেট পার্থক্য কলিকাতা হাইকোর্টের একটি অসঙ্গত বিধি, এই দুইটিই এখন উঠিয়া যাওয়া উচিত। সম্প্রতি বাংলা-সরকার হাইকোর্ট সংস্কারের কথা বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিটির গঠনপ্রণালী দেখিয়া কিন্তু উহার উপর জনসাধারণের আস্থা আসে নাই, লোকে মনে করিতেছে যে উহা সমস্যাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গঠিত হইয়াছে এবং এ বিষয়ে সংবাদপত্রে আলোচনাও সুরু হইয়াছে। কমিটির দশ জন সদস্যের মধ্যে আছেন চেয়ারম্যান-রূপে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, সেক্রেটারী-রূপে বাংলা-সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী, তিন জন ব্যারিষ্টার, দুই জন এডভোকেট, মফস্বল বারের এক জন উকীল, এক জন এটর্নী এবং এক জন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল বারের প্রতিনিধিরূপে লওয়া হইয়াছে বর্দ্ধমানের একজন মুসলমান উকীলকে। হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে পত্র লিখিয়া এক জন উকীল বলিতেছেন যে কমিটির গঠন বিষয়ে কথা ছিল যে ব্যারিষ্টার ২ জন, এডভোকেট ২ জন, মফস্বল বারের ২ জন, এটর্নী ১ জন, সার্বডিনেট জুডিশিয়ারির ১ জন, আই-সি-এস ১ জন—এইরূপ ৯ জনকে লইয়া কমিটি গঠিত হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে চেয়ারম্যান বাদে ৯ জন সদস্যের বিলিব্যবস্থা ঐরূপে হয় নাই, ব্যারিষ্টার এক জন বেশী এবং জেলা বারের উকীল ১ জন কম লওয়া হইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত জজ যাঁহাকে লওয়া হইয়াছে তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা বিষয়ে কিছুই জানা নাই। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে নূতন যুগের উপযুক্ত পরিবর্ত্তনের কথা বলিতে পারেন এরূপ এক জন মাত্র সুপরিচিত লোক, শ্রীঅতুল গুপ্ত, কমিটিতে স্থান লাভ করিয়াছেন। এই কমিটি বাতিল করিয়া দিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক উহা গঠন করাইয়া লইলে এইরূপ সমালোচনার অবসর থাকিবে না। ব্যবস্থা-পরিষদের অধি-বেশন এই মাসেই আরম্ভ হইবে, সুতরাং ইহাতে অসুবিধা বা বিলম্ব কোনটিই হইবার কথা নয়।

হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশন

গত ১০ই পৌষ শনিবার কলিকাতা নগরীতে হিন্দু মহা-সভার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ইহার উদ্বোধন করেন শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর। এই কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ ও ত্যাগিশ্রেষ্ঠের পরিচয় দিতে হইলে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে যাইতে হয়। লোকমান্য তিলকের অনুপ্রেরণায় মহারাষ্ট্রে যে নূতন "জীবন-প্রভাত" দেখা দেয়, সেই সময় হইতে ১৪ বৎসর বীর সাভারকর দেশের স্বাধীনতার জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডভোগ করিয়াছেন; রত্নগিরি জেলায় প্রায় ১২ বৎসর অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৭ সালে যখন বোম্বাই প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি মুক্তিলাভ করেন, এবং নিজের বিশ্বাসের প্রেরণায় হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের "মুসলিম তোষণনীতি"র বিরোধী ছিলেন বলিয়া এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে "অহিংসা" নীতির প্রয়োগ অবাস্তব বলিয়া তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিলেন না।

হিন্দু মহাসভা তাঁহাকে নেতৃত্বের পদে বরণ করিয়া লইল; তিনি ইহার কর্ম্মপন্থাকে গতিশীল, সংগ্রামমুখী করিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই বলিয়াই ব্রিটিশ শাসনের অবসানে জাতীয় জীবনের নব-সংগঠনে হিন্দু মহা-সভার কোন প্রভাব বিস্তার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই পটভূমিকায়ই এই রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপের বিচার করিতে হইবে। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে গত ১২৫ বৎসরের শিক্ষার ফলে শিক্ষিত হিন্দুর মন গোঁড়ামির আহ্বানে মাতিয়া উঠিতে পারে না। এই কারণেই কেবলমাত্র হিন্দু সংস্কৃতির নামে কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের ডাকে তাঁহারা দ্বিধাবিহীন চিত্তে সাড়া দিতে পারেন না।

জাতীয় প্রকৃতির এই প্রমাণ মনে রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গের সামরিক সংগঠন করিতে হইবে। প্রায় দেড় শত বৎসরের অনুশীলনের অভাব পূরণ করিতে হইলে, কলম-পেশা ও ঘর-মুখো বাঙালীকে বিষ্ণুপুর বীরভূমের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে ঐ পুরাতন কথা শুনাইতে হইবে। গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশে নৃত্যের যে ইতিহাস "বঙ্গলক্ষ্মী" মাসিক পত্রিকায় বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে এই সংগঠন-কার্য্য কঠিন হইবে না। সমাজের অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গের "অন্ত্যজ" জাতিসমূহ আজ "অজ্ঞাতবাস" করিতেছে। ভারতরাষ্ট্রের স্বাধীন ব্যবস্থায় সেই "অজ্ঞাতবাসের" লাঞ্ছনা অতীতের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করা উচিত। রাষ্ট্রচালকবর্গ এই ইতিহাসের ইঙ্গিত বুঝিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য স্থির করুন।

ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা

বর্দ্ধমানের "আর্য্য" পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে :

> তুচ্ছ একটা খেলা লইয়া, জনৈক চিকিৎসক শিক্ষকের সাময়িক একটা ব্যবহার লইয়া অভিজাত বংশের, ভদ্র-গৃহস্থের শিক্ষিত সন্তানেরা দুই দিন ধরিয়া যে অক্লান্ত রণ-দুর্ম্মদ হইয়া উঠিবেন,—ইহা বিস্ময়ের সহিত একটা মর্ম্মান্তিক লজ্জার বিষয়। বাংলার যে যুবক এক দিন অর্দ্ধোদয় যোগে সেবাকার্য্য করিয়া, দামোদর বন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া, বিশ্বমানবের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারাই আজ অসহিষ্ণুতার চরম মাত্রা প্রদর্শন করিল। ঘটনাটা যতই ভাবিতেছি,—ততই মনে হইতেছে কাফ্রী ও নিগ্রো—দুইটি আরণ্যক বর্ব্বরতা—যেন উন্মত্ত তাণ্ডবে মাতিয়াছে। যেন মরুভূমির দুইটি উপজাতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে !! শিক্ষা, সংস্কৃতি, কালচার, উচ্চ শিক্ষার মহিমা—এ্যাডভান্সমেণ্ট অব্ লারনিং—এক ভস্ম আর ছাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া গেল !···কাহাকেও অভিযুক্ত করিতেছি না। আতঙ্কিত হইয়া ভাবিতেছি—আমাদের ভবিষ্যৎ কি ? কোথায় যাইতেছি ? শতবর্ষের য়ুরোপীয় শিক্ষা সভ্যতা কোন্ আসুরিক অসংযমের মাঝে আমাদের টানিয়া লইয়া যাইতেছে। একটা কথা কর্ত্তব্য-বোধে বলিতেছি—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ আমাদের স্নেহ-ভাজন। তাঁর পূর্ব্বজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দির লইয়া একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হইয়া গেল। তাঁর একবার উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। আজও বর্দ্ধমান তাঁহাকে মান্য করে। তিনি সম্মুখে দাঁড়াইলে ছাত্রদল নিশ্চয়ই শান্ত হইত।

কলিকাতার ছোঁয়াচ মফস্বলেও বিস্তারলাভ করিতেছে। যে বর্ব্বরতা কলিকাতার রাস্তা-ঘাটকে বিপৎসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে তাহার কারণ সম্বন্ধে সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেই অল্পবিস্তর চিন্তা করিতেছেন। ইহা কেবলমাত্র ছাত্রসমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। গত ১৮-১৯-২০শে পৌষ তারিখে কলিকাতায় ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে যে বর্ব্বরতার উন্মাদনা দেখিয়াছি, তাহা লক্ষ্য করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হয়। বিদেশী যাঁহারা ভারতীয়ের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিবার কর্ত্তব্য ভুলিয়া আমাদের যুবকবৃন্দ দেশের গৌরববৃদ্ধি করেন নাই।

এই রোগের চিকিৎসা কি, তাহাই এখন ভাবিতে হইবে। খেলার মাঠে ইহা বন্ধ করিতে হইলে খেলোয়াড়দের এইরূপ সহস্র সহস্র বর্ব্বরদের সম্মুখে খেলিতে অস্বীকার করা উচিত। শুনিয়াছি একবার ক্রিকেট বীর ব্র্যাডম্যান খেলার মাঠে চীৎকার ও উন্মাদনা দেখিয়া খেলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন ; এই ভর্ৎসনায় জনতা শান্ত হইয়াছিল। আমাদের যুবকবৃন্দকে সামরিক জীবনের কঠোর শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দিলে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে। এইরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পাড়ায় পাড়ায় অলস আড্ডাদারী বন্ধ হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে কুঠারাঘাত হইবে। এই ব্যবস্থা পরীক্ষার যোগ্য।

মণিমেলা সম্মেলন

আমাদের সমাজ-জীবনের বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতাই বাঙালীর একমাত্র পরিচয় নয়। গত ১৫-১৮ই পৌষ এই চারি দিন কলিকাতা নগরীতে যে মণিমেলা সম্মেলন উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা নানা নিরাশার মধ্যে আশার ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছেন। একটা বিবরণীতে দেখিয়াছি যে, এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ নিখিল-ভারতে বিস্তৃত ; তাহাদের সংখ্যা প্রায় পঁচাত্তর হাজার ; ইহার শাখার সংখ্যা প্রায় চারি শত। প্রাচ্যের এই "সর্ব্বাপেক্ষা" বৃহৎ কিশোর প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের কিশোরদের শিক্ষাকেন্দ্র। এই কেন্দ্রে তাহারা নূতন যুগের নূতন শিক্ষা লাভ করিতেছে—ভদ্রতা, শীলতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা—রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্ঘশক্তির অমোঘ পরীক্ষা যেসব গুণাবলীর মাধ্যমে সমাজ-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, মণিমেলা প্রতিষ্ঠান সেই গুণাবলীর অনুশীলন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

এক জন বাঙালী এই সংগঠনের প্রবর্ত্তক বলিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতেছি। বাংলাদেশ হইতে তাহা দিকে দিকে বিস্তারলাভ করিয়া একটা সর্ব্বভারতীয় সঙ্ঘবদ্ধতার গোড়াপত্তন করিতেছে। এই পঁচাত্তর হাজার কিশোর যখন নাগরিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, তখন তাহাদের শিক্ষার কল্যাণে দেশে নূতন জীবনের সূচনা দেখিতে পাইব, এই আশার মধ্যে আনন্দ আছে। আর এই আনন্দ বৃদ্ধি পায় এই ভাবিয়া যে, যে উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের জীবনকে ধিক্কৃত করিতেছে, তাহার বিনাশ হইবে বর্ত্তমানে যাহারা কিশোর তাহাদের হাতে।

শুনিয়াছি, এই সংগঠনের সভ্যবৃন্দকে শিক্ষার সময়ে রাজ-

নীতি হইতে—দলগত রাজনীতি হইতে—দূরে থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে যাহা রাজনীতি নামে পরিচিত তাহা হইতে দূরে থাকিবার এই নীতি সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। যাঁহারা এই সংগঠনের পরিচালক আমরা তাঁহাদের কর্ম্মের সাফল্য কামনা করি।

আসাম গবর্ন্মেণ্টের উদাসীনতা

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে শিলং হইতে প্রেরিত একটি সংবাদে দেখিতে পাই যে, আসাম গবর্ন্মেণ্ট শেলা নামক স্থানে একটি বিমান ঘাঁটি প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই স্থানটি শিলং হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত ; এবং এই স্থানে একটি বিমান ঘাঁটি প্রস্তুত হইলে বর্ত্তমানে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসীবর্গ "পাকিস্থানী" অবরোধে যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহাও নিবারিত হইবে। এই অঞ্চলের কমলালেবু, চুণ, সুপারি, আনারস, আলু প্রভৃতির ব্যবসায় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত শ্রীহট্ট জেলার মাধ্যমে পরিচালিত হইত এবং গত ২৭ মাস হইতে "পাকিস্থানী" মর্জ্জির উপর নির্ভর করিয়া এই অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। একটা হিসাবে দেখিয়াছি যে বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রীহট্টে গণভোটের পরে দ্রব্যাদির সহজ ও স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দিয়া পাকিস্থানীরা এই অঞ্চলের ৭০,০০০ লোকের উপর চাপ দিয়া পাকিস্থানে যোগদান করিবার মনোভাব তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি করিতেছে।

অসমীয়া-ভাষাভাষী অঞ্চল নয় বলিয়া শ্রীগোপীনাথ বড়-দলৈয়ের মন্ত্রিমণ্ডলী এই কষ্ট ও ক্ষতির প্রতি এত দিন দৃক্‌পাত করেন নাই। মনে হয় সম্প্রতি নানা দিক হইতে আঘাত পাইয়া তাঁহাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। আর এই মন্ত্রিমণ্ডলী বাঙালী-বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া এমন আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করিয়া যাইতেছেন যে, অদূরভবিষ্যতে তাহার একটা হেস্তনেস্ত অবশ্যম্ভাবী। আমরা জানি বাঙালীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য অসমীয়া-ভাষাভাষী নেতৃবর্গ জনাব সাহুল্লার মত মুসলিম লীগ প্রধানের সঙ্গে নানাভাবে জড়াইয়া পড়িতেছেন। কলিকাতার "যুগবাণী" পত্রিকা ৯ই পৌষ তারিখের সংখ্যায় আসামে মুসলমান-বৃদ্ধির একটা হিসাব দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, "১৮৯১ সালে আসামের (শ্রীহট্ট জেলা বাদ) মোট অধিবাসী ৩৩,২২,২৪০ জনের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩,১৪,৩৭১ অর্থাৎ প্রতি এগার জন অধিবাসীর মধ্যে মাত্র এক জন ছিল মুসলমান। ১৯৪১ সালে আসামের লোক-সংখ্যা (পাকিস্থানভুক্ত শ্রীহট্ট জেলা বাদ) ছিল ৭৬,০৬,০২৬ এবং তন্মধ্যে মুসলমান ১৭,৩৯,৯৮২ জন, অর্থাৎ প্রতি চার জন অধিবাসীর মধ্যে এক জন মুসলমান। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা ১৯৪১ সালের পর আজ পর্য্যন্ত আসামে মুসল-মান জনসংখ্যা অন্ততঃ ডবল হইয়া গিয়াছে।"

এই বিপদ সম্বন্ধে আসামের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী এক চক্ষু হরিণের মত চলিয়া ভারতরাষ্ট্রকে বিপন্ন করিতেছে। এই সম্বন্ধে আমাদের সহযোগীর সাবধান বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

> পাকিস্থান আসামের বিরুদ্ধে পূর্ণ ব্লকেড (অবরোধ) চালাইতেছে, কিন্তু আসাম গবর্ন্মেণ্ট এখনো পাকিস্থানের সিমেণ্ট কোম্পানীকে পাথর ও কয়লা সরবরাহ করিয়া তাহা চালু রাখিতেছেন। এই সিমেণ্ট কোম্পানীর একজন বড় অংশীদার মন্ত্রী বলদেব সিংহের পিতা ইন্দ্র সিংহ; আসামের এই যোগান বন্ধ হইলে পূর্ব্ব পাকিস্থানের এই সবে মাত্র একটি সিমেণ্ট কোম্পানী এখনই বন্ধ হইয়া যায়। গান্ধী টেকনিক্ পাকিস্থানের কাছে গান্ধীজীর আমলেই বার বার ব্যর্থ হইয়াছে একথাটা ভুলিলে ভারতরাষ্ট্রের বিপদ অনিবার্য্য। পাক-আসাম সীমান্তে এই বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে এবং বড়দলই গবর্ন্মেণ্টের অকর্ম্মণ্যতা এই সর্ব্বনাশকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতরাষ্ট্রে বাগ্‌বিতণ্ডা

ভারতরাষ্ট্রের পরিচালনা লইয়া তিক্ত আলোচনার অন্ত নাই। আমরা যে "নব-বৃন্দাবন" প্রত্যাশা করিয়াছিলাম পরদেশী শাসনক্ষমতার অবসানে তৎসম্বন্ধে অনেক কল্পিত বিবরণ দেখিয়াছি। প্রায় সকলেই গান্ধীজীর স্বপ্নের "রামরাজ্য" লইয়া অনেক কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন এই রামরাজ্যের উদ্দেশ্য ও নীতি আপনাদের জীবনে রূপদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা জানি না। তাঁহাদের সংখ্যা বেশী হইলে বর্ত্তমানের বাগ্‌বিতণ্ডার কোলাহল কথঞ্চিৎ স্তব্ধ হইত। তাহা হয় নাই; বরং বাড়িয়াই চলিতেছে। ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যেসব বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাই তাহার প্রমাণ। উভয়েই বলিয়াছেন—আমরা সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতেছি ; আমাদের চার-পাঁচ বৎসর সময় দাও ঘর গুছাইয়া লইতে ; তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রের যা' অভাব পরিশ্রম না বাড়াইলে, উৎপাদন না বাড়াইলে এবং খরচ না কমাইলে তাহা মিটিবার সম্ভাবনা কম। দেশের জনসাধারণ এই সব কথায় সান্ত্বনা পাইতেছে না।

একটি মাত্র উপায়ের কথা ভাবিতে পারিতেছি যাহা অবলম্বনে দেশের এই বাগ্‌বিতণ্ডা শান্ত হইতে পারে। সদ্য পরদেশী শাসনমুক্ত অন্যান্য দেশে কি ঘটিয়াছিল, কি করিয়া তাহারা যুগান্তব্যাপী সমস্যাসমূহের সুমীমাংসা করিয়াছিল, সেই কর্ম্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস আমাদের দেশের লোকের বুদ্ধিগম্য

করিতে পারিলে তাহাদের নিরাশা নিবারিত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত একখানি পত্রিকায় এরূপ একটা চেষ্টা দেখিয়াছি। লেখক যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের—ম্যাস্যাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির (Massachusets Institute of Technology) প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ এফ. এ. ওয়াকারের একখানি পুস্তকের বর্ণনা হইতে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের পরের অবস্থার চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, তাহা পাঠ করিলে ভারতরাষ্ট্রে যে নিরাশার ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা দূর হইবে। পুস্তকখানির নাম—একটি জাতির সংগঠন (The Making of the Nation)।

সেই ইতিহাসই সংক্ষিপ্ত আকারে দিতে চাই। আমেরিকার ১৩টি ব্রিটিশ উপনিবেশ ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তারপর প্রায় এগার বৎসর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয়সত্তা স্বীকার করাইয়া লইতে সক্ষম হয়, যদিও তাহারা ১৭৮১ সালেই যুদ্ধে ব্রিটিশের উপর জয়লাভ করে। ১৭৮৭ সালে রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা ১৩টি উপনিবেশের নাগরিকের প্রতিনিধি সভার নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রের ৯টি যদি এই বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবেই তাহা লোকগ্রাহ্য হইবে। এই সম্বন্ধে এরূপ গুরুতর সন্দেহ ছিল যে জর্জ ওয়াশিংটনকে বলিতে শোনা যায়—"যদি অধিকাংশ ঔপনিবেশিক এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তবে পরবর্ত্তী সংস্করণ রক্তাক্ষরে লিখিত হইবে।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলি সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে; কারণ বৃহত্তর প্রদেশগুলির শক্তি সম্বন্ধে তাদের একটা ভীতি ছিল। বৃহত্তম প্রদেশ, ভার্জিয়ানা, অনেক দিন দোমনা ছিল, কারণ তাহাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভাগে ক্ষুদ্রতমের সমান করা হইয়াছে। নিউ ইয়র্ক প্রদেশও সেই ভাবাপন্ন ছিল। যখন ১১টি প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধি গ্রহণ করিল, তখন কে আগে আসিল, কে পিছনে পড়িয়া রহিল, তৎসম্বন্ধে চিন্তার কারণ রহিল না। ১৭৯০ সালে সর্ব্বশেষ উপনিবেশ যোগদান করিল।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা ছিল ঋণের বোঝা। ফ্রান্স ব্রিটেনের শত্রু ছিল এবং বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। রাষ্ট্রের নাগরিকগণের নিকট হইতেও ততোধিক ধার করা হইয়াছিল। এই ঋণ লইয়া দেশ-বিদেশে তর্ক ও মনান্তরের সৃষ্টি হয়; প্রায় বিশ বৎসরে তাহা ক্ষান্ত হয়। এই নূতন রাষ্ট্রের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিত যখন তাহাকে শুনিতে হইত যে ফরাসীর সাহায্য না পাইলে সে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না।

এই অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক কথা শুনিতে পাই যাহা ভারতরাষ্ট্রেও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা হইতেই ভরসা করিতে পারি যে নিরাশার কালো মেঘ সরিয়া যাইবে।

জম্মু-কাশ্মীর সমস্যা

জম্মু-কাশ্মীর সমস্যা ভারতরাষ্ট্রের জন্মাবধি সমস্ত গঠনমূলক কার্য্যকে ব্যাহত করিতেছে। "পাকিস্তান" জম্মু-কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া এই সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতরাষ্ট্র অস্ত্রবলে আততায়ীকে দূর করিয়া সে সমস্যার সমাধান করিতে পারিত। হয়ত তাহার সে শক্তি ছিল না; এবং শক্তি থাকিলে তাহার সদ্ব্যবহার কেন হইল না তৎসম্বন্ধে সদুত্তর আমরা এখনও পাই নাই।

সম্মিলিত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের দরবারে নালিশ ও আপীল করিয়া ভারতরাষ্ট্র লাভবান হয় নাই, আমরা তাহা দেখিতেছি। জম্মু-কাশ্মীর সমস্যা ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পায়তাড়ার মধ্যে জড়াইয়া গিয়াছে। সংঘ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কমিশনের কার্য্যাবলী ও তাহাদের রিপোর্টে তাহার প্রমাণ। এই কমিশনের চারি জন সভ্য এক রিপোর্ট সহি করিয়াছেন; একজন সভ্য স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিয়াছেন।

চারি জন সভ্য আক্রমণকারী ও আক্রান্তকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়া "খোলা মনের" একটা ব্যর্থ অভিনয় করিয়াছেন। অতীতে "পাকিস্তানের" কুকার্য্য সব ভুলিয়া গিয়া একটা রায় দিয়াছেন, যাহা সদবুদ্ধিপ্রণোদিত হইতে পারে না। একজন সভ্য সোজা বলিয়াছেন যে ব্রিটিশ ও মার্কিন গবর্মেণ্ট এই জটিলতার জন্য দায়ী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের কমিশন ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাহা ভারতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করিবার বা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ব্রিটিশ হাই কমিশনারদ্বয়ের (দিল্লী ও করাচীর) নিকট পৌঁছিয়া যায়।

ইহার পিছনে একটা ষড়যন্ত্র আছে নিশ্চয়ই এবং তাহার সন্ধান করিবার চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইবে যে লণ্ডন ও ওয়াশিংটন নগরীর রাষ্ট্রকৌশলীগণ কোন অজ্ঞাত কারণে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বকে জিয়াইয়া রাখিতে চান। সেই কারণ সম্বন্ধে নানা সন্দেহের অবকাশ আছে। পাকিস্তান কি ভাবিতেছে তাহা জানি না। সে সন্তুষ্ট যে আক্রমণকারীর অভিনয় করিয়া সে বিশ্বের দরবারে সম্মান হারায় নাই। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ কমিশনের রায় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির (Security Council) প্রাক্তন সভাপতি কানাডার সেনাপতি ম্যাকনটন ব্রিটিশ মার্কিনী কটি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা ভারতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

ন্যায় ও মানবহিতের ক্ষেত্রে জোড়াতালির স্থান দিতে

অস্বীকার করিয়া ভারতরাষ্ট্র ভালই করিয়াছে। এই ভাবের রাজ্যে অটুট থাকিতে পারিলে সম্মিলিত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের কূটবুদ্ধিজীবীদের রঙ্গালয়ের দীপালোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। সে ধৈর্য্য ও শক্তি রক্ষা করিতে পারিলে সব দিক হইতে মঙ্গল। এই আশায় ভারতরাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জকে সংকল্পে দৃঢ় থাকিতে হইবে। বিলাতী-মার্কিনী-পাকিস্তানী ভাল ভাল কথায় বিভ্রান্ত বা অস্থির হইলে চলিবে না।

ভারত-ইতিহাসের রহস্য

বোম্বাই নগরীতে প্রসিদ্ধ গুজরাটী সাহিত্যিক শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সী প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে "ভারতীয় বিদ্যাভবন" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়াছেন। উহার উদ্দেশ্য ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন। এই ভবনের নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী নিমন্ত্রিত হইয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সেইজন্য ইহার কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম :

> ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতের দর্শন বিগত কালে ভারতকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজ যদি তাহা অব্যাহত থাকিত, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণতাজনিত ক্ষতির উপর হয়ত তেমন গুরুত্ব আরোপ করিবার প্রয়োজন থাকিত না। কেবলমাত্র পণ্ডিতের নয়, সাধারণ নরনারীর হৃদয়ে এবং তাহাদের গম্ভীর উপলব্ধির মধ্যে যদি বৈদান্তিক সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভবপর হইত, তবে স্কুল বা কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির ফলে তেমন মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হইত না। ক্ষোভের বিষয়, পরবর্ত্তী কালে আমাদের প্রাচীন সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। আমার আশঙ্কা হয়, তাহার কিছুই আর অবশিষ্ট নাই।...বৈদান্তিক সংস্কৃতি বলিতে যে শৃঙ্খলা, সংযম ও নীতিজ্ঞান বুঝায়, গত ৫০ বৎসরের অনুসৃত শিক্ষা-পরিকল্পনা দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সহিত দূরে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে। অথচ এই বর্ত্তমান শিক্ষা-পরিকল্পনা আমাদের প্রাচীন সম্পদের স্থানে কিছুই দেয় নাই।

এই ক্ষোভের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া আমাদের সহযোগী "উজ্জ্বল ভারত" প্রশ্ন করিয়াছেন ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন বলিতে কি বুঝায়? যাহা বৌদ্ধধর্ম্মকে দেশছাড়া করিয়াছে, যাহা ইস্‌লামের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারে নাই এবং যে হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার দাপটের সম্মুখে প্রায় দুই শত বৎসর নতশির ছিল, "কূর্ম্মনীতি" অবলম্বন করিয়া যে সংস্কৃতি আপনার প্রাণ কায়ক্লেশে রক্ষা করিয়াছিল, তাহাই কি ভারতীয় সংস্কৃতি?

"মনস্তত্ত্বের কোন্ রন্ধ্রপথে বিদেশের আক্রমণকারীগণ প্রবেশ করিল, কেন প্রবেশ করিতে পারিল,"---এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া "উজ্জ্বল ভারত" বলিতেছেন :—"এতদিনকার ভারতীয় সংস্কৃতি বর্জ্জন-নীতির উপর, নেতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ভারতের পক্ষে পরদেশীকে "হজম" করা সম্ভব ছিল না; বর্ত্তমানেও সেই শক্তির উন্মেষ হয় নাই বলিয়াই ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে।"

এই প্রশ্নাবলী ভারত-ইতিহাসের মূল রহস্যের অঙ্গ। কেবল বাঁচিয়া থাকায় কোন বিশেষ গৌরব না থাকিতে পারে। কিন্তু কেবল "কমঠ বৃত্তি" ও তার কৌশল অবলম্বন করিয়াই কি ভারত বাঁচিয়া আছে? রামমোহন যুগ হইতে গান্ধী যুগ পর্য্যন্ত কি একটা সমন্বয়ের চেষ্টা চলে নাই? জাতীয় জীবনের এই সংগঠকগণের জীবন প্রমাণ করে যে, আমাদের সমাজ-মন নিশ্চেষ্ট ছিল না। যতদিন এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়া যাইতেছে ততদিন এই রহস্যের স্বরূপ বুঝা যাইবে না।

ভারতীয় সংস্কৃতি

ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু যদি ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্ত্তনে হিন্দু সংস্কৃতির দানের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেন, তবে যখন তখন তিনি এরূপ ভাবে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেন না। ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আমাদের বর্ত্তমান সংস্কৃতি নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে; নানা বিকৃতির আধারও হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ এই পরিবর্ত্তনের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচরে যে বিরাট সমাজ প্রাচীন চিন্তাধারা ও রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে, তাহার সংবাদ আমরা সাধারণতঃ রাখি না। এত দিন তাঁহারা একটা পরদেশী উগ্র সমাজের তাড়নায় ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃতিতে প্রায় অবিশ্বাসী ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়েরাই সেই পরদেশী সমাজের প্রভুত্বকে দূর করিয়াছেন। এবং প্রাচীনপন্থীরা মনে করিতেছেন পরদেশী শাসনের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইবেন। এই আশার প্রকাশ শুনিতে পাই শান্তিপুর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের সপাদ শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন মহাশয় একটি ভাষণ প্রদান করেন। 'সংঘবাণী' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

> আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জাতীয় সরকার। কাজেই জাতীয় সরকারের কর্ত্তব্য উপযুক্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের বৃত্তির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাঁহাদিগের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার অন্তর্নিহিত যথার্থ ভাবধারা দেশবাসিগণের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া

তাহাদের জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত করা। দেশবাসী উপলব্ধি করুন তাঁহাদের অতীতের ইতিহাস, তাঁহারা উপলব্ধি করুন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সত্তা। ইহার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বিশেষভাবে এ বিষয়ে কার্য্য করিতেছেন সত্য, কিন্তু আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া নদীয়া শান্তিপুরস্থিত বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ সামান্য আকারে হইলেও পুরাণের ভিতর দিয়া আর্য্য ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। উৎসাহ পাইলে এই পরিষদ প্রসারিতভাবে আর্য্য ভাষা ও তদন্তর্গত বিবিধ তথ্যাদির প্রকাশ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন।

রাসায়নিক শিল্পের অবনতির কারণ

বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী পশ্চিম ইউরোপে ভ্রমণ শেষ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নানাবিধ প্রবন্ধে তিনি তাঁহার নূতন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিতেছেন। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় তিনি জার্ম্মানীতে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি ও ভারতে তাহার অবনতির কারণ সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জৈব রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি-অবনতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন :

> আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত 'হিমালয়ান' ব্যক্তিত্ব ও মনীষার অধিকারী যদি ঐ সময়ে এডিনবরার অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউনের কাছে না গিয়ে জার্ম্মানীতে বেয়ার এমিল-ফিশার বা হফ্‌মানের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষালাভ করতে যেতেন তবে আজ আমাদের গোটা দেশেরই চেহারা বদলে যেত—অত্যাবশ্যক ঔষধপত্র, রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতির জন্যে আজ আমাদিগকে বিদেশীর মুখের দিকে আর চেয়ে থাকতে হত না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও তা'হলে আজ সত্যিকারের রসায়নবিদ ও শিল্পবিদ আরও অধিক সংখ্যায় আমরা দেখতে পেতাম। তারপর আচার্য্য রায় যে সময় বিলাতে শিক্ষার্থে যান ঐ সময় বিলাতের মেধাবী উচ্চাভিলাষী রসায়নের ছাত্রমাত্রেই জার্ম্মানীতেই ঐ বিষয় শিক্ষা করতে যেতেন।
>
> স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের সুযোগ্য কর্ণধারগণ যদি অতীতের ঐ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি নিরোধে কৃতসংকল্প হন, যদি সত্যিকারের দেশকল্যাণ যথার্থই তাঁদের কাম্য হয়, তবে উচ্চাভিলাষী মেধাবী ছাত্রদের সকলকেই মার্কিন মুলুক বা বিলাতে না পাঠিয়ে জার্ম্মানীতে বা জার্ম্মানীর দিকপাল রসায়নবিদগণের পদাঙ্ক অনুসরণে আজ যেখানে পুরাদমে রসায়নশাস্ত্রের উচ্চতর চর্চ্চা অবাধ গতিতে চলেছে—সুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিখ শহরে নোবেল লোরিয়েট অধ্যাপক রুজিকা ও কারারের ল্যাবরেটরিতে পাঠালে—তাঁদের অর্জ্জিত জ্ঞানে দেশ সত্যসত্যই ধন্য ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

সাহিত্যে "উপেক্ষিতা"

নদীয়া কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ অনুবাদ সাহিত্যকে উপরোক্ত উপাধি দিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মুখপত্র "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকার নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখকের প্রতি-পাদ্য বিষয়ে নূতন ভাবে মনোযোগ দান করা উচিত। যখন আমাদের "রাষ্ট্রীয় ভাষা" করা হইয়াছে হিন্দি ভাষাকে যাহার শব্দসম্ভার ও প্রকাশভঙ্গী এই গুরু দায়িত্ব ও সম্মানের উপযোগী হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে, তখনই এই প্রয়োজন আরও অনুভূত হইতেছে। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া অনুবাদের সাহায্যে ভাষার উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসী-বৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে এরূপ আদান-প্রদান শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। বাঙালী আমরা এই বিষয়ে ভাগ্যবান। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যের দিকপাল এইরূপ অনুবাদ সাহিত্যে হাত পাকাইয়াছিলেন। সেইজন্যই বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া ভারতের অনেক ভাষা সম্পদশালিনী হইয়াছে। আজ নূতন পরিস্থিতিতে বাঙালীর এই বিষয়ে অবহিত না হইলে চলিবে না। প্রতিবেশী ভাষা-সমূহের উৎকৃষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সময় থাকিতে সাবধান হইতে হইবে। বাঙালীর সাহিত্য-গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার উচ্চ আশা নূতন গৌরবে মণ্ডিত করিতে হইলে অনুবাদ সাহিত্যের আরও উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। অধ্যাপক ঘোষের প্রবন্ধদ্বয় সেইজন্য সময়োপযোগী হইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিশ্বের বহুধা-বিভক্ত প্রকাশের মধ্যে ঐক্যের "দর্শন" লাভ করা, তাহাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা ও লোকবুদ্ধি-গ্রাহ্য করাই হইল দার্শনিকের কর্ত্তব্য, চিন্তানায়কের জীবনব্রত। বাঙালী সমাজ হইতে এইরূপ একজন দার্শনিক ও চিন্তানায়কের তিরোধান হইল।

কৃষ্ণচন্দ্র প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে নিজের জীবনের গতিপথ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া জাতির ও তাঁহার নিজের প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হন নাই। দুইয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া নিজের চিন্তা ও ব্যবহারে এমনি একটি সংযত ও শান্ত রূপ দান করিয়াছিলেন যাহা বর্ত্তমান দার্শনিক সমাজে বিরল হইয়া উঠিতেছে বলিলে অন্যায় হইবে না। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ছিল অনন্যসাধারণ; জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজনে যে অহমিকার প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা দেয় তাহা তিনি কঠোর হস্তে দমন করিয়াছিলেন। সেইজন্যই অনেকের মতে তিনি লোকের

নিন্দা-প্রশংসায় বীতস্পৃহ হইয়া, অর্থ ও সম্মান সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া দার্শনিকের প্রকৃত মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

এরূপ চরিত্রের লোক সমাজ-সংগঠনের ব্রত গ্রহণ করেন না বলিয়াই আমাদের জীবনে এত চিন্তা-সাঙ্কর্য্য, কর্ম্মে ও কর্ত্তব্যে এমন শিথিলতা। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মত লোকই এইরূপ বিপদে আমাদের পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। তিনি ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারের ক্ষতি ও দেশের ক্ষতি এক পর্য্যায়ের।

পূর্ণচন্দ্র মৈত্র

লাট কার্জ্জনের "বঙ্গভঙ্গ" চেষ্টার বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের রাজনীতিক চিন্তাধারা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করে। পূর্ণচন্দ্র মৈত্র তার সাক্ষীরূপে ১৯৪৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে প্রার্থিত লোকে চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে উক্ত আন্দোলন বিশেষ উগ্ররূপ ধারণ করে। বরিশালের অশ্বিনীকুমার, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ, ঢাকার আনন্দচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ; ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু, তারানাথ, সূর্য্যকান্ত; ত্রিপুরার মথুরামোহন, ভূধরচন্দ্র, অনঙ্গমোহন; চাঁদপুরের হরদয়াল, মহেন্দ্রনাথ; চট্টগ্রামের যাত্রামোহন; শ্রীহট্টের শশীন্দ্রচন্দ্র, রাধাবিনোদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। ফরিদপুরে অম্বিকাচরণের নেতৃত্বে পূর্ণচন্দ্র আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার কার্য্যে বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন।

তাঁহার পরিবারবর্গ সেই ধারা বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

হরিসিং গৌর

এই মহারাষ্ট্রীয় আইনজীবী প্রধান ও শিক্ষাবিদ প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। জীবনের প্রায় সমস্ত উপার্জ্জন, প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, মধ্য-প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। শেষজীবনে তিনি যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি, কারণ শিক্ষাদানে আগ্রহ তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। নাগপুর, দিল্লী, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলাররূপে তাঁর যে প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস্ চ্যান্সেলার রূপের মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

হরিসিং গৌর সমাজ-সংস্কারক ব্রতেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরবিলাস সরদা বাল্য-বিবাহ-নিরোধ আইন পাস করাইয়া ভারতীয় সমাজের একটা দুর্ব্বলতা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরিসিং গৌর হিন্দু আইনের সংস্কার চেষ্টা করিয়া, এই সমাজের নানা শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শিক্ষাবিদরূপে তাঁহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা দেশের লোকের মনে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবে।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

পূর্ব্ববঙ্গের খুলনা জেলার একজন প্রধান ব্যক্তি কর্ম্মের পরপারে চলিয়া গেলেন। প্রথম "বঙ্গভঙ্গ" আন্দোলন উপলক্ষে যে জীবনের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার আরম্ভ, দ্বিতীয় "বঙ্গভঙ্গের" পর তার পরিসমাপ্তি। বিধাতার বিধান আমাদের বুদ্ধির অগম্য; তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

কর্ম্মজীবনের উর্দ্ধে ও বাহিরে জ্যোতিষচন্দ্রের আর একটা রূপ ছিল। তিনি ভোলানন্দ গিরির শিষ্য ছিলেন; আধ্যাত্মিক সত্যানুভূতির প্রতি তাঁহার একটা সহজ টান ছিল। সেইজন্য দেখিতে পাই বৃদ্ধবয়সে তিনি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্ম ও ভাবের সমন্বয় সাধক আমাদের মধ্যে বিরল হইয়া যাইতেছে। জ্যোতিষচন্দ্র এই পথের পথিক ছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (পুরাতন রিপন কলেজ) তার অধ্যক্ষকে হারাইল। ৬৩ বৎসর বয়সে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মরলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গের দুঃখে আমরা যোগদান করিতেছি।

তিনি এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাতজামাই ছিলেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্রে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি "রিপন কলেজে" যোগদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের পরিচালক সমিতির সভাপতিরূপে তিনি শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করেন। সেই কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বনলতা দাশ

রেডিং ও আরউইন বড়লাটদ্বয়ের আমলে সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয় কেন্দ্রীয় আইন-সচিব ছিলেন। তাঁহার পত্নী বনলতা দাশ সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাংলার নারী-সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধায়ক চেষ্টার এক জন সমর্থকের তিরোধান হইল। শ্রীযুক্তা অবলা বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নারী-শিক্ষা সমিতির তিনি সহকারী সভানেত্রী ছিলেন, এবং অন্যান্য নারী-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। নীরবে তিনি তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্যাদি পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের শোকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

লেখক-লেখিকাদের প্রতি নিবেদন

ইদানীং ডাকের গোলমালে প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত রচনাদি সমুদয় আমাদের হস্তগত হয় না। আমরাও যেসব লেখা ফেরত পাঠাই তাহার প্রত্যেকটি যে রচয়িতাদের নিকট পৌঁছিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। এ কারণ লেখক-লেখিকাগণ সর্ব্বদা লেখার নকল রাখিয়া আমাদিগকে পাঠাইবেন। কবিতা ফেরত পাঠাইবার দায়িত্ব আমরা কোন ক্রমেই লইতে পারি না।—'প্রবাসীর সম্পাদক'।

বাংলার আদিকবি—চণ্ডীদাস না কৃত্তিবাস?

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের পৌর্ব্বাপর্য্য এবং অভ্যুদয়কাল নির্ণয়ে পুনর্ব্বিবেচনা আবশ্যক হইয়াছে। ১২৭৯ সনে রামগতি ন্যায়রত্ন চণ্ডীদাসকে বাংলা সাহিত্যের আদ্যকালে এবং কৃত্তিবাসকে মধ্যকালে স্থাপন করিয়াছিলেন—ত্রিপাদ-শতাব্দীর প্রচুর গবেষণা ও আলোচনার পরও আজ পর্য্যন্ত তাহাই বহুল পরিমাণে শিক্ষিত সমাজে সংস্কারবদ্ধ হইয়া আছে। এ বিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে কতিপয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি ও যথোচিত আলোচনা আহ্বান করিতেছি।

১

চণ্ডীদাসের কালনির্ণয় দুইটিমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করে—"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথির লিপিকাল এবং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্নলিপিতত্ত্বের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া কতিপয় কালনির্দ্দেশযুক্ত পুথির অক্ষরলিপির সহিত তুলনাপূর্ব্বক "স্থির সিদ্ধান্ত" করেন যে, পুথিটি "১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল" (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ১ম সং, ১৩২৩, মুখবন্ধ, পৃ. ৷৵০)। এই লিপিকাল নির্ণয় সর্ব্বসম্মত না হইলেও বহুল প্রচারলাভ করিয়াছে। শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় স্বয়ং ইহা অনুসরণ করিয়া চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল "খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধে" ধরিয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ২৮)। পুথির এই লিপিকালনির্ণয় সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রত্নলিপিতত্ত্বের প্রমাণ দ্বারা কিম্বা গ্রন্থের ভাষা বিচার দ্বারা কোন পুথিরই লিপিকাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে সঙ্কীর্ণ অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে স্থাপন করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা এবং সংস্কৃত পুথির লেখকদের মধ্যে একটা প্রভেদ সাধারণতঃ উপলব্ধি করা যায়—উভয়ের লিপির তুলনা বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, "শূদ্রপদ্ধতি"র লিপিকাল সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন—ইহা ১৪৪২ "সম্বৎ" (অর্থাৎ ১৩৮৫-৬ খ্রীঃ) নহে, পরন্তু ১৪৪২ "শকাব্দ"। কালনির্দ্দেশ স্থলে "সং ১৪৪২" অঙ্কসংখ্যার পর শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া "শাকে" লিখিত হইয়াছে এবং ১৪৪২ শকাব্দের পৌষ মাস কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি শনিবার বস্তুতই ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পড়িয়াছিল বলিয়া গণনা দ্বারা পাওয়া যায়। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থির সিদ্ধান্ত সংশোধন করিয়া তাঁহার যুক্তিবলেই লিপিকাল হয় ১৪৩৬-৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে (অর্থাৎ বোধিচর্য্যাবতার পুথির পূর্ব্বে) মাত্র। বস্তুতঃ এস্থলে তাঁহার যুক্তিও মোটেই বিচারসহ নহে। তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিটির "অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক" (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৷০)। পুথিটির যে সকল অক্ষর তিনি "প্রাচীন" আকারের বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহাদের ঐরূপ আকার বহুতর আধুনিক পুথিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাহাদের প্রাচীনতা প্রমাণসিদ্ধ হয় না। যথা—

(১) প্রাচীন আকারের "উ" এবং "ঊ"তে মাত্রার উপরে বক্রগতি উর্দ্ধরেখা নাই (পৃ. ৷০)। চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর গ্রন্থালয়ে তাড়ীপত্রে লিখিত একটি হরিবংশের শেষ দুই পত্র আছে; লিপিকালাদির পাঠ এই—"শুভমস্তু শকাব্দাঃ ॥ ১৪৪৫ ॥ কেনাপি হরিচরণসরোজমধুমত্তমধুকরেণ শ্রীহরিহরপণ্ডিতেন লিখিতং ॥" এই পুথিতেও উকারের উর্দ্ধরেখা নাই ("উপায়েন" বধঃ কালযবনস্য প্রকীর্ত্তিতঃ)। ১৪৪৫ শকে ১৫২৩-৪ খ্রীঃ হয়।

(২) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির খ, ঘ, থ ও য প্রাচীন আকারের—ইহাদের নিম্নভাগে কোণ নাই। কিন্তু আমাদের নিকট রক্ষিত ১৬০১ শকাব্দের (১৬৭৯ খ্রীঃ) একটি তন্ত্রসারের পুথির বহুস্থলে এই তথাকথিত প্রাচীন আকারের ঘ ও য দৃষ্ট হয়।

(৩) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের তথাকথিত প্রাচীন আকারের চ ও জ উল্লিখিত হরিবংশের পুথিতে এবং অপরাপর বহু পরবর্ত্তী পুথিতেও দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিতে দৃশ্যমান বর্ণমালার আকার সমস্তই ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর কোন না কোন পুথিতে পাওয়া যায় এবং ইহা স্থির সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করা যায় যে, পুথিটির লিপিকাল খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, ১৬শ শতাব্দীও হইতে পারে। সুতরাং তদ্দ্বারা চণ্ডীদাসের কাল নির্ণয় হয় না।

চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে তাহাই চণ্ডীদাসের কালনির্ণয়ের একমাত্র সূত্র বলা যায়। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদ্যাপতির গ্রন্থ-রচনাকাল ১৩৯৫-১৪৪০ খ্রীঃ মধ্যে নির্ণয় করিয়াছিলেন (J. A. S. B., 1915, p. 392)। বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে ভৈরবসিংহের নাম আছে এবং পক্ষধর মিশ্রের সহিত তাঁহার সম্বাদপ্রসঙ্গ উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং প্রায় ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার স্বর্গারোহণ-কাল ধরিয়া তাঁহার আনুমানিক জন্মকালের উর্দ্ধতন সীমা ১৩৭০

সনে স্থাপন করা যায়। তাঁহার সাহিত্য-রচনা ১৪শ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্ব্বে ঘটে নাই এবং চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ১৫শ শতাব্দীর প্রথম দশকে কিম্বা পরে ঘটিয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বে নহে। এতদনুসারে চণ্ডীদাসেরও জন্মকাল ১৩৭০ সনে অনুমান করা যায়।

সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন চণ্ডীদাসকে "স্বচ্ছন্দে" শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ধরিয়া অনুসন্ধানলব্ধ কতিপয় অনতিপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার অভেদ কল্পনা করিয়াছেন (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ, ১৬৭-৬৯)। চণ্ডীদাসকে অকারণ আধুনিক প্রতিপন্ন করার এই চেষ্টা আমাদিগকে অতিমাত্রায় বিস্মিত করিয়াছে। "শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত-দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি"র উল্লেখ সনাতনের বৃহত্তোষণীতে (১০।৩৩।২৬ শ্লোকের টীকায়) দৃষ্ট হয়, জীবের লঘুতোষণীতে নহে। সনাতন নিঃসন্দেহ শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন—তাঁহার কোন গ্রন্থেই চৈতন্যসম্প্রদায়ের বহির্ভূত কোন সমসাময়িক গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম নাই এবং থাকার সম্ভাবনাও নাই। চণ্ডীদাস চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ঘুণাক্ষরেও এরূপ কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। সনাতন কর্তৃক জয়দেবের সঙ্গে চণ্ডীদাসের সসম্মান নামোল্লেখ হইতে (শ্রীচণ্ডীদাসাদির "আদি" পদটি লক্ষণীয়) চণ্ডীদাসের গ্রন্থরচনাকাল অধস্তন পক্ষে প্রায় ১৪৫০ খ্রীঃ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত। ভাবচন্দ্রিকাকার চণ্ডীদাসকে শ্রীযুত বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় (১ম সং, পৃ. ১৪) পৃথক্ ধরিয়াছেন। ভাব চন্দ্রিকা গ্রন্থ অধুনা অপ্রাপ্য, গ্রন্থটি না দেখিয়া শুধু পুথি-বিবরণী (L. 2131) দেখিয়া গ্রন্থকারকে "ষোড়শ শতকের প্রথম অংশে" (পৃ. ১৬৭) স্থাপন করা অযৌক্তিক। আর, কাব্যপ্রকাশের 'দীপিকা'-কার চণ্ডিদাসকে ভাবচন্দ্রিকাকারের সহিত, কিম্বা গণমার্ত্তণ্ডকার নৃসিংহের পূর্ব্বপুরুষের সহিত অভিন্ন কল্পনা করার প্রশ্নমাত্রও ভ্রমাত্মক। চণ্ডিদাসের দীপিকা কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় অংশতঃ মুদ্রিত হইয়াছে; এই চণ্ডিদাস সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের খুল্লপিতামহ এবং নিঃসন্দেহ খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর লোক।

বর্দ্ধমান, কেতুগ্রাম নিবাসী গণমার্ত্তণ্ডকার নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন উর্দ্ধতন ১১ পুরুষের নামমালা ও কুলক্রিয়ার বিবরণ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—(I. O., 1, p.226), বাঙ্গালী গ্রন্থকারসমাজে ইহা এক অপূর্ব্ব বস্তু। ডঃ সেন ইহা সংক্ষেপে লতাকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১৬৮)। দুঃখের বিষয়, রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীর প্রতি শিক্ষিতজন-সুলভ বিজাতীয় বিদ্বেষ ডঃ সেনের চিত্তকেও অভিভূত করায়, এস্থলে তাঁহার পণ্ডশ্রম হইয়াছে—নৃসিংহের আসল কুলপরিচয়ই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে। নৃসিংহের উর্দ্ধতন দশম পুরুষ চণ্ডিদাস* ছিলেন অশ্বপতির পুত্র এবং এই অশ্বপতি ছিলেন মুখ-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ মুরারি ওঝার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভৈরবের পুত্র। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী হইতে ভৈরবের কারিকাংশ (প্রাচীন পুথির বিশুদ্ধ পাঠ দৃষ্টে) উদ্ধৃত হইল (নগেন্দ্রনাথ বসুর সং, পৃ. ৬৫):—

গজপত্যশ্বপতী চ হেরম্বো বামনস্তথা।
ভৈরবস্যাত্মজা এতে তেষশ্বপতিকঃ কৃতী॥

অর্থাৎ ভৈরবের ৪ পুত্রের মধ্যে অশ্বপতিই কুলাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ভৈরব কবি কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন, আত্মবিবরণীতে কৃত্তিবাস গজপতির কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছেন:—

ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারানসি পজ্যন্ত কিত্তি ঘুসএ সংসার॥

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত একটি বিরাট কুলপঞ্জীতে (২১০২ সং পুথি) গজপতির ধারা বিবৃত হইয়াছে; নিম্নে গজপতির কুলবিবরণ অংশতঃ উদ্ধৃত হইল—(৪২৭।১ পত্রে) "গজপতিমহামণ্ডলস্য আর্ত্তি···বিসম্বাদসময়ে প্রতিপত্তিহানি ঘোং রত্নাকর নগাঞ্যা হানিঃ···তৎসুতা···।" মহামণ্ডল উপাধি দ্বারা তাঁহার বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা সম্যক্ সূচিত হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় কুলক্রিয়ায় তাঁহার "হানি" ঘটিয়াছিল। কৃত্তিবাসের ভ্রাতৃসম্পর্কিত এই গজপতি ও অশ্বপতি কৃত্তিবাস অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ মুরারি ওঝার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন ভৈরব এবং কৃত্তিবাস-পিতা বনমালী ছিলেন পঞ্চম পুত্র। সুতরাং অশ্বপতির পুত্র চণ্ডিদাস কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। উক্ত কুলপঞ্জী হইতে অশ্বপতির ধারার নামমালা মাত্র (কুলক্রিয়াংশ বাদ দিয়া) উদ্ধৃত হইল নৃসিংহের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখিলে কুলপঞ্জীর প্রামাণ্যবিষয়ে সকলের সংশয় দূর হওয়া উচিত।

অশ্বপতি—সঙ্গীদাস চণ্ডীদাসনামা—(গরুড়শ্রীনাথ)গোপীনাথ মহানন্দকাঃ)—মাধব(বিদ্যানন্দ-সানন্দ অনন্তকাঃ)—নয়ন(ভুবনভোলাইকাঃ)—(সদানন্দ) কুমুদানন্দ (যাদবানন্দাঃ)—শ্রীহরিবাচস্পতি(গঙ্গাহরিকৌ)—শ্যামচরণ বিদ্যাবাগীশ (রামচরণৌ)—গোপালসার্ব্বভৌম (কৃষ্ণরামপ্রাণকৃষ্ণাঃ)—কুশলতর্কভূষণ (সুবলরামনাথাঃ) - নৃসিংহতর্কপঞ্চানন—রমাকান্ততর্কসিদ্ধান্তশ্রীকান্তৌ॥ কেতুগ্রামনিবাসী (৪২৭।২ পত্র)। এস্থলে কুলপঞ্জীতে কেবল কতিপয় ভ্রাতৃনাম বাদ গিয়াছে মাত্র এবং কুলক্রিয়াংশের বিবরণে নৃসিংহের উক্তির সহিত

* কালিদাসের ন্যায় চণ্ডিদাস সংজ্ঞাপদ বলিয়া হ্রস্ব-ইকারযুক্ত, ছন্দের খাতিরে নহে—কাব্যপ্রকাশদীপিকাকারও হ্রস্ব-ইকারই লিখিয়াছেন।

যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। বুঝা যায় গণমার্ত্তণ্ড হইতে এই নামমালা গৃহীত হয় নাই। তথাপি ঘটকদের নিজস্ব উপকরণ হইতে যে নামমালা উদ্ধৃত হইয়াছে নৃসিংহের উক্তির সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল আছে এবং একটি মূল্যবান্ অতিরিক্ত তথ্য আছে যে, চণ্ডীদাসের নামান্তর ছিল ষষ্ঠীদাস।

সময়ের হিসাবে বাধা না থাকিলেও এই চণ্ডীদাসকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারের সহিত অভিন্ন কল্পনা করার বিন্দুমাত্রও হেতু বিদ্যমান নাই। বড়ু চণ্ডীদাস বিশ্রুতকীর্ত্তি, ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় কবি কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, অথচ ৫০০ বৎসর-মধ্যে একথা ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিল না, ইহা কল্পনার অতীত। অশ্বপতি এবং সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র চণ্ডীদাসও ফুলিয়ানিবাসীই ছিলেন, নিশ্চিতই নান্নুরনিবাসী ছিলেন না। বিদ্যাবিতরণে সুরদ্রুমসদৃশ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ভট্টাচার্য্যশিরোমণি এই চণ্ডিদাসের প্রশস্তিশ্লোকে তাঁহার একটি মাত্র "কৃতি"র (অর্থাৎ গ্রন্থের) উল্লেখ আছে—"অলঙ্কারটীকা"। এস্থলে নৃসিংহ সম্ভবতঃ কাব্যপ্রকাশদীপিকাকারের সহিত নিজ পূর্ব্বপুরুষের ভ্রান্তিমূলক অভেদ কল্পনা করিয়াছেন, কিম্বা বস্তুতই চণ্ডিদাসরচিত অপর একটি অলঙ্কারটীকা ছিল। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কুলপঞ্জীর প্রমাণবলে "বড়ু" নামে নিকৃষ্টজাতীয় এক ব্রাহ্মণশ্রেণী বিদ্যমান ছিল—বড়ু চণ্ডীদাসও ঐ জাতীয় ছিলেন, রাঢ়ীয় প্রভৃতি উচ্চজাতীয় ছিলেন না, মনে করাই যুক্তিযুক্ত। প্রমাণটি উদ্ধৃত হইল:—বন্দ্যঘটীয় বাবলাবংশে নরাইজ বিপ্রদাস ৯৭ সমীকরণের কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ ১২৪ পৃ.)। তাঁহার অন্যতম পুত্র বিদ্যানন্দ—তৎপুত্র জগন্নাথের কুলবিবরণে আছে, "অস্য কন্যা রাজা নিধিচন্দ্রেন নীতা তেন সর্ব্বনাশঃ" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৮১৫খ পুথির ২।২ পত্র, অস্মদীয় জয়ন্তীপুরের পুথির ৩৩৭।১ পত্র)। এস্থলে পরিষদের পূর্ব্বোদ্ধৃত পুথিতে (২১০২ সং, ৩।২ পত্র) অতিরিক্ত বিবৃতি আছে। যথা, "পশ্চাৎ কন্যা শুঙ্গোমুখোটী রাজনিধিচন্দ্রে নীতা সা কন্যা "বড়ুশ্রোত্রিয়" × × × (অক্ষর অস্পষ্ট) পণ্ডীতে নীতা সর্ব্বনাশঃ মোড়শ্বরবাসী…।" রাজা নিধিচন্দ্র মলুটি-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ এবং প্রায় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।*

২

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে গবেষণা শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অতি কৌতুকজনক ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। আন্দুলরাজসংগৃহীত "কায়স্থকৌস্তুভ" গ্রন্থের প্রথম সংখ্যায় (প্রকাশকাল ৩ শ্রাবণ, ১২৫১) লিখিত হইল, "কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়কায়স্থ ছিলেন" (৶০ পৃ.)। পরবর্ত্তী ৫ ভাদ্রের "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" কৃত্তিবাসের ওঝা উপাধির প্রশ্ন উত্থিত হইলে ২৭ ভাদ্রের "পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" উত্তর লিখিত হইল যে, ওঝা "৬ষ" কায়স্থ, যাহাদের সমাজ ছিল 'ফুলে খড়দহ'—প্রমাণস্বরূপ জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লীক-রচিত 'রাজতরঙ্গ' ও 'কায়স্থহিতার্ণব' গ্রন্থের নাম লিখিত হইল (পৃ. ৯)। অতঃপর হরিশ্চন্দ্র মিত্র 'কবিকলাপ' গ্রন্থে এবং তদ্দৃষ্টে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিতে' (খ্রী: ১৮৬৯, পৃ. ২৫) লিখিলেন, "বিষবৈদ্য ও ভূতপ্রেতাদির মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে ওঝা কহে; বোধ হয়, মুরারি একজন বিখ্যাত ওঝা ছিলেন" ইত্যাদি। পরে হরিশ্চন্দ্র মিত্র স্বয়ং এই নিতান্ত 'ভ্রমাত্মক' ব্যাখ্যা সংশোধন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম গায়ক-সম্প্রদায়ের নিকট জানিয়া কৃত্তিবাসের পরিচয়সূচক কবিতা প্রকাশ করেন:—

মুরারি নামেতে ওঝা ছিলেন কাশীবাসী।
করিলেন বসবাস ফুলিয়াতে আসি।
হইলেন তাহার পুত্র বনমালী নাম।
রামভক্ত অনুরক্ত নানা গুণধাম।
বাপ বনমালী ওঝা মাণিকি উদরে।
কৃত্তিবাস জন্মিলেন চারি সহোদরে।
কৃত্তিবাস শ্রীনিবাস অদ্বৈত ভাস্কর।
সবে সুপণ্ডিত অতি নানা গুণধর। ইত্যাদি

(৺কৃত্তিবাসের পরিচয় সংগ্রহ, ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭, পৃ. ৬ এবং মিত্রপ্রকাশ)।*

কবিচরিতে (পৃ. ২৮) কৃত্তিবাস আকবরের সময়ে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে (১ম সং, পৃ. ৭৫) অনুমান "১৪৬০ শকে [১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে] রামায়ণের রচনা হয়", অর্থাৎ মুকুন্দরামের চণ্ডীরচনার ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে। এই মতই রাজনারায়ণ বসু (পৃ. ১৫) গ্রহণ করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩০০ সনে সর্ব্বপ্রথম রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী হইতে কৃত্তিবাসের বংশ উদ্ধার করিয়া ১৪১০ হইতে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাবকাল স্থির করেন (বিশ্বকোষ, ১ম সং, ৪র্থ ভাগ, পৃ. ৩৩৬ ও ৪০২); পরে, বঙ্গবাসী ও জন্মভূমি (চৈত্র ১৩০১) পত্রিকায় অনুরূপ আলোচনা

* ৺ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত "মলুটি-রাজবংশ" গ্রন্থে (১৩২৮) লিখিত হইয়াছে, (পৃ ১৯-২০) বংশের "কয়েক পুরুষ উত্তরাধিকারীর নাম" পাওয়া যায় না। অথচ আমরা একাধিক কুলপঞ্জীতে সম্পূর্ণ বংশাবলী পাইয়াছি। প্রথমাংশ যথা, মুখ আহিতের অধস্তন ১১শ পুরুষ ভবানন্দ খাঁ—রাজা বসন্ত—রাম সাহা—রাজা নিধিচন্দ্র—রাজা উদয়চন্দ্র (ও রাজা রাম রায়)—রাজা জয়চন্দ্র ও বেণীচন্দ্র রাজা বসন্তের পৃষ্ঠপোষক দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দিন নহে, পরন্তু বাংলার আলাউদ্দিন হসেন সাহ।

* হরিশ্চন্দ্রের কৃত্তিবাস পুস্তিকার শেষে তদ্রচিত "বঙ্গভাষা এবং বঙ্গীয় সাহিত্যবিবরণ" গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় ("১ম খণ্ড সঙ্কলিত হইতেছে")। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল মনে হয় না।

হয়। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থের ১ম সংস্করণেই (ডঃ ভট্টশালী ২য় সং লিখিয়া ভুল করিয়াছেন) কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী মুদ্রিত করেন (পৃ. ৬৭-৭১) এবং কৃত্তিবাসের কাব্যরচনার কাল ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে (অর্থাৎ রাজা গণেশের রাজত্বকালে) নির্ণয় করিয়াছিলেন (পৃ. ১২৮)। অতঃপর "কৃত্তিবাস পণ্ডিত" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে (সা-প-প, ১৩০৪, পৃ. ১১৭-৪২) কুল-শাস্ত্রের প্রামাণ্যবাদী প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তর আলোচনা করিয়া আনুমানিক ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্মকাল গণনা করেন (পৃ. ১৩৪)। তাঁহার প্রবন্ধের পরিশিষ্টে (পৃ. ১৪২-৪৯) আত্মবিবরণীটি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং নগেন্দ্রনাথ বসু মন্তব্যে (পৃ. ১৫০-৫৭) কৃত্তিবাসকে ১৪০৮ হইতে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের লোক বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রফুল্ল-চন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম ধ্রুবানন্দের মহাবংশ হইতে মূল কুলকারিকা উদ্ধৃত করিয়া (পৃ. ১২৫) কৃত্তিবাস ও তাঁহার ভাইদের নাম মুদ্রিত করেন এবং আত্মবিবরণীর অনেক কথাই যে কুলগ্রন্থের সহিত মিলিতেছে তাহা লক্ষ্য করেন (পৃ.১৪৯)।

কৃত্তিবাস প্রভৃতির ওঝা উপাধি হইতে তাঁহার উপর মৈথিলদের দাবি হইতে পারে, আমাদের এইরূপ ধারণা ছিল—সম্প্রতি তাহা ফলিয়াছে। এডুকেশন গেজেটে (২৩ বৈশাখ, ১৩৫৬, পৃ, ৯-১৬) শ্রীকমলাকান্ত পাঠক পরাশর-গোত্র এক মৈথিল কৃত্তিবাস ওঝার সন্ধান দিয়াছেন, বর্ত্তমান বংশধরের ঊর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ, বাড়ী জেলা বীরভূম। এই কৃত্তিবাসেরও পিতা বনমালী এবং পিতামহ মুরারি। এই কৃত্তিবাসই বংশধরদের ও লেখকের মতে রামায়ণকার—এবং রাঢ়ের ফুলিয়ানগর হইল বীরভূমের অট্টহাসস্থিত শ্রীশ্রী৺ফুল্লরা মহাপীঠ। রামায়ণকার দুইজন কৃত্তিবাসের অন্যতরও ইনি হইতে পারেন বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। নানা স্থানের বিভিন্ন কালের বহু লেখক পুথিতে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা "মুখটি-বংশ" লিখিয়াছেন এবং ফুলিয়ানগরীর "দক্ষিণ-পশ্চিম চেপ্যা বহে গঙ্গা সুরেশ্বরী" বর্ণনাটি মিথ্যা স্বীকার করিলে রাঢ়ের অগঙ্গা দেশে কৃত্তিবাসকে টানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু এক পুরুষের গড়পড়তা ৪০ বৎসর ধরিয়াও মৈথিল কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ ১৩৬০ খ্রীষ্ট সনের পূর্ব্বে হয় না।

কৃত্তিবাসের অভ্যুদয়কাল যাঁহাদের মতে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি, তাঁহারা সকলেই—নগেন বসু-দীনেশ সেন-প্রফুল্লচন্দ্র-ভট্টশালী—কুলশাস্ত্রের উপকরণ সাদরে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিতর্ক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বিচার করা ত দূরের কথা, যে ভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষকও কুলশাস্ত্রের প্রতি জাজ্জ্বল্যমান অনাদর এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাহা প্রযত্নপূর্ব্বক সমস্তই গোপন করিয়া গিয়াছেন (ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থে, ২য় সং, পৃ. ৮৫-১০৬, কুত্রাপি পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধনিচয়ের উল্লেখ নাই), মনে হয়, সকল দিক সম্যক্ বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তনির্ণয় এই শ্রেণীর লেখকের কাম্য নহে—একদেশদর্শী হইয়া ভ্রমপ্রমাদ জীয়াইয়া রাখা এবং সৃষ্টি করাই যেন ইঁহাদের কাম্য। ৮ বৎসর পূর্ব্বে "কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়" প্রবন্ধে (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ১০৫-২০) কুলশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বসমূহ সাধ্যমত বিচার করিয়া আমরা দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, নরসিংহ ওঝাকে দনুজমর্দ্দনের সভায় ১৪১৮ সনে টানিয়া আনা "একেবারেই অসম্ভব" (পৃ. ১১৪)। ডঃ সেনের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এখনও হইল এই যে, নরসিংহের পৃষ্ঠপোষক "দনুজমর্দ্দন ছাড়া আর কেহ নহেন" (পৃ. ৯৭)! আমাদের যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি না করিয়াও (পূর্ব্বপ্রবন্ধে দ্রষ্টব্য) এ স্থলে ডঃ সেনের মারাত্মক ভ্রম স্বল্পপাঠী বালকেরও বোধগম্য হইবে। দনুজ-মর্দ্দন ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, ডঃ সেনের মতে নরসিংহ তখন 'বয়স্ক' এবং তৎপুত্র গর্ভেশ্বরের বয়স খুব বেশী হইলে ৪৮ ধরা যায়। তাহা হইলে গর্ভেশ্বরের জন্ম হয় ১৩৭০ সনে (তৎপূর্ব্বে নহে), তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুরারির ১৩৯৫ সনে (একপুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া), মুরারির পঞ্চম পুত্র বনমালীর ১৪৩০ সনে এবং কৃত্তিবাসের জন্মের ঊর্দ্ধতন সীমা হয় ১৪৫৫ সন। যুক্তিযুক্ত গণনায় আরও অনেক পরে, ১৪৭৫-১৫০০ সনের মধ্যে, পড়িবে। কারণ, আমরা একাধিকবার দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গলার শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারে কস্মিন্ কালেও ২৫ বৎসরে এক পুরুষ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ৩০-৪০ বৎসরে (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ১১৪, প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৯, পৃ. ২৩৬-৪৩ ; ঐ, ভাদ্র ১৩৫৪, পৃ. ৫০৭ প্রভৃতি)। সুতরাং "বয়সে সনাতন-রূপ কৃত্তিবাসের এক পুরুষ পরের লোক" (ডঃ সেন, পৃ. ৯৮) না হইয়া এক পুরুষ পূর্ব্বের হইয়া পড়েন। ঊর্দ্ধদিকের গণনায় ডঃ সেনের ভ্রম আরও অনেক মারাত্মক। নরসিংহ ওঝা হইলেন লক্ষ্মণসেনের অভিষেককালীন প্রথম সমীকরণের প্রথম কুলীন আহিতের প্রপৌত্র—লক্ষ্মণসেনের অভিষেক ১১৭৮ সনে ধরিয়া তৎকালে আহিতের বয়স ন্যূনপক্ষে ২৮ ধরিলেও তাঁহার জন্ম হয় ১১৫০ সনে, কিছুতেই তার পরে নহে। আর, দনুজমর্দ্দনের সময়ে নরসিংহের বয়স যদি চূড়ান্তভাবে ১০০ বৎসরও ধরা যায়, তাহা হইলেও এক পুরুষের গড়-পড়তা হয় ৫৬ বৎসর! পারিবারিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইহা এক অভাবনীয় ঘটনা—৪ পুরুষে প্রায় ৩০০ বৎসর! অথচ যাহাদের মতে ৪ পুরুষে এক শতাব্দী মাত্র হয়, তাহাদের সাবধান লেখনাগ্র হইতে ইহা বাহির হইতে পারিল।

কুলশাস্ত্রের গহন বন হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বহু নূতন তথ্য প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিয়াছি (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, পৃ. ৫৩৬-৩৯)। কৃত্তিবাসের পাণ্ডিত্যের উপাধি "পণ্ডিত", তাঁহার মাতামহের পরিচয়, তাঁহার বিবাহ, বংশধারা ও ৪ কন্যার পরিচয় ঐ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। দুইটি তথ্যের প্রমাণ-বলে তাঁহার জন্মাব্দ আমরা ঐ প্রবন্ধে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে (১৩৫০-৭৫ খ্রীঃ মধ্যে) নির্ণয় করিয়াছি। তন্মধ্যে একটি তথ্য আবশ্যকবোধে পুনরালোচিত হইল। "কাঞ্চিবিল্লীয়-রাজপণ্ডিত" কুবের রচিত ভাস্বতীব্যাখ্যার রচনাকাল ১২২৯ শকাব্দ (১৩০৭-৮ খ্রীঃ Indian Culture, XI, pp. 33-36 দ্রষ্টব্য)। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে (পরিষদের ২১০২ সং পুথির ৫৪।১ পত্র) এই "কাং কুবের রাজ-পণ্ডিতে"র নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, বন্দ্যঘটীয় 'বৃহদ্বজপাশ' বংশীয় উৎসাহ-পুত্র বাসুর কুলবিবরণে। এই বাসু প্রথম কুলীন মহেশ্বরের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং কুবেরও প্রথম কুলীন কৃষ্ণের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বলিয়া অনুমিত। কুবেরের জন্ম ১২৭৫ সনে ধরিয়া এবং তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া প্রথম কুলীন কৃষ্ণ-মহেশ্বরের জন্ম হয় অনুমান ১১১০ সনে—অর্থাৎ প্রৌঢ়বয়সে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-৭০+) প্রথম কুলীনদের মধ্যে ইহাদের অন্তর্ভুক্তি সময়ের হিসাবে সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিল। কুবেরের গ্রন্থরচনাকাল (১৩০৭-৮ খ্রীঃ) সুতরাং সমগ্র কুলশাস্ত্রের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি যোগাইতেছে। কুবেরের পিতা রবি ২৩ সমীকরণে এবং বাসুর পিতা উৎসাহ ২০ সমীকরণে সম্মানিত হইয়াছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ২১ সমীকরণে সম্মানিত (মুরারি ওঝার পিতা) গর্ভেশ্বর ইহাদের সমসাময়িক হইতেছেন এবং কুবের-বাসু-মুরারিও সমসাময়িক প্রতিপন্ন হন। অর্থাৎ মুরারি ওঝার জন্মও ১২৭৫ সনে অনুমান করা যায়, বরং কিছু পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব, কারণ বাসু ছিলেন তাঁহার পিতার অষ্টম পুত্র, মুরারি জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও দুই সমীকরণ পরবর্ত্তী। কৃত্তিবাসের জন্মকালে মুরারি জীবিত ছিলেন, বয়স ১০০ ধরিলেও তাঁহার পৌত্রের জন্ম ১৩৭৫ সনের পরে হইতে পারে না। মুরারির পিতামহ নরসিংহ যে নিঃসন্দেহ দনুজমাধবেরই পাত্র ছিলেন তাহার অভিনব প্রমাণরূপে ইহা গ্রহণীয়।

উল্লিখিত কুবেরের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ "বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য" সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণির সহাধ্যায়ী এবং যশোহর-মল্লীকপুরের 'দোহাকরা' ভট্টাচার্য্যবংশের আদি-পুরুষ ছিলেন ; নামমালা যথা, কুবের—শক্রঘ্ন পণ্ডিত—নীলকণ্ঠ পণ্ডিত—বিজয় পণ্ডিত—ধরাধর পণ্ডিত—বিষ্ণুদাস (পরিষদের উক্ত পুথি ৩১৮।১ পত্র)। শিরোমণির জন্মাব্দ অনুমান ১৪৬০-৬৫ সন (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১৩-১৫), সুতরাং তাঁহার প্রপিতামহ-স্থানীয় কৃত্তিবাসের জন্ম হয় ১৩৬০-৬৫ সনে।

কুলগ্রন্থে কৃত্তিবাসের কালসূচক এ জাতীয় তথ্য অনেক আবিষ্কার করা যায়—পূর্ব্বপ্রবন্ধে একটির বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। এ স্থলে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অপর একটি মূল্যবান তথ্য বিবৃত হইল। মুরারি ওঝা ৩৩ সমীকরণের কুলীন ছিলেন এবং ঐ সমীকরণের প্রথম কুলীন ছিলেন মুখ-বিকর্ত্তনবংশীয় গোবিন্দ (মহাবংশ, পৃ. ৩৮-৯)। এই গোবিন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত চৈতন্যপার্ষদ "স্বরূপগোস্বামী" : বংশাবলী যথা, গোবিন্দ—পৃথ্বীধর—গজাপতি—জিতামিত্র—প্রমোদন ন্যায়াচার্য—পুরুষোত্তমাচার্য্য "সন্ন্যাসী" নামান্তর স্বরূপগোস্বামী (পরিষদের ১৮১৫খ সং পুথির ৩৬৬।১ পত্র, ২১০২ সং পুথির ৪৬০।২ পত্র)। স্বরূপগোস্বামীর কুলপরিচয় এই প্রথম আবিষ্কৃত হইল—সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তিনি গৃহী ছিলেন এবং তাঁহার এক পুত্রের নাম লিখিত আছে "বিপ্রদাস" (ঐ, ৩৬৬।২ পত্র)। এ স্থলেও কৃত্তিবাস স্বরূপগোস্বামীর প্রপিতামহ-স্থানীয় হইতেছেন এবং তিনি যে সনাতন-রূপের সমসাময়িক ছিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাদের ১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এ কথা বেশ জোর করিয়াই প্রমাণপরতন্ত্র পণ্ডিতসমাজে বলা যায়। সভ্যসমাজের সর্ব্বত্র ব্যক্তিবিশেষের কালনির্ণয়াদি প্রধানতঃ পারিবারিক ইতিহাস দেখিয়া আলোচিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলার সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের সমৃদ্ধ বিবরণ হস্তলিখিত মূল কুলগ্রন্থে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। তাহা স্বেচ্ছায় পদদলিত করিয়া যে কেহ গবেষণা করিবেন ভ্রমপ্রমাদের গর্ত্তে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃত্রিম রচনাপূর্ণ ভ্রমপ্রমাদবহুল মুদ্রিত কুলগ্রন্থসমূহ আমাদের লক্ষ্যস্থল নহে।

উল্লিখিত আলোচনার ফলে কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে নির্ণীত হওয়ার পর "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস" পঙ্‌ক্তিটির প্রকৃষ্ট উপযোগিতা ধরা পড়ে। কারণ গণনাদ্বারা পাওয়া যায় ঐ পাদে মাত্র তিন বৎসরে ঐ সংযোগ সংঘটিত হইয়াছিল—১৩৫২, ১৩৭২ ও ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। মুরারির জন্ম যখন ১২৭৫ সনের পরে নহে, পূর্ব্বে হওয়ারই সম্ভাবনা, তখন কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩৫২ সনে হওয়াই অধিক সম্ভব—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দ্ধারিত ১৩৩৫ সন তাহা হইতে বেশী দূরবর্ত্তী নহে। এতদনুসারে কৃত্তিবাস নিঃসন্দেহ চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন এবং ১৩৭২-৫ সনে জন্ম ধরিলেও তিনি বড়জোর চণ্ডীদাসের

ঠিক সমসাময়িক হন, পরবর্ত্তী নহেন। সুতরাং বাঙলার আদিকবির আসনে, আমরা 'বড়ু শ্রোত্রিয়' চণ্ডীদাসের পরিবর্ত্তে ফুলিয়ার মুখুটিবংশীয় ... তাঁর বরপুত্র "পণ্ডিত" উপাধিধারী কৃত্তিবাসকেই বসাইতে চাই। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক "রাজা গৌড়েশ্বর", তাঁহার পিতৃব্য নিশাপতির পৃষ্ঠপোষক "রাজা গৌড়েশ্বর," কিম্বা রাজপণ্ডিত কুবেরের পোষ্টা কে ছিলেন সে সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার না হইলে অনন্তকাল বাদবিতণ্ডা চলিতে পারে। কৃত্তিবাস দনুজ-মর্দ্দনের সময়ে জীবিত ছিলেন কোন সন্দেহ নাই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীনতম পুথিতে (১৫০২ শকে অনুলিখিত) পুষ্পিকায় একটি বিশেষণপদ আছে যাহার উপর কাহারও দৃষ্টি এ যাবৎ পতিত হয় নাই—"ইতি 'শ্রীবৎসপণ্ডিত' শ্রীকির্ত্তিবাসবিরচিতং।" শ্রীবৎসপণ্ডিত পদটির ব্যাখ্যা আমাদের মতে এই। পাঠসমাপ্তির পর কৃত্তিবাসের উপাধি হইয়াছিল "পণ্ডিত", সাধারণতঃ কোন রাজা বা রাজপুরুষের সভায় সসম্মানে এইরূপ উপাধি প্রদত্ত হইত। কৃত্তিবাস যাঁহার সভায় উপাধি পাইয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল "শ্রীবৎস।" এইরূপ প্রথার আর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। সুবিখ্যাত রায়মুকুট (যাহার পদচন্দ্রিকাটীকা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়) সর্ব্বপ্রথম "রাজ্যধর" নামক জল্লালদীননৃপতির মন্ত্রীর নিকট "আচার্য্য" ও "কবিচক্রবর্ত্তী" উপাধিদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—রায়-মুকুটের কোন কোন টীকার পুষ্পিকায় "রাজ্যধরাচার্য্য" পদ দৃষ্ট হয় (I. H. Q, XVII, pp. 457-8)। আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের এইরূপ সংযুক্ত নাম—শ্রীবৎসপণ্ডিত ও রাজ্য-ধরাচার্য্য—দুর্ল্লভ হইলেও মনোহর ও সুরুচির পরিচায়ক।

ব্রিটিশের বিচার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিচারনিষ্ঠ বলিয়া বড়াই
করেন ব্রিটিশ জাতি,
কতটুকু তাতে সুখ্যাতি—আর
কতখানি অখ্যাতি।
যীশুকে যাহারা দিয়াছিল ক্রুশে,
বিচার করায়ে,—বিচারক পুষে,
মোরা দেখি সব শ্বেতাঙ্গ জাতি
আজিও তাদেরি জ্ঞাতি।
পুণ্যপ্রতিমা 'জোয়ান ডি আর্ক'
ফরাসী বীরাঙ্গনা,
বিচার করিয়া কাহারা করেছে
তাঁর শত লাঞ্ছনা?
যে বিচার এক পাপ-প্রহসন,
শুনি কলুষিত হয় দেহমন,
বীভৎস সেই জঘন্যতার
করিব না আলোচনা।

'নন্দকুমারে' ফাঁসি দিল যারা
তাদেরো বিবেক আছে?
ওকে যদি বল ন্যায়!—অন্যায়—
স্পৃহনীয় ওর কাছে।
ওকি কদর্য্য বিচারের রূপ!
হীন কুৎসিত বিষ বিদ্রূপ,—
ও বিচারে মরে দেবতা মানুষ
অসুরই কেবল বাঁচে।
কি পেলে জাপান, ওই জার্ম্মানী
পরাজিত অবনত?
বিচার যা তাহা—প্রতিহিংসার
'এটম বমে'রই মত।

সুদূর ভবিষ্যতের চক্ষে—
শুধু মহাপাপী হলে অলক্ষ্যে,
বিচারাতঙ্ক-বীজাণু বাহন
বিজয়ী ভাগ্যহত।

দেহ শুধু শ্বেত, চেতোদর্পণে—
আবর্জ্জনার স্তূপ,
প্রতিফলিত কি হতে পারে সেথা
সত্য ন্যায়ের রূপ?
স্বার্থের নামে এতো বলিদান,
নাহিক যুক্ত-যুক্তির স্থান,
সব ত্যজিয়াছ—লজ্জা ত্যজো না,
হে ভদ্র রও চুপ।
ভেবো না তোমরা ন্যায়পরায়ণ,
বিচারে নরোত্তম,
কোথা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষতা
বিবেকীর সংযম?
গুহামানবেরা ভাল বরঞ্চ,
রচে না ন্যায়ের বধ্যমঞ্চ,
হত্যাই করে—প্রবঞ্চনার
আড়ম্বরটা কম।
পূর্ব্বপুরুষ হনু ছিল বলো—
জানি না সত্য কিনা?
ও মত গ্রহণে সন্দেহ হয়
বিশেষ প্রমাণ বিনা।
হই নিশ্চিত—তবু মনে ভাবি—
হেসে মেনে লবে তোমাদের দাবি
অনাগত তব বংশধরেরা
হেরি বিচারের চিনা।

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পরদিন সন্ধ্যার পরে বেড়াইয়া ফিরিয়া শচীনবাবু শুনিলেন বৌমা জিনিষ দুইটিই বৈকালে দিয়া গিয়াছে। মীরা তাহা রাখিয়া দিয়াছে নির্ভয়ে এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। মীরা শুধু কহিল, কোথায় রাখবে ভাল করে রাখ—

কতকগুলি পুরানো পরীক্ষার খাতা তাকের উপর ছিল, শচীনবাবু ইস্তাহারগুলি তাহার মাঝে রাখিয়া আগ্নেয়াস্ত্রটিকে উপরে একটা স্থানে সংগোপনে রাখিলেন। কেবলমাত্র বসিয়াছেন ঠিক এমনি সময়ে ধলাদের দলের রঞ্জন আসিয়া উপস্থিত। সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে, কিন্তু এই ছেলেটি আশ্চর্য্য উপায়ে ধরা পড়ার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। দারোগা-হত্যার পরে সে নিকটবর্ত্তী এক আত্মীয়বাড়ীতে দুই-চার দিন থাকিয়া পরে আসিয়াছিল—

রঞ্জন প্রশ্ন করিল, সত্যদা কেমন আছেন?

শচীনবাবুর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল সত্যর বিশীর্ণ শুষ্ক মুখখানা, সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি ও করুণায় তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, ভাল নেই, আমাশয় হয়েছে আর সে পারে না।

—অসুখ বেশী?

—না, তবে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, অথচ কোথাও একদিনের জন্যে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, চারিদিকে হয় পুলিস না হয় রাজভক্ত প্রজা—

—আর কতদিন পারবেন এমনি করে?

আমিও তাই বলে'ছি তাকে, আর এমনি করে পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ কি? এ জাতির সবাই জড়বুদ্ধি, স্বার্থপর, অলস, আত্মকেন্দ্রিক—পরাজিতের মনোবৃত্তি আর আত্মসম্মান-জ্ঞানের অভাব এদের মজ্জাগত—

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পরে রঞ্জন অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল, সত্যদা কোথায়, তার কাছে যাওয়া ছাড়া ত কোন কাজ নেই আর—

আত্মগত ভাবে শচীনবাবু বলিলেন, আজ রাত্রের ষ্টীমারে বরিশাল যাবে, যদি বাইরে থাকতে পারে তবে হয়ত কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজে পাবে।

—আমিও তা হলে বরিশালই যাই—

রঞ্জন আলোচনাকে যেন অনাবশ্যকরূপে এবং অত্যন্ত আকস্মিকভাবে সংক্ষেপ করিয়া উঠিয়া গেল।

রঞ্জন চলিয়া যাইবার পর শচীনবাবুর হঠাৎ সন্দেহ হইল কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ভাল হয় নাই, এতদিন ত অমন ভুল তাহার হয় নাই। রঞ্জন চলিয়া গেল এমনি ভাবে যেন সে একটা কিছু হদিস পাইয়াছে—তার উপর, ধলাদের সঙ্গে বহু নিরপরাধ লোকও জেলে গিয়াছে—কিন্তু ঐ ছেলেটি কারাদণ্ডের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে—কেন? সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল, রঞ্জনের পশ্চাদনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যে শচীনবাবু তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন কিন্তু রাস্তায় সে নাই, কিন্তু এত শীঘ্র গেল কোথায়? তিনি একটু আগাইয়া আসিয়া মোড়ে দাঁড়াইলেন, বড় রাস্তায়ও নাই—একটু এদিক ওদিক চাহিয়া দেখেন রঞ্জন চায়ের দোকানে খাবার খাইতেছে, মণিবাবু দোকানে বসিয়া আছেন।

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিলেন বিমর্ষভাবে—এত বড় একটি ভুল তিনি মুহূর্ত্তে করিয়া বসিলেন কেমন করিয়া? ইহার পেছনে যেন রহিয়াছে নিয়তির দুর্জ্জেয় বিধান। মীরা প্রশ্ন করিল, কি হ'ল?

—সত্য বোধ হয় কালই ধরা পড়বে!

—ভালই ত, তার যা শরীরের অবস্থা তাতে সে-ই ভাল হবে।

শচীনবাবু যেন সান্ত্বনা পাইয়াছেন এমনি ভাবে বলিলেন, হয়ত ভালই হ'ল। বৃথা আর কেন?

মীরা বলিল, তুমি দুঃখিত হচ্ছ কেন? সে ভালই হয়েছে।

শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন, কিন্তু মীরা জানিল না কেন?

পরদিন বেলা ১২টার মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল সত্য ষ্টীমারষ্টেশনেই গ্রেপ্তার হইয়াছে। ওখানকার লোকেরা তাহাকে মাল্যভূষিত করিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছে। এই বাহবা ও জয়ধ্বনির নিস্ফল সঞ্চয়কে হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া সে কারাগারের প্রবেশদ্বার পার হইয়াছে।

যদিও ইহাতে বিমর্ষ হইবার যথেষ্ট কারণ নাই তবুও দেশসেবক কারাবরণ করিয়াছে এই সংবাদ পাইবার পরই শচীনবাবুর মনটা অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া পড়িল। মিস্ রায়ও সংবাদটা জানিয়াছেন, কিন্তু কেমন করিয়া শচীনবাবু স্বীকার করেন যে এ ব্যাপার তাঁহারই অনিচ্ছাকৃত ভুলের পরিণাম। সারাটা দিন একটা অব্যক্ত অস্বস্তিতে কাটিয়া গেল—মিস্ রায়ের সহিত দেখা করিতে যেন লজ্জা করিতেছিল।

সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে অকস্মাৎ রিজিয়া আসিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করাটা দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। প্রশ্ন করিলেন, কি?

—ছ'দিন পড়াতে যান নি, তাই ভাবলুম আপনার অসুখ করেছে।

—না ভালই আছি—শচীনবাবু তাকাইয়া দেখিলেন রাস্তায় রিজিয়ার একজন বান্ধবী দাঁড়াইয়া আছে।

—ওঃ ওদের ডাকো, বাইরে রয়েছে—

—না, আজ শেষরাত্রে আপনার বাসা সার্চ হবে তাই বলতে এলাম। যা আছে সরিয়ে ফেলুন—

—কেন ?

—সত্যদার কাছে আপনার আংটি পাওয়া গেছে—আপনার ছাত্রেরা সনাক্ত করেছে।

—ওঃ ভাল কথা—

রিজিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দরজার নিকট হইতে প্রশ্ন করিল, কাল যাবেন ত ?

—হ্যাঁ, যদি শরীরটা ভাল থাকে।

রিজিয়া চলিয়া গেল—শচীনবাবু আশ্চর্য্য হইলেন। এই মেয়েটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ধর্ম্মের। কিন্তু কেমন আন্তরিকতার সহিত এই সব কাজের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িতেছে, কিসের জন্য বৈপ্লবিক কাজে তার এত অনুরাগ। এমন সুন্দরী, এমন চমৎকার স্বভাব। মেয়েটি বিধর্ম্মী না হইলে যেন তিনি খুশী হইতেন।

যাহাই হোক এ সংবাদটা ভাল নয়, এখন অকারণ গ্রেপ্তার হইয়া মীরাকে বিপন্ন করিবার কোন মানে হয় না। আজ রাত্রেই যেমন করিয়াই হোক ওটাকে সরাইতে হইবে। কিন্তু কোথায় ? একমাত্র মিস্ রায় ছাড়া আর কে আছে ? আর সত্যর গচ্ছিত বস্তুকে রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য—ধর্ম্ম।

মীরাকে তিনি সবই জানাইলেন—

মাঝে মাঝে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলেন শচীনবাবু। কোথাও এতটুকু মেঘ নাই। স্বচ্ছ সুন্দর জোছনায় পৃথিবী ঝলমল করিতেছে—শচীনবাবু পরিপূর্ণ জোছনা দেখিয়া একটু যেন হতাশ হইলেন। আজ যে নিবিড় অন্ধকারেরই প্রয়োজন।

আহারাদির পর মীরা ও শচীনবাবু নীরবে বারান্দায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু এমন দিবালোকের মত সুপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় শচীনবাবু যেন সাহস পাইতেছিলেন না। কিছুক্ষণ বাদে রাত্রি প্রায় একটার সময় কতকগুলি খণ্ড মেঘ প্রদীপ্ত গোলকের মত চাঁদের উপর দিয়া দ্রুত ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। পৃথিবী একটা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অস্বচ্ছ হইয়া উঠিল।

শচীনবাবু বলিলেন—দাও ত মীরা, এখনই যেতে হবে—

মীরা আগ্নেয়াস্ত্র আনিয়া দিল, শচীনবাবু মনে মনে ভাবিলেন যদি তেমনিই হয়, না হয় আগ্নেয়াস্ত্র একবার ব্যবহারই করিবেন। ব্যবহার-কৌশল তিনি না জানেন এমন নয়। তিনি স্বল্পালোকে গুলি কয়েকটি ভরিয়া লইলেন এবং নীল রঙের একটা ছিটের জামা পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

রাস্তা নির্জ্জন, কেহ কোথাও নাই। নগরী নিশ্চিন্ত সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন। তিনি পিছনে, সামনে চাহিয়া চলিলেন—স্বল্পালোকিত চিরপরিচিত পথ—গরমে দুই-একজন দোকানী বাহিরে বেঞ্চে শুইয়া আছে। কে যেন অদূরে বিকৃত কণ্ঠে গান করিতে করিতে ফিরিতেছে—আনন্দের রেশটুকু যেন এখনও রহিয়াছে তাহার মনে।

মোড়ের মাথায় পুলিস থাকে—কিন্তু দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন কেহ নাই। মোড়ের বিড়ির দোকানটা বন্ধ। সম্ভবতঃ কেহ নাই।

একখানা ঘন কালো মেঘ অকস্মাৎ চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া দিল—পথ আর দেখা যায় না। বিধাতার ইঙ্গিত মনে করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মোড়টা পার হইতে অগ্রসর হইলেন।

মোড়টা প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন ঠিক এমনি সময় পিছন হইতে কে বলিল, ঠারিয়ে।

শচীনবাবু হাতের অস্ত্রটিকে ভাল করিয়া ধরিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই কনেষ্টবলটি। সে আজও নোকরী ছাড়ে নাই। আজ রোঁদের পালা তারই।

শচীনবাবু একটু যেন হতভম্বের মত দাঁড়াইলেন—কি কর্ত্তব্য বুঝিলেন না। কনেষ্টবলটি কহিল, আইয়ে মাষ্টারসাব—সেলাম।

সে অত্যন্ত ভালমানুষটির মত দোকানের আড়ালে তার টুলে গিয়া বসিল। শচীনবাবু অগ্রসর হইলেন। অদূরেই বালিকাবিদ্যালয়—রাস্তা হইতে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন—কেহ কোথাও নাই।

দেয়ালের পাশ দিয়া তিনি নিঃশব্দে পিছনে গেলেন—পুকুরপাড়ে ছোট গেট, কিন্তু প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। বহু কষ্টে উপরে উঠিয়া লাফাইয়া পড়িলেন—শব্দ একটু হইল।

কিন্তু আলো—বোর্ডিং ঘরে! সর্ব্বনাশ, ছাত্রীরা দেখিলে কি ভাবিবে! তাহারা মনে মনে সন্দেহ না করে এমন নয়। গেট খুলিতে গেলেও শব্দ হওয়া অনিবার্য্য।

একটু দাঁড়াইয়া তিনি কান পাতিয়া শুনিলেন, কোন সাড়া-শব্দ নাই। মনে হয় না যে কেহ জাগিয়া আছে। একটু একটু করিয়া বোর্ডিঙের জানালার নিকটে আসিলেন—একটি ছাত্রী আলো জ্বালাইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এইমাত্র।

শচীনবাবু স্বস্তির সঙ্গে আগাইলেন। মিস্ রায়ের ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে, মশারির ভিতরে তাঁহার ঘুমন্ত দেহখানা আলোর পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট। কিন্তু মশারি হাতে নাগাল পাওয়া যায় না—জানালা হইতে দূরে।

উঠানে একখানা পাকাটি জোছনায় চিক্ চিক্ করিতে-

ছিল, সেটি লইয়া তিনি মশারি তুলিয়া মিস্ রায়ের পায়ে একটা খোঁচা দিলেন। মিস্ রায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

শচীনবাবু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, দরজা খুলুন।

—কে? শচীনবাবু?

—হ্যাঁ।

মিস্ রায় দরজা খুলিয়া দিতেই শচীনবাবু ঢুকিয়া পড়িলেন। বলিলেন, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেন নি এই ঢের।

—করা উচিত ছিল, অমনি করে খোঁচা দেয়! কি ব্যাপার—

শচীনবাবু কহিলেন, 'এতদিন পরে এসেছে আমার আজি অভিসার রাত্রি'।

—অভিসারে এসেছেন? যাক্ সে কথা, কিন্তু ব্যাপার কি? এত রাত্রে এভাবে আসার হেতুটা কি বলুন দেখি?

শচীনবাবু কহিলেন, সত্যর গচ্ছিত ধন নিয়ে এসেছি। আজ ভোরে আমার বাসা সার্চ্চ হবে। আপনার এখানে রাখতে হবে।

—কোথায় রাখব—

—সে আমি রাখছি। শচীনবাবু গুলি বাহির করিয়া কাগজে পুরিলেন।

—কোথায়?

—বাথরুমে ত টালির ছাদ?

—হ্যাঁ—

—তবে, আলো ধরুন।

মিস্ রায় আলো ধরিলেন। শচীনবাবু রুয়ো ও টালির মাঝে জিনিষগুলি সাবধানে রাখিলেন। নামিয়া আসিয়া বলিলেন, গচ্ছিত ধন, রাখবেন—আর বিশ্বস্ত ব্যক্তি পেলে দেবেন।

—হ্যাঁ, এখন আসুন তাড়াতাড়ি।

চেয়ারে বসিয়া শচীনবাবু বলিলেন, বসুন, একটু জিরিয়ে নি।

একটু পরে রহস্য করিলেন, এখন কেউ দেখে ফেললে বেশ মজা হয় না?

—কি আর হবে? বদনাম ত! তা হতে কি আর বাকী আছে। কিন্তু আমার পক্ষে সুনাম-দুর্নাম সবই এক।

—থাক্—খবর বলুন—

শচীনবাবু আনুপূর্ব্বিক সবই বলিলেন। সত্যর কাহিনী ও তাহাদের বাঁচাইবার জন্য বৌমার সর্পদষ্ট হওয়ার অভিনয়ের কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। যখন দুই জনেই কথাবার্তায় মশগুল হইয়া উঠিয়াছেন ঠিক সেই সময়ে উপরের টিনের চালের উপর চড় বড় করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল।

—বেশ হ'ল, এখন যাবেন কি করে?

—না হয় থাকি।

—রাত যে প্রায় তিনটে—

—বৃষ্টিতে আমার যাওয়া আটকাবে একথা ভাবতে পারলেন।

—হ্যাঁ, তাও ত বটে, আপনাদের গতি যে অপ্রতিহত। যাক্, আপাততঃ চা করি, খান্ তার পরে যা হয় হবে।

—কিসে চা করবেন?

—ষ্টোভে—

—শব্দ হবে যে!

—না স্পিরিট ল্যাম্প।

চায়ের জল গরম হইতে লাগিল। শচীনবাবু বলিলেন, সত্য বলেছিল সেদিন, আমার একসঙ্গে ধরা পড়লে সে খুব আনন্দিত হ'ত। আমারও তাই মনে হচ্ছে।

জল ফুটিলে মিসেস্ রায় চা তৈরি করিলেন···চা খাইতে খাইতে শচীনবাবু বলিলেন,—বেশ লাগছে কিন্তু স্থান কাল সবই মনে মোহজাল বিস্তার করবার উপযোগী।

—আপনার লজ্জা করা উচিত ছিল—নিঃসম্পর্কীয়া একজন মহিলার শয়নকক্ষে গভীর রাত্রে ঢুকে—শ্রীমতী রায় হাসিয়া উঠিলেন।

লঘু হাস্য-পরিহাসে চা পান সমাপ্ত হইল—তখনও ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্রীমতী রায় ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, সাড়ে তিন।

—হ্যাঁ উঠি—আর দেখা হবে কি না কে জানে? জেলে যেতেই হবে বোধ হয়।

শচীনবাবু হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। শ্রীমতী রায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু শচীনবাবু তথাপি কিছু বলিলেন না। অণিমা প্রশ্ন করিলেন, আপনার কি শীঘ্রই জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?

—হাঁ, মনে হচ্ছে অতি সত্বর, নেহাত কিছু না পেলেও পুলিস ছাড়বে না—সত্যর কাছে আমার আংটি পাওয়া গেছে, আমার ভক্ত ছাত্রেরা তা সনাক্ত করেছে—কাজেই—

শচীনবাবু হঠাৎ আবার চুপ করিলেন, একটা চিন্তা তাঁহার মনকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল, মীরা ও খোকার কি হইবে—কেমন করিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে? যাহারা সাহায্য করিতে পারিত তাহারা আজ কারা-প্রাচীরের অন্তরালে—যাহারা বাহিরে তাহারা নিশ্চিন্তে দিন গুজরান করিতেছে। কতকগুলি কর্ম্মীর গ্রেপ্তারের সুযোগে যাহাদের দোকানের খরিদ্দার বাড়িয়াছে তাহারা নিয়তই কামনা করিতেছে তাহাদের কারাবাসের মেয়াদ দীর্ঘ হোক।···শচীনবাবু ভাবিতে লাগলেন,—তাঁহার আদরের খোকা—মীরা, ইহাদের কি গতি হইবে?

শ্রীমতী রায় বলিলেন, কি ভাবছেন?

সে কথা বললে আপনি হয়ত আমাকে দুর্ব্বলচিত্ত বলে মনে করবেন।

—না, খোকাদের কথা ত! আমি বেঁচে থাকতে তারা কষ্ট পাবে না, আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান। আপনি জয়যুক্ত হোন্।

—জয়-পরাজয়ের কথা জানি না। সত্যর কথাই বলি, একটা কিছু করতে হবে বলে সে কাজে নেমেছে, আমিও নামতে বাধ্য হয়েছি, ওদের দেশপ্রীতি আর আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধা করি বলে।

স্থির বিশ্বাসের সুরে অণিমা দেবী কহিলেন, কিন্তু এই ত্যাগ, এই সেবা, ব্যর্থ হতে পারে না, জগতের ইতিহাসে কখনো তা হয় নি—

—হয়ত তাই। অঞ্জলিরা রইল প্রয়োজন হলে তাদের দেখবেন—

—হ্যাঁ জানি।

—জীবনে আর দেখা হবে কিনা কে জানে! তবে আপনাকে ভুলবো না।

—যেখানেই থাকুন, আপনার জন্যে আমার সহানুভূতি চিরকালই থাকবে।…অণিমার চোখ দুটি আসন্ন বিদায়ের ব্যথায় অশ্রু-আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া শচীনবাবুকে প্রণাম করিলেন, তারপর সদর দরজাটি খুলিয়া দিলেন। শচীনবাবু রাস্তায় পড়িয়া একটু আগাইতেই দেখেন রঞ্জন এত রাত্রে ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় ঘুর ঘুর করিতেছে। শচীনবাবু চমকাইয়া উঠিলেন—তবে ত কিছুই গোপন নাই।

বাড়ী যাইয়া শচীনবাবু বোধ হয় একটু ঘুমাইয়াছেন হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সবে সূর্য্যোদয় হইতেছে—পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে—

খানাতল্লাসী চলিতে লাগিল অতি নির্ম্মমভাবে। বালিশ ছিঁড়িয়া তুলা বাহির করিল, তোশক কাটিয়া দেখিল, চাল, ডাল, গুড়, তেল মিশাইয়া দেখিল—কিছুই বাদ গেল না, তাহার পরে পরীক্ষার কাগজের ভিতরে বাহির হইল কংগ্রেসের ইস্তাহার—ধ্বংসাত্মক কার্য্যের প্ররোচনা।

শচীনবাবুর হাতে হাতকড়া দিয়া বিজয়গর্ব্বে পুলিসের লোকেরা তাহাকে লইয়া চলিল। রাস্তার দুই পাশে বহু লোক ভিড় জমাইয়াছে। কেহ বিস্ময়ে, কেহ করুণায়, কেহ উল্লাসে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। অত্যন্ত নিঃশব্দে নীরব জনতার কৌতুকদৃষ্টির উপর দিয়া শচীনবাবু চলিয়া গেলেন কারাগারের অন্তরালে।

শচীনবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, এখনও তাঁহার বাক্সে ১২।৶০ আছে। পাঠকদা একটি পয়সা রাখিয়া সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, 'বেঁচে থাকিস্'। তাহারা সত্যই বাঁচিয়া ছিল, তিনি সেই তুলনায় তো বিরাট সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছেন বিবেচনা করিয়া যেন হৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ভগবান অবশ্যই মীরা আর খোকাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। আর যদি নাই রাখেন তবে তাঁহার কি করিবার ক্ষমতা আছে? তিনি ত নিমিত্তমাত্র!

শচীনবাবু চলিয়া যাইবার পর মীরা ঘরে ঢুকিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। কতদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সে এই গৃহকে সাজাইয়াছিল। প্রত্যেকটি দ্রব্যকে অপরিসীম স্নেহ দিয়া সে আপনার করিয়াছে, মুহূর্ত্তে তাহা নষ্ট হইয়া গেল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। মীরার মনটা অত্যাচারীদের উপর বিদ্রোহে নির্ম্মম হইয়া উঠিল—সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, এত দম্ভ অত্যাচারের শাস্তি পাইতেই হইবে।

কিন্তু মীরার এ নিস্ফল ক্রোধ—পরাজিতের অভিশাপ মাত্র।

কয়েকদিন পরের কথা।

মিস রায় মাঝে মাঝে আসেন, খোঁজখবর লন। খোকা তাহার সহিত বেশ জমাইয়া লইয়াছে—তাহাকে পিসিমা বলিয়া ডাকে। মাঝে মাঝে সে পিসিমার সহিত বেড়াইতেও যায়। মাঝে মাঝে সে প্রশ্ন করে—বাবা কোথায়?

মিস রায় বলেন, কলকাতায় বেড়াতে গেছেন শীগগিরই আসবেন।

—কবে আসবে?

—কাজ শেষ হলেই আসবেন।

সেদিন মীরা ভাত রাঁধিয়া খোকাকে ভাত মাখিয়া দিয়াছিল। খোকা নানারূপ বায়না করিয়া অবশেষে এক গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল, মীরাকে নানারূপ প্রশ্ন আরম্ভ করিল। মীরা তাহাদের পানে না তাকাইয়াই উত্তর দিল, জানি না।

নানা প্রশ্নের একমাত্র 'জানি না' এই জবাব পাইয়া জনৈক অত্যুৎসাহী পুলিস-কর্ম্মচারী খোকার সামনের ভাতের থালাটা বুটের আঘাতে বাহিরে ফেলিয়া দিল—মীরা খোকার হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। পুলিসপুঙ্গব সদম্ভে ভাতে ভরতি মাটির হাঁড়িটায় পদাঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়া দিল।

মীরা চাহিয়া দেখিল—হঠাৎ চোখ দুইটি তাহার বাঘিনীর হিংস্রতায় ভরিয়া উঠিল, রাগে আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে সে বলিল, আপনারাও মানুষ!

জবাবের অপেক্ষা না করিয়া সে পাশের বাড়ীতে চলিয়া গেল। পুলিস বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া চলিয়া গেল।

মীরা আসিয়া দেখে তাহার বাক্স ভাঙ্গা, কানের দুলজোড়া, বিবাহের আংটিটি ও নগদ টাকার কিছুই নাই।

মীরা আর একবার কাঁদিল—একান্ত অসহায়ের মত।

যে ভাবনায় মীরা একদিন শিহরিয়া উঠিত কি করিবে, কেমন করিয়া খোকাকে লইয়া থাকিবে; এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহার সে ভাবনা দূর হইয়া গেল। তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল এই অত্যাচারের প্রতিবাদ না করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই ভাল। ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে সে নাগিনীর মত ফুলিতে লাগিল।

শ্যামলী অঞ্জলি বৌমা ও মীরা সেদিন একত্র সমবেত হইল। পেট্রোল টিন দুইটি এখনও রহিয়াছে, সেগুলিকে লাগানো প্রয়োজন। দুইটি দল—একটি শ্যামলী ও মীরা আর একটি বৌমা আর অঞ্জলি—প্রথম দলের লক্ষ্য মুলি বাঁশের বেড়াঘেরা খড়ের পুলিস ব্যারাক, দ্বিতীয় দলের লক্ষ্য পোষ্টাপিস—সেও অনুরূপ ঘর। কলসী ভরিয়া পেট্রোল লইয়া যাইবার সুবিধা আছে, কারণ উভয় স্থানেই টিউবওয়েল আছে এবং মেয়েরা সন্ধ্যার পরে সেখানে জল আনিতে যায়।

পোষ্টাপিসের পূব ও দক্ষিণ দিক দিয়া এবং পুলিস ব্যারাকের দক্ষিণ দিয়া বড় রাস্তার পাশের খরস্রোত খালটি প্রবাহিত। আর একটি খালের জলধারা ব্যারাকের পিছনের খানিকটা জঙ্গলের পাশ দিয়া বহিয়া ঐ খালে পড়িয়াছে—উভয়ের মিলিত জলরাশি বড় রাস্তার পুলের নীচে দিয়া যাইয়া একেবারে মাঠে চলিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে একটা ছোট রাস্তা বৌমাদের বাড়ীর সন্নিকটে গিয়াছে। ঠিক হইল—কার্য্য সমাধা করিয়া সকলে জলে ঝাঁপ দিবে কলসী লইয়া এবং এক স্থানে মিলিত হইয়া ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে গিয়া উঠিবে—আর যদি কার্য্য সুসম্পন্ন নাই হয় তবে অদৃষ্টে যা আছে তাই হইবে।

পুলিস-ব্যারাকের সামনেটা কাঁটা তারে ঘেরা, কিন্তু ঐ খালটি থাকায় পিছনটা উন্মুক্ত।

পারিপার্শ্বিক ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইলে বৌমা মীরাকে কহিল—আপনার আর গিয়ে কাজ নেই, অন্য কিছু না হলেও গ্রেপ্তার অবশ্যম্ভাবী। খোকা রয়েছে, তাকে দেখবার ত কেউ নেই।

মীরা কহিল—খোকার জন্যেই আমাকে যেতে হবে, খোকার ভাতের থালা যারা পা দিয়ে মাড়িয়েছে, তাদের উপর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। স্বামী-পুত্র নিয়েই মেয়েদের সংসার, যদি তাদেরই এ দশা, তবে আমার বেঁচে থেকে কি ফল?

অঞ্জলি কহিল—তবুও চিন্তা করা দরকার, আমরা ত যাচ্ছি—

মীরা দৃঢ়তার সহিত জানাইল, সে যাইবেই। অত্যাচারে মানুষ এমনি ভাবেই মরিয়া হইয়া উঠে, নহিলে কে ভাবিতে পারিত মীরার মত ভীরু কুলবধূর মনে এমন দুর্জ্জয় সঙ্কল্প আসিয়া দেখা দিবে।

অঞ্জলিরা প্রতিবাদ না করিয়া কহিল—আচ্ছা সে দেখা যাবে। আগে খোঁজখবর নিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করা যাক্—

সকলে চলিয়া গেলে মীরা অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া রহিল—তাহার মনের আকাশে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা যেন রহিয়া রহিয়া গর্জ্জাইতেছে। খোকার কি হইবে, সে কেমন করিয়া বাঁচিবে, অসহায় শিশু কি করিয়া এই অনুদার পৃথিবীতে আত্মরক্ষা করিবে এ সব চিন্তা সে ক্ষণিকের জন্যও করিল না, সে কেবল ভাবিল—আগুন দিতে হইবে—আগুনে পুড়িয়া উহারা মরুক, যদি নেহাতই বাঁচিয়া যায়—তাহা হইলেও পুড়িয়া মরিতে পারে এই আশঙ্কা যেন উহাদের রাত্রির নিদ্রাকে হরণ করে। এই একমাত্র চিন্তা তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

মীরা স্থিরসংকল্প হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—খোকা খাটের উপর অঘোরে ঘুমাইতেছে। মীরা নিদ্রিত পুত্রের কপালে চুম্বন করিয়া কহিল—বেঁচে থাকো—সত্যের মত বীর হও।

সেদিন সন্ধ্যার পর এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছিল, কিন্তু সঞ্চরমাণ মেঘে তাহা অস্পষ্ট ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে। রিজিয়াদের বাড়ীর পিছনে তাহারা যখন সমবেত হইল তখন ঈষৎ রাত্রি হইয়াছে—পথে বৈকালিক ভ্রমণার্থীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছে।

আজ শ্যামলী, অঞ্জলি ও বৌমা আসিয়াছে দেশপ্রেমের উত্তেজনায় মাতিয়া, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাইতে হইবে এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া, কিন্তু মীরা আসিয়াছে প্রতিহিংসার অন্ধ উন্মাদনা লইয়া—অল্পশিক্ষিতা গৃহস্থ-ঘরের বধূ, আদর্শের প্রতি অনুরাগ তাহার নাই, কিন্তু তাহার ভিতরের প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা প্রচণ্ড বেগে বাহির হইয়া আসিবে। সামনে যাহা পায় তাহাই সে গ্রাস করিবে।

যথাসময়ে রিজিয়া তাহাদের গৃহের পিছনে পেট্রোলের টিন বাহির করিয়া দিল—দুইটা কলসীতে তাহা ভরিয়া উহারা বিভিন্ন পথে রওনা হইল।

পোষ্টাফিসের পিছনে ও পুলিস-ব্যারাকের সামনের টিউবওয়েলে পাড়ার মেয়েরা সন্ধ্যার সময় যায়, পানীয় জল লইয়া আসে—কাজেই সন্দেহের কিছু ছিল না। মীরার কাঁকালে পেট্রোল ভর্ত্তি কলসী—আজ তাহার এতটুকু ভয় নাই—প্রাণ তাহার যায় যাক্, কিন্তু আগুন দিতেই হইবে···তাহার বুকে আজ দুর্জ্জয় সাহস—একমাত্র ভাবনা খোকাকে লইয়া। সে তাহার পিসির কাছে থাকিবে।

ব্যারাকের সামনের টিউবওয়েলে শ্যামলী তাহার কলসী ভর্ত্তি করিয়া আবার শূন্য করিল। রাস্তায় কদাচিৎ লোকজন যাইতেছে—হঠাৎ রাস্তাটা যেন জনশূন্য হইয়াছে, মীরা অত দেখে নাই—সে শ্যামলীর ইঙ্গিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া চলিল।

পিছনের অন্ধকারে তাহারা আসিয়া দাঁড়াইল—খানটি অল্পস্বল্প জঙ্গলাকীর্ণ, ব্যারাকের ভিতরে কে একজন সেপাই খাটিয়ায় শুইয়া নাকি সুরে ভজন গাহিতেছে।

শ্যামলী কহিল—আমি পেট্রোল ছিটিয়ে দেই এই হেঁচা বেড়ার গায়ে আপনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে দেবেন—আর সঙ্গে সঙ্গে কলসী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন জলে—ওরা গুলি করতে পারে—

—গুলি করবে ?

—হ্যাঁ, ওদের উপর এখন এমনি হুকুমই আছে।

শ্যামলী প্রস্তুত হইয়া পেট্রোল ছিটাইতে যাইবে এমনি সময় একটা হৈ চৈ—সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্ত কণ্ঠের চীৎকার—আগুন আগুন—

লোকজনের ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি, চারিদিকে তুমুল কলরব। মীরা সহর্ষে কহিল—পোষ্টাপিসে ওরা লাগিয়েছে তা হলে—

শ্যামলী কহিল—হ্যাঁ—আর দেরি করবেন না, এই অবসর, সব ছুটেছে ওদিক পানে।

ভজনগান-রত লোকটি 'কেয়া কেয়া' করিতে করিতে বাহির হইয়া গিয়াছে। শ্যামলী কলসী হইতে বেড়ার গায়ে পেট্রোল ছিটাইয়া দিল, কলসী নিঃশেষ হইলে কহিল—লাগান বৌদি—

—কিন্তু ওরা যে ঘরে নেই—

—না থাক্ লাগান, পেট্রোলের গন্ধে সব এসে পড়বে—

মীরা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া ফেলিয়া দিল—দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘর অগ্নিময় হইয়া উঠিল, আগুনের লেলিহান শিখা দেখিতে দেখিতে আকাশকে রক্তাভ করিয়া ফেলিল—

শ্যামলী কহিল—আসুন—মুহূর্ত্তে সে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

মীরা অপূর্ব্ব আনন্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল—আগুন। ছিটা বেড়া পার হইয়া আগুন খড়ের চাল ধরিয়াছে, একটা বাঁশের গিট সশব্দে ফাটিয়া গেল। পরম উল্লাসে সে মনে মনে বলিল—জ্বলুক, আরো জ্বলুক··· অত্যাচার, লুব্ধতা, সব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাক্, ক্ষমতার ঔদ্ধত্য পুড়িয়া ভস্মীভূত হোক—

মীরা জলে ঝাঁপ দিতে ভুলিয়া গিয়াছে—আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে—খোকার খালা যাহারা লাথি দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে তাহারা পুড়িয়া মরিতেছে—তাহার সঙ্গে পুড়িতেছে অত্যাচার, অবিচার, আর সকল গ্লানি।···মীরা হর্ষে গর্ব্বে সফলতায় আত্মপ্রসাদে অভিভূত হইয়া পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াই রহিল—তাহার কানে আসিতেছে যেন অত্যাচারীর হাহাকার, আর্ত্ত কণ্ঠস্বর, করুণ ক্রন্দন—অগ্নিদগ্ধ নিরুপায়ের ভয়াবহ চীৎকার।

দুম্ করিয়া রাইফেল গর্জ্জিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে মীরা পড়িয়া গেল। কি হইয়াছে সে জানে না—একটা উত্তপ্ত অগ্নি-শলাকা যেন অকস্মাৎ তাহার দেহ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথায়—বুকে, পেটে না মাথায় বুঝিতে পারিতেছে না। অসহনীয় যাতনায়, আর্ত্তস্বরে সে ডাকিল, শ্যামলী, খোকা, খোকা—শরীরের কোন একটা স্থান যেন ভিজা—সে হাত দিয়া দেখিল, সারা হাত রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে, আগুনের আভায় তাহা ঘোর রক্তবর্ণ দেখা যাইতেছে—তাহারই বুকের রক্ত—হোক, সে প্রতিশোধ লইয়াছে।

মনে মনে সে বলিল, বেঁচে থাকিস খোকা, এই রক্তের প্রতিশোধ নিতে তুই বেঁচে থাকিস।

অত্যন্ত ব্যাকুল আর্ত্তকণ্ঠে সে আর একবার ডাকিল, খোকা—

তাহার পর সে আর কিছু জানে না।

রক্তে তাহার ক্ষীণতনু প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। সবুজ ঘাস, পৃথিবীর মাটি ভিজিয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে—এই নূতন নয়, যুগে যুগে পৃথিবীর মাটি এমনি ভাবে কতবার রক্তাক্ত হইয়াছে, অগ্নিকুণ্ডে কত মৃত পতঙ্গের ভস্মস্তূপের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে এই সভ্যতা।···

চারিপাশের আগুন নির্ব্বাপিত করিবার জন্য সহস্রাধিক ব্যক্তি সমবেত হইয়া কলরব করিতেছে, কিন্তু যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহা নিবাইবার উপায় নাই। খড়ের ঘরের আগুন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এক নিমেষে, তাহার উত্তাপের নিকটবর্ত্তী হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাই নিরুপায় জনতা নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া কেবল দেখিতেছে।

কয়েক মুহূর্ত্তেই সমুদয় গৃহ পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়া গেল—তাহার কিছুক্ষণ পরেই আসিল জোয়ার, নদীর জল প্রবল বেগে খালে পড়িল এবং আশেপাশের সব কিছু ভাসাইয়া অতি দ্রুত মাঠে নামিতে লাগিল।

নির্জ্জন অন্ধকারে খালের জল কলকল করিয়া বহিয়া চলিল নিরুদ্দিষ্ট নিম্নভূমির দিকে।

ক্রমশঃ

ভেজাল ও নকল

শ্রীরাজশেখর বসু

নন্দ গোয়ালা দুধে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, 'বলেন কি বাবু, আপনি পুরনো খদ্দের, আপনাকে কি ঠকাতে পারি? পাপ হবে যে।'

বললাম, 'দেখ নন্দ, দুধে অল্পস্বল্প জল থাকলে আমি কিছুই বলি না, কিন্তু এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কালের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলে ফেল।'

নন্দ লোকটি সজ্জন। মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে, সের পিছু মোটে আধ পো জল দিই, পরিষ্কার কলের জল। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবেন না।'

'নন্দ, আর একটু সত্যি করে বল।'

'আজ্ঞে, এক পোর বেশী জল কোনও দিন দিই না, আমার এই গলার কণ্ঠির দিব্যি।'

এবারে বোধ হ'ল নন্দ সত্য বলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, একেবারে খাঁটি দুধ কি দরে দিতে পার?'

'আজ্ঞে, টাকায় তিন পো দিতে পারি।'

'বরাবর খাঁটি দেবে তো? হাত সুড়সুড় করবে না?'

'তা কি বলা যায় হুজুর? মাঝে মাঝে একটু জল না দিলে চলবে কেন, গরিব নোক।'

'আচ্ছা, যদি সরকার আইন ক'রে দেয় যে দুধের দাম বাড়াতে পার, কিন্তু জল একদম দিতে পাবে না, দিলে মোটা জরিমানা বা জেল হবে, তা হলে কি করবে?'

'তা হলে তো ভালই হবে বাবু। টাকায় আধ সের বেচব, আমাদের লাভ বাড়বে।'

'কিন্তু নামজাদা ডেয়ারির খাঁটি দুধ তো টাকায় এক সের পাওয়া যায়?'

নন্দ অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, 'খাঁটি কে বললে বাবু, মোষের দুধ জল মিশিয়ে দেয়।'

'আচ্ছা, টাকায় আধ সের হলে তুমি আর জল মেশাবে না তো?'

নন্দ ঘাড় নীচু করে হাসতে লাগল।

'মনের কথা বলে ফেল নন্দ।'

'তবে বলি শুনুন বাবু। সুবিধে মতন জল দিতেই হবে, এ হ'ল ব্যাবসার দস্তুর। আবার ইনস্পেকটারকে খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিতে হবে। ছাপোষা গরিব মানুষ, এসব খরচ পোষাতে হবে তো!'

এইবারে ব্যাপারটি বোধগম্য হ'ল। ব্যবসার দস্তুর অনুসারে গোয়ালা সনাতন প্রথায় যথাসম্ভব জল দেবেই। যতই ইনস্পেকটার থাকুক, শহরের সমস্ত দুধ পরীক্ষা করা অসাধ্য। অবশ্য মাঝে মাঝে ভেজাল ধরা পড়বে, তখন ইনস্পেকটারকে খুশী করতে হবে, সে বিমুখ হলে জরিমানাও দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে বা অনেক ইনস্পেকটার রাখলেও সর্বদা নির্জল দুধ মিলবে না। কয়েকজন ভাগ্যবান যাঁরা চোখের সামনে দুইয়ে নিতে পারবেন তাঁদের কথা আলাদা। কোঅপারেটিভের দুধে বেশী তারতম্য দেখা যায় না, কিন্তু তাও নির্জল নয়।

শিউরাম পাঁড়ে এককালে আমার বাড়িতে রাঁধত, এখন স্বাধীন ব্যাবসা করে। একদিন একটা টিন এনে বললে, 'বাবু, বড়িয়া ভঁইসা ঘিউ আনিয়েসি, সস্তা আছে, ছে টাকা সের, লিয়ে লিন।'

ঘি খুব সাদা, শক্ত, একটু গন্ধও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভেজাল কতটা দিয়েছ?'

'বনস্পতি? আরে রাম রাম!'

'দেখ পাঁড়ে, তোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে তিলকও আছে। মিথ্যা বলো না, পাপ হবে।'

শিউরাম সহাস্যে বললে, 'গাঁওসে আনিয়েসি, গোয়ালা কি করিয়েসে সে তো মালুম নহি। বাকী সে ভালা আদমী, সেরে আধ পৌয়ার বেশী মিশাবে না।'

'তারপর তুমি কত মিশিয়েছ?'

'সচ বাত বলছি বাবু, হামি সেরে এক পৌয়া মিশিয়েছি।'

'চেহারা আর গন্ধ থেকে মনে হচ্ছে সেরে সাড়ে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এ রকম ঘি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়া তিন টাকায় এক সের হবে।'

'এ ছিয়া ছিয়া! আপনে ভেজাল ঘিউ বানাবেন?'

'দোষ কি, বেচব না তো। সজ্ঞানে নিজেরাই খাব।'

দুধ-ঘিএর কালবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ বাড়ানো যায়। নকল দুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি তাই যথাসম্ভব জল মেশানো হয়। ঘিএর নকল আছে, কিন্তু

শিউরাম পাঁড়ের বিদ্যা কম, তার ভেজাল সহজেই বোঝা যায়, স্বাভাবিক ঘিএর মতন রং নয়, বেশী জমাট, গন্ধ অতি কম। সেকালে যখন চর্বির ভেজাল চলত তখন চেহারা আর গন্ধ খাঁটি ঘিএর সঙ্গে অনেকটা মিলত। আজকাল ওস্তাদ ঘি-ব্যবসায়ীরা একটু নরম দেখে ঘনতেল (hydrogenated oil) কেনে, তাতে ঈষৎ হলদে রং এবং রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে। ঘিএর এসেন্স বাজারে খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। তার গন্ধ অতি তীব্র, একটু পচা ঘিএর মতন, এক সেরে কয়েক ফোঁটা দিলেই সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানো যায়। সরষের তেলের এসেন্স আরও ভাল, রাই-সরষের মতন প্রচণ্ড ঝাঁঝ। চীনাবাদাম, তিল, তিসি—যে তেল যখন সস্তা, তাতে অল্প এসেন্স দিলেই কাজ চলে। যাদের সাহস বেশী তারা আরও সস্তায় সারে, অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলে গন্ধ দিয়ে বেচে। সরষের সঙ্গে শেয়ালকাঁটা-বীজের মিশ্রণ সম্ভবত ইচ্ছাকৃত নয়।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায়, ভেজাল ঘি-তেল বেচার জন্য আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমানা হয়েছে। যাদের নাম ছাপা হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকানদার। যারা বড় বড় কারবারী তারা কদাচিৎ দণ্ড পেলেও তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, তারা রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে জানে। যদি সমস্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয় তবে বদনাম এবং খরিদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-ব্যবসায়ীরা কতকটা শাসিত হতে পারে। সরকারী কর্তারা যদি এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারেন তবে লোকে তাঁদেরও সন্দেহ করবে।

রেশনে যে বিদেশী ময়দা পাওয়া যায় তা আমাদের পূর্বপরিচিত ময়দার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সময় রবারের মতন টান হয়। এই স্থিতিস্থাপকতা কি কানাডা-অষ্ট্রেলিয়ার ময়দার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মেশানোর জন্য? সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্তাদের উচিত। আটা কি শুধু গম-যবের মিশ্র থেকে তৈরি হয়, না অন্য শস্যও থাকে? রেশনের আটায় ভুসির পরিমাণ অত্যধিক। তা কোথা থেকে আসে? চালের সঙ্গে অনেক সময় এত পাথরকুচি আর ভুসি পাওয়া যায় যে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এই ভেজাল কোথায় দেওয়া হয় তার খবর সরকারী কর্তারা নিশ্চয় রাখেন। তাঁরা কি প্রতিকার করতে অসমর্থ, না ওজন বাড়াবার জন্যই ভেজালে আপত্তি করেন না? অনেক রেশনের দোকানে ভাল চালের বস্তা আড়ালে থাকে, বাছা বাছা খদ্দেরকে তা থেকে দেওয়া হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর সোপ-স্টোন পাওয়া গিয়েছিল। কয়েক গাড়ি তেঁতুল বিচিও একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে কাগজে প্রকাশ করা হয়, কিন্তু তার পরেই চুপ। অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হ'ত? গুজবের উপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস। ছেলে-ধরা, শিল-নোড়ার বসন্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের জলে সাপ প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে খেপে ওঠে। খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা কি সরকারের কর্তব্য নয়?

জল-মেশানো দুধের মতন ভেজাল-মেশানো চাল আর আটা না দিয়ে যদি খাঁটি জিনিস দেওয়া হয় তবে হয়তো দাম না বাড়ালে চলবে না, কিন্তু তাও লোকের পক্ষে শ্রেয় হবে। অবশ্য নন্দ গোয়ালা যাকে ব্যবসার দস্তুর বলে তা একেবারে নিবারণ করতে হবে, দাম বাড়াবার পরেও যেন ভেজাল না থাকে।

* * *

নিত্যব্যবহার্য বহু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা যায়। অসময়ে বাজারে স্তূপাকার সবুজ মটরের দানা বিক্রি হয়। সবুজ রঙে শুকনো মটর ছুবিয়ে বস্তাবন্দী হয়। পাইকাররা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে এবং দরকার মতন জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে বিক্রি করে। অজ্ঞ লোকে তা কাঁচা মটরশুঁটির দানা মনে করে কেনে। যে রং দেওয়া হয় তা সবিষ কি অবিষ কেউ ভাবে না। মিউনিসিপালিটি উদাসীন, মার্কেটের যাঁরা অধ্যক্ষ তাঁদের সামনেই এই অপবস্তু বিক্রি হয়। মিষ্টান্নেও নানারকম রং থাকে, তা নির্দোষ কি না দেখা হয় না। ময়রাকে যদি বলা হয়—রং দাও কেন? সে উত্তর দেয়—খদ্দের যে রং না থাকলে কেনে না। কথাটা সত্য নয়। রঙের প্রচলন ময়রার বুদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে করে রং থাকাটাই দস্তুর বা ফ্যাশন-সংগত। পাশ্চাত্ত্য দেশে খাদ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দোষ রঙের বিধান আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হয়। এদেশে যত দিন তেমন ব্যবস্থা না হয় তত দিন খাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য। সরকারী এবং মিউনিসিপাল কর্তাদের উচিত বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা।

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে যে চায়ের ছিবড়ে জমা হয় তা শুকিয়ে অন্য চায়ের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি থেকে অল্পাধিক আরক (essential oil) বার করে নেওয়ার পর বাজারে ছাড়া হয়। সব চেয়ে বেশী ভেজাল ও নকল চলছে ঔষধে। কুইনীন, এমেটিন

অ্যাড্রেনালিন প্রভৃতির লেবেল দেওয়া জাল ঔষধে বাজার ছেয়ে গেছে। শিশি-বোতল-ওয়ালারা বিখ্যাত দেশী বিলাতী ঔষধ ও প্রসাধনদ্রব্যের খালি শিশি ও টিন বেশী দাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ী থেকে কেনে, জালকারী তাতেই ছাইভস্ম পুরে বিক্রি করে। অনেক ভদ্র গৃহস্থ জেনে-শুনে এই পাপ ব্যবসায়ের সাহায্য করে। এই সব জাল জিনিস ফুটপাথে বিস্তর দেখা যায়, বড় বড় দোকানেও পাইকারী দরে বিক্রি হয়। পাকিস্থানে এই কারবার অবাধে চলছে। আজকাল কলকাতায় যে গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে তার সম্বন্ধেও অভিযোগ শোনা যায় যে গ্যাস পূর্বের মতন নয়, তাতে হাওয়া মেশানো আছে।

ভেজাল ও নকল এদেশে নূতন নয়। দেশী বিক্রেতার সাধুতায় আমাদের এতই অনাস্থা যে অনেক ক্ষেত্রে খাঁটি জিনিসের জন্য 'সায়েব-বাড়ি'র দ্বারস্থ হতে হয়। এই জাতিগত দুর্নীতিতে আমরা গ্লানিবোধ করি না। যুদ্ধের পর এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে মহাকলি-যুগের আরম্ভ হয়েছে তাতে সর্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জন-সাধারণের অধিকাংশেরই সামাজিক দায়িত্ববোধ কম, এক-জোট হয়ে আত্মরক্ষার উৎসাহ কিছুমাত্র নেই। সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেক বীরপুরুষ ও বীরনারীর উদ্‌ভব হয়েছে। এরা ট্রাম-বাস পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে মারে, মান্যগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক এবং স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের খেপায়; কিন্তু ভেজাল, নকল, কালবাজার প্রভৃতি দুষ্কর্ম সম্বন্ধে এরা পরম নির্বিকার। শুধু অসংযম ও অশান্তির প্রসারই এদের কাম্য।

কোনও অনাচার যখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে নির্বিবাদে তা মেনে নেয় তখন অল্প কয়েকজন সমাজ-হিতৈষীর উদ্‌যোগেই তার প্রতিকার আরম্ভ হয়। সতীদাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি এইপ্রকারে হয়েছে। ভেজাল ও নকল নিবারণের জন্য কয়েকজন নিঃস্বার্থ উৎসাহী লোকের প্রয়োজন। তাঁরা যদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদ্‌বোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ জিনিস বেচবার জন্য সমবায়-ভাণ্ডার খোলেন, তবে দাম বেশী নিলেও ক্রমশ তাঁরা সাধারণের আনুকূল্য পাবেন। তাঁদের প্রভাবে অন্যান্য ব্যবসায়ীও তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হবে।

দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস খেতে গিয়েছিলেন। আমাদের অভ্যস্ত অন্নের অভাব হলে অনুকল্প খুঁজতেই হবে, নিকৃষ্ট খাদ্যে তুষ্ট হতে হবে। জন-সাধারণ অবুঝ, অনভ্যস্ত খাদ্যে সহজে তাদের প্রবৃত্তি হবে না। যাঁরা ধনী ও জ্ঞানী তাঁদের কর্তব্য নূতন বা নিকৃষ্ট খাদ্য নিজে খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেওয়া। সরকার এইরূপ খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অত্যুক্তি বা মিথ্যা উক্তি করবেন না, তাতে বিপরীত ফল হবে। মিথ্যা প্রিয় বাক্যের চেয়ে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও খাদ্যবিশারদ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ঘাস থেকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হবে। সরকার যদি এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচারের প্রশ্রয় দেন তবে সাধারণের শ্রদ্ধা হারাবেন। চাল-আটা দুর্লভ হলে লাল-আলু, টাপিওকা প্রভৃতির সপক্ষে প্রচার করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে যে চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এই সব খাদ্যে জীবনরক্ষা হয়, স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও বিশেষ কিছু নেই; খরচ বেশী পড়তে পারে, কিন্তু এই দুঃসময়ে গত্যন্তর নেই।

সম্প্রতি পণ্ডিত নেহেরু জানিয়েছেন যে, কোনও এক ল্যাবরেটারিতে ভুট্টা থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরির চেষ্টা সফল হয়েছে। আজকাল অনেক রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন নীল (indigo), কর্পূর, মেন্থল। কিন্তু রাসায়নিক বা অন্যবিধ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কোনও শস্য, ফল বা প্রাণী প্রস্তুত করা এখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য। আমড়া থেকে আম অথবা ব্যাং থেকে মাছ তৈরি যেমন অসম্ভব, ভুট্টা থেকে চাল তৈরিও সেই রকম। পণ্ডিত নেহেরু যে বস্তুর কথা বলেছেন তাকে synthetic rice বললে সত্যের অপলাপ হবে, তা imitation rice বা নকল চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা। টাপিওকা থেকে যেমন নকল সাগুদানা তৈরি হয়, সম্ভবত ভুট্টাচূর্ণ থেকে সেই রকমে চালের মতন দানা তৈরি হয়েছে, হয়তো প্রোটিনের মাত্রা সমান করবার জন্য কিছু চীনাবাদামের গুঁড়োও মেশানো হয়েছে। দেখতে চালের মতন হলে দরিদ্র অজ্ঞ লোককে ভোলানো যেতে পারবে, খেলে পেটও ভরবে, কিন্তু এই জিনিসের গুণ চালের সমান হবে না। সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একেবারে বর্জন করতে হবে। 'সত্যমেব জয়তে'—এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়।

এক দিনের স্মৃতি

শ্রীউপেন্দ্র রাহা

সেবার নৈহাটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব বাহাদুর সম্মেলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জীবিত ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে ও উৎসাহে তদীয় জন্মস্থান নৈহাটিতে সম্মেলনের অধিবেশন হয়। আমরাও প্রতিনিধিস্বরূপে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলাম।

নৈহাটি ষ্টেশনের পাশেই কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্য-সম্রাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন। আমরা সম্মেলনস্থল হইতে তাহা দেখিতে গেলাম। 'বন্দে মাতরম্‌' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সহিত এই বাড়ীর স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত। ইহা কেবল বাংলার সাহিত্য-তীর্থ নয়, সমগ্র ভারতের পুণ্যতীর্থ। বঙ্কিমের অমর লেখনীপ্রসূত সমস্ত উপন্যাস এবং অন্যান্য গ্রন্থ ও রচনাবলী কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও 'বন্দে মাতরম্‌' মন্ত্র ভারতের প্রতি প্রাসাদে ও কুটিরে, প্রত্যেক দেশপ্রাণ ভারতবাসীর চিত্ত সঞ্জীবনী-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া চিরকাল ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে। এক দিন ভারতের মুক্তিকামী স্বদেশী যজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণ যে শক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া-ছিলেন, যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ভারতমাতার সহস্র সহস্র বীরসন্তান অবলীলাক্রমে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, যে মন্ত্রের অপরিসীম শক্তিতে তাঁহারা অশেষ দুঃখ দৈন্য ও বিপদ বরণ করিয়াছিলেন অম্লান বদনে প্রবল রাজশক্তির ভীষণ অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, দেশমাতৃকার মুক্তিব্রত উদ্‌যাপনে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া সর্ব্বরিক্ত হইয়াছিলেন, সেই মহামন্ত্রই ভারতের মুক্তিসাধনায় একমাত্র শক্তির উৎস, মহাজাতি সংগঠক ও মহৈক্যবিধায়ক ভারতের জাতীয় মন্ত্র, বেদের প্রণবের ন্যায় ইহাও 'বন্দে মাতরম্‌' সঙ্গীতের প্রণবস্বরূপ। ইহা অমরত্বের অমৃতে অভিষিক্ত, মৃত্যুহীন, ধ্বংসহীন। যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এই মহামন্ত্রের উদ্গাতা যিনি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরমে'র বাণীরূপ প্রদান করিয়াছেন, তিনিও অমরত্বের গৌরবে চিরপরিচিত, জাতির ইতিহাসে সেই মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রণেতা ঋষির নাম স্বর্ণাক্ষরে চির-মুদ্রিত থাকিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারে আরও দুই তিন জন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে। তন্মধ্যে তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ও তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শচীশচন্দ্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের লিখিত 'কণ্ঠমালা' 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রভৃতি অধুনালুপ্ত গ্রন্থের কথা বোধ হয়, আধুনিক পাঠক-সমাজে অনেকেই অবগত নহেন। তাঁহার 'পালামৌ' শীর্ষক সুলিখিত কাহিনীর অংশবিশেষ অনেক বাংলা পাঠ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শচীশচন্দ্র অনেক-গুলি বাংলা উপন্যাসের রচয়িতা। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের এক-খানি জীবনীও প্রণয়ন করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভালোকে বঙ্গের সাহিত্যাকাশ আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিরল। তিনি যে ঘরে বসিয়া সাধারণতঃ লেখাপড়া করিতেন সেই ঘরটি দেখিলাম। তাঁহার সুবিস্তৃত বাস-ভবন জীর্ণদশায় পতিত, বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া জীর্ণদেহে দণ্ডায়মান আছে। বঙ্কিমের এই স্মৃতিতীর্থে আসিয়া কত কথাই মনে পড়িল। বঙ্কিম-চন্দ্র যে যুগে বিদ্যমান ছিলেন, সেই যুগের সাহিত্যের তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়। সেই যুগে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভূদেব মুখো-পাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কসমূহের প্রতিভা-দীপ্তিতে বাংলার সাহিত্যগগন আলোকিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন হইতে একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যাণ্ডেলে আসিয়া তথাকার পর্ত্তুগীজ মিশন হাই স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রলাল ধর মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইলাম। ব্যাণ্ডেল কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। পারস্য ভাষার 'বন্দর' শব্দ হইতে ব্যাণ্ডেল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বন্দর শব্দের অর্থ বাণিজ্যস্থল—যেখানে দেশ-দেশান্তর হইতে বাণিজ্য-তরীসমূহ পণ্যসম্ভার বহন করিয়া আনে এবং যেখান হইতে বিবিধ পণ্য অন্যত্র বহন করিয়া লইয়া যায়। পর্ত্তুগীজেরা বন্দরকে 'ব্যাণ্ডেল' বলিত। তাহাদের বিকৃত উচ্চারণে হুগলী বন্দর 'Bandel de Ougolim'-এ পরিণত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যায়, দিল্লীর বাদশাহ্‌ হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে পর্ত্তুগীজ নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ এডমিরাল্‌ সেমপায়ো (Simpayo) ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নয়খানি জাহাজ লইয়া হুগলী বন্দরে আগমন করেন। তিনি অনেক বিলম্বে আসিলেও বাদশাহ তাঁহাকে পুরস্কার-স্বরূপ বাংলায় একটি কুঠি নির্ম্মাণের

অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে সেম্পায়ো হুগলীতে কুঠির স্থান নির্ব্বাচন করেন।

কিছুকাল পরে পর্ত্তুগীজেরা বর্ত্তমান 'জুবিলী সেতু' ও হুগলী জেলের মধ্যবর্ত্তী গোলাঘাট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করে। এখনও সেই প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে তাঁহার অনুগৃহীত ট্রেভারেস্ নামক একজন পর্ত্তুগীজ কাপ্তেন এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ও গীর্জ্জা নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার পর ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কুঠির প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী ব্যাণ্ডেল গ্রামে একটি উপাসনা-গৃহ নির্ম্মিত হয়। অল্প কয়েকজন অগাষ্টিনপন্থী পর্ত্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক যাজক এই স্থানে উপাসনার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিছুকাল মধ্যেই হুগলী কুঠির সীমানার ভিতরেই আরও দুইটি গীর্জ্জা এবং দুর্গ-মধ্যে সৈনিকদের জন্য একটি ভজনালয় নির্ম্মিত হয়।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ বণিকগণ এখানে বিশেষ সাফল্যের সহিত বাণিজ্য করেন, ক্রমেই তাঁহাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। কালক্রমে তাঁহাদের বাণিজ্য-কুঠিও বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত এবং দুর্গ আরও সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হয়।

১৬২২ সালে শাহজাদা হারুণ (খুররম) তাঁহার পিতা সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হন। ইনিই পরবর্ত্তীকালে সম্রাট্ শাহজাহান নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হারুণ তৎকালীন পর্ত্তুগীজ গবর্ণরকে অনেক ভূমি ও ধন-সম্পদের প্রলোভন দেখাইয়া তাহার পক্ষাবলম্বনের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু গবর্ণর মাইকেল্ রড্রিগ্স্ (Michael Rodrigues) তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। গবর্ণর এইরূপে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় শাহজাদা তাঁহার প্রতি নিতান্তই রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। বাংলার তদানীন্তন সুবাদারের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের ঘোরতর শত্রুতা ছিল। তিনি সময় ও সুযোগ বুঝিয়া বাদশাহের নিকটে সংবাদ দিলেন যে, পর্ত্তুগীজেরা তাহাদের কুঠি-মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কামান বসাইয়াছে এবং নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে। সম্রাট্ এই সংবাদ পাইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য সুবাদারকে আদেশ দিলেন। সুবাদার তদনুসারে ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া হুগলী কুঠিতে উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার পর্ত্তুগীজ দুর্গ অবরোধ করিলেন। প্রায় এক মাসকাল পর্ত্তুগীজেরা আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। অবশেষে সুবাদার কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারীকে উৎকোচ প্রদান করিয়া বশীভূত করিলেন। একদিন দুর্গ-মধ্যে যখন মহাসমারোহে জন দি ব্যাপ্‌টিষ্টের উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন এই কর্ম্মচারীর সাহায্যে সুবাদারের সৈন্যগণ গোপনে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

১৬৩২ সালের ২৪শে জুন এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উৎসব উপলক্ষে যখন দুর্গবাসীরা উপাসনায় রত ছিলেন, তখন শত্রু-সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গ বিধ্বস্ত করিতে লাগিল, অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করিল এবং সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়া ফেলিল। দুর্গমধ্যে যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। সুবাদার গবর্ণরকে বন্দী করিয়া জীবন্ত দগ্ধ করিলেন এবং এক হাজারেরও অধিক স্ত্রী-পুরুষ ও বালকবালিকাকে বন্দী করিয়া রাজধানী আগ্রায় পাঠাইয়া দিলেন। শত্রুসৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণে পর্ত্তুগীজদিগের গীর্জ্জা ও অট্টালিকাসমূহ ভূমিসাৎ হইল, সমগ্র কুঠি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। বন্দরে প্রায় ৩০০ পোত ছিল, তন্মধ্যে অল্পকয়েকটি মাত্র রক্ষা পাইল, অবশিষ্ট পোতগুলি মোগলসৈন্যের কবলে পতিত হইল। এই বিপুল ধ্বংসলীলার মধ্যে একমাত্র ব্যাণ্ডেলের গীর্জ্জাই শত্রুর অত্যাচার হইতে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা পাইয়াছিল।

এই গীর্জ্জার বেদীতে একটি অতি সৌষ্ঠবময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এই মূর্ত্তিই সুপ্রসিদ্ধ 'সুখযাত্রার দেবীমূর্ত্তি' (Lady of Happy Voyage)—১৬৩২ সালে হুগলীর দুর্গ অবরোধের সময় মূর্ত্তিটি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পায়। প্রবাদ এইরূপ যে, তখন একজন পর্ত্তুগীজ বণিক এই দেবীমূর্ত্তিকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহা বেদী হইতে তুলিয়া লইয়া মূর্ত্তিসহ নদীগর্ভে ঝম্পপ্রদান করে। অবরোধের পরবর্ত্তী বৎসরে পর্ত্তুগীজেরা যখন ব্যাণ্ডেলে ফিরিয়া আসিল, তখন সহসা এক দিন রাত্রিকালে এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হয়। তখন বাতাসের ভীষণ গর্জ্জন হইতেছিল। এই প্রচণ্ড গর্জ্জন-ধ্বনির মধ্যে গীর্জ্জার অধ্যক্ষ ফাদার ডা' ক্রুজ যেন সেই বণিকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সে যেন আকুলভাবে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আমাদের বিজয়দাত্রী এই 'সুখযাত্রার দেবী'কে অভ্যর্থনা করুন। ফাদার, উঠুন, আমাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করুন।" ফাদার ডা' ক্রুজ এই আহ্বান শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি দেখিলেন, নদীবক্ষ এক অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। কিছুকাল পরে সেই আলোকরাশি অন্তর্হিত হইল, নাবিকের সেই কণ্ঠধ্বনিও আকাশে বিলীন হইয়া গেল, প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিল। পরদিন প্রভাতে সেই দেবীমূর্ত্তিটি নদীকূলে গীর্জ্জার তোরণ হইতে কয়েক গজ দূরে পরিদৃষ্ট হইল। সম্ভবতঃ ঝটিকাক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার ঘাতপ্রতিঘাতে ইহা নদীতীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ডা' ক্রুজ মূর্ত্তিটি আনিয়া প্রধান বেদীর উপর স্থাপন করিলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থে একটি বিশেষ উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই উৎসব প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত

হয়, তখন এই দেবীমূর্ত্তিকে লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হয়।

কয়েক বৎসর পরে মূর্ত্তিটি নদীতীরে যে স্থানে পাওয়া গিয়াছিল, তথায় একটি ঘাট নির্ম্মিত হয়। এই ঘাট এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি যে বেদীতে স্থাপন করা হইয়াছিল, পরে তাহা হইতে তুলিয়া লইয়া গীর্জ্জার ছাদের উপর একটি আধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জায় একটি জাহাজের মাস্তুল প্রোথিত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যখন দেবীমূর্ত্তিটি পুনঃপ্রাপ্তির পর গীর্জ্জামধ্যে বিবিধ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন হইতেছিল, তখন একটি পর্ত্তুগীজ জাহাজ আসিয়া গীর্জ্জা-তোরণের সম্মুখবর্ত্তী ঘাটে নোঙ্গর করে। গীর্জ্জায় উপাসনা শেষ হইলে, ঐ জাহাজের কাপ্তেন তাঁহার জাহাজখানা বঙ্গোপসাগরের মধ্যে কি অবস্থায় ভীষণ ঝড়ে পতিত হইয়াছিল এবং তিনি নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলে ঝড়ের দেবতাকে যথোচিত উপচার প্রদানের মানস করায় ঝটিকার বেগ ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া কিরূপে প্রকৃতি শান্ত ভাব ধারণ করিল, তাহা ফাদার ডা' ক্রুজের নিকট বর্ণনা করেন। অতঃপর কাপ্তেন জাহাজের একটি মাস্তুল অপসারিত করিয়া তাহা প্রতিশ্রুত উপচারস্বরূপ গীর্জ্জাপ্রাঙ্গণে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন। তিন শতাধিক বর্ষের পরও ইহা এখনও সগৌরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত কাহিনীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

ভূপেনবাবুর বাসায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে আমরা তাঁহার সঙ্গে ব্যাণ্ডেলের গীর্জ্জা দেখিতে গেলাম। গীর্জ্জার শীর্ষদেশে সেই 'সুখযাত্রার দেবীমূর্ত্তি' দর্শনে মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। বাস্তবিকই ইহা শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের এক বিচিত্র নিদর্শন। শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত অতুল সৌষ্ঠবমণ্ডিত, জীবন্তভাবের প্রাচুর্য্যে অভিষিক্ত সুগঠিত মাতৃমূর্ত্তি, ক্রোড়ে একটি অতি কমনীয় শিশুকে ধারণ করিয়া আছেন। মূর্ত্তির মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব মাতৃভাবের বিকাশে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে; দেখিলে মনে হয়, যেন অনবদ্য শুচিতা, শুভ্রতা, কমনীয়তা এবং স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত মাতৃত্ব এখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। বহুক্ষণ নয়ন ভরিয়া এই মূর্ত্তি দেখিলাম। অতঃপর ইহার স্মৃতিভারে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে গীর্জ্জা-প্রাঙ্গণে অবতরণ করিলাম। অনেক দিন হইল, পর্ত্তুগীজেরা বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের কত কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির কথা অতীত কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় পর্ত্তুগীজ-দিগের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ব্যাণ্ডেলের গীর্জ্জা এই মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি শীর্ষে ধারণ করিয়া সার্দ্ধ ত্রিশতাব্দী কাল সর্ব্বসংহারী কালের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আজিও অক্ষত শরীরে দণ্ডায়মান আছে। গীর্জ্জা হইতে ভূপেনবাবুর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধ্যাহ্নের ভূরিভোজন ও ভূপেনবাবুর অকৃত্রিম অতিথিবাৎসল্যে পরিতৃপ্ত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। নৈহাটি সাহিত্য-সম্মেলনের স্মৃতির সহিত এই একদিনের স্মৃতি অচ্ছেদ্য-রূপে বিজড়িত হইয়া রহিল।

বৃথা তবে এই স্বাধীনতা

শ্রীনীলরতন দাশ

নব্যযুগের সব্যসাচী ও দধীচির সাধনায়,
মূর্চ্ছিতা দেশ-জননী জাগিল মুক্তির চেতনায়।
নরকাসুরের রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল ধূলির 'পরে,
দুঃশাসনের রক্ত-চক্ষু নিমীলিত চিরতরে।
কংসের কারা ধ্বংস হইল, টুটে গেল বন্ধন;
তবু কেন এত দুঃখদৈন্য? তবু কেন ক্রন্দন?
অমারজনীর অবসানে যেই উজলিল চারিধার,—
রঙীন উষার দুয়ারে আবার ঘনালো অন্ধকার!
অন্নপূর্ণা ভারতমাতার ক্ষুধার্ত্ত সন্তান
পরের দুয়ারে আর কেন করে অন্নের সন্ধান?
বিশ্বের মাঝে নিঃস্বের সাজে বিবস্ত্র নরনারী
বিলাসপুরীর রাজপথে কেন চলে আজো সারি সারি?
হুজুরে মজুরে আজিও বিরোধ; যন্ত্রশালার কুলি
পেষণচক্রে গুঁড়া হয়ে কেন হতেছে পথের ধূলি?
চিত্তে তৃপ্তি দিল না মুক্তি, নিরাশায় ভরা বুক;
বহুবাঞ্ছিত স্বপ্নলোকের কোথা সে স্বর্ণযুগ?

প্রেতপিশাচেরা এখনো গোপনে হাসিছে অট্টহাস,
নাগিনীরা আজো চুপে চুপে ফেলে বিষাক্ত নিশ্বাস।
শান্তির নীড় পল্লী-কুটীর ভাঙে যে গুণ্ডারাজ,—
সম্বলহীন বাস্তুহারারা পথে পথে ফিরে আজ।
এখনো যে কত পল্লীভবন আর্ত্ত-অশোক বন,
বন্দিনী সীতা লাঞ্ছিতা সেথা কাঁদিছে অনুক্ষণ!
সমাজের অরি চোরাকারবারী মুনাফাখোরের দল
লক্ষ লোকের বক্ষ শুষিয়া চক্ষে ঝরায় জল।
ধনিকে বণিকে কাঞ্চন লুটে' সঞ্চিত করে টাকা,
বঞ্চিত জন লাঞ্ছিত শুনি' গালভরা বুলি ফাঁকা!
দেবতার তরে স্বর্গে এখনো মজুত হতেছে সুধা,
মর্ত্ত্যে মানুষ কণিকা তাহার পায় না মিটাতে ক্ষুধা!
শত শহীদের রক্তের স্রোত, মাতার অশ্রুধারা—
ব্যর্থ কি হ'ল? ধরার ধূলায় হ'ল কি সকলি হারা?
মুক্তির স্বাদ নাহি পায় যদি চির দুর্গত জন—
বৃথা তবে এই স্বাধীনতা, মিছে উৎসব-আয়োজন!

রথগাত্রের প্রতিকৃতি

মহাবল্লীপুর

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

অজন্তা-এলোরা না রামেশ্বর-সেতুবন্ধ, মাদুরা না মহীশূর-রাজ্য, কোদাইকানাল না কলম্বো ? জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হ'ল মহাবল্লীপুরে এবার পড়বে আমাদের বেদুইনী আস্তানা আর দু'দিনের ডেরাডাণ্ডা। কারো নেই পিছুটান, চল বেরিয়ে পড় ; ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ তার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, বাতাসে বাতাসে ভেসে তা আমার কানে এসে পৌঁছেছে। আজ মুখর অতীতের বাণী শোনবার দিন। আর কি অপেক্ষা করা চলে ?

সমস্ত রাত ট্রেনে কাটিয়ে ভোরবেলার দিকে মাদ্রাজের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে চিঙ্গেলপেট ষ্টেশনে পৌঁছানো গেল। এখান থেকেই অসমতল ভূমির আভাস পাওয়া যায়। দিগন্তে অনতি-উচ্চ সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী আর হ্রদ। একটু পরেই সূর্য্য উঠবে। আমাদের বেরুতে হবে মোটরবাসের সন্ধানে। আরো কুড়ি মাইল পথ উজিয়ে যেতে হবে বাসে। যথাস্থানে বাসের জন্য ধরনা দিলাম। অন্য জায়গার গাড়ী একটা আসছে আর চলে যাচ্ছে। আমাদের বাহনটি কই ? অপেক্ষা করে করে সবাই ক্রমে হতাশ হয়ে উঠছি।

—'ফিরে যাওয়া যাক্।'

—'না হয় সোজা মাদ্রাজের গাড়ীতেই উঠে পড়ি।'

—'কাঞ্চীপুর বলে রওনা দিলেই বা মন্দ কি।'

এমনি কথাবার্ত্তা আর সলাপরামর্শ চলছে। পৌনে দশটা বাজল। তখনো পরামর্শ চলেছে সমানে। দশটা নাগাদ পেট্রোলগ্রাসী যন্ত্রজন্তুটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছাল। অবিলম্বে একটা অস্ত্রোপচার চাই—ওর মুখ দিয়ে জল পড়ছে হুড় হুড় করে, কাটাছেঁড়াটি নতুন করে জুড়ে দিতে হবে। এক ঘণ্টার মত আবার আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। ইঞ্জিন গেল যন্ত্রমেরামতি ডাক্তারের বাড়ী।

আরো ঘণ্টাখানেক গেলে গাড়ী প্রস্তুত হ'ল। ইতিমধ্যে যাত্রীরা ক্রমাগত উঠেছে। ক্রমে অধিকাংশকেই নাড়গোপাল হয়ে বসতে হয়েছে—নড়াচড়ার এতটুকু স্থান নেই। এবার মোটর ছাড়ল। প্রশস্ত রাস্তা জনবিরল প্রান্তরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছে সর্পিল রেখা এঁকে। গাড়ী চলেছে ঝড়ের বেগে—লোকসানি সময় পুষিয়ে নিতে হবে ত ! মাঝ-রাস্তায় পক্ষীতীর্থে নামছে তীর্থযাত্রীরা। এই তীর্থের কথা অন্য এক সময় বলব। আমরা আজই পৌঁছাতে চাই মহাবল্লীপুরে। আরো কয়েকটা 'ষ্টপ' পেরিয়ে এলুম। তারপর অকস্মাৎ দূরে দেখি সমুদ্রের নীল জলরেখা আর সু-উচ্চ বাতিঘর, দূরে বিরাট বিরাট পাথরের পাহাড়। ঐ ত আমাদের গন্তব্য।

মহাবলীপুরের সাধারণ দৃশ্য। মোটরের পশ্চাতে 'গঙ্গাবতরণ' প্রস্তরফলক

এবার আমরা এসে পড়েছি একটা প্রাচীন ইতিহাসের জগতে। জনশ্রুতি, কল্পনা, ঐতিহাসিক প্রমাণের ছিটে-ফোঁটা এর মধ্যে গা ঠেলাঠেলি করছে। এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হবে। তবে ইত্যবসরে একটা ভূমিকা পাঠকের কিছু কাজে লাগতে পারে।

দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যশিল্পকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, পাঁচটি রাজবংশ যে ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেছে সেই অনুযায়ী: (১) পল্লব (৬০০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দ), (২) চোল (৯০০-১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ), (৩) পাণ্ড্য (১১৩০-১৩৫০), (৪) বিজয়নগর (১৩৫০-১৫৬৫), (৫) মাদুরা (১৬০০ থেকে)। স্পষ্টত: পল্লবেরা কম-বেশী তিন শ বছর রাজত্ব করেছিল। এই তিন শত বছরের মধ্যে দুই রীতির স্থাপত্যশিল্প দেখা দেয়। প্রথম রীতি চলেছিল সপ্তম শতাব্দী ধরে, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে প্রচলন হয় আর এক রীতির। প্রথম রীতির শিল্প হ'ল খোদাই কাজ (monolythic বা rock-cut)—গোটা পাথর থেকে কেটে কেটে মূর্ত্তি, চিত্র ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা। দ্বিতীয় রীতির শিল্প সংযোজন-পদ্ধতির (structural) উপর প্রতিষ্ঠিত—পাথরের সঙ্গে পাথর সাজিয়ে এখানকার কক্ষ বা মন্দির গড়ে উঠেছে। প্রথম রীতির মধ্যে রয়েছে আবার দুই রকমের সৃষ্টি—(ক) মণ্ডপ, (খ) রথ। মণ্ডপগুলি ছোটখাটো কক্ষ—পাথরের গায়ে খোদাই করা—কতকগুলি স্তম্ভ তার মধ্যে ছাদ এবং মেঝেকে সংযুক্ত করে রেখেছে। একেবারে ভিতরের দিকে পাথরের গায়ে এক বা ততোধিক স্থানে খনন গভীরতর—এগুলিকে দেবদেবীর জন্য 'গর্ভগৃহ' বলা হয়। রথগুলিতে এরকম স্তম্ভ বা দেবদেবীর জন্য অন্তঃপুর-কক্ষ কিছু নেই; তার মধ্যে সবটাই প্রায় অলঙ্কারের কাজ। এই রথগুলিতে যদি দেবদেবীর স্থান না থাকে তবে ধর্ম্মপ্রবণ ভারতীয়দের হাতে কেন তাদের সৃষ্টি হ'ল তা রীতিমত গবেষণার বিষয় এবং তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ থাকাও বিচিত্র নয়। বলছিলাম পল্লবদের দুই রীতির শিল্পের কথা; তাদের রাজত্বকালও এই দুই রীতি ধরে দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়—

প্রথম ভাগ { মহেন্দ্র-পন্থী, ৬১০-৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ—শুধু মণ্ডপ।
মামল্লা-পন্থী, ৬৪০-৬৯০ খ্রীঃ—রথ ও মণ্ডপ।

দ্বিতীয় ভাগ { রাজসিংহ-পন্থী, ৬৯০-৮০০ খ্রীঃ—মন্দির।
নন্দীবর্ম্মণ-পন্থী, ৮০০-৯০০ খ্রীঃ—মন্দির।

ধর্ম্মশালার সামনে এসে নেমে পড়া গেল। জিনিষপত্রের মধ্যে তো প্রায় লোটা-কম্বল সম্বল বললেই চলে। সে-সব একটা ঘরে বন্দী করে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়া গেল। আমরা মোটামুটি জায়গাটা একবার প্রদক্ষিণ করে ফিরব এক ঘণ্টা বাদে—খাবার তৈরি রাখতে বলা হ'ল হোটেল-বিধাতা মুণ্ডিতমস্তক তামিল ব্রাহ্মণটিকে। গতকাল রাত্তির থেকে অভুক্ত থাকার পর সেদিন আমরা প্রত্যেকে যে পরিমাণ রসদ টেনেছিলাম তার পরিণাম বড় দুঃখের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছিল। কথাটা বলে নিই। দীর্ঘ মোটরযাত্রার পরে আরো এক ঘণ্টা রোদ্দুরে রোদ্দুরে টো-টো করে যখন পাত পেতে বসা গেল তখন প্রত্যেকের জঠরে দাবানল জ্বলছে। সাত্ত্বিক তামিল বামুন ভেবেছিল এই বাবুলোকেদের আর কত দৌড় হবে—দু'চার গ্রাস ভাত নাড়াচাড়া করেই উঠে পড়বে। কিন্তু একবার পা বাড়িয়ে একগলা জলে পড়ল সে। তরকারিতে টান পড়ল। ভাতও তথৈব চ। অবশেষে কোন রকমে যেন একটা শোচনীয় বিয়োগান্ত নাটককে টেনে-হিঁচড়ে বাঁচানো গেল। ফল হ'ল রাত্রে। খেতে বসে মুখে ভাত দিতে গিয়ে দাঁতে কাঁকর ঠেকছে, তরকারির আলু অন্তর্দ্ধান করেছেন—তার জায়গায় শোভমানা কৃষ্ণবর্ণা কাঁচকলা, 'সম্বর' নামক ডাল বলে যে পদার্থটি তার ঝালে মুখ ঝলসে যাবার যোগাড়; ব্যাপারটা চুপচাপ অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হ'ল। কেউ কেউ মন্তব্য করলেন:

—'বেনে বামুন ওবেলাকার শোধ নিলে।'

—'আচ্ছা, আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এক চড়াই পাখীতে গ্রীষ্ম হয় না।'

দুর্গা

পল্লবদের রাজ্য এক সময়ে প্রায় বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল—তাদের তখনকার প্রাচীন রাজধানী ছিল 'কঞ্জিভেরম'-এ (কাঞ্চীপুর)। পল্লবরাজ্য জুড়ে এই সব শিল্পের যে বিশেষ চর্চ্চা হয়েছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। মহাবল্লীপুর একটি প্রধান নিদর্শন—প্রথম ভাগের শিল্পের এখানে পরাকাষ্ঠা। আবার এই চরমোৎকর্ষ হয়েছিল প্রথম ভাগের শেষ দিকে, রাজা নরসিংহ বর্ম্মণের (৬৪০-৬৮ খ্রীঃ) রাজত্বকালে। নরসিংহ বর্ম্মণের এক উপাধি ছিল 'মহামল্ল' (অনেকটা তাঁর বীরত্বের ব্যঞ্জনাসূচক)—তাঁরই নামানুসারে নির্ম্মিত হয়েছিল সমুদ্রোপকূলস্থিত নগরী ও পোতাশ্রয় 'মামল্লাপুর'। কথিত আছে, এই মূল শহরটির সুদীর্ঘ ছয় মাইল স্থান এখন সমুদ্রগর্ভে বিলীন। ঐতিহাসিক এই জনশ্রুতির সত্যতা বিচার করবেন।

আর একটা জনশ্রুতির কথা তুলছি। এটি সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। মহাবল্লীপুরের শিল্প গড়ে উঠেছিল সমাজ-পরিত্যক্ত একশ্রেণীর লোকের দ্বারা; সমাজের উচ্চবর্ণ কর্ণধারদের ওপর প্রতিহিংসার বশেই যেন তারা তাদের এই কঠিন শ্রমের বিজয়কেতন সগর্ব্বে তুলে ধরেছিল। সেন্টিমেন্টের দিক দিয়ে এরূপ একটা গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু ইতিহাসের প্রমাণ এর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিপাত করেই চলেছে—আর তার প্রমাণ মানুষের মুখে মুখে নয়, কঠিন পাথরের উপর উৎকীর্ণ।

মহাবল্লীপুরের শিল্পনিদর্শনগুলির অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এখানকার পরিকল্পনার মধ্যে জলাধার, জল আনয়ন এবং জল নিষ্কাশনের প্রণালকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আজ অবশ্য এই চিহ্নগুলির অধিকাংশ ভেঙেচুরে গেছে এবং বালির স্তূপে চাপা পড়েছে—বালি আর বালির ঢিবি আর একান্ত নির্জ্জনতার মধ্যে এই একদা-জনবহুল কর্ম্মব্যস্ত বন্দর এখন শিরীষ আর ঝাউয়ের ছায়ায় বসে অতীত গৌরবের স্বপ্ন দেখছে। তার মধ্যে জলের স্রোত বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের স্রোতও নিথর হয়ে গিয়েছে। কেন এই সন্ধ্যা নেমে এল মহাবল্লীপুরে? সমুদ্র-গ্রাসিত হবার ভয়ে লোকজন সব পালিয়েছিল আরও অভ্যন্তরপ্রদেশে? তাই অসমাপ্ত শিল্পের এত মর্ম্মান্তিক ছিটেফোঁটা চিহ্ন? হয় তো এসেছিল রক্তক্ষয়ী রাষ্ট্রবিপ্লব—যার ফলে শিল্পীকেও যন্ত্র ফেলে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল? দক্ষিণ-ভারতে রাজায় রাজায় সংঘর্ষের কাহিনী ত উপকথার মত অলীক কল্পনা নয়। কিম্বা নূতন এক রাজার (রাজসিংহ) অভিপ্রায়ে পুরাতন রীতিতে চলমান ধারার এখানে ঘটল পরিসমাপ্তি; তারপর অন্যত্র নূতন প্রচেষ্টা, নূতন শিল্পের আবির্ভাব?

এই মহাবল্লীপুর এককালে ছিল সমৃদ্ধ পোতাশ্রয়। ভারতের পণ্যবোঝাই তরণীর সারি এই আশ্রয়ঘাট থেকে যেত সমুদ্র উজিয়ে দেশদেশান্তরে:

"For there is little doubt that from Mamallapuram, in the middle of the first millennium, many deep-laden argosies set forth, first with marchandise and then with emigrants, eventually to carry the light of Indian culture over the Indian Ocean into the various countries of Hither Asia. Amidst the opalescent colouring of Java's volcanic ranges, and on the lush green plains of old Cambodia, in the course of time there grew up important schools of art and architecture derived from an Indian source. That the origin of these developments is to be found in the Brahminical productions of the Pallavas, and, before them in the stupas and monastaries erected by the Buddhists under the rule of the Andhras, is fairly clear. It is possible to identify in the khmer sculptures at Angkor Thom and Angkor Vat, and in the endless bas-reliefs on the stupa-temple of Borobadur, the influence of the marble carved panels of Amaravati, while the architecture that this plastic art embelishes owes some of its character to the rock-cut monoliths of Mamallapuram."*

আমরা ইতিমধ্যে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মহাবল্লীপুর সম্বন্ধে একটা মোটামুটি চিত্র পেয়েছি। এবার শিল্পনিদর্শনগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। এগুলি গ্র্যানাইট জাতীয় দুটি বিরাটায়তন প্রস্তরস্তূপের গায়ে খোদাই করা। প্রথমটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত—আধ মাইল দীর্ঘ ও সিকি মাইল প্রশস্ত, এক শ ফুটের বেশী উঁচু; একটু দূরে অন্যটি—

* Percy Brown—*Indian Architecture*, Vol. I.

গঙ্গাবতরণের একাংশ

আড়াই শ ফুট লম্বা, উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট, দেখতে অনেকটা যেন রাক্ষুসে তিমি মাছের পিঠের মত।

প্রথমে মণ্ডপগুলির উল্লেখ করি। এদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত দশ—নাম যথাক্রমে: (১) ধর্ম্মরাজ, (২) কোটিকাল, (৩) মহিষাসুর, (৪) কৃষ্ণ, (৫) পঞ্চপাণ্ডব, (৬) বরাহ, (৭) রামানুজ, (৮) পঞ্চগৃহ শিব, (৯, ১০) অসম্পূর্ণ। মণ্ডপগুলির প্রত্যেকটিতে যেমন এক একজন প্রধান অধিষ্ঠাতা দেবতার স্থান রয়েছে—তীর্থযাত্রীর কাছে তারা প্রধান আকর্ষণ, তেমনি আর এক দিকে তার অন্তর্ভাগে দেয়ালে দেয়ালে পাথর কেটে তোলা পুরাণের কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর খণ্ডচিত্র, মানব-মানবীর নানা অনুপম মূর্ত্তি। বরাহ-মণ্ডপটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তার কারুকার্য্য চমৎকার সুক্ষ্মতাতে গিয়ে পর্য্যন্ত পৌঁছেছে। অথচ তার মধ্যেই রয়েছে কেমন একটা অতি-রিক্ততার ভারহীন শুচিশুদ্ধ পরিচ্ছন্নতা। মণ্ডপরচয়িতা এই শিল্পীরা কক্ষগঠনে সুনিপুণতা দেখালেও প্রধানত: এঁদের মনে হয় ভাস্কর বলে—তাঁদের গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতিতেও এই ভাস্কর্য্যের ধর্ম্মই সুপরিস্ফুট। এ কথা পরবর্ত্তী কালের রথশিল্পের বেলাতেও সমান ভাবে প্রযোজ্য।

রথগুলি সব একই জায়গায় পাওয়া যায়—মণ্ডপগুলির মত তারা দূরে দূরে ইতস্তত: ছড়ানো নয়। সংখ্যা ৭টি মাত্র: উত্তর-পশ্চিমে—(১) বলয়কুঠি ও বিদরি; দক্ষিণে—(২) দ্রৌপদী, (৩) অর্জ্জুন, (৪) ভীম, (৫) ধর্ম্মরাজ, (৬) সহদেব; উত্তরে—(৭) গণেশ—ছটি একই শ্রেণীতে, সপ্তমটি দ্বিতীয় শ্রেণীতে। দ্বিতয় শ্রেণীতে সপ্তম রথের সামনে একটি প্রকাণ্ড হস্তীমূর্ত্তি—জীবন্ত হস্তীর সমানই তার উচ্চতা, জীবন্ত হস্তীর মতই তাকে দেখতে। রথগুলি মনে হয় কোন মন্দিরের প্রতিকৃতি—প্রত্যেকটি যেন এক একটি মডেল, গোটা পাথরের চাঁই থেকে কেটে কুঁদে বের করা। সমস্ত গায়ে তার কারুকার্য্য, পাদপীঠ থেকে শীর্ষ অবধি। এগুলির প্রসঙ্গে ব্রাউন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করছি:

"Solitary, unmeaning, and clearly never used, as none of their interiors are finished, sphinx-like for centuries these monoliths have stood sentinel over mere emptiness, the most enigmatical architectural phenomena in all India, truly a "riddle of the sands." Each a lithic cryptogram as yet undeciphered, there is little doubt that the key when found will disclose much of the story of early temple architecture in South India."*

এই রথগুলির গঠনশিল্পের মধ্যে যে পারিপাট্য ও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে চমৎকৃত হতে হয়। সবচেয়ে কলাসৌষ্ঠবময় বোধ হয় অর্জ্জুনরথের গায়ে কেটে তোলা মূর্ত্তিগুলি। নিখুঁত তাদের গড়ন, অনুপম তাদের ব্যঞ্জনা রাজা নরসিংহ এবং কাঞ্চীরাণীর যুগলমূর্ত্তি যেখানি—অর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'রূপমে' এক সময়ে তার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছিলেন:

"The portraits of men are given in terms of the heroic type, a body,—of medium height, and finely built,—from which the deeds on the fields of battle have subtracted all superfluous flesh. And the result is a frame of sinuous grace of stateliness and of restraint. To this male type, the female forms offer an exquisite parallel, in the suppleness of their contours as in their bashful modesty of their gesture" †

আর যে একটি দ্বারপালের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রয়েছে—তার দৃষ্টি কোন্ দূরের বস্তুতে নিবদ্ধ, তার তুলনা সহসা মেলে কি? একটা অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়: ভারতীয় ভাস্কর্য্যে 'ফিনিশ' এর অভাব। মামল্লার উদাহরণ এই শ্রেণীর মতাবলম্বীদের চোখের সামনে তুলে ধরতে ইচ্ছা করে—মামল্লাপুরের এই সব মূর্ত্তি, স্বর্গীর চিত্র, যেখানে ফুটে উঠেছে অবর্ণনীয় ভাব এবং শক্তির বিচ্ছুরণ; গঙ্গাবতরণের চিত্র—

* Percy Brown—*Indian Architecture,* Vol. I.

† *Rupam*: No. 27-28, July-October, 1926.

গঙ্গার মৃতসঞ্জীবনী ধারা যেখানে নেমে আসছে উপর থেকে, ক্ষাত্রবীর এবং মুনি-ঋষিরা তাঁর আবাহন করছেন, নাগকন্যারা তাঁর উপাসনায় রত, তাঁর স্পর্শে সজীব হয়ে উঠছে মৃতকল্প ধরণী, আবার সচল হয়ে উঠেছে বিশ্বচরাচরের প্রাণীকুল; নাগরাজ অনন্তের উপর শয়ান বিষ্ণু; প্রত্যেকটি প্রস্তরফলকের কথা বলা এখানে সম্ভব নয়। শুধু মহাবল্লীপুর কেন, সমগ্র ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও শিল্পের মর্য্যাদা কি গুণী বিদেশীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন নি? এক তাজমহলই পার্থেননের সমান গৌরব দাবি করবার পক্ষে যথেষ্ট; আগ্রা আর তার উপান্তস্থানগুলিই গ্রীসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।"*

গঙ্গাবতরণের আর এক অংশ

রথগুলির আকার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এবার দু'একটি বিষয় উল্লেখ করবার আছে। আকারে এগুলি বিপুলায়তন নয়। বৃহত্তমটি দৈর্ঘ্যে ৪২ ফুট এবং প্রস্থে ৩৫ ফুট—উচ্চতমটি উচ্চতায় ৪০ ফুট। রথের সংখ্যা আটটি, কিন্তু তার মধ্যে তিন রকম 'ষ্টাইল' বা গঠন-রীতি দেখা যায়। একমাত্র দ্রৌপদীরথ বাদে বাকী অন্যগুলি বৌদ্ধবিহার এবং মঠের অনুকরণে গঠিত। দ্রৌপদীরথটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, কিন্তু শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিক থেকে এটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; মনে হয় একটি পর্ণকুটীরের প্রতিচ্ছবি করে একে গড়ে তোলা হয়েছে। গণেশ রথটি বৌদ্ধবিহার এবং মঠের মিশ্র রীতিতে তৈরি। তার প্রবেশ-পথ প্রশস্ততর দিকের মাঝখানে, তার দ্বিতল ক্রমেই সূক্ষ্মাগ্র হয়ে উঠেছে শেষে ঢালু দ্বিকরপত্রের মত—পণ্ডিতেরা বলেন এই রীতি থেকেই পরে দক্ষিণী শিল্পের বিশিষ্ট 'গোপুরম'-এর জন্ম ও বিকাশ।

এই পর্য্যন্ত ত রথশিল্প দেখলাম। তারপর এলেন রাজা রাজসিংহ, আর এক নূতন পদ্ধতির শিল্প মাথা তুলল—এবার সত্যিকারের রাজমিস্ত্রীর কাজ সুরু হ'ল। মামল্লাপুরের তিনটি নিদর্শন—অধুনা-কথিত সমুদ্রতট-মন্দির (Shore Temple), ঈশ্বর, মুকুন্দ—ছাড়াও আরও দুটি নিদর্শন রয়েছে কাঞ্চীপুরে, ষষ্ঠটি দক্ষিণ আর্কট জেলায়। প্রধান হিসাবে গণ্য তিনটি—সমুদ্রতট-মন্দির, কাঞ্চীপুরের শিবমন্দির এবং বিষ্ণু-মন্দির। সমুদ্রতট-মন্দিরটির, অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়—নূতন ধরণের এই শিল্পের প্রথম সৃষ্টি বলেই নয়, তার অবস্থানও সেজন্য বহুলাংশে দায়ী। সমুদ্রের একেবারে গায়ে বলে তার লবণাক্ত জল ও হাওয়া এর কম ক্ষতি করে নি। তারপর অস্থির বালুতট ধ্বসিয়েছে অনেক গাঁথুনি। মন্দিরের গঠনকৌশল একটু বিশেষ ধরণের। বেদী একেবারে সমুদ্রের দিকে অনাবৃত, সম্মুখে এতটুকু প্রাঙ্গণ নেই, প্রবেশ তোরণ পর্য্যন্ত নেই। বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল মন্দিরের দেবতা পাবেন সূর্য্যোদয়ে প্রথম আলোর রশ্মি, দূরাগত যাত্রী সমুদ্র থেকেই দেখতে পাবে তাঁকে; রাত্রিতে তাঁরই সামনে জ্বলবে যে দীপাধার তাই হবে নাবিকের সতর্কতার সঙ্কেতসূচক নিদর্শন। পরে অবশ্য অনুষঙ্গ হিসাবে কিছু কিছু বাড়তি কক্ষ ও চত্বর গড়ে উঠেছিল। সমস্ত মন্দির-সীমানা ঘেরা ছিল উঁচু দৃঢ় প্রাচীর দিয়ে—তার উপরে সারিবদ্ধ ছিল বৃষের উপবিষ্ট মূর্ত্তি, পাঁচিলের গায়ে সিংহের মুখাবয়ব। এই দ্রুত-ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরের দুটি গম্বুজই এখন দর্শনীয়। এরা পূর্ব্বোল্লিখিত রথশীর্ষেরই অনুকৃতি অনেকখানি। তবে এর চূড়া গিয়ে শেষ হয়েছে বর্শাফলকের তীক্ষ্ণতায়—রথশিল্পের বা বৌদ্ধ নিদর্শনের মত সুডৌল অর্দ্ধবৃত্তাকার চূড়া এখানে নয়। ফলে একটা লঘুতা এসেছে সমস্ত মন্দিরের গঠনে—তা যেন উড়ে উড়ে কোথাও দূর আকাশে উধাও হয়ে চলেছে।

সমস্ত দিন ঐ পাথরের ভগ্নস্তূপের আর সাইপ্রাসের ছায়ায় নির্জ্জন বালি-প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ানো গেছে। আমাদের চটির সামনে বেশ খানিকটা সবুজ খোলা মাঠ। সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যেবেলা তারই উপর গা এলিয়ে দিয়েছি। যেন এই পৃথিবীর কোন এক শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি আমরা—এখান থেকে তাকিয়ে দেখি লক্ষ যোজন দূরে কোলাহলমত্ত মানবের স্রোত।

হঠাৎ কাঁধে হাতের স্পর্শ পেলাম। স্বল্পালোকে ভাল চেনা যায় না, প্রশ্ন করলাম:

—'কে, ভেঙ্কটেশ?'

—'না।'

* "Le Taj Mahal est seul digne de balancer la gloire du Parthenon; Agra et ses alentours peuvent rivaliser avec la Grece."—Sylvain Levi: *Aux Indes Sanctuaires.*

—'কামেশ্বর ?'

—'না ।'

—'তবে যুধাজিৎ সিং ?'

—'তাও নয়, পারলে না। দেখছি নিজের পরিচয় নিজেই দিতে হ'ল।' নিঃশব্দ পদক্ষেপে একটা আবছায়া মূর্তি সম্মুখে এসে দাঁড়াল। 'পাথরের মধ্যে আমাকেই তো তোমরা খুঁজছিলে, এখন চিনতে পারছ না ? আমি কাঞ্চীকুমারী'—

এবার সোজা হয়ে বসতে হ'ল। পাশে অর্দ্ধনিদ্রিত দিব্যেন্দু, তাকে ডাকতে যাব। মূর্ত্তিটি ইঙ্গিতে বারণ করল :

—'তোমার সঙ্গেই দুটি কথা বলতে চাই।'

পল্লব-ইতিহাসে এই রাজনন্দিনীকে ত কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সেখানে রাজা, বড় জোর রাজমহিষীর উল্লেখ আছে। তাও রোমাঞ্চকর তেমন কিছু নয়।

মূর্ত্তিটি তখন যেন বলতে সুরু করলে,

'তোমার কাব্যের আমিই পাঠোদ্ধার করছি।...রাজায় রাজায় বাধে দ্বন্দ্ব আর স্বার্থের সংঘাত। এই হিংসার অনলে ইন্ধন যোগায় পুরনারীর দল। সহস্র মৃতদেহের পরিবর্ত্তে ওঠে বিজয়ের জয়রথ; ওই পাথরের মূর্ত্তি, ওর অন্তরালে শোণিতের স্রোত। আজ কালের তরঙ্গে তার রক্তাভা ম্লান হয়ে গেলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে কি ? তারপর বিজয়ীরও আসে শেষ দিন...।'

—'তোমার বিদ্রূপ বুঝতে পেরেছি রাজকুমারী। ইতিহাসের বাস্তব বর্ণনার ওপর তুমি হানতে চাও কঠিন কশাঘাত। তার কি প্রয়োজন ছিল।'

ইতিমধ্যে দিব্যেন্দু কখন উঠে বসেছে। বলছে,

—'হোটেলওয়ালাকে চেঁচিয়ে বল না গরম পকোড়ি আর কফি দিতে।'

তাকিয়ে দেখলাম কাঞ্চীকুমারীর চিহ্নও কোথাও নেই। দিব্যেন্দুকে বললাম :

—'বেশ গরম কফি চাই, আমার গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।'

দুঃখ-ঝড়ে

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

জীবনকে কেন্দ্র করে নানা দুঃখ আছে।
পদ-স্খলনের ভয় পাছে—
বক্ষ ওঠে কাঁপি'।
জীবন-মৃত্যুর দাপাদাপি
হানাহানি সর্বদা উদ্যত।
যতটুকু পারি সাধ্যমত
দুই হাতে
রেখেছি তফাতে।
তবু যেন কোনো এক অসতর্ক ক্ষণে
বিষাক্ত ফণার আস্ফালনে
শশব্যস্ত আছি—
মৃত্যুর একান্ত কাছাকাছি।

সমুদ্রের মত অন্ধকার
মুহুর্মুহু বক্ষ কাঁপে, ভয়ত্রস্ত আকাশ আমার।
নেই তা'তে কোনোই দ্যোতনা
নক্ষত্রের স্বল্প আনাগোনা।
ইতস্তত আনাচে-কানাচে
শুধুই সর্পের ফণা সমুদ্যত আছে—
অদৃষ্টের আরো কি লাঞ্ছনা ?
জীবন বড়ই বিড়ম্বনা।

যখন সম্ভাব্য মৃত্যু অন্ধকারে হাঁটে,
বিমর্ষ মুহূর্তগুলি শঙ্কা-ত্রাসে কাটে,
নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে তখন ললাটে
কে সে কর রাখে ?
দূরে ঠেলে ঝড় ও ঝঞ্ঝাকে ?
কেউ নয়, সে স্বপ্ন ছড়ায়।
হৃদয়ের নম্র মমতায়
অন্ধকারে দীপ জেলে যায়।
সে মুহূর্তে শুধু মনে হয়,
যদিও অনন্ত দুঃখ পরিব্যাপ্ত আছে
জীবন তবুও মিথ্যা নয়—
অত্যাশ্চর্য পরম বিস্ময়।
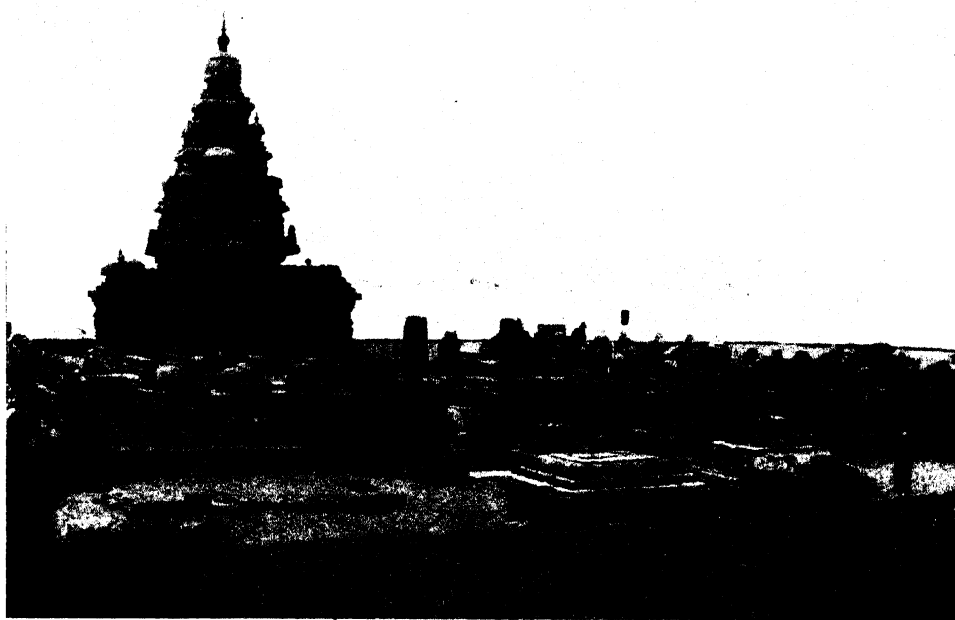
সমুদ্রতট-মন্দির

বরাহ মণ্ডপ

সপ্তরথ

সপ্তরথের আর এক অংশ

শিক্ষাব্রতী রিচার্ডসন

(১৮০১-১৮৬৫)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে সকল শিক্ষাব্রতী বঙ্গের যুবক-মনে নব ভাবধারার উন্মেষ সাধনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন, তাঁহাদের মধ্যে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। ডিরোজিও রিচার্ডসন অপেক্ষা বয়:কনিষ্ঠ ও স্বল্পায়ু ছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশ ছিল তাঁহার জন্মভূমি; বঙ্গীয় যুবকদের মধ্যে নব্য-শিক্ষার আলোকে তিনি যেরূপ আলোড়ন উপস্থিত করিতে পারিয়াছিলেন, রিচার্ডসনের পক্ষে তেমনটি সম্ভবপর ছিল না। তথাপি তিনিও ডিরোজিওর পরে শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের মনে বিশেষ প্রেরণা জোগাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে প্রশস্ততর ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মাধ্যমেও তিনি লোকশিক্ষায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এখানেও ডিরোজিওর সঙ্গে তাঁহার তুলনা করা চলে। তবে স্বল্পায়ু হওয়ায় ডিরোজিওর পক্ষে সাংবাদিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার সুযোগ হয় নাই। রিচার্ডসন কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ডিরোজিও কবি, সাহিত্যিক। এদিক হইতেও রিচার্ডসন তাঁহার সমগোত্রীয়। কিন্তু ঐ একই কারণে ডিরোজিও অপেক্ষা তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা স্ফুরণে অধিকতর অবকাশ ঘটে এবং তিনি প্রচুর যশের অধিকারী হন। কিন্তু ডিরোজিও ও রিচার্ডসন উভয়েই ছিলেন সত্যকার শিক্ষাব্রতী। নব্য-বঙ্গের শিক্ষা ও সংগঠনের কথা বলিতে গেলে দুইয়ের কৃতিত্বই আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। ডিরোজিও সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হইয়াছে, রিচার্ডসনের কথাও এখন আমাদের জানা আবশ্যক।*

রিচার্ডসনের পিতা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বাঙালী পল্টনে চাকরি করিতেন। ১৮০৮ সনে অবসর গ্রহণান্তর স্বদেশে ফিরিবার পথে জাহাজে তিনি মারা যান। তাঁহারও বেশ সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল। পুত্র ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন তাঁহার সাহিত্যিক গুণপনার পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন ১৮০১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮১৯ সনে সৈন্যবিভাগে গোলন্দাজ বাহিনীতে ভর্ত্তি হইয়া কলিকাতায় আসেন। বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক হাজলিট তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি যে অল্পবয়সেই মাতৃভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, ১৮২০ সন হইতে জেম্‌স সিল্ক

ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন

বাকিংহাম-সম্পাদিত 'দি ক্যালকাটা জর্ণালে' প্রকাশিত তাঁহার কবিতা ও অন্যান্য রচনা হইতে বুঝা যায়। এই সকল রচনা *Miscellaneous Power* নামক পুস্তকে একত্রে ১৮২২ সনে প্রকাশিত হয়। ১৮২৩, ১১ই জুলাই রিচার্ডসন লেপ্টেনাণ্টের পদে উন্নীত হন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় ইহার পর বৎসর তিনি বিলাতে ফিরিয়া গেলেন।

স্বদেশে গিয়া তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তখনই ভারতবর্ষে না ফিরিয়া সাহিত্য ও সংবাদপত্র-সেবায় মন দিলেন। ১৮২৫ সনে তাঁহার *Sonnets and Other Poems* প্রকাশিত হইল। ইহার দুই বৎসর পরে, *Weekly Review* নামে একখানি সংবাদপত্রও তিনি বাহির করিলেন। হাজলিট, রস্কো প্রমুখ সেযুগের সাহিত্য রথীগণ তাঁহার পত্রিকায় লিখিতেন। পত্রিকাখানি সাহিত্যক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু রিচার্ডসন ইহাকে অর্থের দিক হইতে স্বাবলম্বী করিতে পারিলেন না; নিজে ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে ইহার স্বত্ব বিক্রয় করিতে বাধ্য হন।

ভারতবর্ষে অর্জ্জিত অর্থ এইরূপে নি:শেষিত হইলে রিচার্ডসন পুনরায় এদেশে আগমন করেন। এখানে আসিয়া রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রের সম্পাদক হইলেন। এ পত্রিকাখানির প্রথম সম্পাদক ছিলেন আর. এম্. মার্টিন। তিনি তখন স্বদেশ-যাত্রা

* 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু' জানুয়ারী ১৯০৬ সংখ্যায় এস সি. সান্যাল 'Captain David Lester Richardson' নামক প্রবন্ধে রিচার্ডসনের জীবন-কথা লিখিয়াছেন। ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ রিচার্ডসনের বিখ্যাত ছাত্রগণও তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রে এবং সরকারী বার্ষিক শিক্ষা বিবরণেও রিচার্ডসনের বিষয় অনেক কথা জানা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনায় প্রধানত: এই সকল সূত্র হইতে সাহায্য লইয়াছি।

করিতে উদ্যোগ করেন। 'বেঙ্গল হেরাল্‌ডে'র বাংলা সংস্করণ 'বঙ্গদূত' ৫ সেপ্টেম্বর ১৮২৯ তারিখে লেখেন,—

"বঙ্গদূতের সহচর বেঙ্গল হেরাল্‌ডের সম্পাদক শ্রীযুত আর, এম্, মার্টিন···প্রিয় জনের প্রয়োজনে স্বদেশ গমনে উদ্যুক্ত এ প্রযুক্ত সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত শ্রীযুত ডি এল্ রিচার্ডসন সাহেব এতৎপত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছেন। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত সম্পাদকের বিচ্ছেদে অস্মদাদির হর্ষ বিপ্রকর্ষ হইয়া বিমর্ষ সন্নিকর্ষ, কিন্তু পাঠকবর্গ এ সম্ভাবনায় এরূপ ভাবনা করিবেন না যে বঙ্গদূত তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হইবেন যেহেতু ইহার সহচরের সাহিত্য রাহিত্য কদাচ হইবেক না কেবল সম্পাদকের পরিবর্ত্তন মাত্র।"*

সৈন্য বিভাগের কার্য্যও রিচার্ডসনের সমানে চলিয়াছিল। সে যুগে সরকারী যে-কোন বিভাগে কার্য্য করিলেও, কর্ম্মচারীরা সংবাদপত্র-সেবায় নিয়োজিত হইতে পারিতেন। ১৮২৯ সনের ২৯শে অক্‌টোবর রিচার্ডসন সৈন্য বিভাগে ক্যাপ্টেন পদলাভ করেন। বিকলাঙ্গ হওয়ার দরুন তিনি ১৮৩৩, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, 'ইন্‌ভ্যালিড' পেন্সন লইতে বাধ্য হন। সৈনিকের রণক্ষেত্রে গমন, যুদ্ধ এবং অন্যান্য কর্ত্তব্য হইতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল, যদিও কর্ম্মীর তালিকায় তাঁহার নাম রাখা হয়। এইরূপে সৈনিকের করণীয় কার্য্যাদি হইতে অব্যাহতি পাইয়া রিচার্ডসন অতঃপর পরিপূর্ণ রূপে সাহিত্য-চর্চ্চা ও সংবাদপত্র-সেবায় মন দিলেন। 'ক্যালকাটা লিটারারী গেজেট', 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্ন্যাল' এবং 'বেঙ্গল এন্যুয়াল' নামক সাময়িক পত্র-ত্রয় সম্পাদনে রত হইলেন। শেষোক্তখানি তিনি বড়লাট-পত্নী লেডী বেণ্টিঙ্কের নামে উৎসর্গ করেন। রিচার্ডসনের সাহিত্যিক গুণপনার প্রতি সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৪ সনে তাঁহাকে নিজ 'এডিকং' নিযুক্ত করিলেন। ইহার পরই তাঁহার শিক্ষাব্রত আরম্ভ হইল।

২

সাহিত্য ও সংবাদপত্রসেবীরূপে রিচার্ডসন দেশী বিদেশী বিদ্বজ্জনসমাজে পরিচিত হইয়া উঠেন। হিন্দু কলেজের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর আর. টাইট্‌লার স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু ১৮৩৪ সনে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদবধি কলেজের অধ্যক্ষ-সভা একজন উপযুক্ত শিক্ষাব্রতীর অনুসন্ধানে ছিলেন। রিচার্ডসন টাইট্‌লারের অবসর গ্রহণের বিষয় অবগত হইয়া শিক্ষা-সমাজের (General Committee of Public Instruction—যাহা পরে Council of Education-এ পরিণত হয়) সভাপতি টমাস বেবিংটন মেকলের নিকট এই পদলাভের নিমিত্ত স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মেকলে ১৮৩৫, ৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁহাকে এই মর্ম্মে লেখেন যে, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা—যাহার প্রায় সকল সভ্যই হিন্দু, কলেজের শিক্ষক ও কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন, তবে শিক্ষা-সমাজের সভাপতি হিসাবে তাঁহার যাহা করণীয় তাহা তিনি নিশ্চয়ই করিবেন। রিচার্ডসনের সাহিত্যিক কৃতির কথা হিন্দু-প্রধানগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। তাঁহারা সানন্দে রিচার্ডসনকে ১৮৩৫ সনের আগষ্ট মাস হইতে কলেজের প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৩৬ সনের শিক্ষা-সমাজের কার্য্যবিবরণে তাঁহার বেতন পাঁচ শত টাকা বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি এই পদে তিন বৎসরাধিক কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ১৮৩৯ সনের ১লা এপ্রিল হইতে মাসিক ছয় শত টাকা বেতনে কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। রিচার্ডসন কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে তরুবীথিসমন্বিত একটি উদ্যান-বাটিকায় বাস করিতেছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে পাল্কীতে করিয়া কলেজে আসিতেন। অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে কলেজ-সংলগ্ন এখন যেখানে এলবার্ট হল অবস্থিত সে স্থলের বাড়ীতে উঠিয়া আসেন। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার বাড়ীভাড়া বাবদ বেতন বাদে অতিরিক্ত এক শত চল্লিশ টাকা মঞ্জুর করিলেন।*

কলেজে রিচার্ডসনের উপর ইতিহাস, দর্শন এবং সাহিত্য পড়াইবার ভার থাকিলেও তিনি শেষোক্ত বিষয়ই ছাত্রদের বেশী করিয়া পড়াইতেন। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে শেক্‌সপীয়র এবং পোপ ছিল তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। এই দুই বিষয়েই তিনি ছাত্রদের মধ্যেও অনুরূপ প্রীতির ভাব উদ্রেক করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আবৃত্তি ছিল অত্যুৎকৃষ্ট এবং অতুলনীয়। মেকলে তাঁহার শেক্‌সপীয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন,

"If I were to forget everything of India, I could never forget your reading of Shakespeare."

'আমি ভারতবর্ষের সবকিছু ভুলিয়া গেলেও আপনার শেক্‌সপীয়র আবৃত্তি ভুলিতে পারিব না।' রিচার্ডসনের অধ্যাপনা-প্রণালী ছিল অভিনব। তিনি আবৃত্তির সহায়ে দুরূহ বিষয়ও ছাত্রদের কাছে সহজ করিয়া তুলিতেন। এই সকল বিষয় তাঁহার কোন কোন ছাত্র পরবর্ত্তীকালে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। রিচার্ডসনের অন্যতম বিখ্যাত ছাত্র ভোলানাথ চন্দ্র

* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড (৩য় সং), পৃ ৩৮৩।

* "A Professor of English Literature at this Institution from August, 1835, to April, 1839, salary 500. As Principal he receives a house rent free, next the College—140 per month."—*Report* of the General Committee of Public Instruction, p. 51: "Establishment of the Hindu College as on the 30th April, 1842." 'Captain D. L. Richardson'-এর পাদটীকা।

হিন্দু কলেজে শেষ চারি বৎসর (১৮৪৮-৪২) তাঁহার নিকট ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দীকাল পরেও রিচার্ডসনের আবৃত্তি সহায়ে অধ্যাপনার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Both Shakespeare and Pope were taught for my mental stomach at fifteen. But Richardson's excellent reading made them digestible. How shall I describe that reading? Resembling the march of soldiers with a disciplined foot-fall, the rise and fall in the stress of his voice went on smoothing down the difficulties that were slumbling block to my immature capacity, and unravelling the clue of the meaning to its very marrow and core. It proved to be the best commentary and explanation. The elegance, and beauty, and charm of that reading, with the most accurate pronunciation and appropriate emphasis on the most significant words, made an impression which has not yet worn-out in me."

সুন্দর আবৃত্তির দ্বারা দুরূহ বাক্য বা বাক্যাংশগুলির খুঁটিনাটি ভাব এবং অর্থও ছাত্রদের মনে রিচার্ডসন গাঁথিয়া দিতে পারিতেন। ভোলানাথ বলেন, কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণকালে একবার তিনি কোনরূপ প্রশ্নপত্র না দিয়া শুধু তাঁহাদের আবৃত্তি শুনিয়াই পাঠোৎকর্ষ যাচাই করিয়া লইয়াছিলেন।* তাঁহার অধ্যাপনা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুও লিখিয়াছেন,—

"আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডসন (Captain David Lester Richardson) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁহার নিকট আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পরে তিনি বিলাত যান। তৎপরে দুই বৎসর কর সাহেবের (James Kerr) নিকট পড়ি। কাপ্তেন সাহেব ইংরাজি সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্ষপীয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি আশ্চর্য্যরূপে সেক্ষপীয়র বুঝাইয়া দিতেন। হ্যামলেটে যেখানে আছে 'That shows its hoar leaves in the glassy stream' সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গাছের পাতা সবুজ, 'hoar leaves' এই প্রয়োগ কবি কেন ব্যবহার করিলেন? ইহার উত্তর না দিতে পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে পাতার নিম্ন ভাগই জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সে ভাগ সাদা।"†

রিচার্ডসনের আবৃত্তিও খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল বলিয়াছি। ছাত্রেরা যাহাতে ভাল আবৃত্তি করিতে পারে সেদিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাজনারায়ণ এ সম্বন্ধেও বলেন,—

"তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্ব্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, 'Are you going to the theatre today?' তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে কবিতা আবৃত্তি বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থান নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত।...যখন তিনি বিলাত যান, তখন তাঁহাকে আমরা যে অভিনন্দন পত্র দিই, তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেজে সর্ব্বোত্তম আবৃত্তিকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম।"*

কলেজের কার্য্যের অবসরে রিচার্ডসনের সাহিত্যসেবাও সমানে চলিয়াছিল। কলেজে অধ্যাপনা তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চায় বরং সহায় হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ১৮৩৬ সনে তিনি *Literary Leaves* প্রকাশিত করেন। বিলাত হইতে টমাস কার্লাইল পুস্তকখানির অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া ১৮৩৮ সনের ১৯শে ডিসেম্বর তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক গুণপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বড়লাট বেন্টিঙ্কের মত ১৮৩৭ সনে তৎকালীন ডেপুটি গবর্ণরও তাঁহাকে 'এডিকং' নিযুক্ত করেন। ইহার পর শিক্ষা-সমাজের অনুরোধে ১৮৪০ সনের শেষে রিচার্ডসন *Selections from British Poets* নামে একখানি সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত করেন। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "ঐ সংগ্রহের প্রথমে ইংরেজী কবিদিগের জীবনী আছে। তাহা অতি সংক্ষেপ অথচ অতি সুন্দররূপে লিখিত। এই সকল গ্রন্থ এক সময়ে ভারতবর্ষের কৃতবিদ্য সমাজে সর্ব্বজনাদৃত ছিল।"†

দীর্ঘকাল একাদিক্রমে একই স্থলে বসবাস করায় রিচার্ড-সনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশায় ১৮৪২ সনে দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রোপকূলে গমন করেন। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ ফল হইল না। তিনি কিছুকালের জন্য স্বদেশে অবস্থান করাই সাব্যস্ত করিলেন। ইতিমধ্যে কলেজে এমন একটি ব্যাপার ঘটে যাহার বিষয় সংবাদপত্রেও গড়ায় এবং তিনি আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়েন। রিচার্ডসন রাজনীতিতে 'টোরী' বা রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'র অধিবেশন কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংস্কৃত (বা হিন্দু) কলেজের হল-ঘরে যথারীতি হইয়া আসিতেছিল। ১৮৪৩ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে স্থায়ী-সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর পৌরোহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতে ব্রিটিশ

* "মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র" পুস্তকে (পৃ. ২৬২-৮৩) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ *The Calcutta University Magazine*, July 1894 হইতে ভোলানাথের "Recollections of D.L.R." সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

† রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত, পৃ. ২১-২২।

* ঐ, পৃ. ২২-২৩।

† ঐ, পৃ. ২২।

আদালত ও পুলিশ বিভাগের সমালোচনা করিয়া এক বক্তৃতা পাঠ করেন। যখন সমালোচনা বিশেষ তীব্র হইতেছিল তখন রিচার্ডসন ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "I cannot allow the hall to be made a den of treason"—'কলেজ-গৃহকে রাজদ্রোহের আগার করিতে দিব না।' মূল বক্তা, সভাপতি এবং আরও কেহ কেহ তাঁহার এই উক্তির নিন্দাবাদ করায় রিচার্ডসন ইহা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। 'রক্ষণশীল' রিচার্ডসন কিরূপে ভারতবাসীর সেবায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদারচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন আমরা ক্রমে তাহা দেখিতে পাইব।

রিচার্ডসন ১৮৪৩ সনের ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত কলেজ হইতে বেতন গ্রহণ করেন। ইহার পরেই তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রগণ বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র ও একটি প্রীতি-উপহার প্রদান করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রিচার্ডসনের ইচ্ছাক্রমে রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক অভিনন্দন-পত্রখানি পঠিত হয়। কলেজের ছাত্রেরা রিচার্ডসনের প্রতি কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন এবং রিচার্ডসনও যে হিন্দু ছাত্রদের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন—অভিনন্দন-পত্র ও তাহার উত্তর হইতে ইহা সম্যক্ প্রতীত হয়। রিচার্ডসনের উত্তরটি এখানে প্রদত্ত হইল,—

My Friends and pupils,—I am sure you will give me credit for feeling as I ought on this occasion, though I am quite unable to express myself as I ought. The very presentation of your warm hearted address and elegant gift implies that you deem me worthy of it; and I certainly should not be worthy of your gratitude and good will, if I did not thoroughly reciprocate those feelings. If *you* are grateful and cordial—so also am *I*. The task of instruction has been to me a truly agreeable one, for never had a teacher in any country more earnest, more attentive and more able students. In Europe the teacher too often looks with an angry eye on disobedient pupils—the pupils too often see nothing but a tyrant in the teacher. It is very different here. Soon after I joined the college, the students instead of asking me to lessen their labours and my own, very earnestly solicited that I would double the hours of literary study. I was surprised and gratified. Such an unquenchable thirst for knowledge I have never met with, in the youth of any other country, neither have I anywhere else ever seen so clear and cordial an understanding between the teacher and the taught. A teacher's task therefore when he has Hindoo pupils is a peculiarly light and pleasant one, for they are always willing and respectful. It is only necessary for us to point out the road to knowledge—you need never be driven. Entertaining these opinions you may believe me when I say that I part from you all with the most sincere regret, and in the land to which I am going I shall continue to think of the Hindoo college students, with the deepest interest. Your present will serve in my native land as a morning and evening remembrance of the kind young friends I have left upon these shores. I shall always be delighted to hear of the prosperity of this College, and of all who have received an education, within its walls.

I wish you heartily and affectionately farewell.*

রিচার্ডসনের এই সময়কার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন। প্যারীচরণ সরকার, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, জগদীশনাথ রায় প্রমুখ রিচার্ডসনের ছাত্রদের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৩

১৮৪৫ সনে কৃষ্ণনগরে সরকার একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। রিচার্ডসন প্রত্যাবৃত্ত হইলে এই বৎসর ২৮শে নবেম্বর প্রস্তাবিত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কলেজ ও স্কুল পরিচালনার্থ যে লোক্যাল কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়, রিচার্ডসন তাহারও সেক্রেটারী হইলেন। এই সময় স্বনামখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং রামতনু লাহিড়ীও স্কুল বিভাগের শিক্ষক-পদে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। নূতন কলেজের সংগঠন-কার্য্যে রিচার্ডসনের সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজ ১৮৪৬, ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সনের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে রিচার্ডসন হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া সেখানে চলিয়া যান। ১৮৪৮ সনের পূজাবকাশ পর্য্যন্ত সেখানে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন জেম্‌স কার। রিচার্ডসন সরকারের অনুমোদন ক্রমে জেম্‌স কারের সঙ্গে স্বীয় কর্ম্মস্থল পরিবর্ত্তন করিয়া হুগলী কলেজ হইতে হিন্দু কলেজে ১৮৪৮, ২৯শে অক্টোবর চলিয়া আসেন। এই বিষয়টি শিক্ষা-সমাজের বার্ষিক বিবরণে (from *1st May* 1848 to *1st October* 1849, pp. 3 & 4) এইরূপ উল্লিখিত আছে—

During the vacation Mr. J. Kerr, the Principal of the Institution [Hindu College], and Captain D. L. Richardson, the Principal of the Hooghly College, having expressed a desire to exchange appointments, the exchange was recommended by the Council of Education, and sanctioned by Government; and Captain D. L. Richardson took charge of the Hindu College on the 29th October, 1848.

কিন্তু এখানে আসিবার পর হইতেই যত রকমের গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। ক্রমশঃ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন এবং কলেজে আসা-যাওয়ার অনিয়ম সম্বন্ধে নানারূপ গুজব রটে। সরকারী ভাবে ইহার তদন্তও হইল। শিক্ষা-সমাজের তৎকালীন সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এই দুইটি বিষয়ে রিচার্ডসনের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। রিচার্ডসন কৈফিয়ৎ দেওয়া আত্মসম্মান হানিকর বিবেচনা করিয়া একেবারে পদত্যাগপত্র পাঠাইলেন। শিক্ষা-সমাজ কর্ত্তৃক পদত্যাগ-

---

* *Cal. Star*, April 14 and *The Friend of India*, April 20, 1843, pp. 246-7.

পত্র গৃহীত হইল। শিক্ষা-সমাজের পরবর্ত্তী বার্ষিক বিবরণে (১৮৪৯-৫০, পৃ. ১৮৫-৬) এ বিষয়ে এইটুকু মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে—

"There has been no change in the instructive establishment in the past session, Captain D. L. Richardson having resigned the post of the Principal, Mr. E. Lodge was appointed Principal in succession to him."

রিচার্ডসনের পদত্যাগ ব্যাপার লইয়া তখন ছাত্রদের, এমন কি বাঙালী-প্রধানদের মধ্যেও বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। সংবাদপত্রেও বিশেষ বাদানুবাদ সুরু হইল। এই সময় শিক্ষা-সমাজের সভাপতিরূপে বেথুনের সঙ্গে হিন্দু কলেজের হিন্দু অধ্যক্ষগণের ছাত্র ও শিক্ষকরূপে দেশীয় খ্রীষ্টানদের গ্রহণ করা লইয়া বিশেষ মতানৈক্য ঘটে, এবং শেষ পর্য্যন্ত রাজা রাধাকান্ত দেব চৌত্রিশ বৎসর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পর ইহার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। বেথুনের প্রতি বাঙালী-প্রধানদের বিরূপ হওয়ার মূলে এই কারণটি বিদ্যমান ছিল, সন্দেহ নাই। ইহার উপর রিচার্ডসনের মত সুযোগ্য জনপ্রিয় শিক্ষককে কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করাইবার কারণ হওয়ায় তাঁহারা বেথুনের উপর আরও চটিয়া গিয়াছিলেন। রিচার্ড-সনের পদত্যাগের অল্প দিন পরে, ১৮৪৯ সনের ১৪ই নবেম্বর তাঁহারা রমানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদানার্থ একটি সভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন।* রিচার্ডসনকে প্রকাশ্যে সম্মান প্রদর্শন সরকারী নিয়মে আটকাইত। হিন্দু কলেজের প্রায় কুড়ি জন উৎকৃষ্ট ছাত্র নিজেদের স্বাক্ষরে সংবাদ-পত্রে শিক্ষা-সমাজের প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করিয়া এক-খানি পত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। বেথুন সাহেব সংবাদ-পত্রে জবাব না দিলেও পরবর্ত্তী ২৪শে জানুয়ারী (১৮৫০) অনুষ্ঠিত সরকারী বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কারবিতরণী সভায় এই কার্য্যের জন্য ছাত্রদের ভর্ৎসনা করিলেন। তিনি পত্রোক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, শিক্ষা-সমাজ হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষকে অভিনন্দন-পত্রাদি প্রদানে প্রতিবন্ধক হন নাই; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাংলা গবর্ণ-মেণ্টই এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, বিদায়ী কোন সরকারী কর্ম্মচারীকেই অন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা সমষ্টিগত ভাবে বিদায়-অভিনন্দন জানাইতে পারিবে না। সরকারী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের পক্ষেও ইহা সমানে প্রযোজ্য।*

৪

রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মেট্রো-পোলিটান একেডেমি (প্রতিষ্ঠাকাল ১লা এপ্রিল ১৮৪৯) নামক একটি বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হন। বিদ্যা-লয়ের অধ্যক্ষ গোবিন্দচন্দ্র দের সহিত উহার দ্রুত ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি প্রসঙ্গের আলাপনে এই বিষয় জানিয়া 'সম্বাদ ভাস্কর' ১৫ নবেম্বর ১৮৪৯ তারিখে লেখেন,—

"অধ্যক্ষ কহিলেন হিন্দু কালেজ হইতে অনেক ছাত্র আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের আগমনের এক কারণ উক্ত কালেজের দুইজন প্রধান শিক্ষক কাপ্তান রিচার্ডসন সাহেব ও মণ্টেগ্র [?] সাহেব এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতেছেন, হিন্দু কালেজের নীচস্থ বালকেরা মাসিক পাঁচ টাকা দিয়াও যাঁহারদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন নাই মিটরো-পোলিটিক্যাল* একাডেমিতে মাসিক এক টাকা দুই টাকা দানে ঐ দুই প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন…।"

এই প্রসঙ্গে ভাস্কর-সম্পাদকের মন্তব্যটিরও কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি। ইহা হইতে তখনকার সাধারণ ইংরেজ-চরিত্র সম্বন্ধে কতকটা ইঙ্গিত মিলিবে। সম্পাদক শেষে লেখেন,—

"আমরা ইহাও বলিতেছি মিটরোপোলিটিক্যাল একা-ডেমিতে উক্ত সাহেবদ্বয়ের স্থায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, কাপ্তান রিচার্ডসন এবং মণ্টেগ্র সাহেব হিন্দু কালেজ হইতে বহির্ভূত হইয়াছেন, সেই রাগে এই নবীন বিদ্যালয়ে পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহারদিগের ঐ রাগ শান্তির কোন উপায় প্রাপ্ত হইলে আর এস্থানে আসিবেন কিনা বলা যায় না, সাহেব জাতির প্রতিজ্ঞা প্রায় থাকে না, লাভের পথ পাইলে অনায়াসে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেন অতএব ছাত্রেরা ইহাও বিবেচনা করিবেন, বরং উক্ত সাহেবদ্বয় এই বিদ্যালয়ে কতকাল থাকিবেক ইহার এক প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইয়া লইলে উত্তম কর্ম্ম হইবেক।"

'সম্বাদ ভাস্করে'র আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইল। রিচার্ডসন বরাবর হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গেই যুক্ত রহিলেন। তিনি মেট্রোপলিটান একাডেমিতে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৫০, এপ্রিল মাসে এই বিদ্যালয়টি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণ আঢ্য ক্রয় করিয়া লন। তখন তিনি ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অন্যতম শিক্ষক গুরুচরণ দত্ত ১৮৫১ সনের ৭ই আগষ্ট বটতলায় ডেভিড হেয়ার একাডেমি প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। রিচার্ডসন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে তিন বৎসরকাল কার্য্য করিয়া এই বিদ্যালয়ে ১৮৫৩ সনের এপ্রিল মাসে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে বৃত হন।† পরবর্ত্তী মে মাসে

* 'সম্বাদ ভাস্কর', ১৫ নবেম্বর ১৮৪৯।

* *General Report of the Committee of Public Instruction for the Lower Provinces of Bengal for 1849-50*, p. 234.

* নামটি এই তারিখে বার বার এইরূপ ভুল মুদ্রিত হইয়াছে।

† এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭০৪ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ কথা পরে বলিতেছি।

হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের পর রিচার্ডসন আরও দুইটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (পরে, মহারাজা) গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় 'বেঙ্গল হরকরা' সম্পাদনের গুরুভারও তিনি গ্রহণ করেন। ১৮৫২ সনে রিচার্ডসনের এই পুস্তকখানি বাহির হইল: *Literary Recreations or Essays, Criticism and Poems chiefly written in India.*

রিচার্ডসন সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র ও সাহিত্য-সেবার ভিতর দিয়া লোকহিতে মন দিলেন এই মাত্র বলিয়াছি। ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার মমত্ববোধ ক্রমে সাধারণে বুঝিতে পারিল। হিন্দু কলেজ পরিচালনা লইয়া শিক্ষা-সমাজ এবং ইহার হিন্দু অধ্যক্ষগণের মধ্যে কিছুকাল যাবৎ মনকষাকষি চলিতেছিল। কলেজের উপর সরকারী কর্তৃত্ব এতখানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, ছাত্রদের ভর্তি করায়ও তাঁহারা আর হিন্দু অধ্যক্ষগণের মতামত গ্রাহ্য করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না। তাঁহারা ১৮৫৩ সনের প্রথমে হীরা বুলবুল নামে এক গণিকার পুত্রকে কলেজে ভর্তি করিলেন। ইহা লইয়া হিন্দু সমাজে জোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দু-প্রধানেরা হিন্দু কলেজে নিজ সন্তানদের পাঠানো আত্ম-মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া গণ্য করিলেন। এই সময় প্রধানত: কলিকাতা ওয়েলিংটনস্থ দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্রনাথ দত্তের চেষ্টা-উদ্যোগে মান্যগণ্য হিন্দুদের সহায়ে ১৮৫৩ সনের ২রা মে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।* ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের সাহায্যলাভে হিন্দুগণ প্রথম হইতেই সমর্থ হইলেন। ঐ দিনে কলেজের যে উদ্বোধন-সভা হয় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন সুবিখ্যাত আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু)। রিচার্ডসন ছিলেন এই দিনের প্রধান বক্তা। তিনি বক্তৃতায় এরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। এই বিদ্যাগারটি তৎকালীন অন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী না হইয়া যে পরিপূরক রূপে কার্য্য করিবে তাহা বলিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ আমাদের জাতীয় শিক্ষার পীঠস্থান হইবে, তিনি এই আশাও প্রসঙ্গত: ব্যক্ত করিলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্ক-বাগীশও ('গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য') এই সভায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই দিন কলেজের অধ্যক্ষ-সভাও গঠিত হইল। রাণী রাসমণির দশ হাজার টাকা দানের উল্লেখও এই সভায় করা হয়।† গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং একাডেমী এবং মতিলাল শীলের ফ্রি কলেজকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দু মেট্রো-পলিটান কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইল।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রথম হইতেই হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ-পদে বৃত হইলেন। সে যুগের কয়েকজন খ্যাতনামা ইংরেজ শিক্ষকও এখানে আসিয়া জুটিলেন। বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন বিখ্যাত বাংলা নাটক-রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন ('নাটুকে রামনারাণ')। বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চ্চা এবং বাংলা সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে তিনি ২২শে অক্টোবর, ১৮৫৩ দিবসে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নিকট যে ভাষণ প্রদান করেন তাহা সে সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করে। কলেজের কোন কোন ছাত্র বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য চর্চ্চায়ও পরে অবহিত হইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রমুখ বিখ্যাত অধ্যাপকগণের শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া তৎকালীন সরকারী, বেসরকারী ও মিশনরী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রেরাও এখানে আসিয়া ভর্ত্তি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কয়েক মাসের মধ্যে ইহার ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় এক সহস্র। উমেশচন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণমোহন মল্লিক কলেজের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত থাকিয়া ইহার পরিচালনায় বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। রিচার্ডসনও কলেজের কার্য্যে তনুমন ঢালিয়া দিলেন। মাত্র নয় মাসের মধ্যে যে কলেজের এত দ্রুত উন্নতি হইতে পারিয়াছিল তাহার মূলে রিচার্ডসনের কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কৃতিত্বের স্মারক-স্বরূপ একটি চেন ঘড়ি দেওয়া সাব্যস্ত করেন। তাঁহা-দের পক্ষে সম্পাদকদ্বয় ১৮৫৪ সনের ৩১শে জানুয়ারী একখানি পত্র লিখিয়া রিচার্ডসনকে ইহা প্রেরণ করিলেন। ইহার উত্তরে রিচার্ডসন ঐ দিনেই সম্পাদকদ্বয়কে একখানি পত্র লেখেন। পত্রোক্ত কোন কোন বিষয় আজিও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে যে হিন্দুদের ভাবনা, উদ্যোগ এবং অর্থ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে—তাহা তিনি ইহাতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। রিচার্ডসনের পত্রখানির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"With respect to this Hindu Metropolitan College —This great national institution—I rejoice to be able to assert truly that its foundation owes nothing to foreign suggestion or foreign money. Its origin is due exclusively to native enterprize. It was no suggestion of mine or any other European. The scheme had been matured before I had heard a word upon the subject, and when you offered me Principalship, you had already engaged the services of other teachers. All the Native gentlemen who had a hand in the foundation of this new flourishing institution deserve the gratitude

* হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত আমি 'বাঙলার শিক্ষক' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

† *The Hindu Intelligencer*, May 16. 1853 সংখ্যায় সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

of their country, but permit me to say, the Dutt family in particular must always occupy an Honorable place in the history of this monument of Hindu energy, patriotism and philanthropy. In spite of innumerable obstacles and the evil prognostication of ungenerous enemies and faint hearted friends, Baboo Rajendro Dutt, (zealously supported by his nearest relatives) went to work with a courage, enthusiasm and determination that resembled what are usually regarded as amongst the best characteristics of the European mind. This College has only been opened a few months, and yet it numbers a thousand paying students on its rolls, looks as if it would endure for centuries, and communicate to the people of Bengal a vast amount of intellectual and moral good when all who are now connected with it shall have passed into another world.

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া শিক্ষা-সমাজ কতকটা হকচকিয়া গেলেন। তাঁহারা হীরা বুলবুলের পুত্রকে কলেজ হইতে বিদায় দিলেন, উপরন্তু হিন্দুদের মনস্তুষ্টির জন্য নানা উপায়ও অবলম্বন করিতে লাগিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া ছাত্র-বেতনও তাঁহারা কমাইয়া দিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বিরুদ্ধ ভাব অনেকটা বিদূরিত হইল। ১৮৫৬-৫৭ সনে দেখি, শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্পেকটর হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা লইতেছেন। কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসনও সরকারী কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ—প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলে শেষোক্তটির সঙ্গে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের মিলনের কথা উঠে। কিন্তু তাহা কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ছাত্রদের পাঠোৎকর্ষে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাংলা সাহিত্য চর্চ্চার উৎসাহদানের জন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বাংলা রচনাকারীকে পদক এবং পুরস্কার দিবারও ব্যবস্থা করিলেন। রিচার্ডসনের ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা এই কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরবর্ত্তী কালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, যদুনাথ ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫

রিচার্ডসন যে শুধু কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যেই রত ছিলেন তাহা নহে, তিনি এই সময় সংবাদপত্র-সম্পাদনাও রীতিমত করিয়া আসিতেছিলেন। দীর্ঘকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। তিনি ১৮৫৭ সনের এপ্রিল মাসে পুনরায় স্বদেশে গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আশু বিলাত-যাত্রার কথা শ্রবণে ১৮৫৭, ১৫ এপ্রিল তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যে মন্তব্য করেন, একটু দীর্ঘ হইলেও এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আমরা শ্রবণ করত: সাতিশয় অনুতাপিত হইলাম যে বিখ্যাত সুকবি ও পরম পণ্ডিতবর সুলেখক শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব, চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে স্বদেশ গমনের অভিপ্রায় ধার্য্য করিয়াছেন। কাপ্তেন সাহেব এদেশে অবস্থান কালে সাধারণের কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছিল তাহা আমরা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন পূর্ব্বক এদেশের কত ব্যক্তি সুলেখক ও কবিতা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কত ব্যক্তি ইউরোপীয় কবিকদম্বের লিখিত ভাব, রস ও তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ স্বভাব পরিধারণ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। তিনি যখন হিন্দু কালেজ ও হুগলী কালেজ ও কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সিপালের পদে অভিষিক্ত ছিলেন সেই সময়ে ঐ কালেজত্রয়ের সুখ্যাতি জ্যোতি: বিকীর্ণ ছিল, মৃত মহাত্মা বীটন সাহেব অবিবেচনাপূর্ব্বক কাপ্তেন সাহেবের সহিত বিবাদ করাতে তিনি আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের শিক্ষালয়সমূহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছেন, কিন্তু তিনি পরিত্যাগ করণাবধি গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত কালেজের সুখ্যাতি ক্রমে হ্রাস পাইয়াছে।

"কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের স্থাপিত যে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন তত্তাবতেরই ছাত্রেরা···নিয়মমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ তাঁহার সংযোগে অতি প্রধানরূপে গণ্য হইয়াছে, অতএব তাঁহার বিলাত গমনে ঐ কালেজের ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত নিরানন্দজনক বলিতে হইবেক।

"কাপ্তেন রিচার্ডসন যে কেবল বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হইয়া এদেশের উপকার করিতেছেন এমত নহে, সম্পাদকীয় কার্য্যেও তাঁহাকে একজন অগ্রগণ্য রূপে মান্য করিতে হইবেক, তিনি লেখনী ধারণ পূর্ব্বক বাঙ্গাল হরকরা ও লিটরেরি গেজেট পত্র সম্পাদন করিতেছেন, এবং তাহাতে ঐ উভয় পত্রের যে প্রকার সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত হইয়া থাকিবেন। কাপ্তেন সাহেব যখন যে বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তিনি পীড়িত শরীরেও এক দিনের নিমিত্ত লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করেন নাই, সাধারণের উপকারার্থ পরিশ্রম করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়াছেন।···"

ছাত্র-বন্ধু রিচার্ডসনের বিলাত গমনের সংবাদে কলেজের ছাত্রেরা বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা রিচার্ডসনের গৃহে ১৮৫৭, ২২শে এপ্রিল একটি সভায় সমবেত হইয়া তাঁহাকে একখানি বিদায় অভিনন্দন-পত্র এবং স্মারক চিহ্নস্বরূপ একটি ঘড়ি ও একটি কলম-দান প্রদান করিলেন। ছাত্রদের পক্ষে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন পরবর্ত্তী কালের সুবিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল। সাধারণের পক্ষে রিচার্ডসনের পূর্ব্বতন ছাত্র গৌরদাস বসাকও একখানি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। কলেজের শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে অভিনন্দন-পত্র

প্রদান করেন উইলিয়ম মাষ্টার্স। কলেজের অধ্যক্ষগণ এবং গণ্যমান্য হিন্দু-প্রধানেরা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে রিচার্ডসন যে বক্তৃতা দেন তাহা আজিও আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। দেশ ধর্ম্ম বা বর্ণের বিভেদ যে কৃত্রিম তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,—

"Our creeds are widely different—our countries are far apart—divided by a world of waters—but we are all the sons of the same Great Father who looks upon us all with equal eye and who bids us love one another—and so we *can*.

One touch of nature makes the whole world kin."*

ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার কিরূপ প্রীতির সম্পর্ক ছিল বক্তৃতায় তাহারও উল্লেখ করিলেন। তাহাদের মনে সাহিত্যানুরাগ উদ্রেকেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন বলেন,—

"More docile, more affectionate, more industrious or more brilliant pupils no teacher could desire. They cannot but do honour to an able instructor if the instructor be true to himself, and use his best exertions and make his duty a labour of love. But I am not only delighted to find that I have won the affections of my pupils. It is also pleasant to me to remember that I have taught them to regard a liberal education as a source of happiness and refinement—to love literature *for its own sake*. I have taught them that the treasures that can be stored up in the small space of a single human skull are more precious and far more secure than those which could be locked up in a thousand iron chests. The riches of the mind are more truly ours than heaps of silver or gold. The riches of the coffer often make unto themselves wings and flee away, but the riches of the mind are a permanent blessing. A rupee is a good thing and a solid one, but a fine thought or a virtuous feeling is better, for it cannot be taken from us by tyranny, or knavery or misfortune. . . . The legacy which a great intellect leaves us, cannot be squandered. The more it is used the better. Intellectual wealth is increased not lessened the more it is diffused or divided. I have rejoiced that you have learnt that literature is its own exceeding great reward."*

রিচার্ডসন কলিকাতার বিখ্যাত 'ফিনিক্স' সংবাদপত্রের লণ্ডন-সংবাদদাতা হইয়া যান। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার ছাত্রদের সঙ্গে যে পত্র-ব্যবহার করিতেন তাহার প্রমাণ আছে। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি পত্রের উত্তরে ১৮৫৮, ২২শে আগষ্ট তারিখে তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দত্ত-পরিবারের আর্থিক বিপর্য্যয়ের সংবাদে এবং কলেজের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। রিচার্ডসন বিকলাঙ্গ হওয়ায় সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনমত কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এতদিন তিনি ইহার অঙ্গীভূত ছিলেন। এই পত্রখানি হইতে জানা যাইতেছে, তিনি এতাদৃশ পদ হইতেও অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে যৎসামান্য 'ইন্‌ভ্যালিড' বা বিকলাঙ্গ হওয়ার দরুন যে পেন্সন পাইতেছিলেন তাহা আজীবন পাইবেন। তিনি আরও লেখেন যে, সৈন্যবিভাগ হইতে পদত্যাগ করিলেও ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে তাঁহার কোন বাধা নাই।

* *The Bengal Hurkara and India Gazette*, April 24, 1857.

৬

বিলাতে দুই বৎসর থাকিয়া রিচার্ডসন পুনরায় ১৮৫৯ সনে ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। বাংলার তৎকালীন ছোটলাট সার জন পিটার গ্রাণ্ট তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার এই পদে নিয়োগের কয়েক মাস পরেই ভারত-সচিব ইহাতে বাদ সাধিলেন। তিনি এই যুক্তি দেখাইয়া এই নিয়োগ সম্পর্কে আপত্তি জানান যে, রিচার্ডসন সরকার হইতে 'বিকলাঙ্গ' পেন্সন পাইতেছেন, তাঁহাকে নূতন করিয়া কোন সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত করা চলিবে না। রিচার্ডসনকে অগত্যা অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিতে হইল। তিনি ১৮৬১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে চিরতরে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যান। এই মাসের ৫ই তারিখে গুণমুগ্ধ প্রাক্তন ছাত্রগণ তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন তো দিলেনই, তদুপরি শ্রদ্ধাপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে এককালীন চারি হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দিলেন। ছাত্রদের অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে এবারেও তিনি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। হিন্দুদের নিকটে যে তিনি কত ঋণী বক্তৃতার এক অংশে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে,—

"His Honour the Lieutenant-Governor was lately pleased to state in a public document that I was known as an earnest labourer in the cause of Indian education long before it was so popular and well-cared for as it is now. I was the first Principal of a College ever appointed in India, and then it was not by the Government but by a Committee of Natives. Lord, then Mr., Macaulay, though President of the Council of Education, could only recommend me to the Natives—which he did most generously—but it was the Natives who elected me from very many candidates—and this, perhaps, is not forgotten, though it happened exactly a quarter of a century ago. I have still in my possession Mr. Macaulay's reply to the application for my appointment. It is to the Natives then that I owed my first appointment as Principal of a College; Macaulay, you see, generously encouraged at the rising of the curtain; and you have kindly cheered me at the fall of it."*

* *The Calcutta Review*, January, 1906. "Captain David Lester Richardson." By S. C. Sanial.

বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে সার জন উইলিয়ম কে কর্ত্তৃক *Allen's Ov rland Mail* ও *Homeward Mail* সম্পাদনায় তাঁহার সহকারী রূপে রিচার্ডসনকে নিযুক্ত করেন। এই কে সাহেব এক সময় রিচার্ডসনের 'ক্যালকাটা লিটারেরী গেজেটে' লেখা মক্স করিতেন। তিনি পরে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'র সম্পাদক এবং সিপাহী যুদ্ধের ইংরেজী ইতিহাসকার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। *Saunder's and Oti e's Orient l Budget* নামে একখানি সংবাদপত্রও রিচার্ডসন সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ('হিন্দু পেট্রিয়ট'—১৪ এপ্রিল ১৮৬২)। *Court Circu'ar* নামে একখানি সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ইহার সম্পাদনায়ও তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন ইহার পর একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। 'সম্বাদ প্রভাকর' (১০ মে, ১৮৬৫)-এর মতে তিনি ১৮৬৫, মে মাসে কলিকাতা হইতে স্বদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। এই সনের ১৭ই নবেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। রিচার্ডসনের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র রাজনারায়ণ বসু আত্ম-চরিতে (পৃ. ২৩) লিখিয়াছিলেন, "তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয় বলিতে পারি না—তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না—কিন্তু তথাপি হয়।" নিজের ব্যক্তিগত দোষত্রুটি সত্ত্বেও যে শিক্ষক ছাত্রের মনে তৎপ্রতি এইরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা স্থায়ী ও অটুট রাখিতে পারেন তিনি সকলের নমস্য। রিচার্ডসনের মৃত্যুর পচাশী বৎসর পরেও তাঁহার কৃতির কথা স্মরণ করিয়া আমরা নিজেদের ধন্য বোধ করি।

ব্যর্থ সাধনা

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

কুশ্রীতার রথযাত্রা! পথে পথে মেলা বসে তার,
মেঘাবৃত অমানিশা নামে লয়ে গাঢ় অন্ধকার।
দেবতা বিদায় নিয়ে অন্তর্হিত দিগন্তের ভালে,
শূন্য বেদীমূলে তাই কেহ নাহি সন্ধ্যা-দীপ জ্বালে।
নির্ব্বাপিত ধ্রুবজ্যোতিঃ, জ্যোতিষ্কের নাহি অবশেষ,
জননীর দ্বারপ্রান্তে সন্তানেরে বলি দেয় দ্বেষ।

শুনিলাম কণ্ঠে কণ্ঠে নব যুগ এলো আজি দ্বারে,
পূরব গগনে চাহি নতি আমি জানালেম তারে।
ব্যর্থ মোর সে প্রণাম, ব্যর্থ হোলো জীবন-স্বপন,
মানবের কণ্ঠ রোধি' দানবের নির্ম্মম চরণ
দেখা দিল ক্রূর হেসে! এরি তরে এত আয়োজন,
এত ত্যাগ, এত প্রেম, জীবনের সব সমর্পণ!

ব্যর্থতার কূলে বসে চেয়ে থাকি একা—
হে সুন্দর, হে শাশ্বত, এ কি বেশে দিলে আজ দেখা!
সত্যে অনুরাগ নাই, নাই শ্রদ্ধা, নাই ভালবাসা,
স্বার্থ নিয়ে রেষারেষি, বুকে বিষ, শাঠ্যে ভরা ভাষা;
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে গড়িবারে বুকে-হাঁটা প্রাণী
ছলা-ভরা কলা-জালে দিকে দিকে চলে কানাকানি।

এ কি আজ জাগরণ, এরি তরে আগমনী গান
গেয়ে গেল কবি যারা, বীর যারা দিয়ে গেল প্রাণ!
বীণাপাণি বীণা হাতে স্বপ্নে মোর বাজাইল বীণ,
আশার কুহকে ভুলি' জপিলাম ব্যর্থ এত দিন।
সুধা-পাত্র লয়ে দেবী আসে নাই, উঠেছে গরল,
পঙ্কিল সাগরে ওঠে তরঙ্গের ঘৃণ্য কোলাহল।

শ্মশান সৃষ্টির লাগি' আয়োজন দেবীর দেউলে,
হোমাগ্নি নিভিয়া যায়, দাবানল জ্বালায় বাতুলে।
বাণীর বীণার তন্ত্রী ছিঁড়ে ফেলে তোলে অট্টরব;
রুধির-লালসাময়ী বিভীষিকা নাচিছে তাণ্ডব;
অন্ধকার প্রান্তরের প্রান্তে বসি' শকুনি শিবায়
ভোজের প্রাচুর্য্যে মাতি' মদমত্ত জয়-গান গায়।

অবশেষে এই পথে উৎসবের জয়-যাত্রা রথী!
কুশ্রীতার উপচারে দেবতার করিবে আরতি?
ঘৃণ্য যাহা বরেণ্য তা—এই বাণী মূর্ত্ত হবে আজি?
পঙ্ক-স্রোতে অবগাহি' এ কি বেশে দেখা দিলে সাজি'?
জাগিয়া নয়ন মেলি' যারে আমি ভালবাসিলাম
দলিত সে চক্রতলে নিপীড়িত প্রথম প্রণাম!

দিগন্তের প্রান্ত হ'তে ভেসে-আসা অনন্ত আহ্বান
আমি যে শুনেছি রাতে, কণ্ঠ মোর গাহিয়াছে গান
আমার একেলা কোণে। মৃৎ-পাত্রে সন্ধ্যা-দীপ সম
বন্দনার নতি-ভরা, দেখেছি যে হে সুন্দরতম,
আঁধার পাথার মাঝে বিচ্ছুরিত একটু আলোক—
শীর্ণ-শিখ কম্প্র দীপে পূর্ণিমার পরম পুলক।

সে কি মিথ্যা, সে কি মিথ্যা? সত্য হবে হাহাকার শুধু?
অন্তহীন আঙ্গিনায় পড়ে রবে মরুভূমি ধূ ধূ?
কুশ্রীতার শত ফণা উগারিবে বিষ সর্ব্বনাশা?
ব্যর্থ হয়ে মরে যাবে অমৃতের দুরন্ত পিপাসা?
অন্ধকার কারা-কক্ষে জন্ম লভে শিশু ভগবান—
সে কি মিথ্যা? তার লাগি' কোন কণ্ঠ গাহিবে না গান?

বনচারিণী

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

ঘটনাটি দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যের সীমান্তে, প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ঐতিহাসিকদের বিবরণে বিবৃতিটি বাদ পড়ায় লিখিতে বাধ্য হইলাম। বক্তব্য বিষয় ঐতিহাসিক-দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হইলে ঘটনাচক্রকে দায়ী করিতে হইবে।

বসন্ত সমাগমে, বনফুলের মধুর গন্ধ মৃদু সমীরণস্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। স্বচ্ছ কুহেলিকার অন্তরালে বনস্পতি ঈষৎ চঞ্চল, যেন বনলতার গাঢ় আলিঙ্গনকে অধিকতর ঘনীভূত করিয়া লইতে চায়। জ্যোৎস্নালোকে বনভূমি ভয়াল ও সুন্দরের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে—উভয়ই আপন রূপে আত্মহারা, আবেষ্টনী রহস্যপূর্ণ।

প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই যুবরাজ মল্লরাও উচ্চ টিলার উপর বসিয়াছিলেন। অরণ্য বেষ্টন করিয়া যে শৃঙ্গার-রসের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার সহিত যুবরাজের চিত্ত মিল খুঁজিতেছিল। গোপন কথার সূত্র অনুসন্ধানের নিমিত্তই তিনি মৃগয়ার শিবির হইতে দূরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিলেন, ভয়ালকেই সুন্দর দেখিতেছিলেন।

টিলার পাদমূলেই নিবিড় বনানী, তাহারই ছায়ায় গতিশীল সন্দেহের বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, যুবরাজ শরসন্ধান করিলেন। অঙ্গসঞ্চালনে অনুভব করিলেন জানু দুইটি জড়বৎ হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল নিশ্চল অবস্থায় একই স্থানে বসিয়া থাকায়, রক্ত চলাচলের স্বাভাবিক গতি রোধ হইয়াছিল, তদুপরি দেখিলেন বাম জানুর কিয়দংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে—বর্ণও সচল, বিস্ময়কর দৃশ্য। পরীক্ষা করিতে বাহির হইল, মসীকালো পিপীলিকার বাহিনী একত্রিত হইয়া গত কালের উন্মুক্ত ক্ষতের উপর নির্ব্বিবাদে নরমাংস আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। সহস্র সহস্র হিংস্র কীটের ভোজন-সম্মেলন, তাড়াইলেও পালাইতে চায় না। বহু চেষ্টায় পরিত্রাণলাভের পর রক্তস্রাব রোধ করিবার নিমিত্ত রুমাল দ্বারা দংশনের স্থানটি ঢাকিতে যাইতেছিলেন। যথাস্থান স্পর্শ করায় বুঝিলেন ক্ষত গভীর হইয়া গিয়াছে, এত গভীর যে স্বচ্ছন্দে একটি আঙ্গুল গহ্বরে ঢুকিয়া যায়।

নিজের প্রতি ধিক্কার আসিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন মৃগয়াস্থলে এইরূপ অন্যমনস্কতার সংবাদ পাইয়াও নরভুক শার্দ্দূল কেন যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, আশ্চর্য্যের বিষয়।

সন্দেহের স্থানটি প্রখর দৃষ্টির ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রসিক ব্যাধের স্তরে নামিয়া আসায় যুবরাজ ভিন্ন জীব হইয়া গিয়াছিলেন। হিংস্র পশুর মতই সন্দেহকে সাথী করিয়া, প্রতিটি পদবিক্ষেপ সংযত করিতে-ছিলেন। গমনকালীন কটিদেশের তরবারির খাপ প্রতি-নিয়ত শিলার সহিত সংঘর্ষিত হইতেছিল। অস্বস্তিকর শব্দে বিরক্ত হইয়া স্বগত বলিয়া ফেলিলেন,—এতগুলি অস্ত্রে সুসজ্জিত হইলে শিকারীকেই শিকার হইতে হয়। এই অবস্থায় কোন জন্তু নিকটে আসিয়া পড়িলে আত্মরক্ষাও অসম্ভব। বীরের রাজসিক শোভা তাঁহার নিকট বিড়ম্বনা হইয়া উঠিল। নিরুপায় হইয়াই তরবারিসহ কটিবন্ধ খুলিয়া ফেলিলেন। লঘুভার হইয়া মাত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, দেখিলেন, বিশাল শার্দ্দূল, অতি নিকটেই বৃক্ষচ্ছায়ার তলদেশ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহার গতি শিকারান্বেষীর নহে, পদক্ষেপ পলাতকের, যেন কোন দ্বন্দ্বে বিতাড়িত হইয়া নিরাপদ স্থান খুঁজিতেছে।

তূণ হইতে তীর সংগ্রহ করিয়া, সবে ধনুকের সহিত যোজনা করিয়াছেন, এমনি সময় শার্দ্দূল হুঙ্কার দিয়া শূন্যে লাফাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই আর একটি জীব তীরবেগে বাঘের দিকে ছুটিয়া গেল—বরাহ বাঘকে আক্রমণ করিয়াছে, বীরের সম্বর্দ্ধনায় বীর আসিয়াছে, মল্লযুদ্ধ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এমতাবস্থায় কোন্‌টিকে মারা সঙ্গত, যুবরাজ স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, অকস্মাৎ বাঘ ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। বরাহ এইবার যুবরাজের দিকে ফিরিয়াছে, ভয়াল রূপ, চলিতে চলিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া যাইবার ভঙ্গী দেখিয়াই যুবরাজ বুঝিয়াছিলেন, এই মুহূর্ত্তে তীর না চালাইলে, বধ্য ও ব্যাধের মাঝে ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইবে। কালক্ষেপ না করিয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন। ত্রিফলা তীর বায়ুবেগে বরাহের মাথা বিদ্ধ করিয়া দিল। ফল হইল বিপরীত। অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়াও প্রবল পরাক্রমশালী দাঁতাল যুবরাজের দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। যুবরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন, অন্য শর তূণের ভিতরেই রহিয়া গেল। পুনরায় অস্ত্র প্রয়োগের সময় পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। বরাহ কয়েক হাতের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। অতি নিকটে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিয়া যুবরাজ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাংসল ভারী ওজনের পতন শব্দ শুনিলেন ঠিক তাঁহার পদ-তলে অথচ তাঁহার দেহে এতটুকুও আঘাত লাগিল না। চক্ষু উন্মীলিত করিতে দেখিলেন যূপকাষ্ঠে বধ্য জানোয়ারের মতই প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বে যাতনার নির্দ্দেশ দিয়া বরাহ অসাড়

হইয়া গেল। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে যুবরাজ আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সান্ত্বনা স্থায়ী হইল না। বরাহের মাথায় বিদ্ধ তীর ছাড়া আর একটি অস্ত্র দেখা যাইতেছে; হৃদয়ের কেন্দ্রে সূচ্যাকার বল্লম, বরাহকে একদিক দিয়া বিদ্ধ করিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া গিয়াছে।

যুবরাজ রোষে আত্মসংযম হারাইলেন। কাহার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তাঁহার শিকারে ভাগীদার হইতে চায়? আদেশ করিলেন, কে আমার শিকারে বল্লম চালাইয়াছ, শীঘ্র বাহির হইয়া আইস অন্যথায় কঠোর দণ্ড ঘোষিত হইবে।

উত্তর যাহা আসিল তাহা বামা কণ্ঠের হাসি—অবজ্ঞার হাসি, তাহার পরেই শুনিলেন শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনি। শব্দ দ্রুত অরণ্যের গভীরতার দিকে চলিয়া যাইতেছে। যুবরাজের আদেশ লঙ্ঘন, তাহার উপর অবজ্ঞার হাসি, মল্লরাওয়ের আত্মাভিমানে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল—পলাতকের গতি অনুমান করিয়া তীর চালাইয়া দিলেন। ঈপ্সিত স্থানেই তীর গিয়া আঘাত করিল, সঙ্কেত পাইলেন করুণ আর্ত্তনাদে। নারীর কাতর স্বরে যুবরাজ সচকিত হইয়া উঠিলেন, কালক্ষেপ না করিয়া জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার মস্তিষ্কে বাতুলতার ক্রিয়া সুরু হইয়াছে। যে স্থানে দিবালোকের প্রবেশপথ রুদ্ধ সেই গভীর অরণ্যে তিনি কিসের সন্ধানে চলিয়াছেন? স্থির চিন্তায় অসম্ভবকে সফল করার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যের বাহিরে আসার জন্য ফিরিলেন। বাহিরে আলোর দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই অগ্রসর হইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, কেহ তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। পদবিক্ষেপ মানুষের মত, নিঃসন্দেহ হইবার নিমিত্ত চলা হঠাৎ থামাইয়া দিলেন, অনুসরণও সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। আবার আগাইতে লাগিলেন, পুনরায় অনুসরণকারীও চলিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া জঙ্গলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন, কখনও এই জাতীয় অসুবিধার সহিত পরিচয় হয় নাই। যুবরাজ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন, মনে হইতে লাগিল তিনি অলৌকিক শক্তির কবলে পড়িয়া গিয়াছেন—অদৃশ্য অনুসরণকারী তাঁহাকে অজানা অনিশ্চিতের পানে টানিতেছে। অস্বাভাবিক প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি নিজের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। লোকালয়ে এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে কেহ দেখিলে বাতুল বলিয়া মনে করিত।

আপন মনে কথা বলিতে বলিতে আরও খানিকটা অগ্রসর হইলেন। অনুসরণকারীর আর কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য নিজের কাছেই লজ্জিত হইলেন। জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পড়ার দরকার ছিল, কিন্তু যে আলোক এতক্ষণ বাহিরের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল তাহা অপসারিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার, স্থানে স্থানে চন্দ্রালোক তীক্ষ্ণধার বল্লমের ফলার মত উপর হইতে পত্রাবরণ ভেদ করিয়া মাটিতে বিদ্ধ হইয়া আছে, আলো জ্যামিতিক সরল রেখার মতই নিরেট ও সোজা। ছটার বিস্তার অত্যন্ত স্বল্প পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। দৃষ্টিকে নিঃসন্দেহ করিতে হইলে, বেশ খানিকক্ষণ লক্ষ্য-বস্তু নিরীক্ষণ করিতে হয়। যুবরাজ ঐটুকু আলোর উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে লাগিলেন। কয়েক পদ মাত্র গিয়াছেন, পিছন হইতে কেহ সাবধান করিয়া দিল, "আর অগ্রসর হইও না, রাজ গোক্ষুরা নূতন রাণীর সন্ধানে বাহির হইয়াছে।"

সতর্কতার বাণী থামিয়া গেল; বনভূমি নিস্তব্ধ, বায়ুর গতি প্রায় নিশ্চল, নিকটেই কোন স্থান হইতে গলিত মাংসের পূতিগন্ধ আসিতেছে—নিশ্চয় বাঘের দ্বারা নিহত কোন জানোয়ারের। অদূরে বিষাক্ত সরীসৃপের ফোঁসফোঁসানি, সামনেই বাঘ এবং পিছনে প্রেতলোকের বাণী। অপূর্ব্ব যোগাযোগ, মৃত্যু যেন সমারোহ করিয়া তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিয়াছে। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিকটেই মাংসভুকের ভোজন-শব্দ শুনিবার প্রত্যাশায়। কোনরূপ সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বাঘ তাহা হইলে আহার পরিত্যাগ করিয়া মানুষের গতিবিধি জানিবার জন্য নিকটেই কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে; জন্তুটির আক্রমণরীতি বরাহের মত নয়, সম্মুখ দ্বন্দ্বে তাহার অভ্যাস নাই, অকস্মাৎ আড়াল হইতে শিকার ধরাই তাহার নীতি। এইরূপ অবস্থায় বৃক্ষের উপর আশ্রয় না লইলে, বাঁচার আশা অনিশ্চিত। ভাগ্যগুণে নীচু ডাল নিকটে পাওয়ায়, গাছের উপরে উঠিয়া যাওয়ায় বিশেষ অসুবিধা হইল না। যেখানে আসন গ্রহণ করিলেন সেখানে বিশাল সরীসৃপ ব্যতীত অন্য কোন হিংস্র জন্তুর আসার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি সতর্কতার প্রয়োজন থাকায় কোষ হইতে ছোরা বাহির করিয়া সামনের শাখায় বিদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

বায়ুর গতি থামিয়া গিয়াছে, নিস্তব্ধতা চতুর্দ্দিক হইতে ভারী ওজনের মত তাঁহাকে চাপিতে সুরু করিয়াছে। কোন দিকেই প্রাণের সাড়া নাই, রাত্রি নিঝুম। যে-কোন প্রকারের ঝিমানো অবস্থা যুবরাজের পক্ষে পীড়াদায়ক। যুবরাজের বাহিরের রূপ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তাঁহার ভিতরে একটি দুর্দ্দান্ত জীব বাস করে। বিপদের সহিত খেলায় তিনি সুনিপুণ। যে বিপদ সম্মুখ হইতে আসে তাহার সম্বর্দ্ধনায় যুবরাজকে কখন কেহ পশ্চাৎপদ হইতে দেখে নাই। শিকারে বাহির হইবার সময় কখনও দেহরক্ষীকে সঙ্গে লন নাই।

যে সময় ঝিমানোর ভাব তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত সেই সময় চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হইল—শুনিলেন বীণার ঝঙ্কার, তৎসহ নারীর কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর। স্বরকে সুর অনু-

সরণ করিতেছে, সুর চলিয়াছে মূর্চ্ছনার দিকে। বসন্ত রাগ মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া তানকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছে। সুরের বিস্তার কখন খাদে নামিতেছে, কখন অন্তরার চড়া পর্দ্দায় উঠিয়া যাইতেছে। মূর্চ্ছনায় আবেষ্টনী মদির প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।

সুর যুবরাজকে নেশাগ্রস্ত করিয়া ফেলিল, তিনি যেন মাতাল হইয়া উঠিলেন। ভয়াল অরণ্য তখন তাঁহার নিকট পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়াছে; যুঁই, বেল, মল্লিকা, রজনীগন্ধা একত্রে গন্ধ ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। অপূর্ব্ব রসকেন্দ্রে যুবরাজের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঝিমানোর কবল হইতে মুক্তি পাইয়া তরুশাখা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। সুর ও গন্ধকে অনুসরণ করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। গম্য স্থল নির্দ্দিষ্ট না হইলেও ক্রমে ক্রমে পথরেখা বাহির হইয়া আসিতেছিল। বহুক্ষণ চলিয়া অবশেষে তিনি যেন এক রহস্যলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে অন্ধকারে দৃষ্টি অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল, সামনেই দেখিলেন পাষাণের স্থাপত্য নিরেট, বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই, প্রবেশ-পথও অদৃশ্য। এই সময় সুর থামিয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে বহু নারীর মিলিত হাসির শব্দ শুনা যাইতেছে, শ্লেষের অভিব্যক্তি? যুবরাজ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে নারী তাঁহাকে রসমদিরায় নিক্ষেপ করিয়া এই রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে যে-কোন প্রকারে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

হাসি আর শুনা যাইতেছে না। যুবরাজ দেয়ালের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ সুরু করিয়া দিলেন। কোন দিকেই প্রবেশ-পথ বা জানালার চিহ্নমাত্র নাই। এক বার দুই বার বহু বার ঘুরিলেন, কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। রোখ চাপিয়া গেল. পণ করিয়া বসিলেন প্রাতঃকালের প্রথম কাজ হইবে এই পাষাণস্তূপকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলা। যে কয়টি হস্তী সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে কার্য্যটি সম্পন্ন করা অসম্ভব নয়। এই সঙ্কল্প করিয়া ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় বীণার তারে পুনরায় ঝঙ্কার উঠিল, শব্দ যেন ভূগর্ভ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া আসিতেছে। বদ্ধ বায়ু ও অভেদ্য পাথরকে অতিক্রম করিয়া যে ধ্বনি উপরে উঠিয়া আসিতে পারে তাহার সহিত মরলোকের কোন যোগ থাকা কি সম্ভব? যুবরাজের মত সাহসী পুরুষেরও মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তবে কি এই স্থাপত্য কাহারও সমাধি? লোকান্তরিতের অধিষ্ঠানস্থল? যুবরাজ ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, স্থির হইয়া একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন ঘটনার ক্রমবিবর্ত্তন দেখিবার জন্য। নূতন কিছু ঘটিল না। যুবরাজ ইতিমধ্যে অনেকটা ধাতস্থ হইয়া আসিয়াছিলেন। উত্তেজনা ও ভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজিতে লাগিলেন। এইটুকু বুঝিয়াছিলেন রাত্রিবাস অরণ্যের ভিতরেই করিতে হইবে। দিগ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পথ খুঁজিতে যাওয়াটা যতই সাহসের হোক সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সমাধির উপর-দিকে তাকাইলেন—সেখানে দৃষ্টি চলে না। অতিকায় বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সমাধিস্তূপকে এমন ভাবেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে, স্থাপত্যের শেষ দেখিবার উপায় নাই। অগত্যা গাছের উপরেই উঠিয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল, কখনও কখনও বন্য কুক্কুট চীৎকার দ্বারা অরণ্যের নিস্তব্ধতাকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। ঊষা-সমাগমের আভাস পাইয়া, যুবরাজ তন্দ্রার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বৃক্ষ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছিলেন—নীচের দিকে দৃষ্টি পড়িতে মনে হইল যেন কেহ সমাধির ভিত্তিতল হইতে মাটির উপর উঠিয়া আসিতেছে। যে উঠিয়া আসিতেছিল, সে নারী, অবগুণ্ঠনবতী, দক্ষিণ হস্তে তাহার বল্লমের মত একটি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র। নারী উপরে উঠিয়া যে ভাবে সমাধির আশে-পাশে ঘুরিতে লাগিল তাহাতে মনে হইল কিছু বা কাহাকেও খুঁজিতেছে। কিছুক্ষণ পরে নারী স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং উত্তরীয় মাটিতে ফেলিয়া দিয়া নীচু হইয়া দেয়ালে ঠোকা মারিল—সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালগাত্র হইতে একটি দ্বার খুলিয়া গেল। নারী ভিতরে ঢুকিয়া তখনই বাহির হইয়া আসিল। বল্লম প্রাচীরগাত্রে ঠেসান দিয়া চকমকির সাহায্যে ছিন্ন বস্ত্রে অগ্নি-সংযোগ করিল—সঙ্গে সঙ্গেই আগুন সহজেই ধরিয়া উঠিল। জ্বলন্ত অগ্নি সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেই পতনস্থলে মুহূর্ত্তে আগুন লাগিয়া গেল।

আগুন ক্রমান্বয়ে কলেবর বিস্তার করিয়া চলিল, দেখিতে দেখিতে একটি শুষ্ক বনলতা সহজেই অগ্নিকে বৃক্ষচূড়ায় উঠাইয়া দিল। বনে আগুন ছড়াইয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই। যুবরাজ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া থাকিলে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নি-সংস্কারের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। নারী মানবী হউক বা ডাকিনী হউক, ঐ সমাধির ভিতর আশ্রয় লওয়া উপস্থিত বাঁচিয়া যাওয়ার একমাত্র পন্থা। উপর হইতে আদেশ করিলেন বল্লম দূরে ফেলিয়া দাও অন্যথায় তীর দিয়া বিদ্ধ করিয়া ফেলিব।

নারী হয়ত সন্ধানের বস্তু দেখিতে না পাইয়া অন্যমনস্ক ছিল। বৃক্ষচূড়া হইতে অপ্রত্যাশিত আদেশ শ্রবণে তাহার কিঞ্চিৎ সচকিত ভাব দেখা গেল, ক্ষণিকের ত্রস্ততা—পরক্ষণেই নারী বল্লম দেয়াল হইতে তুলিয়া দৃঢ় মুষ্টির ভিতরে ধরিল এবং উপর-দিকে তাকাইল। মুখে ক্রূর হাসির রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রূর উত্থান-পতনের সহিত গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম ভাব ধারণ করিয়াছে—নারী যেন দংশনোদ্যতা নাগিনী। অগ্নিশিখার আভা তার সর্ব্বদেহের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে—যুবরাজ দেখিলেন, পরিপূর্ণযৌবনার গঠনশ্রীতে অবর্ণনীয় রেখার সমাবেশ, যেন

ওস্তাদ শিল্পীর সুনিপুণ কারিকরির চরম সফলতা। প্রতিটি অঙ্গ সামঞ্জস্যের সীমায় আবদ্ধ হইয়া নিজের রূপেই অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। অগ্নি কামনার ইন্ধনে প্রজ্বলিত, রূপবহ্নি মোহ-মুগ্ধদের আত্মোৎসর্গের নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। আকর্ষণ এমনই প্রবল যে পরিত্রাণলাভ সাধ্যের অতীত। যুবরাজ রূপবহ্নির ভিতর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। আত্মরক্ষার যাবতীয় অস্ত্র বর্জ্জন করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। অতি নিকট হইতে দৃষ্টির দ্বারা নারীর সর্ব্বদেহ স্পর্শ করিলেন, আশা আর মিটিতে চায় না। রূপের সম্মোহিনী শক্তিতে যুবরাজ নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন, আত্মাভিমান নারীর পদতলে অর্ঘ্য দিয়া কৃপার্থীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। নারীর নয়নযুগলে যে বাণ রক্ষিত ছিল তাহার ব্যবহারে যুবরাজের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতে লাগিল। এমন পুলকমিশ্রিত বেদনা জীবনে কখন অনুভব করেন নাই।

অকস্মাৎ জঙ্গলের আগুন নিবিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ কয়েকজন অতর্কিতে পিছন হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। যুবরাজ আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া বাধা দিবার অবসর পাইলেন না। কাজেই তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিতে আততায়ীদের কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। হাত ও পায়ের বন্ধন শেষ হইতে, উষ্ণীষ খুলিয়া দৃষ্টিও ঢাকিয়া দিল। অতঃপর তাহারা যুবরাজকে বহন করিয়া নীচের দিকে নামিতে লাগিল। শূন্যে থাকিয়াই যুবরাজ অনুভব করিতে লাগিলেন সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। আঁকাবাঁকা দীর্ঘ পথ ফুরাইতে আর চায় না। হঠাৎ একটি ঘণ্টার আওয়াজ শুনিলেন, লোকগুলির চলা যন্ত্রবৎ থামিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে মাটিতে দাঁড় করাইয়া দিল—পরক্ষণেই শুনিলেন—কোন নারী বলিতেছে—দক্ষিণ মণ্ডপের পঞ্চম বট বৃক্ষের দ্বার তোমাদের পাহারায় রহিল—"রাজকুমারীর এই আদেশ।" লোকগুলি কোন উত্তর দিল না, যেন নিঃশব্দে চলিয়া গেল। যুবরাজ একই স্থলে দাঁড়াইয়া আছেন—নারী আসিয়া তাঁহার হাতের ও পায়ের বন্ধন খুলিয়া দিয়া বলিল—আমার হাত ধরুন, বিহার-গৃহে লইয়া যাইতেছি—চোখের বাঁধন সেইখানে খুলিয়া দেওয়া হইবে। আপত্তি অর্থহীন জানিয়াই যুবরাজ নারীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। আবার আঁকা বাঁকা পথ—তবে সিঁড়ি ওঠানামার প্রয়োজন হয় নাই—অবশেষে যেখানে আসিয়া থামিলেন, সে স্থানটি মধুর গন্ধে ভরপুর হইয়া ছিল, অজানা গন্ধ ধীরে অবগুণ্ঠনবতীর দিকে মন ফিরাইয়া দিল, ঠিক এই গন্ধ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য পাইয়াছিলেন—যখন বল্লমধারিণী নারী তাঁহাকে নয়ন-বাণে বিদ্ধ করিতেছিল। এই সময় পথপ্রদর্শিকা নারী অগ্রসর হইয়া আসিল তাঁহার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিবার জন্য। বস্ত্রের খস খস শব্দ যখন নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তখন যুবরাজের চিত্ত-চাঞ্চল্য চরমে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু মানসিক উত্তেজনাকে কঠোর ভাবেই সংযত করিয়া রাখিলেন। অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীকে চিনিবার জন্য চোখের বাঁধন উন্মোচনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চক্ষু উন্মীলিত করিতে দেখিলেন, তিনি গভীরতম অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছেন। মাথার ভিতর যেন চক্র ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইতে আলোর সন্ধান পাইতে লাগিলেন। স্বল্প সময়ের ভিতর দৃশ্যস্থল আলোকিত হইয়া উঠিতে লাগিল; তখন কোন মানুষই তাঁহার নিকটে নাই।

যুবরাজ দেখিলেন—সুসজ্জিত প্রশস্ত ঘর, এক দিকে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা। যে পালঙ্কের উপর তাহা স্থান পাইয়াছে, তাহা স্বর্ণময় কারুকার্যখচিত। পদতলে বহু মূল্যবান গালিচা। দেয়াল খোদিত করিয়া কঠিন পাথরকেই নারীর রূপ দেওয়া হইয়াছে। সুকুমার কান্তি লইয়া মূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। গঠন এমনই সজীবতায় পূর্ণ যে মনে হয়, যে-কোন মুহূর্ত্তে পাথরের বাঁধন বিদীর্ণ করিয়া দেয়াল হইতে বাহির হইয়া আসিবে। বস্ত্রাবরণের আভাস যেটুকু আছে তাহাও কারিকরি কৌশলে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। স্বচ্ছ আবরণী রূপকে অধিকতর চিত্তহারী করিয়া তুলিয়াছে।

পালঙ্কের পার্শ্বেই খর্ব্ব পিঠিকা, তাহার উপর স্বর্ণপাত্র, পানীয় বস্তুর আধার। প্রকোষ্ঠে কোন প্রদীপ নাই তথাপি কেমন করিয়া আলোক-রশ্মি প্রাচীরগাত্রে প্রতিফলিত হইতেছে। যুবরাজের দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া পাষাণ-মূর্ত্তিগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। দৃষ্টি আবিষ্কার করিল উহাদের ভিতর একটি অবগুণ্ঠিতার প্রতিমূর্ত্তি। মূর্ত্তি নড়িতেছে, মানুষ হইয়া গিয়াছে—দেয়াল ছাড়িয়া গালিচায় পা দিয়াছে। ক্ষণিকে যুবরাজের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। এই সময় আলোক-রশ্মি ঝাপসা হইতে হইতে এমন একটি আলো-আঁধারিতে আসিয়া থামিয়া গেল যে, দৃষ্টিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে স্পর্শের সাহায্য না লইয়া উপায় নাই।

যুবরাজ যখন নিজেকে ফিরিয়া পাইলেন, তখন নবজাগরিত দিবালোক অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে ঘরের চিহ্নমাত্র নাই, পাশ ফিরিতে চমকাইয়া উঠিলেন। অতিকায় বাঘ তাঁহার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া আছে। মুহূর্ত্তে যেন তাঁহার রক্ত চলাচল থামিয়া গেল। অতি সন্তর্পণে ঘনিষ্ঠতা হইতে সরিয়া আসিলেন, দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই, শার্দ্দুলকে ঠিকই দেখিয়াছিলেন, তবে তাহা অসাড়, বল্লমের আঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। পরিচিত অস্ত্রের পুনঃপ্রয়োগ দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ঠিক বরাহ যে ভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রথায় বাঘও নিহত হইয়াছে।

গত রাত্রের ঘটনাগুলি অগোছাল অবস্থায় মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—প্রাণময়ী পাষাণ তাঁহার সামনে শক্তির প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ শক্তির নিকট নত হইতে পারায় আনন্দ বোধ করিতেছেন, হৃদয়ের গোপন কথা স্বীকার করিতেও আপত্তি নাই। যে মানুষ নারীকে ক্ষণিকের ভোগ্য ব্যতীত অন্য কিছু ভাবেন নাই, যে মানুষ নারীর প্রেমকে কেবল বিপজ্জনক ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই মানুষ এক রাত্রির দীক্ষায়, পুরোপুরি বদলাইয়া গিয়াছেন, দাতা হইয়া উঠিয়াছেন কৃপাপ্রার্থী। অবগুণ্ঠনবতীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্কল্পকে তখনকার মত স্থগিত রাখিয়া শিবিরে ফিরিলেন।

যুবরাজ যখন নিজের আস্তানায় আসিয়া পড়িয়াছেন তখন দেখিলেন শান্ত্রী পাহারা ব্যতীত সকলেই প্রাতঃনিদ্রায় অচৈতন্য। প্রথমে ঢুকিলেন সর্ব্বাধিকারী বীরভদ্রের আস্তানায়। প্রবেশপথেই যে সব নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইল তাহাতে প্রাতঃনিদ্রার কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। চতুর্দ্দিকে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রদর্শনী এমনই বিকট হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁবুর ভিতরে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। এই নরককুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তিনি ত্বরিতপদে আপন শিবিরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

অপরাহ্ন সময় পার হইতে যুবরাজের নিদ্রাবসান হইল। শিবিরের বাহিরে বীরভদ্র অপেক্ষা করিতেছিলেন। যুবরাজ ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং সুদৃশ্য ও সুগন্ধযুক্ত পত্র যুবরাজের হাতে দিলেন। পত্রের বহিরাবরণ পরিচিত গন্ধ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বীরভদ্র আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। প্রেম বড় সাংঘাতিক ব্যাধি, ঐ ছোঁয়াচে রোগ হইতে এতকাল তিনি যুবরাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ব্যাধিটি কি অবশেষে যুবরাজের মধ্যেও সংক্রামিত হইল।

যুবরাজ পত্র খুলিলেন—পাঠকালীন তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। যেন প্রতিটি ছত্র চীৎকার করিয়া তাঁহাকে উত্তেজক বার্ত্তা শুনাইতেছে। যুবরাজের মুখমণ্ডলে ক্রোধ ও বিরক্তির কুঞ্চিত রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বীরভদ্র সবই লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবরাজকে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত দেখিয়া বিনীত ভাবে জানাইলেন, অধীনের স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিয়া পত্রটি আমাকে পড়িতে দিন, দেখি কোন প্রতিকারের সন্ধান পাইতে পারি কিনা?

যুবরাজ তাঁহার হাতে পত্র দিবার উপক্রম করিয়াও শেষে ক্ষান্ত হইলেন। বক্তব্যে যে রসিকতা ছিল তাহার অর্থ জটিল নয়। পত্র নিজের কাছেই রাখিয়া আদেশ দিলেন, পত্র-বাহককে এখুনি উপস্থিত কর।

বীরভদ্র মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, ধর্ম্মাবতার, যাহারা পত্র আনিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া গিয়াছে।

যুবরাজ অনেকক্ষণ কোন উত্তর না দেওয়ায় বীরভদ্র জানাইলেন, একটি আরজি আছে।

মল্লরাও বিরক্ত হইয়াছিলেন, উত্তর দিলেন, এখুনি না বলিলে নয়?

বীরভদ্র—ব্যাপারটা লৌকিকতার সহিত জড়িত তাই এখুনি শেষ করিবার আজ্ঞা কামনা করি।

মল্লরাও—বল।

বীরভদ্র—আমরা যে জঙ্গলে আসিয়াছি, তাহা হিন্দুপুর রাজ্যের অধীনে। প্রবেশের জন্য কোন আদেশ লওয়া হয় নাই, তথাপি রাজকুমারী—এখানকার ভাবী রাণী, বহুবিধ উপহার পাঠাইয়াছেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, উপহারের সঙ্গে কতকগুলি অস্ত্রও আসিয়াছে, দুইটি আপনার নামাঙ্কিত ত্রিফলাবিশিষ্ট তীর এবং অপর দুইটি কারুকার্য্যখচিত ক্ষুদ্রাকার বল্লম—দেখাইতেছি। বলিয়া, দ্বারীকে অস্ত্র দুইটি আনিবার আদেশ দিলেন। দ্বারী অস্ত্রগুলি আনিলে যুবরাজের সামনে ধরিয়া জানাইলেন, এইগুলি লইয়াই ফাঁপরে পড়িয়াছি। এই ধরণের অস্ত্র সাধারণতঃ রাজকুমারীরা মৃগয়ায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুর্দ্দান্ত সাহসী ও অব্যর্থ লক্ষ্যভেদীকে এইরূপ অস্ত্র উপহার দেওয়ার কোন অর্থ বুঝিতেছি না। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই বল্লম, তলোয়ার, ছোরা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, আপনার সম্বন্ধে ত ওকথা অবান্তর।

মল্লরাও ভাবিতে লাগিলেন, সখা দেখিতেছি সন্ধান না করিয়াই বিদ্রূপের পুঁজি বাড়াইতেছে? সপ্রশ্ন দৃষ্টি বীরভদ্রের উপর পড়িতে তিনি বলিলেন, আমি ভাবিতেছিলাম, ঐ বল্লম লইয়া রাজকুমারী যদি···কথাটা শেষ করা হইল না, সহসা চন্দ্রগিরির কুমার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। সুগোল নধরকান্তি, যুবরাজের মান্য অতিথি। মৃগয়ায় তাঁহার তেমন প্রবৃত্তি নাই, আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ বেশী। সংক্ষেপে তিনি বিলাসপ্রিয়।

কুমার বেসামাল অবস্থায়ই ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। চলার শ্রী দেখিয়া মল্লরাও বীরভদ্রকে জানাইলেন, লৌকিকতার ব্যবস্থা তিনি নিজে করিবেন, উপস্থিত কুমারের জন্য নূতন নটীর ব্যবস্থা করা হোক। এক চেহারা রোজ দেখিয়া কুমারের অরুচি ধরিয়া গিয়াছে।

বীরভদ্র বলিলেন—যে কয়জন সঙ্গে আসিয়াছিল, সবই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তবে শুনিতেছি জ্যোৎস্না রাত্রে এই জঙ্গলেই বিবাহযোগ্যা রাজকুমারীরা মৃগয়ায় আসিয়া থাকেন। গতকাল অনেকেই সঙ্গীতলহরী শুনিয়াছে। বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলে রাজার দরবার হইতে নিমন্ত্রণ আসিবেই—আসরে কি নৃত্যের ব্যবস্থা থাকিবে না?

রাজকুমারীদের সন্ধান পাইয়া কুমার বলিলেন, আমি এখুনি প্রস্তুত।

যুবরাজ কঠোর দৃষ্টি বীরভদ্রের উপর নিক্ষেপ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাহার পর আদেশ দিলেন কুমারের জন্য শিকারের ব্যবস্থা করিয়া দাও—এক শত অশ্বারোহী দেহরক্ষী যেন নিকটেই থাকে।

কুমার বলিলেন, এক শত সওয়ার লইয়া কি করিব? রাজ্যের লোক সাক্ষী রাখিয়া রসকেলি কি সমীচীন হইবে? আমি বলি রাজকুমারীদের এইখানেই ডাকিয়া আনা হোক।

মল্লরাও—শোনা যায় রাজকুমারীরা বল্লম চালাইয়া থাকেন। অভ্যর্থনার পূর্ব্বেই জীববিশেষ ভাবিয়া যদি···

কুমার চমকাইয়া বলিলেন, এইরূপ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকিলে, তাঁহাদের অস্ত্র বর্জ্জন করিয়া আসিতে বলাই বাঞ্ছনীয়।

মল্লরাও—আপনার উপদেশ খুবই মূল্যবান, কিন্তু প্রস্তাবটি করিবে কে?

কুমার—আপত্তি না থাকিলে, আমিই দূতের কাজটা করিতে পারি, আগাম দর্শনের লাভটাও হইয়া যায়।

মল্লরাও—আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি—তবে বাছাই করিতে গিয়া যেন নিজে না ভেস্তাইয়া যান।

কুমার হৃষ্টচিত্তে নিজের শিবিরে ফিরিলেন।

যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন, তুলার বস্তাকে আগুনের মুখে ফেলিয়া দিয়া কাজটা ভাল করেন নাই। কিন্তু অতিথি-সংকারের কর্ত্তব্যবোধ বেশীক্ষণ তাঁহার মনকে ব্যাপৃত রাখিতে পারিল না। সন্ধ্যার আগমনে রহস্যময়ী বনচারিণী তাহার মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অতিথিকে আজ জঙ্গল ছাড়িয়া দিয়াছেন, ওদিকে যাইবারও উপায় নাই। মল্লরাও অন্যমনস্ক হইবার জন্য রুদ্রবীণ লইয়া বসিলেন। বাগেশ্রীর আলাপে অল্পক্ষণেই সুর জমিয়া উঠিল। শিবিরের হট্টগোলকে সুরধ্বনি যেন আদেশ দিয়া থামাইয়া দিল। সুরের মাধ্যমে অন্তরের কথা প্রকাশ হওয়াতে ভারী মন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল।

বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ঘণ্টাচারেক রাগিণী আলাপের পর মল্লরাও দুঃখের দরদী বীণাকে সযত্নে যথাস্থানে রাখিয়া শিবির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অস্ফুট চাঁদের আলোর চারিপাশের দৃশ্য আবছা দেখাইতেছে। নিকটেই স্রোতস্বিনী হইতে ক্ষীণ কুল কুল ধ্বনি আসিতেছিল, যুবরাজ রাজকুমারী-প্রদত্ত বল্লম লইয়া ঐ দিকে চলিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর পত্রে শ্লেষপূর্ণ উক্তিগুলি যেমন এক দিকে তাঁহার আত্মাভিমানকে আহত করিতেছিল অন্য দিকে তেমনই এই পত্রপ্রেরিকা কেমন প্রকৃতির নারী তাহা জানিবার জন্য যুবরাজ অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে বহু বার পাষাণ-মূর্ত্তির ভিতর রাজকুমারীকে আবিষ্কার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। প্রয়োজনীয়তার তাগিদে অনেক কিছুই তিনি কল্পনায় গড়িয়া তুলিতেছিলেন। অবশেষে যুবরাজ নিজের সম্বন্ধে একটি সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহা নির্ম্মম হইলেও একান্ত সত্য,···তিনি প্রেমে পড়িয়াছেন ঐ পাষাণীর সহিত। লোকে জানিলে অবাক হইবে, তাঁহাকে বাতুল ভাবিবে, কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধান।

চিন্তাস্রোত যে সময় তাঁহার মনকে অকূলের দিকে টানিতেছিল সেই সময় তাঁহার পিছনে কোন ধাতব দ্রব্যের পতনের শব্দ শুনিলেন। অরণ্যে সতর্কতা শিকারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অবাক হইয়া গেলেন, পুনরায় বল্লমের আবির্ভাব! অস্ত্র নৃত্য সুরু করিয়াছে। কোন জন্তুর অস্তিত্ব নাই, বল্লম প্রায় খাড়া হইয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে এবং তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। চলন্ত বল্লম লক্ষ্য করিয়াই তাহার গোড়ার দিকে অস্ত্র চালাইলেন। তৎক্ষণাৎ প্রথম অস্ত্রটির অগ্রগতি থামিয়া গেল, কিন্তু ভিন্ন অস্ত্র তখন নাচিতেছে। যুবরাজের অস্ত্র নরম মাটি পাওয়ায় বল্লম মজবুত হইয়া নিজেকে দাঁড় করাইয়াছিল। অভিজ্ঞতার সাহায্যে অনুমান করিলেন যে প্রাণী বল্লমকে নাচাইতেছিল সে কোন বৃহৎ সরীসৃপ না হইয়া যায় না। লক্ষ্যভেদের সফলতায় শিকারীর কৌতূহল এমন একটি স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল যে কি মারিলেন পরীক্ষা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

নিকটে আসিতে দেখিলেন, তাঁহার অনুমান কিছুমাত্র ভুল হয় নাই, অতিকায় ময়াল তাঁহাকেই ভক্ষণীয় ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু কে তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইল? প্রথম নিক্ষিপ্ত বল্লম পরীক্ষার জন্য সরীসৃপের আরও নিকটে গেলেন, সাপের মাথা যুবরাজের দিকে ফিরিল, ময়ালের বাকি দেহটা যে তখন মাটিতে গাঁথা অস্ত্রকে ভাঙ্গিয়া ফেলার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল সেদিকে যুবরাজ লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান নাই, উত্তেজনাপূর্ণ কৌতূহল তাঁহাকে অস্ত্র-পরীক্ষায় সব কিছুই ভুলাইয়াছিল। নিকটে আসিতে গোড়ালিতে ঠাণ্ডা কিছুর ছোঁয়া লাগিল। সতর্কতাকে কৌতূহল বহুদূরে সরাইয়া দিয়াছে। ছোঁয়ায় চাপ পড়িতে লাগিল, তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি অস্ত্র-পরীক্ষায় ব্যস্ত, হঠাৎ সাপের দেহ দুইটি পায়েই বেষ্টন করিয়া ধরিল; যুবরাজ মাটিতে পড়িয়া গেলেন। বাঁধনের চাপ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়া গিয়াছে, অসহ্য যন্ত্রণায় দম বন্ধ হইয়া আসার উপক্রম; ইতিমধ্যে আর একটি বেড় আসিয়া পড়িল তাঁহার কোমরের উপর। নূতন বাঁধন তাঁহাকে উপুড় করিয়া

ফেলিল, সাহায্যের জন্য চীৎকার করিবার ক্ষমতা নাই, যেটুকু আওয়াজ গলা হইতে বাহির হইল তাহা শ্লেষ্মাজড়িত কাশির মত ঘড়ঘড়ানি শব্দ। চাপ বাড়িয়া চলিয়াছে, শেষে জ্ঞানও লুপ্ত হইয়া গেল।

পরের দিনের ঘটনা—যুবরাজের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, তিনি শিবিরে শুইয়া আছেন, বৈদ্য গোড়ালিতে ঔষধের প্রলেপ লাগাইতেছেন। বীরভদ্র নিকটেই দাঁড়াইয়া। মল্লরাও প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে বাঁচাইল।" বীরভদ্র উত্তর দিলেন, "রাজকুমারীর বল্লম"। তাহার পর বিশদ বর্ণনায় জানাইলেন, অতিকায় অজগর যুবরাজকে বাঁধিয়া হাড়গোড় চূর্ণ করিবার চেষ্টায় ছিল এমন সময় কেহ সাপকে বল্লমের সাহায্যে মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। যে তাঁহাকে বাঁচাইয়াছে সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াই কাজটি করিয়াছে।

যুবরাজ—শিবিরে খবর দিল কে?

বীরভদ্র সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না, বলিলেন, খবর পাইয়াই আমরা এই দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, সংবাদ-দাতাকে সনাক্ত করিয়া রাখার মত মনের অবস্থা ছিল না।

যুবরাজ—দিক্ নির্ণয় করিলে কেমন করিয়া?

বীরভদ্র—এদিকে ঝরণা তো একটিই এবং আমাদের শিবিরের ঠিক পিছনে।

যুবরাজ বৈদ্যকে বাহিরে যাইবার আদেশ দিলেন। বীরভদ্র পর্দা ফেলিয়া নিকটে আসিতে যুবরাজ অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন, সখা, আমাকে দগ্ধাইয়া মারিও না, বল কে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।

বীরভদ্র উত্তর দিলেন, কে আপনাকে বাঁচাইয়াছিল বাস্তবিকই জানি না, তবে যিনি সংবাদ দিয়াছিলেন তিনি নারী। ইহার বেশী জানিবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ আমি নিজে জানিতে পারি নাই কে তিনি। সংবাদ-দাতাকে অধিক প্রশ্ন করিবারও সময় ছিল না, কারণ তখন আপনি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে।

সপ্তাহখানেক কাটিয়া গেলে যুবরাজ চলাফেরা করিবার আদেশ পাইলেন। পায়ের হাড় না ভাঙ্গিলেও মাংসপেশী রীতিমত জখম হইয়া গিয়াছিল—সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে আরও কিছুদিন সময় লাগিবে।

যে সময় যুবরাজ পঙ্গু অবস্থায় শয্যাশায়ী, সেই সময় শিবিরে বিচিত্র ঘটনা ঘটিতে লাগিল। দুর্ঘটনার সংবাদ কেমন করিয়া হিন্দুপুরের রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল—ফলে মহারাজ স্বয়ং আসিয়া যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন—তাহার পর প্রত্যহ রাজার প্রেরিত অশ্বারোহী তাঁহার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইয়া যাইতে লাগিল। ইহাই শেষ নয়—মহারাজা বীরভদ্রের নিকট প্রস্তাব করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার একমাত্র কন্যা, হিন্দুপুরের ভবিষ্যৎ রাণীর সহিত যুবরাজের বিবাহ হইলে হিন্দুপুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান। প্রস্তাবটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যুবরাজের নিকট পেশ করিতে এক কথায় তিনি "না" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। জীবন্ত পাষাণকে তিনি দেহমন সব কিছুই অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অন্য পাত্রীর স্থান নাই। শুধু অসম্মতি জানাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বীরভদ্রকে উপদেশ দিলেন চন্দ্রগিরির কুমারের সহিত রাজকন্যার বিবাহের চেষ্টা করিতে।

মল্লরাও চলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইতেই প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাহির হইতে লাগিলেন—প্রেম-দীক্ষাদাত্রীর সন্ধানে। এক দিন দুই দিন করিয়া সময় কাটিয়া যাইতেছিল—সেই পাষাণময় সমাধির আর সন্ধান পাইলেন না।

সেদিন প্রাতে অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ক্লান্তি দূরীকরণার্থে বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। সহসা আকাশে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। গুরুগম্ভীর নিনাদের সহিত মুষলধারায় বৃষ্টি নামিল। বিশ্রামের স্থান পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন—সামান্য চেষ্টাতেই বিরাটকায় এক বটবৃক্ষের সন্ধান পাওয়া গেল। যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন সে জায়গাটি শুধু অস্বাভাবিক রকমের পরিষ্কারই নয়—মানুষের পদচিহ্নও সেখানে রহিয়াছে। পদচিহ্ন এত স্পষ্ট যে অনুমান হয় একটু আগেই এখানে কেহ দাঁড়াইয়াছিল। যুবরাজ সামনে মুখ রাখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিলেন। হঠাৎ বৃক্ষমূলে দরজা খোলার আওয়াজ শুনিলেন—মরিচা পড়া কব্জার ঘর্ষণ। পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই বৃক্ষত্বকে আচ্ছাদিত কপাট সামান্য খুলিয়াছে—পাল্লায় নরম আঙ্গুলের ডগা দেখা যাইতেছে। যে দরজা খুলিতেছিল সে নিশ্চয়ই যুবরাজকে দেখিতে পায় নাই—আঙ্গুল দেখিয়াই বুঝা যায় তাহার মুখ যুবরাজের দক্ষিণ দিকে। এই সময় যুবরাজের মাথায় এক দুষ্টবুদ্ধি আসিল। তিনি এক হাতে দরজার উপর চাপ রাখিয়া অপর হাত দিয়া ভিতরের মানুষটির কব্জি ধরিয়া টান দিলেন। স্বল্প চেষ্টাতেই আঙ্গুলের মালিককে বাহির হইয়া আসিতে হইল। যে আসিল, সে নারী—লজ্জাবনতা। জোর করিয়া মুখ তুলিয়া ধরিতে দেখিলেন, ভুল করিয়াছেন। যাহাকে খুঁজিতেছিলেন, এ সে নয়। যুবরাজ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "ক্ষমা কর দেবী, কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয় গভীর অরণ্যে এই বিচিত্র গুপ্তস্থানে তুমি কি করিতেছ। দরজার গহ্বরে দেখিতেছি সুড়ঙ্গ-পথ; পথটি কোথায় গিয়াছে বলিতে পার?"

নারী জোড়হস্তে বলিল, আপনার সন্ধানেই আমি রাজ-

কুমারীর আদেশে আসিয়াছি—আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

মাটির নীচে রাজকুমারী? তবে কি যাহাকে খুঁজিতেছেন সেই রহস্যময়ী বনচারিণীই যুবরাজকে স্মরণ করিয়াছে? সন্দিগ্ধ পুলক যুবরাজের মনকে আগুয়ান করিয়া দিল। তিনি বলিলেন, চল, আমি প্রস্তুত। রমণী জানাইল তৎপূর্ব্বে রাজকুমারীর একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে। আপনার চোখ বাঁধিয়া লইয়া যাইবার আদেশ আছে।

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, চোখ ত বাঁধিবে তুমি, ঐ নরম আঙ্গুলের বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে কতক্ষণ, মাঝ রাস্তায় এইরূপ ইচ্ছা হইলে তোমাদের গোপন পথ ত অজানা থাকিবে না।

রমণী—গোপন পথ একটি মাত্র, কিন্তু মাটির তলায় সুড়ঙ্গ যে অনেক আছে। রাজকন্যা এই সুড়ঙ্গপথ দিয়াই বরাহ ও বাঘের সন্ধানে ঘুরিয়া থাকেন। এই জঙ্গলে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে গুপ্ত সুড়ঙ্গগুলি পৌঁছাইয়া না দিতে পারে। তা ছাড়া আপনার সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইলে আপনি বাহির হইবামাত্র আপনার জানা পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, প্রয়োজন হইলে পথের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। এইখানেই সাবধানতার শেষ নয়, আদেশের সামান্য বিরুদ্ধাচরণ করিলেই, আপনার অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে। কয়েক দিন আগেই তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছেন।...একটু থামিয়া রমণী আবার বলিতে লাগিল:

আসলে এই সুড়ঙ্গ-পথগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। স্থলপথে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে জঙ্গল অতিক্রম না করিয়া উপায় নাই, এবং জঙ্গলে বিপক্ষের সেনা ঢুকিলে আমাদের যোদ্ধারা অলক্ষ্যে থাকিয়া কি ভাবে শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিবে সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এই সুড়ঙ্গের সাহায্য ছাড়া রাজকুমারী আপনাকে অজগরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া রমণী ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তাহাতে যুবরাজের মোটেই চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল না। তিনি পুনরায় রাজকুমারীর প্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের রাজকুমারীর কি মর্ম্মর-মূর্ত্তি আছে? আমি যেন তাহা দেখিয়াছি।

রমণী—আমি যাহা বলিলাম তাহার অধিক জানিতে হইলে রাজকুমারীকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, এখন ভিতরে আসুন।—তাহার কথামত যুবরাজ বৃক্ষগহ্বরে প্রবেশ করিলেন, রমণী দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গাঢ় অন্ধকার, তথাপি রমণী তাঁহার চোখ বাঁধিতে আরম্ভ করিল, সুকোমল স্পর্শ যুবরাজের মন্দ লাগিতেছিল না।

বন্ধন শেষ হইতে রমণী যুবরাজের হাত ধরিয়া বলিল—চলুন। সেই আঁকাবাঁকা পথ, সেই সিঁড়ির ধাপ। যখন চলা থামিল তখন রমণী হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি রাজকুমারীকে সংবাদ দিয়া আসি। রমণী চলিয়া গেল, কিন্তু ফিরিল না। যুবরাজ বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, স্বহস্তেই বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে যাইতেছিলেন। হঠাৎ কপালে নরম আঙ্গুলের ছোঁয়া পাইলেন। চোখের বাঁধন খুলিয়া গেল, কিন্তু যে খুলিল, তাহাকে দেখা যায় না, জমাট অন্ধকারে দৃষ্টি অবরুদ্ধ। যে চোখের বাঁধন খুলিয়া দিতেছিল, সে নিঃসন্দেহ নারী—হাতের তেলোর স্পর্শ হইতেই তাহা অনুমান করা চলে। ধীরে ধীরে নারী অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের মাঝে ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইতেছে, নারীর তপ্ত নিঃশ্বাস যুবরাজ গণ্ডের অতি নিকটে অনুভব করিতেছেন। এই সময় পূর্ব্বেকার মতই ধীরে আলো আসিতে লাগিল। যাহাকে দেখিলেন, তাহার সহিত পাষাণ-মূর্ত্তি বা পথপ্রদর্শিকা রমণীর কোন সাদৃশ্য নাই। যে উত্তেজনা এতক্ষণ যুবরাজকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ক্ষণিকে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন তিনি প্রবঞ্চনার মায়াজালে আটকা পড়িয়াছেন। নারীর প্রেমকে তিনি চিরকাল ক্রীড়ার বস্তু ভাবিতেন। সেই নিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটাইল অপরিচিতা প্রেমিকা। অকস্মাৎ যুবরাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। রমণীকে আদেশ দিলেন—তোমাদের রাজকুমারীকে ডাকিয়া দাও, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের আশাতেই এখানে আসিয়াছি। রমণী পরম নির্লিপ্ততার সহিত উত্তর দিল—রাজকুমারী প্রমোদ-বিহারে ব্যস্ত আছেন; এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কোন আশা নাই। আপনাদের চন্দ্রগিরির কুমার নৃত্যশালায় উপস্থিত।

যুবরাজের হৃদগহ্বরে একটি বারুদখানা লুকানো থাকিত; ঠিক তাহার মাঝখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গিয়া পড়িল। বিনা শব্দে বিস্ফোরণ ঘটিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন—প্রমোদ-বিহারের সঙ্গী হইবার জন্য নিত্য নব নব পুরুষ আসিয়া থাকে নাকি?

রমণী সে প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়া ঘোরালো ভাবে বলিল—আপনার অভ্যর্থনার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। যুবরাজ বলিলেন—প্রবঞ্চনা তোমাদের অভ্যর্থনার অঙ্গ জানিলে এখানে আসিতাম না; এখন বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলেই আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করা হইবে। উত্তর কিছু আসিল না, কিন্তু ঘর মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া গেল, পুনরায় নারীদেহের স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন, স্খলিত বাক্যে নারী ব্যাকুল ভাবে আত্মনিবেদন করিয়া চলিয়াছে।

যুবরাজ ঈষৎ বলপ্রয়োগেই নারীর বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিলেন। স্থানটি তাঁহার নিকট নরককুণ্ড সামিল হইয়া উঠিয়াছিল। নারীর কবল হইতে মুক্তি পাইয়াও নিজেকে

নিষ্কণ্টক ভাবিতে পারিতেছিলেন না। যে-কোন আকস্মিক ঘটনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। এই সময় ঘরের ভিতর সুমিষ্ট পরিচিত গন্ধ বহিতে সুরু করিল। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় যে চিত্তচঞ্চলকারী মাদকতা অনুভব করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহার কোন প্রভাব নাই—বরং একটি অপরূপ স্নিগ্ধতা অনুভূত হইতেছে। গন্ধের সহিত আলো আসিতে লাগিল—তাহার সহিত নূপুরের রিমিঝিমি রব ধ্বনিত হইতে লাগিল। ধ্বনি নর্ত্তকীর পদবিক্ষেপ হইতে আসিতেছিল না। মনে হইল একাধিক নারী যেন তাঁহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। যুগপৎ কুতূহলী ও সতর্ক হইয়া যুবরাজ নতুন ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ দেখিলেন সখীপরিবেষ্টিতা হইয়া মন্থর গমনে মাল্যহস্তে আসিতেছেন এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী—যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পাষাণমূর্ত্তিই সচল হইয়া উঠিয়াছে। কপালে চন্দনের টিকা, বাহুতে বাজুবন্ধ, অঙ্গবাসে রাঙা জবার রং উপচাইয়া পড়িতেছে, যেন কোন পবিত্র উৎসব-সম্মেলনে চলিয়াছেন। একান্ত বাঞ্ছিতার নব রূপ দর্শনে যুবরাজের মন গভীর প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

রাজকুমারী যুবরাজের নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পদধূলি মাথায় লইয়া মালা যুবরাজের গলায় পরাইয়া দিলেন। যুবরাজ প্রথমে এমনই বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন যে, প্রবঞ্চনা, আত্মাভিমান ইত্যাদির কথা মনে আসে নাই। কিন্তু নারী পুরুষের পাদস্পর্শ করিয়াছে—যুবরাজের ক্ষুণ্ণ পৌরুষ পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠিল, রাজকুমারীর পত্রের শ্লেষ-বাণী মনে করাইয়া দিল—"তোমার সময় আসিয়াছে, যা-কিছু বলিবার আছে প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ কর।" যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, মালাটা কি চন্দ্রগিরির কুমার ব্যবহার করেন নাই বলিয়া আমার জন্য লইয়া আসিয়াছ?

যুবরাজের প্রশ্ন শুনিয়া রাজকুমারীর মাথা নত হইয়া গিয়াছিল। অবনত মস্তকেই জানাইলেন, এই সুড়ঙ্গ-পথে যুবরাজ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ জীবন্ত অবস্থায় প্রবেশাধিকার পায় নাই। আমার সখীরা আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিল, আমারই আদেশে। প্রভুকে যেদিন দেখিয়াছি, সেই দিনই নিজেকে আপনার দাসী ভাবিয়াছি, আপনার চরণতলে দেহ ও মনকে অর্ঘ্য দিয়াছি। আমাকে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা আপনার ইচ্ছা।

মাল্যদানের পরই সখীরা ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছিল। যুবরাজের আত্মাভিমান তখনও সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হয় নাই। পত্রের শ্লেষপূর্ণ কথাগুলি তখনও অন্তর জ্বালাইতেছিল, বলিলেন—তোমাকে বিশ্বাস করিতে আপত্তি নাই কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমাকে কুৎসিত প্রলোভন দেখাইয়া সংগ্রহ করিলে কেন? রাজকুমারী উত্তর দিলেন, প্রভু, আপনি যে ভোগী, ভোগের প্রলোভন দেখাইয়া যদি আপনাকে পাইয়া থাকি, তাহা হইলেও দোষণীয় বলিতে পারেন না। যে মুহূর্ত্তে আপনাকে মন সমর্পণ করিয়াছিলাম সেই মুহূর্ত্তেই ধর্ম্মতঃ আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং স্ত্রী হইয়া যদি কামনা-উদ্দীপক ছলাকলার আশ্রয় লইয়া থাকি তাহা হইলে তাহাকে কুৎসিত বলেন কেমন করিয়া? আপনাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় সখী দুইটি ব্যর্থ হওয়ায় আপনার প্রেমের একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছি। চন্দ্রগিরির কুমারের জন্য উহাদিগকে আপনার শিবিরে পাঠাইয়া দিয়াছি।

যুবরাজ তুষ্ট হইয়াই বলিলেন, এখন আমাকে যাইতে দাও, তাহা না হইলে কাল সকালে ঐ কুমারের সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব রাজদরবারে উপস্থিত হইবে। কথা শুনিয়া রাজকুমারী কঠোর হইয়া উঠিতেছিলেন—সুস্পষ্ট আলোকেই যুবরাজ উৎকোচ দিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

শিবিরে পৌঁছিয়া যুবরাজ শুনিলেন, কুমারের আস্তানায় দুইটি নূতন নর্ত্তকী আসিয়াছে। যুবরাজ ভাবিয়া দেখিলেন, রাজকুমারীর সহিত কুমারের বিবাহের প্রস্তাব রাজদরবারে চলিয়া গিয়া থাকিলে পরিবর্ত্তন লজ্জাকর ব্যাপার। প্রস্তাবটি মহারাজার হাতে পড়ার আগে যেমন করিয়া হউক হস্তগত করিতে হইবে।

বীরভদ্রকে আলাদা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রগিরির কুমারের বিবাহ-প্রস্তাব চলিয়া গিয়াছে নাকি?

বীরভদ্র উত্তর দিলেন, কুমারের কাজ ত পাকা হয়ে গিয়েছে, তোমার আদেশেই মহারাজার কাছে খবর গেছে একটু আগে।

যুবরাজ প্রমাদ গণিলেন। বীরভদ্রকে বিদায় দিয়া ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া ছুটিলেন হিন্দুপুরের প্রাসাদাভিমুখে।

যুদ্ধ-নৃত্য সজ্জায় একদল নিগ্রো পুরুষ

নিগ্রোদের দেশ

শ্রীসুনীলপ্রকাশ সোম

নিগ্রোজাতির দেশ বলতে আফ্রিকাই বুঝায়। শ্বেতাঙ্গ লেখকেরা আফ্রিকাকে 'Dark Continent' অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলেন। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে বলে নিরপেক্ষভাবে কিছু লেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেজন্য তাঁদের লেখায় আফ্রিকা এবং সেখানকার বাসিন্দা নিগ্রোদের সত্যচিত্র পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান লেখক যখন আফ্রিকায় যান পূর্ব্ব-আফ্রিকায় তখন পুরাদমে যুদ্ধ চলছিল। জেনারেল ভন্ লিটো ভরবেক্ অতি অল্পসংখ্যক জার্ম্মান সৈন্য নিয়ে অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশবাহিনীর সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। জেনারেল স্মাট্‌স্ যখন পূর্ব্ব-আফ্রিকার জার্ম্মান অধিকৃত স্থানগুলি ধীরে ধীরে দখল করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করছিলেন তখন আমি পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ছিলাম। সেই সময়ে আফ্রিকাতে যা দেখেছি—আফ্রিকাবাসীদের সম্বন্ধে যা জেনেছি, তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণনা করব।

আফ্রিকার অনেক শহরে এস্‌ফল্ট্ দেওয়া চওড়া রাস্তা আছে। পথের দু'ধারে সুসজ্জিত বাগানের পাশে সুন্দর সুন্দর বাংলো ধরণের বাড়ীগুলি দেখতে চমৎকার। মোম্বাসা, নায়রোবী, জাঞ্জিবার, দার-উস্-সালাম, পোর্ট এমেলিয়া ইত্যাদি দেখে এই কথাটি মনে হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গ লেখকগণ আফ্রিকা সম্বন্ধে লোকের মনে কি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করবার প্রয়াসই না পেয়েছেন। পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের মধ্যে আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া প্রপাত এবং আমেরিকার নায়েগ্রা প্রপাতের নামই সকলের আগে মনে পড়ে। আফ্রিকার

মায়ের পিঠে শিশু

ভিক্টোরিয়া হ্রদ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হ্রদ। এই হ্রদ থেকে একটি খণ্ড জলস্রোত বাইরে চলে গেছে। এই জল-স্রোতের নামকরণ করা হয়েছে ষ্টানলী প্রপাত। এই প্রপাত বিনকা গ্রাম থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে অবস্থিত। শহরের ঠিক

মাঝখান দিয়ে একটা পথ দক্ষিণ দিকে বেঁকে একেবারে প্রপাতের কাছে চলে গেছে। যাতে স্রোত বাঁ দিকে আর

নাকে ও পায়ে উদ্ভট আকারের অলঙ্কার-পরিহিত একজন নিগ্রো পুরুষ

অগ্রসর হতে না পারে সেজন্যে প্রপাতের দিকটা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রপাতের উভয় দিকেই শক্ত পাথর। কোয়ার্টস, গ্র্যানাইট এবং মসৃণ স্যাণ্ডষ্টোন প্রপাতের বাম পার্শ্বে দেখতে পাওয়া যায়। প্রপাতের মাঝখানের গভীরতা আনুমানিক দশ থেকে পনর ফুটের বেশী হবে বলে মনে হয় না। ইঞ্জিনিয়ারদের ধারণা এখান থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাবে তা দিয়ে সমগ্র আফ্রিকাকে আলোকিত করা সম্ভবপর হবে। অথচ ঝিনঝাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে প্রচুর কয়লা পোড়াতে হয়। এখানে পাওয়ার হাউসে উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রত্যেক ইউনিটের মূল্য পঁচিশ থেকে ত্রিশ সেণ্ট। যদি এখানে জলস্রোত থেকে বিজলী তৈরির ব্যবস্থা হ'ত তা হলে এক সেণ্ট করে ইউনিট বিক্রী করলেও বেশ মুনাফা থাকত।

আফ্রিকায় দাস-ব্যবসায় কিরূপ লাভজনক ছিল সেকথা অনেকেরই জানা আছে। আরব, পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান প্রভৃতি অনেক সভ্যদেশের ব্যবসায়ীরা এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করত। আরবেরা গ্রাম থেকে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে আসত, আর শ্বেতাঙ্গরা তাদের কিনে নিয়ে বিদেশে চালান দিত। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে পর্ত্তুগীজরাই এ ব্যবসায়ে সবাইকে টেক্কা দিয়েছিল। তারা হাজার হাজার নিগ্রোকে জাহাজে করে বিদেশে চালান দিত। যাদের ধরে আনা হ'ত, তাদের গভীর রাত্রে সংগোপনে জাহাজে উঠানো হ'ত; জাহাজ ভর্ত্তি হয়ে যাবার পর যাদের স্থান সঙ্কুলান হ'ত না, তাদের মেরে ফেলা হ'ত। মোম্বাসাতে ভাস্‌কো-ডি-গামা ষ্ট্রীটে এদের জন্য লোকচক্ষুর অগোচরে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ খনন করে রাখা হয়েছিল। এই সুড়ঙ্গের সহিত অনেক লোমহর্ষণ ব্যাপারের স্মৃতি বিজড়িত। লিভিংষ্টোন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত-চিত্তে লিখেছিলেন—

"Blood, blood, everywhere. Africa was bleeding to death. Villages were littered with skeletons

পূর্ব্ব-আফ্রিকার শঙ্খচূড় জাতীয় সর্প

in the slave raids and human blood and wildernesses reigned where there had been gardens." অর্থাৎ—রক্ত, রক্ত, সর্ব্বত্রই রক্ত—রক্তমোক্ষণ করতে করতে আফ্রিকা এগিয়ে চলেছে মরণের পথে। গ্রামগুলি দাস-ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক নিহত নরকঙ্কালে পূর্ণ। যেখানে এক সময় ছিল উদ্যানের শোভা, এখন সেখানে নররক্তের স্রোত আর

নির্জ্জনতা।—কথিত আছে, লিভিংষ্টোন যখন আফ্রিকায় ভ্রমণ করতে যান তখন প্রতি বৎসরে প্রায় কুড়ি লক্ষ ক্রীতদাসকে জাহাজে করে বিদেশে চালান দেওয়া হ'ত।

আফ্রিকার জঙ্গলের অধিবাসী দুই জন উলঙ্গপ্রায় নিগ্রো

আফ্রিকায় ভারতের অনেক লোক বহুকাল যাবৎ বাস করে আসছে। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে পোরবন্দরের গুজরাটী বণিকেরা আফ্রিকায় প্রথমে ব্যবসা করতে যায়। তখনকার দিনে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় আরবদের খুব বেশী প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। অনেক ভারতবাসী মোম্বাসা, জাঞ্জিবার এবং নায়রোবীতে দীর্ঘকাল ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন। এঁদের চেষ্টায় সেখানে ভারতীয়দের উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। পোরবন্দরের শাসনকর্ত্তা যখন শুনলেন যে সেই সুদূর বিদেশে গিয়ে হিন্দুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তখন তিনি ঔপনিবেশিক হিন্দুদের বিধর্ম্মী বলে ঘোষণা করেন। যে সকল হিন্দু লোকলস্কর ইত্যাদি নিয়ে যাবার জন্য পোরবন্দরে এসেছিল, তারাই প্রথমে পোর-বন্দরের শাসনকর্ত্তার আদেশে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তারা আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে অন্যান্য জাতভায়েদের কাছে যখন বললে যে তারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, তখন আফ্রিকার প্রবাসী হিন্দুদের মনে স্বধর্ম্মচ্যুত হওয়ার আশঙ্কার বিষাদের ছায়া পড়ল। অনেকেই দেশে ফিরে গিয়ে জানালে যে তারা সাগর পার হয় নি, বোম্বাই থেকে অথবা ভারতের অন্য কোন বন্দর থেকে ফিরে এসেছে। আফ্রিকায় যারা রয়ে গেল তারা প্রায় সবাই হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করল। এরই ফলে ভারতীয় হিন্দুদের আফ্রিকা যাত্রার উৎসাহ উবে গেল। এর কয়েক বৎসর পরে আরবেরা আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের আক্রমণ করে তাদের উপনিবেশ দখল করে নেয়।

পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। সমতল ভূমির উপর হঠাৎ এক একটি পাহাড় যেন মাথা উঁচু করে

চামড়ায় তৈরি পোশাক পরিহিত দুইটি নিগ্রো যুবতী

দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের উপরকার জমি প্রায়ই বন্ধুর এবং উচ্চাবচ। সমতল অঞ্চলে অনেক জায়গায় রাস্তার দু'পাশে আনারসের বাগান, আখের ক্ষেত এবং মাঝে মাঝে কার্পাসের ক্ষেত দেখতে পাওয়া যায়। আনারসের বাগান, আম, কাঁঠাল এবং নারিকেল গাছ আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই
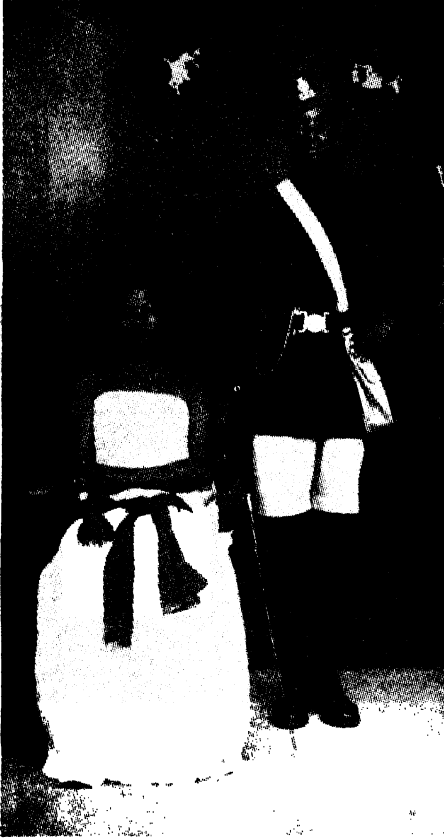
আফ্রিকার একজন নিগ্রো পুলিশ কর্ম্মচারী ও তার স্ত্রী

আছে। সমতল অঞ্চলের অনেক জায়গায় জমির উপরটা ভিজা, আবার দু'হাত নীচেই একেবারে শক্ত পাথর।

আফ্রিকার অভ্যন্তর-প্রদেশে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে আজও স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ থাকে। এরা চাষ-আবাদ কিছুই করে না। গো-পালন এদের একমাত্র বৃত্তি। গরুর দুধ, গরুর মাংস, শুকর ও ছাগল এদের প্রধান খাদ্য। এক দিন একটি গ্রামে একটি নালার পাশে একজন নগ্ন নিগ্রো পুরুষকে স্নানরত অবস্থায় দেখেছিলাম। কি সুন্দর সুগঠিত তার শরীর! নিগ্রোদের মাথার চুল ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়ানো। ওদের কান ছোট, নাক চেপ্টা, বুক, হাত, পা বেশ চওড়া এবং পুষ্ট। এদের দেহের রং কালো কুচকুচে। স্নানরত লোকটি তার শরীর ভাল করেই মার্জ্জন করলে, কিন্তু মাথায় এক ফোঁটা জলও দিল না। কাছে গিয়ে দেখলাম একপ্রকার হলদে মাটি চুলে মাখানো রয়েছে। এখনও এরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও শিক্ষায় আলোক পায় নি। কয়েক জায়গায় খ্রীষ্টান মিশনরীরা তাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। মিশনরীদের কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রতিই উৎসাহ বেশী—লেখাপড়া বা অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদানের প্রতি তেমন মনোযোগ নাই। কয়েকটি গ্রামে লক্ষ্য করে দেখেছি প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মস্তক মুণ্ডিত। 'আলোকপ্রাপ্ত' নিগ্রোরা ছেলেমেয়েদের মাথা প্রায়ই মুণ্ডন করে দেয়। অনেকের ধারণা বার বার মস্তক মুণ্ডন করলে চুল আর তেমন কোঁকড়ানো থাকে না।

আফ্রিকার শহরগুলিতে 'ডু-ডু' পোকার ভয়ানক উপদ্রব। এই পোকার আক্রমণে এখানকার অধিবাসীদের যন্ত্রণার একশেষ হয়। ডু-ডু পোকা সাধারণতঃ হাত এবং পায়ের নখের ভিতরে এমন অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করে যে, প্রথমে কিছুই টের পাওয়া যায় না। নখের মধ্যে প্রবেশ করার পর তারা নখের মাংস খেতে সুরু করে। এতে নখে ভয়ঙ্কর বাথা হয়। আফ্রিকার সর্ব্বত্র নিগ্রোরা কি করে নখ হতে ডু-ডু পোকা বের করতে হয় তা বেশ ভাল করে জানে। ডু-ডু পোকা দংশন করবামাত্রই তার প্রতিকারের জন্য যত্নবান হওয়া আবশ্যক—সময়ে সাবধান না হলে অনেক সময় দষ্ট স্থান বিষাক্ত হয়ে যায়, তখন অঙ্গচ্ছেদ ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ডু-ডু পোকাকে ইংরেজীতে Giggers বলে।

আফ্রিকার জঙ্গলের গণ্ডার

আফ্রিকার অনেক শহরে খোজা মুসলমান, গুজরাটী হিন্দু এবং পঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাস করে। বহু শিখ মোম্বাসা, জাঞ্জিবার, নায়রোবী ইত্যাদি শহরে দিন-মজুরি করে জীবিকা অর্জ্জন করেছে। খোজা মুসলমান এবং গুজরাটী হিন্দুদের নিগ্রোরা এবং আরবেরা তেমন সম্মানের চক্ষে দেখে না। কেননা তারা আঘাত পেলে আঘাত ফিরিয়ে দেয় না। আরব এবং নিগ্রোরা প্রথম প্রথম শিখদেরও অব-হেলার চক্ষে দেখত—পথে ঘাটে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। শিখরা অনেক দিন সে অত্যাচার সহ্য করেছিল, কিন্তু হঠাৎ

পূর্ব্ব-আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলের একটি পান্থশালা

এক দিন কালসিং নামক একজন শিখ তলোয়ার হাতে করে মোম্বাসার বাজারে বিচরণ করতে থাকে এবং কয়েকজন আরব, নিগ্রো এবং সোমালিকে হত্যা করে। এর পর থেকে শিখদের আরব ও নিগ্রোরা বেশ সমীহ করতে আরম্ভ করে এবং শিখদের শিখ না বলে 'কালাসিংহা' নাম দেয়।

আফ্রিকার উচ্চভূমিতে ভারতবাসী জমি কিনতে পারে না। আপন ইচ্ছামত বাড়ীঘর তৈরি করতেও পারে না। ডাক-বাংলোতে গিয়ে টাকা খরচ করে থাকবার সঙ্গতিও অধিকাংশ ভারতবাসীর নেই। ইউরোপীয় হোটেলেও তাদের প্রবেশ নিষেধ। ইউরোপীয় রেস্তোরাঁতে ভারতবাসীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা হয়।

নিগ্রোদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ বর্ত্তমান লেখকের হয়েছিল। দেখেছি তারা বেশী কথা বলে না। তারা একতারার মত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাদনে পটু। কেনিয়াতে এক দিন পথের পাশে বসে চারদিকের দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময় কতকগুলি নিগ্রো মেয়ে পাশ দিয়ে চঞ্চল চরণে দ্রুত-গতিতে চলে গেল। তাদের নাকে নথ ঝুলছে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত—হাতে এবং পায়ে তারা কাচের গহনা পরেছে। শরীরের সর্ব্বত্র উলকি কাটা। নিগ্রোদের মধ্যে অঙ্গশোভা বর্দ্ধনের জন্য উলকি পরা, দাঁত উঠিয়ে ফেলা, মাথায় হলদে মাটি মাখা, নাকে এবং কানে ছিদ্র করে নানারূপ গহনা পরা ইত্যাদি নানা উৎকট প্রথা প্রচলিত আছে।

আফ্রিকার জঙ্গলে হাজার হাজার হরিণ একসঙ্গে বিচরণ করে। বন্য গরু, উটপাখী, জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতিও এখানকার অরণ্যচারী জানোয়ার। জিরাফগুলি যখন মাথা দুলিয়ে দলে দলে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় যেতে থাকে—তখনকার দৃশ্যটি উপভোগ্য। আফ্রিকার জঙ্গলের বন্য মহিষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জীব। সিংহ পর্য্যন্ত এই বুনো মোষের কাছে সংগ্রামে পরাস্ত হয়।

আফ্রিকার জঙ্গলের হাতীর পাল বড় বড় সিংহকে যখন একযোগে আক্রমণ করে তখন সিংহ প্রাণের ভয়ে পালাতে বাধ্য হয়। হাতী প্রায়ই জলাভূমিতে থাকে।

আফ্রিকার শহরে যে পল্লীতে ভারতীয়েরা থাকে সেই অঞ্চলের একটা বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করে মনে বেদনা অনুভব করেছিলাম। সেখানে খ্রীষ্টান ভারতীয়েরা তাদের গীর্জ্জা করেছে একটি নিতান্ত সাদামাটা ঘরে। নিগ্রোদের ন্যায় ভারতীয়েরাও শ্বেতাঙ্গদের গীর্জ্জার ছায়া মাড়াতে পারে না। ওদিকে আবার বোরাদের মসজিদে বোরা ছাড়া অন্য মুসলমান অথবা নিগ্রোর প্রবেশ নিষেধ। নিগ্রোরা যদি কেউ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে চায়, তবে তাদের সিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয় না। পূর্ব্বেই বলেছি আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই খোজা মুসলমানের বাস। খোজা স্ত্রীলোকেরা বাঙালী মেয়েদের ধরণে শাড়ী পরেন। তাদের ধর্ম্মপুস্তক নাকি পুরাতন সিন্ধী অক্ষরে লেখা।

নিগ্রোজাতির দেশ আফ্রিকাকে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে বেশ আরামেই প্রভুত্ব করছে। বেলজিয়ম দখল করে রেখেছে কঙ্গো প্রদেশ; ফরাসীর অধীনে সাহারা, ব্রিটিশের অধীনে পূর্ব্ব-আফ্রিকা, পশ্চিম-আফ্রিকা, মধ্য-আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা; পর্ত্তুগীজের অধীনে আছে পূর্ব্ব-আফ্রিকার কিয়দংশ, তারপর আছে অন্যান্য ছোট ছোট

রাজ্য—আরবরা মিশর এবং আরও কয়েকটা জায়গা দখল করে রেখেছে। নিগ্রোরা যখনই স্বাধীন হবার জন্য বিদ্রোহ করে, তখনই বিদেশীরা তাদের কঠোর হস্তে দমন করে। নিগ্রোরা স্বাধীনতার জন্য অনেকবার সংগ্রাম করেছে। ব্রিটিশের সঙ্গেও তারা জোর লড়েছিল। ব্রিটিশের আগমনের পূর্ব্বে আরবদের সঙ্গেও তারা অনেকবার লড়াই করেছিল। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের সামনে তাদের বর্শা, তীর ধনুক কার্য্যকরী হতে পারে নি। ছলে বলে কৌশলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ আফ্রিকার উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং দীর্ঘকাল ধরে অকথ্য অত্যাচার-উৎপীড়ন করে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এমনিভাবে জাতি যখন অবনতির শেষ সোপানে এসে দাঁড়াল তখন কয়েকজন দেশপ্রেমিক নিগ্রো স্বদেশের দুর্গতি দূরীকরণ মানসে আমেরিকায় একটি সমিতি গঠন করলেন—তার নাম African Communities League—অর্থাৎ 'আফ্রিকার আদিম অধিবাসী সঙ্ঘ'। এই সমিতি নানা বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে নিগ্রোদের জন্মগত স্বাধীনতার দাবি প্রচার করতে লাগল। এই সমিতি কর্ত্তৃক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার নাম 'Negro World' এই পত্রিকাখানিতে অনেক সুচিন্তিত রচনা প্রকাশিত হয়। নিগ্রো জাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত ও নিষ্কণ্টক করবার উদ্দেশ্যে

আফ্রিকায় 'আদিম অধিবাসী সঙ্ঘে'র সভ্যগণ

জাতীয়তাবাদী নিগ্রোরা আফ্রিকাকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে জোরগলায় দাবি করতে সুরু করেছে। প্রেসিডেণ্ট মার্কাস গারভি অত্যাচরিত নিগ্রোদের স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলেছেন :

"What is good for the whiteman is equally good for the negro, namely, freedom, liberty, and equality. If the Englishman claims England, the Frenchman France, the Italians Italy, as their native habitat, then the negroes claim Africa and will shed blood for their claim.

"The bloodiest of all wars is yet to come, when Europe will match its strength against Asia and that will be the negro's opportunity to draw sword for Africa's redemption."

পূর্ব্ব-আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ

তাৎপর্য্য—"শিক্ষিত নিগ্রোরা নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য আফ্রিকায় গণতান্ত্রিকতার প্রবর্ত্তন কামনা করেন। নিগ্রোজাতি নিজেদের জাতীয় সত্তাকে ফিরে পাবার জন্য যে ব্যাকুলতা অনুভব করছে, তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তারা পরবশ্যতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

স্বাধীনতা এবং সাম্য শ্বেতাঙ্গের পক্ষে যেমন কল্যাণকর নিগ্রোর পক্ষেও তেমনি সমভাবে মঙ্গলজনক। ইংরেজ যদি ইংলণ্ডকে, ফরাসী যদি ফ্রান্সকে, ইটালীয় যদি ইটালীকে

নিজেদের বাসভূমি বলে দাবি করতে পারে তা হলে নিগ্রোরাও আফ্রিকার উপর তাদের দাবি জানাতে পারে এবং এই দাবি আদায় করবার জন্যে তারা রক্তপাতেও কুণ্ঠিত হবে না।... সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ যুদ্ধ আসতে এখনও অনেক দেরি। সেই যুদ্ধে এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের শক্তি-প্রতিযোগিতার পরীক্ষা হবে এবং আফ্রিকার মুক্তির জন্য তরবারি কোষমুক্ত করবার সেই হবে নিগ্রোদের সুবর্ণ-সুযোগ।"

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

মহাশূন্যে অনন্ত নীলিমা ;
অনন্ত মাধুরী রাজে নীলাম্বু সলিলে,
ধ্যানমগ্ন অরবিন্দ ঋষি !
কুমারিকা উচ্ছলিতা ধ্যানমহিমায়,
প্রভাতের নবার্ক-স্বপন
সিন্ধুর সলিল মাঝে উত্তরিল আসি'
চেতনার দিব্য রূপান্তরে
অনন্তের ছন্দ বিকশিয়া—
মূর্ত্ত হ'ল যুগ-গুরু সাধনা-প্রাঙ্গণে
ভাগবত অনুভূতি।

দৃশ্য যাহা, অদৃশ্য অতলে
অন্তরীক্ষে আছে বহমান—
জড়মাঝে প্রাণময় মনোময়
সুক্ষ্মরূপ ধরি'—
আনিলে সেথায় তুমি
বিবর্ত্তন সূত্র অনুসরি'
ভাগবত মানস-বিসার !
অভ্রান্ত দৃষ্টিতে
জাগে সেই ঊর্দ্ধায়নে মানব-চেতনা
লীলায়িত মুক্তির আবেশে !
কামনা তোমার নহে
ভৌগোলিক ভারতের স্বাধীনতা শুধু !
তুমি দিলে রূপ তার অমর আত্মার
স্বধর্ম্মের নিষ্ঠা-অধিকারে।
দিলে বাণী, ভারতের
নিমন্ত্রণ ঘরে ঘরে নিখিল জগতে !

অগ্নি-গর্ভ মন্ত্র তব
বেজেছিল একদিন
স্বদেশের সেবা লাগি'।
দুঃখ, ক্লেশ, কারাবাস
অম্লান রেখেছে ওই স্বর্ণোজ্জ্বল ছবি
তপস্যা-ভাস্বর !
আদর্শের লাগি'
নিলে স্থান নীরব নিভৃতে
যোগ মাঝে মৌন সাধনায় !
বীজ হ'তে বিরাট বৃক্ষের মত
সে সাধনা চলে আজি বিশ্বের বিমুক্তি লাগি'—
নহে শুধু ভারতের।
পার্থিব সত্তায়
দিব্যভাব নিশ্চিত বিকাশ—
এ তোমারি বাণী,
এ সাধনা অব্যয় তোমার—
যে ভারতে বেসেছিলে ভালো—
যার লাগি' সাধনা তোমার
অবিশ্রান্ত চলে অবিরত—
সে ভারত ধন্য আজি
বক্ষে ধরে তোমার গৌরব।

তোমার সাধনা—
তোমার জ্ঞানের বিভা,
তোমার সে দিব্য অনুভূতি—
আমারে দিয়েছ তুমি,
আমারে করেছ ধন্য—
আমারে দিয়েছ এক আদর্শ মহান্।
আমি সেথা শুধু আমি নয়—
সৃষ্টিমাঝে এক জীবকোষ,—
এ আমির মধ্যে আছে জেগে
নিখিলের সমষ্টি গুঞ্জন।
ছন্দ তার অফুরন্ত চলে
প্রাণস্রোতে মানস-ভেলায়
ঊর্দ্ধগতি, অতিমানসের
অনন্ত আলোর দেশে !
তোমার পার্থিব রূপে দিব্য ভাবে সুক্ষ্ম তুমি, দেব,
তোমারে প্রণাম।

সরস্বতী

শ্রীসরোজকুমার সাহা

"যা কুন্দেন্দু তুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর প্রভৃতিভিঃ দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥"

সুদূর অতীতকাল থেকে কত রূপেই না বন্দনা হয়েছে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর! কত মুনি-ঋষি দেবীর উদ্দেশে কত শ্লোক রচনা করলেন, কত কবিই না সৃষ্টি করলেন স্তব-স্তুতি, বন্দনা-গীতি সুললিত মধুর ছন্দে। গ্রন্থারম্ভে সরস্বতীর বন্দনা করা প্রাচীনকালের কবিদের একটি প্রথাস্বরূপ ছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যে এর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাভারতের আরম্ভেও আমরা দেখি—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।"*

কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও কবিগণ এই প্রথা অনুসরণ করেছেন। কৃত্তিবাস বলেন—

'সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।'

তাই— 'কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী বরে।'

বিজয়গুপ্তও বললেন—(পদ্মাপুরাণ)

'সরস্বতী দেবী বন্দম বচনদেবতা।'

ভবানীপ্রসাদ (দুর্গামঙ্গল) গাইলেন—

'প্রণাম করিয়ে মা কল্যাণী সরস্বতী।'

ভবানীশঙ্কর "মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা" রচনা করতে করতে লিখলেন—

'প্রণতি করিয়া বন্দম ভারতী চরণে।'

চৈতন্য ভাগবতকারের—

'জিহ্বায় স্ফুরায় তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী।'

দুঃখী শ্যামদাস (গোবিন্দমঙ্গল) গাইলেন—

'সরস্বতী বন্দো মাগো মধুর পঞ্চম রাগে
বিষ্ণুর বল্লভা বীণাপাণি।'

সুকুর মহম্মদ 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে'র প্রসঙ্গে বললেন—

'নম মাতা সরস্বতী বিখ্যাত সংসারে।'

এ ছাড়া মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ চণ্ডী), ভারতচন্দ্র (অন্নদা-মঙ্গল), রামপ্রসাদ (বিদ্যাসুন্দর), প্রেমানন্দ দাস (মনসার ভাসান) প্রভৃতি সে যুগের বাঙালী কবিগণ তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে এক-একটি 'সরস্বতী স্তব' প্রদান করেছেন।

বৈদিক যুগের আরম্ভ থেকে এত স্তব-স্তুতি খুব কম দেব-দেবীর উদ্দেশেই রচিত হয়েছে। প্রাচীন আর্যগণের কাছে সরস্বতী কেবল মানবেরই উপাস্য দেবী ছিলেন না, দেবতা-গণও তাঁকে রীতিমত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। মানুষ তাঁরই কৃপায় পায় কথা বলবার শক্তি, শুধু মানুষ কেন সর্ব চরাচর তাঁরই আশিসধারায় অভিষিক্ত। তিনি বিপুল শক্তিস্বরূপিণী, তাঁকে কেন্দ্র করে আর্য-ঋষিগণের জল্পনা-কল্পনার বিরাম ছিল না। স্বর্গে তিনি দেবতা-গন্ধর্বগণের প্রিয় হতে প্রিয় দেবী, মর্তে মানব-সংস্কৃতির উৎসস্বরূপ।

এ হেন দেবীর মাহাত্ম্যের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটা প্রশ্ন মনে আসে। প্রাচীন আর্যগণ নানা শক্তির প্রতীকরূপে বহু দেবদেবীরই কল্পনা করেছিলেন। সরস্বতীও তাঁদের কল্পনা এবং উপলব্ধির সৃষ্টি। জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে যে ঐশ্বরিক শক্তির তাঁরা কল্পনা করলেন, সেই শক্তিরই নাম দিলেন সরস্বতী। আর্যদের কাছে 'সরস্বতী' শব্দটি ছিল অত্যন্ত প্রিয়। 'সরস্বতী' নামের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া ছিল তাঁদের শক্তির বাইরে। আর্যদের এই বিশিষ্ট মনোভাবের কারণ জানতে হলে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান করার প্রয়োজন।

সরস্বতী শব্দের নিরুক্তি

যাস্ক তাঁর নিরুক্তে (২, ২৩) সরস্বতী শব্দের দুটি অর্থ করেছেন, 'নদীরূপা' ও 'দেবতারূপা'—"...সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।"

১, ৩, ১২ ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ বলেছেন—

"দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ।"

ঋগ্বেদ আলোচনা করলে সরস্বতীর উভয় অর্থেরই সার্থকতা দেখা যায়। 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ যে 'জল' ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না, তা বেদের গোড়ার দিকের মন্ত্র থেকে বেশ বোঝা যায়। কেউ কেউ 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ করেছেন জ্যোতি এবং এ নিয়ে তর্কেরও অবতারণা করছেন যথেষ্ট। তবে আমাদের মনে হয় বেদের পরবর্তী যুগে হয়ত 'সরস্' শব্দের অর্থের রূপান্তর ঘটেছিল, কিন্তু বৈদিক যুগে 'সরস্' শব্দের দ্বারা জলকেই বুঝাত।

সরস্বতী নদী ও আর্যগণ

অতি প্রাচীনকালে আর্যজাতি কেমন করে কোন্ কোন্ স্থান অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন তার বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন।

---

* মহাভারতের প্রাচীন নাম 'জয়', 'জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা। মহাভারত, আদি ৬২ অঃ, ২২ শ্লোক।

ভারতের বাইরে যে নদীর তীরে ছিল আর্যগণের আদিম বাসস্থান সেই নদীর উভয় তীর ছিল অত্যন্ত উর্বর, জল স্বাদু, স্বচ্ছ ও নির্মল। উক্ত নদীর চতুর্দিকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সপ্ত সিন্ধু (হপ্তহেন্দু) প্রবাহিত হ'ত। এই সপ্তসিন্ধুসমন্বিত ভূমিতে সপ্তসিন্ধুর অন্যতম সরস্বতী নদীর তীরে ইরাণী ও বৈদিক আর্যগণ বাস করতেন। বর্তমান অক্সস্ (Oxus) নদের প্রাচীন প্রবাহের সপ্ত শাখাই ছিল সপ্তসিন্ধু ব হপ্তহেন্দু এইখানেই আর্যজাতির মধ্যে হয় ত বিবাদ বাধে অথবা কোন নৈসর্গিক বিপৎপাতে আর্যজাতির এক শাখা উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।

আর্যদের ভারতে আগমন সম্বন্ধে কিছু কিছু উপকরণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক সূক্ত হতে এ সম্বন্ধে একেবারে গোড়াকার খবর কিছুই জানতে পারা যায় না। আর্যদের ভ্রমণের অতি সামান্য তথ্যই ঋগ্বেদ হতে পাওয়া যায়। প্রথমে আর্যেরা কাবুল নদের উপত্যকা দখল করেন। ক্রমে শতদ্রু ও পঞ্জাবের ঈশান কোণ পর্যন্ত তাঁদের অধিকারে এসেছিল। কিছুকাল পরে পূর্বদিকাভিমুখে তাঁরা আরও অগ্রসর হতে লাগলেন এবং সরস্বতী নদীর দুই তীরে বসতি স্থাপন করতে করতে গাঙ্গেয় ভূমির শীর্ষদেশ পর্যন্ত অধিকার করলেন—ঋগ্বেদের সূক্ত হতে এ ছাড়া আর বেশী কিছু জানা যায় না। আর্যেরা যখন কুরু পাঞ্চাল অধিকার করেন তখন ঋগ্বেদের সূক্ত রচনার পর্ব শেষ হয়ে গেছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে আর্যেরা ভারতে এসে প্রথম যেখানে বসতি স্থাপন করলেন তা পঞ্চনদীর দেশ। ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা ও শতদ্রু এই হ'ল সেই পাঁচটি নদী। আর্যদের আদিম বাসস্থান ছিল সপ্তসিন্ধুসমন্বিত ভূভাগ। এখানেও মিলল পাঁচটি নদী। স্থানটি তাঁদের মনের মতনই হ'ল। কিন্তু সাতের মহিমা তাঁদের মনোমধ্যে ছিল বদ্ধমূল হয়ে—আজন্মের অভ্যস্ত নাম তাঁরা ভোলেন কেমন করে? তাই আরও দুটি নদীর নাম মিলিয়ে নিয়ে তাঁরা নব বাসভূমিরও নাম দিলেন সপ্তসিন্ধু। এই নদী দুটির একটির নাম দিলেন সিন্ধু, আর পূর্বস্মৃতি বজায় রেখে অপরটির নাম রাখলেন সরস্বতী। সরস্বতী নদীর উভয় তীরেই তাঁরা বসতি স্থাপন করেন।

'সপ্ত' সংখ্যাটি ছিল আর্যদের অতি প্রিয়। তাঁরা 'তিন' প্রভৃতি সংখ্যার ন্যায় সাতকে অতি পবিত্র বলে মনে করতেন। সপ্তসিন্ধু—সাতটি নদী। সাতটি নদীবিশিষ্ট প্রদেশও সপ্তসিন্ধু। আর্যদের বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির নাম কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সাত সংখ্যাটির মোহ তাঁরা কোন দিনই ছাড়তে পারেন নি। সাতকে অক্ষুন্ন রাখতে তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। নদী সম্পর্কে কোথাও কোথাও সাতের সংখ্যা যে কখন অতিক্রম করে নি এমন নয়, তবে সাতকে তাঁরা একেবারে পরিহার করতে পারেন নি। ঋগ্বেদে সরস্বতীর ভগিনীর সংখ্যা কখনও সাত হয়েছে এবং আর্য ঋষিগণ প্রার্থনা করেছেন—

উত নরপ্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।

সরস্বতী স্তোম্যাভূৎ—৬,৬১,১০

সপ্তনদীরূপা সপ্তভগিনীসম্পন্না আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী আমাদের স্তুতিভাজন হোন। কখনও আবার সরস্বতীকে নিয়েই তাঁরা সাত ভগিনী হয়েছেন; তাই ত্রিলোকব্যাপিনী এই 'সপ্তধাতু'—সপ্তাবয়বা।

আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশে সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ক্রমে তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরও পূর্বে এবং মধ্যভারতাভিমুখে প্রসার-লাভ করে,—প্রয়োজনানুসারে তখন তাঁরা আবার নূতন করে সপ্তসিন্ধুর নামকরণ করলেন। হরিদ্বারের সুরেণু, পুষ্করের সুপ্রভা, হিমালয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত বিমলোদা, কুরুক্ষেত্রের ওঘবতী, নৈমিষারণ্যের কাঞ্চনাক্ষী, কোশলের মনোরমা ও গয়ার বিশালা তখন সপ্তসরস্বতী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। মহাভারতে দেখি এই সপ্তনদীর সমষ্টি সরস্বতী নাম ধারণ করেছে। ক্রমশঃ আর্যসভ্যতা যখন দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ল, তখন দেখতে পাই—সপ্তসিন্ধুর হ'ল সম্পূর্ণ নূতন নামকরণ। উত্তর-ভারতের সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনার সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরীও মূর্তিমতী পবিত্রতা রূপে নূতন নাম লাভ করে হিন্দুর পূজার্চনার সঙ্গে যুক্ত হ'ল। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সপ্তসিন্ধুকে আবহান করে হিন্দু বলে—

'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

সরস্বতী নদী ছিল আর্যদের কাছে পরম পবিত্র। এই নদীর তীরে মুনি-ঋষিরা অবস্থান করতেন। বহু রাজাও এঁর কূলে বাস করেছিলেন (ঋক্—৮,২১,১৮) "পঞ্চজাতা" এঁরই তটে বর্ধিত হয়েছিল (৬,৬১,১২)। সর্বোত্তম তীর্থ ছিল সরস্বতী। এই নদীর তীরে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবতাগণ পূর্বকল্প যজ্ঞ করেছিলেন এবং ভারতভূমিকে কর্মভূমিরূপে বরণ করে সরস্বতীর তীরবর্তী ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশকে তপস্যার উপযোগী, পবিত্রতম ও সর্বোত্তম স্থানরূপে নির্বাচিত করেন।

বর্তমান যুগে গঙ্গার যেমন মাহাত্ম্য পূর্বে সরস্বতীর গৌরব তদপেক্ষা অধিকই ছিল। সরস্বতীকে প্রাচীন আর্যগণ এত ভালবাসতেন যে, যেখানে তাঁরা গেছেন সেইখানেই এই নাম নদীবিশেষের উপর আরোপ করে এঁর স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখেছেন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমস্থলই প্রয়াগতীর্থ। এমন কি বাংলাদেশে হুগলীর নিকটে ত্রিবেণীতে একটি নদীকে সরস্বতী আখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

বস্তুতঃ এমন কোন স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস নেই যাতে সরস্বতী নদী ও তাঁর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের বর্ণনা করা হয়

নি। মহাভারতের শল্যপর্বে গদাযুদ্ধ পর্বের বলদেব তীর্থ-যাত্রাধ্যায় এবং সারস্বতোপাখ্যানে এই সরস্বতী নদী ও কুরুক্ষেত্রের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। বলদেব শ্রেষ্ঠ তীর্থ সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান প্লক্ষ-প্রস্রবণ দেখে প্রত্যাবর্তন-কালে বলেছিলেন—

সরস্বতীবাসসমা কুতো রতি: ?
সরস্বতীবাসসমা কুতো গুণা: ?
সরস্বতীং প্রাপ্যদিব গতা জনা।
সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্। ইত্যাদি

বলদেবের তীর্থযাত্রার বহুপূর্বেই সরস্বতীর বৃহৎ একাংশ অন্ত:সলিলা হয়। সেই স্থান বিনশন প্রদেশ নামে খ্যাতি-লাভ করে। এই বিনশন প্রদেশ বর্তমান উদয়পুর, মেবার ও রাজপুতানার পশ্চিম প্রান্তভাগের মরুপ্রদেশ—বিনশন প্রদেশও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এর মহিমা বহু স্থানে কীর্তিত হয়েছে।

হিমালয়ের প্লক্ষ-প্রস্রবণ থেকে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি। এটিই বেদোক্ত মুখ্য সরস্বতী মহানদী। এর পূর্বাংশে কুরুক্ষেত্র স্থাণুতীর্থ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান, এর লুপ্তাংশ বিনশন প্রদেশ এবং শেষাংশ আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী থেকে উত্থিত পশ্চিম-ভারতের সরস্বতী। এই অংশ পশ্চিম-দক্ষিণ সিদ্ধপুর পাটনা অর্থাৎ মাতৃগয়ার নিকট আজও প্রবাহিত হয়ে কচ্ছ ও দ্বারকার পাশে সমুদ্রের খাড়িতে মিলিত হয়েছে।

কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, পারসিকদিগের জেন্দ-অবেস্তা গ্রন্থে আফগানিস্থানের পূর্বাঞ্চল বা Arachosia-র যে 'হরখৈ্বতী' নদীর উল্লেখ আছে, বস্তুত: সেইটিই মূল সরস্বতী। পরে আর্যগণ পঞ্জাবের নদীর নাম দিয়েছিলেন সরস্বতী। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

ঋগ্‌বেদে আমরা দেখি, সরস্বতী অন্ত:সলিলা হবার পূর্বে এঁর মত বেগবতী নদী ভারতবর্ষে আর ছিল না। হিমগিরি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এর প্রবাহ ছিল অপ্রতিহত এবং এই নদীর প্রচণ্ড প্রবাহ শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করণার্থ আর্যদের নিকট ছিল সুরক্ষিত দুর্গের সুদৃঢ় দ্বার-স্বরূপ।

শাস্ত্রাদিতে এই সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নদীর উদ্দেশ্যে যে কত স্তব-স্তুতি ও উক্তি আছে তা বলে শেষ করা যায় না। সরস্বতী নদী ছিল, আর্যদের প্রাণস্বরূপ। এর জল পান করে এরই তীরবর্তী উর্বর ভূমিতে চাষ-বাস করে তাঁরা জীবন-ধারণ করতেন। আর্যঋষিগণ এই নদীর তীরে করতেন যাগ-যজ্ঞ, জ্ঞানচর্চা। সারস্বত প্রদেশই ব্রহ্মাবর্ত নামে অভিহিত হয়েছিল এবং ব্রহ্মাবর্ত থেকেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় ব্রহ্মাবর্ত আর্য-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং এর দ্বারা সারস্বত প্রদেশের মহিমাই কীর্তিত হয়।

তারপর কালক্রমে নদী সরস্বতী এক দিন দেবী সরস্বতীতে পরিণত হলেন। তখন আর্যদের অধ্যাত্মচিন্তাধারা একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছে। কল্পনায় তাঁরা সন্ধান পেয়েছেন স্বর্গলোকের, ধ্যাননেত্রে দেখছেন নানা দেব-দেবীর মূর্তি। যে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের তাঁরা ছিলেন উপাসক সেই শক্তি-গুলিকে ধ্যানলোকের এক একটি দেব অথবা দেবীর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে লাগলেন। জ্ঞান ও বিদ্যা, শক্তি ও সাধনার দেবী হলেন সরস্বতী। সরস্বতী নদীর তীরে জ্ঞান ও বিদ্যা-চর্চা হ'ত বলেই যে জ্ঞানের দেবী 'সরস্বতী' আখ্যা লাভ করেছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। সরস্বতী নদীর উপর আর্যদের ভক্তি বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল অসীম। তাই স্বর্গেও সরস্বতী সর্বশক্তিময়ী, দেবতাদিগের পরম প্রিয়, পরমারাধ্যা, সকল দেবদেবীর শীর্ষস্থানীয়া।

"অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।" ঋক—২ ৪১ ১৬

ঋষিগণ দেবী সরস্বতীর রূপও বর্ণনা করলেন—সরস্বতী শুভ্রবর্ণা (ঋক—১ ৯৫ ৬; ১ ৯৬.৩)। তিনি ভীষণ হিরন্ময় রথে আরূঢ়া—

"উত স্যান: সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনি"—ঋক—৬.৬১.৭।

দেবী ভারতী ও বাগ্‌দেবী

ভরত নামে আর্যদিগের একটি শাখা সিন্ধুনদ অতিক্রম করে সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হন এবং এই নদীর তীরে কিছুকাল বসবাস করেন। তাঁরাই সম্ভবত: তাঁদের জাতি-নামে সরস্বতীকে 'ভারতী'রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন, কারণ বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করলে আমরা সরস্বতী ও ভারতীকে অভিন্নারূপেই পাই।

শুক্ল যজুর্বেদ বলেন, সরস্বতী 'অশ্বিভ্যাং পত্নী' (১৯.৯৪)। শুক্ল যজুর্বেদের বহুস্থানেই সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। যজুর্বেদে একটি আখ্যায়িকা আছে—দেবতারা একবার এক যজ্ঞ করেন; সেই যজ্ঞে অশ্বিদ্বয় ভিষগ্‌রূপে এবং সরস্বতী 'বাচা'—ত্রয়ীলক্ষণা বাক্ সাহায্যে ইন্দ্রের বীর্য-সামর্থ্য বিধান করেছিলেন। এখানে আমরা প্রথম বাকের (বাক্যের) সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক দেখতে পাই। যখন তিনি বাক্য দ্বারা ইন্দ্রের বলাধান করেছিলেন তখন তাঁকে 'বাগ্দেবী' বলা যেতে পারে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে দেবী বাক্ নিজের পরিচয় নিজেই দিতেছেন—

'আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি। আমি আদিত্য প্রভৃতি সকল দেবতাগণের সঙ্গে থাকি। আমি মিত্র ও বরুণকে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।'

'আমি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

'দেবতা ও মনুষ্যগণ যাঁহার শরণাপন্ন হয়, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ দিয়া থাকি। যাহাকে মনে করিব তাহাকে আমি বলবান, স্তোতা, ঋষি বা বুদ্ধিমান করিতে পারি। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার অবস্থান, ইত্যাদি।'

বাক্ ও সরস্বতীর গুণরাশির মধ্যে পার্থক্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না, তবে ঋগ্বেদের যুগে যে বাক্ ও সরস্বতী একই দেবী ছিলেন না একথা বলা যায়। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য-যুগেই এই দুই দেবী অভিন্না হয়ে যান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন যে, বাক্ই সরস্বতী। শতপথ ব্রাহ্মণও (৩,৯ ১.৭) বলেছেন—"বাগৈ সরস্বতী।"

মোটের উপর বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য আলোচনা করে আমরা বাক্, ভারতী ও সরস্বতীকে অভিন্নারূপেই পাই। ইড়াও ক্রমে সরস্বতীর সঙ্গে মিশে যান এবং ভারতবাসী সেই বৈদিক যুগ থেকেই সরস্বতীর আরাধনা করতে আরম্ভ করেন। আজও সমগ্র ভারত জুড়ে তাঁর পূজা-অর্চনা। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে বৈদিক দেবদেবীগণের পূজা-অর্চনা হয়েছে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিরও তারতম্য ঘটেছে, অনেকে বিস্মৃতির অন্তরালেও চলে গেছেন। কিন্তু দেবী সরস্বতী সুদূর বৈদিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত সমভাবে পূজিতা হয়ে আসছেন। পাণিনির 'দিব্' ধাতুর দশবিধ অর্থানুযায়ী দেবতা হবেন তিনিই "যিনি ক্রীড়া করেন, যাঁহার লীলা-কৈবল্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ, যিনি অসুরগণের বিজিগীষু, পাপনাশক, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যিনি স্থাবর, জঙ্গম নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি জ্যোৎস্বভাব, যাহার প্রকাশে নিখিলবস্তু প্রকাশমান, যিনি সকলের স্তুতিভাজন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহারই গুণকীর্তন করে, যাঁহারই বিভূতি ঐশ্বর্য্য ব্যাপন করে, যিনি সর্বত্র গতিশীল, সর্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময়—চৈতন্যস্বরূপ, অখিলগতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি 'দেব'—তিনি 'দেবতা'।" দেবী সরস্বতীর মধ্যেও উক্ত গুণগুলির প্রত্যেকটিই বিদ্যমান।

পুরাণে সরস্বতী

সরস্বতীর আদিরূপ এবং মুনিঋষিদের ধ্যানযোগ ও কল্পনাবলে তাঁর সৃষ্টিরহস্যের গোড়ার দিক নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করলাম। এইবার দেখা যাক পৌরাণিক যুগে তাঁর কি রূপান্তর ঘটেছিল।

বেদ হ'ল ভারতের সর্বশাস্ত্রের মূল। পুরাণেরও উদ্ভব বেদ থেকে। বেদ আত্মা, পুরাণ দেহ—বেদ ভাব, পুরাণ চিত্র। ভাবের উপর তুলির আঁচড় যখন পড়ে কিছু রূপান্তর ঘটা স্বাভাবিকই। পুরাণেও হয়েছে তাই। হয়তো ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তৎকালীন মনীষিগণ এরূপ করে থাকবেন। সে যাই হোক, হিন্দুধর্ম্ম পৌরাণিক যুগেই দানা বেঁধে একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। নূতন নূতন দেবদেবীরও সৃষ্টি হয় এই সময়, তবে আলোচনা করলে বুঝা যায় যে বৈদিক দেবদেবীরাই প্রধানতঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে মানুষের কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন।

পুরাণে দেখি সরস্বতীর জন্মরহস্যের নূতন ব্যাখ্যা হ'ল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বললেন, সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণমুখোদ্ভূতা। নারদীয় পুরাণ, ধর্ম্ম ও কূর্ম্ম-পুরাণ মতে তিনি শিবের কন্যা, আবার শিবের শক্তি। বরাহপুরাণের সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মিলিত দৃষ্টি হতে জন্ম নিলেন ব্রহ্মীকলা = সৃষ্টি = সর্বাসারা, বাগীশা, বিশ্বেশ্বরী, সরস্বতী। তন্ত্রগুলির মধ্যে বৃহন্নীল, কুলার্ণব ও সারদাতিলক মতে সরস্বতী শিবদুর্গার কন্যা। পুরাণাদি শাস্ত্রে আরও আমরা দেখতে পাই, সরস্বতী কখন হচ্ছেন ব্রহ্মাণী, কখন ব্রহ্মার কন্যা, কখন তিনি বিষ্ণুশক্তি, কখন বা শিবশক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে, সরস্বতী শতরূপা প্রজাপতির মানসকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, ইত্যাদি।

মোটের উপর পুরাণে সরস্বতীর পরিচয় বেশ একটু গোলমেলে হয়ে গেছে। সরস্বতী যে ব্রহ্মার স্ত্রী সে কথা শাস্ত্রকারগণ একরকম সাব্যস্ত করেই নিয়েছেন। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টির অধীশ্বর, তাঁর অচ্ছেদ্য শক্তি সরস্বতী অধিষ্ঠিতা তাঁর মুখে। তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনিই আবার সৃষ্টির আদিকারণ বাক্ বা শব্দব্রহ্ম (Logos)। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (৪ ১,২) বলেছেন, 'বাগ্ বৈ ব্রহ্ম।'

বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার চক্ষু মুদ্রিত, তিনি ধ্যানমুদ্রায় সাতটি হংসের রথে সমাসীন। দক্ষিণে সরস্বতী, বামে সাবিত্রী। এঁরা সুন্দরী, সালঙ্কারা। কালিকাপুরাণে চতুর্মুখ চতুর্ভুজ ব্রহ্মার এক বর্ণনা আছে। তিনি কখনও রক্তকমল, কখনও বা হংসারূঢ়। এই ব্রহ্মারও বামে সাবিত্রী এবং দক্ষিণে সরস্বতী।

শতপথ ব্রাহ্মণে একটি আখ্যায়িকা আছে; এই আখ্যায়িকা অনুসারে ইন্দ্র নমুচি নামক এক অসুরকে বধ করবার জন্য সরস্বতীর শরণাপন্ন হন এবং সরস্বতী বজ্রের সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র এই বজ্র দ্বারা নমুচিকে বধ করতে সক্ষম হন। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (১২২) আছে—'সরস্বতীতি তদ্দ্বিতীয়ং বজ্ররূপম।' নিরুক্তেও আমরা পাই, অন্তরীক্ষ-দেবতা বাক্ই বজ্র।

কিন্তু পুরাণে বজ্রের সৃষ্টিতত্ত্বের রূপান্তর ঘটেছে। এখানে ইন্দ্র দধীচিমুনির অস্থি থেকে বজ্র সৃষ্টি করছেন। সরস্বতীর সহস্রমুখী বিপুল শক্তি আপাতদৃষ্টিতে পুরাণে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়—কারণ বজ্র বাকেরই অংশ এবং বাক্ই সরস্বতী।

সরস্বতীপূজা

বঙ্গদেশে শ্রীপঞ্চমীর দিন কলা ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজা হয়। বাংলার বাইরে কোন কোন জায়গায় আশ্বিন শুক্লা-অষ্টমীতে সরস্বতীর পূজা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে অপ্রচলিত হলেও আশ্বিনে সরস্বতী পূজার শাস্ত্র-বিধি আছে। তবে বর্ত্তমানে শ্রীপঞ্চমীর (আর এক নাম বসন্ত পঞ্চমী) দিনই পূজা হয়। এই শ্রীপঞ্চমীতে কেমন করে দেবী সরস্বতী পূজালাভ করলেন সেকথা নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে—

শ্রী অর্থে লক্ষ্মী। শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী পঞ্চমীরই দ্যোতক। কিন্তু সরস্বতী কেমন করে এই তিথির অধিকারিণী হলেন? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এ রহস্যের সমাধান করেছেন—

আবির্ভূতা যদা দেবী বক্ত্রতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ।
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী॥

কৃষ্ণযোষিতের মুখ থেকে আবির্ভূতা হয়েই বাগদেবীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা হ'ল শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পান। কিন্তু কৃষ্ণ তখন রাধাগত প্রাণ; তিনি অন্যদার হন কেমন করে? কাজেই বাগদেবীকে তিনি বললেন—তাঁকে পাওয়াও যা বিষ্ণুকে পাওয়াও তাই—কেননা বিষ্ণু কৃষ্ণেরই প্রতিরূপ; তিনি বিষ্ণুকেই পতিরূপে গ্রহণ করুন। সরস্বতীকে শান্ত করবার জন্য বললেন—

"পতিং তমীশ্বরং কৃত্বা মোদস্ব সুচিরং সুখম্।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড)

আরও বললেন, লোকে সরস্বতী পূজা করবে—

মাঘস্য শুক্ল পঞ্চম্যাং
বিদ্যারম্ভেষু সুন্দরি।" (ঐ পুরাণ)

পুরাণও বলছেন—

"আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা।
যৎ প্রসাদাদ্ মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিত।"
(ঐ পুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে হোক, অথবা পরে যে-কোন সময় থেকে হোক মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতীদেবীর পূজার রীতি প্রচলিত হ'ল। পূজার দিনের নামটা কিন্তু শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী-পঞ্চমীই রয়ে গেল। প্রথম প্রথম লক্ষ্মীই পূজা পেতেন, সরস্বতীর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশের উদ্দেশ্যে দোয়াত-কলম মাত্র পূজা হ'ত, কিন্তু কালক্রমে সরস্বতীই এই পূজার প্রায় সবটুকুর অধিকারিণী হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মীদেবীর ভাগ্যে জুটতে লাগল শুধু দুটো মন্ত্র আর সামান্য ফুল। কালক্রমে 'শ্রী' শব্দের অর্থেরও একদিন পরিবর্তন ঘটল। 'শ্রী' আর লক্ষ্মীর নাম রইল না; নূতন নাম হ'ল সরস্বতীর।

সরস্বতীপূজায় পশুবলি

পুরাণ এবং পৌরাণিক যুগের পরবর্তীকালে রচিত শাস্ত্রাদি নির্দেশিত বিধি-ব্যবস্থানুযায়ী বর্তমানে আমরা সরস্বতীপূজা করে থাকি। এই সকল ব্যবস্থা-নির্দেশাদি আমাদের অনেকেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। কিন্তু সরস্বতীপূজায় যে পশুবলিরও ব্যবস্থা আছে এটা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। সাধারণতঃ সরস্বতীপূজায় আমাদের দেশে পশুবলি হয় না এবং এই কারণে এই পূজায় বলির ব্যবস্থা আছে শুনলে আমাদের আশ্চর্য বোধ হয়।

শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে, সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সৌত্রামনী যাগের সৃষ্টি করে একটি মেষী বলিস্বরূপ পেয়েছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও সরস্বতীর প্রীত্যর্থে বলির ব্যবস্থা আছে। কোন ব্যক্তি যদি ভাল করে কথা বলতে না পারে, তাকে সরস্বতীর জন্য একটি মেষী হনন করতে হবে, কারণ সরস্বতীই বাক্। সরস্বতীর কাছে মেষ বলি দিলে নাকি সেই লোক দেবীর প্রসাদে বাগ্‌বিভব লাভ করবে। অশ্বমেধ যজ্ঞেও একটি মেষী সরস্বতীর বলি। পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে সরস্বতীপূজায় সাদা ছাগল আজও বলি দেওয়া হয়।

সরস্বতীর মূর্তি

দেবী সরস্বতী যে কেবল জ্ঞান, বিদ্যা ও শক্তির দেবতা তাই নয়, সৌন্দর্য্যের দেবতাও তাঁকে বলা যায়। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রাদি তাঁর রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনবদ্য। তিনি জ্যোতির্ময়ী, তিনি কল্যাণী, তিনি প্রেমময়ী, তিনি শুভ্রা, তিনি নিষ্কলঙ্কতার প্রতিমূর্তি। স্বর্গে মর্তে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান্ তার সবই যেন দেবীর অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান। এই সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে দেবীর বহুবিধ মূর্তি আমরা দেখতে পাই। সেই মূর্তিগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করব।

পদ্মাসীনা হংসবাহনা সরস্বতী

সচরাচর আমরা পদ্মাসীনা হংসবাহনা মূর্তিতে সরস্বতীকে দেখি। এটিই সর্বজনপরিচিত মূর্তি। হিন্দুর প্রায় সব দেব-দেবীই পদ্মাসীন বা পদ্মাসীনা; পদ্মের উপর দণ্ডায়মান দেবদেবীর মূর্তিও দৃষ্ট হয়। স্মরণাতীত কাল হতে পদ্ম ভারতীয় রূপভাবনা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বেদ, পুরাণ, সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে পদ্মকে অপার মাধুর্যময় ও সৌন্দর্যের সার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই সরস্বতী যে পদ্মাসীনা, অথবা পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা হবেন এ ত খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি হংস-বাহনা কেন?

পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি। তিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সংস্কৃত ভাষার জননী। ব্রহ্মা হংসবাহন। সেই হিসাবে ব্রহ্মাণী সরস্বতীও হংসবাহনা হবেন। দেবের যে বাহন, দেব

পত্নীরও সাধারণত: সেই বাহন হয়। আবার পুরাণাদিতে নির্দেশ আছে, সরস্বতীর সৃষ্টি মানস-সরোবর থেকে, মানস-সরোবরের হংস চিরপ্রসিদ্ধ। কাজেই মানস-সরোবরের দেবীর সঙ্গে হংসের একটা সম্পর্ক কল্পনা করা অসঙ্গত নয়।

ময়ূরবাহনা সরস্বতী

বোম্বাই ও রাজপুতানায় ময়ূরবাহনা চতুর্ভুজা সরস্বতী মূর্তি দেখা যায়। কানিংহাম সাহেবের Archaeological Survey Report (vol. ix)-এ একটা সুন্দর কারণ দেখছি তাঁর মতে সরস্বতী নদীর তীরে ময়ূরের আধিক্যবশত: দেবীকে ময়ূরবাহনা বলে কল্পনা করা হয়েছে।

মেষবাহনা সরস্বতী

সোত্রামনী যাগে দেবী বলিস্বরূপ মেষ পেয়েছিলেন। তাই দেবীর মেষবাহনা মূর্তিও আমরা দেখতে পাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় এইরকম একটি মূর্তি আছে।

সিংহবাহনা সরস্বতী

"সিংহবাহনা সরস্বতী বৌদ্ধ সরস্বতী। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী, মঞ্জুশ্রীর বাহন সিংহ; সুতরাং তাঁর শক্তি সরস্বতীর বাহনও সিংহ হয়েছে।" কলিকাতার প্রত্নশালায়ও একটি সিংহবাহনা চতুর্ভুজা বাগীশ্বরী মূর্তি আছে। তাঁর দুই হাতে পরশু ও গদা, অপর দুই হাতে দানবের জিহ্বা উৎপাটন করছেন।

বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা সরস্বতীর ভক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধযুগে নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান এবং যবদ্বীপে সরস্বতীর পূজা হ'ত। এই সব দেশে সরস্বতীর মন্দির ও দেবীর নানাপ্রকার মূর্তি আজও বিদ্যমান।

জৈনদের মধ্যেও সরস্বতী পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। জৈনসম্প্রদায়ের নিকটেও তিনি জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জৈনগণ সরস্বতীকে শাসন দেবীরূপেও শ্রদ্ধা করে থাকেন।

যে কয়প্রকার মূর্তির আলোচনা করলাম তা ছাড়াও দেবীর আরও বহুপ্রকার মূর্তি আছে। কোথাও তিনি একক দাঁড়িয়ে আছেন, কোথাও আছেন বসে; কোথাও ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণুর পরিবার দেবতারূপে দণ্ডায়মানা। কখন তিনি 'বীণাপুস্তক-ধারিণী' দ্বিহস্তা, কখন চতুর্হস্তা, ং ত্রিমুখ, চতুর্মুখ বা পঞ্চমুখ। কখন দেখি অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমায় তিনি 'নৃত্যসরস্বতী,' কখন বা বীণাবাদনরতা 'ললিতাসনা,' কোথাও দেবী ত্রিনেত্রা 'বজ্র-সারদা,' কোথাও ধ্যানগম্ভীর 'প্রজ্ঞাপারমিতা'।

ভারতের প্রায় প্রতি প্রদেশেই সরস্বতীর বিভিন্ন প্রকার মূর্তি বিদ্যমান। অন্য কোন দেবদেবীর মূর্তির এত প্রকারভেদ আছে কিনা সন্দেহ। মানব-সভ্যতার প্রভাতে সেই সুদূর বৈদিক যুগ হতে সরস্বতীপূজার প্রচলন হয়েছে। তাঁকে পূজা করেছে বৈদিক ভারত, পূজা করেছে পৌরাণিক ভারত; সকল যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকল সম্প্রদায়ের কাছেই দেবী সমভাবে পূজা পেয়েছেন। শুধু ভারতের মধ্যেই এই পূজা সীমাবদ্ধ থাকে নি। বৌদ্ধযুগে ভারত থেকে সিংহল, যবদ্বীপ, তিব্বত, চীন ও সুদূর জাপান পর্যন্ত সরস্বতী পূজা বিস্তারলাভ করেছিল।

একালের জগৎশেঠ

শ্রীঅমলেন্দু সেন

সুবা বাংলার রাজকার্য্য চালাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে দুই-চারি কোটি টাকা জোগাইয়া মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠী ফতেচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি পাইয়াছিলেন। উপাধিদাতা সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌ আজ বাঁচিয়া থাকিলে বুঝিতেন যে শেঠজী একরূপ ফাঁকি দিয়াই এত বড় উপাধিটা লাভ করেন। কারণ ফতেচাঁদজীর এমন সামর্থ্য, সুযোগ কিংবা বাসনা ছিল না যে জগতের শেঠত্ব করেন।

যিনি যথার্থ'ই জগৎ-শেঠত্ব দাবি করিতে পারেন, তাঁহার দেখা মিলিতেছে এতদিনে। তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন আজ চারি বৎসর হইল। এ অবতারে তাঁহার যুগল মূর্তি—আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development) এবং আন্তর্জাতিক ধন ভাণ্ডার (International Monetary Fund); ইঁহারা দুই জনে মোট প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা লইয়া রণবিধ্বস্ত জগতের দুঃখমোচনের কার্য্যে নামিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬)। এবার আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার (সংক্ষেপে 'ভাণ্ডার') বিষয়ে দুই-চারি কথা বলিব।

ইউনাইটেড নেশ্যনস্‌ গঠিত হওয়ার সমসময়ে আমেরিকার ব্রেটন-উড্‌স্‌ নামক স্থানের বৈঠকে (জুলাই ১৯৪৪) বিভিন্ন

জাতির প্রতিনিধিবর্গের আলোচনার ফলে এই ব্যাঙ্ক এবং ধন-ভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়। কাজ আরম্ভ হয় ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৫।

ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য মুখ্যত: তিনটি: (১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুসমঞ্জস বর্দ্ধনের দ্বারা দেশে দেশে বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা; (২) আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়-হার এবং আভ্যন্তরীণ মুদ্রামূল্য স্থির রাখা ও তজ্জন্য সদস্যরাষ্ট্রদিগের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা; (৩) এই সকল কারণে প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করা।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার পরস্পরের পরিপূরকরূপে কার্য্য করেন। কারণ ব্যাঙ্কের কার্য্য দেশে দেশে উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের প্রবর্ত্তন এবং ভাণ্ডারের লক্ষ্য দেশে দেশে মুদ্রা-মূল্যের স্থিরতা সংরক্ষণ। কিন্তু দেশে মুদ্রামূল্য বেশী উঠানামা করিলে শিল্প প্রসারের চেষ্টা ব্যাহত হয়, অপরন্তু দেশের উৎপাদনীশিল্পসমূহের প্রসার না হইলে মুদ্রামূল্যের স্থিরতা রক্ষা করা কঠিন। তাই ব্যাঙ্ক ও ভাণ্ডার সর্ব্বদা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। উভয়েই ইউনাইটেড নেশ্যনস্-এর অর্থ ও সমাজ পরিষদের (Economic and Social Council) সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, এবং তাহার মধ্য দিয়া মহাসভার (General Assembly) সহিত সংযুক্ত।

যে সকল রাষ্ট্র এই ধনভাণ্ডারের সদস্য, তাঁহারা সকলেই যে ইউনাইটেড নেশ্যনস্-এর সদস্য এমন নহে; যথা, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও ইটালী। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাণ্ডারের সদস্যসংখ্যা ছিল ৪৬ অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশ্যনস্-এর সকল সদস্য (৫৮) এই ভাণ্ডারে যোগ দেন নাই। ভাণ্ডারের সদস্যগণ সকলেই অবশ্য ব্যাঙ্কেরও সদস্য আছেন। ভারত তাঁহাদের একজন।

ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব একটি নিয়ামক-পরিষদের (Board of Governors) উপর ন্যস্ত আছে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের নির্ব্বাচিত একজন নিয়ামক এবং একজন বিকল্প-নিয়ামক (Alternate Governor) অর্থাৎ মোট ৯২ জন প্রতিনিধি লইয়া এই পরিষদ গঠিত। বর্ত্তমানে ভারতের প্রতিনিধি আছেন স্যর বেনেগল রাম রাও।

ইহার কার্য্য পরিচালনার জন্য আছেন ১৪ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি নির্ব্বাহী পরিচালকমণ্ডলী (Executive Directors)। যে পাঁচটি রাষ্ট্র এই ভাণ্ডারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ দিয়াছেন তাঁহারা পাঁচ জনকে এবং অপর রাষ্ট্র-গুলির নিযুক্ত নিয়ামকগণ (Governors) অন্য নয় জনকে মনোনয়ন করেন। এই ১৪ জন ডিরেক্টর বাহির হইতে একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাকে বলা হয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর। প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন বেল-জিয়ামের ক্যামিল্ গাট।

ভাণ্ডারের সদস্যরাষ্ট্রগণ নিজ নিজ চুক্তি অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা দিয়াছেন। দেয় অর্থের এক-চতুর্থাংশ সোনা দিয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা কোনও সদস্যের পক্ষে সাধ্যাতীত হইলে সেই রাষ্ট্রের হাতে মোট যত সোনা আছে তাহার এক-দশমাংশ ভাণ্ডারকে দিবার নিয়ম; বক্রী টাকা দিতে হয় নিজ নিজ দেশের মুদ্রা দিয়া। ১৯৪৮ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভাণ্ডারের হাতে এই হিসাবে মোট ৭৯০ কোটি ডলার (প্রায় ২৬৩৩ কোটি টাকা) জমা ছিল।

প্রথমেই দেশে দেশে স্থানীয় মুদ্রার সরকারী মূল্য (official par value) স্থির করিবার চেষ্টা করা হয়। পারস্পরিক আলোচনার ফলে প্রথমে ৩২টি দেশের এবং পরে আরও ছয়টি দেশের মুদ্রামূল্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের ব্যাপারের নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এবং ভাণ্ডারের বিনানুমতিতে কোনও সদস্যরাষ্ট্রই তাঁহার মুদ্রার এই নির্দ্দিষ্টীকৃত মূল্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না।

এই মূল্য-স্থিরীকরণের ফলে বহু দেশের বিনিময় হারের মধ্যে যে সাময়িক অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তাহা নিরাকরণের জন্য ভাণ্ডার হইতে ৩৮টি দেশকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে, এ কথা ভাণ্ডারের মুখপত্র *Internationol Financial Statistics* নামক মাসিক পত্রের ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী সংখ্যায় দেখা যায়। তন্মধ্যে ইংলণ্ড লইয়াছিল ৩০ কোটি ডলার (১০০ কোটি টাকা), ফ্রান্স ১২॥০ কোটি ডলার, হল্যাণ্ড ৬।০ কোটি ডলার ও ১৫ লক্ষ পাউণ্ড। ভারত লয় ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার (প্রায় ৯⅓ কোটি টাকা)।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর দেশগুলি নিজ নিজ অর্থসঙ্কট ও মুদ্রাসমস্যা সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে পরস্পরের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ পায়, এবং একে অপরের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভের আশা করিতে পারে। পরামর্শ দিবার জন্য প্রয়োজন হইলে আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার আপন রাষ্ট্রের অবস্থা পর্য্যালোচনার উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদিগকে পাঠাইয়া থাকেন। ভাণ্ডারের দপ্তরে সকল সদস্যরাষ্ট্রেরই নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ মুদ্রাব্যবস্থা ও বহির্বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ প্রতি মাসে পাঠাইয়া দিবার নিয়ম আছে।

অনাথপিণ্ডদসুতা সুপ্রিয়ার স্বপ্ন সফল করিবার ভার লইয়াছেন আজ ইউনাইটেড নেশ্যনস্-এর আত্মজা এই ব্যাঙ্ক ও ধনভাণ্ডার। ভিক্ষা-অন্নে বসুধাকে বাঁচাইবার এই প্রয়াস কতদূর সফল হয় দেখা যাউক।

কলঙ্কিনী

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বর্ত্তমানের দেশব্যাপী বিষাক্ত আবহাওয়ার স্পর্শ বাঁচিয়ে এখনও সে গ্রামের হিন্দু মুসলমান দিব্যি পাশাপাশি বাস করছে। কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, কিন্তু তা নিয়ে অনাবশ্যক মাতামাতি নেই। বরং সহজ যুক্তির কাছে তার মীমাংসার পথ সব সময়েই খোলা আছে। নইলে এত বড় মাতব্বর ব্যক্তি ইয়াসিন মিঞাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে সে গ্রামের কারুরই সাহস হ'ত না। কিছুদিন ধরে তার সংসারের একটি অতি গোপন কথা নিয়ে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে অনেক কানাঘুষাই শোনা যাচ্ছে। সবিস্তারে না হলেও তার কিছু কিছু ইয়াসিনের কানেও এসেছে, কিন্তু সে তাকে মোটেই আমল দেয় নি। বয়স তার খুব বেশী না হলেও গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা তার ষোল আনাই আছে, তাই সামান্য ব্যাপারকে অসাধারণ করে তুলতে চায় নি।

ইয়াসিন মিঞা পাকা চাষী গৃহস্থ। জোত, জমি, গোয়ালে গরু, উঠানে ধানের জোড়া মরাই—কোন কিছুরই অভাব নেই। সেই সঙ্গে আছে নগদ টাকা। কথাটা সকলের জানা। ইয়াসিন এ বিষয় একটু বিশেষ ভাবেই সচেতন। সংসার তার ছোট। খুবই ছোট। স্বামী স্ত্রী এবং একমাত্র মেয়ে আমিনা। আমিনার বিয়ের বয়স বহু দিন পার হয়ে গেলেও আজও সে অনূঢ়া। কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত: ভাল পাত্র আজও পাওয়া যায় নি, দ্বিতীয়ত ইয়াসিন তেমন ভাবে চেষ্টাও করে নি। অপত্যস্নেহ তাকে নিবৃত্ত করে রেখেছে। যে ক'টা দিন কাছে থাকে সেইটুকুই লাভ। তা ছাড়া কি আর এমন বয়স হয়েছে। সবে মাত্র তেরোয় পা দিয়েছে আমিনা। কিন্তু পুরন্ত গড়নের জন্যে বয়সের অঙ্কটা সহজে কেউ বিশ্বাস করে না। মেয়েও হয়েছে তেমনি—আজও বাপের সঙ্গে জাঙ্গালে মাছ ধরতে যায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কোমরে কাপড় জড়িয়ে গাছে চড়ে, ফল পাড়ে। সে ফল ওপাড়ার হিন্দু ঝি-বৌদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে আসে। তাদের সঙ্গে তাদের সংসারের নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আলাপ করে। নববিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাইতেই ওর আগ্রহ বেশী। হাঁ করে সে ওদের গল্প শোনে। অন্তরে কি যেন একটা ব্যাকুলতা অনুভব করে। নূতন নূতন প্রশ্ন করে আলোচনার গতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। মনে তার রং ধরেছে। সে রঙে তার পৃথিবী অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে। বাড়ী ফিরে আসে খুশীর আমেজে যেন ডানায় ভর করে, কিন্তু বাড়ীর আঙ্গিনায় পা দিতেই তার স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। মা চেঁচামেচি করে বাড়ী মাথায় করে তুলেছে। মেয়েকে ফিরে আসতে দেখেই সে ফেটে পড়ল—তোর আক্কেলডা কেমন লো আমিনা? এতহানি বেইল কোথায় আছিলি তুই? তোর বাপজানের ফেরবার সময় হইছে—বাসি ওই কয়হান ধুইয়া লইয়া আয়।

আমিনা কঠিন বাস্তব সংসারে ফিরে এসেছে। বিনুদিদির ফুলশয্যা-রজনীর চিত্তাকর্ষক গল্পের সঙ্গে কোথাও এক বিন্দু মিল নেই। আমিনা দ্রুতপদে বাসি থালা-বাটি নিয়ে ঘাটের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়। বাটির শব্দে আকৃষ্ট হয় তার পোষা দুটো হাঁস। প্যাক প্যাক শব্দ করে জেগে ওঠে তারা। আলস্য ভেঙে দ্রুত অনুসরণ করে আমিনাকে। গ্রীবা বাঁকিয়ে চেয়ে দেখে আরও দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে যায় সে। হাঁস দুটো পেছনে পেছনে আসতে থাকে।

পুকুর-ঘাটে নামবার পূর্ব্বে মুহূর্ত্তের জন্য আমিনা থমকে দাঁড়ায়। এঁটো বাসনগুলি নামিয়ে রাখে। হাঁস দুটো আরও দ্রুত গতিতে ছুটে আসে। আমিনার মুখে হাসি দেখা দেয়। ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, কিছু নাই রে···কিছু নাই।··· হাঁস দুটো বারকয়েক বাসনগুলোর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে মাথা নেড়ে নেড়ে ডাকে প্যাক···প্যাক···প্যাক···

আমিনা বসে পড়ে। নীরবে একদৃষ্টে হাঁস দুটোর পানে তাকিয়ে থাকে। ওদের একটা অপরটাকে তখন সোহাগ জানাচ্ছে চঞ্চুতে চঞ্চু ঠেকিয়ে। আমিনা কি ভাবে তা সেই জানে। হয় তো বা বিনুদিদির কাছে শোনা তার ফুল-শয্যার রাতের কাহিনী তার মনকে নাড়া দেয়। দু'চোখ তার ভাবাবেগে গভীর হয়ে ওঠে। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অনুভূতি তাকে বিহ্বল করে তোলে। আমিনা সহসা হাত বাড়িয়ে একটা হাঁসকে ধরে ফেলে বুকের উপর গভীর আবেগে চেপে ধরে। এমন সে ইতিপূর্ব্বে বহুবার করেছে, কিন্তু আজকের দিনটি তার বুকে এক অপূর্ব্ব স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। হাঁসের মাথাটি গালের উপর চেপে ধরে সে চোখ বুজে বসে থাকে। কান পেতে শোনে তার বুকের মধ্যে এক নূতন সুরের ব্যঞ্জনা।···সহসা মায়ের কর্কশ কণ্ঠের তিরস্কারে চমকে উঠে আমিনা হাঁসটাকে ছেড়ে দিলে।

মা বলছিলেন,—ঢ্যাংড়া মাইয়া হইছস্, তোর বুদ্ধিহইবে কি মরলে! দুইহান থাল মাজ্‌তে আইছস দুই দণ্ড আগে না···

আমিনা চোখ তুলে দেখে মার পশ্চাতে তার বাবাও নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। সে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। ছিঃ ছিঃ—বাবা কি ভাবলেন।

মা পুনরায় কাংস্যকণ্ঠে চিৎকার করে উঠতেই ইয়াসিন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, চুপ দে আমিনার মা। বিল্লি দিয়া হাল-চাষ কয়োন যায় না।

আমিনার মা কিন্তু থামতে পারলে না, বলতে লাগল—চুপ দেবার হয় তুমি ভাও। আমি মাইয়া মানুষ, আমারে শিখাইতে হইবে না। ঢ্যাংড়া মাইয়া ঘরে পুইষসা বাধপা হইবে না এমন দশা। তোর আইজ কোন খোয়ার করি দেখফি।

ইয়াসিন একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে তাকায়। আমিনাকে বলে,—খাড়াইয়া খাড়াইয়া শোনস কি আমিন্ তুই আমার লগে আয়।

এবার ইয়াসিন মেয়ের বিয়ের জন্য রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং এক মাসের মধ্যেই পাশের গ্রামের বসির আলীর একমাত্র ছেলে ইদ্রিসের সঙ্গে আমিনার বিয়ে হয়ে গেল।

দিব্যি লম্বাচওড়া ছেলেটি। মাথাভরা একরাশ কাল চুল। মাঝখান দিয়ে সিঁথি। দু'পাশ দিয়ে লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ। ভরাট গোলগাল মুখখানি। মিশ-কালো গায়ের বর্ণ। ঝকঝকে দু'পাটি দাঁত। মুখে হাসি লেগেই আছে। বয়স বছর কুড়ি; একটু বেশীও হতে পারে। আমিনার সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে।

আমিনা চেয়ে চেয়ে দেখে। মরদের মত চেহারা বটে। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। আমিনা তার দুই সবল বাহু-বেষ্টনের মধ্যে একান্ত নির্ভরতায় ধরা দেয়। জীবনের একটা নূতন দিক তার কাছে অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বসির আলি ইয়াসিন মিঞার মত অতটা সঙ্গতিপন্ন না হলেও মোটামুটি অবস্থা তার ভালই। খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। নিজের জমিতে দুই বাপ বেটায় মিলে লাঙ্গল দেয়। তাদের মিলিত চেষ্টায় সেখানে সোনা ফলে। নগদ টাকাকড়ি বেশী নেই বটে, কিন্তু অনটনও নেই। পাকা গৃহস্থ।

আমিনার দিন এখানে ভালই কাটছে। স্বামীর কতকগুলি কাজ সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এর উপর আছে গরুর জাবনা দেওয়া, সংসারের ছোটবড় ফাইফরমাস খাটা। ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। সারাদিন আমিনা চরকির মত হাসিমুখে ঘুরে বেড়ায়। মোটের উপর শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। বাপ মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেয়। নিয়ে যাবার কথা উঠলে আমিনা নিজে থেকে আপত্তি জানায়। বলে, বুড়া হাউড়ি—বাপ হাসিমুখে প্রস্থান করে। শাশুড়ী খুশী হন—ননদিনী আড়ালে মুখ টিপে হাসে। আর ইদ্রিস আয়নায় বার বার মুখ দেখে অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে।...

শাশুড়ী, ননদিনী তাকে ভাল চোখেই দেখে। আমিনা এ বাড়ী আসার পর থেকে তারা একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার অবকাশ পেয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। আমিনা রান্না করতে বসে ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হাত চালিয়ে দ্রুত কাজ শেষ করতে গিয়ে আরও দেরী করে ফেলে। নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে অকারণে হাতা খুন্তি লোহার কড়াইয়ের উপর আছড়ে ফেলে। সেই শব্দে সে যেন কতকটা আত্মস্থ হয়।

ননদিনী হাঁক দেয়,—হেই শোনছনি ভাইজান আইছে। এক ধামা হুরুম দিয়া যাও, আর বাপজানের তামাক। এগুলি আমিনার নিত্যকরণীয় কাজ। এর পরের দৃশ্যে ননদিনীকে দেখতে পাওয়া যায় রান্নাঘরে। এবার তাকেই নিতে হবে পাকশালার ভার। আমিনা খুশী হয়ে ওঠে বলে, কারেরথনে দুইহান দাউর লামাইয়া লইও। মোর মনে আছিল না। সন্ধ্যাবেলায় আমিনার ভুলচুক প্রায়ই হয়, কিন্তু তা নিয়ে কারুর তরফ থেকে অনুযোগ নেই।

আমিনা ত্বরিতপদে প্রস্থান করে। স্বামীকে একধামা মুড়ি দিয়ে শ্বশুরের জন্যে তামাক সাজতে বসে। ক'লকের কয়লায় আগুন দিয়ে নিঃশব্দে ফুঁ দেয়। আগুনের রক্তিম আভা আমিনার মুখে প্রতিফলিত হয়ে বড় চমৎকার দেখায়। অদূরে বসে মুড়ি খেতে খেতে ইদ্রিস মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখে। একবার বাপের অলক্ষ্যে হাত পা নেড়ে কিছু একটা ইসারা করতে চায়। কিন্তু কষ্টে নিজের ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রাখে। আমিনা দেখেও দেখে না। একমনে ক'লকেতে ফুঁ দিতে থাকে।

ইদ্রিস বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। বলে, বাপ-জানের তামাক দিয়া মোরে দুইডা কাচামরিচ দিয়া যাইও। খালি হুরুম খাওন যায় না।

আমিনা শ্বশুরকে তামাক দিয়ে স্বামীর জন্য কাঁচা লঙ্কা আনতে যায়। তার পরনের কাপড়ে পা জড়িয়ে পত্ পত্ শব্দ হয়। ইদ্রিসেরও চোখ-কান সজাগ হয়ে ওঠে। আমিনার চলাফেরা, কথা বলা সবই তার মনকে দোলা দেয়।

রাত্রে একলা ঘরে আমিনা স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে গদ গদ কণ্ঠে বলে, মোরে তোমার একখান ফটোক দেবার পার নি।

ইদ্রিস বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ফটোক। মোর ফটোক দিয়া তুই করবি কি?

আমিনা বলে, আমাগো গেরামের বিনুদিদি সোয়ামীর ফটোক হারের লকেটে বন্ধাইয়া থইছে—ইদ্রিস দাঁত বের করে হাসে। আধো আলো আধো অন্ধকারে দাঁতগুলি তার ঝক্ ঝক্ করে ওঠে। সে খুশীর সুরে বলে, তোর হার নাই—ঝুলাবি কিসে?

'আমিনা চটপট জবাব দেয়, ক্যান কালা সুতায়।

ইদ্রিস আবার হেসে ওঠে। গদ গদ কণ্ঠে বলে, আইচ্ছা, আইচ্ছা, দিমু তোরে একখান ফটোক।

আমিনা বলে, আমাগো গেরামের মাখমরাজ খুব ভাল ফটোক উডায়।...ইদ্রিস হাসিয়া আমিনাকে সজোরে বুকে চেপে ধরে।

ফটো একখানার ব্যবস্থা ইদ্রিসকে বহু আয়াসে করতে হয়, কিন্তু সে ফটো আমিনা গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারে নি। ফটো মিলেছে তাইতেই আমিনা খুশী। সে সযত্নে তা টিনের তোরঙ্গে রেখে দিয়েছে। মাঝে মাঝে দ্বিপ্রহরে স্বামী যখন ক্ষেতে কাজে ব্যস্ত থাকে, সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আমিনা ফটোখানি বের করে তন্ময় হয়ে দেখে।

ইদ্রিস চাষী গৃহস্থ হলেও তার রসবোধ আছে। স্ত্রীকে সে আড়ালে আবডালে গান শোনায়—বাঁশীর সুরে মোহিত করে। আদর করে গাল টিপে দেয়।

কিন্তু তাদের জীবনের এই স্বচ্ছন্দ গতি এক দিন অতি অকস্মাৎ ব্যাহত হয়। এর জন্যে আমিনা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। জ্ঞান হবার পর থেকে যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে তার সঙ্গে বর্ত্তমানের কোথাও এক তিল মিল নেই, ফলে তার মন শুধু বিক্ষুব্ধ হয়েই উঠল না, তার প্রকাশ ঘটল তীব্র প্রতিবাদের রূপ নিয়ে।

ইদ্রিস চঞ্চল হয়ে উঠল। শঙ্কিত হয়ে উঠল নিকটেই পিতার উপস্থিতির কথা চিন্তা করে, কিন্তু স্ত্রীকে নিবৃত্ত করতে সে পারলে না, শুধু নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। আমিনা তখন উচ্চ কণ্ঠে বলছিল, ক্যান হিন্দুরা তোমারগো করছে কি যে হারগো খ্যাদাইবার চাও। এমন কাম তোমারে করতে দিমু না।

ইদ্রিস মৃদুকণ্ঠে বললে, বাপজান হুকুম দিছে আমিনা মুই করমু কি! পুবের সুয্যি পচ্ছিমে ওড্‌লেও হুকুম বাপজান ফিরাইবে না।

আমিনার দু'চোখ জ্বলে ওঠে। বলে, তোমার বাপজান যদি মোরে খুন করতে কয়? প্রশ্নটা অত্যন্ত সহজ হলেও উত্তর দিতে গিয়ে ইদ্রিস চমকে উঠল। মনে মনে বলল, তোবা তোবা...আমিনা কি পাগল হইছে। কিন্তু মুখে কোন কথাই সে বলতে পারল না শুধু বড় অসহায়ভাবে আমিনার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমিনা সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারলে না, তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণে বসির আলির উপস্থিতিতে কষ্টে নিজেকে সংযত করলে।

ইদ্রিস এক মুহূর্ত্তে অনেক কথা চিন্তা করে ফেললে। তার বাপকে সে জানে। তার প্রচণ্ড ক্রোধের কথাও ইদ্রিসের অজানা নয়। সামান্য কারণেও যে বসির কত নির্ম্মম হয়ে উঠতে পারে, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু ইদ্রিস আজ ভয় পেলে না। ধীরে ধীরে উঠে এসে স্ত্রী এবং বাপের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। বসির আলি এতক্ষণে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ সুরু করে দিয়েছে। তার প্রচণ্ড ক্রোধের কথা চিন্তা করেই সম্ভবতঃ বসিরের স্ত্রী ও কন্যা সেখানে উপস্থিত থেকেও নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ইদ্রিস এগিয়ে আসতে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার মা বললে, তোমার মাথায় কি খুন চাপছে?

বসির আলি গর্জ্জন করে ওঠে, তুমি চুপ দেও। চাইর আঙুল মাইয়ার এত সাহস! আইজ অর এক দিন কি আমারই এক দিন।

ইদ্রিসের দু'চোখ জ্বলে উঠল, তার শরীরেও যেন একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বসিরের তা দৃষ্টি এড়াল না। আপন অতীত যৌবনের দৃপ্ত প্রতিচ্ছবি সে পুত্রের মধ্যে আবিষ্কার করে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, এবং স্ত্রীর অনুরোধে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ঘটনাটার এখানেই যে শেষ হবে না এ কথা আঁচ করে মার সঙ্গে পরামর্শ করে সেই রাত্রেই ইদ্রিস আমিনাকে গোপনে তার বাপের কাছে পাঠিয়ে দিলে। এর চেয়ে কোন সহজ পন্থা তাদের চোখে তখনকার মত পড়ল না। তা ছাড়া গ্রামের আর দশজনার বিরুদ্ধে একলা কতক্ষণ সে লড়াই করবে। আমিনাকে ইদ্রিস মাঝে মাঝে বাপের বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হবার প্রতিশ্রুতি দিলে। অথচ এমনি দুর্ভাগ্য যে, সে পথও তাদের রুদ্ধ হয়ে গেল। ইয়াসিন কন্যার এই অপমানকে মোটেই সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। মেয়ের পিঠ চাপড়ে বললে, সাবাস বাপের বেডি।...দু'চোখে তার আনন্দ এবং ঘৃণা একই সঙ্গে ফুটে উঠল। গ্রামের অন্যান্য মাতব্বর ব্যক্তিদের নিয়ে সে বৈঠক করলে। পাশের গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এই যে আয়োজন চলছে তার প্রতিকার করতে তারা বদ্ধপরিকর হ'ল। নইলে তাদের নিজেদের গ্রামের ভাঙন রোধ করবে তারা কেমন করে? খবরটা ওগ্রামে গিয়ে পৌঁছাতে বিলম্ব হ'ল না। বসির আলির কাছে সে খবর আরও পল্লবিত হয়ে গিয়ে পৌঁছল, কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশ শুধু শূন্যে হাত পা ছুঁড়ে তাকে ক্ষান্ত হতে হ'ল।

কিন্তু সত্যিকারের বিপদে পড়ল ইদ্রিস, আর চোখে অন্ধকার দেখল আমিনা। আজ একটি সপ্তাহ হ'ল সে বাপের বাড়ীতে এসেছে, এর মধ্যে একটি দিনের জন্যও ইদ্রিসের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। যতক্ষণ চোখের সম্মুখে থাকা যায় ততক্ষণই...নইলে...আমিনা তার বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে স্বামীর ফটোখানি বের করে মুগ্ধ চোখে দেখে। একবার আশেপাশে চঞ্চল দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বুকের উপর চেপে ধরে

মুখের সন্নিকটে এগিয়ে নিয়ে যায়। মন অশান্ত হয়ে উঠে। অকারণে সে তার পোষা হাঁস দুটোকে পীড়ন করে। ওরা তারস্বরে চীৎকার করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমিনা ঘরে ফিরে আসে। মাকে সামনে অকারণে পেয়ে খানিকটা ঝাঁজ দেখায়। তার পরে দুমদাম করে পা ফেলে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে পড়ে।

আমিনার ঘরে মন টেকে না। বিনু দিদির কাছে ছুটে যায়। কিন্তু সেখানেও থাকতে পারে না। তার সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে গিয়ে কেঁদে ফেলে আমিনা। বিনু বলে, তুই কি পাগল হলি আমিনা। এমন ত বাপু কখনও দেখি নি। আমিনার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। সে সবেগে মাথা নেড়ে পালিয়ে যায়। বিনু বিস্মিত দৃষ্টিতে তার গমনপথের পানে চেয়ে থাকে।

রাত হয়েছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আমিনার বাবা মা বহুক্ষণ শুয়ে পড়েছে। এতক্ষণে হয়ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আমিনার চোখে ঘুম নেই। জানালা-পথে চাঁদের আলো এসে ঘরের মধ্যে পড়েছে, কিন্তু তা আমিনার জন্য কোন আশার আলো বহন করে নিয়ে আসে নি। দিন দিন আমিনার অশান্তির মাত্রা বাড়তে থাকে। তাকে ঠিক যেন আর চেনা যায় না। পরিবর্ত্তনটা এতই স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মা মেয়ের জন্য চিন্তিত হন। পাড়াপড়শীরা বলে আহা এমন কাঁচা বয়েস যার···ইয়াসিন ক্ষেপে ওঠে···বসির আলির এত বড় ধৃষ্টতা। কিন্তু মীমাংসার কোন সহজ পথই তার চোখে পড়ে না।

এমনি এক অস্বস্তি যখন ইয়াসিনের সুখের সংসারকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই সময়ই এক দিন সকালে ঘুম ভেঙে আমিনা এক নূতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে। তার অকস্মাৎ থেমে যাওয়া জীবনে দেখা দিলে—আনন্দের জোয়ার। আমিনা হয়ে উঠল উচ্ছল—তার চোখে মুখে ফুটে উঠল ভাবের আবেগ।

আমিনার মা শঙ্কিত হয়ে উঠল। বাপ খুশীমনে ক্ষেতের কাজে চলে যায়। প্রতিবেশিনীরা বলাবলি করে, মেয়েটার হ'ল কি।

আমিনার আজ অকস্মাৎ মনে হ'ল যে, এই দীর্ঘদিন ধরে সে মায়ের কোন কাজেই সহায়তা করে নি—বাপের পানেও ফিরে তাকায় নি। এমন কি তার পোষা হাঁস দুটোকেও নিরর্থক জ্বালাতন করেছে, এবং এই দীর্ঘদিনের ত্রুটিকে এক দিনে পুষিয়ে নিতে গিয়ে সে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করলে যাতে মা মেয়ের সম্বন্ধে রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বাপ হেসে বললে, মোর পাগল মাইয়া খ্যাপছে—হাঁস দুটো কিন্তু পরমানন্দে আমিনার সঙ্গে সমান তালে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে আর ঘাড় নেড়ে নেড়ে ডাকছে, প্যাক প্যাক প্যাক···

দিন চলে যায়। আমিনার জীবনে জোয়ারের আকস্মিক বেগ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু পথে ঘাটে, আনাচে কানাচে তাকে নিয়ে কানাঘুষো বেড়েই চলেছে। যে যার মনের মত করে গল্প রচনা করে চলেছে। কেউ বলে এরই জন্যে স্বামীর ঘর করতে পারলে না। সখ করে কি আর বাপের বাড়ী চলে এসেছে। কেউ বা বাধা দিয়ে বলে, দরকার কি স্বামীর ঘর করে, যদি নিত্য এমন নতুন নতুন···

ওদের আলোচনার মাঝখানে আমিনা হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়। হাসিমুখে বলে, ঠাকরুণ গো লোব লাগে বুঝি···বলেই আর অপেক্ষা না করে হেলে দুলে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে চলে যায়।

ওরা সকলে কানে আঙুল দেয়। ছি: ছি:···দিনে দিনে হ'ল কি। এক ফোঁটা মেয়ের এত আস্পর্দ্ধা! অবশ্য প্রকাশ্যে প্রতিবাদ কেউ করে না। তবে গোপন সমালোচনা আরও ঘটা করে চলতে থাকে। মিথ্যে কথা ত আর না। চণ্ডের বৌয়ের নিজের চোখে দেখা। সাহস বটে ছুঁড়ীর। নইলে রাত দুপুরে কেউ তাদের ঝাউতলায় যায়। এরই নাম আশনাই। কি বলছ? ছেলেটা দেখতে কেমন? ছ্যাঁচা লোহার দত্যি একটা।···

কথাগুলি শেষ পর্য্যন্ত ইয়াসিনের কানেও গেল। প্রথমে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও স্ত্রীর নিকট একই কথার পুনরুক্তি শুনে ইয়াসিন রাগে আগুন হয়ে উঠল। গ্রামের লোকে তাকে সর্দ্দার বলে খাতির করে। সমাজে তার একটা মানসম্রম আছে। প্রাণ গেলেও সে তার অমর্য্যাদা করতে পারে না। কিন্তু মেয়েকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতেও তার আটকায়। মেয়ের মুখের পানে চাইলেই তার সব গোলমাল হয়ে যায়। অমন সুন্দর নিষ্কলঙ্ক যার মুখ তার পক্ষে কখনও এমন নিন্দনীয় কাজ সম্ভব হতে পারে বলে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অন্তরে সে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু কষ্ট তার যত বড়ই হোক এর মীমাংসা তাকে করতেই হবে। মেয়ে বলে ইয়াসিন কিন্তু চোখ বুজে থাকতে পারে না।···

* * *

পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে। আমিনা উদগ্রীব হয়ে তার ঘরে বসে আছে। আজ সারা বিকেল ধরে সে সযত্নে চুল বেঁধেছে। বেছে বেছে সে তার লাল কুর্ত্তাটি গায় দিয়েছে। পাছাপেড়ে শাড়ীখানি পরতেও ভুল করে নি। দুই ভ্রূর মাঝে সযত্নে লাগিয়েছে কাঁচপোকার টিপ—পায় পরেছে আলতা। বিনুদিদির কাছ থেকে চেয়ে আনা পাউডার লাগাতেও তার ভুল হয় নি।···

রাত একটু বেশীই হয়েছে। সমস্ত গ্রাম ঘুমে আচ্ছন্ন।

আমিনা জেগে আছে। জেগে আছে একটি সঙ্কেতের অপেক্ষায়। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে আমিনা। ভুল সে করে নি। এ নিশ্চয়ই তার সঙ্কেতসূচক আহ্বান। আমিনা দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। সাড়া পেয়ে তার হাঁস দুটো নড়ে চড়ে ওঠে। আমিনা মৃদুকণ্ঠে বলে, লক্ষী আমার সোনা চুপ কইরগা ঘুমা···সে বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়ায়। সঙ্কেত-শব্দ পুনরায় শ্রুতিগোচর হয়। এবারে আর অস্পষ্ট নয়। আমিনার গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে।···

পাশের ঘরে আমিনার মা এবং বাবা এতক্ষণ জেগেই ছিল। মেয়ের আজকের হাবভাব তারা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে এবং হয়তো সেইজন্যেই মেয়ের উপর নজর রাখতে স্বামী স্ত্রী তারা এখনও জেগে আছে। দরজা খোলার শব্দে সচকিত হয়ে ইয়াসিন উঠে দাঁড়াল, ঘরের কোণ থেকে তার পাকা বাঁশের লাঠিগাছা তুলে নিয়ে অগ্রসর হ'ল। আমিনার মা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে স্বামীকে চুপ করতে নির্দ্দেশ দিলে এবং নিজে অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে মেয়ের পানে দৃষ্টি রেখে স্বামীকে কি ইঙ্গিত করলে। তার পরে উভয়ে আমিনাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগল।

আমিনা ত্বরিতপদে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সরকারী রাস্তা ধরে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে মেঠো পথ ধরলে। চণ্ডেদের ঝাউতলায় যেতে এইটেই সোজা পথ। তা ছাড়া এই পথে বড় একটা লোক চলাচল করে না। কিন্তু তবুও কি পোড়া লোকের চোখ এড়িয়ে কিছু করবার জো আছে— আমিনা ভাবে আর সঙ্গে সঙ্গে গতি তার আরও দ্রুত হয়ে ওঠে।

ইয়াসিন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পড়তে পড়তে বড় জোর সামলে নিলে। স্ত্রীকে মৃদু কণ্ঠে বললে, মাইয়াডারে কি দানোয় পাইছে?

আরও খানিক এগিয়ে গিয়ে আমিনা একেবারে থমকে দাঁড়াল। একবার চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে যেন কিসের সন্ধান করলে। ইয়াসিন এবং তার স্ত্রী একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে মেয়ের উপর দৃষ্টি রাখছিল।

সহসা একটা উচ্চ হাসির শব্দের সঙ্গে আমিনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এই ছাড়···ছাড়···ব্যথা লাগে—

ইয়াসিন সবিস্ময়ে দেখলে দুখানি বলিষ্ঠ বাহু আমিনাকে বেষ্টন করে কাছে টেনে নিলে।···সে একটা চাপা হুঙ্কার ছাড়লে, হুম্। ইয়াসিন শক্ত করে তার হাতের লাঠিগাছা চেপে ধরতেই আমিনার মা তাকে বাধা দিলে। চাপা কণ্ঠে বললে, থামো—

আমিনা এতক্ষণে আগন্তুকের বাহুবেষ্টনমুক্ত হয়ে ঝাউ-গাছের তলায় তারই গা ঘেঁষে বসেছে। দু'জনেই হেসে হেসে এ ওর গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো এসে ওদের চোখেমুখে পড়েছে—

আমিনার মা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামীকে উদ্দেশ করে বললে, ঘরে চল—

ইয়াসিন বিস্মতভাবে স্ত্রীর পানে মুখ ফেরাতে সে ফিস্ ফিস্ করে বললে, আমাগো ইদ্রিস।

ইয়াসিন আর একবার ঝাউতলার দিকে ফিরে দেখে ঘুরে দাঁড়াল। হাতের লাঠিগাছা ফেলে দিয়ে সে স্ত্রীর একখানি হাত সহসা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরলে। ঝাউতলায় যে চাঁদের আলো লুকোচুরি খেলছে তার অভাব এখানেও নেই। ইয়াসিনের হাতের মুঠি আরও শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টিও হয়তো বা মুহূর্ত্তের জন্য চক্-চক্ করে উঠে থাকবে।

আমিনার মা মৃদু হেসে স্বামীর হাত ধরে আকর্ষণ করে···

একজন অর্দ্ধবিস্মৃত কবি ও তাঁর কাব্য

শ্রীসুনীলকুমার বসু

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলা কাব্যের স্রোতহীন বেলাভূমিতে যে নূতন রসানুভূতির জোয়ার এল, তা যেমন বিচিত্র তেমনি জটিল। তার বহু সুরের ঐকতানের মধ্যে একদিকে শোনা গেল, "surge and thunder of Odyssey",—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে; তেমনি আবার শোনা গেল গীতিকাব্যের কলস্বন, যার প্রতি-ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল বাংলার গীতিগুঞ্জরিত প্রাঙ্গণ। বিহারিলাল সেই সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান বৈতালিক। মধুসূদনের দীপ্ত তেজ তাঁকে ম্লান করে দিতে পারে নি।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে আমরা কয়েকটি ধারা দেখতে পাই। প্রথমতঃ রঙ্গলাল প্রবর্ত্তিত verse tale বা গাথা-কাব্যের ধারা। এ কাব্য রোমান্স-ধর্ম্মী। দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্যের ধারা এবং তা প্রধানতঃ মধুসূদনের লেখনী-নিঃসৃত। এই ধারা অনুসরণ করে একটা ক্লাসিক রীতির প্রবর্ত্তন হ'ল। কিন্তু এই দুই জাতীয় কবিতা objective বা বহির্ভাবমুখী, একলা কবির নিঃসঙ্গ অন্তরের আকুলতা প্রকাশের যোগ্য বাহন নয়। কিন্তু গীতিকবিতার প্রয়োজন সব যুগেই থাকে এবং এ যুগেও ছিল। তাই দেখা যায় এ যুগে অসংখ্য গীতি-

কবিতা রচিত হয়েছে, যার অধিকাংশই আজ বিস্মৃত বা অর্দ্ধ-বিস্মৃত। এলিজাবেথীয় যুগে ইংরেজী সাহিত্যে এইরূপ গীতি-কাব্যের অজস্র বিকাশ ঘটেছিল। তৎকালীন সঙ্কলন-গ্রন্থগুলির ভিতর দিয়ে আজও সেই কাব্যধারা আধুনিক পাঠক-দের কাছে পৌঁছে এবং তাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। দুঃখের বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সঙ্কলন-গ্রন্থ ছিল না বললেই চলে। ফলে বহু কবিতাই আজ পুরানো কীটদষ্ট পুস্তকের জীর্ণ পাতায় বিলীয়মান। এই বিরাট কাব্য-সাহিত্যের নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণী-বিভাগ করা যেতে পারে; যেমন, (১) নীতিমূলক, (২) প্রণয়াত্মক, (৩) নিসর্গবিষয়ক, (৪) সমাজবিষয়ক, (৫) জাতীয়তাবোধক, (৬) আধ্যাত্মিক, (৭) বাউল প্রভাবিত ভাব-বিষয়ক, (৮) ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি। এই বিভিন্ন ও বিচিত্র কাব্যাবলীর ভিতর দিয়ে এ যুগের গীতিকাব্যের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

এ যুগের বিস্মৃত এবং অর্দ্ধবিস্মৃত কবিদের মধ্যে চিরঞ্জীব শর্ম্মা একটা বিশেষ স্থান দাবি করতে পারেন। এঁর আসল নাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। চিরঞ্জীব নামে ইনি অনেকগুলি বই লিখেছেন। গদ্যে ও পদ্যে বহু রচনার স্রষ্টা হলেও ইনি প্রধানতঃ কবি। গান ও গীতিকবিতার মধ্যে এঁর শক্তির মৌলিকতা ও রসপ্রাচুর্য্যের নিশ্চিত সাক্ষ্য বর্ত্তমান। 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'তে বলা হয়েছে, "শান্তিপুরের নিকট ইঁহার জন্মস্থান।" 'সাহিত্য-পঞ্জিকা'র মতে চুপী (বর্দ্ধমান) এঁর জন্মস্থান। এঁর জীবিতকাল ১২৪৭-১৩২২। 'সঙ্গীত মুক্তাবলী'তে এঁর এইরূপ পরিচয় দেওয়া আছে, "ইনি বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের এক জন অতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কবি। ইঁহার অনেক সঙ্গীত নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজে গীত হইয়া থাকে।...কেশবচন্দ্র সেন ইঁহার সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইতেন।" এঁর বিভিন্ন গদ্য-পদ্য গ্রন্থগুলির নাম গীত-রত্নাবলী, বিংশ শতাব্দী, গরলে অমৃত, কেশব-চরিত, নব বৃন্দাবন, যুগল-মিলন, ঈশাচরিত, বাল্যসখা, যৌবন সখা, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি। এঁর মধ্যে সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মের একটা উদার ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর কাব্যে বিদেশী কবির অস্ফুট ছায়া-রেখা লক্ষিত হয় এবং এঁর গানে ব্রাহ্মভাবের মধ্যে হিন্দুভাব ত আছেই; এমন কি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের উপরও এঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়।

"গীতরত্নাবলী" (১ম সং, শকাব্দ ১৮০৬, ২য় সং শকাব্দ ১৮০৮) নামক দুই খণ্ডে যে বিরাট গ্রন্থ তিনি রচনা করে-ছিলেন, তার মধ্যে সঙ্কলিত ৯৮৫টি গান, কবির মূল প্রেরণা যে ছিল লিরিক তার নিশ্চিত সাক্ষ্য দেয়। কোন বিশিষ্ট ধর্ম্ম-প্রেরণা থেকে লিখিত হলেও এগুলি সার্ব্বজনীনতায় পরিপুষ্ট। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কবি বলছেন যে, ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রেরণায় সাহিত্যের উন্নতি ঘটে থাকে, যেমন বৈষ্ণব-সাহিত্যের বেলায়। "ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের দ্বারা এ সম্বন্ধে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্যজনক।......গীতরত্না-বলীতে যে সকল গান রহিল ইহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস বিশেষ। এই সকল সঙ্গীতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব, জ্ঞানী, ভক্ত অশিক্ষিত নর-নারীগণ আপন আপন ভাবের ছবি দেখিতে পাইবেন।"

চিরঞ্জীব 'বাল্য-সখা' নামে একখানা শিশুপাঠ্য কবিতা-পুস্তক লিখেছিলেন। বইখানির বহু সংস্করণ হয়েছিল। এই কবিতা-পুস্তকে অনেক গতানুগতিক বিষয় থাকলেও শিশুমনের সূক্ষ্ম ভাবপরিবর্ত্তনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বুড়ী ঝিকে ঘিরে বসে ছেলের দলের ভূতের গল্প শোনা, নিদ্রালু ননীগোপালের শাস্তি প্রভৃতি এই ধরণের বিষয় সন্নিবেশের মধ্যে এটা সজীব নাটকীয়তা আছে। এই কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য—কল্পনার সহজ সরল স্বাভাবিক বিকাশ, সৌন্দর্য্যের ঋজু উদার অনুভূতি। প্রকৃতি-বর্ণনায় কবির সৌন্দর্য্যোপলব্ধির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন,

ঘুচিল আঁধার উদিল তপন
রাঙা মুখখানি খুলি,
কোণে লুকাইয়া যেন কুলবধূ
দেখিছে ঘোমটা খুলি। (প্রভাত)।

পুনরায়:—

ছোট ছোট তারাগুলি আকাশের গায়,
মাথার উপরে বসি মিটি মিটি চায়;
আঁধার রজনীকালে সুনীল গগনথালে
সাজাইয়া দীপমালা বিবিধ শোভায়,
কে যেন বরণ করে জগৎ পিতায়। (আকাশ)

'যৌবন-সখা' নামে কবির আর একখানি কাব্য গীতি-কবিতা হিসাবে বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। 'বনমালা' নামক আর একখানি পুস্তকে 'যৌবন-সখা'র বিভিন্ন কবিতা স্থান পেয়েছে। কবির গীতি-প্রেরণার মধ্যে বিভিন্ন ভাবের উপাদান মিশ্রিত রয়েছে। প্রথমতঃ তিনি কবি হিসাবে বিশ্বের সমস্ত পরিদৃশ্যমান রূপের মধ্যে এক বিস্ময়-রস-সম্পৃক্ত সৌন্দর্য্য দেখেছেন। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের স্বচ্ছ উর্দ্ধলোকে সীমাবদ্ধ থাকতে তার গভীর ভাবদৃষ্টি অস্বীকার করেছে এবং নিবিড়তর অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষায় বিস্ময়ের অতল নিস্পন্দ মর্ম্ম-মূলে ডুব দিতে চেয়েছে। তাই ইনি নিসর্গের কবি, প্রেমের কবি হলেও বাহ্যিক রূপের কবি নন। ইনি বিহারিলাল অপেক্ষা কয়েক বৎসরের ছোট হলেও (বিহারিলালের জন্ম সন ১৮৩৪) উভয়ের কাব্যজীবন প্রায় সমান্তরাল ভাবে চলেছিল। 'সারদা-মঙ্গল' রচনা ১২৭৭ সালে আরম্ভ হয় এবং ১২৮১ সালে 'আর্য্য দর্শনে' আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'যৌবন-সখা' প্রকাশিত

হয় ১২৯৪ সালে। সুতরাং 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সঙ্গে এই কবির পরিচয় থাকা সম্ভব ছিল। তা ছাড়া নিসর্গপ্রীতির দিক দিয়েও চিরঞ্জীবের অনেক কবিতা বিহারিলালের অনুগামী। বিশ্বের মূলীভূত বিস্ময় উভয় কবির মনে একই রকমের সূক্ষ্ম অনুরণন জাগিয়েছিল। 'বাগ্‌দেবী' কবিতার অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং আবাহন (invocation) মধুসূদনগন্ধী। যেমন,

বকীন্দ্র-জননী মাতঃ! চিত্তবিনোদিনী
আদি কবি, কাব্যরসেশ্বরী, তব পদে
করি গো প্রণতি করপুটে।

কিন্তু অবিলম্বে তিনি মধুসূদনের মহাকাব্যিক নৈর্ব্যক্তিকতা কাটিয়ে বিশ্বের আত্মগত ভাববিহ্বল রূপ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হলেন এবং সেখানে তাঁর ভাবটি বিহারিলালের অনুসারী; তাঁর 'বাগ্‌দেবী' কবিতা রস-রূপে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করে নিসর্গে এবং মানুষের মনে ("And in the mind of man"—Tintern Abbey) নিবিড়ভাবে অবস্থিত। তাই তিনি প্রশ্ন করেন, "তবে হায় জড়বাদী কেন বলে জ্ঞানের বিকাশে পদ্ম বিলুপ্ত হইবে?" কিন্তু কবির এই মানস-লক্ষ্মী শুধু বাগ্‌দেবী নন, ইনিই বিশ্বের মূলীভূত শক্তি যার আহ্বানে যীশু ক্রুসে প্রাণ দিয়েছেন, চৈতন্য প্রেমরসে ভেসেছেন— ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক দৃপ্ত ও দীপ্ত প্রকাশ ("the awful shadow of some unseen power"—Shelley)। এই কবিতা মনে করিয়ে দেয়,

"শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক,...... ...."

আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই কবি যাকে 'কবি কল্পলতা' বলে সম্বোধন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে 'মানসসুন্দরী'তে 'কবিতা-কল্পনা-লতা' বলে আহ্বান করেছেন। চিরঞ্জীবের অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গী সজীব ও সরস। কবিতার আঙ্গিক পুরানো হলেও আত্মায় নবীনতার আস্বাদ আছে।

"বিপুল যৌবনপূর্ণা প্রাবৃটের তটিনী
কিবা প্রভাবতী!
শিশুর বিনোদ হাস্যে বিমল কোমল আস্যে
কেমন সৌন্দর্য্যচ্ছটা ভাসে দিন যামিনী
মনোহর অতি।"

(আশা-সন্দীপন, বনমালা)

বিহারিলালের মত ইনিও চরাচরে বিশাল ও মহান্ প্রকাশ দেখে রসাপ্লুত হয়েছেন।

"একি দেখি কীর্ত্তি, মহান প্রকাণ্ড
শূন্যে ভ্রাম্যমাণ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড
যেদিকে যখন ফিরাই নয়ন নিরখি বিচিত্র সৃষ্টি অগণন
আকাশ ধরণী তলে।" (বিস্ময়, যৌবন-সখা)

মানুষের ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কবির সুদূর পিয়াসী অন্তর সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না, সে চায় বিরাট ও মহানের মধ্যে, রহস্য ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে। তাই তিনি বলছেন :

"অনন্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
নির্ব্বাণের নিভৃত নিলয়ে
ভুলিয়া উপাধি ধাম, দেশ কাল জাতি নাম
ঢালি দি' এ ক্ষুদ্র প্রাণ মহা প্রাণময়ে
মিশে থাকি একাকার হয়ে।"

(অজ্ঞানানন্দ, যৌবন-সখা)

এই বিশ্বচেতনা কবিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে theist হতে দেয় নি, অনন্তের পটভূমিকায় অমর আত্মার তীর্থযাত্রার অবকাশ দিয়েছে। 'দেবপ্রভাব' ও 'বিস্ময়' নামক দুটি কবিতায় সেই মহান প্রকাশের কথা গভীর অনুভূতির সঙ্গে বলা হয়েছে :

"পাখীর পাখায়, গাছের পাতায়
সলিল-দর্পণে, অনল-শিখায়
জলদের গায় শশীর ছটায়
কার অপরূপ ভাতি শোভা পায়
বিবিধ মূরতি ধরি?"

(বিস্ময়, যৌবন-সখা)

কবির কাব্যের মূল সুর অনন্তের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকুলতা এবং মাঝে মাঝে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত ইনিও দৃশ্যমান জগৎকে অতিক্রম করে অদৃশ্য মহা অনন্তের দিকে যাত্রা করতে চান :

"যাইব স্বদেশে, আর রব না এখানে,
পশ্চিম দিগন্তব্যাপী আঁধার সাগরে;
চড়িয়া সমাধি-রথে অনন্ত জীবন-পথে
ধাইব অনন্ত কাল অনন্তের পানে।"

(অজ্ঞানানন্দ, যৌবন-সখা)

এখানে 'স্বদেশ' শব্দটি লক্ষণীয়, এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক দ্যোতনা রয়েছে। উপরি-উক্ত কবিতায় অসীমের সঙ্গে মিলিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যা সসীম ও অতিপরিচিত তাতে কবির তৃপ্তি নেই। সেই অসীমের জন্য একটা আকুলতা দেখা যায় কবির অনেকগুলি গানে; এবং 'পাখীর প্রতি', 'অজানিতের টান' (বঙ্গবাণী) প্রভৃতি কবিতায়। দূরের জন্য, অপরিচিতের জন্য, অসীমের জন্য গভীর আকুলতা ব্যক্ত হয়েছে কবির মরমী কণ্ঠে, সেই অচেনা দেশের ফুলের গন্ধ, অদৃশ্য অননুভূত পথে সমীরিত হয়ে কবির অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই গানগুলির উপর বাউল-প্রভাব স্পষ্ট, কবি বলছেন,

"সে দেশে যাবার তরে প্রাণ যে কেমন করে!"

এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত গান,—

"কোন্ দেশেতে বাসা তোমার কে জানে ঠিকানা
কোন্ গানের সুরের পারে তার পথের নেই নিশানা
ওগো সেই দেশেরি তরে, আমার মন যে কেমন করে,
তোমার মালার গন্ধে,… ।"

* * *

কবির প্রেম-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে গভীর দার্শনিকতা এবং শেলীর ভাবোচ্ছ্বাস অনুভব করা যায়। প্রেম দেহাশ্রয়ী হয়েও একটা দেহাতীত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, যা অন্তরের সঙ্গে অন্তরকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দেয়। মানুষের অন্তরের এই প্রেমানুভূতির ভিতর দিয়ে অনন্তের প্রকাশ ঘটে।

অনন্তের প্রেমাভাস, হয় সবে স্বপ্রকাশ
মানবহৃদয়াধারে মূর্তিমান আকারে।
(বন্ধু অন্বেষণ, যৌবন-সখা)

পুনরায়,

হৃদয়ে হৃদয়ে আছে প্রেমবিন্দু
তার অন্তরালে মহাপ্রেম সিন্ধু
মিশে বিন্দু সনে সিন্ধুর সদনে
হায় আমি যাবো কবে ;
জীবনের আশা প্রাণের পিপাসা
হবে নিবারিতে দিয়ে ভালবাসা
পশিয়া মরমে গলিয়া চরমে
সিন্ধুমাঝে বিন্দু রবে।
(প্রীতিঃ পরম সাধনম্, যৌবন-সখা)

রোমান্টিক হলেও বিহারিলাল বা রবীন্দ্রনাথের মত রোমান্টিক চিরঞ্জীব নন ; বিস্ময়ের প্রাচুর্যে ইনি বিহারিলালের মত ভেসে যান নি, বিস্ময় এঁর অন্তরের শুধু আবেগ নয়, দুরূহ প্রশ্ননিচয়কেও জাগিয়ে তুলছে। এঁর কবিতায় অনেক দার্শনিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কবিতার রসরূপ ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মাঝে মাঝে কবির কল্পনা সুন্দর ভঙ্গিমার মধ্যে সুসমঞ্জস পরিণতি লাভ করেছে। এই সব ক্ষেত্রে কবির তীক্ষ্ণ চেতনা তাঁর হৃদয়াবেগকে সংযত রূপের মাধ্যমে নব নব উপমার দ্বারা রসান্বিত করেছে :

প্রেমও কি ডুবে গেল কালের আঁধারে ?
তবে কি স্বপন আমি দেখিনু সংসারে ?
কাটিয়া আমার মায়া শ্মশানে প্রিয়ার কায়া
জ্বলন্ত অনলে পুড়ে গেছে একেবারে।
… … …
কালের আঁধার তলে অনন্ত জলধি জলে
বিলীন হয়েছে দেহ জন্মের মতন,
পাব না দেখিতে আর নয়নে সে রূপ তার
স্মৃতির দর্পণে মাত্র হয় দরশন।
(প্রেম নিরাকার, যৌবন-সখা)

প্রকৃতি-বর্ণনায় এই কবির রচনাশৈলী বৈশিষ্ট্যময়। প্রথমতঃ, ইনি গতানুগতিক উপমার স্থলে অনেক ক্ষেত্রে নূতন উপমার সুষ্ঠু প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এঁর কবিতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটা সজীব স্পর্শ পাওয়া যায়। কল্পনার অভিনবত্বে ও শব্দপ্রয়োগের নূতনত্বে এঁর প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলি উপভোগ্য। যেমন,—

তরুলতিকামণ্ডিত
গিরিমালা, তদুপরি অনন্তশিখর-
শ্রেণী, যেন সেনাদল সৈনিক নিবাসে
দাঁড়াইয়া। দুগ্ধফেননিভ বারিধারা
রজতরঞ্জন, পড়ে খসি শিলাতলে
নাচিয়া নাচিয়া ; মুক্তাফল সম তার
বিন্দু ছুটে চারিভিতে, রঞ্জিত হইয়া
ভানুকরে নানাবর্ণে। (হিমালয়, যৌবন-সখা)

এখানে সৈন্যদলের সঙ্গে শিখরশ্রেণীর তুলনায় অভিনবত্ব রয়েছে। 'রজত-রঞ্জন', 'ভানুকর' প্রভৃতি কথার ব্যঞ্জনা সুন্দর। নিসর্গ পরিদর্শনে অতি ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য-কণাও স্বর্ণরেণুর মত ঝলমল করছে।

চন্দ্রাতপ সম মণিমুক্তা খচিত-নীল
অনন্ত গগন,
করে তাহে ঝলমল রবি শশী তারাদল
হেরিলে সে শোভা আহা জুড়ায় নয়ন।
ইচ্ছা হয় নদীতটে পাতিয়া বসন
শুয়ে শুয়ে উর্দ্ধনেত্রে সৌরলোক সনে রে
করি সুখে প্রেম আলাপন।
কবিচিত্ত প্রমোদিনী ফুটন্ত গোলাপ আয় ;
তোরে বক্ষে ধরি
জুড়াই তাপিত হিয়া একদৃষ্টে নিরখিয়া
নাসারন্ধ্রে সন্তোমকরন্দ পান করি ;
হরিদ্বরণ পত্রে ঢাকা আহা মরি ;
কি রূপলাবণ্য তোর সহাস্য বদনে রে
লইল আমার প্রাণ হরি।
(স্বভাবসঙ্গ, যৌবন-সখা)

চিরঞ্জীব শর্ম্মার কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আলোচনা করা হ'ল। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কবিদের পাশে হয় ত তাঁর স্থান হবে না। কিন্তু সে যুগের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ভাব-বিপ্লবের কেন্দ্রস্থলে যে তিনি এসেছিলেন সে পরিচয় তাঁর কাব্যেই আছে। উনবিংশ শতাব্দী একটা বিরাট সাংস্কৃতিক জাগরণের যুগ। সে যুগে বাংলার কূলে বহু তরঙ্গ এসে প্রতিহত হয়েছিল। সেই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের রেখা বহন করছে চিরঞ্জীবের কবিতা।

সমবায়

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এম-এ

সামবায়িক পূর্ব প্রতিজ্ঞা
(Postulates of Induction)

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী বলিতেছেন—সমবায়িত্বঞ্চ সমবায় সম্বন্ধেন সম্বন্ধিত্বং, ন তু সমবায়বত্বং সামান্যাদাব ভাবাৎ [ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৪ কারিকার টীকা], অর্থাৎ অভাব প্রভৃতি সমবায়ের অনুযোগীরূপে, কেহ বা প্রতিযোগীরূপে, কেহ বা উভয় রূপে সমবায়ের সম্বন্ধী হইয়া থাকে। "সমবায়ের স্বরূপ"* আলোচনায় অভাব ও গুণের অন্যতম বিভাগ অদৃষ্টকে প্রতি-যোগীরূপে উপস্থাপিত করিয়া সমবায় সম্বন্ধ বিচার করা হইয়াছে। সপ্ত পদার্থের মধ্যে অভাব ও সমবায় ছাড়া আর পাচটির সাধর্ম্যকে অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব বলে। যদিচ অনেকত্বটি অভাবেও আছে তথাপি অনেকত্ব সমানাধিকরণ-ভাবত্ব দ্রব্যাদি পাঁচটির সাধর্ম্য। জ্ঞেয়ত্ব বা জ্ঞান-বিষয়তা পদার্থের অন্যতম সাধর্ম্য [সাধর্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে—ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৩ কারিকার অংশ] এবং জ্ঞেয়ত্ব বলিতে অভিধেয়ত্ব প্রমেয়ত্বাদি বুঝায় [জ্ঞেয়ত্বং অভিধেয়ত্ব প্রমেয়াত্বাদিকম্ বোধ্যম্ ঐ ; সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।] অতএব চরম উপনয় বা উপান্তের আশ্রয় হইতেছে (১) অভিধা বা সঙ্কেতগ্রাহ্য অতিরিক্ত পদার্থ [অভিধেয়ত্বমভিধা বিষয়ত্বমভিধান যোগ্যত্বং বেতি নৈয়ায়িকাঃ। সঙ্কেত গ্রাহ্যোঽতিরিক্ত পদার্থ ইতি মিমাংসকাঃ], (২) প্রমেয়ত্ব এবং (৩) অভিধা ও প্রমেয়ত্বের সম্বন্ধ [(১) The mind or the subject, (২) the thing known or the object and (৩) the relation between the subject and the object]। এই সকল প্রতিজ্ঞা ছাড়া সমবায়ী সাধ্যাভাবে আরও কয়েকটি প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে। আগেই বলিয়াছি যে, সমবায়ী সাধ্যাভাব দ্বারা পৃথক পৃথক কতকগুলি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত ব্যাপার-বোধক নিখিলসাধ্য নিত্য নির্বক্তিতে উপস্থিতি ঘটে। "কতক" হইতে "সমূহে" বা "সামান্য" হইতে "বিশেষে" এরূপ উপস্থিতি (ক) সাধর্ম্যত্ব এবং (খ) অধিকরণত্ব বা হেতুত্ব [যেন সম্বন্ধেন হেতুস্তেনৈব তদধিকরণং বোধ্যং—ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব প্রকরণস্য দীধিতি] দ্বারা সম্ভব হয়।

সাধর্ম্যত্ব (The Principle of Similarity) বলিতে সমান ধর্ম যাহাদের তাহাদিগকে বলে সধর্মা, তাহাদের ভাব অর্থাৎ ধর্মকে [সমানো ধর্মো যেষাং তে সধর্মানস্তেষাং ভাবঃ সাধর্ম্যং—১৩নং কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী] বুঝায়। (পারিমাণ্ডল্য ভিন্ন) পদার্থের সাধর্ম্যকে কারণত্ব বলে এবং কারণত্ব বলিতে নিয়তা বুঝায় (ভাষা পরিচ্ছেদ—১৫।১৬ কারিকা)। পদার্থ মাত্রেরই ধর্মসাম্য বা ঐক্যই এই কল্পনার মূলবস্তু অর্থাৎ সমজাতির পদার্থে তাহাদের প্রকৃতিগত পূর্ব-বর্তিতা বা সধর্ম থাকায় কয়েকটির বিচার ফলে সকলগুলিরই সাদৃশ্য সম্বন্ধ ধরা যায়। এক কথায় ইহাকে প্রকৃতির একরূপত্ব বা নিয়মানুবর্তিতা ধর্ম (Law of Uniformity of Nature) বলে [অনন্ত স্বরূপানাং সম্বন্ধত্ব কল্পান গৌরবাদ লাঘবাদেক সমবায় সিদ্ধিঃ—ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১১ কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী]।

অধিকরণত্ব বা হেতুত্ব (The Principle of Ground and Consequent) বলিতে বুঝায় যে, পদার্থ মাত্রেরই গুণ বা স্বভাব তাহার স্বধর্ম বা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ; ফলে সমকার্যের সমকারণ বা কার্যকারণ সম্বন্ধ বিধি গুণ সাধর্ম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহাতে সমবেত হইয়া কার্য উৎপন্ন হয় তাহাই সেই কার্যের সমবায়ী কারণ [স্বকারণতাব-চ্ছেদক বদ্ধর্ম বিশিষ্টে যদ্ধর্মবিশিষ্টং কার্যং সমবায় সম্বন্ধেনোৎ-পদ্যতে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নং প্রতি তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নং সমবায়ি কারণ-মিত্যর্থঃ। যৎ সমবেতং কার্যং ভবতি জ্ঞেয়ন্ত সমবায়ি জনকং তৎ—ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৮ কারিকা]। কার্য ও কারণের সামানাধিকরণ্য না থাকিলে কার্যকারণ ভাব হয় না। এই জন্য যে স্থলে কার্যের সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে যেখানে কার্য উৎপন্ন হয়, সেখানে কারণের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী কার্য। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সাধর্ম্য, অধিকরণ এবং তাদাত্ম অর্থাৎ প্রকৃতির একরূপতা ধর্ম ও সামানাধি-করণত্ব সমস্ত সামবায়িক সিদ্ধ ব্যাপ্তিগ্রহের অন্তর্নিহিত পূর্ব প্রতিজ্ঞা মাত্র। [হেতু ব্যাপক সাধ্য···সমানাধিকরণত্বাংশ গ্রহে সহচার গ্রহোহেতুরিতি]।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির একরূপতা বা নিয়মানুবর্তিতা ধর্ম—এবং সামানাধিকরণত্ব বা হেতুত্ব প্রত্যেক স্থির ও নিশ্চিত সমবায়ী ব্যাপ্তি গ্রহোপায়ের অবলম্বন। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখিয়া হঠাৎ ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ সমবায় জ্ঞানকে অকাট্য সত্য বলিয়াও ধরা যায় না, কিংবা একেবারে বাতিল সত্য বলিয়াও বিবেচনা করা যায় না ; তাহারা সম্ভাব্য সত্য মাত্র। সামাজিক বর্ণ বা জাতি-বিভাগকে যখন পরম পুরুষের বিভিন্ন দেহাংশ হইতে উদ্ভূত ধরিয়া নিখিল প্রকৃতির জ্ঞানবিরুদ্ধ সত্যের প্রতিযোগীরূপে বিবেচনা করি তখনই সেই জ্ঞানের নিরসন হইয়া "মানব-সমাজে জাতিভেদ অন্যায়" এই সামবায়িক ব্যাপ্তি গ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। অনুরূপ একাধিক বিভক্তির ব্যধিকরণে সন্ধি-শূন্যতাও নিখিলসাধ্য ব্যাপ্তিগ্রহ মাত্র।

বিজ্ঞানের আদর্শ হইতেছে যে, সন্দেহশূন্য নিখিলসাধ্য

* প্রবাসী, মাঘ, ১৩৫০-এ প্রকাশিত।

নির্বক্তি বা নিয়মের আবিষ্কার করা এবং সেইরূপ ব্যাপ্তি-গ্রহকেই বৈজ্ঞানিক সমবায় (Scientific Induction) বলা হয়। বৈজ্ঞানিক সমবায়ে আমরা কয়েকটি মাত্র বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া "প্রকৃতির একরূপতা" ধর্ম এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর বিশ্বাস রাখিয়া নিখিলসাধ্য নির্বক্তি উপস্থাপিত করি এবং অন্যান্য দুর্বল সমবায়ে "প্রকৃতির একরূপতা" ধর্মের উপর সামান্য আস্থামাত্র রাখিয়াই একটা সম্ভাব্য মাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া রাখি। অতএব বৈজ্ঞানিক বা অন্য যে-কোনও রূপ সমবায়ে "প্রকৃতির একরূপত্ব"কেই মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া জ্ঞাত বস্তু হইতে অজ্ঞাত বস্তুতে উপস্থিতি ঘটে।

সমবায় ও অনুমানের সম্বন্ধ বিচার

কৃষ্ণদাস তাঁহার ভাষাপরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—অনুভূতিশ্চতুর্বিধা প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতি স্তথোপমিতি শব্দজে॥ কৃষ্ণদাস প্রোক্ত এই চতুর্বিধ অনুভূতির প্রত্যক্ষ, উপমান ও শব্দকে একত্র সমবায়রূপে ধরিয়া ইহাদের সহিত অনুমানের সম্বন্ধ বিচার করা যাইতেছে। উক্ত গ্রন্থের ৬৮ কারিকার প্রথমাংশের মুক্তাবলীতে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি বিশিষ্টস্য পক্ষেণ সহবৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানমনুমিতৌ জনকম্; অর্থাৎ পক্ষের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞান বা পরামর্শ অনুমিতিতে কারণ। আবার ৫১ কারিকার মুক্তাবলীতে বলা হইয়াছে। যে, যদ্যপি পরামর্শ প্রত্যক্ষাদিকং পরামর্শজন্যম্ তথাপি পরামর্শজন্যং হেত্ব বিষয়কং যজ্জ্ঞানং তদেবানুমিতিঃ, অর্থাৎ যদিও পরামর্শের প্রত্যক্ষ ও পরামর্শের ধ্বংস প্রভৃতি পরামর্শ হইতেই উৎপন্ন তথাপি হেত্ববিষয়ক পরামর্শোৎপন্ন জ্ঞানই অনুমিতি, অর্থাৎ যে জ্ঞানটি হেতুবিষয়ক নহে, অথচ পরামর্শ হইতে উৎপন্ন সেই জ্ঞানই অনুমিতি। অতএব হেতুত্ব বা অধিকরণত্বই অনুমান ও সমবায়ের (প্রত্যক্ষ, উপমান ও শব্দের) পার্থক্য কারণ:

পূর্বে বলা হইয়াছে, আমরা যদি পূর্ণাঙ্গ সত্য লাভ করিতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে সমবায় এবং অনুমান উভয়েরই সাহায্য লইতে হইবে। সমবায় ও অনুমান উভয়েই অনুভূতির প্রকারভেদ, উভয় স্থলেই আমরা এক বা একাধিক পরামর্শ (premise) হইতে একটি নূতন সত্যে উপনীত হই। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে,—

(১) অনুমানে সিদ্ধান্তটি কখনও স্বীকৃত পরামর্শগুলি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক হয় না, কিন্তু সমবায়ে সিদ্ধান্তটি সর্বদাই পরামর্শ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক হইবে। "সকল মনুষ্যই মরণশীল; রাম মনুষ্য, অতএব রাম মরণশীল"—ইহা অনুমানের দৃষ্টান্ত। "রামের মৃত্যু হইয়াছে, যদুর মৃত্যু হইয়াছে, হরির মৃত্যু হইয়াছে অতএব সকল মনুষ্যের মৃত্যু হইবে"—ইহা সমবায়ের দৃষ্টান্ত।

(২) অনুমানে আমরা পরামর্শগুলিকে সত্য বলিয়াই ধরিয়া লই, কিন্তু সমবায়ে সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সামবায়িক পরামর্শগুলির সত্যতা জ্ঞানের জন্য প্রকৃতির একরূপত্ব (Law of Uniformity of Nature) বা নিয়তা [নিয়তা পূর্ববর্তিতা কারণত্বং ভবেৎ—ভাষা পরিচ্ছেদ; ১৬ কারিকা] জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক।

(৩) অনুমানে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক থাকে না। কতকগুলি পরামর্শ স্বীকৃত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা না রাখিয়াই সেই পরামর্শগুলি হইতে কোন্ সিদ্ধান্ত অনিবার্যরূপে নিঃসৃত হইবে তাহা নিরূপণ করাই অনুমানের কার্য। কিন্তু সমবায়ে পরামর্শগুলি ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া সমবায়জ্ঞান হইতে পারে না। অনুমানের ত্রিবিধ বিভাগের মধ্যে কেবলান্বয়ীর সমবায় সাদৃশ্য থাকিলেও এই অনুমান বিভাগ প্রযত্ন (experiment) সাপেক্ষ না হওয়ায় সমবায় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই কেবলান্বয়ী প্রতিযোগিতা ধর্মাবচ্ছিন্নই সমবায়।

(৪) যে-কোনও একটি প্রত্যক্ষ উপমিতি বা শাব্দ বোধ ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বৃত্তিতে বৃত্তি এবং অনুমিতিতে অবৃত্তি যে জাতি, সেই জাতিমত্ত্বকেই সমবায় লক্ষণ বলিতে হইবে [যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষাদিকমাদায় তদবৃত্তিত্বেঽনুমিত্যবৃত্তি জাতিমত্ত্বং (সমবায়ম্) বাচ্যমিতি—সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী]। সমবায়ে প্রত্যক্ষের উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকায় আমাদিগকে আকারগত বৈধতা এবং বস্তুগত সত্যতা উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়—অর্থাৎ কোনও সিদ্ধান্ত কতকগুলি পরামর্শ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে কিনা—মাত্র ইহা দেখিয়াই ক্ষান্ত হই না; সেই সিদ্ধান্তের সহিত বাস্তব জগতের সঙ্গতি আছে কিনা তাহাও নিরূপণ করিতে হয়। অনুমানে আমাদের লক্ষ্য থাকে আকারগত বৈধতা বা শুদ্ধতার দিকে; অর্থাৎ অনুমানে স্বীকৃত পরামর্শগুলি হইতে কোন সিদ্ধান্ত যথার্থই নিঃসৃত হইতেছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সেই সিদ্ধান্তের সহিত বাস্তব জগতের সঙ্গতি আছে কিনা তাহা আমাদের বিবেচ্য নহে। "ধূমাৎ পর্বতো বহ্নিমান"—এই অনুমান বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীল বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াই করা চলে, কিন্তু বিজলি আলো বহ্নিমান হইলেও ধূমবর্জিত হওয়ায় বর্তমান যুগে "বহ্নিমান ধূম" এই সমবায় জ্ঞান সিদ্ধ হয় না।

অনুমান ও সমবায়ের মধ্যে কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় বৈসাদৃশ্য আছে তাহা দেখানো হইল। এক্ষণে উহাদের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক তাহার আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাক। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ যেরূপ বিপুলভাবে কেবলমাত্র অনুমান-খণ্ডের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে অনুমানকেই মূল

অনুভূতি-পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করা সাধারণ বুদ্ধিতে আসিয়া যায়। সমবায়-পদ্ধতিকে একটু বিশিষ্ট স্থান দিতে গেলে ইহাকে অনুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া বলিয়া ধরা যায়। দুইটি প্রক্রিয়ার গতি যদি বিপরীত দিকে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিপরীত প্রক্রিয়া (Inverse processes) বলা যাইতে পারে। বিয়োগ এবং যোগ, গুণ এবং ভাগ ইহাদিগকে পারস্পরিক সম্পর্কে বিপরীত প্রক্রিয়া বলা যায়। ন্যায়ানুভূতিতে দুইটি পরামর্শ থাকে, এবং তাহাদের মধ্যে অন্তত: একটি ব্যাপক বচন। অনুভূতির নিয়মগুলির অনুসরণ করিলে সেই দুইটি পরামর্শের মধ্যে নিহিত এবং তাহাদের অপেক্ষা অনধিক ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। সমবায়-পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা সাধারণ সত্যে উপনীত হইয়া থাকি। অনুমানে আমাদের বিচারগতি সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যের অভিমুখী এবং সমবায়ে বিশেষ সত্য হইতে সাধারণ সত্যের অভিমুখী হয়। এইভাবে দেখিলে অনুমান ও সমবায়কে পারস্পরিক সম্বন্ধে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, অনুমানই যে একমাত্র নৈয়ায়িক পদ্ধতি অথবা সমবায় অনুমানের প্রকারভেদমাত্র তাহা সত্য নহে। একটি কাল্পনিক নিয়মকে পর্যবেক্ষিত তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সমবায়-পদ্ধতির একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু এই নিয়মেরও একটা ভিত্তি থাকা আবশ্যক। এরূপ নিয়ম কল্পনা করিতে হইলেই কোনও না কোনও যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তব তথ্যের সহিত সম্পর্কবিহীন কল্পনার স্থান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নাই। যে সকল বস্তু বা ঘটনার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া, পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে দেখিয়া তবে আমরা একটি সাধারণ নিয়মে (তাহা যতই অনিশ্চিত হউক না কেন) উপনীত হইতে পারি। কতকগুলি বস্তু বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া এইভাবে একটি সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং ইহাই সমবায় পদ্ধতি। কতকগুলি বস্তু বা ঘটনা দেখিয়া কোনও যুক্তির সাহায্য আদৌ না লইয়া নির্বিচারে একটির পর একটি নিয়ম কল্পনা করিতে থাকিলাম এবং দৈবক্রমে তাহাদের মধ্যে কোনওটি বাস্তব তথ্যদ্বারা সমর্থিত হইলে তাহাকে সত্য বলিয়া স্থির করিলাম—এইভাবে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, নৈয়ায়িক প্রক্রিয়ার দুইটি বিশিষ্ট অঙ্গ আছে। সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়ার প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ অপর একটি অঙ্গ। সুতরাং অনুমানই যে একমাত্র নৈয়ায়িক পদ্ধতি এবং সমবায় অনুমানের বিপরীত পদ্ধতিমাত্র ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমবায়ের তুলনা

পাশ্চাত্ত্য জগতে সমবায়সম্বন্ধীয় চিন্তায় বোধ হয় এরিষ্টটলই প্রথম। ভারতীয় সমবায়প্রকরণকে পাশ্চাত্ত্য প্রকরণের সহিত তুলনা করিতে হইলে এরিষ্টটলের মতের সহিত তুলনা করা সেইজন্য অবশ্য কর্তব্য।

এরিষ্টটল বলেন, আমরা কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা দেখিয়া একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং সেইজন্য মনে করি যে, স্থান বিশেষ বস্তু বা ঘটনাসমূহের পরে। কিন্তু প্রকৃতিতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত নিদর্শন মিলে। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়মের স্থান আগে, বিশেষ বস্তু বা ঘটনাগুলির স্থান পরে। কোনও বিশেষ বস্তু বা ঘটনা, কোনও এক সময়ে উদ্ভূত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু যে সাধারণ নিয়মগুলি তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, তাহারা তাহার উদ্ভবের বহুপূর্বেই বর্তমান ছিল এবং পরেও থাকিবে। এই সাধারণ নিয়মগুলি আছে বলিয়াই বস্তু বা ঘটনাগুলি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে এবং বিশেষগুণের অধিকারী হইয়াছে। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ বস্তুগুলির যে পৌর্বাপর্য সম্পর্ক রহিয়াছে, সমবায়ে আমরা তাহার বিপরীত দিকে গমন করি বলিয়া সমবায়কে অনুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া বলা হইয়া থাকে।

ভারতীয় মতে সমবায় যে অনুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া নয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুত আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞানীগণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রভৃতি মতবাদেও সাধারণ নিয়মের জ্ঞান যে আগে নয় তাহা বলিয়াছেন। তবে তাঁহারা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় যে, জড় বা দ্রব্যজগৎ এবং তাহাদের গুণ ও কর্মজনিত প্রকাশ আপেক্ষিক ব্যাপার। কাজেই প্রাকৃতিক কোন নিয়ম আগে হইতে কিছু নাই যদিও জড় বা দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ বা কর্ম এই উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। কৃষ্ণদাসও তাঁহার ভাষা পরিচ্ছেদ কারিকা এবং ন্যায় সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী টীকায়ও বলিয়াছেন—সমবায়িকারণত্বং দ্রব্যস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম্—২৩ কারিকা এবং "সমবায়ত্বং নিত্যসম্বন্ধত্বম্"—১১ কারিকার মুক্তাবলী। এরিষ্টটলের পরবর্তী পাশ্চাত্ত্য সমবায়ী নৈয়ায়িকগণও ভারতীয় মতের সহিত অনেকখানি একমত বলিয়াই মনে হয়।

সমবায়ী অবয়ব (Inductive Syllogism)-এর প্রণালী সম্বন্ধে এরিষ্টটলের সিদ্ধান্ত এই যে, রামের মৃত্যু হইল, শ্যামের মৃত্যু হইল, হরির মৃত্যু হইল, যদুর মৃত্যু হইল—এইরূপ আরও কয়েকটি ব্যক্তির মৃত্যু হইতে দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম —"সকল মনুষ্যই মরণশীল।" এখানে আমরা নিশ্চয়ই একটা যুক্তি প্রয়োগ করিতেছি। সেই যুক্তিকে আমরা তিন অবয়ব বিশিষ্ট ন্যায়ের আকারে পরিণত করিতে পারি কিনা—ইহাই প্রশ্ন। এরিষ্টটলের মতে এই যুক্তির যথার্থ আকার এইরূপ—

রাম, শ্যাম, হরি, যদু, এবং অন্যান্য অনেকে মরণশীল ;
রাম, শ্যাম, হরি, যদু ইত্যাদি ইহারাই সকল মনুষ্য ;
অতএব সকল মনুষ্যই মরণশীল।

এরিষ্টটলের মতে এ স্থলে সাধ্য, যে হেতুর সম্বন্ধে সত্য তাহাই পক্ষের সাহায্যে প্রমাণ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে পদগুলির বিস্তৃতি অনুযায়ী সাধ্য, হেতু এবং পক্ষের নামকরণ হইয়াছে। অর্থাৎ যে পদের বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক তাহাই সাধ্য এবং যাহার বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা কম তাহাই পক্ষ। এই সংজ্ঞানুসারে 'মরণশীল' সাধ্য 'সকল মনুষ্য' হেতু এবং রাম, শ্যাম, হরি, যদু······পক্ষ।

এই ন্যায়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সমবায়কে এই ভাবে ন্যায়ের আকারে পরিণত করিবার চেষ্টা নিষ্ফল। এখানে বলা হইতেছে যে, "রাম, শ্যাম, যদু, হরি ইত্যাদি ইহারাই সকল মনুষ্য"। ইহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, জগতে যত মনুষ্য আছে অথবা থাকিতে পারে আমরা তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দেখিয়াছি। যদি তাহা সম্ভব হইয়া থাকে তাহা হইলে বস্তুত: আমরা কোনও জ্ঞাতপূর্ব সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হইতেছি না ; অর্থাৎ সিদ্ধান্তে কোনও নূতন সত্যের সমাবেশ নাই ; পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু সমবায়ের বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহাতে আমরা কয়েকটি মাত্র বস্তু দেখিয়া সমজাতীয় যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। সুতরাং সমবায়কে এই উপায়ে ন্যায়ের আকারে পরিণত করা হইলে তাহার এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি প্রত্যেক মনুষ্যকে পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব না হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় বচনটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আসিয়া পড়ে। বস্তুত: প্রভাকর-মতে যাহাকে নিত্য সমবায় (perfect Induction) বলা হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাকেই উপরে কথিত উপায়ে ন্যায়ের আকারে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু এই নিত্য সমবায় যে একমাত্র সমবায়-পদ্ধতি নয় তাহা বৃহতী টীকায় (আচার্য গুরু প্রভাকর মিশ্র প্রণীত মীমাংসা দর্শনের শাবর ভাষ্য টীকায়) বলা হইয়াছে।

সমবায়ের সমস্যা

আলোচনায় দেখা গেল যে, প্রকৃতির একরূপত্ব ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যক্ষানুমোদিত যে নিখিলসাধ্য নির্বক্তি আসে তাহাকেই সমবায় বলে। প্রত্যেক সমবায়ে আমরা দুইটি সংস্কার বা ঘটনার সম্বন্ধ লক্ষ্য রাখিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস পাই। এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপস্থিতির সম্ভাব্য সম্বন্ধগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) অযুতসিদ্ধি (Co-existence) (২) সহচার (succession) (৩) সামানাধিকরণ (The relation of equality or inequality)। সমস্ত সম্ভাব্য সাধ্যাভাবই এই ত্রিবিধ সম্বন্ধের যে-কোনও একটিকে আশ্রয় করে।

(১) ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিনাশক্ষণ পর্যন্তং যয়োরাশ্রয়াশ্রয়ীভাবস্তয়োরযুত সিদ্ধি। এই অযুত সিদ্ধি সম্বন্ধ বিষয়ে বলা যায় যে, সমবায়ের মূলীভূত জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে উপস্থিতির জন্য ইহাই একমাত্র ভিত্তিভূমি। আমরা দুইটি বস্তু বা গুণ লক্ষ্য করিতে পারি, কিন্তু যদি তাহাদের অযুতসিদ্ধি-জনিত সাধর্ম্য বা হেতুত্ব ধরিতে না পারি তাহা হইলে আমরা কখনও কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ-বিষয়ক সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। তবে ইহাও সত্য যে, কেবলমাত্র আশ্রয় ও আশ্রয়ী সম্বন্ধ হইলেই সমবায় হইবে না। ধূম ও বহ্নির মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিলেও নিত্য সমবায় নাই এবং সেইজন্য "ধূমবান বহ্নি" বা "বহ্নিমান ধূম" ইহাদের কোনওটি নিখিলসাধ্য নির্বক্তি নহে। শীতকালে জলাশয় হইতে যে ধূম উত্থিত হয় তাহার সহিত বহ্নির কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব "বহ্নিমান ধূম" এ কল্পনা সমবায়গ্রাহ্য নহে। আবার বৈদ্যুতিক আলো নির্ধূম বলিয়া "ধূমবান বহ্নি" ইহাও সমবায়ে অসিদ্ধ। উভয় স্থলেই ধূম ও বহ্নির মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়ী সম্বন্ধ নাই এবং উভয় দৃষ্টান্তে আশ্রয়ীর বিনাশ-ক্ষণে আশ্রয়ের সহিত কোনও সম্বন্ধ আসে না, অতএব সমবায়ও ঘটে না।

(২) সহচার বলিতে—'সাধন বিশেষক সাধ্য সামানাধিকরণ্য প্রকারক" বুঝায়। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী বলিতেছেন—এবমন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং সহচার গ্রহস্তাপি হেতুতা। ভাষা পরিচ্ছেদ—১৩৭ কারিকা দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ সহচার জ্ঞানের হেতুত্ব সিদ্ধি জন্য অন্বয় ও ব্যতিরেকের জ্ঞান আবশ্যক। এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে আবার ব্যতিরেকী সহচার (variable succession) সমবায়ী সাধ্যাভাবের ভিত্তি গঠিত করে না। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমবায় অনুমানের বিপরীত প্রতিজ্ঞা নহে। অনুমানের মূল ভিত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের মূলকারণ হইতেছে ব্যভিচারের অজ্ঞান ও সহচারের জ্ঞান। সমবায়ের মূলভিত্তি হেতুত্ব এবং হেতুত্ব সিদ্ধির জন্য অন্বয়ী সহচার (invariable succession) উপযোগী উপাদান। কোনও ঘটনার হেতুত্ব হইতেছে তাহার অন্যনিরপেক্ষ (unconditional) অন্বয়ী (invariable) ও অব্যবহিত পূর্ব্বগ (immediate antecedent)। সুদৃঢ় অন্বয় থাকায় কার্য্যের পূর্ব্বেই সুনিরূপিতরূপে কারণের স্থান। যদি কতিপয় নিরূপিত সহচারের দৃষ্টান্তে আমরা কারণ-সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারি তাহা হইলে নি:সন্দেহরূপে তাহাদের সম্বন্ধী সাধ্যাভাব আমরা ধরিতে পারিব। অতএব সমবায়ী প্রতিজ্ঞা সহচারজনিত ঘটনা বা নিসর্গহেতু সম্বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(৩) কৃষ্ণদাস তাঁহার ভাষা পরিচ্ছেদ ৬৯ কারিকার

দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলিতেছেন সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানের মূলবস্তু ; সমবায়ের সহিত ব্যাপ্তির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কাজেই সামানাধিকরণ্য অনুমান সিদ্ধান্তের বিশেষ উপাদান, কিন্তু হেতুর সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকায় সমবায় সিদ্ধান্তেও সাহায্য করে ; কেননা রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার "ব্যধিকরণ ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন অভাব" গ্রন্থের দীধিতিতে বলিয়াছেন—তৎসামানাধিকরণ্য চ স্ববিশিষ্ট হেত্বধিকরণাবচ্ছেদেন বোধ্যম্। যে সাধর্ম্ম্যজ্ঞান হইতে সমবায়-সিদ্ধি ঘটে তাহাকে সাক্ষাত্য ধরিলে অধিকরণত্বের সহিত সম্বন্ধ আসিয়া যায় এবং তখন তাহার সমান (the relation of equality) ও অসমান (the relation of inquality) এই দুই ভাবে কল্পনা চলে। রঘুনাথও বলিয়াছেন—সাক্ষাতাং চ সমানঃসমানাধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বান্যতর রূপেণ ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবস্য—দীধিতিঃ। আমরা কয়েকটি স্থলে সমান ও অসমান সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে পারি না বটে, কিন্তু হেতুত্ব সম্বন্ধ পাইলে সমান বা অসমান ভাব লক্ষ্য করিয়া সমবায় সিদ্ধান্ত করা যায়।

যদিও সমবায়ী প্রতিজ্ঞা নৈসর্গিক হেতুত্ব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ তথাপি ইহা আমাদের নিকট দুই রূপে উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম রূপে আমরা কারণ ধরিয়া কার্য বা ফলাফল জানিবার চেষ্টা করিতে পারি ; আর দ্বিতীয় রূপে কার্য্য ধরিয়া কারণ জানিবার প্রয়াস পাইতে পারি।

প্রথম প্রকারের সমবায়ানুসন্ধানে আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বা প্রকৃত প্রযত্ন দ্বারা কারণ-বাহিত কার্য লক্ষ্য করি এবং তদ্দ্বারা তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ-সিদ্ধান্তে উপনীত হই। তবে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বিপজ্জনক অবস্থায় প্রযত্ন বা পরীক্ষা করা সম্ভবে না, কিন্তু এরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া থাকি এবং জটিল অবস্থায় অনুমানের সাহায্যে কারণবাহিত কার্য-পরিণামের হিসাব লই।

দ্বিতীয় প্রকারের সমবায়ানুসন্ধানে আমরা অতীতে পিছাইতে পারি না বলিয়াই প্রকৃত কি কারণে এই কার্য সম্ভব হইয়াছে তাহার সন্ধান লই। এরূপ স্থলে আমাদের এমন একটি কারণের ধারণা করিতে হয় যাহা ঐরূপ কার্য ঘটাইতে সমর্থ। নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তে এরূপ কল্পনার যাথার্থ্য প্রতিপাদন-জন্য সমবায়ী নিয়মের দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে সমবায়ী প্রতিজ্ঞা উপরোক্ত দুই রূপের যে-কোনও রূপে আমাদের নিকট আসুক না কেন সমাধান একমুখী অর্থাৎ প্রকৃত বা কাল্পনিক হেতু হইতে কার্যের দিকে। কৃষ্ণদাসও বলিয়াছেন—উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্টসাধনতার জ্ঞান কারণ বা হেতু [উপায়েচ্ছাং প্রতীষ্টসাধনতাজ্ঞানং কারণম্—ভাষা পরিচ্ছেদ ; ১৪৬ কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী]।

ভারতের বস্ত্রশিল্প

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে প্রধানতঃ কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; রেশম ও পশম যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহা অতিশয় নগণ্য। ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলেও জগতের অন্যান্য দেশেও কার্পাসই বস্ত্রসমস্যা সমাধানের প্রধান বস্তু। বর্ত্তমান কালে অবশ্য কৃত্রিম সুতা তথা বস্ত্র প্রস্তুতের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় বস্ত্রের অভাব কিয়ৎপরিমাণে কৃত্রিম বস্ত্র-সাহায্যেই মিটানো সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্পাস-বস্ত্রের তুলনায় ইহার পরিমাণ যথেষ্ট নহে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে অদ্যাবধি কোন প্রকার কৃত্রিম বস্ত্র প্রস্তুতের কল স্থাপিত হয় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সামান্য পরিমাণে কৃত্রিম রেশম আমাদের দেশে আমদানী হইত তাহা আসিত প্রধানতঃ জাপান হইতে। আজ জাপান যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত, সুতরাং তাহার বস্ত্রশিল্পের উন্নতিও অনেকাংশে ব্যাহত। তবে আশার কথা এই যে, সম্প্রতি ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারীর কলকব্জাদি স্থাপিত হইতেছে। তদ্ব্যতীত দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে রেশম, পশম বা অন্য কোন মূল্যবান বস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্ন আপাততঃ উঠে না। নিম্নে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের শতকরা হিসাব দেওয়া হইল :—

সাল	তুলা	পশম	রেশম	কৃত্রিম রেশম
১৯৩৯	৭৩	১৩	১	১৩
১৯৪৩	৭১	১৪	১	১৫
১৯৪৪	৭৩	১৪	১	১৩

সুতরাং ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প বলিতে এক কথায় কার্পাস-বস্ত্রই বুঝায়। কার্পাস বস্ত্রশিল্প ভারতবর্ষে নূতন নহে। মহেন-জো-দাড়োতে যে কার্পাস-বস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা তিন সহস্র খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের বলিয়া অনুমিত হয়। অনেকের ধারণা যে, মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে রক্ষিত মৃতদেহের আচ্ছাদন-বস্ত্র ভারতে উৎপন্ন কার্পাস-নির্ম্মিত। থিয়োফ্রেস্টাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৩০৬ সাল), হেরোডেটাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী), আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে আগত ঐতিহাসিকগণ, (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ সাল) প্রভৃতির লিখিত বিবরণীতে ভারতের কার্পাস-বস্ত্রের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে তুলা ও তুলাজাত দ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইত। চীন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষ হইতেই তুলার চাষ নীত হইয়াছে। তখনকার দিনে ভারতের কার্পাস-বস্ত্র কত উন্নত ধরণের ছিল ঢাকার মসলিনই তাহার প্রমাণ। হস্তচালিত তাঁতই ছিল তৎকালে বস্ত্রবয়নের একমাত্র উপায়। ইংরেজ এবং ইউরোপের অন্যান্য জাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কার্পাস-শিল্পে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম বস্ত্রবয়ন-যন্ত্রাদি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপর ভারতের বস্ত্রশিল্প উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৬৬ সালে সমগ্র ভারতে মোট ১৩টি মিলে ৩,৪০০ খানা তাঁত ছিল। ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে—৪০৭টি মিল এবং ২০১,৭৬১ খানা তাঁত; বর্ত্তমানে এই সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের স্থান কোথায় তাহা নিম্ন তালিকা হইতে সুস্পষ্ট হইবে :—

দেশের নাম	উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ
যুক্তরাষ্ট্র	৮ শত ৩৬ কোটি গজ
ভারতবর্ষ	৫ " ৪২ " "
জাপান	৪ " ০ " "
রাশিয়া	৩ " ৬৭ " "
ব্রিটেন	৩ " ৬৫ " "
অন্যান্য দেশ	১০ " ৭২ " "
মোট	৩৪ " ৯৩ " "

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। তবে লোক-সংখ্যার তুলনায় এই উৎপাদন যথেষ্ট নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জনপ্রতি গড়ে বৎসরে ১৬'৫ গজ বস্ত্র ব্যবহৃত হইত; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই পরিমাণ ছিল ৫৬ গজ, ব্রিটেনে ৪৫ গজ। চীনের অবস্থা ভারত অপেক্ষাও শোচনীয়, সেখানে এই পরিমাণ ৯ গজ মাত্র। সুতরাং দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে বা প্রতি ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইলেও ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য যে দেশে অধিকাংশ লোকই অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করে সেদেশে খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কতদূর সমীচীন হইবে তাহা বিবেচনার বিষয়। প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইত, যুদ্ধকালীন ভারতের দুর্ভিক্ষ এবং তৎসঙ্গে 'অধিক শস্য বাড়াও' আন্দোলন হেতু উক্ত জমির পরিমাণ তদপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহা বিভিন্ন রকমের। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয় পঞ্জাব, সিন্ধু, হায়দরাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার প্রভৃতি অঞ্চলে। পঞ্জাব ও সিন্ধু আজ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের তুলা ইদানীং ভারতবর্ষে অল্পই রহিয়াছে। বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইত তাহা হইতে কতক কাঁচা তুলা

বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, অন্যপক্ষে বিদেশ হইতে বস্ত্র এবং মিশরের ছোট আঁশের কাঁচা মালও এদেশে আমদানী হইয়াছে। নিম্নলিখিত পরিমাণ কাঁচা মাল বিদেশে গিয়াছে :—

সাল	রপ্তানীর পরিমাণ
১৯৩৯-৪০	২,৩৪৮,০০০ বেল
১৯৪০-৪১	২,০১৩,০০০ "
১৯৪১-৪২	৮৭৩,০০০ "
১৯৪২-৪৩	১৬০,০০০ "
১৯৪৩-৪৪	৩৮৩,০০০ "
১৯৪৪-৪৫	৪০৯,০০০ "

রপ্তানী বাদ দিয়া অবশিষ্ট তুলা ভারতের কলগুলিতে বস্ত্র ও সুতা তৈয়ারীর নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে বিদেশ হইতে যে কাঁচা তুলা এদেশে আমদানী হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ লক্ষ বেল, ভারতের কলগুলিতে ব্যবহার্য্য তুলার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। ভারতীয় মিলে উৎপাদিত বস্ত্র ও সুতার যে অংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

সাল	সুতার পরিমাণ (০০০ পাউণ্ড)	বস্ত্রের পরিমাণ (০০০ গজ)
১৯৩৮-৩৯	৩৭,৯৫৯	১৭৬,৯৯১
১৯৪২-৪৩	৩৪,২১০	৮১৭,৯৯২
১৯৪৩-৪৪	১৯,০৭৪	৪৬১,৩৩৮
১৯৪৫-৪৬	১৪,৪৯৭	৪৪০,৫০০

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সুতা রপ্তানী হইয়াছিল ১৯৪১-৪২ সালেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, পরিমাণ ৯ কোটি পাউণ্ড, এবং বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রপ্তানী হইয়াছিল ১৯৪২-৪৩ সালে। বস্ত্র বিশেষভাবে অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, ইরাক, রোডেসিয়া, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়াছিল আর সুতা লইয়াছিল অষ্ট্রেলিয়া, ইরাক ও প্যালেষ্টাইন। যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র উৎপন্ন বস্ত্রের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র বিদেশে চালান যাইত, ১৯৪২-৪৩ সালে এই পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া শতকরা প্রায় ২০ ভাগে দাঁড়াইয়াছিল। অথচ উৎপাদন তদনুপাতে বর্দ্ধিত হয় নাই। এমতাবস্থায় দেশে যে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে!

যুদ্ধের পরবর্ত্তী কয় বৎসরে ভারতের বস্ত্রশিল্পে নানারকম অসুবিধাহেতু দেশের লোকের বস্ত্রাভাব শোচনীয় হইয়াছিল। দেশে হস্তচালিত তাঁতে তৈয়ারী বস্ত্র কিয়ৎপরিমাণে সমস্যার সমাধান করিয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকসংখ্যক তাঁতী সুতার অভাবে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই। সমগ্র ভারতে মোট প্রায় বিশ লক্ষ হস্তচালিত তাঁত আছে, ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৭২ ভাগেই কার্পাস-বস্ত্র বয়ন করা হয়। সুতার অভাবে শতকরা ১৩ জন তাঁতীই বেকার বসিয়া ছিল। তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের পরিমাণ মোট ১৭০ কোটি গজ। তাহা ব্যতীত যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশ হইতেই প্রচুর বস্ত্র এদেশে আমদানী হইত। ১৯৩৯ সাল হইতেই এই পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া মাত্র কয়েক লক্ষ গজে দাঁড়ায়। অন্য দিকে দেশব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামা, মিলে ধর্ম্মঘট, উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবও বস্ত্র-উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে তাঁতের বস্ত্রসমেত ভারতের ৪২ কোটি অধিবাসীর নিমিত্ত মোট বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল ৪৬২ কোটি গজ—যাহা ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল ৬২২ কোটি গজ। তারপর মুষ্টিমেয় ধনিকসম্প্রদায়ের হস্তে মিল পরিচালনার একাধিপত্য থাকায় যে কালোবাজার ও নানারকম দুর্নীতি চলিতে থাকে তাহা বলা বাহুল্য। কণ্ট্রোল-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শহরবাসীদের বস্ত্রসমস্যার কিয়ৎপরিমাণে সমাধান হইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশার জের অনেক দিন চলিয়াছে। এখনও যে এ সমস্যার সমাধান হইয়াছে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

কাঁচা তুলার মূল্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় তুলা অন্যান্য দেশের তুলনায় সস্তাই রহিয়াছে। নিম্নে তাহা দেখানো হইল (প্রতি ক্যাণ্ডি অর্থাৎ ৭৮৪ পাউণ্ডের মূল্য দেওয়া হইয়াছে) :—

	১৯৩৯	১৯৪৮
ভারতীয় তুলা	২০০ টাকা	৯০০ টাকা
আফ্রিকার "	৩০০ "	১৮৫০ "
মিশরীয় "	৪০০ "	২,৮০০ "

দেখা যাইতেছে, ভারতীয় তুলার মূল্য যুদ্ধের পরে প্রায় ৫ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু মিশরীয় তুলার মূল্য বাড়িয়াছে ৭ গুণ। তুলা হইতে বস্ত্র তৈয়ারী করিবার যন্ত্রপাতি, কর্ম্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচও বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; অথচ সেই অনুপাতে বস্ত্রের মূল্য আশানুরূপ বাড়ানো হয় নাই বলিয়া মিলমালিকগণ কণ্ট্রোল থাকাকালে নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়াছিলেন। কাজেই কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার পর তাঁহারা যে সুদে আসলে তাহার শোধ তুলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কণ্ট্রোল উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের মূল্য যে অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছিল ইহাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। বস্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহকারীগণ বলেন,—সুতা, রং, টাকু এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপর কণ্ট্রোল রহিয়াছে, কিন্তু বস্ত্র উৎপাদন, মাল সরবরাহ এবং মূল্যের উপর হইতে কণ্ট্রোল তুলিয়া লইয়া সরকার মিলমালিকগণকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং তাঁহারা এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সরকার একথা ঠিকই জানেন যে, চাহিদার তুলনায় এখনও উৎপাদন পর্য্যাপ্ত নহে। উপরন্তু প্রতিবেশী সব কয়টি

রাষ্ট্রই বস্ত্রব্যাপারে ঘাটতি দেশ, সুতরাং চোরাকারবার চলা মোটেই অসম্ভব নয় এবং মালিকগণ কণ্ট্রোলের আমলে সরকারের জন্য যে আশানুরূপ লাভ করিতে পারেন নাই তাহাও তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই। এশিয়ার বিরাট সমুদ্র-তীরবর্তী দেশসমূহের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্রের চোরাকারবার চলিতেছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যথার্থ ই বলিয়াছেন :

"There was a rise in the price and the consumers suffered···a chance was given to the industry but I could assert without contradiction that both the country and the government were let down by the industry."

একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার—কণ্ট্রোল তুলিয়া লওয়ার পর বস্ত্রাভাব হয় নাই, বরং ইহার প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হইতেছে। কণ্ট্রোল মূল্য অপেক্ষা তিন-চারি গুণ বেশী মূল্য দিলে বস্ত্রের অভাব নাই; অভাব পয়সার, বস্ত্রের নহে। সম্প্রতি আবার কাপড়ের কণ্ট্রোল উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, অবশ্য বর্তমানে বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের কতকটা সুরাহা হইয়াছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বস্ত্র-ব্যাপারে সরকার কোন্ নীতি অনুসরণ করিতেছেন বুঝা কঠিন।

যাহাই হউক, ভারতের বর্তমান বস্ত্রসমস্যা বিশেষভাবেই জটিল। কার্পাস চাষের নিমিত্ত জমির পরিমাণ যদিও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্থান অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু জমির তুলনায় ভারতে উৎপাদন কম বলিয়া তুলার জন্য ভারতকে বিদেশী মালের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইবে। তবে কাপড়ের কলগুলির অধিকাংশই ভারতে অবস্থিত। ভারত ও পাকিস্থানের কার্পাস উৎপাদনের জমি ও উৎপন্ন তুলার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :

দেশ	জমির পরিমাণ ১৯৪৪-৪৫	উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪৬-৪৭
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র	১১,২২৮,০০০ একর	১,৭৭৩,০০০ বেল
পাকিস্থান	৩,৬১৫,০০০ "	১,৩৭৭,০০০ "

সমগ্র জমির শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ পাকিস্থানে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ পাকিস্থানে শতকরা ৪০ ভাগের উপর। সিন্ধু ও পশ্চিম পঞ্জাবের জমির উৎপাদন-ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; উৎপাদিত তুলাও উৎকৃষ্টতর। ভারতের খাদ্যাভাব হেতু তুলা চাষের নিমিত্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করাও আপাততঃ সম্ভব নহে। সুতরাং পাকিস্থানের বাড়তি তুলা যদি ভারত ন্যায়সঙ্গত মূল্যে ক্রয় করে তবে উভয় রাষ্ট্রেরই মঙ্গল।
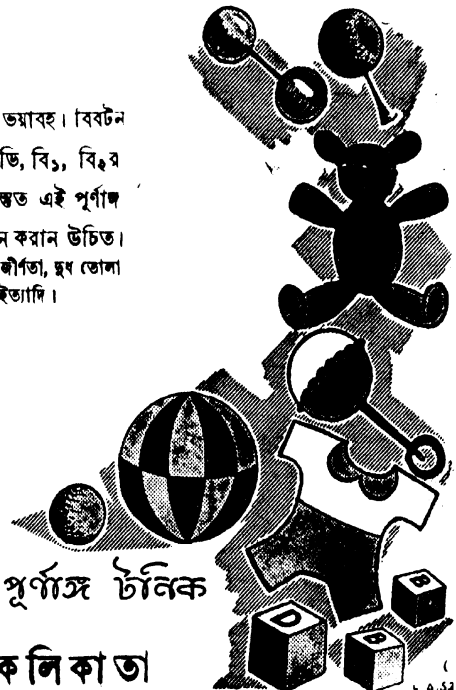
রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। দি বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য বারো টাকা।

এখানি আলোচনা-পুস্তক। সুবৃহৎ গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় ৩১২ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় অধ্যায় ২১৬ পৃষ্ঠা। দুই অধ্যায়ে শুধু গীতিকাব্যের বিচার। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে, এমন কি রবীন্দ্র কাব্য সম্পর্কেও সব কথা ইহাতে শেষ হয় নাই। গ্রন্থের ইহা প্রথম ভাগ মাত্র। কাব্যনাট্যগুলি এ বিচারের অন্তর্ভুক্ত নয়। সন্ধ্যাসঙ্গীতের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা ছাড়া কড়ি ও কোমল, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কথা, এবং কল্পনা প্রভৃতি ষোলখানি কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে আছে। খেয়া, গীতাঞ্জলি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ লেখা পর্যন্ত একত্রিশখানি কাব্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বলাকা, পলাতকা, পূরবী, মহুয়া, বনবাণী, বীথিকা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "অগণিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতার পূর্ণ অর্থ-সঙ্কেত বা স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই এই পুস্তকে তিন শতাধিক কবিতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন ভাবধারার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।" এই ব্যাখ্যা ও নির্দ্দেশের জন্য বিভিন্ন আলোচনা, "ছিন্নপত্র", "পত্রাবলী", "জীবনস্মৃতি", এবং "পঞ্চভূত" প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থের বিরাট কলেবরেও কুলায় নাই, গীতিকবিতাগুলির পরিচয় ও বিচার-বিশ্লেষণেই প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিতে হইয়াছে। বহু তথ্যের সমাবেশে এবং বিবিধ তত্ত্বের অবতারণায় গ্রন্থখানিকে পূর্ণতা-দানের চেষ্টার ত্রুটি লেখক করেন নাই। জীবন-দেবতার আলোচনা জ্ঞানপ্রদ।

রবীন্দ্র-সাহিত্য বিস্তীর্ণ। বিস্তীর্ণতর সমালোচনা আয়ত্ত করা স্বল্প-স্থায়ী জীবনে সহজসাধ্য নয়। গ্রন্থকার অধ্যাপক। তাঁহার শিক্ষক-মনে বুঝাইবার আগ্রহ অত্যন্ত অধিক। সাহিত্যামোদী পাঠকের অপেক্ষা ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা লেখককে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অতএব যাহা অনিবার্য্য তাহাই অর্থাৎ কিছু অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অরণ্যে পাঠকের হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। লেখক নিজেও যে আত্মহারা হইয়াছেন পূর্ব্বাভাষ পড়িলে তাহা বোঝা যায়। দীর্ঘ পূর্ব্বাভাষে তিনি বলিতেছেন, "বাস্তব জগৎ ও জীবন-বিমুখ একটা অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর কি করিয়া এই বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্য স্তম্ভ গড়িয়া উঠিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" আমরাও বিস্মিত হইতেছি, এমন জীবন-বিমুখ কবির কাব্যের আলোচনায় অধ্যাপক-গ্রন্থকারের এত অধ্যবসায় নিয়োগ করার কি প্রয়োজন ছিল? সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠের পর সীতার পরিচয়-জিজ্ঞাসাও এত বিস্ময়কর নয়।

জীবনের পর্য্যবেক্ষণ, জীবনের পর্য্যালোচনা, জীবনের প্রকাশ এবং জীবনের ব্যাখ্যা যাহাতে নাই তাহা কাব্য নয়। ম্যাথু আর্ণল্ড

প্রদত্ত কাব্যের সংজ্ঞা কাল যেমন ছিল আজও তেমনি সত্য এবং যুগোপযোগী হইয়া ভবিষ্যতেও তেমনি সত্য থাকিবে। বাস্তবের উপর আদর্শের, সত্যের উপর কল্পনার প্রতিষ্ঠা। আদর্শ হোক, বাস্তব হোক, যে কাব্য জীবনের প্রতি বিমুখ তাহা মায়া মাত্র, তাহা একেবারেই "একক ইন্দ্রজালময় সাহিত্য"। লেখক অংশের মধ্যে হারাইয়া গিয়া সমগ্রকে দেখিতে পান নাই। তাই মূল কথাতেই ভুল হইয়াছে। লেখক অন্যত্র নিজেই নিজের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কয়েক পৃষ্ঠার পর পূর্ব্বাভাষেই তিনি বলিতেছেন, "কবি একান্তভাবে জগৎ ও জীবনের রূপরসভোগী···বাস্তবকে কবি মোটেই বাদ দেন নাই।" "কোন দিকে না তাকাইয়া নিজের অন্তর-প্রেরণাতেই কবি ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন"—এই কথা বলিয়াই লেখক স্থানান্তরে বলিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণতার কবি, প্রকৃতি ও মানব-জীবনের অসীম রহস্যের কবি।" যদি "তাঁহার নরনারী তাঁহার মনোজগতেরই সৃষ্টি" হয়, এবং "এই সৃষ্টিতে মানব-জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর রসবিলাস নাই"—এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পর-পৃষ্ঠাতেই "রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লিরিক কবি" হইলেন কি করিয়া? 'পূর্ব্বাভাষে' যাঁহার মতে "আত্মগত ভাব, কল্পনা ও অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া কবি রসসাধনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছেন; আবেষ্টনীর কোন নির্দ্দিষ্ট ছাপ তাঁহার সাহিত্যে পড়ে নাই," সোনার তরীর আলোচনায় সেই লেখকই বলিতেছেন, "কবির কাব্য এখন জীবনের কাব্যে পরিণত হইল।" "মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ ও কর্ম্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লেখক নিজেই বলিয়াছেন, "বাস্তব বিশ্বের সত্য ও সুন্দর রূপ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল।···মানব জীবনের অসংখ্য বাস্তব বিকাশের মধ্য দিয়াই সেই সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে স্পর্শ করিতেছে।" মন দ্বিধাগ্রস্ত বলিয়াই লেখক বার বার এইরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি করিয়াছেন। 'ভাববিলাস,' 'অতীন্দ্রিয় অনুভূতি' প্রভৃতি কথার ফ্যাশনের জালে নিজেকে জড়াইয়া না ফেলিলে লেখক দেখিতে পাইতেন, যে-কবি 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' বলিয়াছেন তিনি জগৎ-বিমুখ নহেন, এবং তাঁহার রচনায় ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে জীবনের সাক্ষাৎকার লাভ করি বলিয়াই সে কাব্য এমন অপূর্ব্ব। তৎসত্ত্বেও বিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থে অনেক জানিবার কথা আছে। গ্রন্থকার যে উপকরণরাশি সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা পাঠককে উপকৃত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাংলার জনশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬) - শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭৬। মূল্য আট আনা।

এই ছোট বইখানি বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থরাজির অন্যতম। ইহাতে বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রধানতঃ বেসরকারীভাবে পরিচালিত জনশিক্ষার মূল তথ্যগুলি সমসাময়িক প্রমাণাদির সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধীয় আলোচনায় গ্রন্থকার ইহার বার্ষিক কার্য্যবিবরণসমূহের অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই সোসাইটি সম্বন্ধে স্বল্প পরিসরে এরূপ বিশদ আলোচনা সম্ভবতঃ এই প্রথম করা হইয়াছে, এবং ইহা শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট এবং তাহার পরিণতি সম্বন্ধেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠক পুস্তকখানিতে পাইবেন। তৎকালীন বাংলা গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট জনশিক্ষার প্রসারে অবহিত ছিলেন না। তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল যে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে তাঁহাদের মারফত অপেক্ষাকৃত নিম্ন বর্ণের সাধারণ লোকেরাও শিক্ষালাভ করিবে। আর এই সংস্কারবশে তাঁহারা দেশীয় পাঠশালার উন্নতির প্রতি মনোযোগী না হইয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষাপ্রচারে তৎপর হইয়াছিলেন। ফলে জনশিক্ষার বিশেষ অনাদর ঘটে। পরে অবশ্য এই ত্রুটী সংশোধনের খণ্ডশঃ চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। হিন্দু কলেজ পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার মত আদর্শ পাঠশালার কার্য্যও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকখানিতে এ সকল বিষয়ও বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গসূত্রে অ্যাডাম বলিয়াছিলেন যে জনশিক্ষার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টেরই। যোগেশবাবু তাঁহার পুস্তকে অ্যাডামের একটি উক্তির অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

"কোন উপায়েই যদি অর্থের সংস্থান না হয় তবে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতেই ইহা (অর্থাৎ জনশিক্ষার খরচ) জোগাইতে হইবে। কারণ ইহার উপরে লক্ষ লক্ষ নিঃসম্বল অজ্ঞ লোকের দাবি সবচেয়ে বেশী। ইহারাই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া তাঁহাদের রাজস্ব উৎপাদনের পন্থা করিয়া দেয়। দশ কোটি লোকের শিক্ষার নিমিত্ত বাৎসরিক রাজস্ব কুড়ি কোটি টাকা হইতে মাত্র এক লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ আর কত কাল চলিবে?"

এইরূপ অনেক পুরাতন তথ্য যোগেশবাবুর বইখানিতে আছে। ইহা পড়িয়া দেখিলে অনেকেই শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন

খণ্ডিত বাংলা—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার মিত্র এম্ এস্‌সি। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১-বি, রমা রোড, কলিকাতা—২৫। পৃষ্ঠা ২১১। মূল্য ২৸০।

ভারত বিভক্ত হওয়ায়, বিশেষতঃ বাংলাদেশ খণ্ডিত হওয়ায় লেখক মনে যে বেদনা বোধ করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে এই পুস্তক রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে। গত এক শত বৎসরের অনেক কথা লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ইতিহাস নহে। লেখা আগাগোড়াই ভাবপ্রবণতাপূর্ণ, ভাষা উদ্দীপনাময়ী। লেখার প্রতি ছত্রে বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি গ্রন্থকারের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়াছে। রচনার আন্তরিকতার সুরটি পাঠকের মনকে মুগ্ধ করে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের কথা—ডক্টর শ্রীতমোনাশ-চন্দ্র দাশগুপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৮। দুই খণ্ডে বিভক্ত, ১ম খণ্ড বাংলা ১০৭ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড ইংরেজী ১৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৭॥০ টাকা।

বইখানি ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বিভিন্ন সময়ে রচিত ও সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সমষ্টি; ফলে মাঝে মাঝে পুনরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে, ইতিহাসের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই। এই গেল দোষ। গুণের দিক্ বিচার করিতে গেলে গ্রন্থকারের অধ্যবসায় ও উপকরণ-সংগ্রহের চেষ্টা প্রশংসনীয়। বিশেষ করিয়া নাথধর্ম্ম, গোপীচন্দ্র, বিবিধ মঙ্গলকাব্য, বাংলা রামায়ণ ও পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সেকালের বাণিজ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার লইয়াও লেখক যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। ইংরেজী অংশে বৃন্দাবন পরিক্রমা, রাজা গণেশ এবং বাংলার উপর ফার্সী প্রভাব প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বইখানি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগিবে।

একটি কথা। গ্রন্থকার বাংলা-সাহিত্যের উৎপত্তি সপ্তম শতাব্দীতে ধরিয়াছেন, কিন্তু সে সময়ের সাহিত্যের কোনও নিদর্শনের উল্লেখ করিতে পারেন নাই।

ব.

অরণ্য কুহেলী—শ্রীকালীপদ ঘটক। পূর্বক্ষ প্রকাশনী। ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৲ টাকা।

কালীপদবাবু সুলেখক। আলোচ্য উপন্যাসখানি তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সাঁওতালদের জীবনের কতকগুলি ছোটবড় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানি রচিত। সাঁওতাল-সর্দ্দার রাবণ মাঝির মেয়ের বিবাহ। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবে তাহার বাড়ী পূর্ণ, কিন্তু বিবাহ-সভায় এক সামাজিক গোলযোগের ফলে বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। উপন্যাসখানির মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে কাহিনীর সূচনাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনার বিচিত্র প্রবাহ পাঠকের চিত্তকে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। বিভিন্ন পরিবেশে প্রেমের বিচিত্র রূপ লেখকের নিপুণ তুলিকায় চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাবণ মাঝি, কিষ্ট, টুরাই, চাঁদরায় মাঝি, মোহন এবং টুংরা মাঝি ও দুলালী প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বিশেষতঃ টুংরা মাঝির অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ পাঠককে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে।

সাঁওতালদের জীবন সম্বন্ধে কালীপদবাবুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে রসকল্পনার সমন্বয়ে যে চমৎকার উপন্যাসখানি তিনি রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠকের রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিবে। পুস্তকখানিতে অরণ্যের রহস্যময় পটভূমিকায় অরণ্যচারী সাঁওতালদের জীবনের বিচিত্র রূপ বিভিন্ন পরিবেশে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের ভাষার মধ্যে এমনি একটা অপরূপ স্নিগ্ধতা আছে যে তাহা অরণ্য কুহেলীর মতই পাঠকের মনে মোহজাল বিস্তার করে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জন-শিক্ষার সহচর—শ্রীবিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ জন-শিক্ষা পরিষদ। শিক্ষক পাব্লিশিং হাউস, ৬১নং বালিগঞ্জ প্লেস। ৯৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥০ টাকা।

গ্রন্থকার খ্রীষ্ট-সেবক, কিন্তু দেশের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কল্পনা তাঁর অসাধ্য বলিয়াই তিনি আজ প্রায় ১২ বৎসর যাবৎ জন-শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর লক্ষ টাকা দানের কল্যাণে, বাংলার নারী-সমাজের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ও সমাজের সাহায্যে অনুরূপ চেষ্টা নারী শিক্ষা সমিতির কর্তৃপক্ষগণও করিতেছেন।

বর্ত্তমান পুস্তকখানি জনশিক্ষার আদর্শ ও উপায় সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ—গ্রন্থকারের বার বৎসরের নানা অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত।

বয়স্কদের শিক্ষা আজ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এক পশ্চিম বাংলায়ই জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ—৯০,০০,০০০ জন অক্ষরজ্ঞানবর্জ্জিত; বর্ত্তমান জগতের হালচাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনসাধন করিতে হইলে লেখকের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। নানা ছবি ও নক্সা দিয়া তিনি তাহা পাঠকসমাজের হৃদয়গ্রাহী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রত্যেক জনশিক্ষাব্রতীর "সহচর" হইবার যোগ্য।

জন-শিক্ষার কথা—শ্রীনিখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; বেঙ্গল মাস এডুকেশন সোসাইটি, ৯৯ ১এফ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। ১৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানিতে বয়স্ক-শিক্ষার আদর্শ ও বিভিন্ন দেশে যে যে উপায়ে তাহা সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহার বর্ণনা আছে। ইহাতে এই শিক্ষার তত্ত্ব যেমন বিবৃত হইয়াছে, সেইরূপ আমাদের দেশের উপযোগী নানা উপায়ের বিচারও আছে। সরকারী পরিকল্পনাদির কথা যেমন আছে তেমনই আমাদের গ্রাম্য জীবনের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিচার করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থার কথাও আছে। প্রায় ৪০ পৃষ্ঠার পরিশিষ্টে গ্রন্থকারদ্বয় তাহার একটা ছক কাটিয়া দিয়াছেন।

আজ দেশের অজ্ঞানতা ও নানা বদ্ধমূল সংস্কার দূর ও পরিবর্ত্তন করিবার যে কর্ত্তব্য আমাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। সরকারী বে-সরকারী নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এই পুস্তক হইতে জনশিক্ষা বিস্তারে প্রেরণালাভ করিবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ১৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ২.০।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমান জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে; এক দিক দিয়া বিশ্বত্রাস দুর্জ্জয় জার্ম্মানীকে পরাজিত করিয়া এবং অন্য দিকে পঞ্চবার্ষিক সংগঠনমূলক কার্য্যক্রম দ্বারা এক সুদৃঢ় বিরাট নব-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া জগতের বিস্ময়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি মনীষিগণ মুক্তকণ্ঠে ইহার কৃতিত্ব ও অসাধ্যসাধনের প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক ঠাকুরদার আসনে বসিয়া বর্ত্তমান যুগের নাতি-নাতনীদিগকে কথকতার ছলে সাম্যবাদী রাশিয়ার এই নব অভ্যুদয় এবং সঙ্কল্প ও সাধনার কাহিনী শুনাইয়াছেন। সত্যযুগে ব্রাহ্মণরাজ, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ক্ষত্ররাজ ও বৈশ্য-রাজের কাহিনী পুরাণ ও ইতিহাসে অনেক শুনা গিয়াছে কিন্তু, শূদ্ররাজ বা শ্রমিকরাজের কাহিনী এত দিন অশ্রুত ছিল। যাহারা সমাজ ও দেশের তিন-চতুর্থাংশ জুড়িয়া আছে সেই কৃষক ও মজুরের অথবা বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নসাধের লক্ষ্মীর মূর্ত্তিমতীরূপে ধরা দেওয়ার কাহিনী এতদিন রূপকথার মতই অলীক কল্পনা ছিল। মরুভূমি, তুষার ও অরণ্যের দেশ রাশিয়ায় সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বর্ত্তমান গ্রন্থকার এবং অনেক মনীষী ইহার বিচিত্র বহুমুখী সাধনা ও বিরাট পরিকল্পনার হাতেকলমে পরীক্ষা ও ক্রমাভিব্যক্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনা করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি দেবীর পঞ্চভূতের শক্তি কাজে লাগাইয়া কিরূপে দেশের চেহারা ফিরাইয়া দেওয়া যায়, কৃষক-মজুরের সমবায়পদ্ধতি ও সর্ব্বসাধনা রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা জগন্মোহিনী বিশ্বারাধ্যা লক্ষ্মীর আসন রাষ্ট্রে কিরূপে স্থায়ীভাবে সুদৃঢ়

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা যায়, বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যাপূর্ব্বক গল্পচ্ছলে তাহা কিশোরদিগকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়া গ্রন্থকার 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভে'র প্রসঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সেই লক্ষ্মীলাভের সাধনার কথা তাহাদিগকে শুনাইয়াছেন। ইহার নিরীশ্বরবাদিতা, একনায়কত্ববাদ, পরমত অসহিষ্ণুতা ও রাষ্ট্রের সর্ব্বময়ত্ববাদ বিশ্বের পণ্ডিতগণের বিরুদ্ধ মত ও আলোচনার বস্তু হইলেও ইহার লোক-রাজ গণজাগরণ ও সাম্যবাদের বিস্ময়কর সাফল্য ও কৃতিত্ব লেখক প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন। এই নরনারায়ণের লক্ষ্মীলাভের যজ্ঞের কথা পড়িতে পাঠকদের ভালই লাগিবে ও এই গ্রন্থ রাশিয়ার সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার কৌতূহল জাগাইবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

বর্ষপঞ্জি (১৩৫৬)—সম্পাদক শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত ও শ্রীগোপাল ভৌমিক। এন আর সেনগুপ্ত এণ্ড কোং। ২৫-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা—১৩। মূল্য ৪৲ টাকা।

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত ইয়ার-বুক জাতীয় যে কয়খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সমালোচ্য বর্ষপঞ্জীখানি যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মুদ্রণ-পারিপাট্যে, সম্পাদন বৈশিষ্ট্যে এবং তথ্যপরিবেশননৈপুণ্যে ইহাকে উৎকৃষ্ট ইংরেজী ইয়ার-বুকের সমপর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। গ্রন্থখানি আকারেও বিরাট—এত অধিক পৃষ্ঠাসংখ্যা আর কোনও বাংলা ইয়ার-বুক নাই। সম্পাদকদ্বয় বিবিধবিষয়ক তথ্য সমাহরণ করিতে গিয়া যে অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা পুস্তকখানির পাতা উল্টাইলেই বুঝিতে পারা যায়। তা ছাড়া ভারত ও পাকিস্থানের অর্থনীতি, বীমা, সিনেমা, খেলাধূলা, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের লিখিত প্রবন্ধ এক দিকে যেমন এই বর্ষপঞ্জীর বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে অন্য দিকে তেমনি সাধারণ পাঠকের নিকট ইহাকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে। পাকিস্থানের অগ্রগতি সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত অধ্যায়টি এ বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে নূতন সংযোজনা। ইহা পাঠ করিলে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এমনি নানা দিক দিয়াই বর্ত্তমান বর্ষপঞ্জীখানির স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু ইহার সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহার ব্যক্তিপরিচয় (Who's Who) নামক অধ্যায়টি। ইহা নিম্নলিখিত চারিটি ভাগে বিভক্ত। (১) বর্ত্তমানে (বর্ত্তমানের লেখাই সঙ্গত) বিশিষ্ট বাঙালী (২) বর্ত্তমানে বিশিষ্ট ভারতীয় (৩) পাকিস্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তি (৪) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি। নানা বিষয়ক খুঁটিনাটি তথ্য থাকায় বইখানি সাংবাদিকদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছে—ইহা হাতের কাছে থাকিলে তথ্যের জন্য তাঁহাদিগকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে না।

আকাশজয়ের গল্প—শ্রীবীরেন দাশ। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০ টাকা।

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম প্রধান বাহন বিমান। আকাশযানে আরোহণ করিয়া আধুনিক সভ্যতা জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছে। এই বিমানের দৌলতে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে—দূর আজ নিকট হইয়াছে। বিমান এক দিকে যেমন মানুষের মিলনের পথকে সুগম করিয়া দিতেছে অন্য দিকে তেমনি ধ্বংসলীলার সহায়ক হইয়া মানুষের ক্ষতিও কম করিতেছে না। আজিকার যুদ্ধও প্রধানতঃ আকাশযুদ্ধ। কিন্তু বিমান সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মোটামুটি ধারণা হইতে পারে বাংলাভাষায় এমন বই নাই বলিলেই চলে। শিশুসাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীবীরেন দাশ ছাত্র ও তরুণসম্প্রদায়ের মধ্যে বিমান চালনা বিমানের গঠন-কৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাইবার জন্য এই বইখানি লিখিয়াছেন। লেখার গুণে এই টেকনিক্যাল বিষয়ক বইখানিও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 'কেমন করে মানুষ উড়তে শিখল', 'এরোপ্লেন কেন উড়ে', 'উড়তে শেখো' প্রভৃতি অনেকগুলি অধ্যায়ে বইখানি বিভক্ত। 'মেরুদেশে বৈমানিক অভিযান' নামক অধ্যায়টি কিশোর-পাঠকদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবে।

বৈমানিক বীরেন রায়ের একটি সুন্দর ভূমিকা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

স্যার গুরুদাস জন্ম-শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ—শ্রীঅনাথনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৮+৩৩৪। মূল্য দশ টাকা।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসবকে স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ইংরেজী অংশ বাদে প্রায় সত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং রচনায় গুরুদাসের জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বঙ্গ-মনীষীগণ তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা রচনায় বহু সদুক্তি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "স্বদেশী সমাজে" গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমাজপতি আখ্যা দিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইহাতে যে আদর্শে স্বয়ংপূর্ণ বঙ্গীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা কল্পনা করেন তাঁহার 'সমাজপতি' করিতে চাহিয়াছিলেন গুরুদাসের মত মানবশ্রেষ্ঠকে। গুরুদাসের জীবন ও কর্ম্ম এমনই একটি আদর্শ সমাজের উপযোগী ছিল। এই সকল রচনা এবং অন্যান্য বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রবন্ধে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। গোরীমোহন মিত্র লিখিত গুরুদাস-জীবনের কাহিনীগুলি বাস্তবিকই মনোরম।

শিক্ষা-প্রকল্প—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৭২। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের সাতাশটি সংখ্যক গ্রন্থ। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে জাতীয় বনিয়াদের উপর বাঙালীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠা-কল্পে লেখক যে সকল চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এই বইখানিতে তাহা পুনরায় পাঠকবর্গের গোচরীভূত করা হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান ইংরেজ-মুক্ত আবহাওয়ায় বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণ শিক্ষার সংস্কার-সাধনকল্পে নানারূপ পরিকল্পনা রচনা এবং তাহার কথঞ্চিৎ প্রয়োগে তৎপর হইয়াছেন। মনস্বী যোগেশচন্দ্রের শিক্ষা বিষয়ক সুচিন্তিত প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে এ সকল রচিত ও প্রযুক্ত হইলে সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

আদ্য, মধ্য, অন্ত্য এবং অধিশিক্ষার ক্রম দেশের জল মাটি মানুষের সঙ্গে যোগ রাখিয়া কিরূপে সুনিয়ন্ত্রিত ও কালোপযোগী করা যায় ইহার নির্দ্দেশ বইখানিতে মিলিবে। বিষয়বস্তুর বর্ণনা ও রচনাভঙ্গী পাঠককে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। এই সময়ে এরূপ পুস্তক প্রকাশে আমাদের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, বলিতে হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সামবেদী সন্ধ্যা বন্দনা—শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা ১৪নং কাঁকুড়গাছি সেকেণ্ড লেন হইতে শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার প্রথমেই সরল পদ্যে সামবেদীয় সন্ধ্যামন্ত্রের অনুবাদ সন্নিবেশিত করিয়া ক্রমে সন্ধ্যাবিধি, তর্পণবিধি এবং বঙ্গীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের জ্ঞাতব্য কৌলিন্যবার্ত্তা, ব্রাহ্মণের মরণাশৌচ, শবদাহবিধি, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানি ধর্ম্মানুরাগী সামবেদী ব্রাহ্মণগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের বার্ষিক উৎসব

গত ৯ই পৌষ সেবায়তন যোগমন্দির প্রাঙ্গণে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আশ্রমের পঞ্চম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান হইতে আশ্রমে বিপুল জনসমাগম হয়। আশ্রমাচার্য্য কর্ত্তৃক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির পর সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতায় সেবায়তনের জনশিক্ষা-ব্যবস্থা, চিকিৎসাকেন্দ্র, কৃষি-শিল্প, গোপালন ইত্যাদি আশ্রমের সংগঠনমূলক কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান অশান্তিময় জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের সেবামূলক আদর্শ এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে বিভিন্ন স্থানের সাধকদের এক সম্মেলনে আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনা হয়। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পতি মহাশয়ের নেতৃত্বে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যার পর বিদ্যার্থীগণ কর্ত্তৃক নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান হইলে পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।
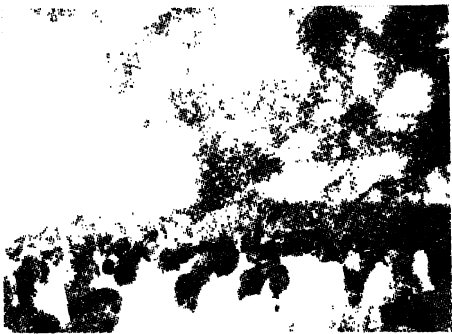
ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের বার্ষিক সম্মেলন। ডঃ শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পিএইচ-ডি সভাপতিত্ব করেন।

সেবায়তন প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব উপলক্ষে সেবায়তন বিদ্যালয়ের বালকদিগের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা। ঝাড়গ্রাম কংগ্রেস নেতা শ্রীগোপীনাথ পতি মহাশয় পারিতোষিক বিতরণ করিতেছেন।

সেবায়তন আরোগ্য-ভবন (চিকিৎসালয়)

ঝাড়গ্রাম সেবায়তন বিদ্যালয়ের "শ্রীযুক্তেশ্বর" ছাত্রাবাস

সেবায়তন বিদ্যালয় গৃহের একাংশ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪৯) ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী সঙ্ঘের জন-সেবা, শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, তীর্থসংস্কার, ভারতে ও ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও সংগঠন ইত্যাদি নানাবিষয়ক কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া বলেন,—আলোচ্য বর্ষে সঙ্ঘের ৬টি প্রচারক দল ভারতের ৮টি প্রদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। সঙ্ঘ কর্তৃক প্রেরিত একটি সংস্কৃতি-মিশন পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারতীয় কৃষ্টির প্রচার করিয়া নাইরোবী ও মোম্বাসায় দুইটি স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, পুরী এবং বৃন্দাবনে সঙ্ঘের পরিচালিত যাত্রী-নিবাসগুলিতে ২৫,৪৩১ জন তীর্থযাত্রীকে আশ্রয় এবং ১০,২০৫ জনকে আহার্য্য দান করা হইয়াছে ও সঙ্ঘের ১০টি দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্রে ২৪,৯৮৮ জন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সঙ্ঘ উদ্বাস্তদের আহার্য্য-দান, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি যে সকল জনহিতকর এবং গঠনমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় সেগুলির কথাও উল্লেখ করেন। সম্মেলনে বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার, শরণাগত সেবা, আদিবাসী উন্নয়ন, ছাত্রদের নৈতিক মান উন্নয়ন, আসন্ন কুম্ভমেলায় সেবাকার্য্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত ৯ই কার্ত্তিক হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ষাট বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম হয় ১২৯৬ সালে। তাঁহার পিতা সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতার বিশিষ্ট

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যবসায়ী ছিলেন। হরিদাসের বাসগ্রাম সেওড়াফুলি। এখানে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। বাংলাদেশে 'বৈদ্যবাটী ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশনে'র খ্যাতি আছে। হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এসোসিয়েশনের গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। হরিদাস ছিলেন 'বন্দনা' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক। তিনি বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই একান্ত চেষ্টায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে বাংলা ভাষায় ইতিহাস-চর্চ্চার একমাত্র পত্রিকা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রবর্ত্তিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নানা কারণে বন্ধ হইয়া যায়। হরিদাসের উৎসাহ এবং উদ্যমে নিখিলনাথ রায়ের সম্পাদনায় ইহা নূতন ভাবে প্রকাশিত হয়। হরিদাস ছিলেন সুলেখক, দেশসেবক, সুচিকিৎসক এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। তাঁহার মত সাহিত্য-সুহৃদের অন্তর্দ্ধানে সাহিত্যের এবং সাহিত্য-সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
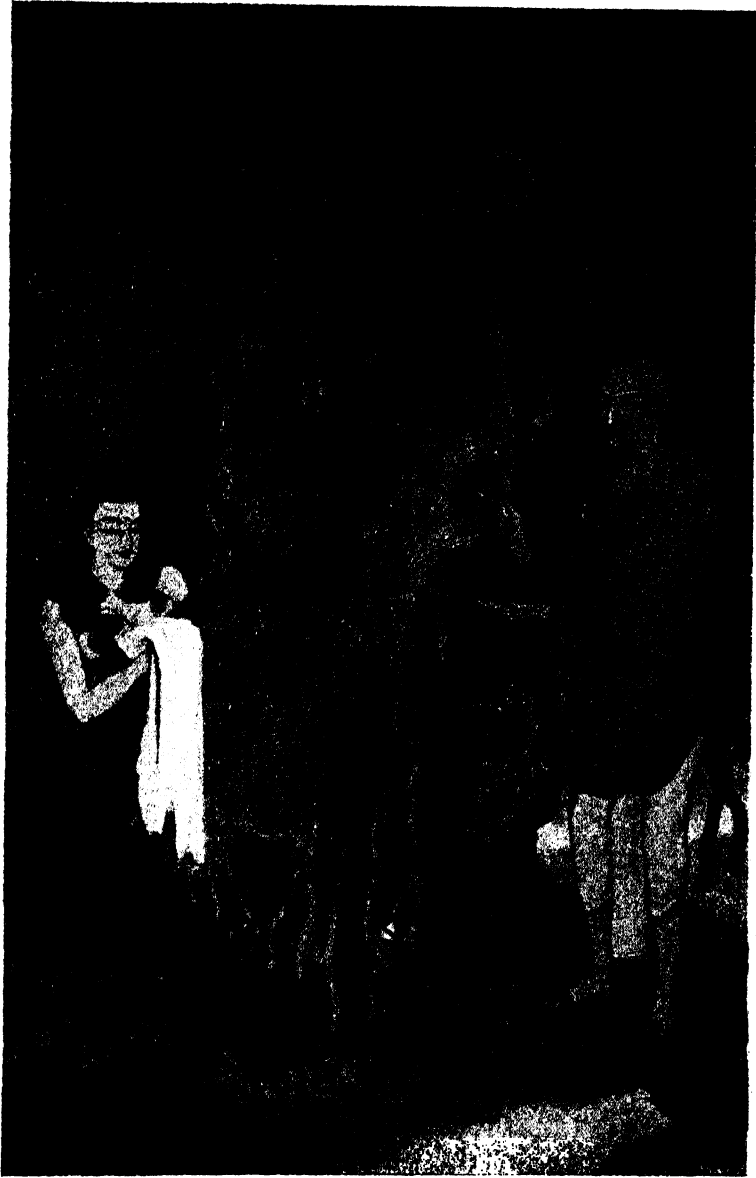
"শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা"

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

শীত (ব্রোঞ্জ) ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৯শ ভাগ ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৭৬ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলায় ন্যায় ও শৃঙ্খলা

কোনও রাষ্ট্রকে সুস্থ সবল ও কার্য্যক্ষম অবস্থায় রাখিতে হইলে তাহার প্রথম ও মুখ্যতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ন্যায় ও শৃঙ্খলার, যাহাকে ইংরাজীতে বলে Law and Order। ইহার অভাবে রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যবস্থা অকেজো হইতে বাধ্য, এবং সেই কারণে রাষ্ট্রের অধোগতি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কেননা ইহা সর্ব্বজনবিদিত রাষ্ট্র-নীতির স্বতঃসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য নিয়ম। পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ এই ন্যায় ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থায় যে আংশিক শৈথিল্য দেখা দিয়াছে তাহার বিচার ও প্রতিকারের চেষ্টা এখন অতি সত্বর হওয়া প্রয়োজন, কেননা উহা এখন একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি এইরূপ অবস্থা আরও কিছুদিন চলে তবে দেশে স্থায়ী অরাজকতার আশঙ্কা দেখা দিতে বাধ্য।

দেশে বিক্ষোভ বা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা আসিলে তাহার দমন ও শৃঙ্খলার পুনঃস্থাপনের ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত আছে তাঁহারা যদি সাময়িকভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন তবে ঐ অবস্থার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, কেননা রাষ্ট্রধ্বংসে বা দেশে অরাজকতা আনয়নে যাহাদের স্বার্থসিদ্ধি হইবে তাহারা একবার হটিয়া গিয়া পুনর্ব্বার আরও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার আয়োজন করে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা ন্যায়-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদিগের চেষ্টা আরও সম্যক্‌ভাবে ব্যর্থ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে। শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গ যদি সেই অবসরে তাঁহাদের ব্যবস্থাও দৃঢ়তর এবং আরও দ্রুত কার্য্যকরী করার চেষ্টা না করেন তবে পরের বারের বিশৃঙ্খলা অধিক ব্যাপক ও প্রচণ্ড হয় এবং রাষ্ট্র-নাশকারীগণ আংশিক সাফল্য লাভ করায় দ্বিগুণ উৎসাহে দেশব্যাপী অরাজকতার চেষ্টায় লাগিয়া, ঘন ঘন বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া শাসনতন্ত্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। এইরূপ বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা দমনে যদি শাসনতন্ত্র রাষ্ট্র-শত্রুদিগের সম্মুখে হটিতে থাকে তবে অরাজকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া দেশব্যাপী মাৎস্যন্যায়ের সৃষ্টি করে।

সম্প্রতি রাষ্ট্রের বাহিরে অনাচার ও অত্যাচার হয়, ফলে জনমত বিক্ষুব্ধ হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—এইরূপ প্রকাশ। আমরা জানি একথা সত্য এবং আমরা ইহাও স্বীকার করি যে পূর্ব্ব পাকিস্থানে হিন্দুর উপর যে অত্যাচার হইয়াছে তাহার অকাট্য প্রমাণ রূপে হাজার হাজার দুঃস্থ ও উৎপীড়িত শরণার্থী এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও বলিব যে, পাকিস্থানের প্রত্যেক ঘটনার প্রতিচ্ছায়া ব্যাপক ভাবে এদেশে পড়িবে ইহা আমরা মানিতে বাধ্য নহি।

পাকিস্থান আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সেখানে যদি প্লেগ মহামারীতে লক্ষ লোক মরে তবে কি আমাদের দেশেও দশ-বিশ হাজার লোক মরিতে বাধ্য? সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত দুই-চারি শত লোক এদেশে আসিতে পারে ও সেই কারণে দুই দশ জন লোক মরিতেও পারে, কিন্তু দেশে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা যদি সময় মত সুষ্ঠুভাবে হয় তবে সে রোগ ছড়াইবেই এ কথা স্বীকার্য্য নয়, আশা করি শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গ সে কথা মানিবেন।

মূলকথা কি তাহা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের ব্যবস্থার বিচারে পাওয়া যায়। আজ না হয় পাকিস্থানে এই অশান্তির হেতু পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী যে অরাজকতা ও বিক্ষোভ দেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের বিরাট অংশে, দেখা দিয়াছিল তাহার উৎপত্তিস্থল তো পাকিস্থান ছিল না? তবে কেন সে সময়েও সেই সকল স্থানে রাষ্ট্রের শাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের শক্তি হটিয়া গিয়াছিল—অন্ততঃপক্ষে সাময়িক ভাবে?

একটা কথা আজকাল অশান্তি ঘটিলেই উচ্চতম অধিকারী-বর্গ বার বার বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "জনসাধারণের

সাহায্য নাই", "জনসাধারণের সহানুভূতি নাই" "জনমত শাসন বিরোধী" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মতবাদের সূক্ষ্ম ও সম্যক্ বিচার এখন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেননা আমরা দেখিতেছি যে জনসাধারণ এইরূপ উল্টাপাল্টা চীৎকারে ক্রমেই উদ্‌ভ্রান্ত ও হতাশ হইয়া পড়িতেছে। একদিকে বিক্ষোভকারিগণের সাহস ইহাতে বাড়িয়াই চলিয়াছে অন্যদিকে শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্ম্মচারীবর্গও ঐ অজুহাতে গা ঢিলা দিবার পূর্ণ সুযোগ পাইতেছে। এইরূপ অবস্থা আর কিছু দিন চলিলে শাসন ব্যবস্থা ক্রমে অচল হইয়া আসিবে।

প্রথমেই অধিকারীবর্গের সম্মুখে প্রশ্ন করি যে শাসনতন্ত্রে জনমতের অধিকার কি ও তাহার প্রকাশ ও ব্যবহার কিভাবে হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন শৃঙ্খলা-স্থাপনে ও বিক্ষোভ-দমনে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি কি ভাবে চাওয়া হইতেছে। সরকার কি চাহেন যে জনসাধারণ ন্যায়-অন্যায় ও আইন-কানুনের বিচার ও প্রয়োগ সরাসরি নিজের হাতে লয়? তৃতীয় প্রশ্ন এই যে দেশের উচ্চতম অধিকারীবর্গ কি দেশ-চালনার অন্য সকল ব্যাপারে জনমত গ্রাহ্য করিতেছেন যে এই ক্ষেত্রে জনমতের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন? এবং সর্ব্বশেষে বিচার্য্য এই যে, "জনমত" বস্তুটি কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর চাই।

শেষের প্রশ্নই বিস্তারিত ভাবে পুনর্ব্বার করা যাউক। যদি কোনও ব্যক্তিসমষ্টি—যাহার মধ্যে সংবাদপত্রের কর্ম্মচারীও মুখ্য ও গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট—পরস্বাপহরণের ব্যাপক ব্যবস্থা, যথা হিন্দুর জমি দখল, বাড়ী দখল ইত্যাদি করে এবং সেই দুষ্কার্য্য "জনমতের" ধূম্রজালে চাপা দিবার জন্য মুখের কথায় ও ছাপার অক্ষরে গোলমালের সৃষ্টি করে তবে কি তাহা "জনমত" হিসাবে গ্রাহ্য? যদি অন্য কোন ব্যক্তিসমষ্টি শরণার্থীদিগের নাম লইয়া সরকারী ব্যবস্থার ও প্রকৃত সেবাব্রতীদিগের বিরুদ্ধে চীৎকার তুলিয়া নিজের কাজ গুছাইবার চেষ্টায় প্রবল কোলাহল তোলে তবে কি সেই রবও "জনমত"? "ব্যক্তিগত স্বাধীনতার" চীৎকার তুলিয়া যদি কেহ প্রত্যক্ষভাবে নিজের বৈরীপীড়নের ব্যবস্থায় জনবিক্ষোভের সৃষ্টি করে তবে কি তাহার চালিত উন্মত্ত জনতার তাণ্ডব "জনমত"? বিদেশীর পঞ্চমবাহিনী যদি অপরিণত-মস্তিষ্ক তরুণ-তরুণীকে বিদেশীর সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিপথে লইবার জন্য চতুর্দ্দিকে অরাজকতা সৃজনে প্ররোচনা দেয় তবে কি তাহা "জনমত"? যদি কোনও পেশাদার "ত্যাগীমার্কা দেশ-সেবকের" দল নিজেদের দলগত স্বার্থসিদ্ধির কারণে দেশের শাসন, খাদ্য সরবরাহ ও সংগ্রহ ইত্যাদিতে বাধা দিবার জন্য প্রবল কলরব তুলে তবে কি তাহাও "জনমত"?

দেশের শাসন-পরিচালনা যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের এখন বুঝিতে হইবে যে স্বাধীন দেশ চালনায় শুধু কুসুমাদপি কোমল হইলে শত শত বৎসরের দাসত্ব রোগ হইতে সদ্যমুক্ত বিভ্রান্ত অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হওয়া ভিন্ন আর কিছুই সম্ভব নয়। দুষ্টের দমনে বজ্রাদপি কঠোর হইলে তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার সম্ভব। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যাহারা নিযুক্ত তাহাদের কর্ম্মচ্যুতি বা ত্রুটি যাহাতে মিথ্যা অজুহাতে চাপা দেওয়া না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিলে তবেই উহা সম্ভব।

সাম্প্রদায়িক গোলযোগ

পূর্ব্ববঙ্গে কিছুদিন যাবৎ হিন্দু উৎপীড়নের যে সমস্ত সংবাদ পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছিল তাহা সকলেই উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। বনগাঁয় ১৩ হাজার আশ্রয়প্রার্থীর আগমনের পর অবস্থা আরও গুরুতর হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতার কতকগুলি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ঘটিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকাতেও বেশ কিছু অরাজকতা ও অশান্তি হইয়াছে। প্রথম হইতেই এবার সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কারফিউ জারী করিয়া ও অন্যান্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শান্তি রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের দুই চীফ সেক্রেটারী ঢাকা সম্মেলনের পর একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন, উহাতে যে সব সতর্কতার কথা বলা হইয়াছে তাহা এখানে পালিত হইতেছে এবং সমস্ত সংবাদপত্র ও জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ উহাতে সাহায্য করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের সঠিক সংবাদ পাওয়ার উপায় নাই, তবে ঢাকার ঘটনার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত "আজাদ" ভারতের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর বিকৃত ও মিথ্যা প্রচারের দ্বারা সেখানে বিষ ঢালিতেছিলেন।

ব্যাপারটাকে আমাদের দুই দিক হইতে দেখা দরকার। প্রথম কথা, পাকিস্থানে হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে মাঝে মাঝে দেখা দিতেছে। আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে বর্ত্তমান গোলযোগের উৎস আমাদের নাগালের বাহিরে, সেখান হইতে যে বিষ ঢালা হইতেছে তাহাই আমাদের উপর পড়িয়া আমাদেরও সমাজদেহকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এই বিষপ্রয়োগ বন্ধ করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, উহা কেবলমাত্র প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের নহে। প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টকে এইটুকু দেখিতে হইবে যে, এই বিষ যেন আমাদের ধ্বংস না করে, যথাসাধ্য উহার কুফল এড়াইয়া চলা এবং সমাজদেহকে এই বিষপ্রয়োগ সত্ত্বেও সুস্থ রাখিবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। ইহা অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু এই অসম্ভবই আমাদের সম্ভব করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক গোলযোগকে ২৬শে জানুয়ারী দক্ষিণ-কলিকাতায় যাহা ঘটিয়াছে তাহার সহিত একযোগে দেখিতে চাই। ভারতরাষ্ট্রে এখন তিন শ্রেণীর লোক তৎপর হইয়া

উঠিয়াছে—তিন জনেরই উদ্দেশ্য এক, রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন। ইঁহারা হইতেছেন কম্যুনিষ্ট, পাকিস্থানী এবং কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত এক দল। ২৬শে জানুয়ারী দক্ষিণ-কলিকাতায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা গবর্ন্মেণ্ট বলিয়া কিছু ছিল না। প্রকাশ্য দিবালোকে টালিগঞ্জ থানার এক শত গজের মধ্যে দক্ষিণ-কলিকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতির বাড়ী লুঠ হইল, মেল-ভ্যান আক্রান্ত হইল, উহাও লুঠ হইল, ষ্টেট বাস ও ট্রাম আক্রান্ত হইল। পরম নিশ্চিন্ত মনে দুষ্কার্য্যকারীরা কার্য্য সমাধা করিল। পুলিস বাধা দিতে পারিল না, লুণ্ঠিত মাল উদ্ধারের চেষ্টা করিল না, মেল-ভ্যানের ড্রাইভার গাড়ীটি গুণ্ডাদের হস্তে সযত্নে সমর্পণ করিয়া সরিয়া পড়িল, উহা বাঁচাইবার কোন চেষ্টা করিল না। এই থানার পুলিসের এবং ঐ মেল-ভ্যানের ড্রাইভারের কোন কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।

এখানে যে বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার কথা তাহা হইতেছে এই ভারতরাষ্ট্রে শান্তি রক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব যাহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহারা উহা যথাযথ ভাবে পালন করিতেছে কিনা এবং কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে অথবা কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম হইলে তাহাদের সরাইয়া তৎস্থলে নূতন লোক দেওয়া হইতেছে কিনা, অযোগ্যতা বা কর্ত্তব্যপালনে অবহেলার জন্য কেহ শাস্তি পাইতেছে কিনা। যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণে রাখা যাইত কিনা এবং ঘটিবার কত সময় মধ্যে উহা নিবারণ করিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনা যাইত তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। ইহা হইলেই কর্ম্মচারীদের যোগ্যতা অযোগ্যতা ধরা পড়িবে। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি এরূপ করা হইতেছে না। ইহা ভারতরাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ঘোরতর বিপদের কথা। পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে সেখানকার গবর্ন্মেণ্ট দুর্বৃত্তদের উপর যথোপযুক্ত শাসন রাখিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আমাদের এখানে এরূপ হওয়ার কথা নয়। আমাদের গবর্ন্মেণ্ট অনেক বেশী শক্তিমান। আমাদের এখানে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, শান্তি রক্ষা এবং দুষ্কার্য্যকারীদের উপর কঠোর শাসন বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী, কারণ পশ্চিমবঙ্গ একটি সীমান্ত ঘাঁটি। এইজন্য আমরা বিশ্বাস করি যে, পূর্ব্ববঙ্গে যাহাই কেন ঘটুক না, পশ্চিমবঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ব্যক্তিগত মারামারি ঘটিতে দিলে সমগ্র দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। এইজন্য এখানকার পুলিস এবং ম্যাজিষ্ট্রেটদের অত্যন্ত কর্ম্মক্ষম এবং সতর্ক হওয়া দরকার।

মাণিকতলা, বেলেঘাটা প্রভৃতি স্থানে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতেও আমরা তিনটি বিভিন্ন দলের হাত লক্ষ্য করিয়াছি। একদল আগুন দিয়াছে, একদল লুঠ করিয়াছে এবং একদল বাস করিতে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতটা যোগাযোগ আছে বা আদৌ আছে কিনা তাহা আমরা বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু এটা দেখা গিয়াছে যে, গোলযোগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইহাতে এই কথাই মনে হয় যে, শান্তিরক্ষা পুলিসের পক্ষে কঠিন ছিল না এবং এখনও কঠিন নয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচার সুরু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে তাহার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। বাগেরহাটের ঘটনার উপর মিথ্যার চুণকাম করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ন্মেণ্ট প্রেসনোট বাহির করিয়াছিলেন, মৌলবি ফজলুল হকের ন্যায় লোকেরাও পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর কিছুই হয় নাই বলিয়া বিবৃতি দিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কিছুদিন যাবৎ লোক আসা একেবারে বন্ধ হইয়াছিল, গত কয়েক দিন যাবৎ উহা আবার সুরু হইয়াছে এবং একমাত্র বনগাঁতে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ১৩০০০ লোক আসিয়াছে। ইহা পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের সহিত ভাল ব্যবহারের নিদর্শন নহে। সে যাহা হউক, তাহার আলোচনা এখানে করা উদ্দেশ্য নহে। সময় মত ও প্রয়োজন মত তাহা করা যাইবে। বর্ত্তমানে শান্তি স্থাপনাই মুখ্য সমস্যা।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ওদিকে পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদেরও বাজেট অধিবেশন সুরু হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের পরিষদ-গৃহে হিন্দু সদস্যেরা বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানের অত্যাচারের আন্তর্জ্জাতিক তদন্ত দাবি করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং তাঁহারা বিধিসম্মত ভাবে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য পরিষদ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসেন। এই অপরাধে তাঁহাদিগকে "রাষ্ট্রদ্রোহী" বলিয়া পাকিস্থানী সংবাদপত্রে প্রচার করা হইতেছে। গবর্ন্মেণ্টের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে তাঁহারা কোনরূপ অসংযত বাক্য বা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন একথা পাকিস্থানী পত্রিকাগুলি বলেন নাই। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলিম দল গবর্ন্মেণ্টের পরিচালকদের অতি কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। মৌলবী আবুল হাসিম বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ন্মেণ্ট অতি সামান্য লাভের আশাতেই নিজেদের কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের পায়ে সঁপিয়া দিয়াছেন এবং "বানর-বৃত্তি" অবলম্বন করিয়াছেন। হাসিম সাহেব অতীতে ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী। এখন পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধী দলের নেতা। তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে গালাগালি, গবর্ন্মেণ্টকে হেয় করিবার দুরভিসন্ধি এবং রাষ্ট্রের শত্রুদের প্রতি প্রশংসা ও উৎসাহ বাক্যই সর্ব্বপ্রধান। কম্যুনিষ্টদের দরদে তিনি চোখের জলের বান ডাকাইয়াছেন। কলিকাতায় কম্যুনিষ্ট সাবোটাশ চেষ্টার পিছনে পাকিস্থানীরা আছে একথা আগেও আমরা লিখিয়াছি। যাঁহারা উহা বিশ্বাস করেন নাই, পরিষদে হাসিম সাহেবের

বক্তৃতায় তাঁহাদের চোখ খোলা উচিত। প্রদেশের ভিতরে রাষ্ট্রের শত্রু কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের অর্থ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা; প্রদেশে এবং কেন্দ্রে বিরোধ বিদ্যমান এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিবার চেষ্টাও ঐপ্রকার অভিসন্ধি-প্রসূত। মৌলবী হাসিম, মৌলবী জসিমুদ্দিন, মৌলবী রফিক প্রভৃতি অতীতে পাকিস্থানী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম সারির নেতা ছিলেন, এখনও পরিষদ গৃহের মধ্যেই তাঁহারা যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পাকিস্থানেরই সহায়ক, ভারত-রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি মমতার নিদর্শন নহে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিম সাহেবের বক্তৃতার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম দল বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক গোলযোগে গবর্মেণ্টকে যতটা সাহায্য করিতে পারিতেন তাহা তাঁহারা সকলে করেন নাই। বর্ত্তমান গোলযোগের গোড়া পাকিস্থান, পাকিস্থানী নেতাদের অসংযত কথা ও ভারতবিরোধী কাজ ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইঁহারা সদলবলে ঢাকায় গিয়া পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্টকে চাপ দিয়া বলিতে পারিতেন যে পশ্চিম পাকিস্থানে হিন্দু নাই, এক কোটি যাহা আছে তা পূর্ব্ববঙ্গেই; ভারতে রহিয়াছে প্রায় চার কোটি মুসলমান; এখন যদি এই হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয় তবে ভারতে তার প্রতিক্রিয়া পড়িবে, চার কোটি মুসলমান বিপন্ন হইবে। পাকিস্থান আনিবার জন্য ইঁহারাও রক্ত দিয়াছেন ও লড়িয়াছেন, খাজা নাজিমুদ্দীন বা মৌলবী নুরুল আমীনের পাকিস্থান শাসক হওয়ার মূলে তাঁহাদের হাত রহিয়াছে, সুতরাং এই দাবি করিবার অধিকার তাঁহাদের রহিয়াছে। কলিকাতায় রাজাবাজার বা সাহেব বাগানে দুইটা সভা করিয়া প্রস্তাব পাশ করিলে বা গা বাঁচাইয়া বিবৃতি দিলে কোন কাজ হইবে না। ভারতরাষ্ট্রে মুসলমানেরা যে সমস্ত সুযোগসুবিধা, নাগরিক অধিকার এবং রাজকার্য্যে উচ্চ ক্ষমতা ভোগ করিতেছেন তাহার অনুরূপ ত দূরের কথা পাকিস্থানের হিন্দুদের তার লক্ষাংশের একাংশ অধিকারও নাই; উহা তাঁহাদিগকে না দিলে ভারতের মুসলমানের মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না,—এই কথা ইঁহারা অনায়াসে ঢাকায় গিয়া জোর গলায় বলিতে পারেন। তাহা না করিয়া ইঁহারাও পাকিস্থানীদের কূটনীতিতে গা ভাসাইয়া ভারতের প্রতিক্রিয়া পাকিস্থানে হইতেছে বলিয়া মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করিলে তার বিষময় পরিণাম ইঁহাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। চার কোটি বনাম এক কোটি অথবা পঁয়ত্রিশ কোটি বনাম সাত কোটিতে জয় পরাজয় বুঝিতে খুব কষ্ট করিবার দরকার নাই। হিন্দু মুসলিম মিলন না হইলে ভারত স্বাধীন হইবে না এই মিথ্যা যেমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভারত-পাকিস্থান বিরোধে উভয় রাষ্ট্র ধ্বংস হইবে এই ইঙ্গ-পাকিস্থানী মিথ্যাও ধূলিসাৎ হইতে বিলম্ব হইবে না।

মৌলবী আবুল হাসিম প্রমুখ মুসলিম নেতৃবর্গ বলিতে পারেন যে ভারতে হিন্দু মুসলমানের সমান প্রজাস্বত্ব সুতরাং হিন্দু যদি রাষ্ট্রের বিরোধী কার্য্যক্রম চালাইতে পারে তবে তাঁহারাই বা কেন সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন? ইহার উত্তর তাঁহাদের বিগত কালের—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে লীগ অধিকার যুগের—ইতিহাস। ভারতরাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে বা সংস্কারের চেষ্টায় তাঁহারা সরকারের বিরোধিতা সমানে করিতে পারেন, ন্যায়সঙ্গত উপায়ে। কিন্তু ভারতরাষ্ট্রকে বিপন্ন করার অপচেষ্টায় বা ভারত-বিরোধী কোন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কোন চেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্য্যায়ে পড়িতে বাধ্য। ভারতের চালকবর্গের সততা ও সদিচ্ছার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছিদ্রান্বেষী শত্রুর চরের কাজ করার অধিকার কাহারও নাই, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, যে যাহাই হউক। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কে সত্যই ভারতরাষ্ট্রের সন্তান এবং কে প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী ইহা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

ইংরেজের চক্ষে "পাকিস্থান"

১৪ই মাঘের 'আজাদ' (ঢাকা) পত্রিকায় লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারেল মার্টিনের ও লণ্ডন 'টাইমস্' পত্রিকার প্রবন্ধ দুইটির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটি গত ২৫শে পৌষ (৯ই জানুয়ারি) তারিখে লণ্ডন 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয়টি 'টাইমসে'র দিল্লীর বিশেষ সংবাদ-দাতা কর্ত্তৃক লিখিত; লণ্ডন হইতে ১৩ই মাঘ তারিখে ইহা নানা দেশে রয়টার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের কোন সংবাদপত্রে দুইটির একটিরও উল্লেখ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ, ভারতরাষ্ট্রের রাজনীতিকেরা ও সাংবাদিকেরা শত্রুপক্ষের মতি-গতির প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। এক চক্ষু হরিণের উপাখ্যানটির কথা তাঁহাদের মনে রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।

'আজাদ' পত্রিকা দুইটি প্রবন্ধকে ফলাও করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। লেখক ১৫ বৎসর পরে পশ্চিম পাকিস্থানে ভ্রমণ করিয়া আকারে-ইঙ্গিতে নানা ভাবে ভারতরাষ্ট্রের কুৎসা প্রচার করিয়াছেন। মহিলা জাগরণের প্রশংসা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন:—

'প্রয়োজনীয়তাই প্রধান যুক্তিদাতা। পঞ্জাবে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিধন, ৬০ হাজার মুসলমান অপহরণ, ৭০ লক্ষ মুসলমান শরণার্থীর দুরবস্থা ও কাশ্মীরে ১ লক্ষ মুসলমানের নিধনের ফলে এই কঠিন সত্যই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এর দরুনই মুসলমান মেয়েরা পর্দ্দার অন্তরালে না থাকিয়া প্রকাশ্যে কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে।'

রেলপথে চলাচল 'গতানুগতিক' ভাবে চলিতেছে। দেশ বিভাগের পর 'রেলগাড়ীর ভাগ বাঁটোয়ারাও পাকিস্থানের পক্ষে লাভজনক হয় নাই।' বিমানযোগে বড় বড় শহরে যাতায়াত করা যায়; 'অন্যত্র সম্প্রতি বিমান ও যাত্রীর অভাবে কতকগুলি পথে বিমান চালনা বন্ধ হইয়াছে'; তা ছাড়া, লেখকের সফরের পরে, 'ভারত হইতে কয়লা প্রেরণ বন্ধ হওয়ায় রেল চলাচল খুব সম্ভবতঃ কমাইয়া দিতে হইবে।'

'পাকিস্থানে'র সামরিক বাহিনীর বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন:—'পাকিস্থানী সৈন্যদলের প্রধান গুণ তাহাদের উদ্দীপনা ও বীর্য্য ভাব; তাদের এই গুণের জন্যই নানা বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও পাকিস্থানী সৈন্যদল এত সুসংহত।' তাহাদের প্রধান অসুবিধা 'ভারী যুদ্ধ সরঞ্জাম ও কারিগরের অভাব।' 'এখনও এক হাজারের অধিক ব্রিটিশ অফিসার নিয়োজিত আছে, পাকিস্থান সামরিক বাহিনীর নানা শাখায় অভিজ্ঞ পাকিস্থানী সামরিক অফিসারের নিদারুণ অভাবের জন্যই এখনও এত অধিক ব্রিটিশ অফিসার রহিয়াছেন।' 'বিমানবাহিনী ছোট হইলেও বেশ কার্য্যকরী।'

সামরিক বাহিনীর 'কথ্য ভাষা' সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন, —'আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এত বেশী সামরিক শিক্ষার্থী পাঠান হইতেছে বলিয়া' মনে হয় যে, ইংরেজী ভাষার ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর নাই।

রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার, কোয়েটা ও কোহাট পাকিস্থানের প্রধান সৈন্য-শিবির। পূর্ব্বেও ইহাদের লেখকের দেখা ছিল, 'কিন্তু এইবার দেখিতে যাইয়া আমার মনে কেমন ভয় হইতে লাগিল, যদিও এই ভয় সম্পূর্ণ অহেতুক।' 'কোয়েটা ষ্টাফ কলেজে প্রত্যেক বৎসর ব্রিটিশ অষ্ট্রেলিয়ান ছাত্রগণ যোগদান করিয়া থাকে। এই বৎসর একজন মার্কিন ছাত্রও আসিবে।'

লেখক উক্ত কলেজে শিক্ষক ছিলেন; সুতরাং তুলনামূলক দৃষ্টিতে সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এখানকার অবস্থা 'মোটামুটি সুশৃঙ্খল' বলিয়াই মনে করেন।

'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে লেখক ভারতরাষ্ট্রের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন; প্রবন্ধের শিরোনামা "ভারতীয় দিগন্তের প্রধান সমস্যা—ভারত-পাকিস্থান সম্পর্ক।" ভারতরাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লী নগরীতে থাকিয়া এই সংবাদদাতা অনেক গোপন কথার সন্ধান লন ও পাইয়াও থাকেন। তাহার বিশ্লেষণ করিয়া লেখক বলিতেছেন: "ভারত-'পাকিস্থান' আজ 'ফরাসী-জার্ম্মান' সম্পর্কের পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে", ইহার ভবিষ্যৎ "বিশেষ সঙ্কট সম্ভাবনাপূর্ণ।" এই কথার অর্থ আমাদের পাঠকবর্গকে মনে করাইয়া দিতে চাই যে এই তিক্ত সম্পর্কের ফলে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটি বিশ্ব-যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; ইউরোপের এত জ্ঞান-বিজ্ঞান শান্তি রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং আমাদের মত রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা ঘটিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আশ্চর্য্য হই ইংরেজের সতীপনার ভান লক্ষ্য করিয়া।

কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে লেখক "ভালমন্দ যতই থাকুক না কেন" তাহা বিচার করিতে চান না; তবে তিনি এই কথা বুঝিয়াছেন যে "ভারত কোনরূপ আপোষ-মীমাংসায় রাজী হইবে না।" তাঁহার প্রবন্ধের চুম্বক প্রকাশ করিতে গিয়া "আজাদ" পত্রিকা একটু রং ফলাইয়াছে; দুই রাষ্ট্রের বিবাদের মূলে দেখিয়াছে "ভারতের স্বেচ্ছাকৃত কলহ" এবং "তজ্জনিত অর্থনীতিক কুফল এবং পক্ষান্তরে ভারতের আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতিজনিত দুরবস্থা ও সরকারী অর্থনীতির উপর জনগণের আস্থার অভাব।" মুদ্রাস্ফীতিজনিত নানা অবস্থায় পাকিস্থান ভাল আছে জানিতে পারিলে আমরা অসুখী হইব না, তাহা হইলে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে ৫ লক্ষ পূর্ব্ববঙ্গবাসী মুসলমানকে "কাফেরে"র রাষ্ট্রে আসিয়া জীবিকা অর্জ্জনের পথ খুঁজিতে হইবে না। মুদ্রাস্ফীতিতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইতেছে না নিশ্চয়ই। এই কথা ভাবিতেও সুখ; বাঙালীর একটা অঙ্গ ত অভাবের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; আসামেও যাইতে হইতেছে না, "পবিত্রস্থানে" সকলেই ভাল আছে।

"টাইমস্" পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার দিল্লীর সংবাদদাতার প্রবন্ধে আরও শুভানুধ্যায়ী অনেক কথা ছিল; রয়টার প্রেরিত চুম্বকে তাহা বুঝা যায় না। কাশ্মীর সমস্যাই তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছে দেখিতে পাই। যখন নিজেই এই সমস্যাটা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে আনিয়াছে, তখন সেই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের—"নিরাপত্তা পরিষদে"র (Security Council) "রায় মানিয়া লইতে ভারত নৈতিকতঃ বাধ্য।" প্রবন্ধে একটু ভয় দেখানোও হইয়াছে।

"যদি এই লইয়া নিরাপত্তা পরিষদকে কর্ম্মপন্থাগত জটিলতার মধ্যে টানিয়া লওয়া হয়, তবে ভবিষ্যৎ সত্যই অন্ধকার। তাহা হইলে দুই দেশের মধ্যে 'স্নায়ুযুদ্ধ' চলিতেই থাকিবে, এবং পার্শ্ববর্ত্তী সিংকিয়াং প্রদেশে কম্যুনিষ্ট চীনের শক্তি যত বৃদ্ধি পাইবে, বিপদ ততই ঘনাইয়া আসিবে।"

উভয় দেশের উন্নতির নানা পরিকল্পনা ব্যাহত হইবে; "বিদেশী পুঁজিপতিরাও বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে পুঁজি নিয়োগ করিতে রাজী হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।" এই ভয় দেখানোর মধ্যে সৎ-অসৎ উদ্দেশ্যের স্বাভাবিক মিলন দেখিতে পাই। ভারতরাষ্ট্রের কম্যুনিজমের ভয় আছে হয়ত। কিন্তু "পাকিস্থানে"র ত সে ভয় নাই। ফিরোজ খাঁ নুন ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রদেশ হইয়া থাকিতে রাজী যদি ভারত এত বেয়াড়া হইয়া উঠে। সুতরাং ইংরেজের পক্ষে "পাকিস্থানকে" বুঝাইয়া-পড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয় না?

বিহারে ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান

প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে পুরুলিয়ার প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বঙ্গভাষার বিরুদ্ধে সরকারী অভিযানের প্রতিবাদস্বরূপ একটি বিবৃতি প্রচার করেন। তিনি তদুপলক্ষে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, উচ্চতম কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে ও নির্দ্দেশে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ভরসা ছিল যে, তাঁহারা এই অত্যাচারের প্রতিকার করিতে তৎপর হইবেন। কিন্তু ছয় মাসেও তাহা হয় নাই। স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজনে তাঁহারা এত ব্যস্ত আছেন যে, এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। একজন বিহারী প্রধান এই নূতন রাষ্ট্রের পালক ও ধারক মনোনীত হইয়াছেন; তদুপলক্ষে উৎসাহ আনন্দের বেগ শরীর মনের স্বাভাবিক বিশ্রামের প্রয়োজনে শ্লথ হইয়াছে। সুতরাং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই দিকে একটু দৃষ্টি দিতে পারিবেন, এরূপ আশা মনে পোষণ করিলে অন্যায় হইবে না।

সেইজন্য, সেই আশায় মানভূম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একখানি পত্রের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল ১৫ই মাঘ তারিখে, স্বাধীন গণতন্ত্র ঘোষণার তিন দিন পরে। কলিকাতার "যুগান্তর" পত্রিকার ১৮ই মাঘ সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হয়। পত্রে উল্লিখিত অত্যাচার বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অবগতির জন্য আমরা এখানে তুলিয়া দিলাম। তিনি বঙ্গভাষা জানেন; বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতায় পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন। সেই সময়ে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির রক্ষার জন্য বাঙালী যে সংগ্রাম করিয়াছিল তিনি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। আজ মানভূম, ধলভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চলে এই ভাষার উপর যে অত্যাচার চলিতেছে এবং তার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভারতীয় গণতন্ত্রে চলিতে দিলে তার রাষ্ট্রপালের কপালে কলঙ্কের টিকা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বাঙালীরও তাহাতে লজ্জার কারণ আছে। এই কথা ভাবিয়াই আমরা মৃগেন্দ্র বাবুর পত্রাংশ তুলিয়া দিলাম। যথেষ্ট সময় নষ্ট হইয়াছে। লোকেরও ধৈর্য্যের সীমা আছে। সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া কোন রাষ্ট্র সম্মানের সহিত টিকিয়া থাকিতে পারে না।—

"মানভূম জেলা বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের সময় বিহার জন-নিরাপত্তা আইনের জন্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট উদ্যোক্তাদিগের পক্ষ হইতে অনুমতির জন্য আবেদন করা হয়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে অযথা বিলম্ব করায় পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হয়। কর্ত্তৃপক্ষ নিছক সাহিত্য-সম্মেলন ও শাখা অধিবেশনরূপে মহিলা, সঙ্গীত প্রভৃতি সম্মেলনে বাধা দিলেন না বটে, কিন্তু তদানীন্তন অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদককে পুলিসের মারফত নানাভাবে হয়রানি ও জব্দ করিবার চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের এই সকল কার্য্যের প্রতি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক ও নিখিল-ভারত কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া যায় না। অধিকন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদককে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষের সদস্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলে। সম্পূর্ণ এক মিথ্যা খবরের উপর ভিত্তি করিয়া এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার ও অন্যান্য বহু শান্তিপ্রিয় বিশিষ্ট বাঙালীর গৃহে "বোমা ও বারুদে"র সন্ধানের অজুহাতে ব্যাপকভাবে তল্লাস করিয়া হয়রানি ও জব্দ করার চেষ্টা করা হয়। ইহা ব্যতীত অনেককে নানা মিথ্যা মামলায় জড়িত করিয়া জব্দ করিবার কৌশল প্রয়োগের ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তব ক্ষেত্রে দিন দিন প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে।

"জেলাবাসী যাহাতে তাহাদের প্রকৃত স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে না পারে এই কারণে বিহার জন-নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ করিয়া একাদশ বার্ষিক অধিবেশন বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদিগকে সম্মেলনের প্রায় তিন দিন পূর্ব্বে এক ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থীমূলক সর্ত্তাদি আরোপ করিয়া অনুমতি দেওয়া হয়। ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া সম্মেলন স্থগিত রাখা হয়।

"সম্প্রতি সঙ্গীত, মহিলা, কৃষ্টি প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের শাখা সম্মেলন বর্ত্তমান বৎসরে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের অনুমতি চাহিয়া জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় প্রায় তিন সপ্তাহের অধিককাল গত হইয়া গেল এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে কোন লিখিত জবাব পাওয়া যায় নাই। এইরূপ বিলম্বের জন্য জেলা যথা দেশবাসীর মনে নানারূপ বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হইতেছে। অনেকে নানারূপ আশঙ্কা করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ অনুমতি দিতে অযথা বিলম্ব করার জন্য সম্মেলনের কার্য্যে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।"

পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি বৃদ্ধি

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলীর অনুমোদনে তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টায় চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিবৃতির হিসাব সম্বন্ধে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার উত্তরে গত ৯ই পৌষ তারিখে একটি নূতন বিবৃতি দিয়া তাহা অবসান করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সেই চেষ্টা সফল হইবে কিনা জানি না। তবে তথ্যগুলি জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

১৯৪৮-৪৯ সালে পাট, আউস ধান ও আমন ধানের উৎপাদনে যথাক্রমে ৯·৪৫ লক্ষ বিঘা, প্রায় ৩৭ লক্ষ বিঘা ও প্রায় ২ কোটি ২৪ লক্ষ বিঘা জমির ব্যবহার হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে তাহার হিসাব এইরূপ : পাট ৯·২১ লক্ষ বিঘা, আউস ধান প্রায় ৩৬ লক্ষ বিঘা এবং আমন ধান প্রায় ২ কোটি ৪১ লক্ষ বিঘা। এই হিসাবে দেখা যায় যে, পাটের জমি বৃদ্ধি পাইয়াছে, আউস জমি কমিয়াছে, আমন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আউস ও আমন ধানের উৎপন্ন বাড়িয়াছে ৮৯৩৫৫ লক্ষ মণ হইতে ১০০১·৭৪ মণ। এই বৃদ্ধির চেষ্টায় গবর্মেণ্টেরও অংশ আছে। দীঘিপুকুর সংস্কার ও ছোট ছোট নদী-নালা পুনরুদ্ধারের ফলে প্রায় ২ লক্ষ ৬২ হাজার বিঘা জমি চাষে আসিয়াছে, ট্রাক্টরের সাহায্যে সরকারী জমি আবাদযোগ্য করা হইয়াছে প্রায় ৫ হাজার বিঘা এবং সরকারী ও বেসরকারী ট্রাক্টরের কল্যাণে প্রায় ১৫ হাজার বিঘা পতিত জমি চাষের যোগ্য করা হইয়াছে।

এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যভাণ্ডার কতটা ভরিয়াছে তাহা জানি না। যে "নাই নাই" ধ্বনি তুলিয়া দেশের গণমনকে বিক্ষিপ্ত করা হইতেছে, সেই ধ্বনি বন্ধ হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। খাদ্যাভাবকে বড় করা হইতেছে নানাবিধ প্রচারের মাধ্যমে। তবুও বলিব আরও জমি বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। "সত্যাগ্রহ পত্রিকা"র ১৯শে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মেদিনীপুর জেলায় এরূপ জমির সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

"কেলেঘাই নদীর উভয় পার্শ্বে খুব কমে ৬ হাজার একর বা ১৮ হাজার বিঘা আবাদযোগ্য পতিত জমি পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত জায়গা প্রায়ই লাগাও এবং বর্ত্তমানে বেনা ঘাসের দ্বারা আক্রান্ত। এই সকল বেনা প্রায়ই ৪ হইতে ৭ ফুট উঁচু এবং ট্রাক্টর ব্যবহারের দ্বারা এইগুলির উচ্ছেদ হইতে পারে। মাটি এঁটেল ও সরস। আগে এই সকল জায়গায় প্রচুর আমন ধান হইত। কিন্তু কেলেঘাই ও বাঘুইর বন্যার জন্য এই সমস্ত জায়গা পতিত হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় কৃষকেরা এই সকল জমিকে ট্রাক্টরের দ্বারা সংস্কার করিয়া চাষের উপযোগী করিয়া দেওয়ার জন্য বিশেষরূপে জিদ করিতেছেন।

অধিকতর খাদ্য উৎপাদন করিতে হইলে কোলন্দা এবং নৈপুরে একটি হিসাবে দুইটি ট্রাক্টর কেন্দ্র খুলিতে হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রে দুইটি ট্রাক্টর থাকিবে।

স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত এই যে, কোদাল দ্বারা এক বিঘা জমির বেনা ফেলিয়া দিতে হইলে ৪০ টাকার কম খরচ পড়িবে না, কিন্তু ট্রাক্টরের দ্বারা ঐ কাজ করিলে বিঘা প্রতি ১৫ টাকার বেশী পড়িবে না।

এদিকে দেখিতে পাই যে, হুগলী জেলায়ও অনুরূপ চেষ্টার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। 'নির্ণয়' পত্রিকার ১৬ই পৌষের সংখ্যায় তাহার একটি বিবরণ দেখিলাম। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া হইল :

"দাদপুর ইউনিয়নের এই কাঁটুল-অনন্তপুর বাঁধটি প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় চাষী ও জমিদারের চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। বাঁধটি কাণা নদীর (কাঁটুল) উপর অবস্থিত। নদীসংলগ্ন বাঁধের উপর চাষীরা ও স্থানীয় জমিদার একটি 'কপাটিয়া কল' তৈয়ার করিয়াছিলেন।

"বর্ত্তমানে ঐ বাঁধটি ভগ্নপ্রায়। তাহা ছাড়া কপাটিয়া কলটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ফলে বহু হাজার একর জমির ফসল উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। স্থানীয় চাষীরা প্রায় ২,০০০ টাকা খরচ করিয়া ঐ কপাটিয়া কলের তিন-চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ করিয়াছে। এক্ষণে ঐ বাঁধ ও অসম্পূর্ণ কপাটিয়া কলটির সংস্কার করিতে হইবে। এইজন্য আনুমানিক ৩,৮০০ টাকার প্রয়োজন। স্থানীয় চাষীরা ৮০০ টাকা ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছে।

"এই বাঁধটি সংস্কৃত হইলে বহু একর আবাদী ও ১৮০ বিঘা পতিত জমিতে জল সরবরাহের সাহায্য হইবে। ফলে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মণ ধান্য ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হইবে। অথচ বর্ত্তমানে তথায় মাত্র ১২ হাজার মণ ধান্য ও ফসল পাওয়া যাইতেছে।

"কাঁটুল হইতে পুইনান পর্য্যন্ত যে জলসেচনের খালটি ছিল, তাহা সম্পূর্ণ মজিয়া গিয়াছে। উক্ত খালটি সংস্কার করিলে প্রায় ৯ হাজার বিঘা আবাদী ও ৯০ বিঘা পতিত জমিতে অধিক খাদ্য-শস্যোৎপাদনে সাহায্য করিবে।

"দাদপুর ইউনিয়নেরই অনন্তপুর হইতে শ্রীরামপুর, কৃষ্ণপুর ও কাঁটাগোড় হইয়া সোমসাড়া পর্য্যন্ত যে জলসেচনের খালটি রহিয়াছে তাহা সংস্কার করিলে প্রায় ৬ হাজার বিঘা আবাদী ও ৪৫ বিঘা পতিত জমিতে অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে।"

"সেকেন্দারপুর হইতে খরসাট, রসুলপুর ও মহেশ্বরপুর হইয়া তামিলা পর্য্যন্ত জলসেচনের খালটির সংস্কারের জন্য প্রায় ৩৫৬০ টাকা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় প্রায় ৯ হাজার বিঘা আবাদী ও ৪৫ বিঘা পতিত জমির সুব্যবস্থা হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায়ও অনুরূপ চেষ্টা দেখিতে পাই। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সরকারী বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। "স্বেচ্ছাশ্রমে"র দ্বারা এই বিরাট পরিকল্পনা সফল করিবার চেষ্টা হইতেছে। মুরশিদাবাদ "গণ-রাজ" পত্রিকার ১লা মাঘের সংখ্যায় তাহার একটা পরিচয় পাওয়া যায় :

"(ক) আন্দুয়া পরাণচণ্ডীপুর খাল খনন। ফরাক্কা থানা।

"এই খালটি মজিয়া যাওয়াতে ষোলশো বিঘা জমিতে ফসল পাওয়া যাইত না, কারণ একটু জোর বর্ষা হইলেই জল

নিকাশের অভাবে ধান নষ্ট হইয়া যাইত এবং রবিশস্যও লাগান যাইত না। সেইজন্য ঐ অঞ্চলের উনিশখানি গ্রামের সকল কর্ম্মক্ষম লোক মিলিয়া মোট ষোলশো ষাট জন লোক খাটিয়া এই দেড় মাইল দৈর্ঘ্যের খালটি মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন।

"(খ) নয়ানপুর, বগলাউরী ও পাতি বিল।

"ফরাক্কা থানায় এই তিনটি বিলের জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গঙ্গায় গিয়া পড়ে এমন একটি খালের সঙ্গে এই বিলগুলিকে কাটিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জলার জন্য এখানে তেইশ শত বিঘা জমি অনাবাদী পড়িয়াছিল। নয়টি গ্রামের ষোলশত লোক মিলিয়া নিজেদের চেষ্টায় প্রায় দেড় মাইল করিয়া লম্বা, বারো ফুট চওড়া আর গড়ে আড়াই ফুট গভীর কয়েকটি খাল কাটিয়া এই অনাবাদী জমিকে ফসল বাড়াইবার কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"(গ) চোকপাড়া ওসমানপুর খাল।

"পাল্লা জলের মুখ হইতে আধ মাইল দূরে সুখা বিল। সুখা বিলের জল এই বিল অপেক্ষা নীচু এবং এই বিলের জল ভাগীরথীতে গিয়া পড়ে। পাল্লা জল মাঠের জল নিকাশের জন্য, তাহা সুখা বিলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ওসমানপুর ও সন্নিহিত ৫খানি গ্রামের অধিবাসিগণ মিলিয়া গত অক্টোবর মাসের প্রথমে এই খাল খনন করে। ইহা ছাড়া ১১টি পয়ঃপ্রণালী খনন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। সমগ্র পয়ঃপ্রণালীর দৈর্ঘ্য আনুমানিক ১১ মাইল হইবে এবং ইহাতে মোট ১২৩২০ বিঘা জমি প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইবে। খরচের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে ৩৬৩৫০৲ টাকার প্রয়োজন, কিন্তু প্রধানতঃ স্বেচ্ছাশ্রমের দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হইবে।

"গো-মহিষের অত্যাচারে অনেক স্থানে রবিশস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। শস্য-সংরক্ষণকল্পে প্রতি গ্রামে স্বেচ্ছসেবক কর্ম্মীদল গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা নূতন আবাদী ফসল রক্ষা করিবার জন্য তৎপর রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে ২৫০০ বিঘা অনাবাদী জমিতে রবিশস্য জন্মানো সম্ভব হইয়াছে। বিস্তীর্ণ অনাবাদী ভূখণ্ড আবাদযোগ্য করিবার জন্য সমিতি কলের লাঙ্গলের সাহায্য লইবেন স্থির করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা লইয়া প্রাথমিক অনুসন্ধান চলিতেছে। সুতী থানায় হিলোরা ইউনিয়নভুক্ত বংশবাটি এবং নাজিরপুর মৌজা মধ্যে প্রায় ৪,৭০০ বিঘা অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করিবার প্রচেষ্টা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। অধিক খাদ্য উৎপাদন কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য প্রতি থানাতে ধান্যের শ্রেষ্ঠ উৎপাদনকারীকে ১০০৲ টাকা করিয়া একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।"

এরূপ স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে বিস্তৃত হউক। এই সম্পর্কে মেদিনীপুর উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য। তাহারা সঙ্কল্প করিয়াছিল যে বাৎসরিক পরীক্ষার পর তাহারা ধান্যের ফসল গৃহজাত করিবার কার্য্যে সহযোগিতা করিবে। সেই সঙ্কল্পানুযায়ী তাহারা গত ২৬শে অগ্রহায়ণের প্রাতঃকাল হইতে দলে দলে ফসল কাটার গান গাহিতে গাহিতে সারিবদ্ধ হইয়া কাস্তে হাতে ধানের ক্ষেতে গিয়া বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ধান কাটিয়াছে। উহাদের সহিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও যোগ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৬০ বৎসর বয়স্ক সংস্কৃতের পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ছিলেন।

ছাত্রদের শ্রমের মূল্যস্বরূপ ১৭৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকজন ছাত্রের বেতন শোধের জন্য ৮৫৲ টাকা লাগিয়াছে। বাকী টাকা দিয়া ছাত্রদের ইউনিফরম তৈয়ারী হইতেছে।

বাঙালী তরুণের নিকট দেশ-মাতৃকা এই সেবার জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি

গত মাসের "প্রবাসী" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা বলিয়াছিলাম যে, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সরবরাহ বিভাগের পক্ষ হইতে ও পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির সম্পাদক প্রমুখ কয়েকজন কৃষিবিদ্ ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের পক্ষ হইতে যে দুইটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কৃষির ব্যয় সম্বন্ধে কোন উল্লেখ বা হিসাব দেখিতে পাইলাম না। তাহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র মিত্র একটি হিসাব পাঠাইয়াছেন। এই ধান্যের মূল্যবৃদ্ধির আন্দোলনের সময় এইরূপ হিসাবের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। একটা কথা লক্ষ্য করা উচিত যে, এক জেলায়ই ক্ষেত্রভেদে ও অবস্থাভেদে কৃষির ব্যয়ের তারতম্য দেখা যায়; তাহা দুই-এক টাকার নয়। আমরা এই গুরুত্বের জন্য হিসাবটি প্রকাশ করিতেছি। সরকারী দপ্তর হইতে আমরা এইরূপ হিসাব পাই নাই বা প্রত্যাশা করি না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির মত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য প্রার্থনীয়।

হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানা :

বীজক্ষেত্র প্রস্তুত : এক বিঘা

(১) ছয়টা লাঙ্গল—(১৸০ হিসাবে)	১০৷৷০
(১) বীজ ধান ২ মণ	২৪৲
(৩) ৮০ ঝোড়া গোবর-প্রয়োগের খরচ	৪৲
(৪) আনুষঙ্গিক ব্যয়	৩৷৷০
	৪২৲

এক বিঘা বীজক্ষেত্রের চারা ১৪।১৫ বিঘায় রোপণ করা

যায়; সুতরাং এক বিঘার জন্য চারা উৎপাদনের ব্যয় তিন টাকা।

আমন জমি : এক বিঘা

(১) তিনখানা লাঙ্গল (৩৷০ টাকা হিসাবে)	১০৷০
(২) রোয়া ৪ জন (প্রতিজন ২৲ হিসাবে)	৮৲
(৩) নিড়ান ২ জন (,, ,, ১৸০ ,,)	৩৷০
(৪) আইল বাঁধা	২৲
(৫) ধান কাটা চার জন (২৲ হিসাবে)	৮৲
(৬) বহন ও গাদা দেওয়া, আড়াই জন	৭৷০
(৭) ঝাড়া তিন জন (১৸০ হিসাবে)	৫।০
(৮) চারার খরচ	৩৲
(৯) জমির খাজনা	৪৲
	৫১৸০

নদীয়ার সুবর্ণপুর (হরিণঘাটার নিকট) :

(১) লাঙ্গল চারখানি (৩/০ হিসাবে)	১২৷০
(২) চারার দাম	৪৲
(৩) চারা তুলিয়া ক্ষেতে লইয়া যাওয়া—দুই জন ১৷৶০ হিসাবে	৩৷০
(৪) রোপণ চার জন—১৷৶০ হিসাবে	৬৷০
(৫) ধান কাটা চার জন—১৷৶০ হিসাবে	৬৷০
(৬) ধান আঁটি বাঁধা একজন	১৷৶০
(৭) বহন	৪৲
(৮) মাড়াই দুই জন	৩৷০
(৯) ঝাড়ন, গাদা দেওয়া দুই জন	৩৷০
(১০) জলসেচন চার জন	৬৷০
(১১) নিড়ান দুই জন	৩৷০
	৫৪৷৶০

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অঞ্চল :

(১) সার	৯৲
(২) বীজ	২৷০
(৩) লাঙ্গল	৯৲
(৪) আলি বন্ধন	২৷০
(৫) রোপণ	৬৷০
(৬) নিড়ান	২৲
(৭) ছেদন	২৷০
(৮) আঁটিবন্ধন ও বহন	৩৲
(৯) ঝাড়ন, মাড়ন	২৷০
	৩৯৷০

চব্বিশ পরগণা রাজবল্লভপুর অঞ্চলের হিসাব	৫৫৲
চব্বিশ পরগণা ভাঙড় থানায়	৩৭৲

ভারতে পাট উৎপাদন

কেন্দ্রীয় পাট কমিটির ষাণ্মাসিক অধিবেশনে সভাপতি সর্দ্দার দাতার সিং ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে ৫০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপাদিত হইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে; ...১০ লক্ষ গাঁইট মেস্তা ও অন্যান্য প্রকার তন্তুও উৎপাদন করা হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই চারিটি পাট-প্রধান প্রদেশ ছাড়াও ত্রিপুরা, কুচবিহার, উত্তর প্রদেশ ও ত্রিবাঙ্কুরে পাট উৎপাদন করা হইতেছে। উত্তর প্রদেশে পাট চাষের পরিমাণ ১৫ হাজার বিঘা জমি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯ হাজার বিঘা এবং উড়িষ্যায় ৬৯ হাজার বিঘা জমি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,৫৩,০০০ বিঘা দাঁড়াইয়াছে। আগামী বৎসরে উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যায় যথাক্রমে অতিরিক্ত ১,২৯,০০০ ও ১,৫০,০০০ হাজার বিঘা জমিতে এবং আসামে ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট চাষ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে পরীক্ষামূলকভাবে পাট চাষ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। সেজন্য সেখানে ৬১ হাজার বিঘা জমিতে পাট চাষ করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গে ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার বিঘার অধিক পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা যাইতে পারে।

বীজের উৎকর্ষ সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের জন্য সরকারী তালিকাভুক্ত উৎপাদকদের দ্বারা এবং সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বীজ উৎপাদন করা হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে বিহারে প্রায় ১,২০০টি, আসামে ৫০০টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩০০টি এবং উড়িষ্যায় ২০০টি প্রদর্শনীক্ষেত্র আরম্ভ করা হইবে। বীজ সংগ্রহ ও ঘাটতি প্রদেশগুলিতে ও উপরাষ্ট্রসমূহে উহার বণ্টনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন এবং বীজ সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এদেশে উৎপন্ন পাটের পরিপূরক হিসাবে "মেস্তা" পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বর্ত্তমানে পাটকলে পাটের সহিত মেস্তা মিশ্রিত করিয়া সুফল পাওয়া যাইতেছে। আশা করা যায় যে, তিন লক্ষ বিঘা জমিতে মেস্তা চাষ বাড়ানো যাইতে পারে এবং উহাতে আগামী বৎসরে ৯ লক্ষ গাঁইট মেস্তা পাওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য উপায়ে আরও এক লক্ষ গাঁইট বিকল্প তন্তু পাওয়া যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের পাটের জমি সম্বন্ধে একটা নূতন ব্যবস্থার কথা শুনা যাইতেছে। এই প্রদেশের ৬ লক্ষ বিঘা জমি, পরে জানিলাম ১২ লক্ষ বিঘা, "আউস" ধান্যের চাষ হইতে লইয়া পাটের জমিতে রূপান্তরিত করা হইবে। এই জমি উপরোক্ত ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার বিঘার অন্তর্ভুক্ত কিনা তাহা জানাইয়া দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গে চালই প্রধান খাদ্যশস্য; এবং সরকারী হিসাবপত্রে ইহা ঘাটতি প্রদেশ। এই অবস্থায় ১২ লক্ষ বিঘা "আউস" ধান্যের জমিতে যে ৪০ লক্ষ মণ চাউল

পাওয়া যাইত, তাহা এই প্রদেশে উৎপাদিত না হইলে, আবার কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের দরজায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। শোনা যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট এই পরিমাণ চাউল প্রাপ্তি সম্বন্ধে একপ্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন; ৪০ লক্ষ মণ চাউল তাঁহারা দিবেন। অপর দিকে শুনি তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে তাঁহাদের দেয় খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক করিয়া দিয়াছেন; গত বৎসর দিয়াছিলেন প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ মণ; ১৯৫০ সালে দিবেন প্রায় ৬৭ লক্ষ মণ। ব্যাপারটা ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে।

মৌমাছির চাষ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি-পালন কিছুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বেসরকারী ভাবে বাংলার কোনও কোনও স্থানে—বিশেষ করিয়া খাদি-প্রতিষ্ঠানে মৌমাছির চাষ অনেক দিন হইতে চলিতেছে। ইহার পালন-পদ্ধতি ১৩৪৬ সালের ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে এক প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত যুক্তপ্রদেশ গবর্ন্মেণ্টের এক প্রেস নোটে জানা যায় যে, উক্ত গবর্ন্মেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে মৌমাছি-পালন শিক্ষাদানের জন্য বর্ত্তমানে শিক্ষার্থী আহ্বান করা হইয়াছে। ফেব্রুয়ারি মাস হইতে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ হইবে। শিক্ষাকাল চার মাস। যুক্ত-প্রদেশের অধিবাসী-শিক্ষার্থীর জন্য এই শিক্ষাকালের এক-কালীন ফি ২০৲ কুড়ি টাকা এবং বাহিরের শিক্ষার্থীর জন্য ৭৫৲ পচাত্তর টাকা। শিক্ষা অন্তে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে।

বাংলা-সরকারের কৃষি বিভাগ এই কাজ আরম্ভ করিতে পারেন যাহা অপর প্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট দীর্ঘ দিন হইতে করিয়া আসিতেছেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে কৃষি বিভাগের কয়েকটি পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র আছে। মৌমাছি-পালন শিক্ষাদানের জন্য এই স্থানগুলি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

বাংলা-সরকারের বনবিভাগ গত জুন মাসে সুন্দর বন হইতে কিছু মধু সংগ্রহ করিয়া উহা বিক্রয়ার্থ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে ধোঁয়া দিয়া, মৌমাছিকে তাড়াইয়া, পোড়াইয়া, চাক চট্কাইয়া প্রতিবছর ঐপ্রকার মধু বরাবরই সংগৃহীত হইয়া থাকে। ঐ মধু সহজ-প্রাপ্য। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষলব্ধ নয় বলিয়া ঐ মধু অল্প সময়ে বিকৃত হইয়া ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া যায়।

বাংলা-সরকার যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালনের শিক্ষাদান আরম্ভ করেন তবে একদিকে মৌমাছিগুলি অনর্থক অকাল মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া যায়, অপর দিকে একটি খাদ্যপদার্থ আধুনিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত হওয়া সহজসাধ্য হয়। আজ দিকে দিকে 'অধিক খাদ্য উৎপাদন কর'—এই অভিযান চলিয়াছে। মধু একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। উপযুক্ত উপায়ে উহা সংগ্রহ করার শিক্ষাদানের অভাবে এই সম্পদ নষ্ট হইতেছে। বাংলার কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি।

তালগুড় ও খেজুরগুড়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশে তালগুড়, খেজুরগুড়, নারিকেলগুড় এই তিনটি শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া শুনিয়াছি। আজ প্রায় আড়াই বৎসর হইতে এই কার্য্য চলিতেছে; তাহার কোন বিবরণ পাই নাই; "হরিজন" পত্রিকার মাধ্যমে তাহা দেখিলাম। এই কার্য্যের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ সংগঠক নিযুক্ত হইয়াছেন যেমন নিযুক্ত হইয়াছেন সর্ব্বভারতের জন্য শ্রীগজানন্দ নায়েক।

একটি হিসাবে দেখিয়াছি যে ভারতরাষ্ট্রে প্রায় ৫ কোটি তাল গাছ আছে; পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোটি গাছ। স্বচ্ছন্দ বনজাত এই দুইটি গাছ হইতে যে গুড়-চিনির উৎপাদন হইবে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টদ্রব্যের অভাব মিটাইবার জন্য উত্তর-প্রদেশ ও বিহারের চিনির কলের ও খান্দিশরী গুড়ের নিকট হাত পাতিতে হয় না, বিরাট দুইটি পল্লীশিল্পও গড়িয়া উঠে; লক্ষ লক্ষ লোকের বেকার সমস্যার সমাধান হয়। ১ কোটি মণ গুড় প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এতদিন তালগুড় শিল্প মাত্র তিনটি জেলায় চালু ছিল। শিউলী—তালগাছ ও খেজুর গাছ হইতে যারা রস বাহির করে—বৎসরে ২।৩ মাস এই শিল্পের সেবায় আত্মনিয়োগ করিত।

তালগুড়ের মরসুম আরম্ভ হয় মাঘ মাসে, আর শেষ হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। একজন ভাল কারিগর ১৫টি গাছের রস প্রত্যহ সংগ্রহ করিতে পারে। এই রসে এক মরসুমে ২২ মণ গুড় হয়। ইহাতে তার ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত নিট আয় হইতে পারে। তালরসে শতকরা ১৪ হইতে ১৬ ভাগ গুড় হয়।

খেজুর গুড়ের মরসুম সাধারণতঃ আশ্বিন মাসে সুরু হইয়া মাঘ মাসে শেষ হয়। দক্ষ একজন কারিগর ৬০টি খেজুর গাছে রস বাঁধিতে পারে। উহাতে মরসুমে ২০ মণ গুড় হয়। খরচ বাদে ইহাতে নিট আয় ২৫০৲ টাকা হইতে পারে। খেজুররস হইতে শতকরা ১০% হইতে ১২% ভাগ গুড় হয়।

সরকারের চেষ্টা সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহা তালগুড়, খেজুরগুড়, নারিকেলগুড়, এই তিন প্রকার গুড় শিল্পের উন্নয়ন ও তালমিশ্রি প্রস্তুত প্রণালীর উন্নততর বিধানের জন্য গবেষণা—চারিটি বিভাগে গঠিত। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই শিক্ষাদান ১২টি কেন্দ্রে আরম্ভ হইয়াছিল।

১২০ জন শিক্ষার্থী লইয়া এই ১২টি তালগুড় শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হইয়াছিল। শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। এই ১২০ জন গ্রামবাসীকে

তালগাছ হইতে রস নিষ্কাশন ও গুড় প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া ছাড়া ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার ১৫০ জন পুরাতন তালগুড় শিল্পীকে উন্নত প্রণালীতে গুড় প্রস্তুতির কৌশল দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১২টি শিক্ষাকেন্দ্রে মোট ৭২০টি তালগাছ শিক্ষাকার্য্যের জন্য লওয়া হইয়াছিল। শিক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে জনকয়েক একক এবং জনকয়েক সমবায় পদ্ধতিতে গুড় প্রস্তুত করিয়া পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই বৎসরে (১৯৪৯-৫০) পুনরায় ১২০ জন শিক্ষার্থী লইয়া ১২টি শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। শিক্ষার্থী বৃত্তি এবার মাসিক ৩০৲ টাকা; তাহা ছাড়া প্রত্যেকে যে গুড় তৈয়ারি করিবে তাহার শতকরা ৪৫ ভাগ সে নিজে পাইবে।

খেজুরগুড় তৈয়ারি শিক্ষণ কেন্দ্র ৬টি খোলা হইবে। প্রত্যেকটিতে ১০ জন শিক্ষার্থী লওয়া হইবে।

হস্তচালিত সেনট্রিফিউগ্যাল যন্ত্র সাহায্যে তালরসের 'রাব' (ঝোলা গুড়) হইতে তালচিনি ও তালমিশ্রি করিবার পদ্ধতি দুই জন অভিজ্ঞ শিক্ষক কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরিয়া পল্লীবাসীদের শিক্ষা দিতেছেন। রস হইতে সরাসরি চিনি তৈয়ারীর পদ্ধতিও শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে।

মাদ্রাজ প্রদেশে মুদবিদ্রিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় তালগুড় শিক্ষণ স্কুল (সেনট্রাল পামগুড় ট্রেনিং স্কুল)-এ ১০ জন শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পাঠান হইয়াছে। শিক্ষান্তে উহাদিগকে বিভাগীয় কাজে নিয়োগ করা যাইবে, আশা করা যায়।

এই বিবরণীতে এই ২১৩টি পল্লী শিল্পের প্রসারের পথে কোন বাধা আছে কিনা এবং তাহা কি, তৎসম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেখিলাম না। একটির প্রতি আমরা মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তালের ও খেজুরের রস জ্বাল দিবার জ্বালানী কাঠের অভাব সর্ব্বপ্রধান বলিয়া অনেকের মুখে শুনিয়াছি। বন-বাদাড় যেরূপ ভাবে উজাড় হইয়াছে তাহার ফলে ইহার অভাব পল্লী-অঞ্চলের গার্হস্থ্য-জীবন বিপন্ন করিয়াছে। রান্না করিবার জন্য পল্লীর গৃহলক্ষ্মীদের কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, গাছের শুকনা পাতা, ধানের তুষ, গোবর পুড়াইয়া স্বামী-পুত্র-শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে আহার্য্য দ্রব্য ধরিতে পারেন, তাহার লাঞ্ছনা অভিজ্ঞ লোকে জানে। শহর-অঞ্চলে কয়লা আসিয়া এই যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে; কিন্তু পল্লীগ্রামের এই নিদারুণ অভাবের কথা কেহ ভাবিতেছেন কিনা, তাহার কোন পরিচয় পাই নাই। স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থোপার্জ্জনের কোন ব্যবস্থাই পল্লী-অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিয়া করা হইতেছে না। অথচ গান্ধীজী গ্রাম-কেন্দ্রিক সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। আর, আমরা সকলেই তাঁহার আদর্শের উপাসক।

শাসনকার্য্যে ব্যয়বাহুল্য

শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী যখন ভারতরাষ্ট্রের গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি কমিটি নিয়োগ করেন রাষ্ট্রের শাসনকার্য্যে যে ব্যয়বাহুল্য দেখা দিয়াছে, তাহা কাটিয়া-ছাঁটিয়া নূতন ব্যবস্থা করিবার জন্য। এই কমিটির অনুসন্ধানের ফলে তাঁহাদের রিপোর্টে আমরা অনেক নূতন কথা শুনিতে পাই। গত ২৯শে অগ্রহায়ণ তাহা চুম্বকরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দের মাহিনা বিদঘুটেরূপে (fantastic) বাড়িয়াছে। এই অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য কমিটি বলিয়াছেন—খাদ্য-মন্ত্রীর নিজস্ব মুন্সী (private secretary) একজন রাজনৈতিক কর্ম্মী ছিলেন; ৮০০৲ টাকা বেতনে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়; ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহাকে আঞ্চলিক খাদ্য কমিশনাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়; বেতন তাঁহার ১,৮০০৲ টাকা। পশুবিদ্যার একজন অধ্যাপক ২৮০৲ টাকা বেতনে প্রথম নিযুক্ত হন; তাঁহার পরের পদলাভ হয়, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে ৬০০৲ টাকা বেতনে; পদের উপাধি পশু-শক্তির সদ্ব্যবহার বিষয়ে সহকারী পরামর্শদাতা (Assistant Cattle Utilization Adviser); ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসে ঐ বিভাগেই ডেপুটি পরামর্শদাতারূপে তাঁহার বেতন দেখা যায়—১,১৫০৲ টাকা। এর উপর মাগ্‌গী ভাতা, ভ্রমণের ব্যয়, বিশেষ ভাতা প্রভৃতি নানা ভাতা আছে। সেইজন্যই দেখিতে পাই পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীবৃন্দেরও বেতনের পরিমাণ ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার কিঞ্চিদধিক; নানাবিধ ভাতার পরিমাণ ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার কিঞ্চিদধিক। এইরূপ না হইলে নাকি পদমর্য্যাদা রক্ষা পায় না। অথ ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।

বাঁকুড়ায় পল্লীসংগঠন

এই জেলার কাপিষ্টা গ্রামে একটি পল্লীসংগঠনের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ঐ গ্রামেরই কর্ম্মী শ্রীঅনাদিনাথ গোস্বামী এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে গঠনকর্ম্মের পরিচয়লাভ করিয়া তিনি এই কর্ম্মে হাত দিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাই। এই কার্য্যে সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে সাধকোচিত মনোভাবের প্রয়োজন। ভারতের ৬ লক্ষ গ্রামের বুকে যে তামসিকতার পাষাণ প্রায় অনড় হইয়া বসিয়া আছে, তাহা সরাইতে হইবে। তাহাই হইবে সর্ব্ব-প্রথম কার্য্য।

অনাদিনাথ আরম্ভ করিয়াছেন একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া। বর্ত্তমানে শতাধিক ছাত্রী হইয়াছে। মনে হয় কষ্টেসৃষ্টে চলিতেছে; গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করিয়া এখনও সাড়া পাওয়া যায় নাই। তাহার পর ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রশ্ন। "সারথি" পত্রিকায় ২৪শে পৌষ সংখ্যায় এই বিষয়ে অনাদিনাথের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইবে :

"আমাদের গ্রামে প্রায় ২।৩ হাজারের (বরং বেশী) লোকের মধ্যে কেহই এ বৎসর ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা পায় নাই, সকলেই ২।৪ বার করিয়া জ্বর ভোগ করিতেছে। গ্রামে মাত্র একটি ডাক্তার, তাঁহাকেই প্রায় ৩০।৩৫খানি গ্রামের চিকিৎসা করিতে হয়। এই গ্রামেই প্রায় সব সময়ে পনর-ষোল শত রোগী বর্ত্তমান। সামান্য কুইনাইন, প্যালোড্রিন ইত্যাদি পাওয়া বিশেষ শক্ত যাকে বলে সুদুর্লভ, তার উপর পথ্যাপথ্য। দেশবাসী যেন ডাক্তার দেখাইতে দেখাইতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছে। আমি দুই বার জ্বর ভোগ করার পর আবার এই সাত-আট দিন জ্বর ভোগ করিতেছি।"

ভারতে ইংরেজ বণিক

ভারতবর্ষে বিদেশী মূলধন কি পরিমাণে ও কি সর্ত্তে খাটাইতে দেওয়া যায় তাহা লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ বিতর্ক চলিতেছে। বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধেই দেশের লোক অভিমত প্রকাশ করিয়াছে এবং ইহা লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বহু তিক্ত আলোচনাও হইয়াছে। জনমত এ বিষয়ে এত তীব্র হইয়া উঠিতেছিল যে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বিলাতী কোম্পানীগুলির অধিকার সংরক্ষণের জন্য দশটি ধারা সংযোজিত হয় এবং উহা লইয়াও কেন্দ্রীয় পরিষদে তুমুল বিতর্ক হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমটা বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধেই জনমত তীব্র হয়, ভারত-সরকারের কর্ণধারেরাও ঐরূপ কথাবার্ত্তা বলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের কমনওয়েলথ-প্রবেশের পর অকস্মাৎ এ বিষয়ে মোড় ফিরিয়াছে এবং বিলাতী মূলধন আমদানীতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে বিলাতী ও দেশী কোম্পানীতে কোন প্রভেদ করা হইবে না এবং বিলাতী কোম্পানীগুলি তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে।

দেশী ও বিলাতী কোম্পানীতে একটা খুব বড় পার্থক্য আছে। শুধু ডিভিডেণ্ট দেখিলেই চলিবে না, এখানে উচ্চপদে কর্ম্মচারী নিয়োগ, কণ্ট্রাক্ট, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। বিলাতী কোম্পানীতে এই তিন দিক দিয়া ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইবার খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়। বিলাতী এবং ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত ব্যবসার মূলসূত্র এই যে কোম্পানীর খরচ উহাদের লাভ ; ডিভিডেণ্ডের উপর উহাদের দৃষ্টি থাকে না। উহাদের প্রধান লক্ষ্য স্বজন কর্ম্মচারীদের বেতন, কণ্ট্রাক্ট, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং পণ্য বিক্রয়ের দালালী, ডিবেঞ্চারের সুদ ইত্যাদি। এগুলির সবই দেখান হয় কোম্পানীর খরচ। তার উপরও লাভ থাকিলে ডিভিডেণ্ডের ভাগ আসে, না আসিলে ক্ষতি নাই। এই ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ম্যানেজিং এজেন্সির প্রতি ভারত-সরকার দৃষ্টি দিয়াছেন কিন্তু বিলাতী কোম্পানীর খরচের দিকটায় তাঁহারা এখনও দৃষ্টি দেন নাই। গত এক বৎসরে ভারতের বিলাতী কোম্পানীগুলিতে কতগুলি করিয়া নূতন ইংরেজ কর্ম্মচারী আসিয়াছে তার হিসাব লইলেই অনেক ব্যাপার প্রকাশ পাইবে। এবিষয়ে সম্প্রতি 'যুগবাণী' পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে উহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :

"ভারত রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা দিবসকে ঠাট্টা করিয়া বিলাতী কার্টুনিষ্ট লো সাহেব চার্চ্চিলপন্থীদের সংবাদপত্র 'ইভনিং ষ্টাণ্ডার্ডে' কার্টুন দিয়াছেন যে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ভারত রিপাবলিকে ইংরেজ ও ভারতবাসী বাহুতে বাহু বাঁধিয়া নূতন ভাবে যাত্রা সুরু করিয়াছে, কয়েক মাস আগে ভিন্‌সেণ্ট সী'ন আমেরিকার 'হলিডে' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ কমনওয়েলথে প্রবেশের পর বোম্বাই এবং কলিকাতার ইংরেজদের দিন ফিরিয়া গিয়াছে, তাদের অবস্থা এখন আগের চেয়েও অনেক ভাল। সংসারে দায়িত্ব নাই ক্ষমতা আছে, পয়সার বেলায় নিজে, দুর্ভোগের বেলায় অন্যে, এটা অতি লোভনীয় জিনিস। ভারতে ইংরেজ আগমনের আরম্ভে কোম্পানীর আমলে এই অবস্থাই ছিল, আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অতিরিক্ত ভদ্রতার দরুন আবার সেই অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে।

"সাহেবদের কপাল কিভাবে ফিরিয়া গিয়াছে, চট, কয়লা, চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, বহির্ব্বাণিজ্য প্রভৃতিতে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। আপাততঃ কেবল চটকল হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। স্বাধীনতার পর সাহেবরা রীতিমত চমকাইয়া গিয়াছিল, অনেকে অতীত দুষ্কার্য্যের শাস্তির ভয়ে পলাইয়াছিল এবং যাহারা এখানে রহিয়া গিয়াছিল তাহারাও ভয়ে ভয়ে ভারতীয়দের খাতির যত্ন আরম্ভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কমনওয়েলথে প্রবেশের পর আবার ইহারা পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরিয়াছে এবং ভারতীয়দের মুখের উপর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া মেজাজ দেখানো সুরু করিয়াছে।

"বাংলাদেশের চার পাঁচটি চটকল ছাড়া সমস্তগুলি ইংরেজ ম্যানেজিং এজেণ্টদের অধীন। এই সমস্ত মিলের ম্যানেজার এবং এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার সকলেই ইংরেজ। যুদ্ধের সময় ইহাদের অনেকে কন্‌স্ক্রিপসনে চলিয়া যাওয়ায় কতকগুলি মিলের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার পদে ভারতীয় নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধের সময় যখন কাজের চাপ অত্যধিক এবং দায়িত্ব ও অসুবিধা সবচেয়ে বেশী তখন ইঁহারা সম্পূর্ণ দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছেন। স্বাধীনতার পর ইঁহাদিগকে পাকা করি-

বার কথা চলিতেছে এমন সময় ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং ইঁহাদের কপাল পুড়িল। আট বৎসর যাঁহারা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন নির্ব্বিকার চিত্তে ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্টরা তাঁহাদিগকে 'ইনএফিসিয়েণ্ট' আখ্যা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ার সাহস পাইল।

"এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের বেতন আরম্ভ হয় ১০৫০ টাকা হইতে; বৎসরে ৫০ টাকা বাড়ে এবং ঊর্দ্ধ সীমা নামে ১২৫০ টাকার মত হইলেও কার্য্যতঃ উহা বাড়িয়াই চলে। ইহার উপর আছে ২০০ টাকা ডি-এ, প্রোডাকসন বোন'স, বিনা-ভাড়ায় আসবাবপত্রসজ্জিত চমৎকার বাড়ী, কোম্পানীর খরচে ৬৪ টাকা বেতনের একজন বেয়ারা ইত্যাদি। সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বালিবার সময় ফ্যাক্টরীতে থাকিলেই এক গিনি ওভার-টাইম। মাসে প্রায় হাজার দুই আড়াই টাকা প্রথম হইতেই ইহাদের প্রত্যেকের পিছনে কোম্পানীর খরচ হয়। বিনা পয়সায় চিকিৎসাও ইহাদের প্রাপ্তি তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তার সুপারিশ করিলেই হিল ষ্টেশনে গিয়া কোম্পানীর খরচায় ইহারা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে, যাতায়াতের সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়া এবং হোটেলে থাকার জন্য দৈনিক দশ টাকা পায়। পুরা বেতন তো আছেই। ভারতে আসিয়া হিন্দী শিখিবার জন্য সপ্তাহে এক শত টাকা করিয়া মাষ্টারের খরচ পায়। ছুটিও ভালই মিলে। বছরে একমাস ছুটি তো আছেই, তদুপরি তিন বছরে একবার পুরা বেতনে দেশে যাওয়ার জন্য ছয় মাস ছুটি এবং সপরিবারে যাতায়াতের ভাড়া পায়। গ্রাচুইটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতিরও ভাল ব্যবস্থা আছে।

"এদের জন্য খুব ভাল ক্লাব আছে। সেখানে ভারতীয় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের প্রবেশ নিষেধ। ভারতীয় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের যে অল্প কয়েকজন যুদ্ধের পর অবশিষ্ট আছেন তাঁদের কোয়ার্টার্স দেওয়া হয় না, সাহেবদের বাড়ী খালি থাকিলে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তবু ইঁহারা পান না। এঁরা বেতন পান সর্ব্বপ্রকার ভাতা সমেত সাড়ে তিন শত বা চার শত টাকা, ডি-এ বেতনের শতকরা দশ টাকা। ব্যস এই পর্য্যন্ত ভারতীয় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারদের প্রাপ্তি। মেডিকেল সার্টিফিকেট ছাড়া ছুটি নাই। বালী মিলে সাহেবদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুইমিং পুল তৈরি হইতেছে।

"এই গেল ছোট সাহেবদের ব্যাপার। বড় সাহেবদের বন্দোবস্ত আরও অনেক দরাজ। জর্জ হেণ্ডারসনের বালী মিলের বড়সাহেব স্কট-কার দেশে গিয়াছেন, তিনি যাওয়ার সময় বেতন ছিল পাঁচ হাজার, কমিশন পৌনে দুই লাখ, বিরাট কোয়ার্টার্স, তাঁর ১৮টি দারোয়ান, ২৪টি মালী। ২২টি ভৃত্য তাঁর ফরমাস খাটিত। কলিকাতা হইতে লরী করিয়া তাঁর জন্য পরিষ্কার জল যাইত।

"এই রাজসিক বিলাসের খরচ দেয় কে? সমস্ত খরচ কোম্পানী দেয়, অর্থাৎ অংশীদার, ক্রেতা এবং গবর্ণমেণ্ট তিন পক্ষের ঘাড় ভাঙ্গিয়া টাকাটা আসে। খরচটা উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ঢোকে, উৎপাদন ব্যয় বাড়িলে দাম বেশী পড়ে, ক্রেতার ক্ষতি হয়; পড়তা বেশী পড়িলে লাভ রাখা কঠিন হয়; ইহাতে অংশীদারেরা লভ্যাংশে এবং গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্সে বঞ্চিত হয়। এই দুইয়ের প্রতি ম্যানেজিং এজেণ্টদের কোন দরদ নাই, কারণ খরচের খাতায় মোটা মোটা টাকা লিখিয়াই ইহারা অজস্র টাকা বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে। অনাবশ্যক ভাবে বহু সংখ্যক সাহেব নিয়োগ করিয়া এক দিকে টাকা বাহির হইতেছে, অপর দিকে বাহির হইতেছে মিলের সমস্ত মাল বিলাতী কোম্পানী হইতে কেনায়। ইহাদের Appointment এবং Store purchase policy উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই দুইটিতেই ইহাদের সবচেয়ে বড় লাভ। ব্যালান্স শীটে কোম্পানীর লোকসান দাঁড়াইলে ইহাদের কিছু মাত্র যায় আসে না, কারণ ব্যালান্স শীট তৈরির আগেই লাভ-লোকসানের খতিয়ানে খরচের খাতে যা কিছু আদায়ের দরকার তাহার ব্যবস্থা হইয়া যায়।

"আড়াই হাজার টাকার সাহেব এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এবং চারশত টাকার দেশী এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার যদি একই দক্ষতার সহিত কাজ করে তবে ঐ সকল পদে ভারতীয় নিয়োগ করিলে একটা বিরাট খরচ বাঁচিয়া যায়। যে সব সাহেব এ দেশে আসে তাহাদিগকে টেকনিশিয়ান বলিয়া আনা হয় কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা টেকনিকের ট-ও জানে না। কারখানার দেশীয় মিস্ত্রীদের নিকট হইতে যেটুকু পারে শিখে। যে কাজ ইহাদের করিতে হয় তাহাতে টেকনিশিয়ানের কোন দরকারও নাই। অনেক টাকা ইহাদের মারফত বিলাতে পার করিতে হইবে বলিয়া ইহাদিগকে গাল ভরা মস্ত মস্ত 'ডেজিগ্‌নেশন' দেওয়া হয়। আসলে ইহারা সতেরো আঠারো বা বিশ বছরের বালক ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রত্যেক মিলে এরূপ ১০।১৫টি করিয়া আমদানী হইতেছে এবং প্রায় শতখানেক মিল আছে।

"এই সমস্ত শ্বেত হস্তী পুষিতে এই ভাবে দুই দিক দিয়া ভারতবর্ষের লোকসান হয়। সম্প্রতি এই অপচয় খুব বেশী বাড়িয়াছে। আগে খুব বড় ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসেও এক যোগে দশ-বারো জনের বেশী ইংরেজ অফিসার থাকিত না এখন সেখানে শতাবধি আসিয়াছেন। নর্টন জোন্স, উইল, ফিনি প্রভৃতি সুপরিচিত পুলিস অফিসারেরা সাড়ে তিন হাজার চার হাজার টাকা বেতন এবং নানারূপ অতিরিক্ত প্রাপ্তি ও সুবিধা পাইয়া ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসগুলিতে চাকুরিতে আসিয়াছেন। এই বিরাট টাকা ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

অধীনে ছিল তখন এই ভাবে টাকা যাইত, এখনও ঠিক সেই ভাবেই অদৃশ্য শোষণ সুরু হইলে তাহা যে শুধু লজ্জার কথা হইবে তাহা নহে, ভয়ের কথাও বটে।"

কাশ্মীর ও পণ্ডিত নেহরু

নয়া দিল্লীতে গত সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্থানে গত দুই বৎসর যাবৎ প্রবল প্রচারকার্য্য চলিতেছে এবং কাশ্মীর পাকিস্থানের প্রাপ্য এই কথা সমানে বলা হইতেছে। পাকিস্থানের অন্যায় দাবি এক শ্রেণীর ইংরেজ ও আমেরিকান পত্রিকা প্রথম হইতে সমর্থন করিয়া আসিতেছে। সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত নেহরু সে বিষয়েও তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের জবাবে ঢাকার 'আজাদ' পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য (২৫শে মাঘ) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া উহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"ভারত-সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কাশ্মীর, হায়দরাবাদ ও জুনাগড়ের ব্যাপার আর ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের প্রচার বিভাগ যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া প্রথমে তাঁহারা এরূপ আশা করিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত দেশগুলি সম্বন্ধে ইউরোপ-আমেরিকার শক্তিগুলিকে চিরদিনই অন্ধকারে রাখা যাইবে। চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য তাঁহাদের দিক হইতে হয় নাই ; কিন্তু ছাই চাপা দিয়া যেমন হীরক ঢাকিয়া রাখা যায় না, সত্যও তেমনি মিথ্যা প্রচারের ধূম্রজাল তুলিয়া চিরকাল ঢাকিয়া রাখা চলে না। সম্প্রতি উপরোক্ত দেশগুলি সম্বন্ধে যাহা খাঁটি সত্য তাহা ইউরোপ-আমেরিকার জনসাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে। কাজেই বিলাতের "ইকনমিষ্ট", "টাইমস" ও "স্পেক্টেটার" এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "নিউইয়র্ক টাইমসে"র মত শক্তিশালী সংবাদপত্রগুলিও কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে ভারতের আচরণ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিলাতী পত্রিকাগুলি যে সব মতামত ব্যক্ত করিয়াছে তাহা মোটেই ভারতের মনঃপূত হয় নাই। "নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতকে দোষী করিয়াছে। পত্রিকাটি বলিয়াছেন : "ভারতই সালিশীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছে। কারণ ভারতের উজিরে আজম বলিয়াছেন, 'এরূপ ব্যাপারে সালিশী চলিতে পারে না।' কাজেই বাহিরের লোকেরা যদি মনে করে যে, ভারতের দাবি এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়াই সে সালিশীর প্রস্তাব মানিয়া লইতেছে না, তবে ভারত তাহাদিগকে দোষ দিতে পারে না।

"অতঃপর কাশ্মীরের ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পত্রিকাটি বলিয়াছেন যে, ভারত হায়দরাবাদ দখল করে এই যুক্তিতে যে, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক হিন্দু। আবার কাশ্মীর কুক্ষিগত করিতে চাহিতেছে এই যুক্তিতে যে, সেখানকার শাসক হিন্দু। ইহা হইতে মনে হয়, ভারত সব দিক হইতেই সমান সুবিধা ভোগ করিতে চাহিতেছে।

"পত্রিকাটির এই আলোচনা দৃষ্টে মনে হয়, ভারতের উজিরে আজম খুব জাঁকজমকের সহিত আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাঁর বোধ হয় ধারণা ছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে লম্বাচওড়া গোয়েবলসী ধরণের বক্তৃতা দ্বারা আরও কিছুকাল বিভ্রান্ত রাখা চলিবে। তাঁহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্যও সম্ভবতঃ ছিল তাহাই, কিন্তু তা সম্ভব হয় নাই দেখিয়া নেহরুজী ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর এক সাম্প্রতিক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি চড়া কণ্ঠে বলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের প্রাক্কালে কাশ্মীর সম্বন্ধে বৈদেশিক সংবাদ-পত্রগুলি যে 'প্রচার' আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নিতান্তই ভারতকে চাপ দিবার জন্য। অতঃপর তিনি বলেন যে, কাশ্মীর সম্বন্ধে গত দুই বৎসর ধরিয়া তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁর মতে সম্পূর্ণ নির্ভুল। কাজেই তিনি ঘোষণা করেন যে, যাহা কিছুই আসুক্ না কেন, জম্মু ও কাশ্মীর সম্বন্ধে তাঁর অনুসৃত নীতি তিনি এতটুকুও পরিবর্ত্তন করিবেন না, এজন্য তিনি তাঁর সমস্ত সুনাম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে রাজী আছেন।

"কলিকাতার 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা পণ্ডিত নেহরুকে একবার 'impetuous pundit' অর্থাৎ 'অস্থিরমতি পণ্ডিত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। উপরোক্ত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে মনে হইল 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার নামকরণ সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার অস্থির মস্তিষ্কের দরুণ আমাদের অবশ্য সুবিধাই হইয়াছে, কিছুই রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার আর্ট পণ্ডিতজী জানেন না বলিয়া উত্তেজনার মুখে তাঁহার বক্তব্যের ঝুলি হইতে বিড়াল ছানা সহজেই বাহির হইয়া যায়। এবারও হইয়াছে তাহাই। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে তিনি দুনিয়ার লোককে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কাশ্মীরে তিনি বিগত দুই বৎসর ধরিয়া যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন দুনিয়া এক দিক হইলেও তার এক চুলও পরিবর্ত্তন হইবে না। এ ব্যাপারে তিনি নির্ভুল। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ঘোষণার পর নিরাপত্তা পরিষদে বা দুনিয়ার অপর কোন রাষ্ট্রের এ ব্যাপারে কোন কিছু করার থাকে না ; কারণ নিজের অনুসৃত নীতি যিনি কোনক্রমেই পরিবর্ত্তন করিবেন না, মধ্যস্থতা, সালিশী প্রভৃতির প্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোন সুফল লাভের আশা নাই।"

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রাওলপিণ্ডিতে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ বলিয়াছেন 'ভারত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হইতেছে। ভারতের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের বিরাট বিরাট কারখানাগুলিতে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে পুরাদমে লোক ভর্ত্তি চলিতেছে। কিন্তু যত বড় ত্যাগ স্বীকারই করিতে হউক না কেন আমরা কোনমতে ভারতকে অস্ত্র বলে কাশ্মীর দখল করিতে দিব না।" ইহার দুই এক দিন আগে পশ্চিম পঞ্জাবের গবর্ণর সর্দ্দার আবদুর রব নিস্তার বলিয়াছেন, "কাশ্মীর সম্পর্কে জনমত পাকিস্থান সরকারের সম্পূর্ণ বিদিত। কাশ্মীর পাকিস্থানের এবং এ বিষয়ে ভারতের সহিত কোনরূপ আপোষ করা হইবে না।" অথচ এ দিকে ভারতের প্রেসিডেণ্ট তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ যুদ্ধ চায় না এবং সত্যই যে চায় না তার প্রথম প্রমাণ স্বরূপ এ বৎসরেই ভারতের সামরিক বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইবে। পাকিস্থানী নেতাদের এই শ্রেণীর প্রচার কার্য্যে পাকিস্থানে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে ভারত পাকিস্থানের শত্রু এবং ইহারই ফল হইতেছে হিন্দুদের উপর আক্রমণ। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ব্যাপার এই তিক্ততাকে তিক্ততর করিয়াছে এবং যে সমস্যা কাশ্মীর লইয়া জটিল হইয়া উঠিয়াছে তাহা জটিলতর হইয়াছে। পাকিস্থানের সঙ্গে কোন মীমাংসার কার্য্যই সম্ভব হইতে পারে না যতক্ষণ না পাকিস্থান অন্যায় ও অসঙ্গত দাবি ছাড়িয়া ন্যায় ও যুক্তির পথ ধরে। তাহা না করিয়া কেবলই বল প্রয়োগের আস্ফালন করিতে থাকিলে বল প্রয়োগই তাহার একমাত্র প্রত্যুত্তর হইতে বাধ্য।

শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের এক অধ্যায়

কলিকাতা নগরীতে তাঁহার জন্মোৎসবের উদ্যোগী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী বিপ্লবী জীবনের সম্যক্ পরিচয় দিতে চান নাই বা পারেন নাই। এই উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন দেখিয়া মনে হয় যে, রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের প্রবর্ত্তক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের কর্ম্মস্মৃতি দেশবাসীর মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টাই তাঁহারা করিতেছেন। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা কি তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। উৎসব উপলক্ষে যে বক্তৃতাদি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের প্রাক্-পণ্ডিচেরী জীবনের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'একটা তথ্যের উল্লেখ করিতে চাই। দৈনিক সংবাদপত্রে এই উৎসব উপলক্ষে যে সব প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কল্যাণে একটা ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে যে অরবিন্দ ১৮৯৭-৯৮ সালের পূর্ব্বে বাংলা ভাষা জানিতেন না; দীনেন্দ্র রায় মহাশয়ই তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষা শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু এই কথা অতি অল্পসংখ্যক বাঙালী জানেন যে ১৮৯৪ সালের ১৬ই জুলাই তারিখ হইতে বোম্বাই নগরীর "ইন্দুপ্রকাশ" নামক পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; শেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ২৭শে আগষ্ট তারিখে।

এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে ইহা প্রমাণিত হয় যে, অরবিন্দ বঙ্কিমযুগ, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যুগের সকল বাঙালী সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কের চিন্তাধারার সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। অনুবাদের মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় নাই; এই সব সাহিত্যিকের পুস্তকাবলী সেই সময় এবং এখনও অতি অল্পসংখ্যকই অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। প্রায় সেই সময়েই ঐ পত্রিকা-স্তম্ভে কংগ্রেসের তদানীন্তন নীতি ও উপায় সম্বন্ধে অরবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধাবলীতে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হয়।

এই প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিলে অরবিন্দ-জীবনের প্রায় এক অজ্ঞাত অধ্যায় দেশবাসী জানিতে পারিত; তাঁহার জীবনের গতি কোন্ পথে চালিত হইতেছে, কোন্ পরিণতি লাভ করিয়া তাহা সার্থক হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম। কেন যে উৎসব-সমিতি এই চেষ্টা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিলেন না, তাহা অবোধ্য রহিয়া গেল। মানবের জীবন খণ্ডিত করিয়া দেখিলে তাহার প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। অতীত বর্ত্তমান এক সূত্রে বাঁধা। এই কথা মনে থাকিলে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও অরবিন্দ ঘোষের জীবন পৃথক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইত না; অরবিন্দ ঘোষের জীবনকে বিস্মৃতির কোটরে ঠেলিয়া দিয়া, শ্রীঅরবিন্দের জীবন লইয়া এরূপ ভাবে মাতামাতি করিবার চেষ্টা হইত না।

এশিয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকগণ ও সাংবাদিকগণের বক্তৃতা ও লেখা পড়িয়া আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, তাঁহারা জানেন না কি করিয়া তাঁহাদের শত্রু কম্যুনিজমের বা একনায়কত্বের (totalitarianism) আক্রমণ প্রতিরোধ করিবেন। চীনদেশে কয়েক শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া, চীনের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়া তাঁহারা দেখিয়াছেন সবই ব্যর্থ হইয়াছে। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব ডীন একিসন একখানি ১,০০০ পৃষ্ঠার বই রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের নিকট দাখিল করেন। তাঁহার দেশের সমরনায়কগণ ও কূটরাজনীতিকগণ এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করেন, তাহা এই বিরাট পুস্তকে সংগ্রহ করা হয়। এই পুস্তকের এই সব মতামত বিচার করিয়া ডীন একিসন তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত ট্রুম্যানকে জানাইয়া দেন। সেই উপলক্ষে তিনি বলেন, চীনের গণ-মন যে এমন করিয়া কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেকের অধীনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা চলিতেছিল তাহার চূড়ান্ত ব্যর্থতা; নতুবা এমন করিয়া তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য-সামন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র মাও-সে-তুং-এর সৈন্যবাহিনীর হাতে

সমর্পণ করিত না। এই ব্যবস্থায় ঘুণ ধরিয়াছিল বলিয়াই তাহা এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

রাজনীতিকগণের এই মতের সঙ্গে সাংবাদিকগণের মতের মিল আছে বলিয়া মনে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার বিভাগের সৌজন্যে আমরা যে সব তথ্যাদি প্রাপ্ত হই তাহার মধ্যে প্রথমোক্তদের বক্তৃতা ও শেষোক্তদের প্রবন্ধাদি প্রধান। ডীন একিসনের একটি বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক "নিউইয়র্ক টাইমস" বলিয়াছেন :

"চীনের ব্যাপারে দেখা যায় যে, সেখানকার সমস্যা কেবল একটা সামাজিক বিপ্লব বা সাধারণ গৃহযুদ্ধ নয়, আসলে সেখানে যাহা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা দুরভিসন্ধিমূলক বিরাটাকারের বহিরাক্রমণ ছাড়া আর কিছু নয়।"

ডীন একিসনের বিভাগের সহকারী সচিব জর্জ্জ ম্যাকৃঘী যাহা বলিয়াছিলেন, ইহার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে তাহা "নিউ-ইয়র্ক টাইমসে"র ব্যাখ্যা সমর্থন করে বলিয়া মনে হয় না। কেবল যুদ্ধের পথে "কম্যুনিজম প্রতিরোধ করিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না।" এশিয়ার বিভিন্ন "স্বাধীন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া আমাদের উচিত।" কিন্তু শুদ্ধ মন লইয়া এরূপ কল্যাণ সাধনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বড় একটা দেখা যায় নাই বলিয়াই যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতে অনেক রাষ্ট্র দ্বিধা বোধ করে। ম্যাকৃঘী ইয়ং ডেমোক্রেটিক ক্লাবের বক্তৃতায় যদিও বলিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, দক্ষিণ-এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্র তাহাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিতে চান, "সশ্রদ্ধ চিত্তে" তাহা বিচার করা হইতেছে। কিন্তু যে কূটনীতিক চাল এই সব ব্যাপারে লক্ষ্য করিতেছি তাহার মধ্যে "শ্রদ্ধার" প্রভাব অনুভব করিতে পারিতেছি না। কাশ্মীর তাহার একটি প্রমাণ।

হাইড্রোজেন বোমা

জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমা বন্দরের উপর এটম বোমা ফেলিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শেষশত্রু জাপানকে নতি-স্বীকার করাইয়াছিল। জার্ম্মানীর হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফোর্ট, বার্লিন নগরীর উপর হাওয়াই জাহাজ হইতে বোমা ফেলিয়া ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি করা হইয়াছিল। কিন্তু আণবিক বোমার ভয়ে প্রায় চারি বৎসর দুনিয়ার সভ্য দেশসমূহে বাগ্‌বিতণ্ডার সীমা-পরিসীমা ছিল না। আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক বোমা নির্ম্মাণের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। দুই-একটি বোমা প্রস্তুত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ভাঙিয়া দিয়াছেন। সুতরাং "নূতন কিছু কর" এই নির্দ্দেশ পাইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকেরা তৎসম্বন্ধে তৎপর হইয়াছেন, ফলও পাইয়াছেন প্রায় হাতে হাতে। হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ধ্বংসলীলার শক্তি নাকি আণবিক বোমা হইতে অনেক গুণ বেশী। আরও দুই-তিন বৎসর এই লইয়া হৈ-হুল্লোড় চলিবে।

ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

ব্যবহারশাস্ত্রে পণ্ডিত একজন বাঙালী সমাজ হইতে তিরোহিত হইলেন। ইংরেজ আমলে তিনি কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের আইন-সদস্য ছিলেন; তিনি দেশের এক যুগসন্ধির সময়ে বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হন; কয়েক মাসের জন্য তিনি বাংলা দেশের গবর্ণর ছিলেন। ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহ-ত্যাগ করিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের সেবা করিবার সুযোগ পান নাই, যদিও তাঁহার কৌশলী নেতৃত্বে দেশের এক সঙ্কট সময়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের অধিকাংশ ভারতরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশন ইংরেজ শাসনের অবসানের অঙ্গস্বরূপ রাজন্যবর্গকে তাঁহাদের সার্ব্বভৌমত্বের অধিকার ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। ভূপালের নবাব 'নরেন্দ্রমণ্ডলী'র মুখপাত্র (Chancellor of the Chamber of Princes) ছিলেন; 'পাকিস্থানী মনোভাবাপন্ন' এই রাজার প্ররোচনায় অনেক রাজাই ভারতরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার কল্পনা করিতেছিলেন। ব্রজেন্দ্রলালের পরামর্শে বরোদার মহারাজা এই পরামর্শের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ ভারতরাষ্ট্রকে ছিন্নভিন্ন হইতে দিলেন না। ১৯৪৭ সালের মধ্য ভাগে তাঁহাদের প্রতিনিধিরা প্রকাশ্য ভাবে ভারতরাষ্ট্রের সংগঠক সংসদে যোগদান করিলেন। ইংরেজের কূটনীতি পরাজিত হইল; ভারতরাষ্ট্রকে খণ্ডবিখণ্ড করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই জন্যই ব্রজেন্দ্রলালের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিবে।

সুধীরচন্দ্র বসু

নেতাজীর চতুর্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুধীরচন্দ্র বসু ৫৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অকাল মৃত্যুর দেশ এই বাংলাদেশ। সুধীরচন্দ্র ধাতব দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধায়করূপে টাটা লোহা ও ইস্পাত শিল্প-কেন্দ্র জামসেদপুরে কাজ করিতেন। নানা জাতি, নানা পরিচয়, নানা ভাষা-ভাষী লোক এই নগরীর বর্ত্তমান বিরাট রূপদানে সাহায্য করিয়াছে। সেই সর্ব্বজাতির সংমিশ্রণে একটা নূতন সংস্কৃতির জন্ম হইয়াছে, একটা নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই সমাজের এক জন নেতা ছিলেন সুধীরচন্দ্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের জন্য তাঁহাকে উত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। নীরবে তাহা তিনি সহ্য করিয়াছেন। ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায় ক্ষোভের কোন পরিচয় দেন নাই; মানবপ্রকৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ হন নাই। চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি পরিচিতের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী কন্যার উদ্দেশে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গান্ধীজী স্মরণে

শ্রীহেমপ্রভা দেবী

গান্ধীজীর তিরোধানের পর দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর চলিয়া গেল। আবার সেই ৩০শে জানুয়ারী নিদারুণ দুঃখের স্মৃতি বহন করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সারা বৎসর যদি বা কাটাইয়া দেওয়া যায়, এই ৩০শে জানুয়ারীকে কোন প্রকারেই এড়াইয়া যাওয়া চলে না। এই দিনটি যখন উপস্থিত হয় তখন আবার সেই ক্ষত-স্থানে নূতন করিয়া দাহ উপস্থিত হয় এবং বেদনায় সমস্ত দেহ ও মন পীড়িত হইতে থাকে। ৩০শে জানুয়ারী আমাদের জীবনে বার বার আসিবে ও তেমনি করিয়া নাড়া দিয়া যাইবে, যেমন করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় সমস্ত প্রকৃতিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যায়।

গান্ধীজীকে অবলম্বন করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন রূপ গ্রহণ করিতেছিল। দেশের দুর্দিনে যখন তাঁহার উপস্থিতি সব চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় ছিল তখনই আমরা তাঁহাকে অতর্কিতে হারাইয়াছি। গান্ধীজী চলিয়া গিয়াছেন, আজ রিক্ত মনে ভাবিতেছি তাঁহার বাৎসরিক স্মৃতি-দিবসে, এই পুণ্য তিথিতে, কি দিয়া তাঁহার তর্পণ করিব। কি সম্বল আছে, কি সঞ্চয় করিয়াছি যাহা দিতে পারি। কিছুই খুঁজিয়া পাই না, একমাত্র অশ্রুজল ছাড়া।

মনে হয়, যখন তিনি ছিলেন তখন যেন সবই ছিল। তাঁহার আলোয় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেদেরও অনেক বড় বলিয়া মনে হইত। কিন্তু আজ দেখিতেছি সবই মিথ্যা, যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভাবে অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব মিথ্যা হইয়া গিয়াছিল। আমরা যেন আজ একেবারে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছি।

গান্ধীজী ছিলেন মহামানব। যুগে যুগে মহামানবগণ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লোকশিক্ষার জন্যই আসিয়া থাকেন। তাঁহারা জগৎকে পবিত্র করিয়া দিয়া যান। গান্ধীজীও ভারতবর্ষের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নিজস্ব জিনিস সত্য ও অহিংসা। সত্য ও অহিংসার বাণী গান্ধীজী তাঁহার স্বকীয় বিশেষ ধারায় নূতন করিয়া জগৎকে শুনাইলেন। সত্য ও অহিংসার পথেই তিনি ভারতের সেবা করিয়া, ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন এবং জগৎকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গান্ধীজী সমগ্র ধর্মের পরিপূর্ণ মূর্তি ছিলেন। তিনি একাধারে জ্ঞানী, কর্মী, সাধক, প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সাধনা ছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরণের; ইহার জন্য কোনও কিছু ত্যাগ করিয়া কোথায়ও একক হইয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। জগতে যত কিছু ভাল ও মন্দ আছে তাহারই মধ্যে বাস করিয়া সকল রকম কর্ম করিয়াই নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি তাঁহার সাধনা সম্পন্ন করিয়াছেন। পদ্মপত্রে জলের মত তিনি বাস করিতেন। কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। সব রকমের মানুষই তাঁহার-নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। সর্ব প্রকারের প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান তিনি অতি আশ্চর্যভাবে নিমেষমাত্রে করিয়া দিয়াছেন। কাহাকেও দূরে সরাইয়া দেন নাই। নিজেকেই সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গান্ধীজীই রচনা করিয়া গিয়াছেন। আজ তিনি নাই। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই দিনটি আজ একাধারে আনন্দের ও দুঃখের দিন। কে জানিত আমাদের ভাগ্য এমন হইবে। আমাদের আনন্দ ও অশ্রুর মালা একত্রে গাঁথা হইয়া রহিল। ভারতের ভাগ্যবিধাতা আমাদের ভাগ্য এই ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিলেন।

গান্ধীজীর কথা বলিতে গেলে ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি মহৎ ছিলেন, সুন্দর ছিলেন, আকাশের মত উদার ও সাগরের মত বিশাল ছিলেন। তিনি একাধারে আমাদের জনক ও জননী ছিলেন। জননীর মত কোমল হস্ত সকলে অনুভব করিয়াছেন। তিনি যে কি ছিলেন আর কি ছিলেন না তাহার কোন সীমারেখা টানা যায় না।

তিনি খুব ছোট ছোট কাজও এমন সুন্দর এবং নিপুণ ভাবে করিতেন যাহা আর কেহই পারিত না। ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, যাঁহার মাথায় সারা বিশ্বের ভাবনা তিনি কেমন করিয়া ইহা করিতেন। তাঁহার নিকট কিছুই তুচ্ছ ছিল না—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এমনই করিয়া সকলকেই টানিয়া লইয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহার অভাব যেন আমাদের আশ্রয়শূন্য অভিভাবকশূন্য অবস্থায় আনিয়া দিয়াছে। গান্ধীজী আমাদিগকে শিখাইয়াছেন মৃত্যুতে শোক করিতে নাই। জীবন ও মৃত্যু একত্রেই বাস করে—দিন ও রাত্রির মত। শোকাচ্ছন্ন মন ত বাধা-স্বরূপ। উহা হইতে মুক্ত থাকিতেই হইবে। তাঁহার এই শিক্ষাকে বার বার স্মরণ করি। তাঁহার জীবিতকালে

তাঁহার বাণী আমাদের মধ্যে যেমন শক্তির সঞ্চার করিত আজও যেন সেইরূপ করে। তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম যেন আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। অলক্ষ্যে থাকিয়া তিনি আমাদিগকে পরিচালিত করুন।

গান্ধীজী বলিতেন তাঁহার জীবনের জন্য যেন আমরা কেহ উদ্বিগ্ন না হই। তাঁহার জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর যখন তাঁহাকে লইতে চাহিবেন তখনই যাইতে হইবে। আর রাখিতে চাহিলে কাহারও সাধ্য নাই কিছু করিতে পারে। একটি গাছের পাতাও ভগবানের ইচ্ছা ভিন্ন পড়িতে পারে না। তিনি সব সময়ই সব অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন তাঁহার সময় আসিল, নির্বিকার চিত্তে রাম নাম করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেলেন। পিছনের দিকে তাকাইলেন না। কি পড়িয়া রহিল, অসমাপ্ত রহিল, কিছুই তাঁহার মনে আর স্থান পাইল না। আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, তাই অহোরাত্র দাহ লইয়া ফিরিতেছি। কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

"আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে
দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদ পুরে
ভগ্ন গৃহে ;"

তাঁহাকে দেখিয়াছি যখন যাহা গড়িয়া তুলিতেন তাহা ছোটই হউক আর বড়ই হউক তাহার জন্য কি অক্লান্ত চেষ্টা ও শ্রম করিতেন। আবার যখন তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার প্রয়োজন মনে করিতেন, খেলাঘরের মতই তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিতেন। কখনও হিসাব করিতেন না উহাতে কত অর্থ ও শ্রম গিয়াছে। এমনই অনাসক্ত তাঁহার মন ছিল। অন্যদিকে আবার এক বিন্দু জলের অপচয়ও সহিতে পারিতেন না।

গান্ধীজী আমাদিগকে অনেক দিয়াছেন, অনেক শিখাইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। মাধুর্যপূর্ণ সেই স্মৃতি আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া আছে। এই আনন্দের স্মৃতি আমাদিগকে অগ্রগামী করুক। গান্ধীজীর কর্ম ও শিক্ষা ত ব্যর্থ হইবার নহে। উহা যে শাশ্বত সত্য। আকাশে ও বাতাসে উহা ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

আমাদের জীবনে ৩০শে জানুয়ারী প্রতি বৎসরই আসিবে। ঈশ্বর করুন আমরা যেন এই দিনটির জন্য প্রস্তুত হইতে, যোগ্য হইতে পারি। এই দিনটি যেন আমাদের সালতামামি হয় ; কি করিলাম, কি পাইলাম তাহার হিসাব-নিকাশ যেন করিতে পারি। গান্ধীজীর যোগ্য অর্ঘ্য যেন সঞ্চয় করিতে পারি।

সমস্ত হৃদয় দিয়া গান্ধীজীকে আজ স্মরণ করি, প্রণাম করি. আমাদের অন্তর-বাহির পবিত্র হইয়া উঠুক। গান্ধীজীর আশীর্বাদ আমাদের জীবন প্লাবিত করিয়া দিক্।

সংগঠনে সুভাষচন্দ্র

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

নেতাজীর বিষয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধক্ষেত্রে সহকর্মী শাহ্ নওয়াজ খাঁ লিখেছেন :

"আমি আজও জানি না তাঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে সাধারণ মানুষ, সেনানায়ক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ এই তিনের গুণ কি ভাবে মিশ্রিত ছিল।

"কোনও লোকের কর্মের ধারা বুঝিতে হইলে প্রথমে তাঁহাকেই চিনিতে হয়। ঐরূপ গুণাবলীযুক্ত অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তিনি একেলা, নিজের হাতে সমস্ত পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দিগকে এক সঙ্ঘে সংগঠিত করিয়া, সমস্ত পূর্ব্ব-এশিয়ার জাতিপুঞ্জকে ভারত ও ভারতীয়দিগের সহিত মৈত্রী ও বন্ধুত্বসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন।...তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের এই গভীর প্রেম ও অসীম শ্রদ্ধার মধ্যে কি গুপ্ত মন্ত্রবল ছিল ? মনে হয় ইহার কারণ, তাঁহার শৌর্য্য, চরিত্রবল এবং উদার মন।"

ঠিক কথা ! বাংলায়, তথা সমগ্র ভারতে, কোন্ জীবন্ত প্রাণ মন আছে যা আজ নেতাজীর স্মরণে সাড়া দেয় না, যা আই-এন-এ সেনাদলের অমর কীর্তি-কথায় চঞ্চল হয়ে উঠে না ? কিন্তু কয়জন ভাবে যে, ঐ অলোকসামান্য পৌরুষযুক্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ হ'ল কোথায় ও কি উপায়ে ?

চরিত্রবল ও জ্ঞানপিপাসা সুভাষ পিতামাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এরই অঙ্গস্বরূপ দেশপ্রেম ও সেবায় নিষ্ঠা তাঁতে অতি অল্প বয়সেই দেখা দেয়। যে দেশপ্রেম ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ও যে দেশসেবায় তিনি উত্তরকালে

সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন তার প্রথম পরিচয় আমরা পাই তাঁর কৈশোরে। কটক স্কুলে ছাত্রাবস্থাতেই, ১৯০৯ সালে, মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে কয়েকজন সঙ্গীকে নিজের দলে টেনে দরিদ্র ও আর্ত্তের সেবা আরম্ভ করেন। ১৯১১ সালে জাজপুরে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়। ১৪ বৎসর-বয়স্ক কিশোর সুভাষচন্দ্র সেই সময়ে সহপাঠীদের মধ্যে সেবাদল গঠন করে সেবাকার্য্যে ব্রতী হন। সমবয়সীদের উপর তাঁর চরিত্র ও চিন্তাশক্তির প্রভাব তখন থেকেই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ঐ সেবাদল সংগঠন বা আলাপ-আলোচনা তাঁর পড়াশুনার কোনও ব্যাঘাত জন্মাতে পারে নি—১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তার পর আরম্ভ হ'ল কলকাতায়, প্রেসিডেন্সী কলেজে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন। এই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও উপদেশ তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম্মজীবনের ব্যাকুলতায় তিনি ১৯১৪ সালের গোড়ায় গুরুর সন্ধানে ঘরের বার হয়ে, কয়েক মাস ধরে বৃথাই হিমালয় অঞ্চলে এবং উত্তর-ভারতের নানা তীর্থ ঘোরা-ফেরা করেন।

তারপর তাঁর ছাত্রজীবনে ক্রমে এল প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক শিক্ষাশিবিরে সৈনিক-জীবনের অভিজ্ঞতা আর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সহিত পরিচয়ের পর্ব্ব। পরে আরম্ভ হ'ল ছাত্রসংগঠন এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই এল তাঁর ছাত্রজীবনের উপর প্রচণ্ডতম আঘাত। কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলেজ ছাড়তে বাধ্য করায় কিছু দিন তাঁর লেখাপড়ায় বাধা পড়ে। সাধারণ বাঙালী ছেলে হলে এখানেই তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়ে উন্মার্গগামিতা আরম্ভ হ'ত, কিন্তু সুভাষ ছিলেন উন্নত ও বিশুদ্ধ ধাতুতে তৈরি। কিছুদিন পর আবার চলল পড়াশুনা সমান ভাবে। তবে সামরিক শিক্ষায় রূপ দিল তাঁর যোদ্ধৃভাবকে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়নের ফলে মনের উপর পড়ল গভীর ছাপ—স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদা সম্পর্কে।

এদেশের লেখাপড়া সাঙ্গ করে বিদেশযাত্রা, আই-সি-এস পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ এবং দেশের ডাকে সে সব বিসর্জ্জন দেওয়া—এ কথা তো সর্ব্বজনবিদিত।

দেশে তখন স্বাধীনতার ডঙ্কা বেজে উঠেছে। চারিদিকে তুমুল আন্দোলন। সুভাষ করলেন আত্মনিয়োগ স্বাতন্ত্র্যের সংগ্রামে। তাঁর যৌবনের অভিষেক হ'ল ত্যাগে, সাধনায় ও সংগঠনে।

১৯২১ সালে আমরা তাঁকে দেখি অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনের সংগঠনে। ঠিক সেই সময় এদেশে এলেন ব্রিটিশ যুবরাজ, সুভাষ দল গঠন করে পূর্ণ উদ্যমে চালালেন বয়কট এবং যুবরাজের অভ্যর্থনা পণ্ড করার আয়োজন। ক্রমে এল আইন-অমান্য আন্দোলন এবং সেই সময়েই আমরা প্রথম পরিচয় পেলাম সুভাষের দল পরিচালনা-ক্ষমতার। বৎসরের শেষে দেশবন্ধুর সঙ্গে হ'ল সুভাষের প্রথম কারাবরণ।

জেল থেকে বেরুলেন ১৯২২ সালের মধ্যভাগে। সেই বৎসর উত্তরবঙ্গে অকাল-প্লাবনে লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন হয়ে পড়ায়, আচার্য্য রায়ের আহ্বানে সুভাষকে ছুটতে হ'ল আর্ত্তের পরিত্রাণে। সেখানে উত্তরবঙ্গ সেবাদলের কাজ এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে তিনি "বাংলার কথা"র সম্পাদকরূপে এবং "অল বেঙ্গল ইয়ুথ লীগ" ও "ইয়ং বেঙ্গল পার্টি"র অধিনায়করূপে, কংগ্রেসের স্বাতন্ত্র্য অভিযানের প্রচার এবং বাংলার যুবশক্তিকে দেশের কাজে যোজনা এই দুই কাজই সমানে চালাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে "স্বরাজ পার্টি"র ভিত্তি স্থাপনা হ'ল এবং তার প্রচারের কাজ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য ইংরেজী দৈনিক "Forward" জন্মলাভ করল। সুভাষের উপর পড়ল তারও কার্য্যাধ্যক্ষ পদের ভার। স্বরাজ পার্টির প্রচার বিভাগ তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এতই সুষ্ঠুভাবে চলেছিল যে কলিকাতার প্রধান বিদেশী দৈনিক বলতে বাধ্য হয়েছিল, "সুভাষ বসুর আই-সি-এস্ পদত্যাগে গবর্ণমেণ্টের লোকসান হয়েছে অনেক এবং কংগ্রেসের লাভ হয়েছে ততোধিক।" সত্য সত্যই তখন সুভাষ সকল বিষয়ে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত।

অল্প দিন পরেই এল মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড বিধানে ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন অধিকারের পর্ব্ব—সুভাষের যুবসংগঠন এবং প্রচার বিভাগের পরিচালন দেশবন্ধুর এই দুই অভিযানকে অশেষ সাহায্য করে সফল করে তুলল।

কর্পোরেশন অধিকার করে দেশবন্ধু সুভাষকে লাগালেন তার সংস্কারের কাজে। কলিকাতা নগরীর তখন এক আনা অংশ—অর্থাৎ সাহেবপাড়া—ছিল ভূস্বর্গ-বিশেষ, বাকী পনর আনা—অর্থাৎ কালা আদমীর মহল্লা—ছিল নরকতুল্য। সুভাষের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি লাগল এই অসাম্য দূর করার প্রয়াসে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তত দিনে বুঝে নিয়েছিল সুভাষের ক্রান্তি-বিপ্লবকারী সংগঠন-শক্তির আকার-প্রকার। ১৯২৪ সালের এপ্রিলের শেষে সুভাষ নিযুক্ত হলেন চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসাররূপে। ছয় মাসকাল পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালাবার পর ২৫শে অক্টোবর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

প্রায় আড়াই বৎসর জেলভোগের পর ভগ্নস্বাস্থ্য কিন্তু

অটুট উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে সুভাষ ফিরলেন দেশের কাজে। সেই সময়েই ব্রিটিশ সরকার পাঠালেন সাইমন কমিশন। সে কমিশনকে বিফল করে ফিরাতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল সমস্ত কংগ্রেসপক্ষ এবং সেই সঙ্গে চলল ব্রিটিশ পণ্যবর্জ্জন। বাংলার যুবশক্তি তখন সুভাষের ইঙ্গিতে চলে, সুতরাং বাংলায় এই বর্জ্জন ও প্রত্যাখ্যান-নীতি অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বেশী জোরালো হয়ে উঠল।

পরের বৎসর কলিকাতায় হ'ল কংগ্রেসের অধিবেশন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু রাষ্ট্রপতি। সেবারের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গঠন ও পরিচালন সমস্তই হয়েছিল সুভাষের নেতৃত্বে। স্বেচ্ছাসেবক দলের শোভাযাত্রায় আমরা প্রথম পাই "নেতাজী সুভাষে"র পূর্ব্বাভাস। কেউবা তখন বাহবা দিয়েছিল আবার বাঙালীসুলভ খেলো বিদ্রূপও করেছিল অনেকে। কেবলমাত্র "Welfare" নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদক লিখেছিলেন, "It was a sight·· No! It was a vision! A promise of the future."—এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—না, না এটা স্বপ্নের মত ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস!

এই কংগ্রেসেই সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদিগের সঙ্গে সুভাষের প্রথম সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হয়। ৩০,০০০ দলবদ্ধ শ্রমিক জোর করে কংগ্রেসের সভায় ঢুকতে চায়। তাদের চালচলন দেখে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, সুভাষ কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শ্রমিক দলকে ধীরে চালনা করে সভার ভিতর দিয়ে নিয়ে গেলেন।

এই ব্যাপারের পর তাঁর দৃষ্টি পড়ল শ্রমিক সংগঠনের দিকে। জামশেদপুরের শ্রমিকসঙ্ঘ তাঁকে করল নেতৃত্বে বরণ। এই নেতৃত্ব গ্রহণ করার ফলে তাঁকে একসঙ্গে লড়তে হয় মালিকানা স্বত্ব, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পেশাদার শ্রমিক নেতার সঙ্গে। বিষম বাধা সত্ত্বেও, অশেষ ধৈর্য্যের সঙ্গে শ্রমিক সংগঠন করে, তিনি প্রথম দুই পক্ষের নিকট জয়লাভ করে প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্রান্তে ১৯৩০ সালের সভায় শ্রমিক দল দ্বারাই আক্রান্ত ও আহত হন, কিন্তু অসীম সাহসের সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি কার্য্যোদ্ধার করেন। সেই শ্রমিক দল সুভাষকে গুরুদক্ষিণা দেয় ১৯৪২ সালে, যখন সমগ্র ভারতের শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে একমাত্র সুভাষের নিজহাতে গড়া ঐ শ্রমিক-সঙ্ঘই দেশবাসীর উপর ব্রিটিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে সরকারী চণ্ডনীতিতে বাধা দেয়।

১৯৩০ সালের পর ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সুভাষকে দমন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের মধ্যে মাত্র ছয় মাস তিনি স্বাধীন ভাবে দেশে ছিলেন, বাকী সময় তাঁকে হয় জেলে, নয় বিদেশে নির্ব্বাসনে কাটাতে হয়। পরের বৎসর ১৯৩৮ সালে তিনি হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন। পরের বৎসরেও তিনি নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেন। কিন্তু তারপরই এল তাঁর জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পদ ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হয়ে গেল। ব্রিটিশের সুনজর তো সুভাষের উপর ছিলই। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হয়ে ডিসেম্বরের গোড়ায় ৭ দিন প্রায়োপবেশনের পর তাঁকে এলগিন রোডস্থ বাসভবনে নজরবন্দী অবস্থায় আনা হয়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে ব্রিটিশ পুলিস ও আমলাতন্ত্রের নজর এড়িয়ে তিনি বিদেশে চলে যান। তার পরের কথা হ'ল আই-এন-এ সংগঠন ও পরিচালনের অমর কাহিনী। তার বিশদ বিবৃতির স্থান-কাল এটা নহে।

সবশেষে ফিরে আসা যাক গোড়ার প্রশ্নে। কোথা থেকে এল এই অনন্যসাধারণ সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্বের অপূর্ব্ব ক্ষমতা? ধাতুর আকর আগুনে গললে লোহা হয়। সেই লোহা দিয়ে সাধারণ ভাবে গড়া হয় চাষীর কোদাল, খন্তা। আবার সেই লোহা যখন ময়দানবের চুল্লীতে হাজার বার উল্কার জালায় জ্বলে, লক্ষ বার প্রবল আঘাত পড়ে তার উপর, তখন জন্মায় বীরের অস্ত্র, বজ্রকঠিন রত্নপ্রভ শাণিত অসি-ফলক। মানুষের সন্তানের মধ্যে যদি থাকে সেই উপাদান, শৌর্য্য, পৌরুষ ও সংযম তবে শত অগ্নি-পরীক্ষায় ত্যাগের অনলে পুড়ে যায় তার সকল মল ক্লেদ হীনতা; দূর হয় মলিনতা—আসে পুরুষকারের জ্যোতি, জগৎ অবাকবিস্ময়ে চেয়ে দেখে মহামানবের আবির্ভাব।*

* অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত ও রেডিও-কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

আর্টের মর্মকথা

অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

জীবনের প্রাঙ্গণে সুন্দরের আবির্ভাব বারবারই ঘটেছে, তবু মানুষ আজও বুঝি তার পূর্ণ অর্থ খুঁজে পায় নি। ক্ষণিকের একান্ত রূপলীলার মাঝে অরূপের সন্ধান চলেছে, চলেছে অনুসন্ধিৎসার অভিযান। জানি না সে অভিযান ব্যর্থ হবে কি সার্থক হবে। মানুষের অন্বেষণের শেষ নেই। তাই চরম বিচার করবার দিন আজও আসে নি, কখনো আসবে কিনা তার উত্তরও দেবে ভবিষ্যৎ। বসন্ত-বাতাস আন্দোলিত পলাশ-পারুলের গতিচ্ছন্দ মর্মর-মুখরিত সায়াহ্নের রহস্যঘন নিঃসঙ্গ বনপথ আমাদের মনে বিভিন্ন রসের সঞ্চার করে, এ কথা সত্য। বালার্কসম্ভবা প্রত্যুষের শিশু-সূর্য তার আলোর আবেদনের মাঝে যে বারতা প্রচ্ছন্ন রাখে, তা আমাদের কাছে পরম বিস্ময়ের। এখানে ফুল-ফোটা জ্যোৎস্না, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের নিরন্তর ভেসে যাওয়া; এখানে বাতাসের বাঁশরীর সঙ্গে সঙ্গে বনবেতসের সাবলীল নৃত্যভঙ্গিমা রূপ-পূজারী মানুষের কাছে আবেদন জানায়। তাই মানুষ চায় তার ছন্দে ও সুরে, তার লেখায় ও রেখায়, তার বর্ণবিন্যাসে শাশ্বত করতে এই পলাতক সৌন্দর্যকে। সে ইলোরা ও অজন্তার বুকে আঁকে তার স্বাক্ষর, সে কালির আঁচড়ে কাগজের বুকে রচনা করে মানুষের শাশ্বত প্রণয় আর বিরহ-বেদনার অমর কাহিনী। ছন্দের উজ্জয়িনী আজও মরে নি। কবি-কল্পনা-উজ্জীবিত উজ্জয়িনী আজও বেঁচে আছে হাজারো মনের গহনে। সেখানে মেয়েরা আজও কালো কেশের মাঝে কুরুবকের চূড়া পরে, আজও জীবন সেখানে মন্দাক্রান্তা তালেই চলে। যে যুগের জীবন নিঃশেষ হয়ে গেছে মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপে তাকেই শিল্প শাশ্বত করেছে, অমর করেছে মানুষের স্মৃতির মণি-কোঠায়।

এই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, এক কথায় যাকে আমরা আর্ট বলব, তার সত্যিকারের মূল্য কতটুকু? এই ধরণের মূল্য-বিচারের প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন আমরা প্লেটোর কথা পড়ি; যখন তাঁর মত মনীষী আর্টকে "copy of a copy" অর্থাৎ 'অনুকৃতির অনুকৃতি', নকলের নকল', এই আখ্যা দিয়ে তাঁর আদর্শ 'রিপাবলিক' থেকে নির্বাসিত করতে চান। তাঁর মতে শাশ্বত সত্য হ'ল 'Idea' এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ, হাসিগান-আলো-ভরা, মায়াময়, মধুময় প্রকৃতি সেই আইডিয়ার ছায়ামাত্র। আর্ট আবার প্রকৃতিকে অনুকরণ করে। তাই আর্ট হ'ল অনুকৃতির অনুকৃতি। প্লেটোর মতে 'Art is doubly removed from reality,' —আর্টের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে মহাসত্তার অবস্থান। তাই আর্টে আমরা সত্যের সন্ধান পাই না। আর্টের মধ্যে সত্যের প্রকাশ নেই। তাই আর্ট সত্যের বাহন নয়।

আর্টের মূল্য-বিচারের এই কি শেষ কথা? মহা দার্শনিক প্লেটোর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে আমরা বলব যে আর্টের মূল্য-বিচারের এই শেষ কথা নয়। আর্ট প্রকৃতিকে প্লেটোর অর্থে অনুকরণ করে কিনা সে বিষয়েও মতভেদের অসদ্ভাব নেই। অবশ্য আর্টে প্রকৃতির অনুসরণ অনস্বীকার্য, এ অনুসরণ অন্ধ অনুসরণ নয়, এ হ'ল নূতন করে প্রকৃতিকে সৃষ্টি করা। দার্শনিকেরা যাকে 'mechanical imitation' বলেছেন, এ তা নয়। স্রষ্টার সৃষ্টি যেখানে ব্যাহত হয়েছে জড়পদার্থের জড়ত্বের জন্য, সেখানে শিল্প তাকে পূর্ণ করে তোলে। শিল্পীর ধ্যানে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে, শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টিতে বাস্তব নূতনতর মহিমায় সমৃদ্ধ হয়।

ঠিক এই ধরণের কথাই আমরা শুনি এরিষ্টটলের মুখে; আবার দার্শনিকশ্রেষ্ঠ হেগেলও শুনিয়েছেন ঠিক একই ধরণের কথা। দৃশ্যমান জগতের বাইরে যে নিরালম্ব মহাসত্তার স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন ঘটেছে, তারই অপূর্ণ প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি আমাদের অতিপরিচিত জগতে। আর্ট হ'ল প্রকৃতির মাঝে এই আংশিক ব্যক্ত সত্যকে পরিপূর্ণ রূপদানের প্রয়াস। জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত অবস্থাবৈগুণ্যে জড়জগতের মধ্যে সত্যকে আমরা তার পূর্ণ স্বরূপে পাই না। তাই প্রয়োজন হয় আর্টের। 'Art supplements nature'—আর্ট অপূর্ণ প্রকৃতিকে পূর্ণতর করে। শিল্পীর কাছে, শিল্প-রসিকের কাছে এই হ'ল আর্টের সত্যিকারের পরিচয়। মানুষের আত্মার স্বাক্ষর পড়ে সার্থক শিল্পে। তাই শিল্প বা আর্টের মর্মকথা হ'ল চিন্ময় আত্মার নিগূঢ় মর্মবাণী। প্রকৃতির অগীত সঙ্গীত বিশুদ্ধ তান-লয়ে গীত হয় শিল্পীর লেখা ও রেখায়, সুর ও ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয়ে। 'স্বয়ংপ্রকাশ' (absolute) ভাস্বর হয় শিল্পের বর্ণ-আলিম্পনে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রতিষ্ঠা করে আর্ট। তাই হেগেল বলেছেন, 'Art is the sensuous representation of the absolute' —যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত, সেই মহাসত্তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপদানের প্রয়াসই হ'ল আর্টের মূল কথা, শিল্পের পরম তত্ত্ব।

এখন আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আর্ট শুধু কথা নিয়ে বা রঙ্ নিয়ে, স্বর নিয়ে বা ঢঙ্ নিয়ে খেয়ালী মানুষের বিলাস নয়। আর্টের গোড়ার কথা হ'ল 'রিয়ালিটী' বা পরম সত্যকে প্রকাশ করা। তুলির বর্ণবিন্যাসে, কালির আঁচড়ে বা স্বরের সার্থক সৃষ্টিতে শিল্পী যে ইন্দ্রলোকের প্রতিষ্ঠা করে, তা 'রিয়ালিটি'-মুখী। আমি রিয়ালিটি অর্থে 'বাস্তবতা' বোঝাতে চাই নি। দার্শনিকপ্রবর ব্রাডলির অর্থেই 'রিয়ালিটি' শব্দের ব্যবহার করেছি। পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে মহাসত্তার 'অবাঙ্মনসোগোচর' অবস্থান তাঁর প্রকাশই হ'ল সত্যিকারের শিল্পীর শিল্প-এষণা। আমাদের বাইরের জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনে, বহিরঙ্গের তৃপ্তিসাধনে অথবা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে হয়ত আর্টকে আমরা ব্যবহার করি সাধারণ পণ্যের মত, কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে আর্টের এটা অপচয়ের দিক, অপব্যবহারের দিক। যাকে আমরা 'art in industry' বলি, সেখানে আর্টের প্রকৃত মর্যাদা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়। আর্টের সত্যিকারের প্রয়োজন মানুষের প্রবৃত্তির ক্ষুধা মেটানো নয়। আর্টের এই ধরণের অপব্যবহার লক্ষ্য করে হেগেল বলেছেন,

"In this mode of employment art is indeed not independent, not free but servile."—অর্থাৎ এই ধরণের অপব্যবহারে আর্টের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়, আর্ট অপরের দাসত্বে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। শিল্প-রসিকের আনন্দলোকে উত্তরণের স্বপ্ন নিষ্ফল হয়।

এই প্রসঙ্গে আর্টের ক্ষেত্রে অসুন্দরের (ugly) স্থান আছে কিনা সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলতে চাই। আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে আর্টের ক্ষেত্রে অসুন্দরের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু শিল্প-রসিকের কাছে, শিল্প-সমালোচকের দৃষ্টিতে অসুন্দর অপাংক্তেয় নয়। আর্টের রাজ্যে কেবল 'সুন্দরের'ই (beautiful) একচেটে অধিকার সাব্যস্ত হয়নি। সুন্দরের সঙ্গে আর্টের আত্মিক যোগের কথা এরিষ্টটল স্বীকার করেন না,—

"Aristotle's conception of fine art so far as it is developed is entirely detached from any theory of the beautiful—a separation which is characterstic of all ancient aesthetic criticism."

বুচার এরিষ্টটলের আর্ট সম্পর্কে মতবাদের আলোচনা করতে গিয়ে আরও বলছেন,—

"He makes beauty a regulative principle of art but he never says or implies that the manifestation of the beautiful is the end of art."

আর্টের লক্ষ্য সুন্দরকে রূপদান করা নয়, সত্যকে প্রকাশ করা। সত্যের ব্যাপ্তি কেবলমাত্র সুন্দরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, অসুন্দরের রাজ্যেও তার অবাধ প্রবেশ। তাই ক্রোচ্ প্রমুখ আধুনিক নন্দনতত্ত্ব (aesthetics)-বিদেরা অসুন্দরের দাবিকে অসম্মান করবার অন্যায় স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন নি। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই প্রশ্নের বিচার করতে বসলে আমরাও 'অসুন্দর'কে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার না দিয়ে পারি না। কারণ সুন্দর এবং অসুন্দর, ভাল এবং মন্দ, সকল ক্ষেত্রেই আমরা একই মহাসত্তার প্রকাশ দেখতে পাই। এই মহাসত্তার প্রকাশ যদি আর্টের উপজীব্য হয় তবে আর্টের ক্ষেত্রে সুন্দর এবং অসুন্দর উভয়ের দাবিই হবে স্বতঃস্বীকৃত। অবশ্য ক্রোচ অন্য যুক্তি দিয়ে অসুন্দরকে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলছেন,

"But if the ugly were complete, that is without any element of beauty, it would for that very reason cease to be ugly.···The disvalue would become non-value, activity would give place to passivity."

অর্থাৎ, সহজ ভাষায় বলতে গেলে অবিমিশ্র অসুন্দর জগতে কখনই সম্ভব নয়। তাই আপাত-অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরের স্পর্শ শিল্পরসিক খুঁজে পান। সুন্দরের অলক্ষ্য স্পর্শে অসুন্দরের মধ্যেও যে রূপান্তর ঘটে তা ধরা পড়ে শিল্পীর চোখে। তাই দেখি শিল্পে ও সাহিত্যে সমাজের নীচের তলার অসুন্দর জীবনের কাহিনীও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এ যুগের মনোবিজ্ঞানী মানুষের রসবোধের মূল সূত্রটি অনুধাবন করেছেন সঠিকভাবে। তাই দেখি এ যুগের আর্ট ক্রমেই হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ জীবনের সর্ব স্তরের সর্ব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। 'গণতান্ত্রিক' কথাটি এখানে রাজনীতিগত অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, এর ব্যবহার পুরোপুরি নন্দন-তত্ত্বগত। যা-কিছু বীভৎস, কুৎসিত, অসুন্দর তাই পরিত্যাজ্য নয়। আর্টের রাজ্যে প্রবেশের তারও রীতিমত দাবি আছে। এ কথাটি ফরাসী কবি বোদেলের যেমন সুন্দরভাবে তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝিয়েছেন, এমনটি বিরল। স্বর্গের সৌন্দর্য অনেক কবিই দেখেছেন, মর্ত্যের সৌন্দর্যের কথা শুনিয়েছেন আরো অনেকে, কিন্তু নরকের সৌন্দর্য কয়জনই বা দেখেছেন এবং শিল্পের মাধ্যমে তা আরও দশ জনকে দেখিয়েছেন? অসুন্দরের সৌন্দর্য-সম্ভার রসপিপাসু পাঠকের কাছে বোদেলের অনাবৃত করেছেন কবিচিত্তের সহজ সৃষ্টি-

লীলায়। তাঁর কাব্য পড়ে আমরা বুঝতে পারি ক্রোচের উপরি-উদ্ধৃত উক্তির সার্থকতা।

সার্থক শিল্পীর চোখে সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব নেই। বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্নও সেখানে অবান্তর। যা ঘটে, যা প্রত্যক্ষ, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যাকে পাই, তার চেয়েও বড় সত্য হ'ল আমাদের শিল্প-লোক। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য, জেনো"

কবিগুরুর এই কথা কয়টি শুধু কবির অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসই নয়, এর পিছনে রয়েছে নন্দনতত্ত্বের বিরাট সত্যের ইঙ্গিত। রামায়ণের রামের সার্থক জন্ম হয়েছিল কবির মানসলোকে। বাল্মীকির রামই শাশ্বত; অক্ষয়-জীবনের উত্তরাধিকার কবি তাঁর হাতে অর্পণ করেছেন। আমরা ঐতিহাসিক রামকে জানি না, আমরা চিনি মহাকবি বাল্মীকির কল্পনা-প্রসূত শ্রীরামচন্দ্রকে। বাস্তবের ক্ষণভঙ্গুরতাকে জয় করেছে শিল্পের শাশ্বত মহিমা। মহাকালের নির্দেশকে উপেক্ষা করে আর্ট মৃত্যুকে লঙ্ঘন করেছে,—এই তার অমৃতত্ব লাভের দুরূহ সাধনা।

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পরদিন প্রত্যুষে শ্যামলী ও অঞ্জলিকে চলিয়া যাইতে হইল কারাগারে—বৌমা দিনের পর দিন অন্তঃপুরে ঘোমটা টানিয়া ঘরকন্নার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, গৃহস্থ-ঘরের নম্র সলজ্জ বধূটির মত। শাশুড়ী জানেন বৌমা তাঁহাদের লক্ষ্মী বৌ—তবে স্নান করিতে গিয়া আংটি হারাইয়াছে এই তাহার একমাত্র ত্রুটি।

মীরার শব পাওয়া যায় নাই—তাহার মৃতদেহের কি গতি হইয়াছে কেহ জানে না।

প্রত্যুষে খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে মা নাই। সকালে খাইতে না দিয়া মা কোথায় গেল? হয়ত ঘাটে—সে ঘাটে গিয়া খুঁজিয়া আসিল—মা সেখানেও নাই।

ঘরে মুড়ির কলসী খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু সব এমন অগোছালো হইয়া রহিয়াছে যে কিছুই পাওয়া গেল না। সে অভিমান-স্ফুরিত অধরে খানিক বসিয়া রহিল,—মা মা বলিয়া ডাকিল, কেহ সাড়া দিল না—

অকস্মাৎ সে চাহিয়া দেখে মাষ্টারনী পিসিমা পাশেই দাঁড়াইয়া।—পিসিমা বলিতেছে—খোকা এদিকে আয়, সন্দেশ খাবি—

খোকা আগাইয়া আসিয়া সানন্দে সন্দেশ খাইয়া লইল। প্রশ্ন করিল, মা কোথায়?

মিস্ রায়ের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল, তিনি নিবিড় আলিঙ্গনে খোকাকে বুকে চাপিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না—চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

—মা কোথায়?

—কলকাতা,—আসবে। চল তুমি আমার কাছে থাকবে—

—কবে আসবে—

—চিঠি দেবে, তারপরে আসবে—

দপ্তরী ঘরে তালা দিতেছিল, খোকা তাই প্রশ্ন করিল, ঘরে তালা দেয় কেন?

—তুমি আমার কাছে থাকবে যে! কত বই দেব—যাবে?

খোকা কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিল, অসহায়ের মত মিস্ রায়ের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল—হুঁ।…

সে আজ কি হারাইয়াছে, কেন হারাইয়াছে তাহা জানে না—পিসিমার পিছনে পিছনে সে উল্লাসের সহিতই চলিল। পিসিমা সন্দেশ দিবে বলিয়াছে অতএব আর দুঃখের কি আছে।

তবুও পিছন ফিরিয়া একবার বোধ হয় দেখিল, মা কোথায়।

রঞ্জন আর মণিবাবু বলিলেন, খোকার আর এমন কষ্ট কি? মেজমার কাছে ভালই থাকবে—

অনেকে বিদ্রূপের হাসি হাসিল, অনেকে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কেহ 'আহা' বলিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিল—কিন্তু তাহাদের সকলেরই জীবনযাত্রা আগের মতই চলিতে লাগিল একান্ত নিশ্চিন্তে।

পৃথিবীর আবর্ত্তন চলিয়াছে আপনার অক্ষকে কেন্দ্র করিয়া একই ভাবে, একই নিয়মে, দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম, মাস-বর্ষ সৃষ্টি করিয়া।

তাহার মাঝে একটি বিশেষ চিহ্নিত দিন ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ।

শচীনবাবু এই বিশেষ দিনটির কয়েক মাস পূর্ব্বে জেল হইতে বাহির হইয়াছিলেন। সত্য, ধলা প্রভৃতিও ছাড়া পাইয়াছিল, অঞ্জলি, শ্যামলী অনেক আগেই মুক্তি পাইয়াছে। শচীনবাবু মীরার মৃত্যুসংবাদ জেলেই পাইয়াছিলেন। প্রথমে চোখের জল ফেলিয়াছিলেন, পরে ভাবিয়া ভাবিয়া বিস্মিত হইতেন অত্যন্ত ভীরু লজ্জাশীলা মীরা এমনি করিয়া জীবনাহুতি দিবার সাহস কোথা হইতে কেমন করিয়া পাইল। অত্যাচার ও লাঞ্ছনাই যে তাহার সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়াছিল তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না।

মিস্ রায় নানারূপ অশান্তি ভোগ করিয়া কপালে কলঙ্কের টীকা পরিয়া স্থানান্তরে চাকুরি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন—খোকা তাহার এক দূরসম্পর্কীয় মাসীর বাড়ীতে কয়েকটি বৎসর অত্যন্ত অসহায়ের মত কাটাইয়া দিয়াছে। শচীনবাবু আসিয়াই তাহাকে লইয়া আসিয়াছেন—এখন তিনি সপুত্র স্কুল-বোর্ডিঙে থাকেন। বাসায় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই অর্থাৎ তখন তিনি নিঃসম্বল।

শহরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে যে-কোন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিতে পারে, এই আশঙ্কা সকলের মনকে উদ্বেগে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। শচীনবাবু কিভাবে নিজ সম্প্রদায়ের লোকেদের বাঁচানো যায় তাহারই উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় স্বাধীনতা দিবস ঘোষিত হইল, চারিপাশে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

১৫ই আগষ্ট। কলিকাতা বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত, নরনারী আনন্দে উৎফুল্ল, বাসে ও ট্রামের মাথায় চলিতেছে লোকেদের তাণ্ডব নৃত্য—সেই দিনের কথা।···

ওদিকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মফস্বল শহরেও আনন্দের সাড়া পড়িয়াছে। স্কুলের ময়দানে জনসভা হইবে—পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলনের পরে সুরু হইবে পতাকা-অভিবাদন ও বক্তৃতার পালা। কংগ্রেস-নেতা শচীনবাবুকে পতাকা উত্তোলনে উপস্থিত থাকিবার অনুরোধ তথা আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সত্যও থাকিবে। শচীনবাবু বক্তৃতা করিবেন। সত্যকেও কিছু বলিতে হইবে। এর আসল তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, তাহাদিগকে পাকিস্থানের প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে।

মাঠে লোক-সমাগম হইয়াছে প্রচুর, এত লোক বহু দিন এখানে একত্র সমবেত হয় নাই। খোকা বাবার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে এখন বড় হইয়াছে, সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার মা মারা গিয়াছেন; বন্দেমাতরম্ আসলে কি তাহাও সে কিছু কিছু বুঝে। তাহার বয়স আট—আগেকার সেই সুন্দর ফুটফুটে চেহারা আর নাই, অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে।

শচীনবাবু প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, সত্যও আপত্তি জানাইয়াছিল, কিন্তু লীগের কর্তৃপক্ষের যুক্তি অন্যরূপ। কংগ্রেস-নেতাগণই লীগবিরোধী, তাঁরা যদি আজ সভায় অকুণ্ঠ আনুগত্য স্বীকার না করেন তবে তাঁরা দেশদ্রোহী প্রমাণিত হইবেন এবং দেশদ্রোহীর পক্ষে শাস্তি যে অনিবার্য্য তাহা না বলিলেও বুঝা কঠিন নয়। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত রাজী হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহাদের বার বার বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল—এইজন্যই কি তাঁহারা এত কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়াছেন। এইজন্যই কি মীরা মরিয়াছে? মাতৃহারা খোকা কি বাঁচিয়া আছে এই আনুগত্যের জন্য। মীরার বুকের রক্তে মৃত্তিকা রঞ্জিত হইয়াছিল কি এইজন্যই!

বিরাট জনসভা।

হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছে পাকিস্থানের স্বাধীনতা-উৎসবে। এক পাশে দাঁড়াইয়া আছেন সেই বীরবৃন্দ, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন একদা যাঁহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাদের অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে পরাজয়ের বেদনায়, মুখে আনুগত্য স্বীকারের কৃত্রিম হাসি দিয়া তাহা ঢাকিবার একটা নিষ্ফল প্রয়াস তাঁহাদের অবস্থাকে অধিকতর শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছে—কি আর করবেন, দেশে যখন থাকতে হবে!

শচীনবাবুকে পতাকার নীচে লইয়া যাওয়া হইল—সেখানে মঞ্চ বাঁধা হইয়াছে। সত্য তাঁহার পাশে পাশে চলিয়াছে। আজ উহাদের বড় প্রয়োজন শচীনবাবু ও সত্যকে দিয়া বক্তৃতা করানো, কারণ তাহারই মাঝে পরিতৃপ্ত হইবে তাহাদের নিষ্ঠুর অনুদার বিজয়োল্লাস।

হাজার হাজার কণ্ঠে জিগীর উঠিল—পাকিস্থান জিন্দাবাদ। সকলে সমবেতকণ্ঠে আনুগত্য স্বীকার করিল।

শচীনবাবু বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—ভাইসব, আজ বড় শুভ-দিন···কিন্তু তাঁহার অন্তর বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠ তাঁহার রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না—বার বার মনে হইতেছিল মীরা কেমন করিয়া খোকাকে ফেলিয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়া উত্তপ্ত সীসক-গোলক তাহার কোমল বুক ভেদ করিয়া গিয়াছিল, উষ্ণ রক্তে পৃথিবী আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সে গুলিবিদ্ধ দেহ কেহ দেখে নাই, তাহার কোনো সন্ধান কেহ পায় নাই—সেই শবদেহকে কেহ বিজয়-মাল্য ভূষিত করে নাই।

শচীনবাবু অতি কষ্টে হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া কোনো-মতে বক্তৃতা শেষ করিয়া কহিলেন, আর একবার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হউক,—পাকিস্থান জিন্দাবাদ। সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইল।

এই সময়ে মঞ্চের এক প্রান্তে একটা সোরগোল উঠিল, শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল "বন্দেমাতরম্" এবং তার পরক্ষণেই

মহাত্মা গান্ধী
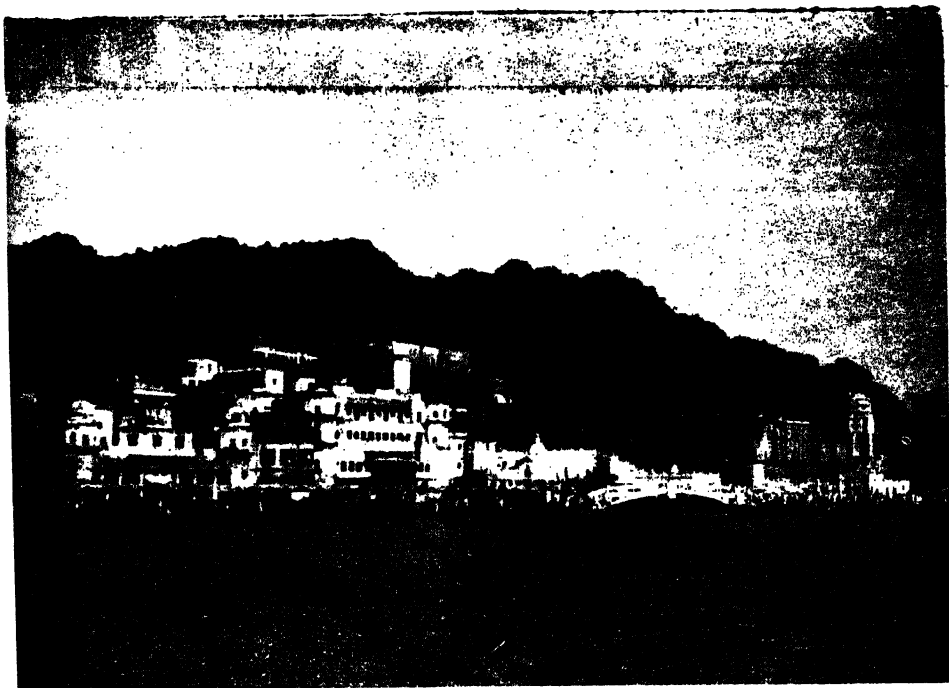
গঙ্গাবক্ষ হইতে হরিদ্বার শহরের দৃশ্য। পশ্চাতে শিবালিক পাহাড়শ্রেণী

হরিদ্বারের সাধারণ দৃশ্য

একটা আর্ত্ত কণ্ঠের চীৎকার শচীনবাবুর কানে আসিয়া পৌছিল। কণ্ঠস্বর পরিচিত যেন খোকার—

তিনি ছুটিয়া গেলেন সেখানে—দেখেন মঞ্চের নিয়ে খোকা পড়িয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছে, কয়েকজন যুবক তাহাকে ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে কেবল চীৎকার করিতেছে—বাবা! বাবা! শচীনবাবু ছুটিয়া গেলেন, খোকাকে তুলিয়া দেখেন তাহার বামহাতের কনুইয়ের যেন হাড় সরিয়া গিয়াছে। সত্যও আসিল, তাঁহারা দুই জনে খোকাকে লইয়া ভিড়ের বাহিরে আসিলেন। তখন একজন স্থানীয় মৌলবী উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ইস্‌লাম ও পাকিস্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

শচীনবাবু আহত পুত্রকে কোলে করিয়া চলিয়াছেন নির্ব্বাকভাবে। সত্য পিছু পিছু চলিয়াছে।

—কে ওকে ফেলে দিলে সত্য!

সত্য মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, ও পাকিস্থানের শ্লোগান না বলে বন্দেমাতরম্ বলেছিল বলে কোন অত্যুৎসাহী যুবক ওকে ধাক্কা মারে—তার পর পড়ে গিয়ে—

নীরবে দুই জনে আরও কিছুক্ষণ চলিলেন। ভাবিতে ভাবিতে শচীনবাবুর হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, ওর মা চলে গেছেন, আর আমি বেঁচে রইলুম কি এই দেখতে?

শচীনবাবু সত্যর পানে চাহিলেন। সত্য নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া আছে মাটির দিকে—সে অপরাধীর মত বলিল, নলিনীবাবুকে ডেকে আনছি আমি। হয়ত হাড় মচকে গেছে—

সত্য উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল।

খোকার হাতটা ক্রমশ: সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু একটু বাঁকা হইয়া রহিল। স্কুলের পরে শচীনবাবু হোষ্টেলের বারান্দায় বসিয়াছিলেন, সত্য আসিয়া প্রণাম করিল। শচীনবাবু বলিলেন, বসো। খোকার হাতটা একটু বাঁকা হয়েই রইল—আমাদের আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ!

—আপনি রিজাইন দিয়েছেন শুনলাম।

—হ্যাঁ।

—তারপর কি করবেন?

—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা পেলেই চলে যাব দেশে, সেখানকার জমি বিক্রী করে যদি কিছু পাই পেলাম না পাই ওই নিয়েই চলে যাব পশ্চিম-বাংলায়। সেখানে গেলে তবু একটা সান্ত্বনা পাব যে, স্বাধীন ভারতে বাস করছি—যে স্বাধীনতার জন্যে ওর মা প্রাণ দিয়েছেন···

—সেখানে কত লোক গেছে, যাবে। সেখানে গিয়ে কি বাড়ীঘর, চাকরি-বাকরি পাবেন? কংগ্রেস যেতে বারণ করছে—এত আশ্রয়প্রার্থীর জায়গা নাকি সেখানে হবে না।

শচীনবাবু উদাসভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, চাকুরী বা বাড়ীঘরের আশায় যাচ্ছি না—যদি নেহাত মরতে হয় তা হলে খোকার মা যে পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছে, সেই পতাকা যেখানে উড্ডীন সেখানেই মরতে চাই। নিত্য এই পরাজয়ের গ্লানি, এই অসম্মান, এই ভয় নিয়ে বাঁচা চলে না, এমনি দুর্ভর জীবন বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া ভাবছি খোকার কথা—সে বড় হয়ে যখন জানবে সব ইতিহাস তখন এই স্থানের আবহাওয়া তার জীবনকে দু:সহ করে তুলবে···

সত্য চুপ করিয়া রহিল। শচীনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কোন তর্ক করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে কহিল, আমাদের এই অন্তর নিয়ে—যারা এক দিন সত্যই ভালবেসেছিল···

শচীনবাবু তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন, কেন? তুমি যাবে না?

—যাব, আর একটু দেখে যেতে চাই।

—এ কেবল আরম্ভ, এখন এই লাঞ্ছনা উত্তরোত্তর বাড়বে। যারা এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারবে তারা থাকবে—সব দেশেই এমন লোকের অভাব নেই যারা সকল অবস্থার সঙ্গেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যাদের সহনশীলতা অপরিসীম। কাজেই সকলে যাবে না—যারা এক দিন দেশের জন্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই আবার নাম-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তির মোহে নিজেদের আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না। ঐ শ্রেণীর লোকের স্বভাব এই। ইতিহাসে দেখা যায়, যুগে যুগে এক দল লোক নিজেদের দেহের রক্তে পৃথিবীর বুক সিক্ত করে দিয়ে যায় আর এক দল লোকের জন্যে—তারা সেই রক্তপুষ্ট উর্ব্বর ধরিত্রীর বক্ষ থেকে ক্ষরিত অমৃত পান করে। তোমরা প্রথমোক্ত দলের, সত্য—পতঙ্গধর্ম্মী; আগুন দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা তোমাদের পুড়তে উৎসাহ দিয়ে পেছনে থাকবে ফলভোগ করতে। এটাই জগতের ইতিহাসের ধারা।

শচীনবাবু গভীর অভিমানে চুপ করিলেন। হঠাৎ যেন তিনি বুঝিতে পারিলেন, আপনার খেয়ালে তিনি অপ্রাসঙ্গিক কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। সত্য চিন্তা করিতেছিল—শচীনবাবু কি বলিলেন, তাঁহার কথাগুলির আসল তাৎপর্য্য কি?

খোকা সামনের উঠানে লাট্টু ঘুরাইতেছিল। সত্য অনেকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, একটা কথা বলব স্যর!

—বল।

—আপনাকে কোন কথা বলতে আজকাল যেন ভয় হয়।

—কেন ?

—জানি না, তবে হয়। আপনি এমন ভাবে কথা বলেন যার উপর তর্ক চলে না। আপনার দুঃখ···কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে থামিল।

শচীনবাবু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, ভয় কি বল ?

—আপনার মত শিক্ষিত লোক যাঁরা এখানকার হিন্দুদের আশাভরসা তাঁরা যদি এখান থেকে চলে যান তবে অশিক্ষিত হিন্দুজনসাধারণ তো একান্ত নিরুপায় হয়ে ভবিষ্যতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারে—এমনি ভাবে তো এখানে হিন্দুর সত্তাই লোপ পেয়ে যেতে পারে।

শচীনবাবু বলিলেন, ওটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যেদিন তোমরা না খেয়ে, রোগে ভুগে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের আহ্বান করেছিলে সেদিন ত তারাই তোমাদের ধরিয়ে দিতে গিয়েছে—তারা তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লীগের সঙ্গে মিতালি করেছিল, সেদিন একথাই তারা বলেছিল কংগ্রেস বর্ণ-হিন্দু প্রধান। বর্ণ-হিন্দুর অত্যাচার ও ঘৃণা সহ্য করা অপেক্ষা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ শ্রেয়। তবে আজ তাদের কথা চিন্তা করে কি লাভ হবে। ব্রাহ্মণে চণ্ডালের অন্ন খেয়েও তার প্রীতি পায় নি, সহানুভূতি পায় নি—তার অন্তরকে জাগাতে পারে নি—

—সে জন্যে দায়ী তাদের শিক্ষার অভাব ও স্বার্থান্বেষীর প্ররোচনা। তারা ত দায়ী নয়।

—না জেনে বিষ খেলেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। অজ্ঞতার জন্যে বিষের ক্রিয়া বন্ধ থাকে না।

—এটা অভিমানের কথা স্যর, যুক্তির কথা নয়—

শচীনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, হয়ত নয়, তবে তাদের প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করার জন্যে অপেক্ষা করার সময় আমার নেই। সে ধৈর্য্যও নেই। আমার বয়স হয়েছে, খোকাকে আমি উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চাই—তোমরা অপেক্ষা কর, চেষ্টা কর। তরুণ মনের উদারতা নিয়ে আর একবার চেষ্টা কর।

শচীনবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে সত্য বলিল, তা হলে আপনি যাচ্ছেন স্যর ?

—হ্যাঁ, যথাসম্ভব শীঘ্রই যাব। তোমরাও যাবে, তবে কিছুদিন পরে। এখানে যখন মনে প্রাণে আনুগত্য স্বীকার করতে পারবে না, এদেশকে নিজের বলে ভাবতে পারবে না, তখন যাবে—

—যেখানেই যান, চিঠিপত্র দেবেন স্যর। দিদি কলকাতায়ই আছে। সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে একবার যাব—

শচীনবাবু বলিলেন, তোমার সে গচ্ছিত জিনিষটা তার কাছেই ছিল, তারপর কি হয়েছে জানি না—

—আমি জানি। ফেরত পেয়েছি—আপনি চিন্তিত হবেন না। সত্য প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—

শচীনবাবু দূরের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। সান্ধ্য-ক্লাব আজও আছে, কিন্তু বৈঠক নিয়মিত বসে না, শচীনবাবু ক্লাবের উদ্দেশ্যেই রওনা হইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন।

শচীনবাবু চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া দেশে আসিলেন।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের শ' পাঁচেক টাকা মাত্র সম্বল, তাহার উপর বেশী দিন নির্ভর করা চলে না। মহকুমা শহর হইতে মাইল চৌদ্দ দূরে তাঁহাদের বাড়ী, পৈতৃক বাড়ী ও জমিজমার তিনি কয়েক আনা অংশীদার, তাহাতে তাঁহার বিঘা দশেক জমি ও দালানের একটা কোঠা ছিল, আর একখানা টিনের ঘর তিনিই তুলিয়াছিলেন ; পূজা ও গ্রীষ্মের বন্ধে আসিয়া মাঝে মাঝে থাকিতেন। বাল্যকালে এই বাড়ীর প্রাঙ্গণের ধূলা গায়ে মাখিয়া তিনি বড় হইয়াছিলেন, উঠানের এক প্রান্তে তাঁহারই মায়ের স্বহস্তে রোপিত একটা নারিকেল গাছে সবে ফল ধরিয়াছে। বাল্য-কৈশোর-যৌবনের শত স্মৃতিবিজড়িত এই বাস্তুভিটা,—এই পৈতৃক ভিটার উঠানেই নবোঢ়া মীরা তাঁহার পাশে প্রথম দাঁড়াইয়া গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিল। উহারই এক কোণে তাঁহার পিতার মৃতদেহের পাশে গঙ্গাজলি হইয়া-ছিল, এমনি কত স্মৃতি মনের মাঝে ভিড় করিয়া আসিতেছিল। তাঁহার মনে অতীতের শত স্মৃতি যেন জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল—এখানে তাঁহার মা বসিতেন, ওখানে বসিয়া মীরা কুটনা কুটিত, ওখানে বসিয়া তিনি খোকার ভাতের মন্ত্র পড়িয়াছিলেন। পিতৃ-পিতামহের পদরেণুকণাপূত এই বাস্তু-ভিটাকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের মত চলিয়া যাইতে হইবে—একথা ভাবিতেই যেন তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিত—বার বার বলিতেন, বিধাতা কোন্ পাপে এমনি করিয়া সুখের স্বর্গলোক হইতে আমায় বঞ্চিত করিলে। ইহার প্রতি ধূলিকণা, ইহার প্রতি বৃক্ষ, পত্র, সব যেন তাঁহার একান্ত আপনার—এ সব ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন ? কোথায়—

যে অভিমান ও জ্বালা লইয়া শচীনবাবু আসিয়াছিলেন তাহা যেন ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল—মাঝে মাঝে মনে হইত না হয় নাই গেলাম, আমার জীবনটা না হয় এখানকার ধূলিকণায়ই এক দিন মিশিয়া যাইবে, তাহার পর খোকা যেন তাহার যেখানে খুশি সেখানে আপনার ঘর বাঁধে।

মায়ের রোপিত বৃক্ষ, পিতার স্বহস্তনির্ম্মিত আসবাবপত্র, মীরার তৈরি রান্নাঘরের মৃত্তিকার জলপিঁড়ি সবকিছু একসঙ্গে যেন তাঁহার মনকে দুর্ব্বার ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল—এই একান্ত আপনার গৃহ ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন, কোন্

সুদূরে? সে যেন মৃত্যুর পরপারের অজ্ঞাত দেশ, একান্তই অপরিচিত।

মীরার মৃত্যু-সংবাদ গ্রামে নানা মুখে নানা রূপে পল্লবিত হইয়া রটিয়াছিল। কেহ বলিত মীরা লড়াই করিয়া মরিয়াছে, কেহ বলিত সে পুলিসের গুলিতে মরিয়াছে, কেহ বলিত অন্যরূপ।

গ্রামের লোকজন শচীনবাবুকে বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া মনে করিত। তাহারা দুই চারি জন ব্যাকুল ভাবে শচীন বাবুকে প্রশ্ন করিল—বল ত, শচীন কি করি? দেশে কি থাকা যাবে? এত দিনের বাস্তুভিটা কি ত্যাগ করতে হবে!

বৃদ্ধ তারিণী চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন—এই বুড়ো বয়সে কোথায় যাব শচীন? সামান্য দুই-এক ঘর যজমান ও দু-চার বিঘে জমি আমার এই নিয়ে কোনমতে আছি—এখন কি করব?

শচীনবাবু নীরব। এ সব প্রশ্নের উত্তর নাই—তার উত্তর নিহিত আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। এই সব প্রশ্নের উত্তরে শচীনবাবু তাই নীরবই রহিলেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন—এরা কি কেবল অত্যাচারই করবে—এত দিনের প্রেমপ্রীতি, বিশ্বাসের কোন মূল্য দেবে না—যে সব হিন্দু-পরিবারের গৃহিণীদের মা বলে ডাকে তাদেরও অপমান করবে।

এই সব কাতরোক্তির পিছনে রহিয়াছে বাস্তুভিটা আঁকড়াইয়া থাকিবার একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া ভাবপ্রবণ অন্তর অপ্রত্যক্ষ আশার উপর নির্ভর করিতে চাহিতেছে।

তারিণী খুড়ো কহিলেন—যে সমস্ত ছোকরা মুখ তুলে কথা বলে নি, বলতে সাহস পায় নি—ফটে, গোদো, ছামাদ সর্দ্দার, সব্বা, আহ্লাদ—তারা ভটচায্যিদের পুকুরঘাটে বসে শুনিয়ে শুনিয়ে নাম ধরে ধরে বলে, অমুককে বিয়ে করব, অমুকের বৌকে নিকে করব। স্বকর্ণে এ সব কথা শুনে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু মুখ বুজে থাকতে হয়, প্রতিবাদের সাহস নেই। তারা বলে···

তারিণী খুড়ো কি বলিতে যাইয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন—প্রসঙ্গটা একান্ত বেদনাদায়ক। তাঁহার কুমারী কন্যা বাসন্তী সুন্দরী সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে পাত্রস্থ করা সম্ভব হয় নাই—তাহাকে উহারা জোর করিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে—তারিণী খুড়ো তাই সর্ব্বদা সচকিত আতঙ্কে কালাতিপাত করিতেছেন।

শুনিয়া শচীনবাবু ব্যথিত হইলেন, কিন্তু করিবার কিছু নাই—পুলিসে সংবাদ দিয়া লাভ নাই, বিপরীত ফল হইতে পারে।

শচীনবাবু বলিলেন—আমার মনে হয় সংসারে দুই রকমের লোক আছে। একদল যারা বেঁচে থাকাটাকেই বড় মনে করে, তার জন্যে সম্মান আত্মমর্য্যাদা বিবেকবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নিজের, সমাজের ও দেশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। যারা প্রথম শ্রেণীর তারা যাবে না, যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা যাবে—বেঁচে থাকতে নয়, মরতেই। কিন্তু ভাবছি এত লোকের ব্যবস্থা কে করবে, তা ছাড়া সেখানে চোরা-কারবারী আর সুবিধাবাদীরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে।

—তুমি কি যাবে?

—হাঁ, যাবই স্থির করেছি, এই গ্লানি ও অসম্মানের মাঝে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমার কি আছে? কোন্ আকর্ষণে থাকব?

—তারিণী খুড়ো বলিলেন—তোমার কি শচীন, বিদ্যেবুদ্ধি আছে, যেখানেই যাবে ভগবানের কৃপায় অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে নিতে পারবে, কিন্তু আমরা—

—একই কথা খুড়ো—সেখানে আমার মত বিদ্বান লাখো লাখো আছে। যাবেও অনেকে। কাজেই সমস্যার কোনও সমাধান হবে বলে মনে হয় না। তবে—না বাঁচতে পারি মরব তাতে আমার দুঃখ নেই—

আলোচনা চলে, কিন্তু কিছুই মীমাংসা হয় না—আলোচনা সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে তাঁদের অধিকতর সচেতন করিয়া তোলে মাত্র। সকলেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হন।

জমির খরিদ্দার সংগ্রহের চেষ্টায় সে দিন শচীনবাবু বৈকালে বাহির হইলেন। হিন্দু খরিদ্দার নাই, মুসলমান ছাড়া কেহই জমি কিনিবে না। পরিচিত দুই-চার জন মুসলমান মাতব্বরের কাছে কথাটা প্রকাশ করিলে হয়ত ক্রেতা জুটিতে পারে।

কিন্তু পথে যাইতে যাইতে একটা ঘটনায় তাঁহাকে থামিতে হইল। ভট্টাচার্য্যরা পুরাতন বর্দ্ধিষ্ণু ঘর, গ্রামের সকলেই তাঁহাদিগকে ভয়ভক্তি করিয়া চলে; সেটা তাঁহাদের অর্থের জন্যই নয়, তাঁহারা পরোপকারী ও একমাত্র তাঁহাদেরই চেষ্টায় ও অর্থে গ্রামে যাহা কিছু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে সেইটাই প্রধানতম কারণ।

কে একজন নিষেধ না মানিয়া তাঁহাদের পুকুরে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে, প্রতিবাদ গ্রাহ্য করে নাই। ফলে একটা বচসা চলিতেছিল।

—তুমি জোর করে দিনদুপুরে মাছ ধরে নিয়ে যাবে ?

মুসলমান যুবকটি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে না, জোর করব কেন ? এত দিন আপনারাই ত সব ভাল মন্দ খেয়েছেন, এখন পাকিস্থান হয়েছে আমরাও একটু খেয়ে নি—এর মধ্যে জোরজবরদস্তির তো কিছুই নেই।

সে নির্ব্বিকার চিত্তে ছিপ তুলিয়া টোপ পাল্টাইয়া ধীরে সুস্থে পুনরায় মৎস্যশিকারে মনোনিবেশ করিল। ভট্টাচার্য্য মশায় বলিলেন—দেখ শচীন কথার ছিরি, এদের জন্যে ইস্কুল হাসপাতাল করেছি আমরা।

শচীনবাবু কহিলেন—পাকিস্থান হয়েছে তার মানে কি এই যে, হিন্দুর সব কেড়ে নেওয়া যায়—স্বাধীন হওয়ার অর্থ কি তাই ?

—আজ্ঞে না, তবে ধরুন আপনাদের খেয়েই ত আমরা আছি—আপনাদের খেয়েই থাকব—দু'একটা মাছ ধরলে আর আপনাদের কি ক্ষতি ?

—সকলেই যে ধরতে চাইবে—

—আজ্ঞে তাই ঠিক হয়েছে, কাল জাল নিয়ে সকলেই আসবে আমি একটু আগেই এসেছি।

—তা হলে সোদা কথা তুমি উঠবে না, মাছ ধরবেই।

—উঠব বৈ কি মাছ পেলেই উঠব।

শচীনবাবু বুঝিলেন বাদানুবাদে লাভ নেই—যুবকটির কথা বলিবার ভঙ্গীতে তেমনি ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্য সুপরিস্ফুট। তিনি কহিলেন—এখানে বাস করতে হলে এ ধরণের অত্যাচার সহ্য করতেই হবে—

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন—সেদিন কথা নেই, বার্ত্তা নেই—দেখি দু'জন নারিকেল গাছে উঠেছে, জিজ্ঞাসা করলে ঠিক এমনি জবাব দিলে—এখন আপনাদেরই ত খাবো—অর্থাৎ এখন ওরা ইচ্ছামত আমার তোমার সবকিছুই খাবে, নেবে, এতে প্রতিবাদ করা চলবে না—

শচীনবাবু কহিলেন—তাই ত দেখছি—

তিনি ফিরিয়া আসিলেন, আজিকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার অন্তরে আর কোনরূপ দ্বিধা রহিল না—যত শীঘ্র সম্ভব এইস্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত।

ও ছেলেটিকে তিনি জানেন—ও প্রাইমারী পাস করিয়া কয়েক বৎসর মাদ্রাসায় পড়িয়া মৌলবী হইয়াছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিতে কলুষিত ওর মন।

শচীনবাবুর মনে নানা চিন্তার উদ্রেক হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—সকল দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে। কিন্তু তাদের অবস্থা এত শোচনীয় নয়। কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত জনসাধারণ—এদের বিশ্বাস করা চলে না—এদের ভালমন্দ বিচার-শক্তি নাই। তাহাদের উগ্র প্রবৃত্তি কখন যে উৎকট উল্লাসে জাগিয়া উঠিয়া চরম সর্ব্বনাশ সাধন করিবে তাহার ঠিক নাই। এই অনিশ্চয়তা, এই অসম্মানেরও মাঝে মানুষ বাস করিতে পারে না।

ঘটনাটা হয় ত সামান্য, কিন্তু তাহা বাস্তুভিটার প্রতি শচীনবাবুর আসক্তিকে দূর করিয়া দিল। তিনি পূর্ণোদ্যমে বাস্তু ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শচীনবাবু কিছু জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন জলের দরে। বিঘা প্রতি দর হয় ত ছয় শত, তিনি তাহা তিন শত টাকায় দিয়া দিলেন। অর্দ্ধেক জমি বিক্রয় করিয়া কোনরূপে বার শত টাকা সংগ্রহ করিলেন। পাড়ার সকলে হা হা করিয়া উঠিল—মাটি-ই সোনা, সোনা চুরি যায়, কিন্তু এ কখনো চুরিও হয় না, জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, তাকেই তুমি এমনি করে নষ্ট করছ—

তারিণী খুড়ো এক দিন কহিলেন—তোমার বাবা পেটে গামছা বেঁধে এই ক' বিঘা জমি করেছিল—সে চলে গেছে, তাকে এ দৃশ্য দেখতে হ'ল না। কিন্তু আমি যে সহ্য করতে পারছি না। তোমার বাবার সে কি টান, কি ভালবাসা ছিল এই জমির উপর—বৃদ্ধ তারিণী খুড়ো অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

শচীনবাবুর হৃদয়ের কোমলতম স্থানে বার বার আঘাত করিয়া তাহার মনকে এঁরাই দুর্ব্বল করিয়া দিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—ইচ্ছা করে ত করছি না, কিন্তু এর মাঝে কেমন করে থাকি ?

বাকী জমির খরিদ্দার স্থির হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তাহারা সকলেই জমি কিনিতে অস্বীকার করিল। কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল মৌলবী মাতব্বরগণ প্রচার করিয়াছেন যে, হিন্দুরা চলিয়া গেলে জমি বিনা পয়সায়ই পাওয়া যাইবে—অতএব টাকা দিয়া কেনা নিরর্থক। তাহার কথায় মুসলমানেরা বিনা মূল্যে ভূমিলাভ করিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া হিন্দুদের প্রস্থানের অপেক্ষায় আছে।

শচীনবাবু অতঃপর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে তৎপর হইলেন ! ঘটি বাটি পিঁড়ি খাট, পালঙ্ক, আলমারী চেয়ার টেবিল—পুরুষানুক্রমে বাড়ীতে কত জিনিষই না সঞ্চিত হইয়াছে ! তিনি টিনের ঘরখানিও বিক্রয় করিয়া দিলেন।

এমনি করিয়া আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ হইল।

একটু ঠাণ্ডা লাগিয়া শচীনবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। জ্বর সামান্য, কিন্তু ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা। দালানে শুইয়া ছিলেন। খোকা তাহার সাধ্যমত পরিচর্য্যা করিতেছিল।

সেদিন টিনের ঘরের ক্রেতা মিস্ত্রি ও লোকজন লইয়া চালের টিন খুলিতে আরম্ভ করিল—টিনের উপর হাতুড়ির

আঘাতের শব্দ হইতেছে অত্যন্ত তীব্র। প্রতিটি আঘাতের শব্দে মনে হইতেছে যেন তাঁহার মাথায় হাতুড়ি পিটিতেছে। আওয়াজ অসহ্য হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই।

শচীনবাবু চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন—এক একখানা টিন খুলিয়া পড়িতেছে, বেড়া অপসারিত হইতেছে···

মনে পড়িল, তিনি নিজে মিস্ত্রির সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া এইগুলি করিয়াছিলেন, কত শ্রমে কত যত্নে কত আশা-উদ্দীপনা লইয়া। তাঁহার মায়ের ও মীরার সযত্ন পরিমার্জ্জনে ঘরদোর যেন পবিত্র হইয়া উঠিত। দীর্ঘকালের স্মৃতিবিজড়িত পিতামহী-জননী-গৃহিণীর কল্যাণকরস্পর্শপূত সেই বাস্তুভিটা শূন্য হইতে চলিয়াছে।

শচীনবাবুর বুকের মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিল—কোথায় স্বর্গতা মাতা, কোথায় মীরা? তাঁহাদের অন্তরও কি আজ এমনি হাহাকার করিতেছে?

টিনের উপর অবিরত হাতুড়ির আওয়াজ যেন সরাসরি একেবারে মাথার ভিতরে গিয়া ঢুকিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বার বার চোখ ভরিয়া জল আসিতেছে।

শচীনবাবু ব্যাকুল ভাবে কহিলেন, খোকা, ওদের একবার ডাক্, উঃ! আর ত পারি না।

খোকা ডাকিয়া আনিল। ক্রেতা নিজেই আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

শচীনবাবু ব্যগ্রভাবে কহিলেন, বড় মাথা ধরেছে, হাতুড়ির শব্দ সহ্য হচ্ছে না, আর এক দিন না হয় ভাঙতে—

—এতগুলি লোক এনেছি।

—আমি দু'চার দিনের মধ্যেই চলে যাব, তার পরেই না হয় ঘরখানা নিয়ে যেতে—

—এতগুলি লোকের মজুরী খামোকা দিতে হচ্ছে—তাতে ঘর কিনে আমার লোকসান হয়েছে—

শচীনবাবু কহিলেন, লোকসান হয়েছে?

—হ্যাঁ, সবাই বলছে, আর দুই-চার মাস পরে এরকম ঘর এমনিই পাওয়া যাবে—আর তা যদি নাও হয় তা হলে বিশ-পঞ্চাশ টাকায় তো নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে!

শচীনবাবু হতাশভাবে পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। লোকটি সান্ত্বনা দিবার সুরে কহিল, এই ত হয়ে গেছে, একটু কষ্ট করে থাকুন—

শচীনবাবু শুইয়াই রহিলেন—ঘরের টিনগুলির সঙ্গে সঙ্গে বুকের পাঁজরগুলিও যেন খুলিয়া পড়িতেছে। নিদারুণ বেদনায় উৎসারিত অশ্রু গোপন করিতে তিনি বিছানায় মুখ গুঁজিয়া মৃতের মত পড়িয়া রহিলেন।

সুস্থ হইয়া শচীনবাবু দেরী করিলেন না। একটা শুভদিন দেখিয়া নৌকা ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

খালের ঘাটে নৌকায় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বোঝাই হইল—শচীনবাবু পুরাতন মণ্ডপে শেষ প্রণাম করিয়া খোকাকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষ সকলে সমবেত হইলেন বিদায় দিতে।

তারিণীখুড়ো কহিলেন, আমাদের ফেলে রেখে ত চললে বাবা! কপালে কি আছে জানি না—যদি সময় হয় মাঝে মাঝে না হয় এমনিই বেড়াতে এস।

শচীনবাবু ফিরিয়া চাহিলেন, পিছনে দেখা যায় তাঁহাদের ভিটার উপর খাড়া খুঁটিগুলি দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বপুরুষের অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া তাহারা যেন সূর্য্যকিরণে চক্ চক্ করিতেছে। এই গৃহ—ইহারই আকর্ষণে কত শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া প্রবাসী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

খোকা প্রশ্ন করিল, আমরা আর বাড়ী আসব না বাবা!

শচীনবাবুর বুকের মাঝে রুদ্ধ ক্রন্দন গুমরিয়া মরিতেছিল। তিনি কহিলেন, না বাবা, এই শেষ—

কথাটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, মাঝি নৌকা ছাড়ো—

তাহার অন্তর আর্ত্তনাদ করিতেছে। ফিরিয়া দেখেন শূন্য ভিটায় সেই একক খুঁটিগুলি সহস্র স্মৃতির পতাকা উড্ডীন করিয় দাঁড়াইয়া আছে। ঘাটের পার্শ্বে অপস্রিয়মান জনতার পাছে অশ্রুচোখে দাঁড়াইয়া আছে কিরণের মা—তাহার মায়ের সমবয়সী নমশূদ্র বিধবা।

শচীনবাবু পঞ্জিকা দেখিয়া শুভদিনেই রওনা হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু দিনটা সত্যই শুভ কিনা তাহা বলা কঠিন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে তাঁহার এক আত্মীয় চাকুরী করিতেন, তিনি প্রথমে তাঁহারই আশ্রয়ে আসিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন বেশী দিন এ আশ্রয়ে থাকা চলিবে না—স্থান নাই, রেশনের মাপাজোখা চাল, এখানে দু'চার দিনের বেশী থাকা সঙ্গত নয়। তিনি একটা বাসা খুঁজিতে লাগিলেন। যা জোটে তিনি ও খোকা উভয়ে মিলিয়া রাঁধিয়া খাইবেন, মাষ্টারী টিউশনি করিয়া শ'খানেক টাকা রোজগার করিতে পারিলে, ধীরে ধীরে একটু জায়গা কিনিয়া খোকার মাথা গুঁজিবার একটু ঠাঁই করিয়া দেওয়াও হয়ত অসম্ভব হইবে না। তাহা হইলেই তাঁহার ছুটি।

বাসা খুজিতে লাগিলেন, কিন্তু বাসা কোথায়? লাখো লাখো লোক আসিয়া গ্যারেজ, গোয়াল, ভাঙা-বাড়ী সবই উচ্চহারে ভাড়া করিয়া ফেলিয়াছে। কোথাও তিল ধারণের স্থান নাই। বাসাটা আত্মীয়বাড়ীর নিকটে হইলেই ভাল হয়—তিনি এখানে ওখানে গেলে খোকার বাড়ীতে থাকিতে অসুবিধা হইবে না এবং তাঁহারা তাহাকে একটু দেখাশুনাও করিতে পারিবেন। বহু চেষ্টায় নিকটেই একটি বাড়ীর সন্ধান

পাওয়া গেল—ভাঙা বড় বাড়ী, একপাশ ধ্বসিয়া গিয়াছে, সেখানে অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে, কিন্তু অন্যপার্শ্বের দুইটি ঘর ভাল আছে, একটিতে রান্নাবান্না চলে ও অন্যটিতে থাকা যায়। এই বাড়ী ভাড়া হইতে পারে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। আত্মীয়টিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীওয়ালার সহিত শচীনবাবু দেখা করিলেন। তাঁহারা কলিকাতাবাসী, পূজায় বাড়ীতে আসেন, ধুমধাম সহকারে পূজা করিয়া চলিয়া যান—দানধর্ম্ম যথেষ্ট। শুনিয়া শচীনবাবু আশান্বিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় মালিকের বাড়ী বিরাট। সামনেই কল, তাহার পাশে গ্যারেজ—তিনখানি মোটর। কর্ত্তা বাড়ীতেই ছিলেন, শচীনবাবুর আত্মীয় পাঁচুবাবুকে তিনি চিনিতেন। বলিলেন—এস হে পাঁচু, কলকাতা এসেছ কেন? বাজার করতে—

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পরে পাঁচুবাবু প্রস্তাব করিলেন, এই ভদ্রলোক বাস্তুত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, আপনাদের পুরনো ভাঙা বাড়ীতে এঁকে যদি আশ্রয় দেন।

—নিশ্চয়ই। ওদের সাহায্য করাই উচিত, কেন করব না? জায়গা জমি বাসা ত দিতেই হবে!

—উনি দরিদ্র শিক্ষক ছিলেন, বর্ত্তমানে বেকার, আপনারা বড়লোক, ভাড়া আর কি নেবেন?

মালিক হাসিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—সেটা ঠিকই বলেছ পাঁচু, দেওয়াই উচিত, কিন্তু একটা নিয়মিত ভাড়া না দিলে ওরও দাবি থাকে না, আর ধর আমারও মতিভ্রম হয়ে কোন দিন বলতে পারি উঠুন মশায়। কিন্তু ভাড়া দিলে আজকাল আইনে আর ওঠাবার উপায় নেই। একটু থামিয়া তিনি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছ, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হয়। আমি একাই ত মালিক নয় সরিক আছে—

শচীনবাবু কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি বলিলেন, তা হলে ভাড়াটা···

—হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আমি ত বলতে পারি না। দশ জনের অংশ আছে—আমি যদি কম ভাড়া বলে ফেলি তায়ারা বলবেন, বাড়ী ভাড়া দেওয়াটা আমাদের ব্যবসা, বাড়ীগুলো ধর্ম্মশালা নয়। তাই বলি পাঁচু, আমি ওখানকার সরকার কেষ্টকে বলে দেব তার সঙ্গে ঠিক করে নিও। সে উচিত ব্যবস্থা করে দেবে, আমারও দোষ রইল না, তোমাদেরও কাজ হাসিল।

তাঁহারা বিদায় লইলেন। শচীনবাবু ভদ্রলোকের কথায় সহানুভূতির সুর লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলেন।

দুই চার দিন পরে সরকার কেষ্ট জানাইল, হুকুম আসিয়াছে, ভাড়া মাসিক ২৫৲ টাকা।

পাঁচুবাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, বল কি? ছ'মাস আগে এর ভাড়া আট আনাও হ'ত না, ২৫৲ টাকা চাইছে—

—আমার হাত ত নয়, বাবু বলেছেন। তিনি বললেন, যে রকম রিফুজি আসছে তাতে তিরিশ টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া হবে—আর বলতে কি সকালেই এক ভদ্রলোক ২০৲ টাকা বলে গেছে—

শচীনবাবু চিন্তা করিলেন। পাঁচুবাবু বলিলেন, মানুষ বিপদে পড়লে কি এমনি করে তাকে শোষণ করা ভাল, না এটা ধর্ম্ম?

কেষ্ট হাসিয়া বলিল, বাবু বলেন, মানুষ বিপদে না পড়লে টাকা দেয় না।

শচীনবাবু অনেক চিন্তা করিলেন, কুটুম্বের গলগ্রহ হইয়া থাকা যায় না। যাহা হউক, দুই চার মাস থাকিয়া কোথাও চাকুরী পাইলে সেখানেই চলিয়া যাইবেন, কয়েক মাস না হয় ভাড়া দিলেনই। শচীনবাবু পাঁচুবাবুকে তাহার মত জানাইলেন, পাঁচুবাবুও একটু দুষ্টভাবে বলিলেন, যা বলছেন, অবস্থা যা হয়েছে শেষে ঐ বাড়ীই হয়ত চল্লিশ টাকা ভাড়া হবে।

অতএব শচীনবাবু খোকাকে লইয়া ভাড়াবাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

প্রথম দিন নূতন বাসায় যাইয়া খোকা মহা পুলকিত হইল—সে পরম উৎসাহে ভাঙ্গা হাতে জল আনিল, চাল ধুইল, শচীনবাবু কোন মতে খিচুড়ি রাঁধিয়া নামাইলেন। খোকা খাইতে খাইতে পরম উৎসাহে বলিল, বেশ হয়েছে, বাবা, আমিও ত রাঁধতে পারি।

আহারান্তে প্রথম কাজ রেশনকার্ড করিতে রেশন আপিসে যাওয়া। খোকাকে বাসায় থাকিতে বলিয়া শচীনবাবু রওনা হইলেন। রেশন আপিসে দরখাস্ত দিয়া জানিতে পারিলেন, পনর দিন বাদে কার্ড পাওয়া যাইবে।

তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এই দুই হপ্তা কি খাব?

কর্মচারীটি জবাব দিলেন, এতদিন যা খেয়েছেন তাই খাবেন।

—তা হলে প্রকারান্তরে আপনারা কালোবাজারে কিনতে বলছেন।

—আমরা বলি না, তবে মানুষ প্রয়োজনে করে··· আমরা ইনস্পেক্টর পাঠাব, তাঁরা রিপোর্ট দেবেন, তার পর কার্ড লেখা হবে ইত্যাদি—তাতে পনর দিন কি বেশী সময়?

—কিন্তু আপাততঃ পনের দিনের খাবার দিতে পারেন না? আর একটু কেরোসিন—

—সে অনেক দেরি, কার্ড পাকা হবে তারপর—

—ততদিন।

—বাতি জ্বালাবেন, দেশী বাতি, দেশী শিল্পের উন্নতি হউক—তিনি চলিয়া গেলেন। শচীনবাবু বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। লোকটি যাহা বলিয়াছে তাহার সবই সত্য।

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, খোকা সারা দ্বিপ্রহর অশেষ শ্রমে ঘর সাজাইয়াছে, তাহার ফলে সব তচনচ হইয়া গিয়াছে। জল আনিতে ঘর ভিজিয়াছে, বাসন গোছাইতে কাপ ভাঙিয়াছে, বিছানা করিতে বালিশ ছিঁড়িয়াছে ইত্যাদি। তিনি পুনরায় সমস্ত গুছাইয়া বাহিরের বারান্দায় বসিলেন। এক ভদ্রলোক অদূরে গামছা পরিয়া হুঁকা টানিতেছিলেন, তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুঝি ভাড়া নিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উভয়ের পরিচয় হইল। শচীনবাবু জানিতে পারিলেন, ভদ্রলোক বাড়ীতেই থাকেন, কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতে কোনমতে চলিত, বর্ত্তমানে দুইখানা বাড়ী ভাড়া দিয়া ভাল ভাবেই চলিতেছে। শেষে বলিলেন, তবে আমি ত বড়লোক নয় তাই বুঝি আপনাদের দুঃখ, আগে ত এখানকার বাড়ী ভাড়াই হ'ত না, অধিকন্তু লোক রাখতে হ'ত দেখাশোনার জন্যে। এখন সেখানে ভাড়া পাচ্ছি...পাঁচখানা ঘর পঁচিশ টাকা ভাড়া। মন্দ কি? বেশ চলে যাচ্ছে, জিনিষপত্রের দাম যদি বাড়ে বলব তাদের আরও কিছু দিতে। অধর্ম্ম করব না—তবে ওঁরা বড়লোক, ওঁরা ত আপনার কাছে পঁচিশ টাকা নেবেনই, আগে জানলে আমি একখানা ঘর আপনাকে দিতাম কিন্তু এখন—

শচীনবাবু সমবেদনায় একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন, সকলেই ত ধর্ম্মভীরু হয় না। তবে আপনি ভাববেন না, চাকুরির চেষ্টা করছি, পেলেই চলে যাব। আপাততঃ আশ্রয়টুকু চাই। (ক্রমশঃ)

কলিঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকার

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

মোটামুটি বলিতে গেলে মহানদী ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল কলিঙ্গ। অবশ্য মহানদীর উত্তর-পূর্ব্বদিক্‌স্থিত বৈতরণী নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলও প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থের কলিঙ্গ। সঙ্কীর্ণ অর্থে কলিঙ্গ বলিতে কেবল আধুনিক পুরীগঞ্জম্ অঞ্চল বুঝাইত। কালিদাসকৃত রঘুবংশে (আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) কলিঙ্গরাজকে 'মহেন্দ্রনাথ' অর্থাৎ মহেন্দ্র পর্ব্বতের অধীশ্বর বলা হইয়াছে। এই মহেন্দ্র পর্ব্বত আধুনিক গঞ্জম্ জেলার অন্তর্গত মহেন্দ্রগিরি। কালিদাসের যুগে কলিঙ্গ দেশের পূর্ব্বোত্তর দিকে উৎকল দেশ অবস্থিত ছিল। আধুনিক বালেশ্বর জেলা এবং মেদিনীপুর ও কটকের কিয়দংশ উৎকলের অন্তর্গত ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ও তন্নিকটবর্ত্তী সময়ের কতকগুলি তাম্রশাসনে দেখা যায়, সিংহপুর, বর্দ্ধমান, দেবপুর, পিষ্টপুর প্রভৃতি স্থানের নরপতিগণ আপনাদিগকে কলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। গঞ্জম্ জেলার চিকাকোল বা শ্রীকাকুলমের নিকটবর্ত্তী আধুনিক সিঙ্গুপুরম্ নামক গ্রামই প্রাচীন সিংহপুর। বর্ত্তমান বিশাখপত্তনম্ জেলার পালকোণ্ড তালুকের অন্তর্গত বাদামা বলিয়া মনে হয়। দেবরাষ্ট্র নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী দেবপুর ঐ জেলার য়েল্লামঞ্চি তালুকে অবস্থিত ছিল। পিষ্টপুর আধুনিক গোদাবরী জেলার অন্তর্গত পিঠাপুরম্ নামক স্থান। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে প্রাচ্য গঙ্গবংশীয় রাজগণ কলিঙ্গনগর (অর্থাৎ আধুনিক গঞ্জমের অন্তর্গত মুখলিঙ্গম্) এবং চিকাকোলের নিকটবর্ত্তী দন্তপুর নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে কলিঙ্গাধিপতি বা ত্রিকলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রচার করিতেন। খ্রীষ্টীয় ৪৯৬-৯৮ অব্দ মধ্যের কোন তারিখ হইতে প্রাচ্য গঙ্গ-রাজগণের ব্যবহৃত সালের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারা মহেন্দ্রগিরির শিখরবর্ত্তী গোকর্ণেশ্বর শিবের ভক্ত ছিলেন। প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় রাজগণের লিপিতে বিশাখপত্তনম্ জেলার অংশবিশেষকে মধ্যমকলিঙ্গ বা এলামঞ্চি কলিঙ্গ দেশ বলা হইয়াছে

গুপ্তবংশীয় মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণাপথের অনেক রাজ্যাধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে ইহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই লিপিতে কলিঙ্গ দেশের কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে মনে হয়, চেদি-মহামেঘবাহন বংশের অধঃপতনের পর কলিঙ্গ দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছিল। এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি 'কলিঙ্গ চক্রবর্ত্তী' খারবেল খ্রীষ্টপূর্ব্ব

প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন বলিয়া জানা যায়। সম্ভবত: এই বংশে শিশুপাল নামক অপর একজন নরপতি ছিলেন এবং ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী শিশুপালগড় তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাভারতে শিশুপালসংজ্ঞক চেদিরাজের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহার নামানুসারেই কলিঙ্গের জনৈক চেদিবংশীয় রাজার নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহা হউক, সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বিজিত দক্ষিণাপথের রাজগণের তালিকায় কলিঙ্গ অঞ্চলের কতিপয় নরপতির উল্লেখ আছে। ইঁহারা কোট্টূরপতি স্বামিদত্ত, পিষ্টপুররাজ মহেন্দ্র গিরি, এরণ্ডপল্লপতি দমন এবং দেবরাষ্ট্ররাজ কুবের। মহেন্দ্র গিরির সমীপবর্ত্তী কোঠুর নামক স্থানকে প্রাচীন কোট্টূর বলিয়া মনে করা হয়। এরণ্ডপল্ল আধুনিক চিকাকোলের নিকটে অবস্থিত ছিল। এলাহাবাদ-লিপি হইতে মনে হয় যে, সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ-রাজগণকে পরাজিত করিবার পর ঐ নরপতি-দিগকে পুনরায় স্ব-স্ব রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপথের কোন রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে দক্ষিণ-ভারতের নানা অঞ্চলে গুপ্তপ্রভাব বিস্তারের অন্যবিধ কিছু কিছু প্রমাণ আছে। বেরার অঞ্চলের বাকাটক রাজবংশ এবং কর্ণাটদেশের কদম্বরাজ-পরিবারের সহিত গুপ্তসম্রাটগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। কদম্ববংশীয় নরপতি কাকুস্থবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনে গুপ্তসংবতের ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণ কোশল অর্থাৎ আধুনিক ছত্রিশগড় অঞ্চলের রাজা ভীমসেনের আরং তাম্রশাসনেও গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দক্ষিণ কোশলরাজ প্রসন্নমাত্রের মুদ্রায় গুপ্তপ্রভাব লক্ষিত হয়। সম্প্রতি মহেন্দ্রাদিত্য নামক অপর একজন কোশলরাজের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি সম্ভবত: গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের সামন্ত মধ্যে গণ্য ছিলেন। অনেকদিন পূর্ব্বে সাতারা জেলায় কুমারগুপ্তের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কলিঙ্গদেশেও গুপ্তসংবতের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বালুগাঁ ষ্টেশনের নিকটে সালিয়া (প্রাচীন সালিমা) নদী প্রবাহিতা। ইহার তীরে কোঙ্গোদ নগরী অবস্থিত ছিল। কোঙ্গোদে শৈলোদ্ভববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। শৈলোদ্ভববংশীয় সৈন্যভীত দ্বিতীয় মাধববর্ম্মা গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সামন্ত ছিলেন। ৩০০ গুপ্তাব্দের তারিখ-সংবলিত তাঁহার একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মেদিনীপুরে আবিষ্কৃত শশাঙ্কের রাজত্বকালীন তাম্রশাসনদ্বয়ে গুপ্তসংবতের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু প্রায় সমসাময়িক শত্রুযশা: নামক উত্তর ও দক্ষিণ তোসলীর জনৈক নরপতির তাম্রশাসনে গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক বালেশ্বর অঞ্চল উত্তর তোসলীর এবং পুরী, কটক ও গঞ্জামের কিয়দংশ দক্ষিণ তোসলীর অন্তর্গত ছিল। সুতরাং প্রাচীন কলিঙ্গের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলেরই পরবর্ত্তীকালীন নাম দক্ষিণ তোসলী। অশোকের যুগে তোসলী (পুরী জেলার অন্তর্গত ধৌলি) কলিঙ্গ দেশের অন্যতম প্রধান নগরী ছিল। সম্ভবত: প্রাচ্য গঙ্গেরা কলিঙ্গনগরে রাজত্ব আরম্ভ করার পর উত্তর কলিঙ্গের নরপতিগণ স্বরাজ্যের স্বতন্ত্র নামকরণের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে, কলিঙ্গ দেশে গুপ্তপ্রভাব বিস্তারের কিছু প্রমাণ আছে। কিন্তু উহাতে প্রমাণ হয় না যে, কলিঙ্গ এক সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সদ্য আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসন এই সম্পর্কে নূতন আলোক-পাত করিয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে উড়িষ্যার খল্লিকোট রাজ্যের অন্তর্গত সুমণ্ডলগ্রামের মৃত্তিকাস্তূপ হইতে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। ব্রহ্মপুর হইতে প্রকাশিত 'মনোরমা' পত্রিকায় ইহার বিবরণ এবং চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই লিপির প্রথম ছয় পঙ্‌ক্তির পাঠ নিম্নরূপ :

১। [সিদ্ধম্॥] স্বস্তি॥ চতুরুদধিমেখলায়াং
সপ্তদ্বীপপর্ব্বতসরিৎপত্তন—
২। ভূষণায়াং বসুন্ধরায়াং বর্ত্তমানগুপ্তরাজ্যে বর্ষশতদ্বয়ে
৩। পঞ্চাশদুত্তরে কলিঙ্গরাষ্ট্রমনুশাসতি শ্রীপৃথিবীবিগ্রহ—
৪। ভট্টারকে তৎপাদানুধ্যাত: পল্লখোল্যাং
মহারাজোভয়ান্বয়ো
৫। বপ্পদেব্যামুৎপন্নতনু: সহস্ররশ্মিপাদভক্তো
মহারাজ-ধর্ম্মরা
৬। জ: কুশলী পরকৃখলমার্গ্‌গ বিষয়ে বর্ত্তমানভবিষ্যৎসামন্ত
—ইত্যাদি। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, গুপ্তসংবতের ২৫০ বর্ষে গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধীন কলিঙ্গরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন পৃথিবী-বিগ্রহ এবং তাঁহার সামন্ত মহারাজ উভয়ের বংশধর বা পুত্র রাজ্ঞী বপ্পদেবীর গর্ভজাত মহারাজ ধর্ম্মরাজ আধুনিক খল্লিকোট অঞ্চলে অবস্থিত পল্লখোলীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

উল্লিখিত সুমণ্ডল লিপির আবিষ্কারে নানা ঐতিহাসিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমত:, এতদিন কলিঙ্গে গুপ্ত সম্রাট্‌গণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই শাসনে কলিঙ্গদেশকে গুপ্তরাজ্যের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত:, এই লিপিতে দেখা যায়, ২৫০ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, এই তারিখের প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বেই মগধের গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয়ত:, এই লিপিতে দেখা যায়, ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাটের প্রতিনিধি পৃথিবীবিগ্রহ কলিঙ্গরাষ্ট্র শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণবলে জানা যায় যে, ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ

পূর্ব্বেই কলিঙ্গ নগর ও মহেন্দ্র গিরি অঞ্চলে প্রাচ্যগঙ্গবংশীয় রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শত্রুযশাঃ নামক নরপতি ৫৭৯ এবং ৬০২ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ তোসলীদেশের অধিপতি ছিলেন।

প্রথম সমস্যাটির সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ কোশলে এবং ঐ দেশের মধ্য দিয়া কলিঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। দ্বিতীয় সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত জটিল। কারণ জৈন কিংবদন্তী অনুসারে গুপ্তসম্রাট্‌গণ ২৩১ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসংবতের আরম্ভ। সুতরাং উল্লিখিত কিংবদন্তী অনুসারে ৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। এই সিদ্ধান্তের একটি সমর্থক প্রমাণ আছে। মৌখরিরা বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অঞ্চলবিশেষে গুপ্তরাজগণের সামন্তরূপে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের হরাহা লিপিতে দেখা যায়, মৌখরিবংশীয় ঈশানবর্ম্মা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং পূর্ব্বপরিচিত গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। অবশ্য এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত দুই একজন নামাবশেষ গুপ্তসম্রাট্ কোনরূপে টিকিয়া ছিলেন। হয়ত তাঁহাদের দশা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজ্যহীন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের ন্যায় ছিল। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও কলিঙ্গের শাসনকর্ত্তা পৃথিবীবিগ্রহের ন্যায় কেহ কেহ তাঁহাদের অনুরক্ত ছিলেন। পৃথিবীবিগ্রহের সহিত গুপ্তবংশের রক্তসম্বন্ধ থাকাও অসম্ভব নহে। আবার যে কারণে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ধরণের রাজনৈতিক কারণেই পৃথিবীবিগ্রহ বিগতশ্রী কিন্তু স্বনামখ্যাত গুপ্তসাম্রাজ্যের সহিত আপন রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করিতে পারেন। হয়ত এইরূপে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সম্মুখে আপনার দাবি অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন যে, তথাকথিত উত্তরকালীন গুপ্তবংশ অর্থাৎ কৃষ্ণগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ প্রাচীন গুপ্তসম্রাট্ বংশের অন্যতম শাখা এবং এই বংশীয় রাজগণ প্রথম হইতেই মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে উল্লিখিত দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান কঠিন নহে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, কৃষ্ণগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সহিত মূল গুপ্তবংশের সম্পর্কের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ, হর্ষবর্দ্ধনের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত এই বংশের রাজগণ মালব দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন।

তৃতীয় সমস্যাসম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীবিগ্রহ সম্ভবতঃ শত্রুযশাঃ নামক রাজার অব্যবহিত পূর্ব্বে দক্ষিণ তোসলী অর্থাৎ প্রাচীন কলিঙ্গদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল শাসন করিতেছিলেন। শত্রুযশার লিপিতে ঐ অঞ্চলে মানবংশের আধিপত্যের উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ পৃথিবীবিগ্রহের অনতিকাল পরেই ঐ দেশে গুপ্ত-অধিকার উচ্ছিন্ন হইয়া মানরাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গঞ্জামের অন্তর্গত কোঙ্গোদের শৈলোদ্ভববংশীয় রাজগণ প্রথমে পৃথিবীবিগ্রহের, পরে শত্রুযশার এবং তৎপরে শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। অপর একখানি তাম্রশাসনে লোকবিগ্রহ নামক জনৈক নরপতির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত 'মনোরমা' পত্রিকায় এই তাম্রশাসনকে কনাসা লিপিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এই লোকবিগ্রহ এবং সুমণ্ডললিপির পৃথিবীবিগ্রহ একই বংশের লোক হইতে পারেন।

সুমণ্ডললিপিতে উল্লিখিত মহারাজ উভয় এবং সূর্য্যদেবতার ভক্ত মহারাজ ধর্ম্মরাজ সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় নাই।

মেঘদূতের ফলপুষ্প ও তরুলতা

শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক

মেঘদূতের কবি কালিদাস নিসর্গপ্রিয় ছিলেন। এই কাব্যে দেখি বিরহী যক্ষ তার প্রিয়ার উদ্দেশে প্রাণের আকুতি জানিয়েছে। যক্ষের নির্বাসন-কাহিনীর মধ্যে সত্যতা কতটুকু তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। আর তার তেমন প্রয়োজনও নেই। আসল কথা এই যে, এতে শাশ্বত কালের বিরহীর মর্মবেদনা মন্দাক্রান্তা ছন্দে ফুটে উঠেছে। প্রিয়ার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন যক্ষ চেতন ও অচেতনের বোধ হারিয়ে ফেলেছিল।১ কবি সত্য ও কল্পনায় মিশিয়ে তার সেই মনোভাবকে অবলম্বন করে এই অপূর্ব কাব্য রচনা করেছেন।

মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির একটা অংশ ও অঙ্গ এই কথাটা মেঘদূতে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে বিশ্বের সবকিছুর কোথায় যেন একটা যোগসূত্র রয়েছে, তাই অভিশপ্ত যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিনের মেঘমালাকে সমব্যথী ভেবে নিজের মনের কথা জানাচ্ছে।

মানুষের সঙ্গে বিশ্বের আত্মীয়তাবোধকে কবি তাঁর কাব্যে ফলপুষ্প ও তরুলতার মধ্য দিয়ে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। সেজন্যে নিসর্গপ্রকৃতি তাঁর কাব্যে যেন প্রাণবান ও মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে দেখি প্রকৃতি মানুষের দুঃখে কেঁদেছে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য কবি প্রকৃতিকে

দেবতার আসনে বসিয়েছেন, কিন্তু কালিদাসের মত স্বর্গ ও মর্ত্যকে মিলাতে পারেন নি। কালিদাসের কাব্যে মাটির তরু স্বর্গে গিয়ে তার মর্ত্যভাব হারিয়ে ফেলেছে, তার পাতা ঝরে নি, তার ফুল শুকায় নি। মৃত্যুর ক্ষয়স্রোতকে তারা জয় করেছে। শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী ও কুমারসম্ভবে এর পরিচয় আছে।

মেঘদূতে যক্ষপুরীর তরুলতা যেন মায়া দিয়ে তৈরি। সে-জন্যে সেখানে সকল ঋতুর সকল ফুল যুগপৎ ফুটে এক অপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।২ কালিদাসের মত এমন অভিনব দৃষ্টিতে আর কোন কবি নিসর্গশ্রীকে দেখেন নি।

দক্ষিণের রামগিরি থেকে উত্তরে হিমালয়ের শিখর পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মেঘদূত কাব্যের পটভূমিকা। এই বিরাট ভূখণ্ডে সে যুগে যে সকল উল্লেখযোগ্য বৃক্ষে ফল ধরত এবং তরুলতায় পুষ্পোদ্গম হ'ত মেঘদূতে তার পরিচয় মিলে। উপরন্তু সেই সকল তরুলতা ফুলফল সেকালের মানুষের জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তাও স্পষ্ট ধরা দেয়। আষাঢ়ের নবমেঘ—যে বর্ষার তরুলতাকেই মর্ত্যের সীমায় কেবল দেখেছে, যক্ষপুরে ঢুকবার পর তার সঙ্গে সকল ঋতুর ফল-পুষ্পের পরিচয় হয়েছে; বর্ষার সেই কদম্ব ত আছেই, উপরন্তু বর্ষেতর ঋতু হেমন্তের লোধ্র, বসন্তের কুন্দ, অশোক, কমল, নবকুরবক ও নিদাঘের বকুল এবং শিরীষগুচ্ছ পাশাপাশি ফুটে রয়েছে।

এখন মেঘদূতের পূর্বমেঘ অংশে রামগিরি পর্বত থেকে সুরু করে ক্রমে ক্রমে যে সকল ফলফুল ও তরুলতার বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

রামগিরি পাহাড়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বলছেন—

দক্ষিণের রামগিরি পাহাড়টি ছায়া৩ বা নমেরু আর নিচুল৪ বা স্থল-বেত দিয়ে ঘেরা।

ঘনছায়াযুক্ত নমেরু পার্বত্য বৃক্ষবিশেষ। এরই তলায় বসে মহেশ্বর ধ্যান করেছেন (কুমারসম্ভব ১।৫৫; ৩।৪৩)। 'রঘুবংশে' সৈন্যেরা নমেরু বৃক্ষের তলায় ক্লান্তি দূর করেছে। (৭।৭৪)। শব্দার্ণব অভিধানে ছায়াবৃক্ষকে নমেরু বলা হয়েছে। 'ছায়াবৃক্ষো নমেরুঃ স্যাদিতি শব্দার্ণবঃ'। বিশ্বকোষে আছে, "নমেরুঃ সুর পুন্নাগঃ"। মনিয়ের উইলিয়মসের সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে 'Elaeocarpus Ganitrus' নাম দেওয়া হয়েছে। ঐ গ্রন্থে নিচুলের ইংরেজী নাম Barringtonia acutangula। মল্লিনাথ—নিচুলাঃ স্থলবেতসঃ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

ঐ পর্বতের অদূরে বিন্ধ্যাচল। তার পাশে নর্মদার স্রোত জম্বুবনের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়।৫

জম্বু বা জামের কথা মেঘদূতে পুনশ্চ বলা হয়েছে৬—মেঘ যখন দশার্ণের বনস্থলীর পাশ দিয়ে যাবে তখন জাম পেকে শ্যামবর্ণ ধারণ করবে। বিক্রমোর্বশীতেও এই ফলের উল্লেখ আছে (৪র্থ অঙ্ক, ৬০ শ্লোক)।

নির্বাসিত বিরহী যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিনে কুটজ ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে নব মেঘকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল।৭ এ ফুলটি মেঘের বড় প্রিয়।৮

কালিদাস ঋতুসংহারে কদম্ব অর্জুন ও নীপপুষ্পের প্রসঙ্গে ঐ ফুলের কথা বলেছেন। কুটজ ও ককুভ এক। শব্দার্ণবে আছে, ককুভঃ কুটজেঽর্জুনঃ।

মেঘের যাবার সময় আম্রকূট পাহাড়ের আমগুলি সব পেকে যাবে।৯ যে পথ দিয়ে মেঘ চলে যাবে তার পরিচয় রাখবে মুকুলিত কেতকী১০, হরিতকপিশ নীপ১১, শিলীন্ধ্রা বা কন্দলী১২, আর যূথিকা১৩।

কালিদাস ঋতুসংহারে কদম্ব সর্জ ও অর্জুনের সঙ্গে কেতকীর কথা বলেছেন। (ঋতু ২।১৭) শব্দার্ণবে বলা হয়েছে যে কেতকী মুকুলের অগ্রভাগ সূচের মত সরু। "কেতকী মুকুলাগ্রেষু সূচিঃ সাং।" কেতকীর রুচির গন্ধ ও তার মুকুলের সূচি-শোভার কথা কবি রঘুবংশ ও ঋতুসংহারে অনেকবার বলেছেন।

নীপের কেশরগুলি ঈষৎ শ্যামবর্ণ, হরিৎ-কপিশ। নীপ ও কদম্বের কথা কবি প্রায়ই পাশাপাশি বর্ণনা করেছেন। মল্লিনাথ "নীপং স্থলকদম্বকুসুমম্" বলেছেন। মেঘদূতে কবি "প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ" বলেছেন। অভিধানকারেরা দুটিকে একই ফুল বলে ধরেছেন। কবি ঋতুসংহার (২।২৩,২৪), রঘুবংশ (১৪।২৭) ও কুমারসম্ভবে (৩।৬৮) যে প্রকার বর্ণনা করেছেন তাতে মনে হয় নীপ ও কদম্ব এক। কদম্ব হ'ল পূর্ণপ্রস্ফুটিত অবস্থা আর নীপ হ'ল অর্দ্ধস্ফুট অবস্থা, বিক্রমোর্বশীতে কবি রক্তকদম্বের কথা বলেছেন (৪র্থ অঙ্ক ৩০ শ্লোক)। দুটি ফুলই সেকালের বিলাসিনীদের অঙ্গরাগ ও অঙ্গভূষণ রূপে ব্যবহৃত হ'ত।

শিলীন্ধ্রা বা কন্দলী পুষ্প বিকশিত অবস্থায় সাদার উপর ঈষৎ লাল রঙের আভাযুক্ত—যেমন তুষারের উপর বৈদূর্যমণি, কালিদাস ঋতুসংহারে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন (২।৫)। শিলীন্ধ্রা পুষ্প ভাবী ফসলের সূচক একথা মেঘদূতে বলা হয়েছে।১৪ কন্দল্যাশ্চ শিলীন্ধ্রাঃ স্যাদিতি—শব্দার্ণবঃ। মনিয়ের উইলিয়মসের অভিধানে এই নামটির কোন ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হয় নাই।

যূথিকা (যুঁই) মাগধী ফুল, এ কথা অমরকোষে আছে। গণিকা যূথিকাম্বষ্ঠা। অথ মাগধী। ঋতুসংহার (২।২৪) ও বিক্রমোর্বশীতে (৪।২৪) উল্লেখ আছে।

এদিকে মেঘ নব নব দেশ অতিক্রম করে গম্ভীরা নদীর উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। যক্ষ বলছে—

গম্ভীরা নদীতটের বেতবন১৫ দেখে মেঘের মন চঞ্চল

হয়ে উঠবে। দেবগিরির বনে উদুম্বর১৬ বা যজ্ঞডুমুর বর্ষার হিমবাতাসে পরিণত হয়ে যাবে। পুষ্পলাবীদের কর্ণভূষণ উৎপল১৭ যদি ঘামে ভিজে যায় তবে ছায়া দিয়ে মেঘ যেন তাদের শ্রান্তি দূর করে। পুকুরের কমল১৮গুলির দল বর্ষার তীব্র ধারায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

বাণীর (বেতস)। মল্লিনাথ টীকায় বলেছেন, 'বাণীর শাখা বেতস শাখা।" তবে এটা জলবেতস তা বলা বাহুল্য। বাণীর ও বেতস কালিদাসের কাব্যের বহু স্থানেই আছে। বাণীর-গৃহ ছিল কাব্যের নায়িকা ও নায়কের গোপন মিলন-স্থান। শকুন্তলা (২৩।২৪), রঘুবংশ (১৩।৩৫, ১৬।২১) দ্রষ্টব্য।

সমিধকাষ্ঠ হিসাবে কালিদাসের কুমারসম্ভবে উদুম্বরের উল্লেখ থাকলেও সজীব ফলবান বৃক্ষরূপে অন্যত্র এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। অমরকোষে বলা হয়েছে, উদুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ। Ficus Glomerata ইংরেজী নাম (M.W.)।

পদ্মের উল্লেখ কালিদাসের সাহিত্যে বিরল নয়। কবি পদ্মের অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। মেঘদূতে অম্ভোজ (পূর্বমেঘ ৬২), কমল (পূর্বমেঘ ৩৯, উত্তরমেঘ ২, ১৯), কুবলয় (পূর্বমেঘ ৩৩, ৪৪, উত্তরমেঘ ৩৪), নলিনী (পূর্বমেঘ ৩৯, উত্তরমেঘ ৩), পদ্ম (উত্তরমেঘ ১৯), পদ্মিনী (উত্তরমেঘ ১২, ২২)। কমল ও উৎপলের পার্থক্য কবি নিজেই রঘুবংশে দেখিয়েছেন (৬।৩৬)। টীকাকার মল্লিনাথ অর্থ করেছেন, "কমলাচ্চিরোৎপন্নাননবাবতারমচিরোৎপন্নমুৎপলম্" অর্থাৎ কমল যে অনেক আগে ফুটেছে, আর উৎপল যে অল্পক্ষণ মাত্র ফুটেছে!

এবার কীচকের প্রসঙ্গে আসা যাক। কবি বলেছেন—ধীরে ধীরে মেঘ গিরিনদী জনপদ অতিক্রম করে যখন হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে হাজির হবে তখন কীচকের বংশীরব১৯ শোনা যাবে।

কালিদাস তাঁর কাব্যের আরও দুই-এক স্থানে কীচকের কথা বলেছেন। কুমারসম্ভব (১।৮), রঘুবংশ (২।১২; ৪।৭৩)। মল্লিনাথ বলেছেন, "বাংশিকোঽপি বংশরন্ধ্রাণি মুখমারুতেন পূরয়তি ইতি প্রসিদ্ধিঃ" (কুমার ১।৮ সঞ্জীবনী)। অমরকোষে আছে, কীচকাঃ। বেণবঃ কীচকাস্তে স্যু র্যে স্বনন্ত্যনিলোদ্ধতাঃ। Arunda Karka (M.W.) বিশ্বকোষে আছে, "কীচকো দৈত্যভেদে স্যাচ্ছুষ্কবংশে দ্রুমান্তরে।"

যক্ষপুরীর রমণীদের হাতে লীলাকমল, অলকে কুন্দস্তবক, মুখে লোধ্রফুলের রেণু, চূড়াতে নবকুরবক, কানে শিরীষগুচ্ছ ও সিঁথির উপর নীপ, এই তাঁদের পুষ্পাভরণ।২০

এই সকল পুষ্প ছিল সেকালের বিলাসিনীদের প্রসাধনের উপকরণ। কুন্দ বাসন্তী পুষ্প। পরিণতশ্যামল পত্রের মাঝে প্রস্ফুটিত তুষারধবল কুন্দের শোভা যেমন কবিকে মুগ্ধ করেছে তেমনই কুন্দস্তবকের উপর ভ্রমরের চঞ্চল স্পর্শ কবির চোখ এড়ায় নি (মালতীমাধব ৩।৮, মেঘদূত পূর্বমেঘ ৪৯)। কুন্দফুলের কথা কবি অনেকবার বলেছেন।

লোধ্রফুলের রেণু সুন্দরীর দেহের তৈলাক্ত ভাব দূর করার উপকরণ। এটি হৈমন্তিক পুষ্প। "গালবঃ শাবরো লোধ্রস্তিরীটস্তিল্বমার্জনী" অমরকোষে বলা হয়েছে। এর ইংরেজী নাম Bassia Latifolia (M.W.) কুমারসম্ভব (৭।৯, ৭।১৩), রঘুবংশ (২।২৯) ও ঋতুসংহারে (৪।১) উল্লেখ আছে। লোধ্ররেণু মাখা পাণ্ডুবর্ণ মুখের কথা রঘুবংশে বলা হয়েছে, "মুখেন সা লক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।" (৩।২)

দুই পাশের শ্যামল বা কৃষ্ণ বর্ণের মাঝে রক্তিম কুরবকের শোভা কবি মালতীমাধবেও উল্লেখ করেছেন (৩।৫)। রসিক কুরবক-শাখা শকুন্তলার গতিরোধ করেছিল। এমনি ভাবে কালিদাসের কাব্যের বহুস্থানে কুরবকের কথা পাওয়া যায়। এটি বাসন্তী পুষ্প—ঋতুসংহারে বলা হয়েছে। অম্লানস্তু মহাসহা। তত্রশোণে কুরবক ইত্যমরঃ। A red Kind of Barleria (M.W.)।

শিরীষের বড় কোমল প্রাণ, সে ভ্রমরের পদভার সহ্য করতে পারে না (কুমারসম্ভব ৫।৪)। এটি কর্ণভূষণ রূপে ব্যবহৃত হ'ত। ঘামে জড়িয়ে গিয়ে সুন্দরীদের আরও শোভা বাড়ত—(শকুন্তলা (১।২৭; রঘু ১৬।৪৮)। এর সৌকুমার্যের কথা কুমারসম্ভব (১।৪০) ও রঘুবংশে (১৮।৪৫) রয়েছে। শিরীষস্তু কপীতনঃ। ভণ্ডিলোঽপি ইত্যমরঃ—A cacia Sirissa (M.W.)।

মন্দার তরুর মধ্য দিয়ে মন্দাকিনী বয়ে গেছে।২১ সেই সুরভিত জলে যক্ষরমণী ও সুরনারীরা জলক্রীড়া করেন। অলক থেকে খসে পড়া মন্দার পুষ্প অভিসারিকাদের গোপন অভিসার-পথের পরিচয় দেয়।২২ কল্পতরু তাঁদের সকল অভাব মিটিয়ে দেয়।২৩

এই দুইটি স্বর্গের পুষ্পতরু। তবে কবি কালিদাস তাঁর কাব্যের বহুস্থানে এগুলির কথা উল্লেখ করেছেন।

অলকাপুরীর ধনপতির বাড়ীর অনতিদূরে উত্তরে যক্ষের আলয়। তোরণের দুই পাশে ছোট ছোট মন্দার-তরু, যক্ষবধূ সেগুলিকে পুত্রের মত ভালবাসেন।২৪ দীঘির ধারে সোনার কদলী-বৃক্ষের শ্রেণী ক্রীড়াশৈলকে ঘিরে আছে।২৫ সেখানে মাধবীলতার ঘরটি কুরবকে ঘেরা, দুই পাশে দুটি তরু, অশোক আর বকুল যাদের দোহদদানের ভার নিয়েছেন স্বয়ং গৃহস্বামিনী।২৬ মালতীলতাটি অদূরে, বাতাসে তার গন্ধ ভেসে আসে।

যক্ষপুরীতে কদলীবৃক্ষ সোনার। কদলীবৃক্ষের শৈত্য ও গুরুতা কবি উপমাচ্ছলে ব্যবহার করেছেন (কুমার ১।৩৬; উত্তরমেঘ ৩৫), মাধবী লতার কথা বহুবার শকুন্তলা ও বিক্রমোর্বশীতে বলেছেন (শ. ৩।৮, ৬।৮, শ ২।১০;

বি ২।৪, ২।৭)। "অতিমুক্ত পুণ্ড্রক স্বাম্বাসন্তী মাধবীলতা ইত্যমরঃ।" অশোকতরু কালিদাসের কাব্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রায় প্রত্যেক কাব্যেই কবি বহুবার তার কথা বলেছেন। কেশরোবকুল ইত্যমরঃ। শকুন্তলা (১।১৮,৪।৩), কুমারসম্ভব (৩।৫৫), ঋতুসংহার (২।২০,২৪) ও রঘুবংশে (৪।৬৭, ৯।৩০, ১৯।১২) উল্লেখ আছে। মালতী২৭ বর্ষাকালের সুবাসিত পুষ্প। ঋতুসংহারে বহুবার এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

নির্বাসিত যক্ষের মনে পড়ে তার প্রিয়ার কথা—সুখস্পর্শ শ্যামা বা প্রিয়ঙ্গু২৮ লতার কাছে সে ছুটে যায়। উত্তরে হাওয়া যখন দেবদারুর২৯ গন্ধ বয়ে আনে তখনও প্রিয়ার কথা তার স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। এমনি করেই সে দিন কাটায়।

প্রিয়ঙ্গু ও শ্যামা এক, অমরকোষে বলা হয়েছে। শ্যামা তু মহিলাহ্বয়ো···প্রিয়ঙ্গু ফলীনীফলীত্যমরঃ। Panicum Italicum (M.W.) ঋতুসংহারেও এই ভাব দেখা যায় (ঋ ৪।১০, ৩।১৮)।

দেবদারুর কথা হিমালয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বারবার উল্লেখ করেছেন। আর কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ উভয় কাব্যেই এর উল্লেখ আছে। পার্বতী এক দেবদারুকে পুত্রের মত পালন করেছিলেন—রঘুবংশে (২।৩৬) বলা হয়েছে। দেবদারুর বর্ণনা করা হয়েছে—দেবদারুবৃহদ্ভুজঃ (কুমার ৬।৫১)।

মেঘদূতের বহুস্থানে কবি অলঙ্কারের উপকরণ হিসাবে পদ্মকে ব্যবহার করেছেন (পূর্ব ৪১, ৫০, উত্তর ১৯,৩৪,২২)। এ ছাড়া কদলী (উত্তর ৩৫), কুন্দ (পূর্ব ৪৯), কুমুদ (পূর্ব ৪২), জবা (পূর্ব ৩৮) ও স্থলকমলিনী (উত্তর ২৯) বহুক্ষেত্রে অঙ্গ শোভা বর্দ্ধনের জন্য অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তার উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১ মেঘদূত পূর্বমেঘ ৫ শ্লোক।

২ মেঘদূত উত্তরমেঘ ২ শ্লোক।

৩ স্নিগ্ধছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥ (পূর্বমেঘ ১)

৪ স্থানাদস্মাৎসরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং···॥ (পূর্বমেঘ ১৪)

৫ জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ। (পূর্বমেঘ ২০)

৬ ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যাম জম্বু বনান্তাঃ···। (পূর্বমেঘ ২৩)

৭ স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ। (পূর্বমেঘ ৪)

৮ কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে। (পূর্বমেঘ ২২)

৯ ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ···। (পূর্বমেঘ ১৮)

১০ পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃত্তয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ···। (পূর্বমেঘ ২৩)

১১ নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেসরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈঃ···। (পূর্বমেঘ ২১)

১২ আবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্। (ঐ)

১৩ উদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকা-জালকানি। (পূর্বমেঘ ২৬)

১৪ কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলী-ন্ধ্রামবন্ধ্যাম্···। (পূর্বমেঘ ১১)

১৫ তস্যাঃ কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্ত বাণীরশাখম্···। (পূর্বমেঘ ৪৩)

১৬ শীতো বাতঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্॥ (পূর্বমেঘ ৪৪)

১৭ গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং ছায়া দানাং ক্ষণপরিচিত পুষ্পলাবীমুখানাম্॥ (পূর্বমেঘ ২৬)

১৮ ধারাপাতৈ স্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষ-মুখানি॥ (পূর্বমেঘ ৫০)

১৯ শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ···। (পূর্বমেঘ ৫৮)

২০ হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রী।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ (উত্তরমেঘ ৭১)

২১ মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি র্মন্দারাণাং তটবনরুখং ছায়য়া বারিতোষ্ণা॥ (উত্তরমেঘ ৬)

২২ গত্যুৎকমলাদলক পতিতৈর্যত্র মন্দার পুষ্পৈঃ···। (উত্তরমেঘ ১১)

২৩ একঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ॥ (উত্তরমেঘ ১৩)

২৪ হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দার-বৃক্ষঃ॥ (উত্তরমেঘ ১৪)

২৫ ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলী-বেষ্টন প্রেক্ষণীয়ঃ। (উত্তরমেঘ ১৬)

২৬ রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবী মণ্ডপস্য। (উত্তরমেঘ ১৭)

২৭ প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবজালকৈ মালতীনাম্। (উত্তরমেঘ ৩৭)

২৮ শ্যামাস্বংগং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্···। (উত্তরমেঘ ৪৩)

২৯ ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারু দ্রুমানাং···। (উত্তরমেঘ ৪৬)

রণ-তাণ্ডবে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতায় আমাদের পাড়ায় মায়ের আবির্ভাবের কাহিনীটা কতক কতক চালু আছে এখনও; বিশ্বাস জিনিসটা এমনই যে···

যাক্ গল্পটাই বলি। দাঙ্গার সময়কার কথা। যে-কোন সময় যে-কোন জায়গায় একটা কাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারে, জীবনটা যে সত্যই বুদ্বুদ শঙ্কর-বুদ্ধও এত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। দূরে কাছে, যখন-তখন জয় হিন্দ! আল্লা হো আকবর! বন্দেমাতরম্! কথাগুলার মানে বদলাইয়া গেছে, সেই মাতালটার কথা মনে পড়ে—বেটারা মধুর হরিনামকে তেতো করে দিলে!

ওর মধ্যে আবার বিবাহ আছে, পূজা আছে, যাত্রা-থিয়েটার আছে; সিনেমা আছে, জীবন-বুদ্বুদ যতটুকু থাকে একটু আলোর ঝিকিমিকি মাখিয়া থাকিতেই চায়।

যেখানেই দেখ ঐ এক আলোচনা। লোকে চলিতে চলিতে যেন জট পাকাইয়া যাইতেছে—গলিতে, ফুটপাথে, পার্কে; চারিদিককার খবর আসিয়া জুটিতেছে—সত্য, কাল্পনিক; আবার জট খুলিয়া যে-যার কাজে-অকাজে চলিয়া গেল; চাপা আতঙ্ক, সেইটাই আবার মত্ত স্লোগানে রূপান্তরিত হইয়া উঠে—জয় হিন্দ! আল্লা হো আকবর! ভয়-ভরসায় চলে মাখামাখি।

এ ভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় দল আছে, রীতিমত কুচকাওয়াজ, ডিসিপ্লিন্; অস্ত্র সংগ্রহ। অবশ্য আত্মরক্ষার ওজুহাতেই, তবে সেটা প্রধানতঃ অজুহাতই; আমাদের পাড়ার দলটা আড্ডা করিয়াছে দত্তদের বৈঠকখানায়। দত্তরা ফেরার, একটা নেপালী দারোয়ানের হাতে চাবি, বেশ ভাল করিয়া তাহাকে দলের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। সবাই হাবিলদার সাহেব বলিয়া ডাকে। এ খেতাবটা যে ওর পূর্ব্ব থেকেই ছিল এমন তো শুনি নাই; মানে, দস্তুরমত মিলিটারি কাণ্ড। ও. সি., মেজর, হাবিলদার, ক্যাপ্টেন—কিছুই বাদ নাই।

যেমন সব ক্ষেপিয়াছে, একটু যোগসূত্র ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে ঘরটাতে গিয়া বসি। নিজেদের নাম দিয়াছে সঙ্কটত্রাণ সমিতি; খবর লুকায়, তবু বুঝি অপরের সঙ্কট কম বাড়াইতেছে না। উপায় নাই, ওদিককার কাণ্ড শুনিয়া এক এক সময় নিজেদের রক্তই গরম হই। উঠে। তবুও গিয়া বসি মাঝে মাঝে, বোঝাই, যতটা ঠাণ্ডা থাকে।

বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার পর সেদিন সকাল থেকে গুজব রটিল ওদিককার ওরা লীগ গবর্ণমেণ্টের উস্‌কানি পাইয়াছে, সেই দিনই আমাদের পাড়ায় আক্রমণ চালাইবে।

তুমুল উত্তেজনায় কাটিতে লাগিল দিনটা; যতই কিছু না হইতে লাগিল, মনে হইল খুব গুরুতর রকমের কিছু একটা ঘটাইবার জন্যই ওদিকে সময় লইতেছে; সমস্ত পাড়াটা সমিতির ছেলেদের উদ্যোগে অস্ত্রেশস্ত্রে প্রস্তুত হইয়া উঠিল, ক্রমেই অধিক অধিক ভাবে। এর যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল সেই-টাই আশঙ্কা করিতে লাগিলাম—অর্থাৎ ওদিক থেকে যদি কিছু না হয়, এই আয়োজনের বিপুলতার চাপে এরাই শেষ পর্য্যন্ত মারমুখো হইয়া উঠিবে। ব্যাপারটা ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

সমস্ত দিনটা কিছু হইল না। সন্ধ্যার পর পাড়াটা হঠাৎ কেমন যেন থমথমে হইয়া পড়িল। লক্ষণটা ভাল বোধ হইল না। সমিতিই সমস্ত পাড়াটার কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে, প্রতিটি কণ্ঠের স্লোগানটুকু পর্য্যন্ত। হঠাৎ এমন নিস্তব্ধ ভাবটা কেমন যেন অস্বস্তিকর বোধ হইল। একটু খোঁজ লওয়া দরকার।

দত্তদের বৈঠকখানায় গিয়া দেখি বেশ ভরা ঘর, একটা কি চাপা মন্ত্রণা চলিতেছিল, আমি গিয়া পড়িতে সবাই একটু তটস্থ হইয়া পড়িল। আর চাপাচাপি করা চলে না, প্রশ্ন করিলাম—"সন্ধ্যের পর একটু যেন অন্য ভাব দেখছি আজ; ব্যাপারখানা কি—বলতে আপত্তি আছে?"

দু'একটা কণ্ঠে "আজ্ঞে···আজ্ঞে" করিয়া একটু কুণ্ঠার ভাব, তাহার পরই সমিতি মুখর হইয়া উঠিল—"ওপক্ষের ওরা আজকে জুৎ করতে পারে নি, তাই এগুল না···অথচ আজ যদি কোন রকমে টেনে আনতে পারি—উইক কিনা—একটিকে ফিরে যেতে দেব না···আজ্ঞে, তাই একটু ঘাপটি মেরে ঠাণ্ডা হয়ে থাকা···বাছাধনেরা যখন দেখবে···"

কথাবার্ত্তার মধ্যেই ঝমঝম্ ঝমঝম্ করিয়া একটা আকস্মিক শব্দে সবাই চকিত হইয়া উঠিলাম; এক লহমা, তাহার পর ঘর ফাটাইয়া সবাই একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল—"জয় হিন্দ!"

আমার কণ্ঠও মিশিয়াছিল।···বুড়ারা ছেলেদের টানিতে পারে না, ছেলেদের আকর্ষণই বড়।

বাহিরে আসিয়া সবাই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম, এক ঝলক হাসিও উঠিল উছলাইয়া—দুইটা গলি পরেই জেলে আর গোয়ালাদের মিশ্র বস্তি; আওয়াজটা সেইখান হইতেই উঠিয়াছে—কি উপলক্ষ্য করিয়া সেটা পরে আপনি প্রকাশ পাইবে বলিয়া এখানে আর লজ্জার মাথা খাইয়া উল্লেখ করিলাম না।

ঘরে আসিতে আসিতে নানা কণ্ঠে মন্তব্য শুনিতে লাগিলাম

—"ওরাই পারে···ওদেরই মানায়···সমস্ত দিন ঐ কাণ্ড করে, সন্ধ্যার পর যদি একটু এই রকম করে গা না এলায় তো বাঁচবে কি করে?···আর একা নয় তো, মেয়ে-পুরুষে লেগে গেছে—কচুকাটা করছে···আর সত্যিই তো, মেয়েদের আর ঘোমটা টেনে বসে থাকা চলে?···"

ঘরে আসিয়া আবার পলিসির আলোচনা চলিল।···লোক বাড়িতে লাগিল, নূতন নূতন খবর আসিয়া পড়িতে লাগিল—ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর। এদিকেও চর পাঠানো হইয়াছে—কেহ ফিরিয়া রিপোর্ট দিল, কাহারও ফিরিতে এত দেরি হয় কেন? মাঝে মাঝে দলের ছেলেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। একজন একজন করিয়া তাহাদের সন্ধানেও আরও জনচারেক রওনা হইয়া গেল।···বিষাদেরই আবহাওয়া, তবুও ছেলেগুলার বুকের পাটা দেখিয়া আনন্দ হয় বৈ কি।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। বসিয়া আছি, বসিয়া থাকিয়াই যতটুকু সংযত রাখা যায়। নিখোঁজ সঙ্গীগুলার জন্যই উত্তেজনাটা বাড়িয়া যাইতেছে ক্রমে ক্রমে; জাপানীদের মত সুইসাইড্ স্কোয়াড্ বা আত্মঘাতী বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে—চারি জন গিয়াছিল; আরও দুই জন চঞ্চল হইয়া উঠিল; কোনমতেই রোখা গেল না।

মৃদু 'জয় হিন্দ' ধ্বনির সঙ্গে তাহাদের বিদায় দিবে এমন সময় আগে যাহারা গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুই জন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল এবং প্রবল হাঁপানোর মাঝে কিছু বলিয়া উঠিতে পারার আগেই পাড়াটার উত্তর-পূর্ব্ব দিক মথিত করিয়া একটা তুমুল কলরব উঠিল—আল্লা হো আকবর!

সমস্ত দলটা একটু চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—নিশ্চয় আগে যে একটা ধোঁকা খাইয়াছে সেই স্মৃতিতেই। তাহার পর কিন্তু আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। ঘরের মধ্যে অস্ত্র সাজানো, অত ক্ষিপ্রতার মধ্যেও একটু গোলমাল হইল না, নিজের নিজেরটি তুলিয়া লইয়া সবাই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

ঘরটা খালি হইয়া গেল, রহিয়া গেলাম শুধু আমিই। অস্ত্রও নাই, শরীরে ওদের মত স্নায়ুর ক্ষিপ্রতাও নাই, আছে বয়োধর্ম্মের যা সম্বল—বিবেক, বিবেচনা, একটু থিতাইয়া জিরাইয়া চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা।

মনস্থির করিয়া বাড়ী হইতে একটা পিস্তল লইয়া বাহির হইতে মিনিট পনের হইয়া গেল। ডোবা ভরাট করা একটা পড়তি জায়গা, সেইখানেই কাণ্ডটা হইয়াছে। যখন পৌঁছিলাম তখন ওদিককার ওরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে; চঞ্চল জনতার মধ্যেই এর-ওর মুখে শুনিলাম পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে কয়েকজনকে রাখিয়াই। তাহাদের অবশ্য সন্ধান পাইলাম না।

হঠাৎ পড়্তি জমিটার একদিকে একটা তুমুল কলরব উঠিল—"মা!—মা!—মা!—মা এসেছেন!···জয় মা!···"

সবাই সেই দিকে ছুটিল। যেন চাকের গায়ে মৌমাছি জমিয়া উঠিল, আর ঐ শব্দ—আকাশ যেন মথিত হইয়া যাইতেছে। ভিড় চিরিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে একেবারে বাক্‌-রোধ হইয়া গেল। কল্পনাতীত ব্যাপার।

একটি স্ত্রীলোক। আমি পিছনের দিকটায় গিয়া দাঁড়াইয়াছি, ভাল দেখিতে পাইতেছি না, তবুও অদ্ভুত! স্ত্রীলোকটির পরিধানে একটা টক্‌টকে রাঙা চেলি, কতকটা মহিষমর্দ্দিনীর মতই গাছকোমর করিয়া পরা। মাথার কাপড় খানিকটা সরিয়া গিয়া আলুলায়িত কুন্তলের একটা রুক্ষ গুচ্ছ দক্ষিণ বাহুর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পাশ দিয়া যতটা দেখা যায় মুখের চোয়ালটা কঠোর, কতকটা পুরুষালিই, হাতটা পেশীবহুল, করতল রক্তবর্ণ; আমার সামনেই পায়ের পাতাটা উল্টাইয়া রহিয়াছে, পেলব নয় মোটেই, তবে সমস্তখানি আলতায় রাঙা, ধুলায় যা একটু মলিন করিয়াছে।

সবচেয়ে যা বিস্ময়কর—রোমাঞ্চকর বলাই ঠিক—রমণী একটা গুণ্ডাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার নাভিকুণ্ডের উপর ডান হাঁটুটা চাপিয়া দুই হাতে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া যাইতেছে। গুণ্ডাটার মুখটা শ্মশ্রুবহুল হওয়ায় সমস্ত দৃশ্যটা এমন নিখুঁতভাবে মহিষমর্দ্দিনীর চিত্রের মত হইয়া উঠিয়াছে যে সত্যই সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। লোকটাকে দেখিলে মনে হয় তাহার আয়ু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ মাথায় কিছুই বুদ্ধি আসিল না, তারপর হঠাৎ কানে গেল—"মা! মা! এই নাও, শেষ করে দাও মা···" সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতার একটা উল্লসিত চীৎকার—"জয় মা!"

ঘুরিয়া দেখি একটি যুবকের হাতে একটা ছোরা। হুঁস হইল, একরকম লাফাইয়া গিয়াই তাহার হাত হইতে সেটা কাড়িয়া লইলাম।

ঐতেই বুদ্ধিটা ফিরিয়া আসিল কতকটা, বলিলাম, "দেখছ কি? তোল ওঁকে, ছাড়িয়ে দাও···"

নিজেই গিয়া হাতটা ধরিলাম। খানিকটা নিশ্চয় আমারও ঘোর আসিয়া গেছে, তা ভিন্ন স্ত্রীলোকই তো, বলিলাম, "মা, যথেষ্ট হয়েছে···ছেড়ে দাও, দয়া কর, তুমি যে কারুর মা-ই সেইটুকু মনে কর···"

অসীম ক্ষমতা শরীরে, আর যেন সংহারের নেশায় মাতিয়া গেছে; তবে কি মনে হওয়ায় আমার দেখাদেখি আরও কয়েক জনে আসিয়া ধরিয়া ফেলিল।

পড়্তি জমির অপ্রচুর আলোকে যতটা সম্ভব চেহারাটা ভাল করিয়া দেখিলাম। বিকট, কোনখানে এতটুকু রমণী-সুলভ মাধুর্য্যের অবশেষ নাই। শুধু চক্ষু দুইটি বিশাল, আয়ত; তাহাও কিন্তু ললাটের নিম্নে অগ্নিপিণ্ডের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। আরও যা—কি বলিব?—ভাষা পাইতেছি না—আরও যা ভীষণ, রহস্যময়—মুখে অল্প অল্প সুরার গন্ধ! কিন্তু

কোন কথা নাই, ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত স্ফীত নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া যে একটা সাঁ সাঁ শব্দ বাহির হইতেছে—শব্দের মধ্যে মাত্র সেইটুকু।

'মা-মা!' শব্দ গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে। ভিড় আরও চাপ বাঁধিয়া উঠিতেছে।...কি করা যায়? বুদ্ধি কাজ করিতেছে না।

হঠাৎ চৈতন্য হইল, সমিতির দু'চারজন অগ্রণীকে বলিলাম, "ভুল হয়ে যাচ্ছে—ভিড় সরাও, দাঙ্গার জায়গা এখুনি পুলিস এসে পড়বে..."

"ওঁকে?...মাকে?"

"ওঁকে দত্তদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি...শীগ্‌গির ভিড় পাৎলা কর..."

খুবই শক্ত ব্যাপার, সাক্ষাৎ মা কালীর অবতরণ হইয়াছে, লোকে মত্ত উল্লাসে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মহলা দিয়া দিয়া ছেলেরা পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চমৎকার নিয়মানুবর্ত্তিতা—দেখিতে দেখিতে সমিতির ছেলেরা ছাড়া সমস্ত ভিড়টা প্রায় পরিষ্কার হইয়া গেল—কতকটা ভয়ে, কতকটা আবার ইহাদের দাবেও। ফিল্ড হাসপাতালও আছে, গুণ্ডাটাকে সেইখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীলোকটিকে মাঝে করিয়া দত্তদের বৈঠকখানায় লইয়া আসিলাম। আপত্তি মোটেই করিল না, তবে একটা কথাও বলিল না। অত্যন্ত অন্যমনস্ক, যেন অন্য কোন্ লোকে রহিয়াছে, শুধু স্ফুরিত নাসারন্ধ্র দিয়া ব্যর্থ আক্রোশের চাপা গর্জ্জন আসিতেছে বাহির হইয়া।

জায়গাটা থেকে দত্তদের বাড়ী বেশ খানিকটা দূরে, গোটা-কতক গলি দিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সবাই নিস্তব্ধ, একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; হিন্দুরই মন তো। প্রথমে যাই ভাবি, সময় পাইয়া আমি সে বিশ্বাসটা অবশ্য কাটাইয়া উঠিয়াছি। তবে সাক্ষাৎ মা কালী না আসুন, একটা বিপন্ন জাতির উদ্ধারের জন্য মানুষের মধ্যেও তো দৈব শক্তির আবির্ভাব হয়—জোয়াঁ অব্ আর্কের মধ্যে ইতিহাসই যে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে—হয় তো ইনি কুমারী নন, তা সবাইকেই যে কুমারী হইতে হইবে তাহার মানে কি?—শক্তির আধার কি এক রকমই?

বৈঠকখানায় আনিয়া একটি সোফায় বসাইলাম। বলিলাম —"এবার শীগগির এঁর একটু আহারের ব্যবস্থা কর।"

একটি ছোকরা চাপা গলায়, তবুও যাতে স্ত্রীলোকটির কানে যায়, এই ভাবে বলিল—"ভোগ বলুন স্যার।"

বলিলাম—"হ্যাঁ, ভুল হয়েছে, ভোগই...শীগ্‌গির দেখো, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

এতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি একটু মুখ খুলিল, খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিল —কিম্বা...যেন এই রকম শুনিলাম—"মাংস।"

সমস্ত ঘরটা আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আমারও বুদ্ধি আবার লুপ্ত হইয়া আসিতেছে,—এ কি আহারের আদেশ! কতকটা বিমূঢ় ভাবেই বলিলাম—"মাংস আনো...মাংস।"

সেই ছেলেটি সেই ভাবে প্রশ্ন করিল—"বলির ব্যবস্থা করি?"

সকলেই একবার মুখের পানে চাহিল, মূর্ত্তি শুধু না'র ভঙ্গিতে একবার মাথাটা ঈষৎ নাড়িল।

আমার বুদ্ধি মাঝে মাঝে ফিরিয়াও আসিতেছে একটু একটু, বলিলাম—"চপ কাটলেট, কোর্ম্মা...এই রকম...শীগগির ...হোটেল থেকে..."

মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম আপত্তির কোন ইঙ্গিত নাই। জনপাঁচেক ছেলে এক রকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘরে তো তিল ফেলিবার জায়গা নাই, বাহিরের বারান্দাটাও গেছে ভরিয়া; গোটা-দুয়েক জানলা সামনের দিকে—তা এক একটাতে রাশীকৃত কুতূহলী মুখ গরাদ চাপিয়া আছে; দরজাটা একেবারে ঠাসাঠাসি। তবে এক চাপা 'মা-মা' ছাড়া কোন শব্দ নাই।

এমন সময় হঠাৎ গলিতে একটু দূরে একটা কচি গলার কান্না উঠিল এবং পরক্ষণেই বোঝা গেল ছেলে বা মেয়ে যেই হোক, দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া যেন এই দিকেই আসিতেছে।

আবার একটা ত্রস্ত গুঞ্জন উঠিল ঘরটাতে, একটা সচকিত ভাব, বলিলাম—"দেখতো...কাঁদে কেন?..."

তাহার আগেই চার-পাঁচ জন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেছে। একটু পরেই একটা ছেলেকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া বারান্দার প্রান্তে দাঁড় করাইল। আমি দরজার কাছে আগাইয়া গেলাম। ভিড় দু'পাশে, একটু সরিয়া দাঁড়াইতে দেখি এও এক অদ্ভুত ব্যাপার—অলকা-তিলকা আঁকা, ধড়া-চূড়া পরা একটি আট নয় বছরের শ্রীকৃষ্ণ, তাহার কান্নাও তখন স্পষ্ট—"জেঠা-মশাই!...জেঠামশাইকে দেখব...আমার জেঠামশাইকে মেরে ফেলেছে!..."

"কোথায় ছিল তোর জেঠামশাই?"

ততক্ষণে তাহার দৃষ্টিটা ভিতরের দিকে পড়িয়া যাওয়ায় হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মূর্ত্তিটার দিকে দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—"ঐ তো, ও জেঠামশাই গো।..."

একটু নিস্তব্ধতা; সবাই বুঝিল বেচারার মাথা বিগড়াইয়া গেছে।

কয়েকজন ঘিরিয়া বলিল—"ও তো মেয়েছেলে, দেখছিস ...কাঁদিস নি, খুঁজে বের করছি তোর জেঠামশাইকে...ঠাণ্ডা হ' দিকিন..."

"না, মেয়েছেলে নয়···আমার মা···ছেড়ে দাও আমায়···"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন নেশাখোর গোছের লোক খিঁচাইয়া উঠিল—"একবার মা, একবার জেঠামশাই···বেটা, মাথা খারাপ হয়েছে তো না হয় বাবাই বল্—একটা লোককেই ভাসুর আর ভাদ্দরবৌ···"

মূর্ত্তি মাথাটা হেঁট করিয়া লইয়াছে। আমি যে এতক্ষণ কথা বলি নাই তাহার কারণ আছে—মাথাটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। আগাইয়া গিয়া বলিলাম—"ছেড়ে দাও ওকে···ব্যাপারটা কি রে? এদিকে আয় তো, বল্ খুলে, ভয় নেই···"

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে এবং তাহারই মধ্যে আড়াল দিয়া কতকটা ভয়ে এবং কুণ্ঠায় মূর্ত্তিটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল—"জেঠামশাই-ই তো···যাত্রায় মা যশোদা সেজেছেল, আমি হনু কেষ্ট···তারপর গড়পাড় থেকে মোছলমানেরা এসে পড়ল—তারপর···"

সবাই থ হইয়া গেছে।

মূর্ত্তিটা হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, ছেলেটার হাতটা ধরিয়া বলিল—"চ" হারামজাদা—হ'ল যদি দু'টো চপকাটলিসের জোগাড় তো কোথা থেকে শনির মতন এসে জুটল—মালের মুখে যে একটু তোয়াজ করে লোক খাবে···"

ছেলেটাকে টানিতে টানিতে ভিড় চিরিয়া ঈষৎ টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

প্রশ্ন

শ্রীনারায়ণ দত্ত

তোমায় আমি যে ভালবাসলেম
তুমি যদি জানতে
বিশাল নয়ন মেলে বিস্ময় হানতে।
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল সন্ধ্যা,
তোমার মানস আজো অনুভূতি বন্ধ্যা—
অর্ঘ্য সাজিয়ে মিছে আসলেম।
চেয়ে আছি কবে ঢল নামবে
শঙ্কার জটা বেয়ে উচ্ছল কামনায়
পাগ্‌লাঝোরার ধারা আন্‌বে···
আমার পথের শেষে দিগন্ত রিক্ত,
এখানে তো ফুল নেই নেই বন রঙ্ নেই
রাত্রির বর্ণেই প্রাণ অভিষিক্ত;
এখানে দিনেরা শুধু তমসার শঙ্কায়
বিবর্ণ সূর্য্যের মত অভিশপ্ত।

আমার জীবন ঘিরে অবিরাম ঝঞ্ঝা,
এখানে দেখেছি আমি মৃত্যুর তাণ্ডব
এখানে নিয়তি রূঢ়-ছন্দা;
এখানে দিনের শেষ রক্তের প্লাবনেই
শোষণে ও শাসনেই স্তব্ধ;
মর্ম্মের সাগরের ঊর্মির দোল নেই—
শিলায়িত পুষ্পের স্বপ্ন।
এখানে তবুও আমি জীবনের সাধনায়
সূর্য্যের কামনায় মগ্ন,
তোমার বিশাল চোখে বক্ষের তৃষ্ণায়
খুঁজে ফিরি আরণ্য লগ্ন।
তোমায় আমি যে ভালবাসলেম
কারণটা যদি শুধু জানতে
বিশাল নয়ন মেলে আমার প্রাণের 'পরে
কি চাহনি বল তবে হানতে?

ভীমসেন　　গণপতি　　ভীমসেন

প্রথাগত কাঠখোদাই মূর্ত্তি। শিল্পী—শ্রীঋতেন্দ্র মজুমদার

শিল্প-কলা প্রদর্শনী

শ্রীদ্বিজেন মৈত্র

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের উদ্যোগে চার জন শিল্পীর শিল্পকলার একটি মিলিত প্রদর্শনী কিছু দিন আগে কলিকাতা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শিল্পীদের মধ্যে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ৺রামকিঙ্কর এঁরা দু'জনে শিল্পরসিক মহলে সুপরিচিত। শ্রীমতী লীলা মুখোপাধ্যায় ও ঋতেন্দ্র মজুমদার এখনো শিক্ষার্থী। এঁরা সম্প্রতি নেপাল পরিভ্রমণ করে এসেছেন। সেখানকার পারিপার্শ্বিক এঁদের মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তার পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন স্কেচ, কাঠখোদাই, পাথর ও ধাতু তক্ষণের মধ্য দিয়ে।

এই রূপময় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ লোকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা গতানুগতিকতা আছে। যখন কোন শিল্পী তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা নতুন দেশের রহস্যময় ভাষা আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন তখনই আমাদের গতানুগতিক দৃষ্টির ব্যর্থতা ও শিল্পীর দৃষ্টির অনন্যতন্ত্রতা সম্বন্ধে আমরা সজাগ হই। এই প্রদর্শনীতে যে কয়টি চিত্র ও অন্যান্য শিল্পকর্ম্ম প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলির বিষয়বস্তু নেপালের পারিপার্শ্বিক, প্রকৃতি, মানুষ, জনতা, হাট, বাজার, মন্দির প্রভৃতি থেকে গৃহীত। এই শিল্প-রচনাগুলির মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কতটুকু এবং শিল্পকলার দিক থেকে তার আসল মূল্য কি প্রধানতঃ সে বিষয়েই আমাদের কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হওয়া আবশ্যক।

এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা প্রদর্শিত সমুদয় চিত্ররচনার একটি মাত্র পরিচায়িকা দিয়েছেন—"রঙ ও কালিকলমের স্কেচ।" যে সঙ্কীর্ণ অর্থে 'স্কেচ' কথাটির প্রয়োগের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেদিক থেকে উক্ত প্রদর্শনীর যাবতীয় চিত্ররচনাকে 'স্কেচ' নামাঙ্কিত করা অসঙ্গত। চিত্রশিল্পের মধ্যে যে বিশদ ষ্টাডি ও finished drawing-এর প্রত্যাশা করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যদি এগুলিকে 'স্কেচ' পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে তবে বলা যেতে পারে যে কি ইউরোপীয়, কি ভারতীয় অনেক বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী শুধু 'স্কেচ'ই সৃষ্টি করেছেন, painting বা চিত্ররচনা করেন নি। এমন কি আচার্য্য নন্দলাল—যাঁর চিত্রকর্ম্মের বিশ্লেষণাত্মক ট্রিটমেণ্ট ও finished drawing বিস্ময়ের বস্তু, তাঁরও অনেক চিত্ররচনা, বিশেষ করে কয়েকটি নিসর্গ-চিত্রকে স্কেচ পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু এ হ'ল ব্যাপক অর্থে স্কেচ বলতে কি বুঝায়—আসলে স্কেচ হ'ল

দৃশ্যবস্তুর প্রাথমিক শিল্পরূপায়ণ। স্কেচ-শিল্পীর কাজ প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে চয়ন করা, রূপের মোট সংগ্রহ। স্বল্প সময়ের

স্নাতক (নেপাল)
কাঠখোদাই। শিল্পী—শ্রীঋতেন মজুমদার

পরিসরে মনোজগতে রূপময় বিশ্বের যে বিশিষ্টতাটুকু ধরা পড়ল স্কেচ হ'ল তারই "first fine careless rapture" অর্থাৎ—চরম আনন্দের অযত্নকৃত প্রাথমিক মধুর প্রকাশ। রস-বিচারের এই মাপকাঠিতে বিনোদবিহারীর চিত্রশিল্পকে 'স্কেচ' বলে স্বীকার করে নেবার পথে একটা বাধা আছে। যদিও শিল্পীর মানসপটে যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর দ্রুত প্রতিফলনের ছাপ ছবি-গুলির সর্ব্বত্র স্পষ্ট তবুও ফর্ম্ম বা রূপ আবিষ্কারের দিকে একটা অখণ্ড মনোযোগ, রঙের বিশিষ্ট প্রয়োগে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করবার প্রয়াস, পরিবর্জ্জন ও গ্রহণের দ্বারা চিত্রের ভারসাম্য সৃষ্টি প্রভৃতি তাঁর শিল্প-রচনাগুলিতে স্কেচের চেয়ে চিত্রশিল্পের মৌল ধর্ম্মকেই ব্যক্ত করেছে অধিক। তাঁর অনেক চিত্র একান্ত ভাবেই সুসম্পূর্ণ। সে সম্পূর্ণতা শুধু চিত্রণের দিক থেকে নয়, শিল্পীর মানসিকতার দিক থেকেও।

ড্রাফটসম্যান হিসাবে বিনোদবিহারীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য্য হলেও এ সব চিত্রের প্রাথমিক উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে রেখা-বিন্যাসের স্থিতিস্থাপকতা থেকে। যে-কোন পরিবেশ থেকেই 'ফর্ম্ম' আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে মূলতঃ ড্রইঙের দক্ষতায়। রঙের প্রয়োগ তাকে স্পষ্টতর করেছে মাত্র। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে চিত্রের বিশিষ্ট গুণ ফুটিয়ে তুলবার জন্যে একটি বিশেষ রঙের প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। যেমন কোন চিত্রে সিঁদুরে রঙের একটি স্পর্শ চিত্রকে একটি বিশেষ সংহত রূপ দান করেছে। কিন্তু যখনই শিল্পীকে নেপালের মানুষ, জনতা প্রভৃতিকে তুলিতে রূপায়িত করতে হয়েছে,

ধারাস্নান
শিল্পী—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

তখনই তাকে রেখার সেই প্রকৃতি আবিষ্কার করতে হয়েছে, যা সেই বিষয়বস্তুর যথার্থ প্রতিভূ হয়ে ধরা দেয়।

স্বতন্ত্র পন্থা দেখা গেল রামকিঙ্করের শিল্পকলায়। রাম-কিঙ্করের রচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, তিনি মাত্র রঙের মাধ্যমেই 'ফর্ম্ম' আবিষ্কারের কৌশলটি আয়ত্ত করেছেন এবং massএর solidity-র (বস্তু-পুঞ্জের ঘনত্বের) নিখুঁত আভাস দিতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি নিঃসংশয়েই আধুনিক, যে আধুনিকতার প্রবণতা হ'ল মৌল

তুষার শৈল শিল্পী—রামকিঙ্কর

বস্তুর রূপের পরিচয় দেওয়াতে। এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা সার্থক শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁর প্রধানতম সহায় হ'ল রঙ। অথচ তাতে ইমপ্রেসনিষ্ট পন্থার আভাস মাত্র নেই।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিল্পীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য বস্তুর বাহ্যরূপের একটা বর্ণনা দেওয়া ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার লক্ষ্য থাকে ফর্ম্মের দিকে। রঙ এই ফর্ম্ম সৃষ্টির একটা উপায় মাত্র। রামকিঙ্কর এ সত্য ভাল ভাবেই জানেন, তাই তাঁর চিত্রে বিষয়বস্তুর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্য দিকে রস-চেতনাকে উদ্বোধিত করার অন্যান্য কৌশলও তাঁর অনায়ত্ত থাকে নি। তাই তিনি শুধু বর্ণবিদ্ নন, রঙ ফর্ম্ম ডিজাইন প্রভৃতি রূপব্যঞ্জনার মুখ্য কৌশলগুলির সৌসামঞ্জস্য তাঁর চিত্রে দেখা গেছে। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পে যাঁরা Colourist বা বর্ণবিদ্ বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও এইখানেই। এই প্রসঙ্গে সেজানের নাম স্মরণীয়। কিন্তু রামকিঙ্করের শিল্প ত শুধু রঙের সুষ্ঠ প্রয়োগ নয়, তাঁর শিল্পকলায় আরও অনেক quality বা গুণের সংমিশ্রণ সুপরিস্ফুট। তাঁর শিল্প প্রকৃতির খুব কাছাকাছি এবং বাস্তব অভিমুখী কিন্তু পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাময়। তাঁর তুলিকায় রূপায়িত প্রকৃতি সর্ব্বদাই গতিমুখর। পাহাড়, গাছ, মেঘ সকলের মধ্যেই একটা গতির প্রচণ্ড স্পন্দন অনুভব করা যায়। সেজানের শিল্প একেবারেই গতিহীন—গাছ, পাতা, জল, মেঘ সব নিথর। তা যেন "antithesis of expressive art"—ব্যঞ্জনাময় শিল্পের বিরুদ্ধধর্ম্মী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, রামকিঙ্করের "তুষার শৈল" নামে চিত্রটি। ছবিটির রচনা-পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে সেজানের বিখ্যাত চিত্র "Monte Sainte Victorie"র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে দুটি চিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের শিল্পসৃষ্টির মূলগত বিভিন্নতাই দুটি চিত্রের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। উভয় শিল্পীর রচনাতেই যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই তা হ'ল প্রকৃতির বিশৃঙ্খলতার মধ্যে সুসমঞ্জস ঐক্য আবিষ্কার আর তাকেই তাঁরা রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু সেজানের রঙের ব্যবহার যেখানে একান্তভাবে জ্যামিতিক ফর্ম্মের অতিরিক্ত কিছুই নয়, রামকিঙ্করের রঙের প্রয়োগ সেখানে plastic quality ব্যতীত একটা আবেগের কমনীয়তাও এনে দিয়েছে।

অবশ্য এই প্রদর্শনীতে রামকিঙ্করের যে কখানি চিত্র

প্রদর্শিত হয়েছে, তার সব কয়টিই নেপাল সম্পর্কিত এবং সবগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা না হলেও এর থেকেই শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতা ও বিশেষত্বটুকুর পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলেছি, এ প্রদর্শনীর আর দু'জন শিল্পী এখনও ছাত্র। তবু এঁদের রচনা যে সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করতে চলেছে তা বুঝতে পারা যায়। শ্রী ঋতেন্দ্র মজুমদারের ছবিতে বিনোদবিহারীর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। তবে এই প্রভাব যে অনুকরণে পর্য্যবসিত হয়নি এইখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব।

ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিষেরই দাম অসম্ভবরকম বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষ দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। যে হারে জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িয়াছে, সেই হারে সাধারণ মানুষের আয় বাড়ে নাই। সম্প্রতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য-মান কিছু কমতির দিকে যাইতেছে বটে, কিন্তু কবে যে মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বের মানে পৌঁছিবে তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, মূল খাদ্যের মূল্যের উপরেই অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্য প্রধানত: নির্ভর করে। সাধারণ লোকেরাও এই মত পোষণ করেন। বাস্তবক্ষেত্রেও এই মতের সমর্থন দেখা যায়। সুতরাং চাল ও গমের মূল্য কি উপায়ে কমানো যায় তাহা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এমন কার্য্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে যাহার দ্বারা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন হয় এবং উৎপাদনের ব্যয়ও কমে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকার ও দেশের জনসাধারণকে একযোগে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। কলিকাতায় ভারতীয় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের বার্ষিক সভায় সভাপতি মি: এলকিন্স ঠিকই বলিয়াছেন, "আমরা মনে করি অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বিশেষ পরিমাণে হ্রাস করার উপর সরকারের সমস্ত পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, খাদ্যের দাম না কমিলে জীবনযাত্রার ব্যয় কমিবে না।" এ সম্বন্ধে গত পৌষ মাসের 'প্রবাসী'র মন্তব্যও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রবাসী লিখিয়াছেন, "খাদ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের উপর সত্য সত্যই এখন সমস্ত কাজকর্ম নির্ভর করিতেছে, দাম না কমা পর্য্যন্ত কোন দিকেই কূলকিনারা পাওয়া যাইবে না।"

কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতেও ধান-চাউলের মূল্য বাড়াইয়া দিলেই (অস্বাভাবিক উপায়ে?) দেশের বর্তমান দুর্গতির অবসান হইবে। অবশ্য ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, বর্তমানে ধান উৎপাদনের ব্যয়ের সহিত উহার মূল্যের কোন সামঞ্জস্য বা সমতা নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে, বর্তমানে গবর্ণমেণ্ট যে মূল্যে ধান সংগ্রহ করিতেছেন তাহা উৎপাদনের ব্যয়ের তুলনায় খুব কম। গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট মূল্য মণপ্রতি সাড়ে সাত টাকা। ইহার ফলে ধান্য-উৎপাদনকারীগণের তথা কৃষকসম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নাই এবং ধান্য চাষের প্রতিও তাহাদের কোন উৎসাহ নাই। এই মত কত দূর সমর্থনযোগ্য তাহা প্রত্যেকেরই বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার যে, ধান্য উৎপাদনের খরচ কত তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কঠিন, এমন কি অসম্ভবও বলা যাইতে পারে। যাঁহারা ধানের মূল্যবৃদ্ধির পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে এক জন কৃষিবিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে, তিনি মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে এক মণ ধান্য উৎপাদনের খরচা অন্তত: ১০৲ টাকা পড়ে, আর এক জন বলিয়াছেন ৮৲ টাকা।

বিভিন্ন স্থানের অবস্থার উপর ধান্য উৎপাদনের খরচ নির্ভর করে; এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে উৎপাদনের পরিমাণেরও তারতম্য হইবে। এমন কি একই এলাকায় প্রায় একই রকমের চাষবাসের প্রণালী সত্ত্বেও, এমন কি দুই-একটি কারণের জন্য উৎপাদনের পরিমাণের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাইবে, অথচ খরচ প্রায় সমানই হইবে। সুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদনের খরচের মোটামুটি একটা গড় হিসাব ধরিয়া লইতে হইবে। এই গড় হিসাবের দ্বারাও এমন কথা বলা যাইবে না যে, প্রত্যেক ধান্য-উৎপাদনকারী ধানের চাষে লাভবান হইবেন, কারণ গড় অপেক্ষাও বিভিন্ন কারণবশত: কাহারও কাহারও ফলন কম হইতে পারে। বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণত: এক মণ ধান উৎপাদনের জন্য ৫।৬ টাকার বেশী খরচ হয় না। নিম্নে একখানি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম:

মাছাডী, সিলদা
মেদিনীপুর
২৮।৮।৫৬

মহাশয়,

আপনার ১১।১২।৪৯ তারিখের চিঠি পেয়ে এক বিঘা জমি চাষ করিতে এখানে কি খরচ হয় এবং কত ধান ও খড় উৎপন্ন হয় তাহা বিশেষভাবে নিম্নে লিখিত হইল। আমাদের এই অঞ্চল (মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ) উচ্চ কঙ্করময় ভূমি। এখানে চারি প্রকার জমিতে (আওয়াল, দোয়েম, সোয়েম ও চাহারাম) ধান চাষ হয়। প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ খুব কম, অন্যান্য জমিও হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জমির মত উর্বর নয়। তবে এখানকার মজুরি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কিছু সস্তা।***

বিনীত
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী ভূভাগের এক বিঘা জমির ধানের চাষের হিসাব :

বিঘা প্রতি গড় খরচ—

সার—৯৲	রোপণ—৬৷৹
বীজ—২৷৷৹	নিড়ান—২৷৷৹
লাঙ্গল—৯৲	ছেদন—২৷৷৹
আলিবন্ধন—২৷৷৹	আঁটিবন্ধন ও বহন—৩৲
	ঝাড়ন, মাড়ন—২৷৷৹
	মোট—৪০৲ টাকা

গরীব দেশ, সকলে উপরোক্ত পরিমাণ খরচ করিতে পারে না।

ফলন	ধান	খড়
আওয়াল	৮ মণ	৸৶৹ পণ
দোয়েম	৬৷৷৹ ,,	৸৵৹ ,,
সোয়েম	৫।৹ ,,	৷৷৶৹ ,,
চাহারাম	৪।৬ ,,	৷৷৵৹ ,,

মনে রাখিতে হইবে, উপরে একটি অনুর্ব্বর অঞ্চলের হিসাব দেওয়া হইল।

আর একটি অঞ্চলের (হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত) হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—ইহা নিজের অনুসন্ধানে জানিয়াছি।

এক বিঘা বীজ-ক্ষেত্র প্রস্তুতের খরচ :

(১) ছয় বার লাঙ্গল— (প্রতিবার ১৸৹ হিসাবে)	১০৷৷৹
(২) বীজ ধান ২ মণ	২৪৲
(৩) গোবর সার (৮০ ঝোড়া) বহনের ও প্রয়োগের খরচ	৪৲
(৪) অন্যান্য খরচ	৩৷৷৹
	৪২৲ টাকা

উপরের হিসাবে গোবরের মূল্য ধরা হয় নাই ; সাধারণতঃ কৃষকগণ নিজেদের গোয়ালের গোবর ব্যবহার করেন।

এক বিঘা বীজক্ষেত্রে উৎপন্ন চারা ১৪।১৫ বিঘায় রোপণ করা যায়।

এক বিঘা ধানের চাষের খরচ :

(১) তিনবার লাঙ্গল (প্রতি লাঙ্গল ৩৷৷৹ টাকা হিসাবে)	১০৷৷৹
(২) রোয়া ৪ জন (প্রতিজন ২৲ হিসাবে)	৮৲
(৩) নিড়ান ২ জন (,, ,, ১৸৹ ,,)	৩৷৷৹
(৪) জমির আইল বাঁধা এক জন	২৲
(৫) ধান কাটা চার জন	৮৲
(৬) আঁটি বাঁধা, বহন, গাদা দেওয়া আড়াই জন	৭৷৷৹
(৭) ঝাড়ন, মাড়ন তিন জন (প্রতিজন ১৸৹ হিসাবে)	৫।৹
(৮) আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ	২।৹
(৯) চারার খরচ	৩৲
(১০) জমির খাজনা	৪৲
	৫৪৲ টাকা

ফলন : ধান—৮ মণ
খড়—১ কাহন

বর্ত্তমান সময়ে উক্ত অঞ্চলে ধানের মূল্য প্রতি মণ ১১৲ টাকা এবং এক কাহন খড়ের মূল্য ২২৲ টাকা, সুতরাং ধান ও খড়ের মোট মূল্য ১১০৲ টাকা। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান বৎসরে ধানের ফলন গড় ফলন অপেক্ষা অতিরিক্ত হইয়াছে। সুতরাং লাভের অঙ্কও অধিক।

অনেকের মত এই যে, পূর্ব্বে এবং এখনও ধানের চাষে যে পরিমাণ খরচ হয় তাহা ধানের মূল্যের প্রায়ই সমান। কেবল মাত্র উৎপন্ন ধানের মূল্য হিসাব করিলে ধানের চাষে লাভ কিছুই থাকে না। খড়ই লাভের অঙ্কে যায়। বর্ত্তমানে খড়ের মূল্য খুবই বেশী।

ধানের চাষে লাভ-লোকসান হিসাব করিতে হইলে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে, বর্গাচাষের পরিমাণ এবং নিজ হস্তে চাষের পরিমাণ। এই হিসাবও সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটিভাবে একটা হিসাব করা যাইতে পারে এবং সেই হিসাবের দ্বারা প্রকৃত অবস্থার মোটামুটি ধারণা হইতে পারে। যে সকল কৃষক বা জমির অধিকারী বর্গাচাষীর সাহায্যে ধানের চাষ করিয়া থাকেন তাঁহারা বিনা খরচে তাঁহাদের জমির উৎপন্ন ধানের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন। চাষের ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, যাঁহাদের পাঁচ

একর (১৫ বিঘা) পরিমাণ পর্য্যন্ত জমি আছে তাঁহারা প্রধানতঃ নিজ হস্তে জমির চাষ করিয়া থাকেন; যাঁহাদের জমির পরিমাণ পাঁচ একর হইতে দশ একর তাঁহারা আংশিক-ভাবে বর্গাদারের উপর নির্ভর করেন এবং যাঁহাদের দশ একরের বেশী জমি আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা সম্পূর্ণ-রূপে বর্গাচাষীদিগের উপর নির্ভর করেন।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী পাঁচ একর পর্য্যন্ত ধান্য-উৎপাদন-কারী পরিবারের সংখ্যা ১৭·৩৬ লক্ষ এবং পাঁচ একরের অধিক ধান্য-উৎপাদনকারী পরিবারের সংখ্যা ৬·১৪ লক্ষ। এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, ৬·১৪ লক্ষ পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষের জন্য সম্পূর্ণরূপেই বর্গাচাষীর উপর নির্ভর করেন এবং ১৭·৩৬ লক্ষ পরিবার আংশিকভাবে তাহাদের উপর নির্ভর করেন। সুতরাং চাষের ব্যয় বৃদ্ধি অনুসারে হিসাব করিলে উৎপাদনের খরচের হিসাব ঠিক হইবে না। কত পরিমাণ শস্য বর্গাচাষের জন্য বিনা খরচে পাওয়া গেল এবং কত পরিমাণ শস্য কি খরচে পাওয়া গেল তাহার সঠিক হিসাবের দরকার।

সমগ্র জীবনযাত্রার ব্যয়ের মানের সহিত চালের বর্তমান মূল্য-মানের তুলনা করিয়াও এই বিষয়ে কতকটা ধারণা হইতে পারে। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান ছিল ৩৪২·৫ এবং শ্রমিকশ্রেণীর মান ছিল ৩৫৯·৬। পল্লী অঞ্চলে এই মান ইহা অপেক্ষা সামান্য কম হইবে। আবার যাঁহাদের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ধান বা চাল আছে তাঁহাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান অনেক পরিমাণে কম; কেননা মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই খাদ্যের জন্য ব্যয় হয়, এবং খাদ্যের মূল্যও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং যাঁহাদিগকে ধান চাল ক্রয় করিতে হয় না, ইহার মূল্য বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, তাঁহাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মান তিন শতের বেশী হইবে না। এ ছাড়া ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে চালের মূল্য ছিল ৩।৶০ কিন্তু বর্তমানে উহা ২০·২৩ হইতে ২৩·৪৮ টাকার মধ্যে উঠা-নামা করিতেছে। এখন চাউলের মূল্য-মান ৫৭৯। সুতরাং সমগ্র জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় চালের মূল্য-মান খুবই বাড়িয়াছে। চালের মূল্য আরও বাড়িলে জীবনযাত্রার অন্যান্য ব্যয়ের মূল্যও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে।

আরও একটি কথা এই যে, জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় চাষের ব্যয় অনেক বিষয়ে কম আছে। কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি শতকরা ৩০০ ভাগের বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। ভূমির খাজনাও অপরিবর্ত্তিত আছে। সুদের হারও বাড়ে নাই।

ধান-চালের মূল্য বাড়াইলে কাহারা এবং লোকসংখ্যার শতকরা কত ভাগ লাভবান হইবে তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করা দরকার। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে :

জমির পরিমাণ	ধান উৎপাদনকারী পরিবারের সংখ্যা (লক্ষ)	মোট পরিবারের সংখ্যার শতকরা হার	ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত (হাজার টন)
১। ২ একরের কম	১০·৩৬	৪৪·১	−৬৯৩
২। ২ হইতে ৩ একর	২·৭৫	১১·৭	− ৪৭
৩। ৩ হইতে ৪ একর	২·২৬	৯·৬	+ ৩৬
৪। ৪ হইতে ৫ একর	১·৯৯	৮·৫	+ ৯৭
৫। ৫ হইতে ১০ একর	৪·৩২	১৮·৪	+৫৪১
৬। ১০ হইতে ২৫ একর	১·৬৫	৭·০	+৩৬২
৭। ২৬ একরের বেশী	·১৭	০·৭	+১১৫
	২৩·৫০	১০০·০	+১০৩৬

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইবে প্রথম দুই শ্রেণীর কৃষক-পরিবারকে চাল ক্রয় করিয়া খাইতে হয়। এই দুই শ্রেণী সমগ্র ধান্য-উৎপাদনকারী পরিবার-সংখ্যার শতকরা ৫৫·৮ ভাগ। যদিও তৃতীয় শ্রেণীর পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয়, কিন্তু নানাবিধ প্রয়োজনের জন্য তাহাদিগকে ফসলের সময় শস্য বিক্রয় করিতে এবং অন্য সময় ক্রয় করিয়া খাদ্যের সংস্থান করিতে হয়। এই তিন শ্রেণীতে মোট ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার পরিবার আছে; অর্থাৎ সমগ্র পরিবার-সংখ্যার শতকরা ৬৫·৪ ভাগ। শেষ চারি শ্রেণীতে মোট আট লক্ষ তের হাজার পরিবার অথবা মোটা-মুটি ৪০ লক্ষ লোক আছেন এবং ইঁহাদের চাল ক্রয় করিতে হয় না। ইঁহারাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল বিক্রয় করেন। সুতরাং ধান-চালের মূল্য বাড়িলে বাংলাদেশের আড়াই কোটি লোকের মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক (অর্থাৎ শতকরা ১৫।১৬ ভাগ) লাভবান হইবেন এবং অবশিষ্ট ২ কোটি ১০ লক্ষ লোককে অধিকতর মূল্যে চাল ক্রয় করিয়া দুই বেলা উদরান্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দুই কোটি লোকের মধ্যে আছেন—অল্প জমি-চাষী কৃষক, বর্গাদার, ভূমিহীন শ্রমিক, অকৃষি শ্রমিক, কারিগর এবং মধ্যবিত্তসম্প্রদায়।

সকল কাজের এবং সকল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে "greatest good to the greatest number" অর্থাৎ অধিকতম সংখ্যার জন্য অধিকতম মঙ্গল সাধন। কিন্তু ধানের মূল্য বৃদ্ধির পরিকল্পনার সাহায্যে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কি ?

এই প্রসঙ্গে ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এই মন্বন্তর সম্বন্ধে দুর্ভিক্ষ-কমিশন বলিয়াছিলেন—

"The rise in the price of rice was one of the

principal causes of famine and this has made it unique in the history of famines in India."

অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল চালের মূল্য বৃদ্ধি এবং ইহাই ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে এক নূতন এবং অদ্বিতীয় ঘটনা।

ধানের মূল্য বাড়াইয়া দিলেই ধানচাষের প্রতি কৃষক-সম্প্রদায়ের উৎসাহ বাড়িবে এবং ধানের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অনেক শাক-সব্জীর মূল্য খুবই বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই অনুপাতে জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে কি? সরিষার তৈলের মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে সরিষার চাষ প্রসারলাভ করে নাই। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। আমন ধান যে পরিমাণ জমিতে জন্মে মোটামুটি সেই পরিমাণ জমিতেই জন্মান হইতেছে। আমন ধানের জমির পরিমাণ বাড়াইতে হইলে ধান-চালের মূল্য মণপ্রতি দুই-এক টাকা বাড়াইয়া দিলে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আমন ধানের চাষের বিস্তৃতির পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দূর করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রধান অন্তরায় হইতেছে উচু জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা এবং নীচু জমি হইতে জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করা। আরও অনেক বাধা আছে যেমন স্থানীয় স্বাস্থ্যের অবনতি, বলদের অভাব, শ্রমিকের অভাব, অর্থের অভাব ইত্যাদি। পল্লী অঞ্চলে ত চালের মণ পঁচিশ ত্রিশ টাকা—ইহাতেও চাষের জমি তেমন বাড়ে নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব বলেন যে, খেজুরে গুড়ের মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে খেজুরে গুড়ের উৎপাদন বাড়ে নাই; তাহার প্রধান কারণ হইতেছে—জ্বালানির অভাব। সুতরাং কোন্ কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পথে কি কি অন্তরায় আছে তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া সেগুলি দূর করিতে পারিলেই উহার উৎপাদন বাড়িবে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, কৃষকেরা ধানের চাষে লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখেন না; তাঁহাদের সহজ বুদ্ধি এই যে, নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা যতদূর সম্ভব নিজেদের ও গরুর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ধানের চাষে ঘর হইতে তাঁহাদের নগদ অর্থ বাহির করিতে হয় না। বীজ-ধান ঘরেই থাকে, সারের বিশেষ বালাই নাই; এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোবর-সারও ব্যবহার করা হয় না।

আমার নিজ এলাকায় (হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া, আঁটপুর, তড়া, আনরবাটী, কোমরবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে) বহু সাধারণ কৃষকের সহিত আলোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহারা ধানের দাম বাড়াইবার পক্ষপাতী মোটেই নহেন, বরং কমাইবারই সপক্ষে। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, মধ্যে মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনের জন্য তাঁহাদের কিছু কিছু ধান বিক্রয় করিতে হয় বটে, কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময়েই তাঁহাদের ধান ক্রয় করিতে হয়। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের লোকসানই হইবে। এইরূপ কৃষকের সংখ্যাই বেশী।

বিজনে

শ্রীরবি গুপ্ত

পাহাড়-শিখর যেথা রচে ছায়া প্রাচীন পাদপ-ডোর,
বসি তারি 'পরে বিষাদে সতত অস্ত-দিবস-পলে;
লক্ষ্য-বিহীন সমতলভূমে ফেরাই দৃষ্টি মোর,
শত বিভিন্ন ছবি জেগে ওঠে আমার চরণতলে।

হেথায় গরজে রচি' আবর্ত উর্মি স্রোতস্বীর,
সর্পিল-পথে হয়েছে সে কোন ধূসর-সীমায় হারা;
সেথা, অবিচল হ্রদে ছেয়ে যায় তারি ঘুমন্ত নীর
নীলাভবর্ণে যেথা ফুটে ওঠে গোধূলি-ক্ষণের তারা।

পর্বত যেথা ঘন অরণ্যে ঢেকেছে শৃঙ্গ তার—
অস্ত-রবির একটু আভাস বুঝি বা এখনো রয়,
নিশীথ-রাণীর ছায়া-যান ওই ওঠে বেগে অনিবার—
অস্ত-মুখর ময়ূখ-মালায় দীপিত দিগ্বলয়।

কিন্তু তবুও উদ্ভূত কোন মন্দির-চূড়া হ'তে
অমরা-মর্ম-সুর-ঝঙ্কার মন্থর বায়ে ছায়:
থামে পথচারী, সুদূর আগত প্রহর-ধ্বনির স্রোতে
শেষ বেলাকার সময় হারায় অমিয়-মূর্চ্ছনায়।
নিরাশা-নিহিত হৃদয় আমার মধুর দৃশ্যদল
জাগে না হেরিয়া পুলক-উচ্ছলে, ওঠে না হরষে মাতি;
মনে হয় মোর এ বসুধা শুধু যেন ছায়া চঞ্চল:
জ্বলে কি অতীত জনের হৃদয়ে চির নভোমণি-ভাতি!
পর্বত হ'তে পর্বত 'পরে বিফল ফিরায়ে আঁখি,
দক্ষিণ হ'তে উত্তরাচলে, উষালোক হ'তে সাঁঝে
ফিরি যেথা রয় পাহাড়মৌলী অনন্ত-বুকে জাগি
কহি আপনায়: "তব তরে সুখ কোনোখানে নাহি রাজে।"
গিরি-কন্দর, রাজার-প্রাসাদ, পর্ণ-কুটীর তারা
ধূলিসম সবে—হরষ তাদের মোর লাগি নাহি আর।
প্রিয় নীরবতা, পাহাড়, বনানী, নদীতরঙ্গ-ধারা
একটি হৃদয় বিহনে বিরচে দৃশ্য শূন্যতার।*

* Alphonse Lamartine-এর মূল ফরাসী হইতে

ব্রিষ্টলের কথা

শ্রীচিত্রিতা দেবী

ধক্ ধক্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন চলেছে এগিয়ে। দু'ধারে গড়িয়ে পড়ছে ঘন সবুজের ঢালু জমি—কি সবুজ চারিদিকে, পৃথিবী ঢাকা পড়েছে নরম সবুজ কার্পেটে। চোখ জুড়িয়ে যাওয়া ঘন স্নিগ্ধ রঙের প্রলেপ মাখানো দিগন্ত। নবীন শ্যামলের বুকের ওপরে দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে নানা রঙের গরুর পাল—সেবায় যত্নে হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। মোটা মোটা উপুড় করা কলসীর মত ঝুলে পড়েছে দু'ধের বাঁট।
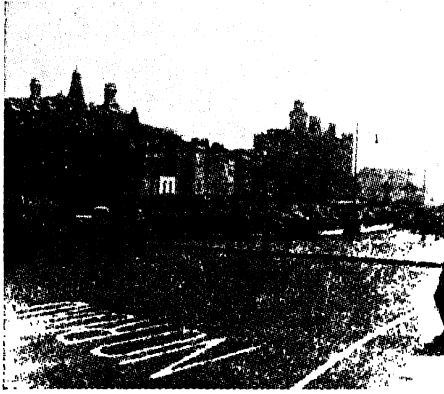
ব্রিষ্টলের ট্রাম রাস্তার কেন্দ্র। দূরে একটি জাহাজ দেখা যাইতেছে

কামরায় কেবল আমরা তিন জন। তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় লাল ভেল্‌ভেটের উঁচু স্প্রীঙের গদি, কোট ঝোলাবার আলনা, আয়না ও টুকিটাকি জিনিষ রাখবার তাক—ব্যাগ রাখবার উঁচু তাক অর্থাৎ আমাদের প্রথম শ্রেণীর কামরার চেয়ে অনেক ভালো ব্যবস্থা। বসে বসে সমুদ্রপারের ছোট দ্বীপটির বিস্তীর্ণ শস্যসম্ভারের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিলাম। গরুর জন্যে নির্দিষ্ট ঘাসের ক্ষেতের আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের খাদ্যশস্যের শাকসব্জীর ক্ষেত। দু'এক জায়গায় গমের শীষ হাওয়ায় দুলছে, কিন্তু সে খুব কম। বেশীর ভাগই কপি ও মটরজাতীয় সব্জীর ক্ষেত কিম্বা রাসবেরী ও ষ্ট্রবেরী ফলের ক্ষেত। কোথাও দেখা যায় ঘন সবুজের মাঝখানে অনেকখানি ধূসর রঙের ফাঁক—সেখানে টুপী মাথায়, জুতো পায়ে চাষীরা চাষ করছে।

ক্রমে গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এসে থামল একটা ছোট ষ্টেশনে। টিনের শেড্ দেওয়া কাঠের প্ল্যাটফর্ম্ম, ছোট একটি ষ্টেশন। লোকের ভিড় নেই বললেই হয়।

বাইরের পানে তাকিয়ে দেখি—টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার চলে গেছে সোজা দূর গ্রামান্তরে, কিন্তু তারের ওপরে পাখীর সারি বসে নেই কেন? কোথাও ট্রাক্টারে চলছে চাষ—কোথাও এখনো পুরোনো কালের প্রথা—ঘোড়া দিয়ে হালচাষ করানো হচ্ছে। ঘোড়াগুলো মোটা-সোটা, কপাল ঢেকে চুল পড়েছে ঝুলে, বেঁটে বেঁটে পাগুলো হাঁটুর নীচ থেকে মোটা হয়ে এসে গোড়ালির কাছে লুকিয়ে পড়েছে ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে। খুকু লাফিয়ে উঠল, ঘোড়াগুলো ওরকম কেন? খুকুর বাবা জবাব দিলেন, এ ওদের হালচষা ও গাড়ীটানা ঘোড়া কিনা, তাই ওরকম। তরঙ্গায়িত সবুজের মধ্যে হীরের কুচির মত ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট ডেক্সি—মাঝে মাঝে দু-একটা গোলাবাড়ী চোখে পড়ে—বাগানে ঘেরা ঢালু ছাদের নীচু বাড়ীর পাশে কাঠের শেড্ দেওয়া বার্ণ। সেখানে কোথাও বা দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা ঘোড়া, বা একটা ছোট ট্রাক্টার। কোথাও ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে জাল দিয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে বড় বড় মুরগীগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও প্যাক্ প্যাক্ করছে হাঁস—সরু সরু খালের মত জলরেখা চলে গেছে কোন গ্রাম বেষ্টন করে। সবুজ বন্যার মাঝে কোথাও ভেসে ওঠে ছবির মত ছোট ছোট গ্রাম। পঁচিশ-তিরিশটা ছোট ছোট বাড়ী—রাঙা টালির ছাদ—জানলা দিয়ে দেখা যায় রঙিন লেসের পরদা ঝুলছে। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গেই বাগান, মেহেদীপাতার বেড়া দিয়ে আলাদা করা। বাগানে খেলছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। মেয়েদের সোনালী চুলে রিবন বাঁধা, ছেলেদের ছোট পাজামা কাদামাখা। প্রায় সকলেই এক একটা ছোট তিন-চাকার সাইকেল বা স্কুট্যার নিয়ে খেলছে।

রেল-লাইনের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে পিচমোড়া রাস্তা—বাস চলেছে যাত্রীদের নিয়ে—বড়লোকদের মটর চলেছে ছুটে। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে ছোট কাঁচের ঘরে পাব্লিক টেলিফোন, পরিপাটি সাজানো। ছোট ছোট ঢালু ছাদের বাড়ীগুলোর ছোট কাঁচের জানলা ঘিরে রঙিন পরদা। ছোপানো এপ্রন বেঁধে মেমগিন্নীরা বেড়াচ্ছে নানা কাজে। বড় রিবনের বো বাঁধা বাচ্চা মেয়েগুলোকে কে বলবে মোমের পুতুল নয়। ওদিকে খুকুর প্রশ্নের অন্ত নেই। খুকুর বাবা রেলগাড়ীর দেয়ালে টাঙানো ইংলণ্ডের রেলপথের ম্যাপ দেখছেন। আমি চেয়ে দেখি লম্বা করিডোরটা দিয়ে অনেক লোক আসছে যাচ্ছে—কারো বা বেশ ফিট্‌ফাট ধোপদুরস্ত পোশাকপরিচ্ছদ, পালিশ করা জুতো, কারো বা জীর্ণ মলিন বেশ-বাস, চুলগুলো উড়ছে। একটি ছোট মেয়ে পাশের
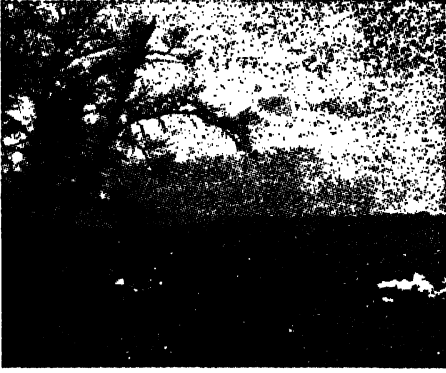
ব্রিষ্টলের একটি উপকণ্ঠ

কামরা থেকে বেরিয়ে আড়চোখে একবার খুকুকে দেখে নিয়ে আবার ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। খুকুরও একই দশা। ভাব করার লোভ দু'পক্ষেরই সমান, অথচ সঙ্কোচও কম নয়। ট্রেন এবারে বড় একটা জংসনের কাছাকাছি এসেছে। ট্রেন ছাড়বার প্রাক্কালে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত এক ভদ্রমহিলা কামরায় এসে ঢুকলেন, তার সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠল। 'জ' মহাশয় উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"ঐ চেয়ে দেখ ব্রিষ্টল দেখা যাচ্ছে। ঐ যে সবুজ পটভূমিকায় অসংখ্য বাড়ী—রাঙা টালির ছাদওয়ালা ছোট ছোট বাড়ী, বড় বড় গীর্জার চূড়া, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সৌধশ্রেণী—ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে। লিভারপুলের মত ধোঁয়ায় আর কালিতে আচ্ছন্ন শহর নয়। সুন্দর উজ্জ্বল।

ওদিকে কামরার রাজনৈতিক আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেই আলোচনায় খুকুর বাবাকেও যোগ দিতে হয়েছে।

'জ' মশায়ের কিন্তু উৎসাহ ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে উঠেছে—ঐ যে দেখা যায় এভন নদীর তটরেখা—ঐ ত অতিপরিচিত শহর—দশ বছর আগে এখানে তিনি বছর তিনেক কাজ করেছেন কোন কারখানায়। যথাসময়ে আমরা ব্রিষ্টল শহরে এসে অবতরণ করলাম।

ব্রিষ্টল শহরের একটি বৈচিত্র্য এই যে, শহরের ঠিক মাঝখানে নদীটা কেমন করে ঢুকে পড়েছে এবং সেইখানেই শহরের কেন্দ্র, জাহাজ আছে দাঁড়িয়ে। দু'পাশ দিয়ে জনস্রোত যাচ্ছে বয়ে—বড় বড় বাসে লাফিয়ে উঠছে কেউ, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে কিউ-এর শেষ প্রান্তে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে পাশেই দেখতে পাবে, তিনরঙা জাহাজের মাস্তুলে নিশান উড়ছে পত্ পত্ করে, রঙীন কাগজের মালায় সাজানো নৌকো আছে বাঁধা। শহরের ঠিক মাঝখানে বন্দর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। এ শহরটি ইংলণ্ডের একটি পুরনো শহর, অবশ্য ইংলণ্ডের পক্ষে যতটা পুরনো হওয়া সম্ভব। রোমানদের আমলে শহর হিসেবে এর নাম কোথাও পাওয়া যায় না। তবে তখনও হয়ত এইখানে, এই এভন নদীর তীরে তাঁবু পড়ত মাঝে মাঝে। 'বাথ' শহরে স্নানে যাবার পথে এইখানে হয়ত হ'ত বিশ্রামের আয়োজন।

ক্রমে সে যুগের পালা হ'ল শেষ। তারপরে শতাব্দীর পথ বেয়ে কত এঙ্গল, স্যাকসন, ডেন, নর্ম্যান—লড়াইয়ের ঘূর্ণিপাকে দেশটাকে দিলে পাক খাইয়ে। যুদ্ধ আর মৃত্যু—খালি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া, মারা এবং মরা। পরস্পরকে হারিয়ে দেবার তীব্র প্রতিযোগিতায় ধীরে ধীরে একটা ইতিহাস গড়ে ওঠে পৃথিবীর এই ছোট্ট দ্বীপটির ভৌগোলিক

নদীর একাংশের দৃশ্য

সীমার মধ্যে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতির যুগেও যে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ একেবারে লোপ পেয়ে যায় নি তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রিষ্টলের সাসপেনসন ব্রিজ। দুই পাহাড়ের মাঝখানে বহু নিম্নে দিয়ে এভন বয়ে যাচ্ছে। তার ওপরে আধমাইল লম্বা টকটকে লাল একটি পথ ঝুলছে শূন্যে। কোন রকম জবড়জঙ্গ লোহার কারিগরি নেই—সোজা একটা পথ। এ পাশে নরম কোমল ঘাসের বিছানায় ছোট ছোট সাদা ডেজির তারা—মাঝে বেগুনী ও গোলাপী 'মে' ফুলের গাছ পুষ্প স্তবকে ভরা। সেই ঘোরানো পাথরবাঁধানো পায়ে চলা পথ দিয়ে উঠে যেতে পার ব্রিষ্টলের সবচেয়ে উঁচু জায়গায়। ঘোরানো রাস্তাটির বাঁকে বাঁকে পাতা আছে লোহার আসন—তাতে বসে চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে যেতে পার। নীচে এভন যাচ্ছে বয়ে, মাঝখানে এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত লাল পুলটি—যেন শুভ্রতার বুকে রক্তবন্ধনীর মত দৃশ্যমান। আর চারপাশে ছেলেমেয়েরা কলরব করে খেলে বেড়াচ্ছে। পিকনিকে এসেছে দলে দলে স্ত্রীপুরুষ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে। আরো একটু উঁচুতে উঠলে
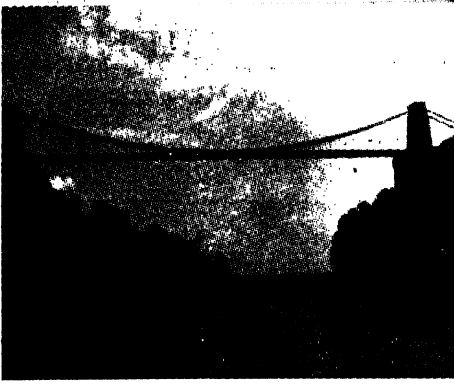
ঝোলানো সেতু

দেখতে পাওয়া যায় একটি ছোট ঘর। সেখানে আছে একটা ধাঁধাঁ-লাগানো ক্যামেরা। সিঁড়ির মুখে প্রায় ৫০ জনের কিউ। আমরা ৮ জন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। অন্ধকার ঘরে একটা গোল বোর্ডের ওপর ফোকাস করে আলো পড়েছে, যেমন পড়ে সিনেমার বোর্ডের ওপর। আর পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের রাস্তা ত বটেই, আরও দূরে, বহু দূরে, প্রায় সমস্ত শহরটারই প্রতিচ্ছবি পড়ছে তার ওপরে। ঐ যে রাস্তা দিয়ে একটা মোটর যাচ্ছে। বাস চলছে—ব্যস্তসমস্ত ভাবে লোকজনেরা চলাফেরা করছে।

এখানে শহরের সঙ্গে প্রকৃতির ঘটেছে মিতালি। এক দিকে প্রায় আধখানা শহর জুড়ে মাঠ। তাকে এরা বলে ডাউনস্। এই ডাউনসের কাছাকাছি একটা বাড়ীর গবাক্ষে বসে লিখছি। সামনে ছোট্ট একটু ফুলের পাড় দেওয়া ঘাসে ঢাকা জমি, পিছনে অনেকটা খোলা জায়গা, তাতে সব্জী ফলানো হয়। বাড়ীতে আছে কর্ত্তা, গিন্নী, একটি ভারতীয় বোর্ডার এবং বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য একটি ঝি। এদের সকলেরই আবার এক একটি পোষ্য আছে, কর্ত্তার একটা প্রকাণ্ড সাদা বুলটেরিয়ার, গিন্নীর একটা বুড়ী টিয়া 'পোলি', ভারতীয়ের একটি ঘনরোমা কুকুরী। দাসীর একটি ছোট ছেলে আছে নাম মাইকেল। ভারতীয়টির নাম দেওয়া যাক 'গ'। 'গ' সাহেব শিশুকাল থেকে এদেশে আছেন। পঁচিশ বছর ধরে ইংলণ্ডের জলবায়ুর প্রভাব এঁকে মনে প্রাণে ইংরেজ করে তুলেছে। ইনি অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে ভাবনা কল্পনা সব দিক দিয়েই ইংরেজ-ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। ইনি ইংরেজদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, এবং ইংরেজের মতই ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত রক্ষণশীল।

এখন বেলা পড়ে এসেছে। 'জ' গেছেন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পুরনো কর্ম্মস্থলে, গিন্নী দিবানিদ্রায় মগ্ন, কর্ত্তা গেছেন কাজে, যদিও বয়েস ৭০। খুকুকে নিয়ে এলিস গেছে বেড়াতে। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু পোলি কোথাও এতটুকু আওয়াজ পেলেই কর্কশ স্বরে 'হ্যালো' 'হ্যালো' বলে চেঁচাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখা যায়, সামনের সারির এক মাপের এক ধাঁচের বাড়ীগুলো। কালো চওড়া রাস্তা বাঁদিক দিয়ে উঠে ডান দিকে নেমে আসা বড় রাস্তাকে অতিক্রম করে পিছন দিকে চলে গেছে। তকৃতকে ঝকৃঝকে পরিপাটি চারদিক, কচিৎ চলেছে দুটি-একটি মেয়ে। দুপুরবেলা যে যার কাজে ব্যস্ত।

কল কল করতে করতে এলিসের সঙ্গে খুকু এসে ঢোকে ঘরে। এলিস বাড়ীর দাসী। সপ্তাহে ১॥ পাউণ্ড তার মাইনে, তার ও তার ছেলের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এই বাড়ীতেই। তিন তলার ওপরে চমৎকার একটি ঘরে এলিস থাকে। গদিওয়ালা খাট, ধবধবে চাদর পাতা বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, দেরাজ আলমারী, কার্পেট, ফুলসমেত ফুলদানী দিয়ে গৃহিণী ঘর সাজিয়ে রেখেছিলেন দাসী এসে সে ঘরে অধিষ্ঠিত হবার আগেই। এলিসের বয়স ৩০। হাসিখুশী চেহারা—মাথার চুলগুলি ফাঁপিয়ে ওপরে তোলা, ঠোঁট দুটি সব সময়ে টুক টুক করছে। এরা দাসদাসীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না। শ্রীমতী বিও দুপুর বেলা দাসীর সঙ্গে খেতে বসেন। স্নানের ঘরে এলিসের জন্যে নিজের হাতে টবে গরম জল ধরে রাখেন।

ঝোলানো সেতুর নিম্ন দিয়া প্রবাহিত এভন নদী

খুট্ করে আওয়াজ হ'ল শ্রীমতী 'বি' ফ্রিল দেওয়া এপ্রন বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছেন—"এলিস এবারে আমাদের ডিনারের জন্যে তৈরি হতে হবে।" এলিস ঘড়ি দেখে বললে, "ওমা তাই ত সাড়ে পাঁচটা বাজে যে।" "এলিস বুঝি সারা দুপুর বক্ বক্ করে তোমাকে বিরক্ত করেছে", শ্রীমতী বি অনুতপ্ত সুরে বলেন। 'ওমা সেকি', এলিস সজোরে প্রতিবাদ করে, "আমি তো খুকুকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নয় কি—বল না শ্রীমতী জ ?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই, এই তো এলিস ফিরল।"

যাই হোক, শ্রীমতী 'বি' তাড়া লাগালেন—খাবার দেরি হয়ে যাবে। শ্রীযুত 'গ' ঘড়ি দেখে বললেন—সত্যিই তো ছ'টা বেজে গেল।

ব্রিষ্টলের সিগারেটের কারখানা

এদেশের জলহাওয়ার প্রভাবে আমাদের পাকস্থলীর গ্রহণ-ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে। আরো দু'জন ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সকলেই 'জ'এর পূর্ব্বতন বন্ধু। খাবার টেবিলে গল্প জমে ওঠে। বাড়ীর গৃহিণী ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত অভিজাত ব্যক্তির নাতনী এবং চার্চ্চিলের অন্ধ ভক্ত। শ্রমিক সরকারের গুণকীর্ত্তন দিয়ে আমাদের ভোজের টেবিলের আলাপের উদ্বোধন হয়। আমিও আলোচনায় যোগ দিই। বলি শ্রমিক-সরকার অত্যন্ত অবিবেচক—তা না হলে এতগুলো অকৃতদারকে জেলের বাইরে রাখে। শ্রীমতী 'বি' আমাকে সমর্থন করেন—বিশেষ যখন ওদেশে মেয়ের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে তখন বিয়ে না করাটা ছেলেদের পক্ষে একটা মারাত্মক অপরাধ। এতগুলি কুমার বন্ধুর সামনে হংসো মধ্যে বকো যথা সস্ত্রীক সকন্যা শ্রীযুত 'জ' হয়ত একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলেন, আমার সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "কিন্তু খুকু কেন ঠিকমত খাচ্ছে না" 'গ' উৎকণ্ঠিত হলেন। নিন্দে করা ঠিক নয়, খাবার আয়োজন যথেষ্ট। অবশ্য নুন খেলে তবেই গুণ গাইতে হয়। কিন্তু এদের রান্নায় নুন নেই। টেবিলে আছে নুনের পাত্র, ইচ্ছামত নাও। অনেকে হয় ত আলুনি খেয়েই উঠে যায়। তা নুন যখন খাই নি, তখন দোষ কীর্ত্তন করতে আপত্তি কি ? খাবারের আয়োজন যথেষ্ট। যুদ্ধোত্তর বিলেতের আহারের একটু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করা যাক। সাড়ে পাঁচটায় এই আহারকে এরা সাধারণত বলে 'সাপার'—ডিনার বলতে বোধ হয় লজ্জা পায়। প্রত্যেকে দেড় টুকরো করে পেতে পারে এই পরিমাণ রুটি রাখা আছে পাত্রে। কিন্তু কেউ এক টুকরোর বেশী নিচ্ছে না।

সুদৃশ্য কাঠের ট্রেতে এলিস খাবার বহন করে নিয়ে আসে। অতিথিদের জন্যে বিশেষ করে বার করা হয়েছে সযত্নে রক্ষিত, বহুকাল আগেকার কেনা সুন্দর আল্পনা-আঁকা চীনা বাসন। সেই সুদৃশ্য ঈষদুষ্ণ পাত্রে আছে প্রকাণ্ড এক খণ্ড ধূমপক্ক হ্যাডক মাছ। ছোট্ট এক টুকরো লেবু, কিছু আলু ও বরবটী সিদ্ধ। প্রত্যেকটা জিনিষ থেকে ধোঁয়া উঠছে এত গরম। ধূমগন্ধী সামুদ্রিক মৎস্যের একটু ছোট অংশ কাঁটায় ঠেকিয়ে মুখে দিলাম। ওঃ, এত লোকের সামনে বসে আছি, ভাগ্যিস অভদ্র কাণ্ড কিছু হয় নি। মুখ তুলে দেখি সবাই আহারে মন দিয়েছে এবং এত বড় মাছ সংগ্রহ করা যে আজকাল কত কঠিন সেই বিষয়ে বক বক করছে। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম—কি দরকার ছিল, এত বড় মাছ সংগ্রহ করবার। যদি ছোট্ট হ'ত কোনমতে পার করে দেওয়া যেত। কিন্তু ভেতরের সব কিছুই যে বেরিয়ে আসতে চায়। এখন তো আর ফেলে দেওয়া চলবে না। খাদ্যদ্রব্যের সামান্য অংশটুকুও এরা নষ্ট করে না। তাকিয়ে দেখি 'জ' মহাশয়ের চোখে দুষ্টু মির হাসি—তিনি আমার অবস্থাটা বেশ উপভোগ করছেন। মুহূর্ত্তে আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি এল—"ও প্রিয় 'জ' " আমি সোৎসাহে বলে উঠি, "তুমি এই মাছ খেতে কি ভালই বাস, আমারটা থেকে কিছু নাও"—বলতে বলতে মাছটির তিন চতুর্থাংশ কেটে ফেললাম। তখন সবাই মিলে স্বামীর প্রতি আমার এ পক্ষপাতিত্ব দেখে কলরব করে উঠল। তখন 'জ' এর প্রতি করুণাবশে আমি বললাম—"আচ্ছা বেশ তোমরা সবাই এর থেকে একটু একটু পেতে পার। জান তো ভারতীয় মেয়েরা স্বার্থত্যাগের জন্যে বিখ্যাত।"

আহারের পরে বসবার ঘরে সবাই এসে জড়ো হয়। খুকুকে গা ধুইয়ে গরম বিছানার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আসি।

ব্রিষ্টলের নিকটে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণের তাগিদে স্তিমিত আলোয় স্বল্পালোকিত ঘর। রেডিওর মৃদু সুরের পটভূমিকায় অনুচ্চকণ্ঠে চলে আলাপ-আলোচনা। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতিই প্রধান আলোচ্য বিষয়, আর সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রতি কথায় প্রকট হয়ে ওঠে। আমি ঢুকতেই একজন উঠে এসে জ্বালিয়ে দিল বড় আলোটা। 'গ' তাড়াতাড়ি উষ্ণীকরণ যন্ত্রটাকে বোতাম টিপে জ্বালিয়ে দিয়ে পায়ের কাছে এনে রাখলে। মেয়েদের প্রতি সৌজন্যের আতিশয্য এক এক সময়ে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। তবু সত্যি কথা বলতে কি, বাড়াবাড়িটা লাগে মন্দ নয়, বিশেষত: প্রাচ্য দেশ থেকে আসে যারা, নূতনত্বের স্বাদ তাদের ভাল লাগবারই কথা।

সেদিন সকালে রেশনের দোকানে গিয়েছিলাম কার্ড করাতে। দোকানের সমস্ত কর্ম্মচারীই মেয়ে। চট্‌পট্‌ 'ছাড়-পত্র' মিলিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যে পাওয়া গেল তিনটি বই। এত শীঘ্র যে রেশনকার্ড পাওয়া সম্ভব তা দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। ভেবেছিলাম আরও দিন দুয়েক অন্তত: ঘোরাঘুরি করতে হবে। সাবান থেকে আরম্ভ করে টিনের খাবার ও চকোলেট পর্য্যন্ত সব কিছুই রেশন-ব্যবস্থার অধীন। ফলে দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে সকল প্রকার খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়। কারণ রেশনের যাবতীয় জিনিষের দাম খুব সস্তা। সেজন্যে এদেশে খাদ্যাভাবে কেউ শুকিয়ে মরে না, আবার অতিরিক্ত আহারের দরুন যকৃতের বিকৃতিজনিত মৃত্যুও এদেশে বিরল।

এদের দেশে সমাজ-জীবনের সংহত রূপটি দেখে বেশ আনন্দ হয়। সমস্ত দেশটা যেন একটা বৃহৎ পরিবারের মত গড়ে উঠেছে, যার ভাঁড়ারঘর একটাই এবং যেখানে সাধারণের মোটা ভাত কাপড়ের একই ব্যবস্থা। অবশ্য যার যেমন সাধ্য খাওয়া-পরার বৈচিত্র্য আনতে পারে—কিন্তু মূল ব্যবস্থাটি এমনি চমৎকার যে, মোটা ভাত-কাপড় থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না, কেউ বেশী পাবে না। যদি কারুর বিশেষ প্রয়োজন হয় সে তাই পাবে সংসারের সাধারণ খরচের খাতা থেকেই। যেমন প্রত্যেক শিশু ও বালকবালিকা দু' বোতল করে খাঁটি দুধ পাবে। পাঁচ বছরের নীচে পর্য্যন্ত ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল শিশুই রেশনকার্ডের ব্যবস্থামত খাঁটি কমলালেবুর ঘন নির্য্যাস সপ্তাহে এক বোতল করে পাবে। যদি কেউ অসুস্থ হয়, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে সেও পাবে, আর পাবে গর্ভিণী ও প্রসূতিরা। রেশন-ব্যবস্থায় এই নির্য্যাসের দাম ছয় পেনি মাত্র—অথচ সেই জিনিষ বড়লোকেরা সখ করে যদি খেতে চায় ত সমপরিমাণ নির্য্যাসের দাম পড়বে ছয় শিলিং। আগে সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটিয়ে তবে দোকানে জিনিষ যায়। পাঁচ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের কার্ডে দুধের আলাদা ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থামত রোজ সকালে বাড়ীর দরজায় খাঁটি দুধের মুখ বন্ধ করা বোতল পাবে—সূর্য্যোদয়ের আগেই ডেয়ারী ফার্ম্ম থেকে লোক এসে দুধ দিয়ে যায়। পাঁচ বছর বয়স হলেই প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। তখন আর তার দুধ তার মায়ের কাছে আসে না, যায় তার স্কুলে। প্রত্যেক স্কুলে প্রত্যেক বালকবালিকার নামে দু' বোতল দুধ দেওয়া হয়। বাড়ীতে দিলে যদি-বা বাচ্চাদের উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু স্কুলে তেমনটি হবার জো নেই, কারণ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে। বাচ্চাদের বেলায় যেমন প্রচুর দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা, বয়স্কদের বেলায় তেমনি কার্পণ্য, কাজেই পুডিং ইত্যাদিতে বেশী খরচ করা চলে না।

এদিকে বসবার ঘরে আড্ডা জমে ওঠে। "ভারতবর্ষের কথা বল। কি তোমাদের ব্যাপার। এত মারামারিই বা কেন?" "কি আর বলব সেকথা,—ভারতের কথা কি এত চট্‌ করে বলা যায়। কি দরকার সে সব অপ্রিয় কথা তোলবার? বিশেষ করে এখানে দেখছি সবাই টোরী-দলীয়। ভারতের দুঃখের কথা বলতে গেলে এত সাধের জমাট আড্ডাটি ভেঙে যাবে। বলতে বলতে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ব, এবং তোমরা দুঃখিত হবে।" শ্রীযুত ট বললেন, "তোমার কি মনে হয় স্বাধীনতা পাওয়া ভারতের পক্ষে এখনি ভাল হবে।" "সে আবার কি" 'জ' মশায় অবাক হয়ে বললেন,

মেণ্ডিপ পাহাড়ের একটি দৃশ্য

"ভাল হোক, মন্দ হোক, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার এবং অনেক আগেই তা আমাদের পাওয়া উচিত ছিল।" আশ্চর্য্য এই যে, এত দিনেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের মনে একটা সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হ'ল না। আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ঝাপসা একটা ছবি আঁকা আছে এদের মনের পটে, সেই সঙ্গে আছে একটা প্রবল অহমিকা, মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে ভারতকে আধুনিক সভ্যতার তীর্থক্ষেত্রে পথ দেখিয়ে আনার দায়িত্ব ছিল এদেরই, তাই কথাবার্ত্তায় এদের একটা মুরুব্বিয়ানার সুর। 'গ' জাতিতে ভারতীয়, কিন্তু মনে প্রাণে ইংলণ্ডের অনুরাগী ও ইংরেজের অনুকারী। ভারত তাঁর জন্মভূমি বটে, কিন্তু তাঁর মনোজগৎ ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় সৃষ্ট। ভারত তাঁর সেকেলে জননী, ইংলণ্ড তাঁর বিমাতা। দুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করে বিমাতার স্নেহচ্ছায়াতলে তিনি আছেন ভালই। তিনি ঘাড় নেড়ে সর্বজ্ঞের ভঙ্গীতে বললেন, "এখন কি হয়েছে জানি না, কিন্তু পচিশ বছর আগে ভারতের সে যোগ্যতা ছিল না।" স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, "তুমি কি ভারতীয়?" 'জ' মশায় বুঝতে পারলেন আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। ব্যাপারটাকে হাসিঠাট্টায় তরল করে আনবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "সে ত বটেই, তান যে তুমি ভারতে ছিলে। তোমার মত লোক থাকতে ভারত স্বাধীন হবে কি করে।" ঘরে হাসির ধুম পড়ে গেল। গম্ভীর মুখে বলি, "পচিশ বছর আগে ভারত কি ছিল, সে-কথা বলবার আগে ভেবে দেখো দেড় শ' বছর আগে সে কি কি ছিল। এই সুদীর্ঘকালের অকথ্য অত্যাচার আর অবাধ শোষণের ফলে যার জীবনীশক্তি লোপ পেতে বসেছে, সেই মুমূর্ষুকে হঠাৎ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের অযোগ্য বলে অপবাদ দেবার আগে ভেবে দেখা উচিত আসল গলদ কোথায়? আর ভারত যোগ্য হোক, অযোগ্য হোক তার স্বাধীনতালাভে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবার কোন অধিকার ব্রিটেনের নেই, সে গায়ের জোরে লোভের তাড়নায় এ কাজ করেছে, ভারতের স্বার্থ রক্ষা কিংবা ভারতকে বাঁচানো তার উদ্দেশ্য ছিল না। এই সত্যটাকে সকলেরই স্বীকার করা উচিত।" শ্রীযুত 'ম' বলেন, "সে ত ঠিকই, জোর যার মুলুক তার, এইটেই ত হচ্ছে বর্ত্তমান সভ্যতার নীতি।" "মুলুক ত নিলেই, তার ওপরে যখন বড় বড় মিথ্যে কথা দিয়ে সেই কেড়ে নেওয়াটাকে হিতৈষণা বলে দুনিয়ার লোককে বিভ্রান্ত করতে চাও তখনই প্রতিবাদ করি। তোমাদের এই অপপ্রচারের দরুনই আমাদের ত্রুটি-গুলো এত বড় হয়ে সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে, আর কূট-নীতিতে তোমরা ওস্তাদ বলে তোমাদের দোষগুলো ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু এটা জেনে রেখ, ভারত কারও চেয়ে কম নয়। তোমরা জান কি আমাদের জাতীয় মুক্তিসাধনার ইতিহাস? আয়ারলণ্ডের দুঃখের খবর তোমাদের জানা আছে। কিন্তু ভারতের ছেলেরা যে দেশের দুঃখমোচনের জন্যে দুঃসহ দুঃখ এমন কি মৃত্যুবরণ করতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় নি সে খবর তোমরা কয় জনে রাখ?" 'ট' বলেন, "বেশ, আমাদের সঙ্গে যাই হোক, তোমরা নিজেদের মধ্যে এত মারা-মারি কাটাকাটি কর কেন?" "তার কারণ আমরা তোমাদের কূটনীতি বুঝতে পারি নি—তোমাদের ফাঁদে ধরা দিয়েছি। আজকের এ মারামারির পেছনে রয়েছে তৃতীয় পক্ষের বহু দিনের ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির অপপ্রয়াস আর এই তৃতীয় পক্ষ হচ্ছ তোমরা।" 'ম' বললেন, "দুর্ভাগ্য আমাদের, সব দোষই যে তোমরা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ঘাড়ে চাপাও সে আমি শুনেছি।" "এটা ভুল শোন নি। কারণ ভারতের সকল দুর্গতির মূলেই যে ব্রিটিশের কারসাজি এটা দিবালোকের মত প্রত্যক্ষ সত্য।"

কিছুক্ষণ আগে 'প' এসে বসেছেন। তিনি শ্রমিকসঙ্ঘের সভ্য—এ সভায় অনাহূত—এসেছেন দশ বছর পরে পুরনো বন্ধুকে দেখতে। তিনি এতক্ষণ চুপ করে বোধ হয় আমাদের বাগ্‌যুদ্ধ উপভোগ করছিলেন। এবারে গম্ভীরভাবে বললেন, "এ বিষয়ে আমি শ্রীমতী 'জ'র সঙ্গে একমত। ভারতবর্ষ

ম্যাগনোলিয়া হাউস—চেডার

নিজেই তার যোগ্যতার বিচার করবে। যদি সে অযোগ্যও হয়, তা হলেও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীর কোন অধিকার নেই তাকে দাবিয়ে রাখবার।" 'প'র কথা শুনে 'জ' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, শ্রীমতী 'জ' ঠাণ্ডা হন, 'গ' বিরক্ত হন, 'টি' মুখ টিপে হাসেন, 'ম' কিছু বলতে যান, কিন্তু এমন সময় এলিস এসে দাঁড়ায় দ্বারপ্রান্তে—শ্রীমতী 'বি' জিজ্ঞেস করছেন, "তোমরা কি এক কাপ করে চা খাবে?" 'জ'রা আমাদের জন্যে চমৎকার চা এনেছে—দার্জ্জিলিঙের চা।" 'ম' বললেন, "সত্যি আমরা অকৃতজ্ঞ—এমন লোভনীয় জিনিষ ভারত আমাদের উপহার দেয়, তবু আমরা তার নিন্দে করি।"

আজ শনিবার। 'প' বাড়ী যাবে তার বাপের কাছে। আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে। তার বাপ বহুবার টেলিফোন করে সব ঠিকঠাক করেছে।

যথাসময়ে 'প'-র বাবা এলেন গাড়ী নিয়ে, ৭৫ বছরের বৃদ্ধ, শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে; টাকের ওপরে দু'এক গাছা সাদা পাতলা চুল। এত বয়স হলে কি হয় সাজসজ্জার ত্রুটি নেই, নিভাঁজ নেভী-ব্লু স্যুট—বাট্‌নহোলে একটা প্রকাণ্ড টক্‌টকে লাল গোলাপ, লাল মুখের সঙ্গে ম্যাচ করেছে ভাল। নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন ২৫ মাইল দূরের চেডার নামক গ্রাম থেকে। চেডারের চীজ বিখ্যাত। চেডার পেরিয়ে ছোট একটি গ্রামে তাঁর বাস। সেখানে আমাদের একটা সপ্তাহ কাটিয়ে আসতেই হবে তাঁর নতুন গৃহস্থালিতে, দেখতে হবে ইংলণ্ডের পল্লীর রূপ। 'প'র মা বাবার গল্প 'জ'র কাছে এত আগে শুনেছি। ভদ্রলোক বিপত্নীক হবার পর বছর না ঘুরতেই পুনরায় নবপত্নী সংগ্রহ করেছেন। এই নবপরিণীতা অবশ্য বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা নন, কারণ তাঁরও বয়েস ভাঁটার দিকে। বরের বয়স ৭৫ এবং কনে হচ্ছেন বাহাত্তুরে বুড়ী। ব্যাপারটা আমাদের ধারণার অতীত—এই নবদম্পতি কিন্তু বিবাহিত জীবনকে বেশ সহজভাবেই নিয়েছেন। বাহাত্তর বছরের নব বধূকে দেখবার জন্যে মনে ঔৎসুক্য জমা হয়ে ছিল। বৃদ্ধ তাঁর অনেক গল্প করলেন—সে নাকি দেখতে আমারই মত ছোটখাটো। ছোট-বেলায় নাকি তাঁদের একবার বিয়ের কথা হয়ে ভেঙে যায়। তার পরে কে ভাবতে পেরেছিল ভবিতব্যের এ বিচিত্র নির্ব্বন্ধের কথা?

ব্রিষ্টল থেকে চেডার ২০ মাইল পথ। দু'ধারে ঘনসবুজ—ঢালু উঁচুনীচু প্রান্তর—মাঝে মাঝে সারিবাঁধা পত্র-নিবিড় তরুশ্রেণী। পীচমোড়া কালো রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। পথে নজরে পড়ল একটা চুণের কারখানা। পাহাড়ের রং সাদা খড়ির মত—পাশ দিয়ে খাদ নেমে গেছে নীচু জমি পর্য্যন্ত। বৃদ্ধ বললেন, 'চেডার গর্জ্জের কথা তোমার মনে আছে 'জ'? চল ঘুরে যাই সেদিক দিয়ে।"

দূর থেকে পাহাড়ের উঁচু মাথা নজরে পড়ে—সাদাটে সাদাটে চৌকো চৌকো পাহাড়ের চূড়ো, রাস্তার দু'ধারে যেন ছবির মত সাজানো। যেমন এদের এক মাপের বাড়ী, পাহাড়গুলোও কি তাই? রাস্তার দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে, যেন ছাতখোলা একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে চলেছি। ভারি চমৎকার লাগছে! মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটা দুটো গাড়ী—পাথরের ওপর কম্বল বিছিয়ে চলছে পিক্‌নিক্। পাহাড় যেন প্রাচীরের মত আড়াল করে রেখেছে ওপারের পৃথিবীকে। এইখানে এই মেণ্ডিপ পাহাড়ে বহু হাজার বছর আগেকার গহ্বর আছে। সেই সব গহ্বরে নাকি আদি মানবের অস্থি পাওয়া গেছে।

বাংলা সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনার দ্বারা সমৃদ্ধ এবং উন্নত করবার সাধনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন বিনয়কুমার সরকার তাঁদের অন্যতম। দেশীয় ভাষা ব্যতীত ইংরেজী, জার্মান, ইটালিয়ান এবং ফরাসী ভাষায়ও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। কিন্তু আমৃত্যু তিনি যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী ছিলেন একথা হয়ত আজকাল অনেকে জানেন না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও বিনয়কুমারের দান সামান্য নহে।

"স্বদেশী", "স্বদেশসেবা", "স্বদেশনিষ্ঠা", "জাতীয় উন্নতি" ছিল বঙ্গবিপ্লবের মূলমন্ত্র। ১৯০৫-এর বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় বিনয়কুমার স্বদেশসেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ১৯০৬ সনে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তিনি দেশের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ই তিনি উপলব্ধি করেন দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য চাই এক দিকে জনশিক্ষার প্রসার, অপর দিকে প্রয়োজন মাতৃভাষা এবং সাহিত্যের অনুশীলন। কেননা ভাষার মধ্য দিয়েই জাতীয় চেতনা মূর্ত হয়ে উঠে।

১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ সনে বিনয়কুমার রাজনীতি ও ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক-রূপে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে যোগদান করেন। মালদহ, বিক্রম পুরের সেনিহাটি প্রভৃতি নানা কেন্দ্রে তিনি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সব বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভারও তিনি গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা যাতে কার্য্যকরী হয় সে দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। তিনি এই সময় প্রচার করেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, প্রাথমিক স্তরে বাস্তব-বিজ্ঞান শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকা চাই। শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক চর্চ্চার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, শিক্ষাকে করতে হবে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী। মাতৃভাষাই হবে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যম। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হ'ল বিনয় সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাবিধির অন্যতম প্রধান কথা। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত ভাষা শিক্ষাদান বিনয়বাবুর শিক্ষাবিধির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

"বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" (১৯০৭), "শিক্ষা বিজ্ঞানে ভূমিকা" (১৯১০), "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা" (১৯১০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত), "ভাষা শিক্ষা" (১৯১০), "সংস্কৃত শিক্ষা" (১৯১২), ইংরাজী শিক্ষা (১৯১২) "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" (১৯১২), "শিক্ষাসোপান" (১৯১২), "শিক্ষা সমালোচনা" (১৯১২), "সাধনা" (১৯১২), "বিশ্বশক্তি" (১৯১৪) নামক গ্রন্থগুলির মধ্যে বিনয়বাবুর শিক্ষাবিষয়ক মতবাদ ধরে রাখা হয়েছে। শিক্ষা সম্বন্ধে বিনয়কুমার শুধু নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেই বিরত হন নি, তিনি তাঁর মতবাদকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াসও পেয়েছেন নিজের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদানের ভিতর। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাবিধি বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাজগতে রীতিমত আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে

বিনয়কুমার সরকার

পেরেছিল। তাই 'স্বদেশী যুগে' বিনয় সরকারের শিক্ষাবিধি বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি মনীষীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিল।

ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার যে রীতি বিনয়কুমার প্রবর্তন করেন তা তদানীন্তন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। কাশীর পণ্ডিতসমাজ তাঁর নূতন প্রণালীতে আকৃষ্ট হন এবং গুণগ্রাহিতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁরা বিনয়বাবুকে "বিদ্যাবৈভব" উপাধি প্রদান করেন (১৯১২)।

বুনিয়াদি বা কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে স্বাবলম্বী

করে তোলা ছিল বিনয়বাবুর শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তিনি আমেরিকার শিক্ষা-ব্রতী বুকার টি. ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী "আপ ফ্রম্ স্লেভারি" গ্রন্থের অনুবাদ "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" নামে প্রকাশ করেন।

ইতিহাসকে বিজ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য বিনয়-বাবু প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১১ সনে ময়মনসিংহ জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি দেখান ইতিহাসও একটা বিজ্ঞান, ইতিহাসের মূলকথা হ'ল বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের উপরই ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। কাজেই উন্নতির প্রচেষ্টায় কোন অবস্থাতেই মানুষের নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। বিনয়কুমারের উক্ত রচনা ১৯১১ সনে 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়। পরে উহা "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা করা হয়। বিশ্বশক্তি সদ্ব্যবহারের মতবাদ আরও জোরের সঙ্গে প্রচারিত হয় "বিশ্বশক্তি" (১৯১৪) নামক গ্রন্থে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের ভূমিকায় পুস্তকখানির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বদেশীযুগে লেখা "সাধনা" সম্ভবতঃ বিনয়বাবুর বহুল প্রচারিত বাংলা রচনা। অক্ষয়চন্দ্র সরকার "সাধনা"র ভূমিকা লেখেন।

১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত বিনয়বাবু প্রত্যেকটি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করতেন এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য তৎপর ছিলেন। ১৯১১ সনে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (মালদহ) তিনি মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা প্রয়োজন বলে আবেদন জানান। এ বৎসরেই তিনি ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মেলনে উক্ত আবেদন কার্য্যকরী করে তোলবার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং বলেন মাতৃভাষার দ্রুত উন্নতির জন্য 'সংরক্ষণ নীতি' গ্রহণ করতে হবে—বিদেশী ভাষায় লেখা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমালোচনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিতান্তই জরুরী। বিনয়বাবুর প্রস্তাব "সাহিত্যসেবী" প্রবন্ধ আকারে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে প্রথম পঠিত হয়। রচনাটি 'প্রবাসী'তে (১৯১১) প্রকাশিত হয় এবং পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রস্তাব ইংরেজীতে "The Man of Letters: A scheme for fo-t ring Indian vernacular literatures" নামে 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯১১) প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবের হিন্দী এবং মারাঠী অনুবাদও ১৯১১ সনের হিন্দী এবং মারাঠী সাহিত্য সম্মেলনে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়। হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্য-সমাজে বিনয়বাবুর প্রস্তাব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তত্ত্বাবধানে বাংলা-ভাষায় অনুবাদের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য তিনি অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হন এবং অনুবাদকার্য্যে অগ্রসর হবার মত প্রয়োজনীয় অর্থ পরিষদের হস্তে প্রদান করেন (১৯১১)। বিনয়বাবুর প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রথম যে গ্রন্থ অনূদিত হয় তার নাম গীজো প্রণীত "ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" (অনুবাদক: রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ)।

অনুন্নত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার জন্য বিদেশী ভাষায় রচিত ভাল ভাল গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিনয়বাবু তাই বার বার সেদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও ইংরেজী, জার্ম্মানী ও ফরাসী ভাষায় লেখা একাধিক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" (বুকার টি. ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী, ১৯১৪), "নবীন রাশিয়ার জীবন প্রভাত" (ট্রট্স্কি রচিত রুষ-বিপ্লবের পূর্ব্ববর্তী রুষ-কাহিনী, ১৯২৪), "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (জার্ম্মান ভাষায় লেখা এঙ্গেলসের রচনা, ১৯২৬), "ধনদৌলতের রূপান্তর" (ফরাসী ভাষায় লেখা লাফার্গের রচনা, ১৯২৮) এবং "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি" (জার্ম্মান ভাষায় লেখা ফ্রেডরিক লিষ্টের রচনা, ১৯৩২)—বাংলাভাষায় বিনয়বাবুর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ।

১৯১১ সন থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত বিনয়-বাবুর যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১৯১২ সনে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক পরিষদের পত্রিকা ও প্রকাশ বিভাগের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

১৯১১ থেকে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত বিনয় বাবু মাসিক "গৃহস্থ" পত্রিকা পরিচালনা করেন। এই "গৃহস্থ" বিনয়কুমারের সাহিত্যসাধনার একটি শ্রেষ্ঠ দিগ্‌দর্শন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্র-নাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেশে সেই সংবাদ পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয়বাবু "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" নামক একটি সুদীর্ঘ রচনা গৃহস্থ পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং "গৃহস্থে"র উক্ত সংখ্যার নামকরণ করেন "রবীন্দ্র-নাথের দিগ্‌বিজয় সংখ্যা"। "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" পরে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯১৪)।

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত বিনয়কুমার চীন, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিভ্রমণ করেন। এই বিশ্বপর্য্যটনের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ প্রচার এবং দ্বিতীয়তঃ ইয়োরামেরিকার জীবনচর্চ্চা ও অভিজ্ঞতাকে ভারতের উন্নতি সাধনে নিয়োগ করা। তাই এই যুগে (১৯১৪-২৫) বিনয়বাবু একদিকে অবিশ্রান্ত ভাবে

ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব নিয়ে ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান ও ইটালীয় ভাষায় লেখনী চালনা করেছেন, অপর দিকে বাংলাদেশের জন্য তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফলাফল রোজনামচার আকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই অভিজ্ঞতা ও পর্য্যটনের কাহিনীই পরে "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থমালায় তের খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯১৫-৩৫)। বিদেশে অবস্থান কালে "বর্ত্তমান জগতে"র অধিকাংশ প্রথমত: প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, বঙ্গবাণী প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে মুদ্রিত হয়ে পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪-২৫ সালের যুবক-বাংলার নিকট "বর্ত্তমান জগতে"র আবেদন যে খুব বেশী ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

"বর্ত্তমান জগতে"র প্রভাব শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বহু লেখাই হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনূদিত হ'ত। এখানে প্রসঙ্গত: বলা যেতে পারে যে কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্তের দৈনিক হিন্দী "আজ" পত্রিকায় ১৯২১ থেকে ২৫ পর্য্যন্ত বিনয়-বাবুর বিশ্বপর্য্যটনের অভিজ্ঞতা বাংলা থেকে অনূদিত হয়ে প্রতি সপ্তাহে "হামারি য়ুরোপ কী চিট্‌ঠি" নামে প্রকাশিত হয়। শিবপ্রসাদ গুপ্তের "পৃথ্বী-প্রদক্ষিণ" গ্রন্থ বিনয়বাবুর "বর্ত্তমান জগৎ" রচনাবলীর উপরই ভিত্তি করে রচিত১।

'বর্ত্তমান জগৎ' বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। 'বর্ত্তমান জগতে'র তের খণ্ডের নাম এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নিয়ে দেওয়া গেল :—

(১) কবরের দেশে দিন পনেরো (পৃ: ২১০, ১৯১৬)
(২) ইংরাজের জন্মভূমি (পৃ: ৫৪৬, ১৯১৬)
(৩) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (পৃ: ১৩০, ১৯১৫)
(৪) ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত য়ুরোপ (পৃ: ৮২৪, ১৯২৩)
(৫) নবীন এশিয়ার জন্মদাতা : জাপান (পৃ: ৪৮৫, ১৯২৭)
(৬) বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য (পৃ: ৪৫০, ১৯২৮)
(৭) চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ (পৃ: ২৫০, ১৯২২)
(৮) প্যারিসে দশ মাস (পৃ: ৩১২, ১৯৩২)
(৯) পরাজিত জার্ম্মানি (পৃ: ৭০৭, ১৯৩৫)
(১০) সুইট্‌জারল্যাণ্ড (পৃ: ৭৫, ১৯৩০)
(১১) ইটালিতে বার কয়েক (পৃ: ৩০২, ১৯৩২)
(১২) দুনিয়ার আবহাওয়া (পৃ: ২৭৬, ১৯২৫)
(১৩) নবীন রাশিয়ার জীবন প্রভাত (পৃ: ১০০, ১৯২৪)

বিনয়বাবু দ্বিতীয় বার বিদেশ ভ্রমণ করেন ১৯২৯ সনের মে মাস থেকে ১৯৩১ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত। এই সময় তিনি ইটালি, সুইটজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, চেকো-স্লাভাকিয়া এবং অষ্ট্রিয়ায় গমন করেন। 'বর্ত্তমান জগৎ' গ্রন্থ-মালায় এই সময়কার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বিশেষ পরিচয় নেই, তবে জার্ম্মানী (১৯১৫) এবং ইটালির (১৯৩২) উপর লেখা গ্রন্থদ্বয়ে কিছু কিছু অংশ যুক্ত করা হয়েছে মাত্র।

'বর্ত্তমান জগৎ' আন্তর্জাতিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, চিত্র, ভাস্কর্য্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বহু বিস্তার উৎস-স্বরূপ। 'বর্ত্তমান জগৎ' গ্রন্থমালায় ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর নানা দেশের তুলনা করা হয়েছে। মানুষের জীবনচর্চ্চা এবং মানব-সভ্যতার উন্নতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ 'বর্ত্তমান জগতে'র মূল প্রতিপাদ্য। 'বর্ত্তমান জগৎ' গ্রন্থমালা বিনয়বাবুর বাংলা সাহিত্য ও স্বদেশ সেবার জীবন্ত নিদর্শন।

১৯১৪ থেকে ১৯২৫ পর্য্যন্ত বিনয়কুমার দেশ থেকে দূরে ছিলেন বটে, কিন্তু "স্বদেশ" ছিল তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খুঁটিনাটি কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারত না। ১৯২২ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত "দি ফিউচারিজম অব্ ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থে দেখতে পাই বিনয়বাবু বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের কৃতিত্ব কি পাশ্চাত্যের কাছে তা তুলে ধরেছেন।

বিদেশে অবস্থান কালেই এঙ্গেলসের জার্ম্মান-রচনা "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামে অনুবাদ করেন। পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে বাংলাভাষায় প্রথম গ্রন্থ। "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" (পৃ: ৩৮০) নামক পুস্তকও বিদেশে অবস্থান কালেই লিখিত হয়। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উৎসাহে বইখানি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় প্রবাসে অবস্থানের সময় রচিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সনে বিনয়বাবুর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে বিনয়কুমার "স্বদেশীয়ানা"র একটা বড়রকমের কর্ম্মকেন্দ্র বিবেচনা করতেন। স্বদেশে অবস্থান কালে পরিষদের সহিত তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। বিদেশে গিয়েও তিনি পরিষদকে ভুলে যান নি। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তরফ থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিনয়কুমারকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে গিয়ে প্রসঙ্গত: বলেন, "তুমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু। যে দেশেই যখন গিয়াছ, সাহিত্য-পরিষদের মঙ্গল কামনা করিয়াছ। তোমারই কল্যাণে পরিষদের নাম নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রায় সকল দেশ হইতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে" (এপ্রিল, ১৯২৭)।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই বিনয়বাবু অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধন-

১ অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস সম্পাদিত "দি সোসাল এণ্ড ইকনমিক্ আইডিয়াস অব বিনয় সরকার" (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪০) গ্রন্থের পৃ: ৫৩৫-৩৬ দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও গবেষণার জন্য ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রভৃতির সহায়তায় "আর্থিক উন্নতি" নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন (এপ্রিল, ১৯২৬)। এই সময় হতে বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণা সুরু হয়। পরে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গবেষণার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ' (১৯২৮)। বিনয়বাবুই বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণার প্রধান পথ-প্রদর্শক। গবেষণার পথকে সুগম করবার জন্য তিনি ধন-বিজ্ঞানের বহু পরিভাষার সৃষ্টি করেন। বাংলাভাষায়ও যে প্রথম শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করা যায় তা বিনয়বাবু প্রমাণ করলেন তাঁর "ধনদৌলতের রূপান্তর" ১৯২৮); "একালের ধনদৌলৎ ও অর্থশাস্ত্র" (১ম ভাগ, ১৯৩০; ২য় ভাগ, ১৯৩৫), "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি" (১৯৩২) নামক গ্রন্থসমূহ রচনার দ্বারা। ধন-বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিনয়বাবুর অক্লান্ত প্রয়াসের পরিচয় "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" (১ম ভাগ, ১৯৩৭; ২য় ভাগ, ১৯৩৯)। "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের দুই খণ্ড বিনয়বাবুর পরিচালনায় "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের" গবেষক ও সহযোগীদের ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণার ফল।

অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও তুলনামূলক জীবনচর্চ্চার মত ও পথ দেখাবার প্রয়াসে বিনয়বাবু লেখেন, "নয়া বাংলার গোড়া-পত্তন" (১ম ভাগ, ১৯৩২; ২য় ভাগ, ১৯৩২) এবং "বাড়তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪)। "নয়াবাংলার গোড়াপত্তন" এবং "বাড়তির পথে বাঙালী" গ্রন্থদ্বয় বিনয়বাবুর কর্ম্মবাদ এবং জীবনদর্শনের নিদর্শন।

বাংলাভাষায় সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার ধারা প্রবর্ত্তন করা বিনয়বাবুর অন্যতম কৃতিত্ব। বিনয়বাবুরই উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় "বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ" ১৯৩৭ সনে স্থাপিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাকে বাংলাভাষায় স্থায়ী রূপ দেবার জন্য বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক-দের সহায়তায় তিনি "সমাজবিজ্ঞান" (১ম ভাগ, ১৯৩৮) নামে সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মত বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা চালাইবার জন্যও বিনয়বাবুর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবার পর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির উৎসাহে "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্" এবং পরিষদের মুখপত্র "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম থেকেই এই দুই কর্ম্মকেন্দ্রের সহিত বিনয়বাবুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে"র প্রথম সংখ্যাতেই বিজ্ঞান বিষয়ে বিনয়-বাবুর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বাংলা ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন বিনয়বাবু তাঁর উল্লিখিত রচনায় বিজ্ঞান-সেবীদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিনয়বাবুর দরদ ছিল কত গভীর এবং দৃষ্টি ছিল কত সজাগ তার সাক্ষ্য বহন করছে হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লিখিত "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (দুই খণ্ড, ১৯৪২-৪৫, পৃঃ ১৫২০)। 'বৈঠকে'র পাতা উল্টালেই বুঝতে পারা যায় বিনয়বাবু বঙ্কিম থেকে অতি-আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা, দেশী ও বিদেশী প্রভাবের ফলাফল, বর্ত্তমান সাহিত্যের রূপ, সমালোচনা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে কত গভীর ও ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার কামনায় বিনয়বাবু আজীবন লেখনী চালনা করেছেন। তাঁর এই বিরাট্ সাধনা দেখে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিভাগের আলোচনার তিনি পথপ্রদর্শকই শুধু নন, বাংলাভাষায় একটা নূতন রচনা-নীতিরও তিনি প্রবর্ত্তক। তাঁর ভাষা হ'ল যুক্তিতর্কের ভাষা। ভাষা ভাবের বাহন। বাহনকে ভাবপ্রকাশের উপযোগী করবার জন্য তিনি বাংলাভাষায় আরবী, ফারসী, হিন্দী এবং নানা বৈদেশিক শব্দ আমদানি করেছেন, সংস্কৃত শব্দের সহিত অবাধে গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে তাঁর ভাষা দুর্ব্বল হয় নি, বরং ভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়েছে।

বিনয় সরকারের ভাষার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ভাষায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছে এইজন্য যে তিনি কখনও বড় বড় কথা বা বাক্য লিখতেন না। তিনি ছোট ছোট বাক্য ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর বাংলা রচনায় দেখা যায় বাক্যগুলি অল্প কয়েকটি শব্দেই সমাপ্ত হয়েছে। ছোট বহরের বাক্যরীতি অনুসরণ করার ফলেই বিনয়বাবুর ভাষায় একটা প্রদীপ্ত তেজ ও প্রচণ্ড শক্তির স্ফুরণ সম্ভব হয়েছে। বিনয়-বাবুর বাংলা রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কখনও বাংলা রচনায়, এমন কি বৈঠকী কথাবার্ত্তার মধ্যেও ইংরেজী বা অন্য কোন বৈদেশিক শব্দ ব্যবহার করতেন না। তাঁর বাংলা রচনার কোথাও ইংরেজী বা অন্য বিদেশী শব্দের ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। বাংলা রচনায় যেখানেই তিনি বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করেছেন, সেখানেই তিনি বাংলা হরফে বৈদেশিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে বাংলা রচনায় ইংরেজী অথবা অপর কোন বিদেশী শব্দ বৈদেশিক হরফে ব্যবহার করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

পরিভাষা

শ্রীঅনাদিনাথ সরকার

প্রাতঃকাল ; কালীবাবুর বৈঠকখানা ; শতরঞ্চি আস্তীর্ণ তক্তাপোশে, 'সরকারী কার্য্যে ব্যবহার্য্য পরিভাষা', গিরীশ বিদ্যারত্নের 'শব্দসার', রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা', সুবল মিত্রের 'ইংরেজী-বাংলা অভিধান', স্লেট, পেন্‌সিল লইয়া কালীবাবু নিবিষ্ট মনে পাঠ-নিরত ; ছোট-বড় চার-পাঁচটি পুত্র-কন্যা সকৌতুকে পিতাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

কালী—Additional অপর, Assistant সহ, Chief মুখ্য, Deputy উপ, General মহা, Head প্রধান, Joint যুক্ত, Under অবর। Under মানে অবর ? নিশ্চয় ছাপার ভুল। খুকী, দেখ দেখি মা, বাংলায় অবর একটা কথা আছে নাকি।

বড় মেয়ে খুকী 'শব্দসার' দেখিয়া—শব্দসারে ত পাচ্ছি না বাবা ! এবার কোন্ বইটা দেখব ?

কালী—বাংলা কথাই নয়, গিরীশ পণ্ডিত মশায় জানবেন কি করে ? ঐ লাল নূতন বইটা দেখ।

খুকী চলন্তিকা দেখিয়া—এতে দিয়েছে বাবা, অবর মানে নিকৃষ্ট, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী, কনিষ্ঠ।

কালী—এ মাসের মাইনে পেলে দিলুকে (কালীবাবুর বড় ছেলে) দিয়ে আমায় একখানা ঐ বই আনিয়ে দিস্ মনে করে। এখানা আবার আপিসের এক বাবুর, তার বই সে ফেরত চেয়েছে। তারও তো এই বিড়ম্বনা চলছে।

কালীবাবুর স্ত্রী প্রবেশ করিয়া বলিলেন—হ্যাঁগা, তোমার একি কাণ্ড ? প্রাতঃ-সন্ধ্যা করলে না, ছেলেমেয়েদের পড়াতে লেগেছ ? বাজার যাবে কখন, আমার উনুন জ্বলে যাচ্ছে।

কালী—ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছি কোথায়, আমি নিজেই বাংলা পড়ছি, ওরা আমায় সাহায্য করছে। আজ দিলুকে বাজারে পাঠাও। আমি একবার ঠাকুরঘরে গিয়ে দশ বার গায়ত্রী জপ করে নিই। সন্তানদের প্রতি—তোদের একজন এখানে দাঁড়া, আমি এখুনি আসছি।

কালীবাবুর স্ত্রী—ওমা, তুমি বুড়ো বয়সে বাংলা পড়ছ ? তুমি না এম্-এ পাস দিয়েছিলে ?

কালী—হ্যাঁ, পাস দিয়েছিলুম ত, ইংরেজীতে ফার্ষ্ট ক্লাস, কিন্তু তাতে আর কাজ চলছে না।

কালীবাবুর স্ত্রী—যত সব ; তিরিশ বছর চলল আর আজ চলছে না।

কালী—তুমি যাবে কি যাবে না ? আমায় পড়তে দেবে না ?

কালীবাবুর স্ত্রী—ক'দিন ধরে কি যে তোমায় হয়েছে, শুধু শুধু কথা শোনাও। তিনি অন্তঃপুরে গেলেন।

কালীবাবু তাড়াতাড়ি গায়ত্রী জপ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বই-পুথি লইয়া পড়ায় মন দিলেন। এমন সময়—"কালীদা বাড়ী আছ ?" বলিয়া সুকুমারবাবু সদরের কড়া নাড়িলেন। "নাঃ, কাল থেকে উপরের ঘরেই পড়ব। ভেবেছিলুম আজ প্রথম পাতাটা শেষ করব, তা আর হতে দিলে না। তোরা সব ভেতরে যা।" বলিয়া সদর খুলিয়া দিয়া সুকুমারবাবুকে লইয়া ঘরে আসিয়া বসিলেন ও স্লেট, পেন্‌সিল বইগুলি গুছাইতে লাগিলেন।

সুকুমার—কি হচ্ছিল কালীদা, সকালবেলায় ছেলেদের পড়াচ্ছিলে নাকি ? আমি এসে বাধা দিলুম।

কালী—পড়ায় বাধা দিয়েছ তা সত্যি, কিন্তু ছেলেদের নয়, আমিই বাংলা শিখছিলুম।

সুকুমার—সেকি কথা কালীদা, তুমি না ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ ? দেশ স্বাধীন হয়েছে তাই, নইলে তোমার ত রায় বাহাদুর হওয়ার কথা ছিল।

কালী—আর রায় বাহাদুর, চাকরীই থাকে কিনা ঠিক নেই। ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এর বিড়ম্বনা দেখে ব্রাহ্মণী খোঁটা দিয়ে গেলেন। তুমিও তাই বলছ ? আপিসে হুকুম হয়েছে গবর্ণমেণ্টের সব লেখা-পড়া বাংলায় চলবে। কাল একটা খসড়া-পত্রের নিদর্শ (Draft letter form) লিখে দিয়েছিলুম, যুক্ত কর্ম্মসচিব (Joint Secretary) তার উপরে মন্তব্য লিখে ফেরত দিয়েছেন "কিছু হয়নি।" দু'দিন বাদে আমার উপকর্ম্ম সচিব (Additional Deputy Secretary) হবার কথা, আর কাল যে ছোকরারা আপিসে এসেছে তারাও মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। আমি ভাবছি আর সাড়ে তিন বছর পর আমার পেন্‌সন্ হবে, শেষের ছ মাস ছুটি নিলেও পাকা তিন বছর কাজ করতেই হবে। এখন এই বয়সে কি একটা নূতন ভাষা শেখা যায় ?

সুকুমার—কালীদা, তুমি ত এঙ্গলো-স্যাক্সনের পেপারে সবার চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছিলে, আর বাঙালীর ছেলে হয়ে এইটে রপ্ত করতে পারবে না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

কালী—তুমি ভুলে যাচ্ছ ভাই যে, তখন আমার বয়েস ছিল কম। সন্ধ্যা-আহ্নিক করতাম না, গঙ্গাস্নানের বালাই ছিল না, সংসারের ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া যে বাংলা জানি এ ত তা নয়, এ যে একেবারে একটা কিম্ভূতকিমাকার

নূতন ভাষা। বড়রা বক্তৃতা দিচ্ছেন ইংরেজীতে, আর বে-কায়দায় পড়েছি আমরা বুড়ো সরকারী কর্ম্মচারীরা।

সুকুমার—আচ্ছা কালীদা, দেখি তুমি কেমন বাংলা শিখেছ, বল ত' First Instalment-এর বাংলা কি হবে?

কালী—কেন প্রথম কিস্তি?

সুকুমার—না, হ'ল না; এর বাংলা হবে প্রথম স্তবক; এই দেখ মলাটের উপরেই ছাপা আছে। বলিয়া পরিভাষার মলাট দেখাইলেন।

কালী—তবেই দেখ, বাংলা না ভুলতে পারলে কি করে এ ভাষা শিখব? চিরকাল ধরে শুনে আসছি, জমিদারের কিস্তি, লাটের কিস্তি, কোর্টের কিস্তি, মহাজনের কিস্তি, আর আজ হ'ল স্তবক! স্তবক মানে ত গুচ্ছ, যেমন পুষ্পের স্তবক—কিনা এক গোছা ফুল। ওদিকে আবার বিনয় করে মুখবন্ধে লেখা হয়েছে "বহু প্রচলিত বাংলা শব্দগুলি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ত্যাগ করা অনুচিত হইবে।"

সুকুমার—আমি বলছি কালীদা, হতাশ হয়ো না, ঠিক হয়ে যাবে।

কালী—"হতাশ কি আর অমনি হয়েছি সুকুমার, এই ত সবে পয়লা কিস্তি, আরও কত কিস্তি বেরবে কে জানে।" একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন দিন পড়েছে —নূতন কিছু কর, না হয় বাংলাকে মার। প্রথম স্তবকের সবটাই একবার পড়ে দেখলুম, তোমার এই স্তবকীরা দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত কথার যেন দানসাগর করেছেন। এক একটা শব্দ উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায়। তুমি বইটার ইংরেজী কলম না দেখে পরিভাষা পড়ে দেখ, কি বোঝাতে চাচ্ছে বুঝতেই পারবে না।"

সুকুমারবাবু পরিভাষা হাতে লইয়া একটু দেখিয়া বলিলেন —কালীদা, তোমার কথা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে, সত্যিই বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে এই পরিভাষা কিছুতেই খাপ খাবে না, এ পরিভাষা একটা অভিনব উদ্ভট ভাষা, একে অন্তত: বাংলা কিছুতেই বলা চলে না।

কালী—বইখানা পড়লেই তুমি দেখবে যেন বাংলার উপরেই যত রাগ; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গ্রহণযোগ্য আর বোধগম্য করা কর্ত্তাদের প্রধান লক্ষ্য, তা নিরেনব্বুই জন বাঙালী বুঝুক আর নাই বুঝুক। মনের ভাবপ্রকাশ করা যদি ভাষার উদ্দেশ্য হয়, এ পরিভাষায় কি বাঙালীর পক্ষে তা সম্ভব হবে?...

—দেখ সুকুমার, তবে আমি বাঙালী, বাংলা আমার মাতৃ-ভাষা, আমি এই প্রার্থনা করি আমরা মাতৃভাষার অনুরাগী সকল বাঙালী যেন এবিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে, আমরা বাংলায় চলতি শব্দগুলি কিছুতেই ত্যাগ করব না, ভারতের সকল প্রদেশের লোকদের বোধগম্য হবে শুধু এইজন্যেই আমাদের মাতৃভাষার রূপকে আমরা বিকৃত করে তুলব না। একটা কথা বলতে পার সুকুমার, নিজেদের বৈশিষ্ট্য পরিহার করে, বাঙালীত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে বাঙালীর বেঁচে থেকে কি লাভ?

কালীবাবুকে ভাবাবেগে বিচলিত হইয়া উঠিতে দেখিয়া সুকুমারবাবু বুঝিতে পারিলেন আজীবন ইংরেজী সাহিত্যের আওতায় পুষ্ট হইলেও মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ কত অকৃত্রিম, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি তাঁহার প্রীতি কত সুগভীর! তাঁহার মনে হইতে লাগিল পরিভাষার নামে অপভাষা সৃষ্টির এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সমস্ত বাঙালী জাতির সমবেত প্রতিবাদ যেন কালীবাবুর কণ্ঠে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকাল তিনি মুগ্ধনেত্রে এই প্রৌঢ়ের ঋজুদীর্ঘ মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া রহিলেন, তার পর একান্ত শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ঝড়

শ্রীকমলরাণী মিত্র

মেরু-সাগরের ঝড় দেখে আসি চলো!
তুষার-ঝটিকা বহিছে রাত্রিদিন,
ঝড়ের ঝাপটে আকাশ পৃথিবী যেন
ধুয়ে' মুছে এক একাকার হয়ে গেছে;—
ঝড় আর ঝড়, উদ্দাম ঝড়রাশি
বহিছে শূন্যে অ-কূল শূন্য ছেয়ে;
ধূসর আঁধার থরথর করে' কাঁপে
—ভয় আর শীত, শীত আর ভয় শুধু।

মহাকাল যেন মহোৎসঙ্গ পেতে'
মৃত্যুকে নিয়ে বসে আছে কোলে করে,
বুঝি বুকভাঙা দারুণ দীর্ঘশ্বাস
ভেঙে পড়ে আর খান্ খান্ হয়ে যায়!
বলো, যাবে সেই মহা-প্রলয়ের মুখে?
কাল-বোশেখীর প্রলয় বাতাসে আর
ঝড় ওঠে নাকো নিথর বক্ষোমাঝে;—
বড়ো চেনা যেন কালো কাল-বৈশাখী!
চলো না সেখানে সাধের বাসর বাঁধি
চির-রাত্রির অরোরা বোরিয়ালিসে।

রাইপুরের মহামায়া ও শিখরবংশ

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ সীমান্তে কাঁসাই নদীর কিনারে রাইপুর বা গড়-রাইপুর একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। স্থানটিও স্বাস্থ্যকর। বাঁকুড়া হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে কাঁসাই-তীরের এই গ্রামটি এক সময় প্রাচীন শিখররাজাদের রাজধানী ছিল। পরবর্ত্তী কালে 'ধবল'রা ইহার মালিক হন। শিখর-আমল রাইপুরের গৌরবময় যুগ। সে যুগের জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির বহু ভাস্কর্য্য-নিদর্শন আজিও রাইপুর, মণ্ডলকুলি, অম্বিকানগর, সারেঙ্গড় প্রভৃতি স্থানে এবং কাঁসাই ও কুমারী নদীর ধারে ছড়াইয়া আছে। পুরাকালে এদেশে জৈনধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, পরে শাক্ত ও শৈব-মতের প্রতিষ্ঠা হয়।

খাস রাইপুরের পুরাকীর্ত্তিগুলির মধ্যে মহামায়া দেবী, শিখরগড় ও শিখর-সায়র উল্লেখযোগ্য। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আশী বিঘা জমির উপর পুরাতন গড়ের ধ্বংসস্তূপ। স্তূপটিতে অনেক কুঠরির চিহ্ন বিদ্যমান। আশেপাশে দুই-চারিটি পাষাণ-মূর্ত্তি ও কিছু কিছু প্রত্ননিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রাজবাড়ী ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল। সে ইট আজকালকার ইট অপেক্ষা পাতলা ও বড়—অনেকটা টালির মত। স্তূপটি খনন করিলে শিখরবংশের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

শিখর-সায়র শত বিঘা স্থান ব্যাপিয়া একটি বিশাল চতুষ্কোণ সরোবর। এই সরোবরের সহিত রাজবংশের একটি করুণ কাহিনী জড়িত আছে। রাইপুরের আর একটি দ্রষ্টব্য মস্তানী পীরের সমাধি। এককালে এখানে পীরসাহেবের প্রভাব খুব বেশী ছিল। গ্রামের পূর্ব্বাংশে উপরবাঁধা নামক মুসলমান পল্লীটির অস্তিত্ব এই প্রভাবের নিদর্শন।

সে শিখরবংশ আজ নাই, সে রাইপুরও নাই, কিন্তু দেবী মহামায়া আজও রাইপুরে তাঁহার পূর্ব্বমহিমায় বিরাজ করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই মহামায়া মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মহামায়া রাইপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—জাগ্রত দেবতা। লোকে বলে, তিনি শিখর-রাজাদের প্রতিষ্ঠিতা ও তাঁহাদের কুলদেবী। যত দিন মহামায়া আছেন তত দিন রাইপুরে দুর্গা প্রতিমা গড়াইয়া পৃথক্ পূজা করিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রাচীনকাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে দেবীর সম্মুখে নরবলি হইত। এখনও তাঁহার নিত্যভোগে আমিষ না হইলে চলে না। গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে চাঁদুডাঙা পল্লীসংলগ্ন একটি উচ্চ ভিটায় দেবীর স্থান। পূর্ব্বে দেবী বৃক্ষতলে থাকিতেন, কয়েক বৎসর আগে তাঁহার জন্য একটি ছোট পাকা ঘর বা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের নিকটস্থ নিম্নভূমিতে একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণী খননকালে সেই স্থানে মহামায়ার পাষাণমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। স্বপ্নাদেশে সেখান হইতে আনিয়া দেবীকে তাঁহার বর্ত্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। মন্দির-মধ্যে বেদীর উপর পাশাপাশি তিনটি পাষাণ-বিগ্রহ। মধ্যস্থলে মহামায়া, তাঁহার দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা দেবী ও বামে সর্ব্বমঙ্গলা। মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি গণপতি মূর্ত্তি। মহামায়া মূর্ত্তিটি উচ্চতায় দুই হাত। দেবী অসুরের উপর দণ্ডায়মানা, ষড়্ভুজা, বিবিধ অলঙ্কারভূষিতা ও খড়্গ, চক্র, ত্রিশূল, খর্পর প্রভৃতি নানা প্রহরণধারিণী। তাঁহার পরিধেয় বসন দক্ষিণী ছাঁদে কোঁচা করিয়া পরা। শীর্ষদেশ বেষ্টিয়া প্রভামণ্ডল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র তাঁহার মুখাবয়ব। দেবী মেষ বা অজমুখী! সর্ব্বমঙ্গলা মহামায়ারই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংস্করণ। সম্ভবতঃ পুরাকালে উৎসবাদিতে মূর্ত্তিটিকে বাহিরে আনিয়া নগর পরিক্রমা করা হইত। তুঙ্গভদ্রা দেবী প্রভা-মণ্ডল বিশিষ্ট একটি পাষাণপিণ্ড। মনে হয় এটি কোন বড় মূর্ত্তির শীর্ষদেশ।

এই বিচিত্র মহামায়া মূর্ত্তিটির সহিত বাংলা বা উত্তর-ভারতের প্রচলিত দুর্গামূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। অথচ ইনি পুরাকাল হইতে দুর্গারূপেই পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। পূজারীরা বলেন, ইনি বারাহী। শুম্ভ নিশুম্ভ বধের প্রাক্কালে দেবতারা মহাদেবীর সাহায্যার্থে স্ব-স্ব শক্তিকে পাঠাইয়া-ছিলেন। বারাহী, যজ্ঞবরাহরূপী বিষ্ণুর অনুরূপ মূর্ত্তিধারিণী শক্তি। বারাহীর ধ্যানরূপের সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটির মিল নাই। তাহা ছাড়া, বারাহী প্রভৃতি দৈবশক্তির কোনও পাষাণমূর্ত্তি এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই,—প্রধান দেবতারূপে ইঁহাদের পূজাও প্রচলিত নাই। তবে ইনি কোন্ দেবতা? একমাত্র দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ী দুর্গা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার সহিত মহামায়ার সাদৃশ্য নাই। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ যাহা কিছু তাহা শুধু নামের। দ্রাবিড়ী দুর্গা মহামায়ার কন্যা। তিনি সিংহমুখাসুরের উপর দণ্ডায়মানা, ষড়্ভুজা, নানালঙ্কারভূষিতা। তাঁহার ছয় করে খড়্গ, চক্র, ত্রিশূল, খর্পর, ছাগ ও বরাভয়। মস্তকের চারিদিকে সমুজ্জ্বল দিব্যজ্যোতি। তিনি নীলবর্ণা ও অজমুখী। তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি প্রচলিত আছে। মহামায়া এক পরমাসুন্দরী কামুকী দানবী। সম্ভোগ-লালসায় নানা ছলাকলা প্রদর্শন করিয়া তিনি মহর্ষি কশ্যপের তপোভঙ্গ করেন। মহামায়া ও কশ্যপ উভয়ে মেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়া মিলিত হন। সেই মিলনের ফলেই অজ বা মেষমুখী দুর্গার জন্ম। দেবতার রূপ, তাঁহার বসন পরিবার ভঙ্গী ও পার্শ্বে তুঙ্গভদ্রা দেবীর অধিষ্ঠান প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয়, রাইপুরের

মহামায়া দ্রাবিড়ী দুর্গা ভিন্ন অপর কেহ নহেন। তুঙ্গভদ্রা দাক্ষিণাত্যের একটি নদী। গঙ্গা-যমুনার মত নারী রূপে কল্পিত হইয়াছে।

কোথায় তুঙ্গভদ্রা, কোথায় কাঁসাই-তীরে রাইপুর। এখানে দ্রাবিড়ী দুর্গার আবির্ভাব ঘটিল কেমন করিয়া? কবেই বা সেই প্রাচীন যুগে সুদূর দাক্ষিণাত্যের সহিত বাংলার যোগাযোগ স্থাপিত হইল? শিখর-রাজারাই বা কোন্ সূত্রে এই মূর্ত্তি পাইলেন? প্রথম দুইটি প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, খ্রীষ্টাব্দ ১০১২ হইতে ১০২৫ সালের মধ্যে কোনও সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া দক্ষিণ রাঢ় জয় করেন। তাঁহার তিরুমলৈ গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ আছে যে, তিনি দিগ্বিজয় ব্যাপদেশে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত মধুকর-নিকর পূর্ণ উদ্যানবিশিষ্ট দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপালকে পরাজিত করেন।

দণ্ডভুক্তির অবস্থান-স্থল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ইহাকে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতনের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন। দণ্ডভুক্তি রাইপুর রাজ্যের পূর্ব্বনাম হওয়াও বিচিত্র নহে। রাজেন্দ্র চোলের অভিযাত্রী বাহিনীর সহিত মহামায়া রাইপুরে আসিয়া থাকিবেন। শিখর-রাজারা এ মূর্ত্তি কিরূপে পাইলেন, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয় রাজেন্দ্র চোলের কোনও সেনাপতি দাক্ষিণাত্যে না ফিরিয়া শিখরবংশের আদি পুরুষ-রূপে রাইপুর অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। কিম্বা শিখরবংশ দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের কোনও স্থানীয় রাজবংশ। দক্ষিণী বাহিনীর নিকট পরাজিত হইয়া ঐ বংশের জনৈক রাজা বিজেতার চাপে বা স্বেচ্ছায় রাইপুরে মহামায়ার প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের প্রথম অনুমান সত্য হইলে শিখর-রাজারা দাক্ষিণাত্যের আদিবাসী দ্রাবিড়ী হইয়া পড়েন।

শিখরবংশ দ্রাবিড়ী বা স্থানীয় রাজবংশ যাহাই হউন তাঁহাদের রাজধানীর "রাইপুর" নাম হইতে মনে হয়, তাঁহাদের উপাধি "রায়" বা "রায় শিখর" ছিল। কথিত আছে, একবার কোন বহিঃশত্রু স্থানীয় রাজশক্তিকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া শিখরগড় অবরোধ করে। রাজা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া সপরিবারে শিখর-সায়রে জীবন বিসর্জ্জন দেন। কবেকার কথা? কেই বা সেই পরাক্রান্ত শত্রু? সেই হতভাগ্য শিখররাজারই বা পরিচয় কি—কেহ বলিতে পারে না।

শিখরবংশের কীর্ত্তিকলাপ রাইপুর রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঁকুড়া জেলার খাড়ড়ানগরের সন্নিকটে সুপুর গ্রামে শিখর-কীর্ত্তির কিছু কিছু নিদর্শন দেখিয়া মনে হয়, এক সময় এই গ্রামটি একটি ক্ষুদ্র শিখর-রাজ্যের রাজধানী ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদীর ধারে পঞ্চকোট রাজ্যও একটি শিখর রাজ্য। এই রাজ্যের আদি রাজা পঞ্চকোট পাহাড়ের পাদদেশে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। অতীত গৌরবের বহু নিদর্শন আজিও সেখানে বিদ্যমান। এক সময় পঞ্চকোট রাজধানী শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। একমাত্র রাজা ছাড়া রাজপরিবারের প্রায় সকলেই নিহত হন। রাজা কোনও রূপে পলায়ন করিয়া মণিহারা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শত্রুর দেশত্যাগের পর রাজা পঞ্চকোট ত্যাগ করিয়া কাশীপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আজিও পঞ্চকোট রাজ্য জনসাধারণের নিকট শিখরভূম নামে পরিচিত। পঞ্চকোট রাজবংশের আর এক বিশেষত্ব ইহাদের গুরুবংশ মাদ্রাজী। ইঁহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়া জয়ন্তী পাহাড়ের সন্নিকটে বেরোগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। রাজগুরুকে বলা হয় মহাপ্রভু। বরাকরের সন্নিকটে নদীর ধারে পাহাড়ের কোলে একটি নির্জ্জন ও মনোরম স্থানে দেবী কল্যাণেশ্বরীর পীঠস্থান। পঞ্চকোটাধিপতি কল্যাণেশ্বরীর সেবাইত। দেবী খুবই জাগ্রতা। পূর্ব্বে তাঁহার সম্মুখে নরবলি হইত; এখনও পূজা-পার্ব্বণে, বিশেষতঃ মাকরী সপ্তমীর দিনে সেখানে মহিষ, মেষ ও অসংখ্য ছাগ বলি হয়। পাথরের নালা দিয়া রুধিরস্রোত মন্দির-সংলগ্ন একটি কুণ্ডে আসিয়া পড়ে। প্রত্যহ দেবীর দর্শনার্থী বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার—দেবী দেয়ালের দিকে মুখ ও ভক্তের দিকে পিছন ফিরিয়া থাকেন। পিছন দিকেই তিনি পূজারীর পূজা গ্রহণ করেন। এই কারণে কেহ কখনও দেবীর মুখ দেখিতে পায় না। কল্যাণেশ্বরীর এই অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে অবস্থিতি হইতে মনে হয় দেবীমূর্ত্তিতে এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যাহা সাধারণের গোচরীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কাশীপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরে মহারাজা কল্যাণেশ্বরীকে কাশীপুরে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেবী স্বস্থান হইতে নড়েন নাই। তবে রাজার কাতর প্রার্থনায় স্বপ্নে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি প্রতি বৎসর দুর্গাপূজায় মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে কাশীপুরে আসিবেন। সেই সময় দেবী-প্রতিমার কাছে একটি সোনার থালায় সিন্দুর ছড়াইয়া রাখিলে সেই সিন্দুরের উপর তাঁহার পায়ের ছাপ পড়িবে। ইহা হইতেই "মল্লেরা শিখরে পা" প্রবাদের উৎপত্তি। আজিও কাশীপুরে মহাষ্টমীর সময় দেবীর নির্দ্দেশমত থালায় সিন্দুর ছড়াইয়া রাখা হয়।

পঞ্চকোট রাজ্য প্রতিষ্ঠার কিছু পরে পশ্চিমবাংলায় সামন্তভূম রাজ্যের পত্তন হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্খরায়ও সম্ভবতঃ শিখরবংশসম্ভূত ছিলেন। "সাঁওৎ" রাজারা বহিরাগত —সামন্তভূমের আদিম বাসিন্দা নহেন। শুনিয়াছিলাম শঙ্খরায় কয়েকজন অনুচরসহ শিলদা পরগণা হইতে ছাতনায় আসেন।

শিলদা পরগণা প্রাচীন রাইপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাহা ছাড়া পঞ্চকোট রাজবংশের সহিত সামন্ত রাজাদের বৈবাহিক আদান-প্রদানে বাধা নাই অথচ পার্শ্ববর্ত্তী মল্লরাজাদের সহিত তাঁহাদের কোনকালেই "চলৎ" ছিল না। এই সকল কারণে "সাঁওৎ"দের শিখরবংশের একটি শাখা বলিয়া মনে হয়। সামন্তভূমের রাজধানী ছাতনা নগরের সন্নিহিত মৌলবনা গ্রামে কুম্ভকার-গৃহে অজ্ঞাতবাসকালে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন শঙ্খরায় বার জন অনুচরসহ "ভক্তা"র ছদ্মবেশে মৌলেশ্বরে গাজন দেখিতে আগত ছাতনার ব্রাহ্মণ-রাজা ভবানী ঝরাতের সমীপস্থ হইয়া খড়্গাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন ও স্বয়ং রাজা হইয়া বসেন। সেই খড়্গ আজিও ছাতনার রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। সামন্তরাজ প্রথম হামির উত্তরের রাজত্বকালে ছাতনায় বাসুলী দেবী ও কবি চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধদেবী হইলেও মহামায়ার মত বাসুলী দেবীকেও প্রত্যহ আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। কথিত আছে, একবার নিশা-যোগে শত্রু ছাতনা আক্রমণ করিয়া রাজাকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতে থাকে। সে সময় বাসুলী মায়াপ্রভাবে অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করিয়া রাজাকে পাশমুক্ত ও শত্রুকে বিতাড়িত করেন।

শিখর-রাজাদের কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আবার মহামায়ার প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক। দ্রাবিড়ী দুর্গার অজমুখ আপাতদৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা স্থানীয় বিশেষত্ব বলিয়া মনে হইলেও আসলে তাহা নয়। আমাদের শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থানে দুর্গাকে "কোকমুখী" বলা হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতী'তে মিশরে আবিষ্কৃত এক ব্যাঘ্র-দুর্গামূর্ত্তির কথা পড়িয়াছিলাম। সে মূর্ত্তিটি দ্রাবিড়ী দুর্গারই অনুরূপ। মূর্ত্তির পাদপীঠে নাকি মিশরীয় চিত্রলিপিতে "দুর্গাম্মা" এই কথাটি লিখিত আছে। প্রায় সকল প্রাচীন সভ্য দেশে দেবদেবীর আদি মূর্ত্তিগুলিতে পশুমুখ বা অর্দ্ধাঙ্গ পশু ও অর্দ্ধাঙ্গ মানবাকৃতি দেখা যায়। মিশরের অধিকাংশ মূর্ত্তিই পশুমুখ। গ্রীক দেবতা "ব্যাকাসের" ও রোমান দেবতা "স্যাটারনেলিয়া"র অজমুখ। আমাদের দেশে দক্ষযজ্ঞ পণ্ডের পর দক্ষ অজমুণ্ড হইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, দক্ষের অজমুণ্ড জ্যোতিষিক রূপক। রাশিচক্রের আদি মেষ-রাশির প্রথম নক্ষত্র "অশ্বিনী"ই নাকি দক্ষের অজমুণ্ড। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় শারদোৎসবের জ্যোতিষিক ভিত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। কে জানে সিংহমুখাসুরের উপর দণ্ডায়মানা ষড়্ভুজা, অজমুখী দুর্গাও কোন জ্যোতিষিক রূপক কিনা। সিন্ধু-সভ্যতার যুগেও দ্রাবিড়ীদের মধ্যে মাতৃকাপূজা প্রচলিত ছিল। অজমুখী দুর্গা কি তাহাদেরই পরিকল্পিত? উত্তর-ভারতের দুর্গামূর্ত্তিতে দেখিতেছি অজমুখের স্থলে নারীমুখ আসিয়াছে—সে মুখে রুদ্র ও করুণ ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। সিংহমুখাসুর দেবীর বাহন সিংহরূপে পরিণত ও দেবীর বধ্যরূপে অপর এক অসুর—মহিষাসুরের আবির্ভাব হইয়াছে। বিভিন্ন যুগের মহিষাসুর মূর্ত্তিতেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ভুবনেশ্বরের বেতাল-দেউলের দুর্গায় মহিষাসুরের নরদেহ, মহিষমুখ। দেবীর দক্ষিণ পদ অসুরের বাম স্কন্ধে ও ও বাম পদ অসুরের দক্ষিণ স্কন্ধের উপর স্থাপিত। সিংহ অসুরের বাম পদ দংশনে উদ্যত। ময়ূরভঞ্জের খিচিঙে অসুরের নিম্নাঙ্গ মহিষ, ঊর্দ্ধাঙ্গ মানব। বাংলার বর্ত্তমান কালের প্রতিমায় মুণ্ডটি ছাড়া মহিষের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, অসুরও সম্পূর্ণ মানবাকার ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণ দেশে প্রচলিত মহিষ-মর্দ্দিনীর কল্পনায় দেবী অষ্টভুজা ও তিনি মহিষের ছিন্ন মুণ্ডের উপর দণ্ডায়মানা। এই ছিন্ন মহিষমুণ্ডই অসুরের প্রতীক। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া সংশয় জাগে—অনার্য্য দুর্গামূর্ত্তি কি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকারে পৌঁছিয়াছে অথবা আর্য্য দেবতা অনার্য্যের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছেন?

শিল্প-কলা প্রসঙ্গে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পরিচয় নূতন করে দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। তাঁর ভাস্কর্য্য এবং চিত্রকর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েছে। শিল্প-কলা এবং সংস্কৃতির অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁর সংস্পর্শে এলে লাভবান হবেন, তাঁর শিল্পকলার মর্ম্মকথা অনুধাবন করবার হদিস পাবেন। তিনি নিজেই বলেন, কোন শিল্পীর কাজের স্বরূপ বুঝতে হলে প্রথমে শিল্পীকে বুঝতে হবে।

রায়চৌধুরী মহাশয় পিতৃভূমি ত্যাগ করে জন্মস্থান থেকে বহুদূরে মাদ্রাজে শিল্পকলার সাধনায় রত আছেন। আজন্ম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত অভিজাত শিল্পীর এই স্বেচ্ছারত নির্ব্বাসন শিল্পকলার প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুরাগের পরিচায়ক। যাঁরা তাঁর আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁদের নিকট তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনকথা সুবিদিত। তিনি একাধারে লেখক, শিল্পী ও একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে শিল্পকুশলতা এবং মননশীলতার এক অপূর্ব্ব সমন্বয়

ঘটেছে। বস্তুত: দেবীপ্রসাদের মত এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিরল।

দেবীপ্রসাদের সঙ্গে শিল্পকলা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগলাভ করা মস্তবড় একটা সৌভাগ্য। তাঁর মুখে শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রসের ব্যাখ্যান শুনলে মনে হয় শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে বিরাজ করছেন। তাঁর সুস্পষ্ট উক্তিগুলি সরাসরি শ্রোতার অন্তরের একেবারে অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছে এবং সুন্দরের প্রতি তার অনুরাগকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে সাহায্য করে। আপাতদৃষ্টিতে দেবীপ্রসাদকে মনে হয় অত্যন্ত রাশভারি, পরুষপ্রকৃতির। কিন্তু এই কর্কশ বহিরাবরণ ভেদ করে যদি একবার তাঁর হৃদয়ের কোমলতম স্থানে ঘা দিতে পারা যায় তা হলে তিনি তাঁর অন্তরের মণিকোঠায় সঞ্চিত সম্পদরাশি একেবারে উজাড় করে ঢেলে দেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা এবং বোধশক্তি অনুযায়ী তাঁর সুভাষিতাবলী থেকে সারসংগ্রহ করে উপকৃত হতে পারেন। কেউ যদি গ্রহণ করতে পারে তো দানে তাঁর কার্পণ্য নেই।

মাদ্রাজই দেবীপ্রসাদের কর্মক্ষেত্র। সেখানে তিনি যে শুধু নিভৃতে শিল্প-সাধনায়ই রত আছেন তা নয়, জনসাধারণের মধ্যে যাতে শিল্পানুরাগ জাগ্রত এবং বর্দ্ধিত হয় সেজন্যে তাঁর চেষ্টারও অন্ত নেই। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত খাদি স্বদেশী ও শিল্পপ্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্ট গ্যালারির সংগঠনে তাঁর নির্দ্দেশ বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয়েছে। উক্ত আর্ট গ্যালারির সম্পাদক শ্রীবিনায়কমের সঙ্গে সমাজ ও শিল্পকলা বিষয়ে দেবীপ্রসাদের যে কথোপকথন হয় তার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

শ্রীবিনায়কম—আপনার মতে সমাজের সহিত আর্টের সম্পর্ক কি এবং সমাজে আর্টের স্থান কোথায় ?

রায়চৌধুরী—সমাজ হচ্ছে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। এখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব প্রতিপালন করে তারই উপর এর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে। এই বিষয়টির সঙ্গে যে মূল প্রশ্নটি জড়িত সেটি হচ্ছে জীবনের প্রতি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী। সেজন্যে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের মানসিক গড়ন এমন হওয়া উচিত যেন সুন্দরের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের সংস্পর্শে তার হৃদয়ে সাড়া জাগে এবং মনে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাবাবেগের সঞ্চার হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এই দিক দিয়ে একেবারে জড়তাগ্রস্ত, তাদের সেই সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা নেই। সম্ভবত: শিল্পকলার আসল মূল্য নিরূপণে আমাদের ভ্রান্ত বিচারবুদ্ধিই এজন্যে দায়ী।

বিনায়কম—আপনার কথা আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম তাতে মনে হয়, আপনি একথাই বলতে চাচ্ছেন যে, চিত্রে এবং ভাস্কর্য্যে সুন্দরের যে রূপটি ফুটে ওঠে তাকে উপলব্ধি করবার জন্যে আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালনা করি না। কিন্তু আমাদের বোধশক্তি যদি এতই জড়তাগ্রস্ত হয় তা হলে সাহিত্যে সুন্দরের প্রকাশ আমাদের অনুরাগকে এরূপ উদ্দীপিত করতে সক্ষম হয় কেমন করে। আধুনিক কালে সে অনুরাগ তো আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান বলেই মনে হচ্ছে। এর কি ব্যাখ্যা আপনি করেন ?

রায়চৌধুরী—বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সাহিত্যকে টেনে আনবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না। সে যাই হোক, আমি জোর গলায়ই একথা বলছি যে, কেবল সাহিত্যেই সুন্দরের বহুধা-বিচিত্র প্রকাশের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ এবং একমাত্র মাধ্যম হতে পারে না, কেননা আর্টের অন্যান্য শাখার ন্যায় এরও নিজস্ব একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে। চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্য্যে রং এবং রূপকে যেমনভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় সাহিত্যে কখনও তেমনটি সম্ভব হয় না। কথার সাহায্যে ছবি আঁকবার অর্থাৎ সাহিত্যে বর্ণনার দ্বারা রং ও রূপকে প্রতিফলিত করবার যে চেষ্টা করা হয় তা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে না, কল্পনা-গ্রাহ্যই থেকে যায়।

মনে ভাবাবেগ সঞ্চারের প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই যে, আর্টের এক রূপ আর এক রূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। পার্থক্যটা হ'ল প্রকাশের বাহনের মধ্যে। চিত্র-কলা ও ভাস্কর্য্য সাহিত্যের মত মুখর নয়, তার ভাষা হ'ল মূকের ভাষা এবং তাদের প্রকাশরীতি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বলে তাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। অন্য দিকে নিরন্তর ব্যবহারের দরুন সাহিত্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্র ব্যাপকতর বলে তার রসগ্রাহী এবং বোদ্ধার সংখ্যাও অধিক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ভাবের ও চিন্তার আদানপ্রদানের জন্য সাহিত্য হচ্ছে একটি অপরিহার্য্য মাধ্যম-স্বরূপ। সেইজন্যেই সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ ঘনিষ্ঠতর। কিন্তু কঠোর বাস্তব দুঃখকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে শিল্পীর তুলি এবং ভাস্করের ছেনিতে রূপায়িত সুন্দর মূর্ত্তি থেকে আনন্দোপভোগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা যদি সচেতন হই তা হলে আমরা দেখব যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই কল্যাণসাধনে ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা সাহিত্যের চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন নয়।

বিনায়কম—একথাটা আমার জানতে ইচ্ছা হয় যে, আমাদের সমাজে শিল্প-সচেতনতা বিকাশের প্রকৃষ্ট পন্থা কি ?

রায়চৌধুরী—আমার মনে হয় ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ই একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা। তাই হচ্ছে সমাজে শিল্প-সচেতনতা বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

বিনায়কম—কেমন করে ?

রায়চৌধুরী—প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের জন্যে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে সেই কৌতূহলকে

জাগিয়ে তোলা যা তাদের মনকে টেনে নিয়ে যাবে আমাদের উদ্দিষ্টের অভিমুখে। সেই জাগ্রত কৌতূহলবশতঃ কালক্রমে তারা এমন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবে যার দরুন তারা শিল্পকলার বাহ্যরূপে বিভ্রান্ত হবে না এবং চক্ষুর বিভ্রম-উৎপাদক চটকদার বাহ্যবস্তুর পিছনে লুক্কায়িত গোপন গহ্বরের শূন্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে। বাহ্য রূপ কথাটা আমি বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বকই ব্যবহার করছি। কেননা এর মধ্যে এমন একটা সস্তা চটক আছে যা শিল্পকলার মর্ম্মকোষে সঞ্চিত মধু আহরণের পরিপন্থী। বাহ্যিক চটক যে রস-সন্ধানীর মন ভোলায়, শিল্পকলার অন্তর্লোকে ভাব-ব্যঞ্জনার সঞ্চয়-ভাণ্ডারে তার প্রবেশ-পথ অবরুদ্ধ। সাধারণ অর্থে বাহ্য রূপ বলতে বোঝায় বিষয়-বস্তু, তার প্রতি থাকে একটা ভাবপ্রবণতামূলক আকর্ষণ। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু তো বহিরঙ্গ মাত্র—এহ বাহ্য, শুধু তাই দিয়ে আর্টের মূল্য যাচাই হয় না, আর্টের আসল মূল্য নিরূপিত হয় বিষয়বস্তু কি ভাবে প্রকাশিত হ'ল তাই বিচার করে—সেই জন্য আর্টের জগতে বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রকাশভঙ্গীর গুরুত্ব ঢের বেশী। এখন এই দিক দিয়ে আমরা জটিলতার সম্মুখীন হয়েছি অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে শিল্পকলার নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার প্রয়াস পাচ্ছি। এই মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা শিল্পকলার রস উপলব্ধি করা ধৈর্য্য ও সময়সাপেক্ষ। এটা খুব সহজসাধ্যও নয়। আপাততঃ এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা অনাবশ্যক।

বিনায়কম—তা হলে আপনি কি বলতে চান যে, জনসাধারণের জন্যে উপযুক্ত সুযোগের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তারা শিল্পকলার রসোপলব্ধিজনিত প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হবে না?

রায়চৌধুরী—যেখানে নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য বিদ্যমান সেখানে আর্টের নিগূঢ় তাৎপর্য্যের উপলব্ধিজনিত স্থায়ী আনন্দ-লাভ সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতিরিক্ত অন্য কিছু ভাববার অবকাশ নেই। এটার ব্যবস্থা সে যেমন তেমন ভাবেই হোক করে নেয়।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক একজন কেরাণীর কথা। তার আছে আপিস। আর তার জীবনের মুখ্য কাজ হ'ল নিয়মিত ভাবে সেখানে হাজিরা দেওয়া। সেই পবিত্র পীঠস্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে তাকে ধরতে হয় প্রথম 'বাস', সেখানে গিয়ে গভীর নিষ্ঠা সহকারে রত হতে হয় তাকে নথিপত্রের পূজায়, কারণে-অকারণে ঘন ঘন প্রণতি জানাতে হয় আপিসের বড়বাবুকে। দুর্ভাগ্যক্রমে পরমতীর্থ চাকরিস্থানে হাজিরা দিতে যদি তার দু'এক মিনিট দেরি হ'ল তো বড়বাবু নামধেয় সেই উদার নরদেবতাটির নিকট তার কর্ত্তব্য-সচেতনতা প্রমাণের সকল আয়োজন এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়। ষোল আনা ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, যে যানটি সেই পবিত্রতম মুহূর্ত্তের মধ্যে তাকে বড়বাবু অধিষ্ঠিত স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দেবে সেটিকে সে প্রায়ই 'মিস' করে। ফলে যথাস্থানে পৌঁছুতে তার বিলম্ব হয়—কম্পিত বক্ষে সে আপিস-কক্ষে প্রবেশ করে। সময় নষ্ট করার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সে যে একান্ত নিরুপায় সে কথা কে শোনে! এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আপিসের নিয়মানুবর্ত্তিতা মেনে চলবার জন্যে তার উপর আদেশ জারী করা হয়। সে নত মস্তকে সেই আদেশ গ্রহণ করে এবং যে বেতনের জন্যে সে নিজের দেহমনকে বিক্রী করেছে তা উপার্জ্জন করবার জন্যে একেবারে মরীয়া হয়ে খাটতে থাকে। কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে সে বাড়ী ফিরে যায়—যেন একটি ভগ্ন জীর্ণ মনুষ্য দেহ-ধারী যন্ত্রবিশেষ।

সেখানে আবার সুরু হয় সংসারের করণীয় কাজ, কিন্তু তাতেও কোনো স্বতঃস্ফূর্ত্ততা নেই বলে সেগুলোও হয় প্রাণহীন, নেহাতই দায়সারা গোছের। এক সময় সে ছিল তার প্রিয়তমা পত্নী এবং গৃহের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, কিন্তু প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং কৃত্রিমতাপূর্ণ কর্ম্মজীবনের চাপে অতীতের সেই প্রেমের হয়েছে সমাধি-রচনা। যাই হোক, রঙ্গমঞ্চে পেশাদার অভিনেতা যেমন যে ভূমিকায় অভিনয় করে সেটা যে তার আসল স্বরূপ নয়, ধারকরা ব্যক্তিত্বমাত্র সেকথা ভুলে যায়, উক্ত মসীজীবীটির অবস্থাও হয় তদনুরূপ অর্থাৎ জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যে কৃত্রিম জীবন তাকে যাপন করতে হয় সেটা যে তার আসল সত্তা নয়, সেকথা সে বিস্মৃত হয় এবং এই কৃত্রিম জীবনই তার কাছে একান্ত ভাবে সত্য হয়ে ওঠে, ফলে তার প্রকৃত ব্যক্তিসত্তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

তখন তার জীবননাট্যের পট পরিবর্ত্তন হয়ে অবতারণা হয় নূতন দৃশ্যের। প্রিয়তমা পত্নীকে প্রণয়-বচনে পরিতৃপ্ত করার পরিবর্তে সে তাকে দেয় অভিশাপ। একপাল অবাঞ্ছিত ছেলেমেয়ের জন্মের জন্যে স্বামী তাকেই দায়ী করে, জীবনের এই নিরানন্দ একঘেয়েমির জন্য সে তারই উপর করে দোষা-রোপ। আর এটা তো জানা কথা যে নিজের দোষত্রুটি অপূর্ণতা ইত্যাদির জন্য অপরকে দায়ী করে মানুষ লাভ করে পরম সান্ত্বনা। যাই হোক্, স্বামী কর্ত্তৃক ভৎর্সিতা বেচারী স্ত্রী কিন্তু পতিদেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে এই সমস্ত প্রশস্তিবাক্য নীরবে হজম করে। রাত্রি কেটে যায় দুঃস্বপ্নের ঘোরে, আর পরদিন থেকে সুরু হয় সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। যে কাহিনী বর্ণনা করলাম সেটি হচ্ছে সমাজের এমন এক জনের জীবনের বাস্তব ও সত্য চিত্র, আনন্দের সন্ধান করবার অবকাশ তো দূরের কথা, আনন্দের অস্তিত্বেই যার আস্থা নেই। আনন্দ হচ্ছে তার নিকট নিষিদ্ধ বস্তু। এখন যদি হিসাব সংগ্রহ করতে সুরু করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে,

সমাজের আরও বহু ব্যক্তি অনুরূপ ভাবে নিরানন্দময় গতানুগতিকতার অনুবর্ত্তন করে চলেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যে কেরাণীটির কথা বলা হ'ল তার সঙ্গে তাদের অল্পই পার্থক্য আছে, অনেক ক্ষেত্রে আবার কিছুমাত্র পার্থক্যও নেই।

বিনায়কম—কিন্তু···

রায়চৌধুরী—দয়া করে আমাকে বক্তব্যটা শেষ করতে দিন—আমি কি বলছিলাম?

বিনায়কম—বলছিলেন লোকের আনন্দের প্রতি বিশ্বাস লোপের কথা।

রায়চৌধুরী—হাঁ। একদা পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস আমাদের দেশের শিল্প-কলার বিকাশের পথে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। বরং একথাই আমি বলব যে, ধর্ম্মবিশ্বাসই সেই শিল্পকলা-সৃষ্টির মূল প্রেরণা জুগিয়েছিল যার পেছনে ছিল জনগণের সমর্থন। দেবমন্দিরের সহিত ভক্তের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য যদিও ছিল ভিন্ন প্রকার তথাপি মন্দিরের অধিষ্ঠাতা সুন্দরের প্রচণ্ড প্রভাব দর্শকের মনেও সঞ্চারিত হ'ত। এমনিভাবে উপাস্য দেবতার নিরন্তর সান্নিধ্যের দরুন ভক্তের হৃদয়-মনে যে ছাপ পড়ত তা স্বভাবতই হয়ে দাঁড়াত একেবারে বদ্ধমূল। দেবতা অলক্ষ্যে তার হৃদয়ের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিতেন। গ্রহীতা জানতেও পারত না কেমন করে সুন্দর তার অন্তরের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এসে আসন পেতেছেন।

বিনায়কম—আচ্ছা ছবির গভীর রসোপলব্ধি হয় কেমন করে? এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

রায়চৌধুরী—এটা নির্ভর করে কৌতুহল কিভাবে জাগ্রত হ'ল আর ছবির মূল রহস্য-সন্ধানী কি পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পারে তার উপর। কিন্তু এখনই এত তত্ত্বানুসন্ধানের কি দরকার। আমি আগেই বলেছি যে, আপাততঃ আমাদের এ নিয়ে মাথা ঘামানো অনাবশ্যক। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, এখন আমরা চাই সেই পরিবেশের সৃষ্টি করতে যা জনসাধারণকে দেবে আনন্দ। গোড়ায় আমরা কেন শুধু তাই নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকব না। কোনো উত্তম খাদ্য যদি আমাদের রসনার তৃপ্তি বিধান করে তা হলে সকল সময় আমরা যে সকল মশলা সংযোগে এবং যে প্রাকপ্রণালীতে সেই খাদ্য প্রস্তুত হয়েছে তা আবিষ্কার করবার জন্যে পাচকের পেছনে ধাওয়া করি না। আর্টের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগের স্বাস্থ্যকর অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি যদি করতে সক্ষম হই তা হলেই আমরা এই মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করব যে, মানুষকে নিষ্ঠুর বাস্তবের প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমরা যথাসাধ্য করেছি—বাস্তবিকই আমরা জনসাধারণের সেবায় লাগতে পেরেছি। আসুন আমরা এমন আর্ট-গ্যালারি স্থাপন করি যা অতীতের মন্দিরের ন্যায় দর্শকের মনে সুন্দরের প্রতি অনুরাগকে উজ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হবে—অতীতে মন্দির দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত বর্ত্তমানে তাই সাধিত হবে আর্ট-গ্যালারি দ্বারা।

বিনায়কম—আপনার বক্তব্য আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারছি না। আপনি কি বলতে চান যে, আর্ট-গ্যালারিগুলো গ্রহণ করবে মন্দিরের স্থান।

রায়চৌধুরী—সুন্দরের মন্দির।

বিনায়কম—আচ্ছা, আপনি কি একথা মনে করেন না যে, কোনো শিল্পীর কাজ ভাল করে বুঝতে হলে তার ব্যক্তিত্বের সহিতও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন?

রায়চৌধুরী—শিল্প হচ্ছে শিল্পীর চিন্তার প্রতিফলন। সুতরাং কেমন করে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে? কিন্তু এটা কি আপনি ভেবে দেখেছেন যে, এতে অপরের সময়ের উপর কিরূপ অত্যাচার করা হবে। এ ধরণের কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্যে কয়জন তাদের শক্তি ও সময় ব্যয় করতে পারে। কারো কারো বাহ্য আকৃতি দেখে মনে হয় লোকটি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির; কিন্তু তার অন্তরের কোমল বৃত্তিগুলির সন্ধান পেতে হলে যেমন চাই সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব তেমনি আবশ্যক ধৈর্য্য। গতিশীল জগতে আমাদের বাস। সবকিছু চলছে এক পূর্ব্বব্যবস্থিত পরিকল্পনা অনুযায়ী। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাতমাত্রেই আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় এবং তাই হচ্ছে চরম। আপনি যে দিকটার প্রতি ইঙ্গিত করছেন সেটি হচ্ছে আর্টের তত্ত্ব এবং সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ সম্বন্ধে লোকের মনে কৌতূহল জাগানোর প্রশ্ন, কিন্তু আপাততঃ তার প্রয়োজন আমাদের নেই।

বিনায়কম—রং এবং রূপের আসল মূল্য আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং এগুলির মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াই বা কি?

রায়চৌধুরী—যাবতীয় মূল্যই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং আপেক্ষিক। রং এবং রূপের বেলায়ও তাই। ছবিতে অবাঞ্ছিত ছায়ার সংস্পর্শে এলে অথবা নিজের পারিপার্শ্বিকের সহিত সৌসামঞ্জস্য স্থাপন করতে না পারলে রং আর্ত্তনাদ করে উঠতে পারে। রূপসমূহ গড়ে ওঠে সুমিত রেখার বিন্যাসে এবং মাত্রাজ্ঞানের সহায়তায়। সঙ্গীতে বিবাদী সুর যেমন রাগরাগিণীর মাধুর্য্য নষ্ট করে তেমনি রঙের প্রয়োগ আর রেখার বিন্যাস যথাযথভাবে না হলে ছবির রস ক্ষুণ্ণ হয়।

যদি আমরা কারও মনের উপর ভাল মন্দ উভয় প্রকার শিল্পকলার প্রতিক্রিয়া দেখবার প্রত্যাশা করি ... সর্ব্বাগ্রে তার মুড, মানসিক গড়ন এবং রসোপলব্ধির ক্ষমতা কিরূপ তাই বিচার করে দেখতে হবে। যদি তার সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলি নির্জ্জীব বা চেতনাহীন হয়ে থাকে তা হলে আমাদের সকল প্রত্যাশাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কেননা তা হলে ভাল বা

মন্দ কোন রকম ছবিই তার মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারবে না। নানা কারণে আমাদের সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলি চেতনাহীন হয়ে গেছে—এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে তার চিকিৎসা আর এর ওষুধ হচ্ছে অন্তরের সহানুভূতি। অনাহুত ভাবে কৃপা প্রকাশ দ্বারা বা উৎসাহের আতিশয্যে কেতাদুরস্ত প্রচার দ্বারা এর প্রতিকার হবে না। এর দ্বারা মূল রোগের প্রতিবিধান অল্পই হয়, কেননা এ ধরণের প্রচারমূলক আন্দোলনের অন্তর্নিহিত আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে নিজেকে জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভের উপায় সন্ধান। এভাবে অনেক তথাকথিত শিল্প-সমালোচকের স্বমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বহু ক্ষেত্রে আসল উদ্দেশ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বিনায়কম—আর্ট কি মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করতে পারে?

রায়চৌধুরী—চরিত্রের আদর্শ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন। সুতরাং চরিত্র কথাটির সংজ্ঞা আরও সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

বিনায়কম—প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, আর্টের অনুশীলন নৈতিক বোধ বিনষ্ট করে।

রায়চৌধুরী—নীতিসমূহ হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনে তৈরি কতকগুলো আদর্শ—মানুষ তাদের প্রবর্ত্তন করেছে সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে। নৈতিক বিধানগুলো যেন প্রহরীস্বরূপ, এবং যখনই কেউ সামাজিক অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে তখনই তার বিবেককে পীড়ন করবার জন্য সেগুলি সর্ব্বদা সজাগ থাকে—আর অনুশাসন মানেই তো বিনা প্রশ্নে কোন বিধান বা মতবাদকে মেনে নেওয়া।

আর্টেরও নিজস্ব রক্ষক আছে, কিন্তু আর্টিষ্টের নীতিধর্ম্ম সীমাবদ্ধ তার অশান্ত অন্তরের ভাবকল্পনার প্রকাশের আন্তরিকতার মধ্যে। তার সৃষ্টি ঘটনাচক্রে প্রচলিত নৈতিক আদর্শকে সমর্থন করতেও বা পারে। কিন্তু যদি তা নাই করে তাতে আর্টিষ্টের কিছু যায় আসে না, সেটা প্রচলিত দুর্ব্বল নৈতিক বিধানেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

বিনায়কম—আর্টের ক্ষেত্রে যৌন প্রবৃত্তির স্থান কোথায় তা জানতে আমার ইচ্ছা হয়।

রায়চৌধুরী—যৌন প্রবৃত্তিই হচ্ছে মূল প্রেরণা যা শিল্পীকে সৃজনকার্য্যে প্রবৃত্ত করে। এটা হচ্ছে মহান্ লক্ষ্যে পৌঁছবার মহৎ পন্থা। একেবারে আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা যায় [illegible] প্রবৃত্তি ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চিত্রে, সাহিত্যে এবং ভাস্কর্য্যে এর সাক্ষ্য মেলে। অমর কবি কালিদাস তাঁর মহাকাব্য কুমার-সম্ভবে মহাযোগী শিবের ধ্যানে বিঘ্ন উৎপাদন করাতেও দ্বিধা করেন নি। পার্ব্বতীর বর্ণনা পড়লে মনে হয় এ যেন নিপুণ ভাস্করের গঠিত অনবদ্য মূর্ত্তি—সেই মূর্ত্তির ঋজু বক্র রেখাগুলি যেন চোখের সামনে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। অজন্তা গুহায় প্রভু বুদ্ধের তপস্যার বিঘ্ন-সৃষ্টির চিত্র আমাদের চোখের সামনে সেই একই দৃশ্য উদ্ঘাটিত করে। শ্রেষ্ঠ ভাস্করগণ মন্দিরাদির কঠিন পাষাণ-প্রাচীরে মানুষের আদিম হৃদয়াবেগসমূহকে তিন ডাইমেনসনে রূপায়িত করেছেন এবং মূর্ত্তিগুলোকে তাঁরা একেবারে যেন জীবন্ত করে গড়েছেন। গঠনকৌশলে তাদের এমনি বাস্তব বলে মনে হয় যে, দর্শকের মনে এগুলোকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগে—এ সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন নীতিবাগীশদের বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং যুক্তিতর্ককে ব্যর্থ করে দিয়ে আজও বেঁচে আছে।

ব্যষ্টি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই যৌন প্রবৃত্তির অপব্যবহার অনিষ্টকর হতে পারে, কিন্তু এর উপযুক্ত ব্যবহার পৌরুষ ও শক্তিমত্তার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়, আর এটা যার আছে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি।

বিনায়কম—কোনো কোনো মহলে এ ধারণা প্রচলিত যে, আর্টের অনুশীলন বিলাস মাত্র।

রায়চৌধুরী—যদি তাই হয় তা হলে শ্রেষ্ঠ কবিদের লেখা সমুদয় বই পুড়িয়ে ফেলে ছেলেদের আর্টের চর্চ্চার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না কেন? বিভিন্ন শিল্প-কলার যা উদ্দেশ্য, কবিতারও তাই—অর্থাৎ সেগুলোর মত কবিতাও আমাদের শুধু আনন্দই দেয়—আমাদের কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনে আসে না। আজকের দিনে আমাদের খাদ্যাভাব নিদারুণ বলে আমরা আকুলভাবে আর্ত্তনাদ সুরু করেছি এবং নিজেদের দারিদ্র্যের কথাও তারস্বরে ঘোষণা করছি। এর উপর অকারণে আমরা কি আর এক শ্রেণীর দৈন্যকে বরণ করে নেব আর মনকে রাখব উপবাসী। আর্ট হচ্ছে মনের খোরাক এবং এর সঞ্জীবনী শক্তি শ্রেষ্ঠতর কর্ম্মে এবং উন্নততর জীবনযাপনে মানুষকে প্রবৃত্ত করে।

* * *

দেবীপ্রসাদ বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, ভাস্কর, চিত্রকর এবং লেখক। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হৃদয়কে অভিভূত করে সেগুলি হচ্ছে শক্তি, সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং সংবেদনশীলতা বা দরদ। তাঁর শিল্পকর্ম্মের মধ্যেও এগুলির প্রকাশ লক্ষণীয়। বাস্তবিকই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং শ্রেষ্ঠ ভাস্কর।*

---

* মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত খাদি স্বদেশী এবং শিল্পপ্রদর্শনীর (১৯৪৯-৫০) *Souvenir* অবলম্বনে।

শত্রু

শ্রীজীবনময় রায়

নদীর ধারে একটা ছিপ হাতে করে বসে আছে বাম্নু। শাল-মহুয়ার বনের ধারে ছোট্ট পাহাড়ে নদী। তার এক দিক ঘেঁসে একটা স্রোতের ধারা। তারই মধ্যে এক কোলে জলটা একটু গভীর। ভোরে উঠে বাম্নু ছিপ নিয়ে এসে বসেছে সেই জলের ধারে, আর একটা কাঁচা পেয়ারায় একটু একটু করে কামড় দিয়ে অনির্বচনীয় রস সম্ভোগ করছে। চোখ দুটো কিন্তু ফাৎনার উপরে একেবারে আঁটা। ছোট্ট একটা মাছও এর মধ্যে ধরা পড়েছে, মনটা তাই খুশী আছে। চর্বণের ফাঁকে ফাঁকে বিড়বিড় করে বকছে—আসুক না আজ উল্‌খান্, তারপর কালকের শোধ তুলে নেব। আমার মাছ ছুঁতে এলে দেব এক পট্‌কান জলের মধ্যে, হুঁ:। হৈ:—যা: মাছটা পালিয়ে গেল। কে ঢিল মারলে রে! পিছন ফিরে দেখে উল্‌খান্ আর একটা ছিপ হাতে প্রায় কাছে এসে পড়েছে।

—তবে রে, ঢিল মারলি কেন? মাছটা আমার পালিয়ে গেল! দাঁড়া দেখাচ্ছি।

—তুই আমার জায়গায় কেন বসবি? দে আমার মাছের ভাগ দে।

—দিচ্ছি দাঁড়া। বলেই বাম্নু ছিপ নিয়ে উল্‌খানকে তেড়ে গেল। সাঁই সাঁই, পট্‌পট্ ছিপ দিয়ে পেটাপিটি চলল খানিকক্ষণ। বাম্নুর কপালটা কেটে রক্ত পড়ছে গাল বেয়ে; উল্‌খানেরও ঠোঁট আর ভুরু কেটে গেছে। দু'জনেরই মুখ দেখাচ্ছে ঠিক বটতলার সিঁদুরমাখা কালো পাথরের ডেলার মত।

হঠাৎ উল্‌খান্ দৌড়ে গিয়ে এক লাথিতে বাম্নুর মাছের খালুইটা জলে ফেলে দিলে; আর বাম্নু ছুটে এসে এক ধাক্কায় উল্‌খানকে একেবারে নদীর মধ্যে ফেলে দিয়ে বললে, যা, এখন ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধর গিয়ে। এই বলে, উল্‌খান্ ওঠবার আগেই ছুটে বাড়ী পালিয়ে গেল। এই গেল সকালে।

সেই দিনই দেখা গেল দুপুর বেলা বনের মধ্যে একটা হরিতকী গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে, বুনো কুল খাচ্ছে দু'জনে। সকালবেলায় খণ্ডযুদ্ধে ভেঙেচুরে ছিপ দুটোর আর কিছু ছিল না। ছিপ কাটতে এসেছে তাই দু'জনে দুপুর বেলা এই জঙ্গলে।

২

বাম্নু আর উল্‌খান্ একই গাঁয়ে পাশাপাশি পাড়ায় থাকে। ছেলেবেলা থেকেই একদণ্ড দু'জনের দু'জনকে না হ'লে চলে না, আবার উভয়ের মধ্যে রেষারেষিও দুর্দান্ত। খেলাতেই বল, কি পালপার্বণে তীরবর্শা চালানোতেই বল, কিংবা শিকারে কি গাছ বাওয়ায়, যাতেই বল, দু'জনের মধ্যে একটা রেষারেষি না হলে কারোরই তৃপ্তি হয় না। কেমন করে একজন আর একজনকে একেবারে ঘায়েল করে ছাড়বে এই ছিল তাদের দিন রাতের চিন্তা। এ শুধু রেষারেষি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, এ যেন জন্মান্তরের শত্রুতা।

বয়স যখন তাদের সবে সতেরো কি আঠারো, তখন নাথু সর্দারের মেয়ে ঝুমরিকে নিয়ে দু'জনের মধ্যে একদিন খুব ঝগড়া হয়ে গেল। তাতে উল্‌খান্ নির্বিকার চিত্তে বাম্নুর বুকে বর্শার ফলক বসিয়ে দিলে ইঞ্চি তিনেক; আর উল্‌খানের তেলমাখানো চেরা সিঁথি বরাবর হেঁশোর কোপ বসিয়ে দিলে বাম্নু ইঞ্চি পাঁচেক, বেশ পরিপাটি করে। ফলে দু'জনকেই মাস দুই শহরের হাসপাতালে গিয়ে বন্দী হয়ে থাকতে হ'ল। আর কেউ কাউকেই খুন করতে পারে নি বলে অতি অপদার্থ জ্ঞানে ঝুমরি ঘেন্নায় দু'জনকেই ত্যাগ করলে। ছ্যা:! এ দুটো আবার মরদ!

এদিকে হাসপাতালে শুয়ে দু'জনে জ্বরের ঘোরে অনবরত প্রলাপ বকছে। তাতে তিনটে কথা স্পষ্ট বোঝা গেছে। এক—যে, ঝুমরী এই ঝগড়ার ঠিক লক্ষ্য নয়—উপলক্ষ্য, মানে, একটা বলবার মত অজুহাত চাই ত—খুনোখুনিটাই আসল লক্ষ্য। দুই—যে, মোক্ষম ঘা মারতে পারে নি বলে দু'জনেরই আপসোসের আর অন্ত নেই, এবং তিন—যে, ভবিষ্যতে খুন করার সুযোগ পাবার জন্যে লড়াইয়ের দেবতা বোঙ্গার কাছে একে অন্যের প্রাণ ভিক্ষা চায়। কেননা শত্রুই যদি মারা গেল তবে বেঁচে থেকে আর সুখ কি?

বোঙ্গা বোধ করি তাঁর সুযোগ্য ভক্তদের প্রার্থনা পায়ে ঠেলতে পারলেন না। কেননা দেখা গেল যে দু'জনেই ঠিক বেঁচে উঠল।

৩

কিন্তু তাদের জীবনের যে ঘটনাটি বলার জন্যে তাদের বাল্য এবং কৈশোরের এতখানি পরিচয় দিতে হ'ল তার মত অদ্ভুত ঘটনা জীবনে কখনও শুনি নি। সেইটেই এখন আপনাদের বলব।

গ্রামের মধ্যে সকলেই একথা জানত যে, হয় বাম্নু না হয় উল্‌খান্ একদিন গ্রামের সর্দার হবে। কেননা ওদের জুড়ি আর ও গাঁয়ে কেউ ছিল না। সেই সর্দার বাছাইয়ের দিন ঘনিয়ে এল বুড়ো সর্দারের মৃত্যুতে। সুরু হ'ল দুজনের মধ্যে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দু'জনেই পঞ্চায়েৎ-বুড়োদের হাত করার মতলবে আর নিজের দলে লোক টানবার চেষ্টায় অসাধ্যসাধন করছে। গ্রামের লোকও প্রায় সমান ভাগে কেউ এর দলে কেউ ওর দলে ভিড়েছে। বীভৎস চিৎকারে ঢাকঢোল পিটিয়ে এক দল অন্য দলের পরাজয় এবং স্বদলের জয়বার্তা ঘোষণা করছে। তলে তলে গোপনে চলেছে, একের অপরের আয়োজন পণ্ড করার চেষ্টা, আর সর্বনাশ করার ফিকির-ফন্দী। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল যে পক্ষপাতী পঞ্চায়েৎ উল্‌খান্‌কেই সর্দার বলে ঢোলশহরৎ করে প্রচার করে দিলে। রাগে বান্নুর মাথায় গেল খুন চড়ে। কাউকে কিছু না বলে সভা ছেড়ে উঠে সে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরে বসে বসে শুনতে পাচ্ছে বান্নু উল্‌খানের দলের হুঙ্কার। কাড়া নাকাড়া ডুগির আওয়াজ আসছে কানে—ডুগ্‌ ডুডুগ্‌ ডুগ্‌, ডুগ্‌ ডুডুগ্‌ ডুগ্‌ যেন তার মাথার চাপা হাঁড়িটার মধ্যে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে তারই শব্দ। হাজার রকমের শব্দ উৎসবের। নূতন সর্দারকে নিয়ে গ্রাম উৎসবে মেতেছে। তাড়ি উড়ছে ভাঁড়ের পর ভাঁড়। মাদল বাজছে—ডিমি ডিমি ডিমি ডিম, ডিমি ডিমি ডিমি ডিম।

দেয়াল থেকে ধনুকটা নামিয়ে বাঁ হাতটা গলিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে। তারপর এক মনে তীর বাছাই করতে লাগল। কঠিন মুখের একটা পেশীও নড়ছে না, কেবল চোখের ভিতর দিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে মনের আগুনের লহর। বিড় বিড় করে বলছে—একটার বেশী দুটো তীর না লাগে শয়তানকে মারতে; নইলে মারার সুযোগ আর জুটবে না কোন কালেই। তারপর কি ভেবে তীরধনুক রেখে টাঙ্গিটা পেড়ে নিলে। তার ধার পরীক্ষা করে বললে, হাঁ, ঠিক আছে। এক কোপে একেবারে—পাকা তালটির মত টুপ করে কাঁচা মাথাটা ধড় থেকে খসে পড়বে—রক্ত ছুটবে ফিন্‌কি দিয়ে…ইঃ।

হঠাৎ কি একটা মতলব মাথায় আসতে বান্নুর কালো পাথরের মত মুখটা যেন একটা পৈশাচিক হাসিতে সজীব হয়ে উঠল। মনে মনে ভারি পছন্দ হয়েছে ফন্দীটা। দেয়ালের গায়ে টাঙ্গিটা টাঙিয়ে রেখে ধীরে সুস্থে সে বাইরে বেরিয়ে গেল। ওদিকে তখন উল্‌খান্‌কে নিয়ে চলেছে নাচ গান আর হল্লোড়। মত্ত হয়ে নাচছে উল্‌খান্‌, খোশ মেজাজে, উদ্ভিন্নযৌবনা ঝুমরির পরিপুষ্ট দেহের দিকে নুয়ে নুয়ে, দুলে দুলে—ঝুমরির নাচের তালে তালে। সাপ খেলাচ্ছে যেন ঝুমরি—হেলিয়ে দুলিয়ে এগিয়ে যায়, ধরতে গেলে এড়িয়ে পালায়। মাদল বাজছে, ডিডি ডিম্‌ ডিডিম্‌ ডিডিম্‌—ডিডি ডিম্‌—ডিডিম্‌ ডিডিম্‌। যৌবনের নেশা, মদের নেশা—তাড়ি আর ঝুমরি! মাতাল করে তুলছে উল্‌খান্‌কে। গা টলছে, পা টলছে, রক্তে জ্বলছে আগুন। ঝুমরি…। দুই হাতে আকাশ আঁকড়াতে আঁকড়াতে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বেহুঁশ উল্‌খান্‌কে সেদিন ধরাধরি করে সবাই তার ঘরে রেখে এল।

৪

পরদিন সকালে চড়চড়ে রোদের ঝাঁঝ লেগে চোখ মেলল উল্‌খান্‌—এ কি! নড়তে পারে না কেন? সমস্ত দেহটা যেন আড়ষ্ট, কাঠের মতন! কি একটা অসহ্য অস্বস্তি আষ্টেপৃষ্ঠে হাড়ে-মাসে যেন সেঁটে ধরে আছে। জেগে দেখে দশ মাইল দূরে, কিছু দিন আগে যে বাঘের ফাঁদটা পেতে এসেছিল দু'জনে বিজ্‌নীর জঙ্গলে, তারই মধ্যে পাটাতনের সঙ্গে লতার দড়ি দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে আগাপাছতলা বাঁধা হয়ে পড়ে আছে সে। ওঠবার বা নড়বার যো নেই। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিমূর্তি বান্নুটা এক চোখ মট্‌কে হাসছে আর শরীর দুইয়ে বিদ্রূপ করে বলছে—গড় হই সর্দার গো:, চল্লুম এখন। আবার এক দিন ফিরে আসব তোর হাড় ক'খানার পুজো দিতে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ…। থামতেই চায় না যেন আর দুশমনটার হাসি।

রাগের চোটে উল্‌খান্‌ প্রাণপণে ঝাঁকি দিল দুই হাতের বাঁধনে। থর থর করে কেঁপে উঠল মোটামোটা শালের খুঁটি দিয়ে তৈরি সেই বাঘের ফাঁদ, বাঁধন কিন্তু ছিঁড়ল না। দশ মিনিট প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করে নির্জীব হয়ে পড়ে রইল সে নিঃসাড়ে।

দুপুরবেলার পাহাড়ে রোদে মুখের বুকের চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। চোখের ভিতর শেয়াকুলের কাঁটা খোঁচাচ্ছে যেন। তেষ্টায় ছাতি ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে পড়বে মনে হচ্ছে। প্রতি লোমকূপে আগুনের শিখা।

রাগের চোটে গর্জাচ্ছে উল্‌খান্‌—খাঁচায় পোরা বাঘ। মাথার খুলিটা রাগের দাপটে মদের বোতলের ছিপিটার মত দম্‌ করে উড়ে যাবে যেন। জ্ঞান ক্রমে তার লোপ পেয়ে আসছে। শুধু মাথার মধ্যে লাট্টুর মত পাক খেয়ে ফিরছে একটা কথা—মরলে চলবে না, মরলে চলবে না, মরলে চলবে না। বান্নুকে খুন না করে মরতে পারবে না সে; কিছুতেই না।

সন্ধ্যার দিকে আবার তার জ্ঞান একটু একটু করে ফিরে আসছে। খিদের চোটে পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়িগুলো খামচাচ্ছে চটকাচ্ছে চিবোচ্ছে যেন। আর একবার প্রাণপণ শক্তিতে সে বাঁধন ছিঁড়তে চেষ্টা করলে। সাধ্য কি! বুনো মোষের মত তার দেহ, তেমনি বল তার শরীরে। মেলায় সে বান্নুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কত মোটা মোটা কুয়োর দড়ি ছিঁড়েছে; কিন্তু বুনো লতার এই শক্ত বাঁধন সে ছিঁড়তে পারলে না। ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে রইল চুপ করে। ঘুমাতে চেষ্টা করতে গিয়ে কিছুতে ঘুম এল না। ঝুমরি আর উৎসব

আর শয়তান বান্নু টার কথা ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, যেন ঝুমরির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তার। চারদিকে মশালের আলো, মাদলের বাজ; হাঁড়িয়ার গন্ধে আকাশ বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে। এমন সময় প্রকাণ্ড একটা ভাল্লুকের মত বান্নু টা হঠাৎ কোথা থেকে এসে ঝড়ের মত আসরে ঢুকে পড়ল—আর, ও কি! ঝুমরিকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলে। হাসছে ঝুমরি খিল খিল করে, বান্নু র কোলে চড়ে, ওর গলা জড়িয়ে ধরে। যেন ভারি একটা কৌতুকের ব্যাপার। রেগে উল্‌খান্ বান্নু কে খুন করবে বলে লাফিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু এ কি! কারা সব ওর হাত পা চেপে গলা টিপে ধরেছে, বুকের উপর চড়ে বসেছে।

আরে! দম বন্ধ করে মারবে নাকি। প্রাণপণে ওদের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছে সে—কিছুতেই পারছে না। ওরা, হেঁশো দিয়ে হাতটা কাটছে করাতের মত করে। ঘুম ভেঙ্গে দেখে যে ঘুমের ঘোরে ধস্তাধস্তিতে লতায় তার হাত কেটে গেছে—আর রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে।

নির্জীব হয়ে পড়ে আছে উল্‌খান্। শরীর তার ঝিমিয়ে আসছে ক্রমে। একটানা একটা ঝি ঝির ডাক—মাথার কোন্ একটা ফোকরে বাসা বেঁধেছে যেন। কেমন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। সমস্ত চৈতন্যকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে। হাত পা গা এলিয়ে আসছে। দেহ থেকে প্রাণটা আল্‌গা হয়ে গেছে যেন—আর ধরে রাখতে পারছে না। এ কি! সে মরে যাবে নাকি শেষে? কিছুতেই নয়, মরা তার হতে পারে না। বান্নু বেঁচে থাকতে সে মরবে? না—না—না মরতে পারবে না সে।

এমনি চলল তিন দিন তিন রাত। চতুর্থ দিন ভোরের বেলা ঘোলা ঘোলা চোখ মেলে সে তাকাল। চারদিকে মনে হয় যেন ছায়া ছায়া কি সব ঘুরছে। ভয়ে ভয়ে ঘাড়টা ফেরাল সে। কে? বান্নু? না, না, একটা হুণ্ডার, ঐ যে আরো একটা। ওর মরার অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে সব। মস্ত ভোজ হবে ওদের। ই-স! কিছুতেই মরবে না সে! মরতে পারবে না। বান্নু বেঁচে থাকতে নয়। হু-ট; হাঃ! হুণ্ডার ছুটো লাফ দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে বসে।

সকাল হয়ে এল। ঘাড় বড়ই ব্যথা করছে। ঘাড়টাকে অন্যদিকে ফেরাতেই দেখে সারি সারি লাইন বেঁধে, লম্বা লম্বা ঘাড় হেঁট করে উপাসকমণ্ডলীর ভঙ্গীতে নীরবে বসে আছে, এক পাল শকুন। ঠিক এমনিটি সে দেখেছিল শহরে, গির্জায় মাঠে, কোন্ একটা পরবের দিনে। বসে আছে ওরা অগাধ ধৈর্যে, ওরই মরণের প্রতীক্ষায়। সত্যিই মরতে হবে নাকি! এঁ্যা! বান্নু টা দিব্যি নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকবে, সর্দার হবে, ঝুমরিকে—উঃ! কক্ষণ হতে দেবে না তা। মরবে না সে! মরা কিছুতেই চলবে না তার।

তুপুর রোদে মুখ আর বুকের চামড়া পুড়ে ভিস্তির চামড়ার মত হয়ে উঠেছে। গা বমি বমি করছে রোদ্দুরে। অন্য পাশে মাথাটা ফেরাতেই এক ঝলক বমি হয়ে গেল—রক্ত বমি। তেতো! মাথার ভিতরে পান্‌চাককী ঘুরছে যেন—ঘরর্ ঘরর্। শরীর ঝিমিয়ে জ্ঞান লোপ পেয়ে আসছে। পান্‌চাককীর আওয়াজ শুনছে ঘরর্ ঘরর্। ঝুমরির হাতের হাড়ের বালায় কাঁসার চুড়িতে ঝুমঝুমি বাজছে—ঠুক্ ঠুক্ ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ ঝুম্ ঠুক্ ঠুক্। মাথায় গোঁজা ডালসুদ্ধ এক থোকা কলকে ফুল দোল খাচ্ছে তালে তালে ঝুমরির এলো খোঁপা বাঁধা ঘাড়ের উপরে এসে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ওর গাল। খুব দূরে কোথায় যেন একটা রেলের বাঁশী বাজছে একটানা সুরে—কু-উ-উ।

৫

অলাহু জঙ্গল। জনমনুষ্য আসে না এদিকে বড় একটা। সেদিন দূর গাঁয়ের কয়েকজন লোক চলেছে, জঙ্গল ভেঙ্গে সোজা পথে। ফাঁদটার কাছাকাছি এসে সামনের লোকটা থমকে দাঁড়াল।

প্রথম—ওরে ভাই, একটা বাঘের ফাঁদ!

দ্বিতীয়—আর দেখ দেখ ওটার মধ্যে একটা শুয়োর মেরে রেখে গেছে।

প্রথম—চল, চল, ওটাকে বের করে পুড়িয়ে খাই!

চতুর্থ—খাবি ত। আবার বাঘ মশাই তোকে না খায়।

সকলেই এগিয়ে খাঁচার কাছে এল। সামনের লোকটা চেঁচিয়ে উঠল—ওরে শুয়োর নয়, ও একটা মানুষ বটে রে।

তৃতীয়—এ আবার কি রে!

আর একজন ফাঁদের ফাঁকে মুখ রেখে বললে, মরা নয় কিন্তুক। ওর পেটটি নড়ছে যে রে। জিয়ন্ত মানুষ বটে। তখন সকলে মিলে বাঁধন কেটে উল্‌খান্‌কে কাঁধে করে নিয়ে চলল নিজেদের গাঁয়ে।

৬

দিন পনের পরে ওদের যত্নে বেঁচে উঠল—উল্‌খান্। এখন সে একটু একটু করে জোর পাচ্ছে—সকালবেলা কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে বুড়ো মহুয়াতলায় এসে উবু হয়ে রোদ্দুরে বসতে পারে। সারাদিন গাছের ছায়ায় বসে থাকে আর ভাবে, কবে যে পুরো জোর পাবে। সেদিন আর দেরি করবে না। একটা টাঙ্গি নিয়ে বেরবে সে বান্নু র সঙ্গে ভেট করতে। চমকে উঠবে বান্নু টা—ভাববে ভূতটি বটে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

এমনি করে আরো পনের কুড়ি দিন কেটে গেল। এক দিন রীতিমত তীর ধনুক, টাঙ্গি, বর্শা, ঢাল নিয়ে সেজেগুজে

বেরিয়ে পড়ল উল্‌খান্‌, নিজেদের গাঁয়ের পানে। দেহে স্ফূর্তি আর যেন ধরে না। পথে চলেছে সে—যেন হাওয়ায় উড়ছে।

খুন করার উপায়গুলো কিন্তু কিছুতেই তার মনে ধরছে না—তীর? টাঙ্গি? বর্শা? নাঃ, যথেষ্ট নিষ্ঠুর বলে ঠেক্‌ছে না আর কাছে। ওর কোনটাতেই বেশীক্ষণ বাঁচিয়ে রেখে রেখে শেষ করা যায় না। ভাবছে আর চলেছে—চলেছে হন্‌ হন্‌ করে আর ভাবছে। ভাবনার বেগে চলার বেগ বাড়ছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল উল্‌খান্‌। একটা ভারি জবর ফন্দী মাথায় এসেছে। ভাবতে ভাবতে ভারি মজা লাগছে ওর। ওঃ—হোঃ-হোঃ-হোঃ-হো। এমন রগড় তাদের গাঁয়ে কেউ কখনো আর দেখে নি। বান্নু কে সে ধরে নিয়ে যাবে বিজনীর জঙ্গলে, নিজের দলের লোক দিয়ে, চুরি করিয়ে। সেখানে একটা বড় মহুয়াগাছের ডালে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝোলাবে তাকে। তারপর নীচে জ্বেলে দেবে একটা আগুনের কুণ্ড। একটু একটু করে, ঝলসে ঝলসে, জ্যান্ত পুড়ে মরবে—আর ওর গা থেকে চর্বি গলে গলে আগুনে পড়বে—ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ, আর জ্বলে জ্বলে উঠবে। কানে শুনতে পাচ্ছে যেন সেই শব্দ, ছ্যাঁৎ, ছ্যাঁৎ। ওঃ কি রগড়ই হবে!

ভাবতে ভাবতে গাঁয়ের কিনারায় এসে পড়েছে ও। মাদল বাজছে গাঁয়ের উত্তর দিকে—যে দিকে মাটি দেয়—ডুডু ডুম্‌-ডুম্‌ ডুডুম্‌, ডুডু ডুম্‌-ডুডুম্‌ ডুডুম্‌। কে আবার মরল। উমরু নিশ্চয়। বড্ড বুড়ো হয়েছিল। পড়ে পড়ে গাল পাড়ত বৌটাকে। আর বৌটা ভাত নিয়ে এসে বলত—নে নে ভাত নে, খেয়ে মর।

৭

তাড়াতাড়ি ছুটে চলল সে উত্তর দিকে। কিন্তু বেশী দূর আর যেতে হ'ল না। পথেই খবরটা পাওয়া গেল। মরেছে উমরু নয়—বান্নু। তার চিরদিনের সঙ্গী, তার চির প্রতিদ্বন্দ্বী, তার চিরদিনের শত্রু বান্নু মরে গেছে! ভালুক শিকার করতে গেলে ভালুকে ছিঁড়ে মেরেছে তাকে। সেই গণ্ডারের মত মজবুত, চিতা বাঘের মত চটপটে, সিংহের মত নির্ভীক আর হায়নার মত ধূর্ত বান্নু—সাত গাঁয়ে যার তুলনা নেই সেই দুর্দ্ধর্ষ বান্নু মারা গেছে! আর তাকে পাবে না, তার সঙ্গে কাজিয়া আর হবে না। নেই, নেই—বান্নু নেই। বুকে যেন কে হাতুড়ির ঘা মারছে—হা হা করে উঠছে তার বুকের মধ্যে—হঠাৎ যেন খালি হয়ে গেছে বুকটা। সমস্ত সংসারটা এক নিমেষে উল্‌খানের কাছে ফাঁকা অর্থহীন হয়ে গেছে। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আশ্রয়, উদ্দেশ্য চিরশত্রু বান্নু আর নাই।

নিজের বাড়ীতে আর ঢুকতে পারলে না সে। যে গাঁ থেকে এসেছিল সেই গাঁয়েই ফিরে গেল তাদের ঘরে। সর্দারীর আকাঙ্ক্ষা, ঝুমরির আকর্ষণ কোন কিছুই আর তার মনে আজ ঠাঁই পেল না।

৮

পরদিন সকালে ওরা সকল উল্‌খানের কাছে এসে দেখে সে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে আছে। বললে, চলো, বাইরে গিয়ে বসবে চলো! কি হয়েছে গো তোমার?

উঠতে চেষ্টা করল উল্‌খান্‌; উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। হাঁটুতে আর বল নেই তার।

একজন বললে, কি হ'ল তোমার? ওঠ!

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উল্‌খান্‌ বললে—কোন্‌ কবরের তল থেকে কথা বলছে যেন—বললে, আমি আর উঠতে পারছি না গোঃ।

সবাই বললে, সে কি! এই ত কালই তুমি একটা বুনো বরার মত ছুটে চলেছিলে; আজ কি হ'ল তোমার!

কি হয়েছে?—তা, সে কেমন করে বোঝাবে কি হয়েছে। তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, তার জীবনের চিরশত্রু বান্নুর অভাবে জগৎটা তার কাছে শূন্য—শূন্য হয়ে গেছে অকস্মাৎ—বুকটা খালি হয়ে গেছে তার। বেঁচে থাকার ভিত তার সরে গেছে পায়ের তলা থেকে—শূন্যে হাতড়ে জীবনের কোন অবলম্বন আজ আর সে পাচ্ছে না। শত্রু তার মারা গেছে, তারপর—তারপর কি নিয়ে আর সে বেঁচে থাকতে পারে? এর পর আর বেঁচে থাকার মানে কি?

একদিন সকালে সকলে এসে অবাক হয়ে দেখে যে সেই বুড়ো মহুয়া গাছতলাটায় এসে সে মরে পড়ে আছে। গায়ে তার পুরো জঙ্গী সাজ। তার তীর, ধনুক, টাঙ্গি, বর্শা, ঢাল নিয়ে একেবারে যুদ্ধের সাজে তৈরি হয়ে বেরিয়েছে সে।

বোধ করি, মরণ নিশ্চয় ঘনিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি সে সেজে বেরিয়ে এসেছে বড় আশায়—তার চিরশত্রু বান্নুর সঙ্গে ভেট করতে।*

---

* একটি ইংরেজী গল্প হইতে 'আইডিয়া' পাইয়া মূলক প্লটে লিখিত।

অল্‌ ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে

স্বাধীন ভারত

রেজাউল করীম

স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতের গৌরবময় প্রথম দিবসকে অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছি। আজিকার এই পুণ্যক্ষণের সার্থক সাফল্যের জন্য অতীতে কত জনে কত তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অপরিসীম ত্যাগের আদর্শ দেখিয়া ভারতের জাতীয় কবি পুলকিত চিত্তে গাহিয়াছেন: "বীরের এ রক্ত-স্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা, একি ধরার ধুলায় হবে হারা?" না, এই অজস্র রক্তস্রোত ও অশ্রুধারা ধরার ধুলায় বিলীন হয় নাই। তাঁহাদের প্রতি রক্তকণিকায় ছিল বিপ্লবের রক্তবীজ, অশ্রুতে ছিল অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি। তাই জাতির ত্যাগ ও তপস্যার ফলস্বরূপই আজ আমরা স্বাধীনতার রসাস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জাতির জীবনে সে দিন ছিল ত্যাগের দিন, সাধনার দিন। কবে, কতদিনে অমানিশার ঘনান্ধকার বিদূরিত হইবে তাহা জাতি জানিত না। তবুও আশাবাদী কবি আশ্বাস দিয়াছিলেন "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।" আজ সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর সত্যই সে দিন আসিল। আজিকার এই শুভ দিনের পুণ্য প্রভাতে অমরলোকবাসী কবিকে কহিব, "হে বিশ্ববরেণ্য কবি! আজ তোমার বাণী সফল হইয়াছে। আজ সত্যই সেদিন আসিয়াছে। দেশজননীর শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছে। হে সাধক কবি, তুমি আজ স্বর্গলোক হইতে আমাদের এই পুণ্যদিনকে সম্বর্দ্ধনা কর, সমগ্র জাতিকে আশীর্ব্বাদ কর।" যে সব ত্যাগবীর কর্ম্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত সাধনা করিয়া জীবনপাত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিব, আজিকার প্রাপ্তি তোমাদেরই দান। তোমরা করিয়াছ আত্মবলিদান, আর এ যুগের ভারতবর্ষ তাহারই ফলভোগ করিতেছে। তোমাদের আত্মত্যাগের অমর অবদান ভারতবাসী কখনও ভুলিবে না। তাই আজ বারবার তোমাদের কথাই স্মরণ করিতেছি।

আজ অমারজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রত্যুষে যে নবারুণ আত্মপ্রকাশ করিবে, সে দেখিবে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতের নূতন মূর্ত্তি! স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল ভারতের শুভ জন্মদিন। আর ভারতবাসী প্রাতে জাগ্রত হইয়া যে ভারতবর্ষ অবলোকন করিবে, তাহাও নূতন ভারতবর্ষ! আজ এই স্বাধীন ভারতবর্ষকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি!

আজিকার এই স্বাধীন ভারতবর্ষকে সার্থক, সুন্দর ও সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইবে আমাদের সমবেত সাধনার দ্বারা। স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য জাতি যে ত্যাগ করিয়াছে, আজ স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী, সুদৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ ও সুগঠিত করিবার জন্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। কর্ম্মী ও সাধকগণের ত্যাগের তপঃপ্রভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, অধিকতর ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা এই আয়াসলব্ধ স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। পরিপূর্ণ ও অবিমিশ্র গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপরই আমাদের স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ব্রিটিশ যুগের সাম্প্রদায়িকতার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপূর্ণ স্ফুরণের ক্ষেত্র প্রশস্ত করা হইয়াছে। মানুষের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, ব্যক্তিগত মত সব কিছুকেই অবাধে বিকশিত হইবার সকল সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। এই নবগঠিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ও কাঠামোর মধ্যে তেমন কোন ত্রুটি নাই। ইহা রাজনৈতিক আদর্শবাদের দিক হইতে আদর্শ রাষ্ট্র না হইতে পারে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল যে "Idealy best state"-এর কথা বলিয়াছেন, তাহা ত পৃথিবীতে কোথাও নাই। যে সব রাষ্ট্র হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি কখনই Ideally best state হইতে পারে না। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষকে যে অহিংসার মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই যদি আমাদের মূল লক্ষ্য হয় তবে আজ না হউক, এক দিন ভারতবর্ষই Ideally best state গঠন করিতে পারিবে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল লক্ষ্য গান্ধী-বাদের নীতিকেই পূর্ণ রূপ দেওয়া। সেইরূপ আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করা এক দিনেই সম্ভব নহে। প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত অনেক মহাপুরুষই আদর্শ রাষ্ট্রের কাল্পনিক ছবি আঁকিয়াছেন। কিন্তু অহিংসার ভিত্তিতে গান্ধীজী যে আদর্শ রাজ্যের, যে "রামরাজ্যে"র ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাতে কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবতা ও কার্য্যকারিতার প্রভাবই বেশী। সুতরাং আশা করা যায় যে ভারতবর্ষ যদি গান্ধীজীর নীতি পরিত্যাগ না করে, তবে আদর্শ রাষ্ট্র ভারতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তাহার জন্য সময় চাই, সাধনা চাই, ত্যাগপূত মানুষ চাই। আজিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা চিন্তা করা যাক। প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেকার রাজা জনের নিকট হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি মৌলিক অধিকারই ত উহার ভিত্তি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে, কখনও মন্থরগতিতে, কখনও দ্রুতগতিতে, কখনও বিপ্লবের পথে, কখনও বিবর্ত্তনের পথে—এই ভাবে অগ্রসর হইতে হইতে আজ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চরম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্র জাতির

পরিপক্ব মস্তিষ্কের সুচিন্তিত সাধনার ফলেই পূর্ণকলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মৌলিক নীতি অত্যন্ত উদার, ইহার আদর্শ অত্যন্ত ব্যাপক। বর্তমান জগতের কতিপয় শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের সারাংশকেও ইহার মধ্যে গ্রথিত করা হইয়াছে, পূর্ণবিকাশের সমস্ত সুযোগ ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। আজ প্রথম অবস্থায় ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহার পর ইহাকেই অবলম্বন করিয়া কাজ আরম্ভ করিলে বিকাশের পথে যদি কোন ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়, তবে তাহার সংশোধন করিবারও সুযোগ রহিয়াছে। গণতন্ত্রের যেমন সুবিধা আছে, তেমনই বহু বিপদ এবং অসুবিধার মধ্যেও ইহাকে চলিতে হয়। প্রথম অবস্থায় গণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তাহার বিকাশের চেষ্টা করা সমীচীন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এই ভাবেই বিকশিত ও সম্প্রসারিত হইয়াছিল; কিন্তু গণতন্ত্রের প্রথম অবস্থা হইতেই যদি তাহাকে বাধা দেওয়া হয়, ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়, মেকী বিপ্লবের খেয়ালী নেশায় বিভোর হইয়া 'ভাঙিবার জন্ত ভাঙিবার নীতি'কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে কোন দেশেই স্থায়ী রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের পুনঃপুনঃ ভাঙাগড়ার ধাক্কাতে দেশ সর্বনাশের সমুখীন হইবে। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ অরাজক হইয়া পড়ে, তখনই সুযোগ বুঝিয়া ডিক্টেটর বা সর্বাধিনায়কগণ সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে চেষ্টিত হন।

গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে রাষ্ট্রস্থিত প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া দরকার। প্রাচীন এথেন্সের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিতে গিয়া জে, পি, মাহাফি তাঁহার *"Problems in Greek History"* নামক গ্রন্থে বলিতেছেন :

"Even far more deeply did the lessons of Athenian political life act upon the practical character of the citizens, and train him to be a rational being submitting to the will of the majority, to which he himself contributed in debate, taking his turn at commanding as well as obeying, regarding the labours of office as his just contribution to the public weal, regarding even the sacrifices he made as a privilege, — the outward manifestation of his loyalty to the State which had made him in the truest sense an aristocrat among men. Even when he commanded fleets, or armies, he did so as the servant of the State, any attempt to redress private differences by personal assertion of his right, other than law provided, was regarded as essentially a violation of his civility and a return to barbarism."

মর্মার্থ—এথেন্সের রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষার প্রভাব তাহার প্রত্যেক নাগরিকের চরিত্রের উপর গভীরভাবে পতিত হইয়াছিল। সে সর্বদা যুক্তির পথ ধরিয়া চলিত। রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিধানকে স্বীকার করিয়া লইত। রাষ্ট্রের কাজে সে যোগদান করিত, তর্কবিতর্কেও যোগ দিত। প্রয়োজনবোধে সে কখনও ক্ষমতার অধিকারী হইয়া আদেশ দিত, আবার সেই একই লোক অন্য অবস্থায় স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের আদেশ পালন করিত। রাষ্ট্রের সেবা করাকে সে সর্বসাধারণের কল্যাণের কাজে নিজের ব্যক্তিগত দান বলিয়া মনে করিত; ত্যাগে সে গৌরব অনুভব করিত। সে মনে করিত আত্মত্যাগ দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতি স্বীয় বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে। আর এই ভাবে রাষ্ট্রের সেবা করিয়া সে একটা আভিজাত্যের গরিমা লাভ করিত। যখন সে পোতাধ্যক্ষ অথবা সেনাধ্যক্ষের অধিকার লইয়া কাজ করিত, তখন সে নিজেকে রাষ্ট্রের দাস ও সেবক বলিয়া মনে করিত। আইনানুমোদিত উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই ব্যক্তিগতভাবে সে কোন অসুবিধাই দূর করিত না। এরূপ করাকে সভ্যজনোচিত কাজ বলিয়া মনে করিত না। তাহার নিকট এরূপ কাজ বর্বরতার নামান্তর।"

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশের অধিবাসীদের এইরূপ মনোবৃত্তি হওয়া উচিত। এই পথেই গণতন্ত্র সফলতা লাভ করে। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ যদি কথায় কথায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের নামে রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা ভাঙিতে উদ্যত হয়, রাষ্ট্রের সেবা অপেক্ষা রাষ্ট্রের নিকট হইতে পুরাপুরি নিজেদের স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করে, রাষ্ট্রের সেবাকে ও রাষ্ট্রের জন্ত ত্যাগ করাকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া না মনে করে, তবে সে রাষ্ট্র স্থায়ী হইতে পারে না, সে রাষ্ট্রে অহরহ বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ইহাতে অরাজকতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। আইন-অমান্য, বিশৃঙ্খলা, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ, নিজের হাতে আইন গ্রহণ ও স্বেচ্ছাচারমূলক ভাবে আইনের অপপ্রয়োগ—এই সব গণতন্ত্রবিরোধী অপকর্ম প্রশ্রয় পাইতে থাকিলে, তাহা সর্বদাই সীমা লঙ্ঘন করে, তাহার গতি নিশ্চল হইয়া থাকে না, আর কোথায় গিয়া তাহার পরিণতি হইবে তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, এইভাবে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। অরাজকতা শান্তির চরম শত্রু। অরাজকতা হইতে অশান্তি, আর অশান্তি হইতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই বিশৃঙ্খলার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে অস্থির হইয়া উঠে। তখন একটি মাত্র বুলিই সকলের মুখে শুনা যায়, Peace at any cost—যে-কোন প্রকারেই শান্তি চাই। ডিক্টেটর শ্রেণীর লোকেরা এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। যখন "যে-কোন প্রকারে শান্তি চাই।"—এই বুলি দেশময় ব্যাপক হইয়া উঠে, তখনই গণতন্ত্রকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হয়। গণতন্ত্র নিধন করিয়া এইভাবে বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণতন্ত্রকে একনায়কত্বের খপ্পর হইতে

রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে গণতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে গণতান্ত্রিক উপায় ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই দূর করিতে চেষ্টা না করা। একবার গণতান্ত্রিক পন্থা পরিত্যাগ করিলে আর সহজে তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সেইজন্য শত ত্রুটি-সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক পন্থা কোন প্রকারেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে কেবল তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুল-ভ্রান্তির দিকে ইঙ্গিত করিলে চলিবে না। প্রত্যেক নাগরিককে গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে।

আজ দেশে গণতন্ত্রবিরোধী তথা রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব এক শ্রেণীর লোককে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের বিকৃত আদর্শের জন্য রাষ্ট্রের তথা গণতন্ত্রের চরম ক্ষতিসাধন করিতেছে। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের সকলের প্রিয়বস্তু। ইহার রক্ষা ও সংগঠনের দায়িত্বও আমাদের সকলের। স্বাধীনতা আজ আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত, ইহাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লওয়াই ত সমুচিত কাজ। গান্ধীজী আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই আমাদের চরম লক্ষ্য নহে। সত্যকার "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠাই জাতির চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য এই স্বাধীনতা প্রথম পাদপীঠমাত্র। সেই গৌরবময় "রামরাজ্যের" জন্য সাধনা করিতে হইবে গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত পন্থায়। আমাদের রাষ্ট্রের মূলনীতি অহিংসা, প্রেম, সেবা ও আত্মবলিদান। এই নীতির বলে বলীয়ান হইয়া ভারতবর্ষ জগতের সম্মুখে এমন এক সার্ব্বজনীন আদর্শ স্থাপন করিবে, যাহা বিবদমান জাতিসমূহকে সত্যকার প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিবে। এই পথেই ভারতবর্ষ বিশ্বশান্তি স্থাপনে সহায়তা করিবে, বিশ্বসমস্যার সমাধান করিবে। আজ ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের উদ্বোধনের দিনে এই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেছি। ইহার স্থায়িত্ব কামনা করিতেছি। আজ বিভেদকে প্রশ্রয় দিব না, ঐক্য ও প্রীতির দ্বারা দেশের সকলের সহিত এক হইয়া যাইব। আজিকার পুণ্যদিনে এই শপথ গ্রহণ করিব যে, আমাদের বাক্য দ্বারা, আচরণ দ্বারা, মনোভাব দ্বারা, চিন্তার দ্বারা অহরহ রাষ্ট্রের সেবা করিতে থাকিব; রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য এই জীবন উৎসর্গ করিব, গণতন্ত্রকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকিব। দেশবাসীর সকলের কল্যাণের কাজে রত থাকিব। ন্যায়, সত্য, প্রেম ও মনুষ্যত্বের জয়স্তম্ভ রচনা করিয়া তাহাই রাষ্ট্রকে উপহার দিব।

স্বাধীন ভারতের জয় হউক।

মাঘী পূর্ণিমা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এল কি জ্যোৎস্না, এল—পূর্ণিমা-প্লাবন এল?
বহু দিবসের বুদ্ধির বাঁধ ভাসিয়া গেল।
সন্দেহভরা কোথা গেল সব সতর্কতা,
বিচার-আচার, বিবেচনা আর যুক্তি, প্রথা।
সব ভেসে যায়, কিছুই থাকে না চন্দ্রালোকে,
তুমি আছ চাঁদ, আমি আছি, নাই কেউ ত্রিলোকে।

নিঃশব্দের সঙ্গীত চলে ঊর্দ্ধাকাশে,
জীবনে বন্ধু, মাঘী পূর্ণিমা কবার আসে?
দিনের দুঃখ, দ্বিধা ও বেদনা বিদায় হোলো
ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবো না, হৃদয় খোলো,
রেখো না রেখো না অন্তরে কথা সঙ্গোপনে,
স্মৃতি-বিস্মৃতি কোন আবরণ রেখো না মনে।

পদে পদে শুধু সংশয় আর শঙ্কা-ভয়,
কি হ'ত জীবনে যদি না আসিত এ বিস্ময়!
চলে কি চলে না—সময়ের গতি পাই না টের,
ভুলে যাই সব, ভুলে গেছি কথা প্রত্যহের।
ঘুমে অচেতন সকল প্রহরী, দুয়ার খোলা,
চাঁদের আলোয় তাইতো হৃদয়ে লেগেছে দোলা।

মরীচিকা পিছে ছুটিতে ছুটিতে দিবস গেল,
তুমি এলে চাঁদ, তাইতো জীবনে জ্যোৎস্না এল।
দিনের আলোয় হারিয়েছে যাহা, যা কিছু নাই,
রাতের জগতে, চাঁদের জগতে ফিরিয়া পাই।
ভুবন ভরিয়া রহস্যময় কি হাসি ফোটে,
হৃদয়-সাগর তাইতো এমন উথলি ওঠে।

আমি যে পেয়েছি মুগ্ধ চাঁদের মধুর স্নেহ,
জ্যোৎস্নায় স্নান ক'রে পবিত্র হ'ল এ দেহ,
অপরূপ রূপে উদ্ভাসিত যে দিগ্বিদিক,
অমর জীবন, কিছু নয় আজ অলৌকিক।
সুন্দর হ'ল, অম্লান হ'ল তনু ও মন,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মিলন চলেছে অনুক্ষণ।

প্রভাত আসিলে পূর্ণিমা-রাতি চলিয়া যাবে,
তখন খুঁজিলে চাঁদকে তোমার কোথায় পাবে?
যতটুকু পার সুধাসঞ্চয় করিয়া লও,
চন্দ্রকিরণে জীবনপাত্র ভরিয়া লও।
আজি পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, নয়ন মেল,
জ্যোৎস্না-প্লাবনে বিশ্বভুবন ভাসিয়া গেল।

পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে হরিদ্বারে আবার পূর্ণকুম্ভ মেলা হইতেছে। এই উপলক্ষে ভারতের সকল প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও সাধু-সন্ন্যাসী উক্ত পুণ্যতীর্থে সমবেত। ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত তিন মাস এই মেলা থাকিবে। পঞ্জাবী বাস্তুহারাদের আগমনে হরিদ্বারের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইয়াছে। কুম্ভরাশিতে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে প্রায় বার-চৌদ্দ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তথায় সমাগত। এই তিন চারি মাসের জন্য হরিদ্বার বিপুল জনাকীর্ণ স্থানে পরিণত। জনৈক পাশ্চাত্য পর্য্যটক গতবারে হরিদ্বারের কুম্ভমেলা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্ম্মমেলা।'

উদ্যান-বেষ্টিত মন্দির। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল

শাস্ত্রে আছে—'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা।' অর্থাৎ—অযোধ্যা মথুরা, মায়াপুরী, কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী ও দ্বারকা এই সাতটি মোক্ষতীর্থ। মুক্তিতীর্থ মায়াপুরীর অন্য নাম হরিদ্বার। হরিদ্বারকে হরদ্বার বা গঙ্গাদ্বারও বলা হয়। হিমালয়স্থ কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ তীর্থের পথে ইহা দ্বারস্বরূপ। কেদারনাথ শিবতীর্থ এবং বদ্রীনারায়ণ বিষ্ণুতীর্থ। সেইজন্য শাস্ত্রোক্ত মুক্তিতীর্থ মায়াপুরীকে শৈবগণ হরদ্বার ও বৈষ্ণবগণ হরিদ্বার বলিয়া থাকেন। হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে মায়াদেবীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে ত্রিমস্তকবিশিষ্টা চতুর্ভুজা মায়াদেবী এবং তাঁহার সম্মুখে অষ্টবাহু সর্ব্বনাথ শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মায়াপুরীর নামকরণ সম্বন্ধে পুরাণে এই বিবরণ পাওয়া যায় :—একদা প্রজাপতি দক্ষ একটি বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। স্বীয় জামাতা মহাদেবের সহিত মনোমালিন্য হেতু দক্ষরাজ তাঁহাকে যজ্ঞোৎসবে নিমন্ত্রণ করেন নাই। অন্যান্য দেবগণ ও মুনিঋষিদের দক্ষযজ্ঞে যাইতে দেখিয়া সতীদেবী শিবানুচরগণ সহ তথায় বিনা নিমন্ত্রণেই উপস্থিত হইলেন। দক্ষকন্যা যজ্ঞস্থলে অন্যান্য দেবগণের এবং পিতার অন্যান্য জামাতৃগণের যজ্ঞভাগ নির্দ্দিষ্ট দেখিলেন। কিন্তু স্বীয় পতির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা না দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া পিতা দক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ পিতৃদেব! এই যজ্ঞোৎসবে সকল দেবতা আপনার আমন্ত্রণে উপস্থিত এবং তাঁহাদের প্রাপ্য যজ্ঞাংশ নির্দ্ধারিত। কিন্তু আমার পতির জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই কেন?" কন্যার প্রশ্নে দক্ষরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া দিগম্বর জামাতার নিন্দা করিলেন। পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণে পতিপ্রাণা সতী যজ্ঞস্থলে অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সতীর দেহত্যাগে ক্রুদ্ধ হইয়া বীরভদ্রাদি শিবানুচরগণ যজ্ঞ ধ্বংসের আয়োজনে মাতিয়া উঠিলেন এবং দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে সমবেত দেবগণ একাগ্রচিত্তে আশুতোষ মহাদেবকে স্মরণ করিলেন। কৈলাসপতি দেবগণের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞস্থলে আগমনপূর্ব্বক দক্ষের ধড়ের উপর ছাগমুণ্ড স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। জামাতার কৃপায় পুনরায় বাঁচিয়া উঠিয়া দক্ষ স্তবাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন, "এই যজ্ঞভূমি পুণ্যক্ষেত্র। এই মহাক্ষেত্রের নাম আজ হইতে মায়াপুর হইবে। ইহা তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এই তীর্থের স্মরণমাত্র সর্ব্বপাপ মোচন হইবে। যাঁহারা এই তীর্থে বাস করিবেন তাঁহারা ধন্য। দক্ষেশ্বর শিবরূপে আমি এই তীর্থে বিরাজ করিব। দক্ষেশ্বরকে দর্শনমাত্র অষ্ট সিদ্ধি লাভ হইবে।" দক্ষের যজ্ঞস্থল হইতে বার যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি মায়াপুরীর অন্তর্গত। কনখল, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থান মায়াপুরীর অন্তর্ভুক্ত।

কনখলে দক্ষেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। কনখল আদি-গঙ্গার তীরবর্ত্তী। এখানে গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত। দক্ষেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে সতীকুণ্ড, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বাজার এবং দক্ষিণ দিকে মায়াপুর নামক স্থানে আর্য্য-সমাজের গুরুকুল

প্রভৃতি আশ্রম অবস্থিত। এই স্থানের নাম কনখল কেন হইল সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি আছে। একদা দক্ষালয়ে কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন ধর্ম্মালোচনায় রত ছিলেন তখন ধর্ম্মকেতু নামক এক নাস্তিক খল ব্রাহ্মণ এই সকল ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণে তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল। অনুতপ্তচিত্তে সে ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় মুক্তির উপায় জানিতে চাহিল। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে দক্ষেশ্বর শিবমন্ত্র জপ করিতে এবং গঙ্গাস্নান করিতে উপদেশ দিলেন। এই নির্দ্দেশ পালন করিয়া খল ব্রাহ্মণ পরিত্রাণলাভ করিল। 'কো ন খলঃ তরতি' অর্থাৎ এমন খল কে আছে যে এই তীর্থে পরিত্রাণ লাভ না করিবে? স্থানমাহাত্ম্যে এখানে কেহ খল নাই উক্ত অর্থে মুনিগণ এই স্থানের নাম রাখিলেন কনখল।

হরিদ্বার হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহা যুক্তপ্রদেশের সাহারাণপুর জেলায় একটি অতি প্রাচীন স্থান। কলিকাতা হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ৯২২ মাইল। দিল্লী হইতে এখানে আসিবার সুন্দর রেলপথ আছে। হরিদ্বার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটি ষ্টেশন—শিবালিক নামক উন্নত শৈল-শ্রেণীর পাদমূলে এবং গঙ্গার দক্ষিণ-উপকূলে অবস্থিত। এখানে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস, থানা, হাসপাতাল, প্রায় ত্রিশটি ধর্ম্মশালা, বাজার, হাই স্কুল, সংস্কৃত পাঠশালা আছে এবং একটি কলেজও সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, কপিল মুনি এখানে আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক সাংখ্যদর্শন রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য হরিদ্বারের আর একটি নাম কপিল-স্থান। হরিদ্বার উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত। রায় বাহাদুর পতিরাম তাঁহার *History of Garhwal* নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ছয়টি প্রধান হিন্দুদর্শনের প্রায় পাঁচটি উত্তরাখণ্ডে প্রণীত। সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ সগরের ষাট হাজার পুত্রের উদ্ধারার্থ পতিতপাবনী গঙ্গাকে মর্ত্ত্যলোকে এই তীর্থে আনয়ন করেন। এইজন্য হরিদ্বারের একটি নাম গঙ্গাদ্বার। গঙ্গোত্রী হইতে উদ্ভূত গঙ্গা হিমালয়ের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া এখানে সমতলভূমিতে অবতীর্ণা। হরিদ্বারের প্রধান তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড। কুম্ভযোগের সময় এখানে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী স্নান করিয়া পবিত্র হন। ব্রহ্মকুণ্ডে যে সুবিস্তৃত স্নানঘাট ও সুন্দর প্লাটফর্ম্ম আছে তাহা ১৮৯৩ সনে পঁচাশি হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত। প্লাটফর্ম্মে দানবীর বিড়লা একটি সু-উচ্চ ক্লক-টাওয়ার তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। ভগীরথের গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন কালে ইলাবৃত্ত-খণ্ডের রাজা শ্বেত এই স্থানে বহু বৎসর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা যখন বর দিতে চাহিলেন তখন রাজা শ্বেত করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, 'এখানে আমার আশ্রমে যতটুকু স্থান আছে ততটুকু আপনার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করুক এবং এখানে আপনি স্বয়ং গঙ্গা বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকুন—ইহাই আমার প্রার্থনীয়।' ব্রহ্মা রাজার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'তথাস্তু'। এখন হইতে পৃথিবীতে এই স্থান ব্রহ্মকুণ্ড নামে পরিচিত হইল। যে কেহ এখানে স্নান-দানাদি করিবে তাহার অক্ষয় পুণ্যলাভ হইবে। কাহারও কাহারও মতে এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মার যজ্ঞে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবিষ্টা হন। ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডলু হইতে যেস্থানে গঙ্গাধারাকে মুক্তি দেন তাহাই ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত।

ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্বে প্রস্তরচিহ্নিত স্থানকে 'হর কী পৈড়ী' বলে। শৈবগণ ইহাকে হরপাদপদ্ম এবং বৈষ্ণবগণ হরি-পাদপদ্ম জ্ঞান করেন। তীর্থযাত্রীগণ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানান্তে এই পাদপদ্ম দর্শন করেন। গঙ্গার পুণ্যধারাকে এমনই ভাবে এই ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করানো হইয়াছে। ঘাটটি গঙ্গা-বক্ষে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মত। দুইটি পুল দিয়া তীর হইতে ঘাটে যাইতে হয়। সন্ধ্যায় শত শত যাত্রী তথায় বসিয়া গঙ্গাপূজা করেন। ব্রহ্মকুণ্ডের সান্ধ্য দৃশ্য অতি মনোরম। যাত্রীগণ প্রজ্বলিত দীপমালাকে শালপাতার ঠোঙায় বসাইয়া ফুলের মালায় সাজাইয়া গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দেন। ভাসমান শত শত প্রদীপ তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে স্রোতের টানে যখন চলিতে থাকে তখনকার দৃশ্যটি অপূর্ব। ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে গঙ্গাতীরে মন্দিরে মন্দিরে যখন সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তখন ঘাটে দাঁড়াইয়া শত শত যাত্রী গঙ্গাদেবীর আরাত্রিক করেন।

এই বৎসর অমৃত কুম্ভযোগের সময় হরিদ্বারে তিনটি প্রধান তীর্থস্নান হইবে—৩রা ফাল্গুন শিবরাত্রি, ৪ঠা চৈত্র অমাবস্যা এবং ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে। কুম্ভযোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুযাগ, ধর্ম্মশাসন প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। মন্দার পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড আর বাসুকি নাগকে মন্থনরজ্জুতে পরিণত করা হয় এবং বিষ্ণু কূর্ম্মরূপ ধারণ করেন। অতঃপর হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত ক্ষীরোদ সাগর মন্থনার্থ দেবাসুরগণ মিলিত হন। সমুদ্র-মন্থনের ফলে গরল উত্থিত হইবামাত্র দেবতা এবং অসুর সকলেই মূর্চ্ছা গেলেন। তখন বিশ্বের কল্যাণার্থ মহাদেব উক্ত কালকূট পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। পুনরায় সমুদ্রমন্থনের ফলে অমৃতপূর্ণ কুম্ভসহ ধন্বন্তরী সমুত্থিত হইয়া কুম্ভটি ইন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত দেবতা-দিগের নির্দ্দেশে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ লইয়া স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশে অসুরগণ বলপূর্ব্বক অমৃতকুম্ভ অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে দেবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেবাসুরের এই তুমুল সংগ্রাম একাদিক্রমে দ্বাদশ দিবস চলিল। এই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইলেন। যুদ্ধকালে তাঁহারা পৃথিবীর যে চারিটি তীর্থে অমৃতকুম্ভ লুকাইয়া রাখেন সেই

সাধারণ হাসপাতাল। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল

রাশিতে এবং সূর্য্যের মেষরাশিতে অবস্থানকালে হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। অন্যান্য শাস্ত্রেও কুম্ভস্নানের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। একস্থানে আছে, 'গঙ্গায়াঃ স্নানমাহাত্ম্যং নালং বক্তুং চতুর্মুখঃ। হরিদ্বারে কুম্ভে স্নানং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জনম্॥' অর্থাৎ হরিদ্বারে কুম্ভযোগে গঙ্গাস্নানের পুণ্যফল বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এই স্নানের ফলে মুক্তিলাভ হয় এবং পুনর্জন্ম হয় না।

কুম্ভমেলা কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধ মতাসম্মেলনের অনুকরণে হিন্দু ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক কুম্ভমেলা প্রবর্ত্তিত হয়। শঙ্করের পূর্ব্বে কুম্ভমেলা হইত কিনা, তাহার ঐতিহাসিক

সেই স্থানে কিছু কিছু অমৃত পড়িয়া যায়। তদবধি কুম্ভযোগ উক্ত চারিটি তীর্থে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ভগবান মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুম্ভস্থ সুধা দেবগণের মধ্যে বিতরণ করেন। অসুরগণ যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও সুধালাভে বঞ্চিত হয়। দেবলোকের দ্বাদশ দিবস মর্ত্ত্যলোকের দ্বাদশ বৎসরের সমান। তাই দ্বাদশ বর্ষ অন্তে এক একবার গঙ্গাতীরে হরিদ্বার, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ, উজ্জয়িনী এবং গোদাবরীতটস্থ নাসিকে কুম্ভস্নান ও তদুপলক্ষে মেলা হয়।

দেবাসুর সংগ্রামের সময় দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সূর্য্য, চন্দ্র ও শনি কুম্ভরক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য উক্ত দেবচতুষ্টয় বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান করিলে বিভিন্ন স্থানে কুম্ভযোগ হয়। স্কন্দপুরাণে আছে, 'কর্কে গুরুস্তথাভানুচন্দ্রক্ষয়স্তথা যদা গোদাবর্য্যাং তদা কুম্ভং জায়তে অবনীমণ্ডলে॥' অর্থাৎ কর্কটরাশিতে বৃহস্পতি, চন্দ্র ও সূর্য্যের একত্র অবস্থানকালে অমাবস্যা-যোগ ঘটিলে গোদাবরীতটে নাসিকে কুম্ভমেলা হয়। উক্ত পুরাণে আছে, 'ঘটে সুরি শশি সূর্য্যঃ দামোদরে স্থিতা যদা। ধারায়াং চ তদা কুম্ভ জায়তে খলু মুক্তিদঃ॥' অর্থাৎ তুলা রাশিতে বৃহস্পতি, সূর্য্য ও চন্দ্র যখন অবস্থান করেন তখন অমাবস্যা তিথি হইলে ধারাতে (উজ্জয়িনীতে) কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। এই পুরাণেই আছে, 'মেষরাশি গতে জীবে মকরে চন্দ্র ভাস্করৌ। অমাবস্যা তদা যোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থনায়কে॥' অর্থাৎ বৃহস্পতি মেষরাশিতে এবং সূর্য্য ও চন্দ্র মকররাশিতে থাকিলে তীর্থরাজ প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়। উক্ত পুরাণে আরও আছে, 'পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশি গতে গুরৌ। গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগ কুম্ভনামা তদোত্তমম্॥' অর্থাৎ বৃহস্পতির কুম্ভ-

প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হইলেও ইহাতে শঙ্করের অনুগামী দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয়, আচার্য্য শঙ্কর এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের চেষ্টায় ইহা হিন্দু ভারতের বৃহত্তম ধর্ম্মমেলায় পরিণত হইয়াছে। দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ব্যতীত বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, কুলাচারী, অবধূত, অালেখিয়া, পঞ্চধূনী, লিঙ্গায়েৎ, অঘোরপন্থী প্রভৃতি বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধুগণ এখানে উপস্থিত হন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক-একটি আড্ডা দেখা যায় এবং তথায় ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর সম্মুখে শাস্ত্রপাঠ, ভজন, আলোচনাদি চলিতে থাকে। তিন মাসব্যাপী কুম্ভ-মেলার সময় হরিদ্বার স্বর্গধামে পরিণত হয়। তখন এই পুণ্যতীর্থে যে দিব্যভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। হিন্দুজাতির প্রাণশক্তির অনন্ত উৎস কোথায় তাহা কুম্ভমেলা দেখিলে বুঝা যায়।

কুম্ভস্নানে সময় সময় বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেজন্য সরকারকে শান্তিরক্ষার্থ পুলিসের ব্যবস্থা করিতে হয়। গতবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময় আসন ও স্নানের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া উৎকলের বিখ্যাত জগন্নাথ বাবাজীর দলের সহিত অন্যান্য কয়েকটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিরোধ উপস্থিত হয়। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিরোধ আগেকার দিনেও কুম্ভমেলায় ঘটিত। এশিয়াটিক রিসার্চ গ্রন্থে (৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা) উল্লিখিত আছে যে, দারিয়াম নামক

পারসীক পুস্তকে দেখা যায়, ১৭১৭ শকে হরিদ্বার কুম্ভে শিখ-সম্প্রদায় দুই দল সাধুকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করেন। এশিয়াটিক রিসার্চেস গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা) আরও উল্লিখিত আছে, ১৭২৯৷৩০ শকে হরিদ্বারে ধর্ম্মোন্মত্ত শৈব সন্ন্যাসীগণ আঠার হাজার বৈরাগীকে হত্যা করেন। ১৭৬০ সনে গোস্বামী ও বৈরাগীদের দাঙ্গায় প্রায় দুই হাজার লোক নিহত হইয়াছিল। ১৭৯৫ সনে শিখ-তীর্থযাত্রীগণ পাঁচ শত গোস্বামীকে হত্যা করেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিনায়কদের সম্মিলিত চেষ্টায় এই প্রকার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এখন বন্ধ হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের কয়েকজন হিন্দু রাজা এবং মণ্ডলেশ্বর মিলিত হইয়া এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের এক একটি এক এক স্থানের কুম্ভমেলায় অগ্রে স্নান করিবেন এবং তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্নান হইবে।

ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে চণ্ডী পাহাড়। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুই হাজার ফুট উচ্চ। উহার একটি চূড়ায় চণ্ডীদেবীর একটি প্রাচীন মন্দির ও অন্য চূড়ায় হনুমানের মাতা অঞ্জনা-দেবীর মন্দির বিদ্যমান। নীলধারা অতিক্রম করিয়া চণ্ডীপাহাড় যাইতে হয়। চণ্ডীপাহাড় হইতে হরিদ্বারের দৃশ্য অতি সুন্দর। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমে মনসা পাহাড়। উহার শিখরে মনসাদেবীর মন্দির অবস্থিত। মনসা পাহাড় হইতে ব্রহ্মকুণ্ডের দৃশ্য অতীব মনোহর। মনসাপাহাড় কাটিয়া দুইটি রেলওয়ে সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত। এখান হইতে চারি শত মাইল খাল খনন করিয়া সরকার যুক্ত-প্রদেশে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্ম-কুণ্ড ও নীলধারার নিকটে উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গাস্রোতকে খালের মধ্যে আনা হইয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে অল্প দূরে কুশাবর্ত্ত তীর্থ অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস—এখানে গঙ্গাস্নান ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিলে মুক্তিলাভ হয়। প্রবাদ আছে যে, দত্তাত্রেয় ঋষি এই তীর্থে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন। তিনি যখন গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন গঙ্গা আসিয়া তাঁহার কোশাকুশি ও কুশাদি ভাসাইয়া লইয়া যান। কিন্তু কুশগুলি আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছিল। ঋষি দত্তাত্রেয় ধ্যান-ভঙ্গের পর স্বীয় কুশাদি গঙ্গাস্রোতে আবর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়া ক্রোধে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার নিকট আসিয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবতা-গণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ঋষি বলিলেন, এই তীর্থ কুশাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হউক। আপনারা সকলে এখানে অবস্থান করুন। যাঁহারা এখানে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিবেন তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হইবে না।

হরিদ্বারের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। ইহা কনখল ক্যানেলের তীরে অবস্থিত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ উক্ত সেবাশ্রম এই পুণ্যতীর্থের শত শত সাধু-সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং সেবাশুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে। সেবাশ্রমে পঞ্চাশটি বেডযুক্ত হাসপাতাল, বৃহৎ ডিস্‌পেন্সারী, অতিথিশালা, যক্ষ্মারোগীর ওয়ার্ড, মন্দির ও লাইব্রেরি প্রভৃতি আছে। এই বৎসর কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে আরও পঞ্চাশটি অস্থায়ী বেড বাড়ানো হইয়াছে। সেবাশ্রমে তাঁবু ফেলিয়া এবং খড়ের 'কুঠিয়া' করিয়া প্রায় এক সহস্র সাধু ও গৃহী তীর্থযাত্রী অস্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিলেন। হরিদ্বারের তিনটি স্থানে তিনটি চিকিৎসাকেন্দ্র খুলিয়া সেবাশ্রমের সেবকগণ শত শত পীড়িত তীর্থযাত্রীকে ঔষধ-পথ্যাদি দিয়াছেন। তাঁহাদের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়টি তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরিয়া রুগ্ন-নারায়ণের সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে। উক্ত সেবাশ্রম স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তৎশিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ কর্ত্তৃক ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামী কল্যাণানন্দ যখন হরিদ্বারে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া সেবা-কার্য্য আরম্ভ করেন তখন স্থানীয় সাধুসমাজ তাঁহাকে আমল দেন নাই। ভাঙ্গী মেথরদের সেবাকার্য্য করিতেন বলিয়া তাঁহাকে অন্নসত্রেও ভিক্ষা দিত না। তিনি এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া গুরুর আশীর্ব্বাদে অবিচলিত চিত্তে গুরুভ্রাতা স্বামী নিশ্চয়ানন্দের সহযোগিতায় প্রায় ছত্রিশ বৎসর কাল একনিষ্ঠভাবে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই সেবাশ্রম আজ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার কোন বদান্য ব্যক্তির অর্থসাহায্যে তিনি ১৯০৩ সনের এপ্রিল মাসে প্রায় পনর বিঘা জমি ক্রয় করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার সেবাকার্য্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পূর্ব্বাশ্রমে স্বামী কল্যাণানন্দের নাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন গুহ। পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্বর্ত্তী বানরীপাড়া গ্রামে দক্ষিণারঞ্জন ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণারঞ্জন যখন হাই স্কুলের ছাত্র তখন হইতে আর্ত্তের সেবায় বিমল আনন্দলাভ করিতেন। তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৯৮ সনে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৮৯৯ সালের প্রথমার্দ্ধে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক স্বামী কল্যাণানন্দ নাম গ্রহণ করেন। স্বামী কল্যাণানন্দজীর গুরু-ভক্তি ছিল অসাধারণ। ১৯০১ সনে তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ যখন বেলুড় মঠে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতে-ছিলেন তখন তিনি কলিকাতা হইতে কিছু বরফ আনিবার জন্য আদিষ্ট হন। তখন কলিকাতা ও বেলুড়ের মধ্যে 'বাস' বা ষ্টীমার চলিত না। গুরুভক্ত কল্যাণানন্দ অবিলম্বে কলিকাতা গিয়া প্রায় আধ মণ বরফ লইয়া মঠে আসেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গুরু শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, 'ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন কল্যাণানন্দ সেবার দ্বারাই পরমহংসত্ব লাভ করিবে।'

স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯১২ সনে কলিকাতা হইতে দুর্গাপ্রতিমা আনাইয়া কনখল সেবাশ্রমে দুর্গাপূজা করেন। তখন হইতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা ও কালী-পূজাদি নিয়মিত ভাবে উক্ত সেবাশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সেবাশ্রমের গ্রন্থাগারে ৩৭৭১ খানি গ্রন্থ আছে। উক্ত সেবাশ্রম এই পুণ্যতীর্থে বাঙালীর এক শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। হরিদ্বারে লালতারাবাগে ভোলাগিরির আশ্রমটিও বাঙালী সন্ন্যাসী-দের বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিও বাঙালী এবং উত্তর-ভারতের সাধু-সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। কনখলের অনতিদূরে গুরুকুলের কলেজ, বৃহৎ লাইব্রেরি, গোশালা এবং বিড়লা-প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয় দর্শনীয়। কনখলে ক্যানেলের অপর পার্শ্বে ঋষিকুল বিদ্যালয়। ইহা সনাতনী হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। ছাত্রগণকে এখানে গুরুর সান্নিধ্যে রাখিয়া প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রাদি ও আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। গুরুকুলের নিকটবর্তী গুরুমণ্ডলে 'হরিবংশ' গ্রন্থের একখানি পুরাতন পাণ্ডুলিপি আছে।
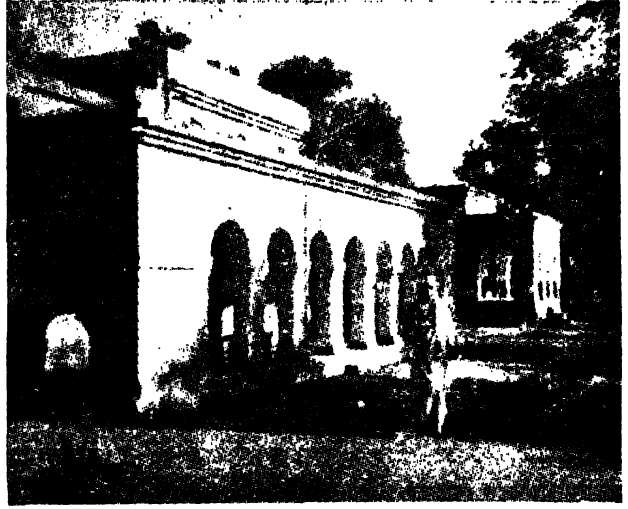
সংক্রামক রোগের হাসপাতাল। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল

হরিদ্বারে বিল্বকেশ্বর, নীলতীর্থ প্রভৃতি আরও বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। চণ্ডী পাহাড়ের প্রাচীন নাম নীলগিরি বা নীল পর্ব্বত। নীল পর্ব্বতে ভগবতী চণ্ডী তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার একাংশকে চণ্ডী পাহাড় বলে। নীল পর্ব্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা গঙ্গাকে নীলধারা বলা হয়। কথিত আছে, কোন ব্রাহ্মণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে নীল নামক গণরাজ হইবার বর দেন এবং স্বয়ং নীলেশ্বর নামে তথায় বিরাজ করেন। চণ্ডী মন্দির হইতে এক ফার্লং উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে নীলেশ্বর মন্দির এবং নীলগিরির সানুদেশে গঙ্গাতীরে নীলকুণ্ড অবস্থিত। শাস্ত্রে বলে, নীলকুণ্ডে স্নান করিলে স্নানার্থী পাপমুক্ত ও শিবময় হইয়া যান। হরিদ্বার হইতে কনখল যাইবার পথে লালতারা নামক যে পুল আছে সেই পুল পার হইয়া রেলপথ অতিক্রম করিলে পাহাড়ের নীচে একটি মনোরম স্থানে বিল্ব-কেশ্বর মন্দির দেখা যায়। উহার অনতিদূরে পাহাড়ের একটি গুহায় একটি দেবীমূর্ত্তি। উভয় মন্দিরের মাঝখান দিয়া প্রবাহিতা পাহাড়ী নদীর নাম শিবধারা। একমাত্র বর্ষাকালেই শিবধারা জলপূর্ণ থাকে। যাত্রীগণ হরিদ্বারে রামতীর্থ, লক্ষ্মণ-তীর্থ প্রভৃতি আরও অনেক তীর্থ দর্শন করেন।

হরিদ্বার সাধুসন্ন্যাসীদের স্থান। শত শত ব্রহ্মচারী সাধু-সন্ন্যাসী এখানে বাস করেন। তাঁহাদের জন্য প্রায় শতাধিক মঠ, আশ্রম, আখড়াদি আছে। হরিদ্বারে নিরঞ্জনী আখড়া, যুনা আখড়া ও আনন্দ আখড়া, ভীমগড়ায় দশনামী আখড়া, কমলদাসের কুঠিয়া ও কৈলাস আশ্রম এবং কনখলে নির্ব্বাণী আখড়া, ঘণ্টা কুঠিয়া, সুরথগিরির বাংলো, অটল আখড়া, হরি ভারতীর মঠ, রামনিবাস, হরিহর আশ্রম, চেতনদেবের কুঠিয়া, মুনিমণ্ডল, বিরক্ত কুঠিয়া প্রভৃতি বহু আশ্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ থাকেন। কুম্ভমেলার সময় নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীগণ বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম প্রচার এবং সেবাকার্য্য করেন। তখন বিরাট প্রদর্শনীও খোলা হয়। কাশী, নাসিক প্রভৃতির ন্যায় হরিদ্বারেও শতাধিক সংস্কৃত পাঠশালা আছে। সেগুলিতে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীকে পণ্ডিত-গণ ন্যায়, বেদান্ত, ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন। হিন্দু-স্থানের তীর্থগুলি হিন্দু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এই তীর্থস্থানগুলির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য আমরা যতই মনো-যোগী হইব ততই হিন্দু সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শ ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হইয়া আমাদের সমাজ-জীবনকে পুষ্ট করিবে।

পল্লী অঞ্চলের জনচিকিৎসা

শ্রীমিহিরকুমার দাস

পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার প্রশ্নটি ভারতের সম্মুখে এক বিরাট সমস্যা। আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে রচিত কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া এক্ষেত্রে এখনও কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। প্রায় পাঁচ বৎসর আগে স্যার জোসেফ ভোরের সভাপতিত্বে গঠিত "হেলথ সার্ভে এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কমিটি" ভারতের চিকিৎসা-সমস্যা সমাধানকল্পে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ একটি দশবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। তখন স্থির হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তর কালে ভারত-সরকার ঐ পরিকল্পনাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিবেন। ভোর কমিটির বিবরণীতে দেশীয় চিকিৎসার প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া সে সময় ইহার বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল। যে বিলাতী চিকিৎসা-পদ্ধতি বিদেশীয় সরকারের সমর্থনে এদেশে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ভোর কমিটির পরিকল্পনায় তাহা আরও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল মাত্র। ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতের নিশ্চিত জন্ম-সম্ভাবনা লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের প্রতিষ্ঠা হইল। সুতরাং নূতন পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমস্যাগুলির আবার নূতন ভাবে বিচার করিবার সময় উপস্থিত হয়। জনসাধারণের ন্যায় আমাদের নেতৃবৃন্দও অনুভব করিতেছিলেন যে, শত শত বৎসরের অবহেলিত দেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে ইহার প্রাপ্য মর্য্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এলোপ্যাথি চিকিৎসার পাশাপাশি এদেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বিকাশলাভের পূর্ণ সুযোগ দিতে হইলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা যোগান বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত। অতএব ভোর কমিটির পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয় এবং এদেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহা বাহির করিবার জন্য ১৯৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের নির্দ্দেশে কর্ণেল চোপরার সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে চোপরা কমিটির বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-ব্যবস্থার সমন্বয়পূর্ব্বক একটি নূতন চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন।

ভারতের জনসাধারণের চিকিৎসা-সমস্যা সমাধানে "ভোর কমিটি"র পরিকল্পনাই গৃহীত হউক, আর চোপরা কমিটির পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হউক—তাহার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ আসিবে কোথা হইতে? অর্থাভাবের জন্য আমাদের জাতীয় সরকার যথাসম্ভব ব্যয়-সঙ্কোচের নীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় কিংবা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলি যে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে এইরূপ ভরসা হয় না। এমতাবস্থায় বহুব্যয়সাধ্য মন্থরগতি সরকারী পরিকল্পনার পরিপূরক হিসাবে স্বল্পব্যয়সাধ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার বিধিব্যবস্থাগুলিকে জনসমাজে, বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে প্রবর্ত্তন করার প্রস্তাব সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

সাধারণ রোগ চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার স্থান

চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়াই লোকসমাজে চিকিৎসক নামক বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে মানুষ এক অর্থে স্বভাব চিকিৎসক অর্থাৎ রোগ জটিল না হইলে, সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষ তাহার দেহস্থ কতকগুলি রোগের প্রকৃতি মোটামুটি বুঝিতে পারে এবং ঔষধের প্রয়োগবিধি জানা থাকিলে ঐরূপ অবস্থায় নিজের চিকিৎসা নিজেই করিতে পারে। মানুষকে চিকিৎসা সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করার জন্যও বটে এবং সব সময় সকলের পক্ষে দর্শনী দিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াও বটে, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী প্রভৃতি সকল চিকিৎসাশাস্ত্রেই গৃহ-চিকিৎসাবিধি গড়িয়া উঠিয়াছে। গৃহ-চিকিৎসাবিধিকে চিকিৎসার সাধারণতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই সাধারণতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে যতটা প্রসারিত ও প্রচারিত হইয়াছে, অন্য কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতে ততটা হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার উপকরণ প্রধানতঃ সহজপ্রাপ্য বনৌষধি বা উদ্ভিজ্জ ভেষজ। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই সেদিন পর্য্যন্ত সহজপ্রাপ্য ভেষজের সাহায্যে আমাদের দেশের গৃহস্থ-পরিবারে সাধারণ রোগের চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছিল। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-পরিবারের গৃহিণীরা অনেক রোগের ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ও পাচনাদির ব্যবহার অবগত ছিলেন এবং ঐ সকল মুষ্টিযোগ ও পাচনাদি অবলম্বনে পরিবারবর্গের অনেক রকম সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসা চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই করিতে পারিতেন। কালধর্ম্মে আমাদের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজকাল পল্লী অঞ্চলের গৃহিণীরাও পারিবারিক চিকিৎসায় ব্যবহার্য্য ভেষজসমূহের গুণাগুণের সহিত তেমন

পরিচিত নহেন। পারিবারিক চিকিৎসায় প্রযোজ্য ভেষজ-সমূহ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এদেশের ঘরে ঘরে সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। যদি সহজ উপায়ে রোগ আরোগ্য হয় তবে ঘটা করিয়া চিকিৎসার আড়ম্বর করিব কেন? দেশীয় টোটকা ও পাচনাদির দ্বারা যে রোগ আরোগ্য হইতে পারে, তাহার জন্য অধিক মূল্যের বিদেশীয় ঔষধ সেবনের সার্থকতা কোথায়?

এদিকে আমাদের দেশে যে সকল সরকারী বা আধা সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেগুলিতে প্রত্যহ রোগীর ভিড় এত বেশী হয় যে, চিকিৎসকের পক্ষে সমাগত রোগীদিগের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। একবার রোগীর চেহারার দিকে তাকাইয়াই চিকিৎসক রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন—এইরূপ ঘটনা প্রায় প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিত্যকার ঘটনা। তারপর আবার রোগী-দিগকে প্রায়ই নিজের পয়সায় ঔষধ কিনিয়া খাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার বিশেষ কিছু পরি-বর্ত্তন হইবে কিনা সন্দেহ। কেননা, আমাদের দেশবাসীর অধিকাংশই দরিদ্র এবং দরিদ্রতানিবন্ধন রোগও বেশী। জন-সমাজে ব্যাপক ভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইলে, সাধারণ রোগের চিকিৎসা গৃহেই হইতে পারিবে। তখন সাধারণ রোগ-চিকিৎসার জন্য কেহ বড় একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারস্থ হইবে না। ফলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকগণও অপেক্ষাকৃত কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীদের প্রতি নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইবেন।

গৃহস্থ-পরিবারের সাধারণ রোগ।

প্রথমেই দেখা যাক, গৃহস্থ-পরিবারের সাধারণ ব্যাধিগুলি কি? জ্বর, সর্দ্দি, কাসি, পেটের অসুখ, পেটফাঁপা, অম্লপিত্ত, কোষ্ঠবদ্ধতা, আমাশয়, রক্তামাশয়, খোসপাঁচড়া, ফোঁড়া, চুলকানি, ঘামাচি, দাদ, ক্রিমি, পেটব্যথা, মাথাঘোরা, মাথা-ব্যথা, অনিদ্রা, মুখের ঘা, দাঁতের মাড়ী ফোলা, অর্শের রক্ত-পাত, কানপাকা, চক্ষু উঠা, যকৃৎ বৃদ্ধি, প্লীহা বৃদ্ধি প্রভৃতি গৃহস্থ-পরিবারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাধি। স্ত্রীরোগের মধ্যে রজঃকষ্ট, অনিয়মিত ঋতুস্রাব ও সূতিকা সাধারণ রোগ। তা ছাড়া শরীরের কোন অংশ থেত্‌লে যাওয়া, মচকে যাওয়া, কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্তপাত, আগুনে পোড়া, বোল্‌তা বা বিছার কামড়, কুকুর-দংশন প্রভৃতি দ্বারাও গৃহস্থ-পরিবারকে আকস্মিক ভাবে ব্যাকুল হইতে হয়।

গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহার্য্য ভেষজ।

উপরি-উক্ত সাধারণ ব্যাধিগুলির প্রতিকারার্থ আয়ুর্ব্বেদানু-মোদিত যে সকল উদ্ভিজ্জ জান্তব এবং পার্থিব বা ধাতব ভেষজ ব্যবহার হয় সেগুলির একটি মোটামুটি তালিকা দিয়ে দিতেছি। তালিকাটি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, প্রায়শঃ গাঁটের কড়ি খরচ না করিয়া কিংবা কখনও কখনও অতি সামান্য ব্যয়েই গৃহ-চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ভেষজ সংগ্রহ করা যায়। এই ভেষজগুলিকে নিয়ে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া দেখান হইল,—

(১) অশ্বগন্ধা, অশ্বত্থ, অশোক, অপরাজিতা (শ্বেত), আমলকী, আকন্দ, আপাং, আমরুল, আম, আনারস, আদা, এরণ্ড, ওল, ওলটকম্বল, করবী (শ্বেত ও রক্ত), কয়েদবেল, কালমেঘ, কাঁটানটে, কাকমাচী, কামিনীফুল, কার্পাস, কাল-কাসুন্দে, কুল, কুলেখাড়া, কুকসিমা, কুড়চি, কেশুর্তে, কৃষ্ণকলি, খেজুর, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, গন্ধভাদুলে, গাব, গাঁদাফুল, গুলঞ্চ, গোয়ালেলতা, ঘেঁটু, ঘৃতকুমারী, চাকুন্দে, চাঁপাফুল, চিতা, ছাতিম, জবা, জয়ন্তী, জাঁতিফুল, তুলসী, তেলাকুচা, থানকুনি, ডালিম, ধুতুরা, নাটাকরঞ্জা, নিসিন্দা, নিম, পটল, পলতা, পান, পাথরকুচি, পালিধা মাদার, পুনর্ণবা, পুঁই, পেঁপে, পেয়ারা, বকফুল, বকুল, বরুণ, বন্তওল, বাসক, ব্রাহ্মী, বেড়েলা, বাবলা, ভাঁট, ভৃঙ্গরাজ, মনসাসীজ, মানকচু, মালতী ফুল, যজ্ঞডুমুর, রাস্না, লেবু, হলুদ, হিঞ্চেশাক, হিমসাগর, শতমূলী, শিমুল, শেয়ালকাঁটা, সজিনা, সিউলী, সেওড়া, স্থল-পদ্ম—এই সকল বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ যথা, পত্র, পুষ্প, ফল, বীজ, কাঠ, বল্কল, ক্ষীর, মূল ইত্যাদি কাঁচা অবস্থায় ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

(২) আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, দারুচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, পিপুল, তেজপাতা, জীরা, কালজীরা, ধনে, গোলমরিচ, মেথি, যোয়ান, বনযোয়ান, ইসবগুলের ভুষি, গমের ভুষি, মুসব্বর, সোমরাজ, শুঁঠ, বুচকি দানা, গোক্ষুর, দারু হরিদ্রা, অনন্তমূল, আতইচ, বামুনহাটি, কণ্টকারী, বৃহতী, ছোট চাদরের মূল, তামাকপাতা, ঝিন্টি, বেণার মূল, তেউড়ী, লাক্ষা, তোপচিনি, কাবাব চিনি, চিতামূল, দন্তিমূল, চিরতা, চৈ, বচ, কুড়, যষ্টিমধু, সোঁদাল, সোনাপাতা, জায়ফল, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, কলাই, মসুর, যব, তিল, সুপারি, অর্জ্জুন ছাল, অশোক ছাল, রোহিতক ছাল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, কটকী, শ্বেত ও রক্তচন্দন, শিমুল ফুল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস, ভুমিকুষ্মাণ্ড, জটামাংসী, তালজটা, শ্যামলতা, তৈজ্রী, ধুনা, গঁদ, তোকমারী, মাজুফল, কিসমিস, বন আদা, কুলবীজ, তুলাবীজ, শশাবীজ, পলাশবীজ, জামবীজ, কাঁকুড়বীজ, মসিনা, মাসকলাই, আতপ চাউল—এই সকল উদ্ভিজ্জ ভেষজ শুষ্কাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া গুড়, চিনি, মিশ্রী, পুরাতন গুড়, পুরাতন তেঁতুল, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, তিল তৈল, রেড়ির তৈল, তার্পিন তৈল, মসিনা তৈল, খয়ের, ডাবের জল, গোলাপ জল, হিং, রসাঞ্জন, সিদ্ধি, আফিং, আরারুট প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য-গুলিও ভেষজরূপে ব্যবহৃত হয়।

(৩) দুধ, দই, মাখন, ঘি, মধু, পুরাতন ঘৃত, মৃগনাভি, মোম, শামুক, শঙ্খ, হরিণের শিং, ময়ূরপুচ্ছ, গোদন্ত, গোবর, গোচোনা—এইগুলি গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহার্য্য জান্তব ভেষজ।

(৪) সোহাগা, গন্ধক, তুঁতে, হীরাকষ, সচল লবণ, বীটলবণ, সৈন্ধব লবণ, সোরা, হরিতাল, নিশাদল, যবক্ষার, লৌহভস্ম, বঙ্গভস্ম, সফেদা, চুণ, চুণের জল, হিঙ্গুল, মনঃশিলা, গেড়িমাটি, ফিটকারী, ফুলখড়ি, উনানের পোড়ামাটি, সমুদ্র-ফেন—এইগুলি গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহার্য্য পার্থিব বা ধাতব ভেষজ।

১ম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ভেষজগুলির জন্য ভেষজ উদ্যানের প্রয়োজন। ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ দ্রব্যই পসারী দোকানে পাওয়া যায় এবং বাকীগুলি অন্য ভাবে সংগ্রহ করা কঠিন নহে। পাচনের কতকগুলি উপকরণ ব্যতীত গৃহ-চিকিৎসায় সর্ব্বদা ব্যবহার হয়, এরূপ প্রায় সমস্ত ভেষজই এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। তবে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরেও দেখা যায়, কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ রোগের আশ্চর্য্য ফলপ্রদ গাছ-গাছড়ার প্রয়োগ জানে এবং তাহারা ঐগুলিকে "মন্ত্রগুপ্তি"রূপে রক্ষা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ঐ প্রকার ভেষজ এই তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। উপরি-উক্ত তালিকায় উল্লিখিত এক বা একাধিক ভেষজের সংযোগে এক একটি ঔষধ কল্পিত হইয়া রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই সকল ঔষধ ব্যবহারে কোন-বিপদাশঙ্কা নাই কিংবা প্রয়োগ বিষয়ে কোন জটিলতা নাই। উহাদের দ্বারা সব সময় উপকার না হইলেও, অপকার হয় না। আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার ঔষধাবলীর ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য।

গৃহ-চিকিৎসায় মকরধ্বজ।

মকরধ্বজ নামক সর্ব্বজনপরিচিত মহৌষধটি আমাদের দেশের প্রায় ঘরে ঘরেই কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। আবহমান কাল হইতেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও সর্ব্ববিধ রোগে মকরধ্বজ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। এই আয়ুর্ব্বেদীয় মহৌষধটির গুণে মুগ্ধ হইয়া অধুনা অনেক বড় বড় ডাক্তার বিবিধ রোগে ইহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অনুপানভেদে ব্যবহারে মকরধ্বজ এক দিকে সকল প্রকার পীড়ানাশক মহৌষধ, অপর দিকে আবার স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তিবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠ রসায়ন। সদ্যোজাত শিশু, আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক এবং মুমূর্ষু রোগীকেও ইহা নির্ভয়ে সেবন করান যায়। শত সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে রোগ নির্ণয় করিয়া যথোপযুক্ত অনুপানের সহিত খাঁটি মকরধ্বজ ব্যবহারে যে-কোন পীড়ার প্রথম অবস্থায় প্রায়ই চমৎকার উপকার পাওয়া যায়। ঔষধটি দামেও সস্তা। বাজারে প্রতি মাত্রা এক আনা হইতে পাঁচ পয়সার মধ্যে কিনিতে পাওয়া যায়। এদিকে দিন দিন রোগের চিকিৎসা যেরূপ ব্যয়বহুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পারিবারিক চিকিৎসায় মকরধ্বজের আরও বহুল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

মকরধ্বজের মত একটা মহোপকারী ঔষধের অপেক্ষাকৃত বহুল প্রচলনের পথে কতকগুলি অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ অনেকের ধারণা, মকরধ্বজ নামে বাজারে যাহা বিক্রয় হয়, তাহা প্রায়শঃ শাস্ত্রোক্ত উপায়ে প্রস্তুত বিশুদ্ধ মকরধ্বজ নহে এবং এজন্য অনেকে মকরধ্বজ ব্যবহার করিতে চায় না। লোকের মন হইতে এরূপ ধারণা দূর করিবার দায়িত্ব অবশ্যই মকরধ্বজ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির। তবে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে মকরধ্বজ তৈয়ারী হইয়া কুইনিনের মত পোষ্ট আপিসের মারফত বিক্রীত হইলে, ঐ মকরধ্বজে সহজেই সকলের আস্থা হইবে। তারপর অনুপান-দ্রব্য সংগ্রহের অসুবিধাও আছে এবং এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি। তৃতীয়তঃ মকরধ্বজ বিশেষ পরিচিত ঔষধ হইলেও ইহার ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকায়, অনেকে ইহার প্রয়োগে অনেক সময় বাঞ্ছিত ফল পায় না কিংবা বিবিধ রোগে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মকরধ্বজের অনুপান ও বিস্তারিত ব্যবহারবিধি সম্বলিত পুস্তিকা রচনা করিয়া ঐগুলি ঘরে ঘরে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গৃহ-চিকিৎসায় পাচন।

অনেক কঠিন কঠিন রোগও পাচন ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া থাকে। কোন কোন রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পাচনের ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদে আছে। সুতরাং কতকগুলি পাচনের প্রয়োগে কিছু জটিলতা আছে এবং এজন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান প্রয়োজন হয়। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি ফলপ্রদ পাচনও আছে, যেগুলি ব্যবহারে কোন জটিলতা নাই এবং পারিবারিক চিকিৎসায় নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। এই শ্রেণীর পাচনই গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইত এবং প্রাচীনা গৃহিণীরা ঐ সকল পাচনের বিবিধ ব্যবহার অবগত ছিলেন। ঐ পাচনগুলি আবার ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়া উচিত।

গৃহ-চিকিৎসার সহায়ে ভেষজ উদ্যান।

সেকালে পারিবারিক চিকিৎসায় বনৌষধিসমূহ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত এবং ঐগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দিকে লোকের দৃষ্টি ছিল। এখন আর তাহা নাই। কয়েক প্রকার ভেষজ পল্লী অঞ্চলের এখানে সেখানে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বনৌষধি আজকাল কোথাও অনায়াসে পাওয়ার উপায় নাই। গৃহ-চিকিৎসায় ব্যবহার্য্য

বনৌষধিগুলিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে, প্রথম কাজ ইহাদিগকে সহজলভ্য করা এবং তাহা করিতে হইলে পল্লী অঞ্চলের স্থানে স্থানে ভেষজ উদ্যান স্থাপন করার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। তবে যে সকল বনৌষধি কাঁচা অবস্থায় প্রয়োগ হয়, প্রধানতঃ সেই সকল বনৌষধি সংগ্রহের জন্য ভেষজ-উদ্যানের আবশ্যক। শুষ্কাবস্থায় ব্যবহার্য্য অনেক উদ্ভিজ্জ ভেষজ সব রকম জলবায়ুতে জন্মায় না। তা ছাড়া পূর্ব্বাহ্নে রোগের কল্পনা করিয়া নানা প্রকার ভেষজ সংগ্রহ করতঃ শুষ্ক করিয়া ঘরে রাখা গৃহস্থ পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং শুষ্কাবস্থায় ব্যবহার্য্য ভেষজসমূহের কিছু কিছু উদ্যানে রোপণ করা গেলেও, ইহাদের জন্য প্রধানতঃ পসারী দোকানের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যাহা হউক, প্রয়োজনীয় ভেষজ সমন্বিত গ্রাম্য ভেষজ উদ্যানগুলি এমন স্থানে রচনা করিতে হইবে, যেখান হইতে উদ্যানের চতুপার্শ্বস্থ অঞ্চলের লোক অনায়াসে উদ্যান হইতে গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিতে পারে। বাজারের সন্নিকটে উদ্যানের স্থান নির্ব্বাচিত হইলেই ভাল হয়। কেননা, তাহা হইলে গ্রামের সকলেই একে অন্যের সাহায্যে উদ্যান হইতে ভেষজ সংগ্রহ করিয়া লইবার সুবিধা পাইবে।

মকরধ্বজ এবং বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অনুপানরূপে যে সকল কাঁচা গাছ-গাছড়ার ব্যবহার হয়, সেগুলি সংগ্রহের অসুবিধা হেতু পল্লী অঞ্চলের লোকেরা অনেক সময় মকরধ্বজ কিংবা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সেবন করিতে চায় না। পূর্ব্বোক্ত ভেষজ-তালিকার ১ম শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত ভেষজগুলির সমন্বয়ে উদ্যান রচিত হইলে, পল্লী অঞ্চলের লোকের এই অসুবিধা দূর হইবে। পারিবারিক চিকিৎসায় মকরধ্বজের গুরুত্ব বিবেচনা করিলে, শুধু মকরধ্বজের অনুপানের জন্যই ভারতের সর্ব্বত্র ভেষজ-উদ্যান রচিত হওয়া উচিত।

যে সকল ভেষজ পল্লী অঞ্চলের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, ভেষজ-উদ্যানে ঐ শ্রেণীর ভেষজ রোপণ না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যত্র তত্র হইতে সংগৃহীত উদ্ভিজ্জ ভেষজকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ এইরূপ—পথে, বৃক্ষতলে, অপবিত্র স্থানে, কূপপার্শ্বে, উইয়ের মাটিতে, ক্ষারপ্রধান মাটিতে এবং শ্মশানভূমিতে জাত ওষধিবৃক্ষসকল ফলপ্রদ হয় না। অল্প কয়েক রকম গাছগাছড়া চারা অবস্থায় ঔষধে লাগে। তা ছাড়া সর্ব্বক্ষেত্রেই বৃক্ষাদি সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে ঔষধার্থ ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং পূর্ণবীর্য্যবান ঔষধের জন্য ভেষজ-উদ্যানের একান্তই প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ ৭।৮টি গ্রামের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, এমন এক একটি উদ্যানের জন্য এক একরের মত জমির আবশ্যক হইবে। কোথাও এক লপ্তে এক একর জমি না পাওয়া গেলে, একাধিক অংশেও উদ্যান রচিত হইতে পারে। ভেষজ-উদ্যানের জন্য তেমন উর্ব্বর জমির দরকার নাই। পতিত ডাঙ্গা জমি (high land) ভেষজ-উদ্যানের সমধিক উপযোগী। সুতরাং খুব অল্প মূল্যেই জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। বৃক্ষাদি রোপণের ব্যয়ও বেশী নহে। লেখকের বিবেচনায় এক একর জমির দাম ও উদ্যান রচনার ব্যয় ৬০০৲ হইতে ৮০০৲ টাকার মধ্যে সঙ্কুলান হইবে। কোন মর্য্যাদা-সম্পন্ন জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান কিংবা গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইলে, অনেক স্থলেই ভেষজ-উদ্যানের প্রয়োজনীয় জমি ধনী গৃহস্থদের নিকট হইতে বিনামূল্যে অর্থাৎ দান হিসাবে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। উদ্যান তৈয়ারী হইবার পর ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ সভা স্বচ্ছন্দেই উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন পরিকল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষা-লয়ের সন্নিকটে উদ্যান-রচনা করিয়া উদ্যান পরিচর্য্যার কাজ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর দেওয়া যাইতে পারে। বাল্য-কাল হইতেই বালক-বালিকারা যদি ওষধি-বৃক্ষের যত্ন লইতে শিখে এবং উহাদের গুণাগুণের সহিত পরিচয়লাভ করিবার সুযোগ পায়—তাহার ফল শুভই হইবে। ভেষজ উদ্যানের জন্য তেমন বিশেষ যত্নেরও আবশ্যক করে না। বর্ষার প্রারম্ভে একবার এবং বর্ষার শেষে আর একবার উদ্যানের আগাছা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। কোন কোন সময় চারিপাশের বেড়ার ভগ্ন অংশ মেরামত করিয়া দিতে হয়। তা ছাড়া মাঝে মাঝে নূতন লতাপাতা এবং গাছ-গাছড়া রোপণ করিবার প্রয়োজনও আছে। এই সমুদয়ের জন্য এক একটি উদ্যানের পিছনে প্রতি বৎসর ৩০।৪০৲ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না।

বেদ, বৌদ্ধযুগের সাহিত্য এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠেও জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে রাজানুকূল্যে ওষধি-বৃক্ষের জন্য দেশের সর্ব্বত্র ভেষজ-উদ্যান নির্ম্মিত হইত। সেই পুরাতন ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করার সময় উপস্থিত হয় নাই কি ?

গৃহ-চিকিৎসার যুগোপযোগী পুস্তক রচনা।

পারিবারিক চিকিৎসাবিধিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে, একদিকে যেমন পল্লী অঞ্চলের স্থানে স্থানে ভেষজ-উদ্যান রচনা করার প্রয়োজন আছে, তেমনি অন্য দিকে বিভিন্ন ভেষজের প্রয়োগবিধি বৈজ্ঞানিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে হইবে। "গৃহ-চিকিৎসায় মুষ্টিযোগ", "পারিবারিক চিকিৎসা", "সহজ টোট্‌কা চিকিৎসা" প্রভৃতি নামধেয় কতকগুলি পুস্তিকা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এগুলি প্রায়ই বাজে। প্রয়োগ ও পরীক্ষা দ্বারা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ উপযুক্তরূপে নির্ণীত হয় নাই, এইরূপ অনেক ভেষজ ঐ সকল পুস্তিকায় ফলপ্রদ ঔষধ-রূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। তা ছাড়া ঔষধের মাত্রা

প্রয়োগের ক্ষেত্রবিচার প্রভৃতি বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকে না। সত্য কথা বলিতে কি, এই শ্রেণীর পুস্তিকাগুলি রোগক্লিষ্ট দরিদ্র জনসাধারণের দুর্ব্বলতার সুযোগে পুস্তক প্রণেতা ও প্রকাশকদের কিছু অর্থ লাভের উপায় মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসার যুগোপযোগী গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে, প্রথমে কয়েকজন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী প্রাচীন কবিরাজ লইয়া একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটি বিভিন্ন রোগাধিকারের আয়ুর্ব্বেদানুমোদিত পারিবারিক চিকিৎসার ভেষজসমূহের গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন। এই প্রাথমিক সংগ্রহকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর "আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ কমিটি" নামে কতকগুলি কমিটি গঠন করিতে হইবে। প্রথম কমিটি কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থে উল্লিখিত ভেষজাদির ক্রিয়া ও প্রয়োগবিধির বিবরণ পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দায়িত্ব এই আঞ্চলিক কমিটিগুলির উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। আঞ্চলিক কমিটিগুলি নির্দ্দিষ্ট পন্থায় স্ব স্ব অঞ্চলের ভেষজব্যবহারকারীদের নিকট হইতে বিভিন্ন ভেষজের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। এই সঙ্গে সম্ভব ক্ষেত্রে দেশ-প্রচলিত অন্যান্য ভেষজ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান এবং তথ্যসংগ্রহ চলিতে থাকিবে। এই ভাবে অন্ততঃ তিন বৎসর কাজ চলিবার পর সংগৃহীত তথ্যগুলির বিচার ও বিশ্লেষণের ভার অপর একটি কমিটির উপর দিতে হইবে। এই শেষোক্ত কমিটি নূতন তথ্যের আলোকে গৃহ-চিকিৎসাবিধির একটি প্রামাণ্য পুস্তক প্রণয়ন করিবেন। যাঁহাদের ধারণা, চর্চ্চার অভাবে গত কয়েক শতাব্দীতে আয়ুর্ব্বেদে অনেক জঞ্জালের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারাও ঐরূপ গৃহ-চিকিৎসার গ্রন্থকে নিঃসঙ্কোচে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। এখন গৃহ-চিকিৎসায় প্রযোজ্য ভেষজ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান এবং গৃহ-চিকিৎসার পুস্তক রচনার ব্যয়ের কথা। সুষ্ঠুভাবে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে আড়াই লক্ষ হইতে তিন লক্ষ টাকার মত ব্যয় হইতে পারে। পরে পুস্তক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে এই টাকার বড় অংশ উঠিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে।

মানুষ যতই প্রকৃতির অনুসরণ করে, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ততই সে বেশী সুখী হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসা-বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অনুসরণে কল্পিত, সুতরাং বৈজ্ঞানিক। জনসমাজে আয়ুর্ব্বেদীয় গৃহ-চিকিৎসাবিধি পুনঃপ্রচলন বিষয়ক এই প্রস্তাবটি দেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি।

নিষ্ফল কামনা

শ্রীকরুণাময় বসু

দেখেছি তোমার স্বপ্ন প্রভাতের আলোর শিশিরে,
কুসুম-কুঁড়ির গন্ধে; চিত্রাঙ্কিত বর্ণাভ আকাশ
বিচিত্র সৌন্দর্য-পথে বারম্বার করেছে আহ্বান,—
তুমি সে ঝর্ণার বাণী, অর্থহীন আনন্দ ঝলক।

অলক দুলায়ে যাও মেঘকক্ষে কজ্জল দিবসে
উজ্জ্বল বিদ্যুৎসম আঁখি-পক্ষে অগ্নিশিখা হানি';
কখনো এসেছ কাছে, মৃদু হেসে গেছ দূরান্তরে
স্বপ্নের অতীত তীরে; হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি।

চিত্রিতা খড়ির বন, তৃতীয়ার ভাঙা চাঁদ কাঁপে
অধীর ঊর্মির প্রান্তে; বিস্মৃতির বাঁকা লেখা যেন
বিরহের মূর্তি ধরে, হিম অশ্রু ফেলে একাকিনী
হিমান্তের অর্দ্ধরাত্রে জীবনের ভাঙা ঘাটে বসি।

হে অচেনা, কে গো তুমি, গায়ে লাগে ব্যাকুল নিশ্বাস,
তবু তো এলে না কাছে তুমি যেন নক্ষত্র-বালিকা;—
সন্ধ্যার সাগর-জলে খেলাছলে ঝিনুক কুড়াও,
আবার কোথায় যাও স্তব্ধ রাত্রে ধ্রুবতারা-দেশে।

আমারে ডেকেছো কেন, রিক্ত আমি, ভাঙা বাঁশী হাতে,
মানুষ ডাকে না মোরে, দুঃখ নাই, তুমি শুধু ডাকো;
তুমি ডাকো, তুমি ডাকো, তারপর মৃত্যু দাও মোরে;—
আমার সমাধি-চিহ্ন তৃণপুঞ্জে ঢাকা পড়ে থাক।

ঢাকা থাক অরণ্যের শুষ্কপত্র দগ্ধ তরুমূলে,
অনাবৃত সূর্যকর দিয়ে যাক আতপ্ত চুম্বন;
তুমি শুধু ভালোবেসে এক বিন্দু ফেলো অশ্রুজল,
ভাগ্যহত জীবনের এই মোর অন্তিম প্রার্থনা।

সাধক নাম্মালোয়ার

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যুগ-স্রষ্টাদের চিন্তা ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া অশিবের পূজারী আত্মবিস্মৃত মানবজাতি ধ্বংসের ভয়াবহ পরিণতি হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। মানবজাতি যখনই স্রষ্টাকে বিস্মৃত হইয়া 'প্রলয়-মন্থন ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা'র পূজায় মত্ততাবশে পশুবলে ধর্মকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয় তখনই যুগাবতারগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মানবের প্রতি ভগবৎপ্রেম জাগ্রত হইয়া দেখা দেয় এই সকল মহামানবের মধ্যে। যুগাবতারগণের সান্নিধ্যে জাতি আবার উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে এবং ক্লৈব্যবর্জিত এক অমর আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। এই আত্মদর্শনের ভিতর দিয়া তাহারা পশুত্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় এবং সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া ধন্য হয়। মহাকালের ধ্বংস-চক্রে জগতের সমস্ত বস্তুই ছিন্নভিন্ন হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু এই ধ্বংসের আবর্তচক্রে অবিনশ্বর হইয়া থাকে তাহাদের ভাবধারা আদর্শ ও সাধনা। ব্যক্তি-জীবন ধ্বংস হইয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহার আদর্শ শাশ্বত হইয়া থাকে সহস্র জীবনধারার মধ্যে—ভাবীকালের জনগণের মাঝে। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ সত্যের যূপকাষ্ঠে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিদেহী আত্মা শত সহস্রের মধ্যে জীবন্ত হইয়া থাকে। অবতারগণ যুগধর্ম-প্রয়োজনে যে অনুপ্রেরণা দিয়া থাকেন তাহাতেই মানবজাতি সত্য ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সকল মহামানবের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

These incarnations are always conscious of their own divinity; they know it from their birth. They are like the actors whose play is over, but who, after their work is done, return to please others. These great ones are untouched by aught of earth, they assume our form and our limitations for a time in order to teach us, but in reality they are never limited; they are ever free.—*Inspired Talks.*

ভগবান তথাগতের মহাপরিনির্বাণের সময় মল্লগণ (কুশী নগরের রাজবংশ) দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন—'তথাগত চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইতেছেন, এরূপ প্রকাশ করিও না। তাঁহার দেহের ধ্বংস হইতেছে, উপদেশাবলী চিরস্থায়ী, ইহা অপরিবর্তনীয়। আলস্য পরিত্যাগ কর; মুক্তির জন্য উত্থিত হও।' সত্যদ্রষ্টা ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন—'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথ-নির্মাতা, পথপ্রদর্শক।...মানুষ অশান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্য নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্য। মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—

> ...তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
> চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে,
> ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে,
> অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
> তাহার আহ্বানগীতি, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
> সংকট-আবর্ত-মাঝে দিয়েছে সে সব বিসর্জন।
> নির্যাতন, লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন
> শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
> বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠার,
> সর্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
> চির জন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন।
> শুনিয়াছি তারি লাগি
> রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
> পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
> প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।

হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাবধারায় বৈষ্ণব ধর্মের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্মের জাগরণের সূত্রপাত হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রারম্ভে। পল্লব বংশের রাজত্ব-কালেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই তামিল রাজগণ সগৌরবে রাজত্ব করেন। এই যুগে আলোয়ার আখ্যাধারী বৈষ্ণব সাধকগণ হিন্দু ধর্মের অভ্যুদয় ও তামিল-ভূমির জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের হ্লাদিনী শক্তির প্রেরণা সঞ্চারে সবিশেষ সাহায্য করেন। দক্ষিণাপথে বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে এই আলোয়ারগণের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচরিত অবলম্বনে তাঁহারা স্তব রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। আলোয়ার অথবা 'মিষ্টিক্' বৈষ্ণবগণ ভক্তিমার্গের উপাসক ছিলেন। তামিল বৈষ্ণব সাহিত্য 'থেবারম্', 'থিরুবাচকম্', 'থিরুবৈমঝ্‌হি', 'তিরুপ্প গ-ঝ্‌ল্' ইত্যাদি নামে পরিচিত। উপনিষদের গভীর তত্ত্বসমূহ সরল ভাষায় রচিত হইয়া এই সমস্ত তামিল সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় আলোয়ারগণ এই সমুদয় তামিল স্তোত্রগাথা রচনা করিয়াছেন। রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, নরসিংহ প্রভৃতি শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতারের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত স্তোত্র

রচিত ও নিবেদিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে শ্রীরামানুজ আলোয়ারগণের এই ধর্মানুষ্ঠানকে প্রপত্তিমার্গ রূপে সাধারণ্যে প্রচার করেন। সুবিখ্যাত বৈষ্ণবকুলতিলক রঙ্গনাথাচার্য কর্তৃক বিভিন্ন আলোয়ারের রচিত স্তোত্রগাথাগুলি সংগৃহীত হয়। এই সংগৃহীত রচনাবলী 'দিব্যপ্রবন্ধম্' নামে পরিচিতি লাভ করে। ইহাতে চারি হাজার স্তুতিগান আছে। রঙ্গনাথাচার্য সর্বসাধারণ্যে নাথমুনি নামে পরিচিত। ইনি খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষার্ধ ও দশম শতকের প্রথম ভাগে শ্রীরঙ্গম্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা কতিপয় ব্রাহ্মণ কুম্বকোনম্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্তির উদ্দেশ্যে ভজন-সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। ঐ সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাব-মাধুর্যে রঙ্গনাথাচার্য অতীব মুগ্ধ হন। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, স্তুতিগানগুলির রচয়িতা সাধক নাম্মা-লোয়ার। অতঃপর তিনি বহু আয়াস স্বীকারে নাম্মালোয়ারের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত স্তুতি-গাথাগুলির সংখ্যা এক হাজার। এই স্তুতিগানগুলি আজও দক্ষিণ-ভারতের প্রত্যেক বৈষ্ণব দেব-দেউলে ভক্তিসহকারে গীত হইয়া থাকে।

পল্লব-রাজত্বের অবসানে খ্রীষ্টীয় নবম শতক হইতে দক্ষিণাত্যে চোল নরপতিগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। প্রথম চোলরাজগণ শৈব ছিলেন। সুতরাং আলোয়ার-গণের উপর অত্যাচার-অবিচার সুরু হয়। কিন্তু পরবর্তী চোলরাজগণ বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন। বিখ্যাত সুব্রহ্মণ্য মন্দির রাজা রাজেন্দ্র চোলের অমর কীর্তি। দাক্ষিণাত্যের আধ্যাত্মিক ভূমি আজও এই দুইটি ধর্মদর্শন দ্বারা উর্বর রহিয়াছে। আলোয়ারগণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রতি দোষারোপ বা বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম' ঘোষণা করেন নাই। তাঁহাদের মতে, জন্মদ্বারা কাহারও মুক্তি নির্ধারিত হয় না, কর্মদ্বারাই ইহা নিরূপিত হইয়া থাকে। হরিভক্ত-গণের মধ্যে কোন উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই। এই বিশ্বে সবাই সেই 'অমৃতের সন্তান'—ভাই ভাই। 'প্রস্থানত্রয়ে'র (ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ ও গীতা) পরিবর্তে তাঁহারা ভক্তিমার্গের প্রাধান্য সাধারণ্যে প্রচার করেন। কারণ গীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বিশ্বরূপদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।৫৩।৫৪

'তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, তাহা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান অথবা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় না। হে পরন্তপ অর্জুন! অনন্যভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ রূপধারী আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে (শাস্ত্রতঃ) পর্যবেক্ষণ করিতে এবং প্রত্যক্ষতঃ আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়।' এই প্রেম-ভক্তি-বাদই ভারতের মধ্যযুগের ধর্মান্দোলনের বিশেষত্ব। 'ভক্তির জন্ম হইল দ্রাবিড় দেশে, উত্তরে তাহা আনিলেন রামানন্দ। তাহার পর সাধকশ্রেষ্ঠ কবীর তাহা সপ্তদ্বীপ নয় খণ্ড বসুধায় বিস্তার করিলেন।'

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীর নে সপ্তদ্বীপ নৌ-খণ্ড॥

এই প্রেম-ভক্তি সম্বন্ধে কবীর বলিয়াছেন—

প্রেম বিনা সব কর্ম বৃথা প্রেম বিনা সব জ্ঞান।
প্রেম বিনা ঢিগ দূর হৈ প্রেম মিলে ভগবান।

আলোয়ারগণের 'তামিলনাদে'র ভিতর দিয়া গীতার এই পরম সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। এই 'তামিলনাদের' জন্মরহস্য কৌতুকপ্রদ। 'পদ্মপুরাণে' এই বৃত্তান্তটি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রাবিড় দেশে ভক্তিদেবীর জন্ম হয়। কর্ণাটকে পুষ্পিত যৌবন কাটাইয়া গুর্জরপ্রদেশে তিনি বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁহার দুই পুত্র—জ্ঞান ও বৈরাগ্য। তাঁহারাও যথাসময়ে বৃদ্ধ হইলেন। একদা ভক্তিদেবী পুত্রদ্বয়সহ শ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেখানে ভক্তিদেবী বিগত যৌবনশ্রী ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দেহের কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্তন সাধিত হইল না। ইহাতে তাঁহারা বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দেবর্ষি নারদ ভক্তিদেবী সকাশে উপনীত হইয়া প্রকাশ করিলেন, "দেবি, দুঃখ করো না। সমস্তই সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের ইচ্ছা। তুমি তাঁর পদপল্লবযুগল স্মরণ কর। আমি বেশ জানি, তুমি তাঁর অতীব প্রিয়—তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছ। তোমার প্রেমের কাছে তিনি তাঁর প্রাণকেও তুচ্ছ বলে মনে করেন। তোমার আহ্বানে তিনি দীনের পর্ণকুটীরে এবং নীচজনের অন্তরেও আসন পেতে থাকেন। ভক্তহৃদয়ে আশার সঞ্চার করে তাঁদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই তোমায় তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। মুক্তিকে দাস এবং জ্ঞান বৈরাগ্যকে পুত্ররূপে ধরাধামে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। মহাদেবি! শ্রবণ কর, সকল যুগের মধ্যে কলিযুগই শ্রেষ্ঠ। এ যুগে তোমাকে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে স্থাপন করব। নতুবা আমার হরিদাস নামই বৃথা বলে মনে করব। একমাত্র বৃন্দাবনের গোপী-জনোচিত প্রেম-ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। তপস্যা কিংবা প্রস্থানত্রয়ের পথে তাঁকে পাওয়া যায় না।"

তখন ভক্তিদেবী দেবর্ষি নারদকে বলিলেন, "আমার প্রতি যদি তোমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা থাকে তবে এদের মৃতকল্প দেহকে শক্তি সঞ্চারে প্রবুদ্ধ করো।"

দেবর্ষি 'ভাগবত ধর্ম' প্রভাবে জ্ঞান-বৈরাগ্যের দেহে যৌবন সঞ্চার করিলেন। 'ভাগবত পুরাণে'র একাদশ অধ্যায়, যাহা

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট উপদেশচ্ছলে ব্যাখ্যা করেন, সাধারণতঃ 'ভাগবত ধর্ম' নামে পরিচিত। কলিযুগে ইহা নারদীয়া ভক্তি নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আনন্দে বিহ্বল ভক্তিদেবী পুত্রদ্বয়কে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এক অলৌকিক রস-ভাবে সকলে বিভোর হইয়া পড়িলেন। ভক্তি-দেবীর এই মোহন ভাবাবেশ হইতেই 'তামিলনাদে'র জন্ম।

তিন্নেবেল্লী জেলার অন্তর্গত তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত থিরুনগরীতে পরম ধার্মিক বেল্লাল জাতীয় এক রাজপুত্র বাস করিতেন। তাঁহার নাম করিমারন্। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। অল্প বয়সে উদয়ানঙ্গই নামে এক পরম রূপবতী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উদয়ানঙ্গইর পিতার নাম বৈষ্ণবদ্বানিক। ইনি থিরুবন্ পরিসরম্ গ্রামের অধিবাসী। দাম্পত্যপ্রেমের অনাবিল আনন্দে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বহুদিন যায়, তাঁহাদের কোন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিল না। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে এক অব্যক্ত গভীর বেদনার সঞ্চার হইল। সতীসাধ্বী উদয়ানঙ্গই স্বামীসহ কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতে লাগি-লেন। একদা পিত্রালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে ব্রতচারিণী উদয়ানঙ্গই এক বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পান। স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া মন্দিরে অবস্থিত বিগ্রহের চরণে প্রাণের আকূতি জানাইয়া পুত্রকামনা করিলেন। তাঁহাদের আকুল আবেদনে দেবতার আসন টলিল। দিন যায়। যথাসময়ে উদয়ানঙ্গই অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। রাজ্যময় মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাণীর প্রসব-কাল উপস্থিত হইল। মন্দিরে মন্দিরে ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা হইতে লাগিল। অন্তঃপুরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল; মহিলারা মঙ্গলগান গাহিতে লাগিল। যথাসময়ে উদয়ানঙ্গই একটি পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা রাণী উভয়েই আনন্দে বিহ্বল হইলেন। কিন্তু জন্মের পর নবজাতক ক্রন্দন পর্যন্ত করিল না—কিম্বা চক্ষুরুন্মীলন করিল না। এমন কি মায়ের স্তন্য পানও করিল না। নবজাত শিশুর অদ্ভুত লক্ষণ দেখিয়া রাজ্যে আনন্দের পরিবর্তে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। মাতাপিতা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। শিশুটি দেব-অংশসম্ভূত মনে করিয়া রাজারাণী তাহাকে নিকট-বর্তী বিষ্ণুমন্দিরে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহারা শিশু-সন্তানকে একটি তেঁতুল গাছের ছায়ার নীচে রাখিলেন। ভগবানের লীলা অপূর্ব! সমবেত জনতা বিস্মিত চিত্তে দেখিল, সেই তেঁতুল গাছের কোটরে শিশুটি দ্রুতগতিতে প্রবেশ করিয়া পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হইল। শিশুর মধ্যে চেতনার চাঞ্চল্য কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইল না। এই ভাবে দেখিতে দেখিতে ষোলটি বছর কাটিল। এই শিশুই পরবর্তী কালে নাম্মালোয়ার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। নাম্মালোয়ার শব্দের অর্থ মরমী সাধক। অবশেষে পরম বৈষ্ণব মাধুরকবির সহিত এই সাধকপ্রবরের যোগাযোগ স্থাপনের ভিতর দিয়া দক্ষিণ ভারতের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।

মাধুরকবি জাতিতে সামবেদীয় ব্রাহ্মণ। চোলদেশের অন্তর্গত থিরুক্কুইলোর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই তিনি বেদাদি শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে তাঁহার সমস্ত দেহমন একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, শুধু পুঁথিগত বিদ্যাদ্বারা ভগবানের সান্নিধ্যলাভ করা যায় না। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত অমৃতের আস্বাদন লাভ করা যায় না। তাই কবীর বলেন—

গুরু বিন জ্ঞান ন উপজৈ গুরু বিন মিলে ন ভেব।
গুরু বিন সংশয় না মিটে জয় জয় জয় গুরুদেব ॥

গুরুর কৃপা ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, গুরুর সহায়তা ব্যতীত রহস্যের সন্ধান পাওয়া মুশকিল, গুরু ভিন্ন মনের সংশয় দূরীভূত হয় না—জয় জয় জয় গুরুদেবের। তাই মাধুরকবি সদ্‌গুরুর অন্বেষণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি উত্তরাপথের অযোধ্যা, মথুরা, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করিলেন। অতঃপর দক্ষিণাপথে তীর্থপর্যটন কালে তিনি বহু দূর হইতে এক বিমল আলোকরশ্মি দেখিতে পাই-লেন। এই অপূর্ব দৃশ্য ক্রমান্বয়ে তিন দিন তিনি দেখিতে পাইলেন। রহস্যের যবনিকা উত্তোলনের জন্য তিনি ক্রমাগত আলোকরশ্মির অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে থিরুনগরীতে উপনীত হইবার পর সেই আলোকরশ্মি আর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তত্রত্য জনপদবাসীদের জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি সাধক নাম্মালোয়ারের আশ্চর্য্য জন্মবৃত্তান্ত ও জীবনযাপন-প্রণালী অবগত হইলেন। অতঃপর মাধুরকবি যেখানে নাম্মালোয়ার সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন সেখানে গমন করিলেন। সাধকপ্রবরের চেতনা সঞ্চারের জন্য তিনি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। অবশেষে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"মহাত্মন্, অবিদ্যাসম্ভূত নশ্বর দেহান্তরগামী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত আত্মার খাদ্য এবং পানীয় কি?" মাধুরকবির প্রশ্নে সেই জ্ঞানতপস্বী দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতহাস্যে উত্তর করিলেন—"বৎস, জড়দেহে অবস্থিত আত্মা প্রকৃতির দ্বারাই লালিত-পালিত হইয়া থাকে। কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি নিজ সামর্থ্য প্রভাবে পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া সমস্ত ভূতকে ধারণ করিয়া আছি এবং আমিই রসময় সোমরূপে ওষধিসমূহ পরিপুষ্ট করিতেছি।"*

---

* গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।—১৫।১৩ গীতা।

নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইতে দেখিয়া মাধুরকবি বিস্ময়ে হতবাক হইলেন। এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহামানবকে তিনি গুরুপদে বরণ করিলেন। নাম্মালোয়ারের নিকট মাধুরকবির শিষ্যত্বগ্রহণ উচ্চ-নীচ বর্ণের ভেদাভেদ দূরীভূত করিয়া মিলনরাখী বন্ধনের সূত্রপাত করিল। এই তামিল মরমী সাধকের আধ্যাত্মিক আলোকরশ্মি মাধুরকবির ন্যায় সুযোগ্য শিষ্যকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণ্যে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। ভক্তিসাধনার নবধা গুণের সমন্বয় মহাভাগবত মাধুরকবির মধ্যে দেখা যায়। তিনি শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে দৈত্যকুলপ্রদীপ 'প্রহ্লাদ, পাদসেবনে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী, অর্চনায় পৃথু, বন্দনায় অক্রূর, দাস্যভাবে মহাবীর, সখ্যভাবে তৃতীয় পাণ্ডব ও আত্মসমর্পণে দৈত্যরাজ দানবীর বলি। একমাত্র গুরুদেবের মহিমা আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য তিনি শ্রীশুকদেবের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। নাম্মালোয়ারের শ্রীমুখবিনিঃসৃত বেদের গম্ভীর তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার লেখনীর যাদুতে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। মাধুরকবি স্বীয় গুরুদেবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমি অন্য কোন দেবদেবী চিনি না বা জানি না; গুরুদেবের যশঃকীর্ত্তনই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। আমি তাঁর সেবক; জগদ্‌গুরুর কৃপাকণালাভে আজ আমার সমস্ত অহমিকা—বিদ্যার অহঙ্কার, যশের অহঙ্কার দূরীভূত হয়েছে। মোহগ্রস্ত আমাকে তিনি প্রিয় শিষ্যের অধিকারদানে ধন্য করেছেন। তিনি আমায় দিব্য চক্ষু দান করেছেন। মোহাচ্ছন্ন মানবজাতিকে গুরুদেবের চিরমধুনিষ্যন্দী বাণী শুনিয়ে প্রবুদ্ধ করাই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁর পাদসেবনই আমার সাধনা।"

কথিত আছে, স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম্মালোয়ারের সকাশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন এবং কলিযুগে 'নারদীয়া ভক্তি' প্রচারের নির্দ্দেশ দিয়া অন্তর্হিত হন। নাম্মালোয়ার শ্রীভগবানকে 'বিশ্বাতীত', 'বিশ্বাত্মগ', 'বিশ্বদেব', 'পরম-ব্রহ্ম', 'জীবন-দেবতা' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের দুর্লভ সৌভাগ্য একমাত্র ভক্তেরই হইয়া থাকে।

নাম্মালোয়ারের কৈশোর ও যৌবনের ঘটনাবলী এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থ 'গুরুপরম্পরায়' কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। তাঁহার কতিপয় স্তোত্র-গাথা দাক্ষিণাত্যের বহু দেব-দেউলের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় পরিব্রাজকবেশে অতিবাহিত করিয়াছেন। নাম্মালোয়ার সম্ভবতঃ চিরকুমার ছিলেন।

নাম্মালোয়ার যে শুধু পরম বৈষ্ণব ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন কবিও ছিলেন। তিনি প্রকৃতির সত্তার সহিত আপন চিত্তের যোগাযোগ স্থাপন করিয়া প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতিকে মানবধর্মী (humanised) করিয়া তুলেন। প্রকৃতির হৃদয়-মুকুরে তিনি অতিপ্রাকৃতের লীলাবৈচিত্র্য প্রতিবিম্বিত দেখিতে পান। প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার কাছে শুধু নৈসর্গিক দৃশ্যমাত্র নহে; ইহা তাঁহার কাছে দেখা দিয়াছে অনন্তের অসীমের বাণী লইয়া। তিনি বিরাটের রূপকে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন প্রকৃতির বিভিন্ন সৌন্দর্যের মধ্যে। 'রোমাণ্টিক' ভাবপ্রবণতা তাঁহার কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য। ভগবানের দেহশ্রী বর্ণনায় তিনি পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক সৌন্দর্যের মাঝে ভগবানের সত্তা আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলী ভাব-ঐশ্বর্যে অনির্বচনীয়, অপূর্ব রসকল্পনায় শ্রীমণ্ডিত। একবার তামিল কবি কম্বন্ স্বরচিত রামায়ণ ব্যাখ্যা করিতে শ্রীরঙ্গম মন্দিরে গমন করেন। তিনি পুস্তকটি শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের চরণে স্থাপন করিলে অকস্মাৎ প্রত্যাদেশ শুনিতে পাইলেন।

—হে কম্বন্! তুমি কি আমার ভক্ত নাম্মালোয়ারের প্রশংসা-গীতি গেয়েছ?

—প্রভো! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা কর; এখনই আমি তাঁর কবিত্বের প্রশস্তিসহ তামিল-সঙ্ঘে আমার রামায়ণ ব্যাখ্যা করব।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে নাম্মালোয়ারের ভাব-সমৃদ্ধ রচনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন,—

"হে সুধীবৃন্দ! নাম্মালোয়ারের একটি কবিতার সহিতও পৃথিবীর সমস্ত কবিতার তুলনা চলে না। সূর্যের সহিত কি জোনাকির তুলনা করা যায়? উর্বশীর সমকক্ষ কি পিশাচী? সাধারণ কবির নাম তো তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্যই নয়।" এই ঘটনায় নাম্মালোয়ারের নাম সাধারণ্যে সুপরিচিত হয়। তিনি মানব-সমাজের কল্যাণকামনায় নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেন,—

"হে ভ্রান্ত মন! ভগবানের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ কর। শয়নে জাগরণে তাঁর নাম স্মরণ-মনন কর। তিনি সমস্ত প্রাণি-জগতের পিতামাতা। জগতের সমস্ত বস্তুতেই ভগবান বিরাজিত। অন্তরে বাইরে তাঁর রূপ অন্বেষণ কর; আমিত্ব বর্জন কর। পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ রেখ না—অহেতুকী ভক্তি অর্জন কর। স্মরণ রেখ, আত্মা অবিনশ্বর। আপনার বলতে মানুষের যা কিছু বুঝায় তৎসমুদয় থেকে ভগবান প্রিয়তর। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের চরণে শরণ লও। বিষয়-বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা চঞ্চল মনকে বশীভূত করতে চেষ্টা করবে। কৃষ্ণের নামে দুর্মদ কলি ভয়ে পালিয়ে যাবে।"

নাম্মালোয়ার মধ্যযুগে আবির্ভূত হন। ডক্টর হল্টজাচ (Hultzsch) বলেন,—

"Namamalwar must have lived centuries before A.D. 1000."

শৈবাচার্য তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বিরাজ করেন। শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তিরুমঙ্গই আলোয়ার ইঁহার সমসাময়িক ছিলেন।* তিনি নাম্মালোয়ারের কবিত্ব-মাধুর্যে মুগ্ধ হন। তখন পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মনের রাজত্বকাল (খ্রী: ৬২৫-৬৪৫)। অধ্যাপক সুন্দরম্ পিল্লাই বলেন—

"The opening of the seventh century is the latest period that can be assigned to Sambhandar."

তিরুমঙ্গই আলোয়ার নাম্মালোয়ারের সমসাময়িক ছিলেন। অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার নাম্মালোয়ারের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। তিনি বলেন,—

"....we shall have to look for the age of Nammalwar in the period of struggle between Buddhism and Brahminism for mastery in South India and that period is between A.D. 500 and 700."

নাম্মালোয়ার পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহরক্ষা করেন। পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের প্রতি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র আকর্ষণ ছিল না। ভগবানের সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিত। দিব্য ভাবের আবেশে সময় সময় তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহার দুই নয়নে অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইত। তিনি বৃন্দাবনধামের গোপীজনোচিত ভাবে ভগবানের সাধন-ভজন করিতেন। যেন—

"জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি,
পরাণ-পুতলী তুমি জীবনের সখি।
অঙ্গ আভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন।
নিমেখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি
স্বায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি।"

নাম্মালোয়ারের মৃত্যুর পরও মাধুরকবি কিছুকাল জীবিত ছিলেন। তিনি গুরুর আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হন। নাম্মালোয়ারের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি গুরুদেবের একটি প্রস্তরমূর্তি থিরুনগরীতে স্থাপন করেন। তিনি মূর্তিটির প্রাত্যহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক পূজা ও উৎসবের সুবন্দোবস্ত করেন। বর্তমানে মূর্তিটি থিরুক্কুরুগুর নামক দেব-দেউলে স্থাপিত রহিয়াছে। প্রতি বৎসর বহু বৈষ্ণবভক্ত ও সাধক তীর্থদর্শন মানসে এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। নাম্মালোয়ারের স্তোত্র-গাথা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন বৈষ্ণব দেব-মন্দিরে ভক্তিসহকারে গীত হইয়া থাকে।

ভারত ঋষিদের সনাতন ধর্মের লীলাভূমি। সেই গৌরবোজ্জ্বল আধ্যাত্মিকতার তপোভূমি অতীত ভারতকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না, উহার সুদূর অতীতের কাহিনী স্মরণপথে রাখিতে হইবে। আজ পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত। জড় বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিকতার উর্দ্ধে আসন দেওয়ায় পৃথিবী ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। বর্তমান জগতের সভ্যতা যদি ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে মানবজাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ দিব্য-দৃষ্টিতে ইহা লক্ষ্য করিয়াই এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মানবতার আদর্শ বিস্মৃত হইয়া মানুষ আজ আত্মঘাতী লীলায় উন্মত্ত। নানা মতবাদের সংঘর্ষে ধরিত্রী আজ প্রপীড়িতা। অমৃতের পুত্রেরা মৃত্যুভয়ভীত ক্লান্ত অবসন্ন। হে মধ্যযুগের সাধকপ্রবর—আবিরাবির্ম এধি! হে অলোকবিহারী জ্যোতির্ময়ের পূজারী, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র বারতা লইয়া আমাদের মাঝে আবার তোমার 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়' হউক। দ্বেষহিংসাকলুষিত মানবসমাজকে তুমি অমর জীবনের পথে পরিচালিত কর।

* প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫৫।

প্রগতিলীলা—শ্রীসন্তোষকুমার বিশ্বাস। ১৭ বি, প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

ভাগ্য-তাড়িত তরুণ তরুণীর বিচিত্র প্রণয়কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হইলেও ইহাতে দক্ষিণ-তীর্থের বিস্তীর্ণ পটভূমিকাটি হইয়াছে অধিকতর উজ্জ্বল। বহু শতাব্দীর শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাধনাসমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাণধারাটিকে চিনাইয়া দিবার আয়োজন লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। মনোজ্ঞ বর্ণনভঙ্গীর আকর্ষণে লেখক পাঠককেও সেই সুদূর তীর্থরাজির পরিমণ্ডলে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং সেই কারণেই ভ্রমণের নেশার কাছে কাহিনীর কৌতূহল হইয়াছে স্বাদহীন। এটিকে উপন্যাসের লেবেল না মারিয়া দিলেও ক্ষতি ছিল না। অবশ্য বাংলা-সাহিত্যে নামকরা এমন দু'একখানি ভ্রমণ-কাহিনী আছে, যাহার ভ্রমণ অংশকে কাহিনী অংশ অনেকাংশে গ্রাস করিয়াছে। তথাপি সে লেখা রসিকমহলে আদৃত হইয়াছে একটি মাত্র কারণে। সেই সব ক্ষেত্রে কাহিনীর কল্পনা ও ভ্রমণের বাস্তবতাকে লইয়া তর্কের অবকাশ ঘটিলেও রচনায় মধ্যে রসসৃষ্টিই হইয়াছে পাঠকচিত্ত আকর্ষণের মুখ্য বস্তু। আলোচ্য গ্রন্থখানিও এই পর্যায়ে পড়ে। লেখকের দৃষ্টিতে ভারত-তীর্থের প্রকৃত রূপ ধরা পড়িয়াছে এবং শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তিনি ছবির পর ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। ছবিগুলি মোটের উপর সার্থক হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জাতিভেদ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

হিন্দুর বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ ও আধুনিক নানা বিবরণ-গ্রন্থ অবলম্বনে আলোচ্য পুস্তকে জাতিভেদ-প্রথার সূচনা ও ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে বিস্তৃত ও কৌতুককর বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। বেদ পুরাণ স্মৃতিতে এ সম্পর্কে কোথাও কঠোরতা, কোথাও কোথাও বা ঔদার্য ও শৈথিল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবহারের মধ্যে এ বিষয়ে যে প্রচুর বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য বিদ্যমান আধুনিক নানা গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে তাহা অনেকাংশে উল্লিখিত হইয়াছে। সকল প্রদেশের আচার ব্যবহারের নিখুঁত বিবরণ সংগৃহীত ও আলোচিত হইলে এ সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য জানা যাইবে। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার মহাশয় এই বিষয় সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত তথ্যের সমাবেশ ও সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রাচীনকালের নারীজাতির অবস্থার—বিশেষ করিয়া জাতিভেদজনিত তাহাদের দুর্দশা ও দুর্গতির বিবরণ দিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে জানিবার, শিখিবার ও বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রচুর উপকরণ ছড়ান রহিয়াছে। গ্রন্থশেষে সংযোজিত নির্দেশপঞ্জী বিষয়ানুসারে সংকলিত হইলে পাঠকের পক্ষে বেশী উপযোগী হইত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। 'বিধবা বিবাহে'র নির্দেশপঞ্জীতে কয়েক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে—'পাঞ্জাবে বিধবাবিবাহ,' 'বিধবাবিবাহ, কথা সরিৎসাগরে', 'ব্রাহ্মণ-

দের মধ্যে বিধবাবিবাহ'। 'বিধবাবিবাহ' শব্দের সঙ্গেই একত্র এই বিষয়-গুলির উল্লেখ থাকিলে সুবিধা হইত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বৈদিকযুগে বিধবাবিবাহের যে নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ এই পঞ্জীতে নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

সন্ধ্যামালতী—শ্রীআশুতোষ সান্যাল। উষা পাবলিশিং হাউস, ৩৪ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা। মূল্য ১৸৹ মাত্র।

এখানি কাব্যগ্রন্থ। পঁয়তাল্লিশটি কবিতা আছে। আশুতোষ সান্যাল সুকবি। পাণ্ডিত্যের ভারে কোথাও তাঁহার কবিতা ক্লিষ্ট হয় নাই। একটি সহজ, ঋজু এবং আন্তরিক প্রকাশভঙ্গী কবিতাগুলিকে উপভোগ্য করিয়াছে। বর্ত্তমানের রূপ কবিকল্পনাকে পীড়িত করিতেছে বলিয়া লেখক বলিতেছেন, "বাঁশরীর সুর ছাপি' উঠে সদা হায়, কল্পান্তের তূর্য্যনাদ।" যে সময়ে "আসে ধেয়ে ব্রহ্মাণ্ড অখিল রক্ত-আঁখি,"

"সে সময় শুনি তব ভৈরব আহ্বান,
হে কবি, আপন মনে গাহ তুমি গান।"

একটি কবিতায় পাই,

"বনের কাঁটা তুলতে পারি, মনের কাঁটা যায় না তোলা,
মরমে যা রইলো গাঁথা, সহজে তা যায় কি ভোলা?"

'অন্তর্হিতা'য় লেখক বলিতেছেন,

"লুকিয়ে আছে, হারায় নিকো, আছে চোখের আড়ালে,
জানি আমি আসবে ছুটে দুখানি হাত বাড়ালে।"

ব্যথিতের জিজ্ঞাসা—

"সন্ধ্যামালতী, বলিতে পারিস, কে তোরে বাসিত ভালো?
দিনের অন্তে সাজাতিস্ তুই কার কুন্তল কালো?"

"ভৈরবী আর পুরবীতে মিলন হ'ল আমার চিতে" বলিয়া মন কেবলই প্রশ্ন করে, "ভাল কি লাগিবে মোর ভালবাসা, আমার স্বপন-কল্পনা-আশা?" কেদারবাহিনী গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া শেষে লেখক বলিতেছেন,

"দিবি কি মা, একবার দগ্ধ প্রাণের 'পর তুহিন শীতল কর বুলায়ে?"

"সন্ধ্যামালতী"র মধ্যে যে একটি করুণ মধুর সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহা কাব্যামোদী পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বাঙালী—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—সিটি কলেজ, বাণিজ্য বিভাগ, কলিকাতা। মূল্য ২৲। পৃষ্ঠা ১৪৩।

এই গ্রন্থে সাতটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার বাঙালী জাতির বহু সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যায়গুলির নামকরণ—এইরূপ 'আমরা বাঙালী', 'ইতিহাসের পাতায়', 'সমাজের রূপ ও রূপান্তর', 'অর্থনীতির সন্ধানে', 'সংস্কৃতির ধারণা', 'যদিও সন্ধ্যা' এবং 'বন্ধ করো না পাখা'। এই নামকরণ হইতেই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে পারা যায়। বহু বিশিষ্ট বাঙালী ও অবাঙালী লেখকের মতামত উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার ও সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য লেখকের যুক্তি ও মতের সহিত সকলে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু একথা সত্য যে তাঁহার তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনাপদ্ধতি

উত্তম হইয়াছে। বিষয়বস্তুতে লেখক যতটা মনোনিবেশ করিয়াছেন প্রকাশভঙ্গির দিকে ততটা দৃষ্টি রাখেন নাই। তবে গ্রন্থকার পুস্তকখানি দরদ দিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া পাঠকমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিবেন। বাংলার ১৬৬০, ১৭৩০, ১৯০৫, ১৯১২ এবং ১৯৪৭ সালের মানচিত্র ও কয়েক বৎসরের জনসংখ্যার হিসাব পুস্তকখানিকে তথ্যের দিক দিয়া মূল্যবান করিয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মিলনবাণী (২য় সংস্করণ)—স্বামী সিদ্ধানন্দ। কলিকাতা সারস্বত সঙ্ঘ—২৬, বিডন ষ্ট্রীট। মূল্য এক টাকা।

আমি কি চাই—শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংস। হালিসহর দক্ষিণ-বাংলা সারস্বত আশ্রম হইতে শ্রীমৎ নলিনী ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চার আনা।

বই দুখানি ঠাকুর শ্রীশ্রীনিগমানন্দের প্রদত্ত উপদেশাবলীতে পূর্ণ। প্রথমখানি পদ্যে রচিত—তাহাতে হালিসহরের আশ্রমের আচার-অনুষ্ঠানাদির বর্ণনাও কতক আছে। দ্বিতীয়টিতে ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত চল্লিশটি বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভক্ত পাঠকপাঠিকা পুস্তক দুখানি পাঠে উপকৃত হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

কবিতা চ্যাটার্জী—শ্রীকুমারকৃষ্ণ বসু। বেলেভিউ পাবলিশার্স। পি ১৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ। কলিকাতা—৫। মূল্য ২৲।

উপন্যাসখানিতে বস্তুর চেয়ে ভাবাবেগের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইল। তদুপরি ইহার স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের একখানি অতিপরিচিত উপন্যাসের ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও কিন্তু পুস্তকখানিতে লেখকের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ভাল, কিন্তু শব্দ প্রয়োগে কিছু কিছু ভুল আছে। প্রচ্ছদপট মনোরম।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সঙ্কল্প ও সাধনা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। ভারতী বুক ষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ১া০।

ব্রিটিশাধিকারের প্রথম যুগ থেকে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত ভারতবাসী ইংরেজের অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদের সঙ্কল্প নিয়ে ঐকান্তিক সাধনার বলে কিরূপে মুক্তিলাভের পথে ধাপে ধাপে প্রস্তুত ও অগ্রসর হয় এবং অবশেষে স্বরাজলাভে সফলকাম হয়, কয়েকটি সুলিখিত ধারাবাহিক অধ্যায়ে গল্পের মত করে গ্রন্থকার কিশোরদের শিক্ষার জন্য তাই লিখেছেন। বইখানি সংক্ষেপে লেখা হলেও প্রচুর জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ এতে আছে। এখানি গ্রন্থকার প্রণীত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রত্যেক ছাত্রের জানা আবশ্যক। গ্রন্থখানি ছাত্রদের হাতে দেখলে আনন্দিত হব।
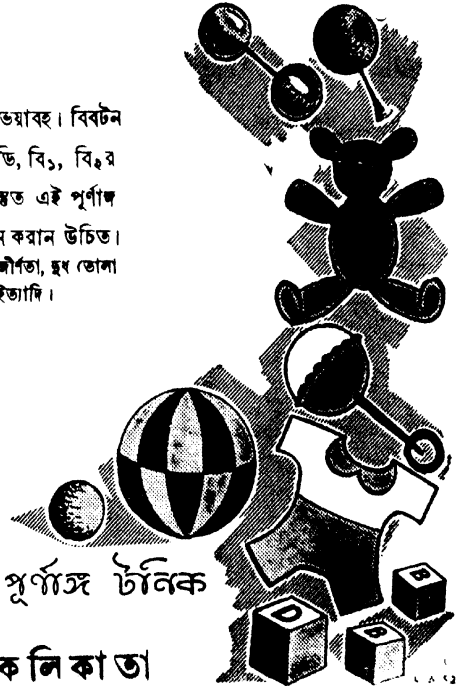
(১) ছোটদের রামায়ণ, (২) ছোটদের জাতক, (৩) ছোটদের ঈসপ, (৪) ছোটদের গ্রিম, (৫) ছোটদের রবিন-হুড—শ্রীতারাপদ রাহা। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা; (১) মূল্য ৸৹, ২, ৩, ৪, ৫, প্রত্যেকখানির মূল্য ।৹।

প্রথম ভাগ শেষ করেই শিশুগণ যাতে সহজেই নানারকম চিত্তাকর্ষক গল্পের বই পড়ে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এই যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত বইগুলি লিখেছেন। গল্পগুলি শিশুবোধ্য সহজ ও চিত্তহারী ভাষায় লিখিত। উৎকৃষ্ট কাগজ, বহু একরঙা ও রঙীন ছবি এবং সুন্দর সচিত্র মলাট বইগুলিকে বিশেষ লোভনীয় করেছে।

ছোটদের প্রথম ভাগ—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। বোর্ড বাঁধাই, মূল্য ৸৹।

বইখানিতে দুটি নূতন জিনিষ দেখা যায়। প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা বর্ণমালা শেখবার ও লেখবার সুবিধার জন্য একটা অক্ষর থেকে কেমন করে দুটো তিনটে এমন কি পাঁচটা সাতটা পর্য্যন্ত অক্ষর রূপান্তর গ্রহণ করেছে, বড় বড় অক্ষর সাজিয়ে কয়েক পৃষ্ঠায় তাই দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকের শেষে কাগজের থলির মধ্যে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষর এবং ইকার-উকার মাত্রাক্ষরগুলি আলাদা আলাদা কেটে পুরে রাখা হয়েছে। এইগুলি চিনে ও সাজিয়ে শিশুরা যথেষ্ট আমোদ পাবে, সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর এবং বানানও ভালরূপে শিখে নিতে পারবে। প্রচুর উৎকৃষ্ট চিত্র ও ঝরঝরে টাইপে ছাপা প্রশংসনীয়।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

পদ্মদীঘির বেদেনী—শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৸৹।

'কল্লোলে'র যুগে যে কয়জন তরুণ কথাসাহিত্যিকের রচনায় শক্তির পরিচয় পাইয়া পাঠক-সম্প্রদায় তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। দীর্ঘকাল সাহিত্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া তিনি পুনরায় অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ রচনাসম্ভার লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে পূর্ব্ববঙ্গের সমাজ-জীবনের নীচুতলার একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক উদ্ঘাটিত হইতেছে।

নদীমাতৃক দেশ পূর্ব্ববঙ্গের বেদেরা যাযাবর-সম্প্রদায়। বিচিত্র তাহাদের জীবনধারা। সারা জীবন তাহারা নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়া বেড়ায়—গ্রামে গ্রামে গৃহস্থদের বাড়ীতে গিয়া দেখায় সাপের খেলা, কোথাও তাহারা ঘর বাঁধে না। জাতিতে তাহারা মুসলমান, কিন্তু একান্ত ভক্তিভরে মা মনসার পূজারতি করে। এই বেদে-সম্প্রদায়ের এক দম্পতি—ময়না আর তার স্বামী—এক শ্যামল পল্লীর ক্রোড়ে ভগ্নজীর্ণ, পরিত্যক্ত শ্রীহীন, নির্ব্বংশ জমিদার-বাড়ীর নিকটে পদ্ম-দীঘির তীরে আসিয়া নীড় বাঁধিল। কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে ময়নার স্বামী অকালে মরিল সর্পাঘাতে। তার পর পদ্মদিঘীর সেই

নিঃসন্তান বেদেনীর জীবনে আবির্ভাব হইল বৈষ্ণব সাধু ভৈরবের। সাধু তাহাকে গেরুয়া বাস ধরাইল, দীক্ষা দিতে চাহিল বৈরাগ্যমন্ত্রে কিন্তু সন্তানহীনা বেদিনীর হৃদয়ে মাতৃত্বের নিদারুণ বুভুক্ষা—তাহার কণ্ঠে আকুল স্বরে ধ্বনিয়া উঠিল—"তুই হামাকে একটি ছেলে দে গোঁসাই।" ভৈরব কিন্তু পাষাণ-দেবতার মত নির্ব্বিকার। নারীর এই আকুল আকুতি তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না—একতারাটি হাতে লইয়া সে পাড়ি জমাইল অজানার উদ্দেশ্যে;—ইহাই পদ্মদীঘির বেদেনীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

কাহিনী-বর্ণনায় স্থানে স্থানে অস্বাভাবিকত্ব এবং অসঙ্গতি থাকিলেও লেখক যে শক্তিমান সে পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ রাজাসাহেবের বহরে পানোন্মত্ত বেদে ও বেদেনীদের ভোগলালসা পঙ্কিল উৎসব-রজনীর যে বর্ণনাট লেখক দিয়াছেন তাহা একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের প্রকৃতি-বর্ণনার হাত বড় মিঠা। এই উপন্যাসে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীঅঞ্চলের একটি অপূর্ব্ব ছবি লেখকের তুলিকায় নিপুণভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বনজঙ্গলবেষ্টিত কচুরিপানায় পরিপূর্ণ বিরাট পদ্মদীঘি যেন পাঠকের চোখের সামনে মায়াজাল বিস্তার করে।

ত্রিলোচন কবিরাজ—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অকালে পরলোকগমন করিলেও রবীন্দ্র মৈত্র বাংলা কথা-সাহিত্যে স্বকীয় প্রতিভার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। যেমন করুণ রসের অবতারণায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তেমনি ব্যঙ্গ রচনায়ও তাঁর জুড়ি ছিল না। 'ত্রিলোচন কবিরাজ' একখানি গল্পের বই। ইহাতে ত্রিলোচন কবিরাজ, অল ইয়ার ট্র্যাজেডি, নারী নির্যাতন, জোয়ার, সংস্কারক, একটি আধুনিক গল্প, শেষ পৃষ্ঠা এই কয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। প্রায় সব কয়টি গল্পই ব্যঙ্গাত্মক, কিন্তু শুধু ব্যঙ্গই গল্পগুলির একমাত্র উপজীব্য নয়। কাহিনীর ভিতর দিয়া লেখক মানুষের ভণ্ডামি, ন্যাকামি ইত্যাদিকে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন।

এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ এবং অপূর্ব্ব গল্প জোয়ার। দাম্পত্য কলহকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি রচিত। গল্পটি রসপ্রাচুর্য্যে টলটল করিতেছে। স্বামী-স্ত্রীর কলহের অবসানে যে ভাবে তাহাদের পুনর্ম্মিলন ঘটানো হইয়াছে তাহাতে অভিনবত্ব আছে। রবীন্দ্র মৈত্রের চোখ ছিল হিউমারিষ্ট বা হাস্য-রসিকের চোখ। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ঘটনার মধ্যেও যে একটা কৌতুকের দিক থাকে তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। গুরুগম্ভীর বিষয়ের বর্ণনা করিতে করিতে একটি মাত্র উপমায় বা সামান্য দুটি হাল্কা কথায় কৌতুকরসের অবতারণা দ্বারা contrast সৃষ্টির যে রীতি রবীন্দ্র মৈত্রের শেষের দিকের রচনা, বিশেষতঃ ঘৃতকুম্ভকে একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল 'জোয়ার' গল্পটিতে তার আভাস পাওয়া যায়। গল্পের উপসংহারটি লেখনীর উপর লেখকের অসাধারণ সংযম এবং মাত্রাবোধের পরিচায়ক।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

মহাচীন—শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়। বীণা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ৮+২৪০। মূল্য চারি টাকা।

মহাচীনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছেদ সম্প্রতি অনেকটা টানা হইয়াছে। 'অনেকটা' বলিতেছি এইজন্য যে স্বার্থান্ধ বিদেশীর চেষ্টায় যে উহা পুনরায় জাগরিত হইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই মহাচীনের কথা জানিবার জন্য উৎসুক নয়, এরূপ লোক বিরল। সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের দিক হইতে ভারতবাসী আমরা চীনাদের আত্মীয় বলিয়া মনে করি। এখানে চীনের কথা জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকা তো স্বাভাবিক। সুধাংশুবিমলের এই পুস্তকখানি পাঠকের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবে, এবং নূতন অনুসন্ধিৎসারও উদ্রেক করিবে। মহাচীনের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্ম্ম ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নানা তথ্যে ইহা সমৃদ্ধ। চীনের পুরাতন ইতিহাস অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। আধুনিক চীনের কথাই ইহাতে বিশেষভাবে লেখক বলিয়াছেন। চীনের আভ্যন্তরিক ইতিহাস, পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে তাহার যোগ, পাশ্চাত্ত্য কূটনীতির ছলাকলায় তাহার আর্থিক ও সামাজিক অবনতি, এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার হানি, মাঞ্চুরাজের নির্যাতন—এসকল মিলিয়া যে এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, যুগমানব সান-ইয়াৎ সেনের কর্ম্মকুশলতায় তাহা অনেকাংশে বিদূরিত হয় এবং চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সান-ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর চীনের নেতৃত্ব চিয়াংকাইশেকের হস্তে পতিত হইলে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ তাহা ভীষণাকার ধারণ করে। ১৯৩৭ সনে জাপান কর্ত্তৃক চীন আক্রান্ত হইলে চিয়াংপন্থী জাতীয় দল এবং মাও-সে-তুং ও চু তে প্রমুখ সাম্যবাদীরা একত্র হইয়া তাহা প্রতিরোধ করিতে থাকে। গত মহাযুদ্ধেও এই মিলন বজায় ছিল। কিন্তু মহাসমর অন্তে আবার অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। গত কয়েক বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সাম্যবাদীরা বর্ত্তমানে চীনের শাসনতন্ত্র দখল করিয়া লইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিবৃত করা সম্ভব হয় নাই, তথাপি পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ই সরল ভাষায় লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। এখানি পাঠে পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে। পুস্তকখানি সচিত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

চারুচন্দ্র ঘোষ

অখণ্ড বঙ্গের রেশম বিভাগের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা (Dy. Director of Sericulture) চারুচন্দ্র ঘোষ, বি. এ., এফ, আর. ই. এস (লণ্ডন) মহাশয়ের পরলোকগমনে বাংলাদেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। ঘোষ মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়-গুণে কর্ম্মজীবনে সবিশেষ খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুষা কৃষি-গবেষণাগারে কীটতত্ত্ব বিষয়ে একজন সাধারণ সহকারীরূপে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। তিনি ভারতীয় কীটপতঙ্গ বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ কীটতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্সওয়েল লেফরয়ের সহকারী হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন এবং পরবর্ত্তী কালে কীটতত্ত্ববিদ্রূপে প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন। ব্রহ্মদেশে কৃষি-বিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ববিদ্রূপে কাজ করিবার সময় তিনি ব্রহ্মদেশে রেশম-শিল্পের উন্নতি-সাধনে ও প্রসারে সমর্থ হন। পরবর্ত্তীকালে তিনি জাপান, ফ্রান্স, ইটালি, আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দেশীয় রেশম-শিল্প বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করেন এবং অবশেষে ভারত-সরকারের আনুকূল্যে "জাপানের রেশম শিল্প" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় রেশম বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় বাংলায় রেশম-শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

তাঁহার কার্য্যকালে কেন্দ্রীয় রেশম-শিল্প গবেষণা বিদ্যালয় এবং কলিকাতা রেশম-পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। তাঁহার বাংলার সমস্যা", "জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে", বাংলার "রেশম শিল্প", "ভারতে রেশম উৎপাদন ও বয়ন" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সুলিখিত।

ব্রজসুন্দর রায়

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ব্রজসুন্দর রায় ৭৫ বৎসর বয়সে দেহ-ত্যাগ করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ একজন একনিষ্ঠ সেবক হারাইল। শ্রীহট্টের রাণিয়াচঙ্গে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিবার জন্য তাঁহাকে কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইয়াছিল। শিক্ষা যখন শেষ হইল এবং লোকে যাকে 'সুখের মুখ' বলে তাহা দেখিবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন আসিল বাঙালী জীবনে 'স্বদেশী'র বন্যা। ব্রজসুন্দর নীরবে তাহাতে অবগাহন করিলেন; রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ লইলেন। তার পর বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক রূপে, কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপকরূপে, শিলং কীন কলেজের অধ্যক্ষরূপে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। জীবনের শেষ ২।৩ বৎসর তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র, 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নানা ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার সশ্রদ্ধ আলোচনা এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল।

নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বাঙালী সংস্কৃতির বন্ধু, বাংলা সাহিত্যের সেবক এই ব্যবসায়ীপ্রধান ৬৪ বৎসর বয়সে অনেক কর্ম্ম অপূর্ণ রাখিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। কর্ম্মজীবনে বাঙালী জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপক চেষ্টা তাঁহার ছিল, আবেগ ছিল অফুরন্ত। সেই আবেগের প্রেরণায় তিনি বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির একজন মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়াছে; অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা তাঁহার পথে নানা বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ আপনার জ্ঞান-বিশ্বাসের জোরে চলিয়া বৈষয়িক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ তাঁহাকে নিজ প্রদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিস্তারে সক্ষম করিয়াছিল এবং এই প্রীতির জন্যই তাঁহার নাম বাঙালী সাহিত্যের অনুরাগীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। তাঁহার নিকট বাঙালীর ঋণ অপরিসীম।

শৈলেশ্বর সিংহ রায়

বিলীয়মান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একজন প্রতিভূ পশ্চিমবঙ্গ হইতে মৃত্যুর কোলে চলিয়া গেলেন। বর্দ্ধমান চকদীঘির জমিদার-পরিবারের শৈলেশ্বর সিংহ রায় ৫৬ বৎসর বয়সে গত ১১ই মাঘ তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯২৬ হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত তিনি পুরাতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন; প্রায় ২৫ বৎসর তিনি বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের সভ্য ছিলেন; আলীপুর চিড়িয়াখানার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার নানা উন্নতি-বিধায়ক কার্য্যে তাঁহার নীরব নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়; প্রাচীন আভিজাত্যের যে একটা সামাজিক দায়িত্ববোধ ছিল, শৈলেশ্বর সিংহ রায়ের চরিত্রে তাহা ছিল দেদীপ্যমান। তাঁহার পিতা শ্রীমণিলাল সিংহ রায় প্রায় ৪০ বৎসর বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের কর্ণধার ছিলেন; শৈলেশ্বর ছিলেন তাঁহার সর্ব্ব-কার্য্যের সহায়ক। পিতা ৮৩ বৎসর বয়সে বাঁচিয়া আছেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
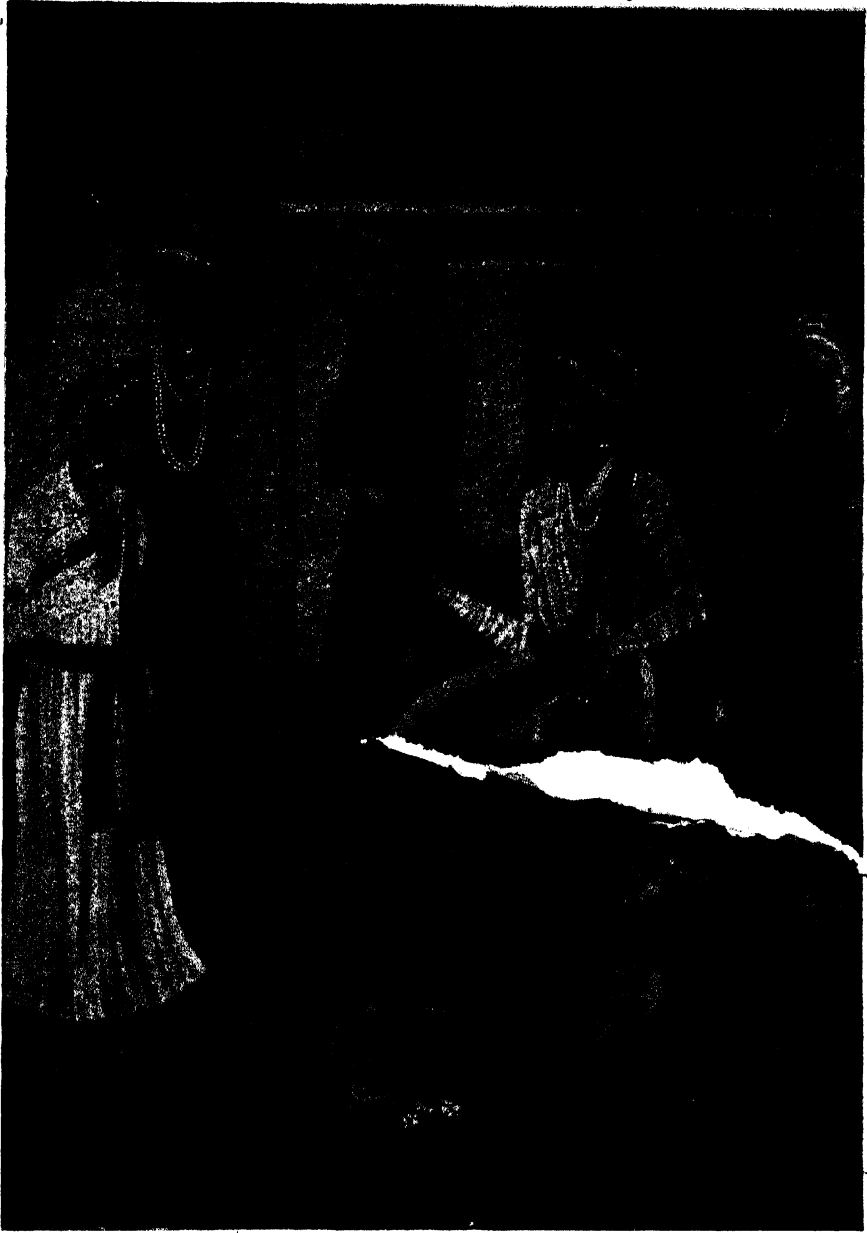
শাহ্‌জাহানের দরবারে পারস্য-দূত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়
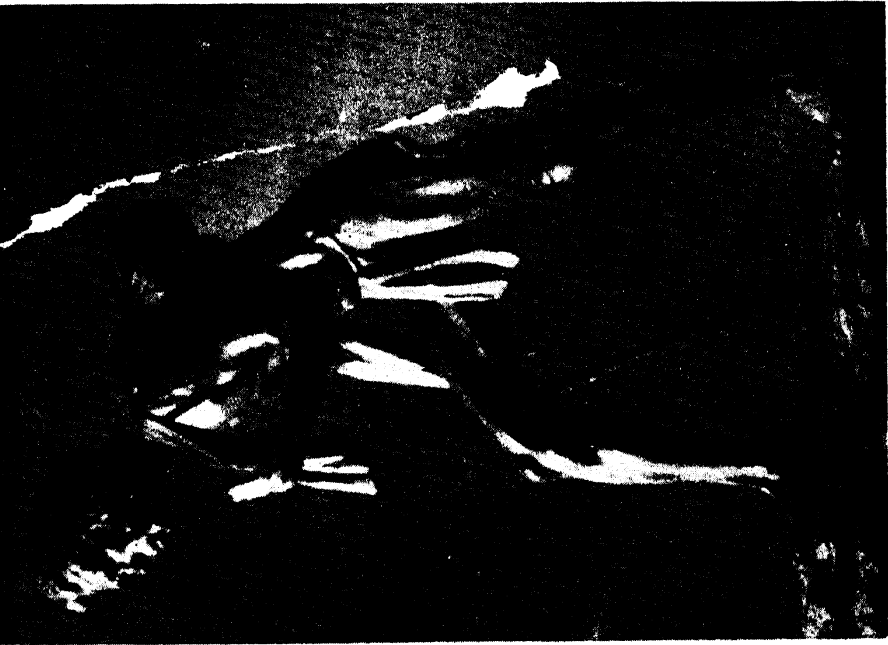
দূরের যাত্রী (ব্রোঞ্জ)
ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
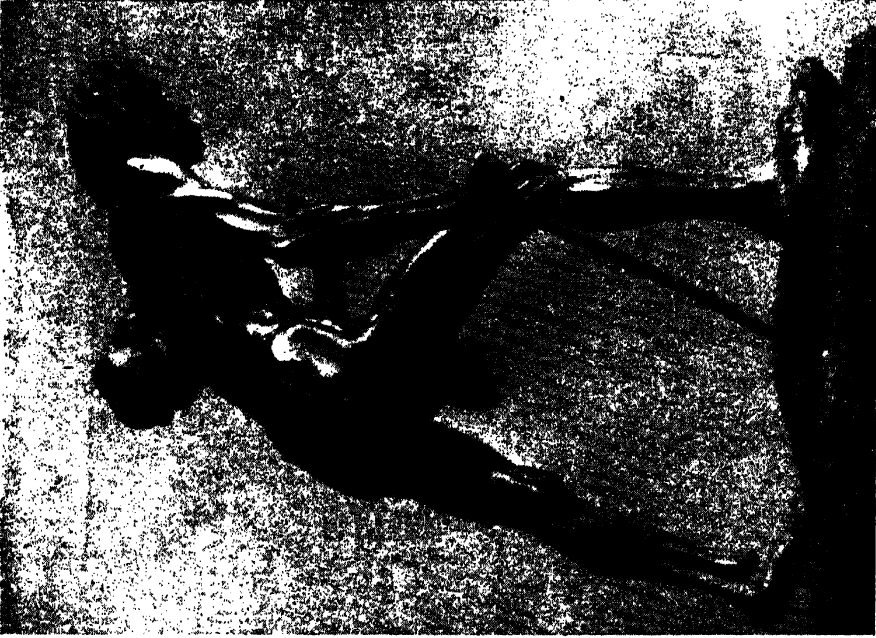
দূরের যাত্রী (ব্রোঞ্জ)
ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৪৯শ ভাগ
২য় খণ্ড
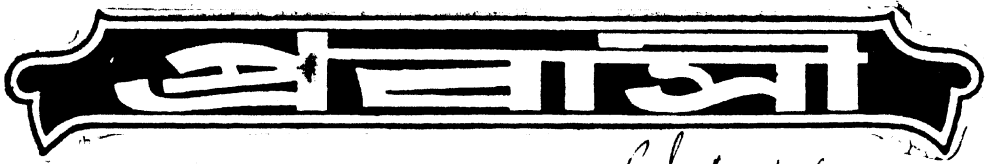
চৈত্র, ১৩৫৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাস্তব ও অবাস্তব যুদ্ধ

অল্পদিন পূর্ব্বে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি প্রবলভাবে উঠিয়াছিল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে যুদ্ধের দাবি ইতিহাসে খুব কম আছে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় সওয়া কোটি হিন্দু নরনারী যে বিভীষিকা ও অপমানের মধ্যে বাস করিতেছেন তাহাতে বাংলার ও ভারতের মন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে এবং বাঙালী মানবতার অপমানের প্রতিকারকল্পে যুদ্ধ চাহিতেছে।

যুদ্ধের দাবী ও যুদ্ধের আহ্বান যে কি বস্তু তাহা দীর্ঘ তিন-চার শতাব্দীর দাসত্বে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমানে যে আবেগ আন্দোলনের মধ্যে "যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই" বলিয়া চিৎকার উঠিয়াছে তাহা অবাস্তবের পর্য্যায়ে পড়িতেছে।

যুদ্ধের আহ্বান আসিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝা যায় কে লড়িবে কাহার সঙ্গে। "যুদ্ধ ঘোষণা কর" এই চিৎকার তখনই বাস্তব রূপ গ্রহণ করে যখন আহ্বানকারী বলে "আমি লড়িব" বা "আমি পুত্র, পাত্রমিত্র, আত্মীয়স্বজন লইয়া যুদ্ধে নামিব।" এরূপ না হইলে সে যুদ্ধের আহ্বান অবাস্তব। যিনি যুদ্ধ ঘোষণা চাহিতেছেন তাঁহার সেই সঙ্গেই বলা প্রয়োজন যে যুদ্ধের অনলে তিনি কি আহুতি দিতে প্রস্তুত আছেন ; নহিলে তাঁহার সে আবেগ বৃথাই যাইবে। বাঙালীরই আত্মীয়-স্বজন ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে, তাহাদের যাতনার আর্ত্তনাদ আমাদের হৃদয়েই বিঁধিয়াছে বেশী, কিন্তু যুদ্ধের দাবিতে দেখিতেছি যেন আমরা চাই আমাদের হইয়া মান্দ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত, শিখ, পঞ্জাবী, বিহারী ও হিন্দুস্থানী বাঙালীর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে নামে।

যদি দেখিতাম যুদ্ধের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে শত-সহস্র বাঙালী যুবক সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে চলিয়াছে, যদি দেখিতাম বাংলার রক্ষীদলে অস্ত্রশিক্ষা ও যুদ্ধশিক্ষার জন্য হাজারে হাজারে ছেলের দল চলিয়াছে, তবে বুঝিতাম এই "যুদ্ধ চাই" কলরবের পিছনে পৌরুষ আছে, ক্ষাত্রধর্ম্মের উদ্দীপনা আছে। সেরূপ অবস্থার অভাবে আমরা বুঝিতে বাধ্য যে এই যুদ্ধের আহ্বান বাঙালীর আকুল হৃদয়ের অবাস্তব উচ্ছ্বাসমাত্র। যুদ্ধ এভাবে হয় না ও হওয়া উচিতও নয়।

যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তাহার দিকে বাঙালী যুবকদিগের মন দিতে না দেখিয়া আমরা কিন্তু আশ্চর্য্য হইতেছি। রক্ষীবাহিনীতে শিক্ষালাভের সুযোগ যুবকেরা গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। স্থিরবুদ্ধি লোকমাত্রেই জানেন যে, প্রস্তুত না হইয়া যুদ্ধে নামা পরম অনিষ্টকর হইবে। যুদ্ধ করিতে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ দখলে হয়ত বেশী সময় না লাগিতেও পারে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। তখন আবার যুদ্ধের রক্তপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গেই ইনফ্লেশন, কণ্ট্রোল, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি যুদ্ধকালীন নানা-বিধ অসুবিধা দেখা দিবে। তার উপর আছে আভ্যন্তরীণ পাকিস্থানী ও কম্যুনিষ্টদের অরাজকতা সৃষ্টির ভয়। যুদ্ধে নামিতে হইলে সমস্ত দিক যত্ন সহকারে বিবেচনা ও বিচার করিতে হইবে। কাজেই ইহা সময়সাপেক্ষ। পাকিস্থান নিজে যদি যুদ্ধ আরম্ভ করে তাহা হইলে দেশরক্ষার আয়োজন কি হইবে তাহাও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কাশ্মীরে বরফ গলার পর পাকিস্থান যদি আবার সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ করে, যুদ্ধ বিরতির সর্ত্ত যদি ভঙ্গ করে তবে হয়ত ভারতবর্ষকে পঞ্জাব ও পূর্ব্ববঙ্গে তার জবাব দিতে হইতে পারে। পণ্ডিতজী বিনা কারণে কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গকে এক সূত্রে গাঁথেন নাই। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে প্রস্তুতির প্রয়োজন, আমরা কি তাহা করিতেছি ?

আমাদের হাতে যুদ্ধ ছাড়াও বড় অস্ত্র আছে, উহা হইতেছে 'ইকনমিক্ স্যাংসন' অর্থাৎ আর্থিক অবরোধ। পাকিস্থানকে অনেক জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। কাঁচা পাট ও তুলা বিদেশে বেচিয়া তাহারা এমন বৈদেশিক মুদ্রা পায় না যাহা দ্বারা ভারতবর্ষকে বাদ দিয়া তাহারা চলিতে পারে। এ কথাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার। ইহা ভিন্ন আমাদের হাতে আছে পশ্চিম পঞ্জাবের জল সেচের দুইটি প্রধান মুখ, পাকিস্থান-পঞ্জাবের উত্তর অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের মুখ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের চলাচলের জলপথ ও আকাশ-পথ।

পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা এখন একটি সর্ব্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু ইহাকে কাশ্মীর সমস্যার সহিত সমান পর্য্যায়ের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে পূর্ব্ববঙ্গের ব্যাপারের প্রতি আমাদের সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একমাত্র ঢাকার ঘটনার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গে গোলযোগের যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহাই পূর্ব্ববঙ্গের শোচনীয় অবস্থা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির পর ফেণী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা হইতে যে সমস্ত হত্যা, লুণ্ঠন, নারী-হরণ ও ট্রেন আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ হইতেছে যে হয় পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট সেখানে শান্তিরক্ষায় একেবারে অক্ষম, নতুবা বর্ত্তমান অত্যাচারের পিছনে তাঁহাদের পরোক্ষ সমর্থন রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যাহা ঘটিয়াছে তাহা সরকারী প্রেস নোটে প্রকাশিত হইতেছে এবং আমরা ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাইতেছি যে প্রেস নোটে সত্য কথাই বলা হইয়াছে। প্রেস নোট সম্বন্ধে বরং হিন্দুদের অভিযোগ আছে যে তাহাদের উপর বেশী করিয়া দোষারোপ হইয়াছে, মুসলমানদের অন্যায় কার্য্যের উল্লেখ প্রেস নোটে কম আছে। পার্ক সার্কাসের ঘটনা সম্পর্কিত প্রেস নোট ইহার নিদর্শন; সেখানকার গোলযোগের দিন হিন্দু-বাড়ীতে যেমন বোমা পাওয়া গিয়াছে, তেমনি মুসলমান বাড়ী হইতে অস্ত্র উদ্ধার হইয়াছে; কিন্তু প্রথমটির উল্লেখ প্রেস নোটে আছে, শেষেরটির উল্লেখ নাই।

পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টের প্রেস নোটের সহিত যেমন সত্য সংবাদের অমিল খুব কম, পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট তার বিপরীত, উহার সহিত সত্যের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। অন্ততঃ প্রকাশিত সংবাদের সহিত পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোটের কোনই মিল নাই। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মৌলবী নুরুল আমীন সেখানকার ঘটনাবলী সম্পর্কে ১০ই মার্চ্চ পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ "পাকিস্থান অবজার্ভার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের ঘটনাবলী চাপা দিবার এবং উহার দায়িত্ব ভারতের উপর চাপাইবার যে অপপ্রয়াস পাকিস্থানে চলিতেছে, এই বিবৃতি তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের প্রেস নোট এখানে বিশেষ পাওয়া যায় নাই, পূর্ব্ববঙ্গ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতেই সমস্ত ঘটনার সরকারী বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। মৌলবী আমীনের প্রধান বক্তব্য এই :

(১) বৎসরাধিক কাল যাবৎ 'মাইনরিটি প্রটেকসন কাউন্সিল' পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের কাল্পনিক দুর্দ্দশার কাহিনী প্রচার করিতেছে; পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রসমূহের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াইতেছে, ভারত বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে, ডিসেম্বর নাগাদ এই কাউন্সিল ও হিন্দু মহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটাইয়াছে।

(২) সেপ্টেম্বর মাস হইতে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্টের বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটি আইন প্রয়োগ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন (flatly refused)।

(৩) ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট বা ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে দিতে পারে না এই কারণে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট আন্তঃ-ডোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে হিন্দু মহা-সভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেণ্টকে চাপ দিয়াছে কিন্তু ফল তো হয়ই নাই বরং তাহাদের পাকিস্থান-বিরোধী ও মুসলিম-বিরোধী প্রচারকার্য্য সভা ও সংবাদপত্র মারফত চালাইতে দেওয়া হইয়াছে।

(৪) ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার সম্মেলন হয় এবং তার পর হইতে অখণ্ড ভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বলপূর্ব্বক পাকিস্থান-দখল এবং ভারতীয় মুসলমানদের "জাতীয়করণের" (nationalisation) কথা ঘোষিত হইতে থাকে। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম-বিরোধী মনোভাব বাড়ে।

(৫) ১৫ই জানুয়ারী সর্দ্দার প্যাটেল কলিকাতার বক্তৃতায় মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং ১৯৪৬ সালের কলিকাতা দাঙ্গা সম্বন্ধে অত্যন্ত অসন্তোষজনক মন্তব্য করেন এবং বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের সীমারেখা কৃত্রিম; পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত হইতে পূর্ব্ববঙ্গের "ভ্রাতাদের" "সাহায্যে" লোক গেলে তিনি বাধা দিতে পারিবেন না। সর্দ্দার প্যাটেলের মনোভাবকে রূপ দেওয়ার জন্য সম্পাদকীয় মন্তব্য, প্রাচীরপত্র, পুস্তিকা প্রভৃতি আবির্ভূত হয়।

(৬) ২০শে ডিসেম্বর বাগেরহাটের ঘটনা ঘটে, উহা সাম্প্রদায়িক নহে, পুলিশের সহিত কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত জনতার সংঘর্ষ। সর্দ্দার প্যাটেলের বক্তৃতার পর ১৮ই জানুয়ারী আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় বাগেরহাটের ব্যাপার লইয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা যদি সত্যই সাম্প্রদায়িক হইয়া থাকিবে তবে এক মাস তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন কেন?

(৭) এইভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া হিন্দু মহাসভা এবং মাইনরিটি প্রটেকসন কাউন্সিল ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় হাঙ্গামা আরম্ভ করায়। ১৯শে জানুয়ারী বনগাঁয়

মসজিদ অপবিত্রকরণ প্রভৃতি ঘটে। ২১শে জানুয়ারী জে পি মিত্র স্বয়ং বনগাঁয় মহাসভা ও তাঁহার কাউন্সিলের একটি মিলিত সভায় বক্তৃতা করেন। ২৪শে জানুয়ারী বহরমপুরে মহাসভা একটি বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করে। এই সভার পরেই হিন্দুরা গোরাবাজারের মুসলমানদের আক্রমণ করে। ২৬শে জানুয়ারী উল্টাডাঙ্গা, বেলিয়াঘাটা ও মাণিকতলায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ২৯শে জানুয়ারী বাটানগরে মাইনরিটি কাউন্সিল সভা আহ্বান করে। ৫ই ফেব্রুয়ারী সেখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়।

(৮) জানুয়ারীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বাগের-হাটের ঘটনা লইয়া কিরূপ প্রচার কার্য্য চলিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট তাহা জানিতে পারে নাই। ৩রা ফেব্রুয়ারী বাগেরহাটের ঘটনার বিবরণ দিয়া আমরা প্রেস নোট বাহির করি। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বিধান রায় উহার তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে আমাদের প্রেস নোটটি—যাঁহারা ঘটনা ভাল করিয়া জানেন না তাঁহাদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রচারিত হইয়াছে।

(৯) ৬ই ফেব্রুয়ারীর প্রেস নোটে পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট প্রথম স্বীকার করিলেন যে সেখানে ব্যাপকভাবে হাঙ্গামা হইয়াছে। তবে এই প্রেস নোটে বলা হয় যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উত্তেজনা দেওয়াতেই ঐরূপ ঘটে। ইহার ফলে কলিকাতা এবং উহার কারখানা অঞ্চলে দুই দিন পরে ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হয়।

(১০) পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট ইহার পরেও প্রেসনোটে এমন সব কথা বলেন যাহাতে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সুবিধা হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ রায় বলেন—"অসুবিধা এই যে পূর্ব্ববঙ্গে যে ঠিক কি ঘটিতেছে তাহা জানা যাইতেছে না, তবে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে লোক আসার মত (৩০ হাজার বনগাঁয়ে ইতিমধ্যেই আসিয়াছে) এবং এখানে মাইনরিটিদের ভীত হওয়ার মত কোন কোন ঘটনা সেখানে ঘটিয়াছে।" অথচ এই দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে নাই।

আসাম হইতে ৫ লক্ষ মুসলমান বিতাড়নের প্রস্তাবে পূর্ব্ব-বঙ্গে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানুয়ারীর শেষের দিকে করিম-গঞ্জ হইতে বহু অস্বস্তিকর সংবাদ আসে। ৩রা ফেব্রুয়ারী লামডিং-এ মুসলমান যাত্রীরা আক্রান্ত হয়।

(১১) এই অবস্থায় ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় উভয় বঙ্গের চীফ সেক্রেটারীদ্বয়ের সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহাদের মধ্যে যে চুক্তি হয় পূর্ব্ববঙ্গের সংবাদপত্রগুলি তাহা পালন করে এবং পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

(১২) ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ভারত বিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গে ইহাই প্রথম দাঙ্গা। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে উৎপীড়িত মুসলমানেরা ঢাকা আসার পর উত্তেজনা জন্মে। যে দিন দাঙ্গা আরম্ভ হয় সেই দিনই সন্ধ্যায় ইষ্ট পাকিস্থান রাইফেল, সশস্ত্র পুলিশ এবং মিলিটারীর চেষ্টায় অবস্থা আয়ত্তে আসে। কারফিউ জারী হয় এবং বদলোকদের গ্রেপ্তার করা হয়। ১০ হাজার লোককে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে সরানো হয়। পরের দুই দিন সামান্য দুই চারিটা ঘটনা ঘটে। ঢাকায় আসা যাওয়ার পথে ট্রেন আক্রান্ত হয়। সমস্ত ট্রেনে সশস্ত্র প্রহরী দেওয়া হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে মিলাইয়া মোট নিহতের সংখ্যা ১৯৮ এবং আহত ২২৩। পুলিশ ২২ বার গুলি চালায় এবং ১২৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। বহু বাড়ী তল্লাসী হয় এবং লুণ্ঠিত সম্পত্তির খুব বড় অংশ (very substantial part) উদ্ধার হয়। অভূতপূর্ব্ব দ্রুততার সহিত ঢাকার গোলযোগ আয়ত্তে আসে।

(১৩) ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার বাহিরে ফেণী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, জামালপুর এবং শ্রীহট্টে গোলযোগ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে বাহির হইতে আগত এজেণ্ট প্রভোকেটারেরা লোককে উত্তেজিত করিয়া দাঙ্গা বাধাইয়াছে। বরিশালে ৮টি গৃহদাহ হয়, তন্মধ্যে প্রথম আগুন লাগে সরকারী শস্যের গুদামে। ১৪ জন ছুরিকাহত হয়। ১৬ই হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ঝালকাঠি ও নলচিঠিতে লুঠ, গৃহদাহ ও আক্রমণ হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে ৭ জন ছুরিকাহত হয় ও ৪টি গৃহদাহ হয়। ফেণীতে ৪০০০ হিন্দুকে বিপজ্জনক এলাকা হইতে সরাইয়া ফেলায় বিশেষ কিছু হয় নাই। ১৩ই হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত করিমগঞ্জ হইতে ২০,০০০ বাস্তুহারা আসায় শ্রীহট্টে উত্তেজনা দেখা দেয় কিন্তু বিশেষ কিছুই ঘটে নাই।

(১৪) ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভৈরবে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী সান্তাহারে ট্রেণ আক্রান্ত হয়।

(১৫) ঢাকার বাহিরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১১৫, তন্মধ্যে ৩১ জন মারা গিয়াছে।

(১৬) ভারতে পাকিস্থান-বিরোধী প্রচারকার্য্য চরমে ওঠে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেণ্টে পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতিতে। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনার একটি অতিশয় অতিরঞ্জিত বিবরণ দান করেন।

(১৭) জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বনগাঁ ও কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববঙ্গে ৩৮৩৪০ জন বাস্তুহারা আসিয়াছে; কাছাড় হইতে শ্রীহট্টে আসিয়াছে ২৩,১১৫ এবং গোয়ালপাড়া হইতে রংপুরে আসিয়াছে ৫৪,৫৬৯। ইহা ছাড়া হাঁটা পথে আরও বহু সহস্র আসিয়াছে।

(১৮) মৌলবী নুরুল আমীন বলিতেছেন, "১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার দাঙ্গার আগে ডাঃ রায় আমাকে অত্যন্ত চাপ দিয়া লেখেন যে কলিকাতার মাণিকতলা এলাকা হইতে প্রায়

১৫০০০ লোককে এক সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে সরাইয়া লওয়া উচিত। তিনি বলেন যে উহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে এবং এই অবস্থায় সেখানে থাকিলে উত্তেজনার কারণ বিদ্যমান থাকিবে। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারও এই মর্ম্মে আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে বলেন।" দুর্ভাগ্যের বিষয় সমস্ত লোক সরাইয়া দেওয়ার ঝোঁক এখনও রহিয়াছে (unfortunately that emphasis on wholesale evacuation still continues.)

(১৯) পূর্ব্ববঙ্গের চতুর্দ্দিকে লৌহ যবনিকা তুলিয়া রাখার মিথ্যা অভিযোগ করা হইয়াছে।

(২০) পণ্ডিত নেহরুর "ভিন্ন পন্থা"র ঘোষণা মহাসভা-পন্থীদের মনে মিথ্যা আশা জাগাইয়াছে এবং প্রকাশ্যে যুদ্ধের দাবী করা হইতেছে। পাকিস্থান যুদ্ধ চায় না কিন্তু ভারতবর্ষ যদি চায় তবে সে পাকিস্থানকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেখিতে পাইবে।

মৌলবী নুরুল আমীনের বিবৃতির যাথার্থ্য

মৌলবী নুরুল আমীনের বক্তব্য নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত অবস্থার সহিত মিলাইয়া বিচার করিলে দেখা যায় উহাতে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনার নিতান্তই অতিরঞ্জন এবং পাকিস্থানের ঘটনা চাপা দিবার ও লঘু করিবার আগ্রহ সুপরিস্ফুট। তাঁহার প্রথম যুক্তি ভুল ইহা এখানে সকলেরই জানা; কলিকাতার রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাসভা বা মাইনরটি কাউন্সিলের কোন প্রভাব নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ঘটাইবার চেষ্টা করেন নাই তাঁহাদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটি আইন নিছক একটি বৈদেশিক গবর্ণ্মেণ্টের অনুরোধে কেহ প্রয়োগ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট এবং সে হিসাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন এখানে বাঞ্ছনীয় নহে; কিন্তু ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকে এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে তাহা জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়াও সমান অন্যায় হইবে। সর্দ্দার প্যাটেলের কলিকাতার বক্তৃতা যেভাবে বিকৃত করিয়া তার কদর্থ করা হইয়াছে সর্দ্দারজী স্বয়ং তার জবাব দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সময়েই মিঃ লিয়াকৎ আলি জবাবে মুখ খুলিয়াছিলেন কিন্তু তখনও তাহার এরূপ ব্যাখ্যা হয় নাই যেমন এখন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার মুখে যে সমস্ত কথা চাপানো হইয়াছে তাহাও যে একেবারে কল্পিত ইহাও তিনি বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ লিয়াকৎ আলি সাহেবকে কলিকাতায় দশ হাজার মুসলিম নিধনের সংবাদ যে মিথ্যুকের দল দিয়াছিল সর্দ্দারজীর বক্তৃতাও তাহারাই রিপোর্ট করিয়াছে।

বাগেরহাটের ঘটনার প্রায় এক মাস পরে উহা কলিকাতায় প্রকাশিত হওয়ার একমাত্র কারণ এখানকার সংবাদপত্রসমূহের উত্তেজনা বন্ধ রাখিবার আগ্রহ। ব্যাপারটা প্রকাশ করিলে পাছে এখানে লোকে উত্তেজিত হয় এই আশঙ্কাতেই তাঁহারা উহা প্রকাশে বিরত ছিলেন। কিন্তু বাগেরহাট হইতে ৩০ হাজার বাস্তুহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে যখন মুখে মুখে উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে তখনই সংবাদপত্রসমূহ সত্য সংবাদ প্রকাশ করিয়া গুজবের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য উহা ছাপাইয়াছিলেন। এক মাস দেরীতে ছাপার যে কদর্থ পাকিস্থানী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী মৌলবী নুরুল আমীন করিতেছেন তাহা সত্য নহে। এই ধরণের সংবাদ বিলম্বে ছাপার কিরূপ প্রতিক্রিয়া পাকিস্থানে হয় তাহাও আমাদের সংবাদপত্রসমূহের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ডাঃ বিধান রায়ের প্রেস নোটেই বাগেরহাট ঘটনার প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পায়।

বনগাঁয়ে জে. পি. মিত্রের কাউন্সিলের ও হিন্দু মহাসভার বৈঠক, তাহার সঙ্গে মসজিদ অপবিত্রকরণ ইত্যাদির সম্পর্ক এবং জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সংবাদ কত বড় বানানো তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ২৬শে জানুয়ারী ও উহার পরবর্তী কয়েকদিন কলিকাতায় কম্যুনিষ্ট গোলযোগ ঘটিয়াছিল ইহা জানা কথা।

৬ই ফেব্রুয়ারীর প্রেসনোটে ব্যাপক হাঙ্গামার কথা কোথাও উল্লেখ নাই। মুর্শিদাবাদে ইতস্ততঃ যে কয়টি সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার সত্য ও সঠিক সংবাদ আছে। কলিকাতায় প্রথম সাম্প্রদায়িক ঘটনা ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সামান্য একটি ঘটনা। ৮ই ফেব্রুয়ারী মাণিকতলার ঘটনা ঘটে। ইহার মূলে ছিল মুসলমান কর্তৃক একটি হিন্দু কনেষ্টবলের ছুরিকাহত হওয়া এবং একটি হিন্দু ভদ্রলোককে টানিয়া বস্তির মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে কবর দেওয়া। ইহার পর জনতার উত্তেজনা প্রশমিত করিতে গবর্ণ্মেণ্টকে বিষম বেগ পাইতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে উত্তেজনা প্রশমন কঠিন হইতেছিল, এই কথা বলিয়া ডাঃ রায় সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। এই দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নাই কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ফেণীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে হিন্দু দোকান লুণ্ঠিত হয় এবং বহু হিন্দু পলাইয়া আগরতলায় আশ্রয় লয়, এই সংবাদ ইউনাইটেড প্রেস-প্রচার করেন। ঘটনা কম ঘটিলেও একথা ঠিক যে ঢাকার ব্যাপারের অনেক পূর্ব্ব হইতে হিন্দুবাড়ী রিকুইজিসন, বেপরোয়া হিন্দু গ্রেপ্তার প্রভৃতির দ্বারা দাঙ্গার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইতেছিল। ভদ্র ও প্রভাবশালী হিন্দুদের হত্যা করিয়া গরীব ও অসহায়দিগকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার যে সুপরিকল্পিত প্ল্যান নোয়াখালিতে দেখা গিয়াছিল এক্ষেত্রেও তাহাই দেখা গিয়াছে। ঢাকার ঘটনার পূর্ব্বে আজাদের দুই তিন সপ্তাহের প্রচারকার্য্য ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

চীফ সেক্রেটারীদ্বয়ের যুক্ত বিবৃতি প্রকৃতপক্ষে কাহারা

প্রথমে ভঙ্গ করিয়াছে তাহা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। এ বিষয়ে পাকিস্থানের অভিযোগ বিশ্বাস করা যায় না।

ঢাকার দাঙ্গা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম খুব বড় দাঙ্গা হইতে পারে কিন্তু ইহার আগেকার বাগেরহাটের ঘটনাকে উপেক্ষা করা যায় না। ঢাকা মেল আক্রমণকে তাঁহারা প্রথমটা অসাম্প্রদায়িক ডাকাতি শ্রেণীর ঘটনা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এখন বাগেরহাটের ব্যাপারটাতেও সেইরূপ রং চড়াইতে চাহিতেছেন। ঢাকা ও ঢাকার বাহিরের দাঙ্গায় হতাহতের যে সংখ্যা মৌলবী সাহেব দিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস্য; এখানে সংবাদপত্রে নাম ঠিকানা দিয়া নিহতদের যে সমস্ত তালিকা প্রকাশিত হইতেছে তার সহিত উহার কোন মিল নাই। ফেণী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, জামালপুর ও শ্রীহট্টে এজেন্ট প্রভোকেটারেরা গোলমালের সূত্রপাত করিয়াছিল; ইহারা কাহারা এবং ধরা পড়িয়াছে কিনা মৌলবী সাহেব তাহা বলেন নাই।

নুরুল আমীন সাহেব বলিয়াছেন যে ভৈরবে ও সান্তাহারে ট্রেন আক্রান্ত হইয়াছে এবং ভারতে একমাত্র লামডিং ছাড়া আর কোথাও এরূপ হইয়াছে বলিয়া তিনি বলিতে পারেন নাই। ঢাকা-মেল আক্রমণের কথা তিনি একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন এবং ঐ সব ট্রেন ছাড়া আরও বহু ট্রেন আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিতেছে। পর পর এতগুলি ট্রেন আক্রমণ তাঁহারা সশস্ত্র প্রহরী দিয়াও নিবারণ করিতে পারেন নাই।

ঢাকার মোট নিহতের সংখ্যা ১৯৮ এবং তার বাহিরে মৃত্যুসংখ্যা মাত্র ৩১, ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য।

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে অতিরঞ্জন বিন্দুমাত্র নাই, বরং ঘটনা যথাসম্ভব লঘুর দিকে টানিয়াই তিনি বিবৃতি দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে বেশী মুসলমান পাকিস্থানে গিয়াছে এইজন্য যে এখান হইতে যাওয়ার পথে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগমনের অবাধ গতি খুলিয়া দিলে তখন এ বিষয়ে তুলনা করা সম্ভব হইবে।

ঢাকার দাঙ্গার আগে ডাঃ রায় মাণিকতলার ১৫০০০ হাজার মুসলমানকে পূর্ব্ববঙ্গে লইয়া যাওয়ার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না। এ বিষয়ে মৌলবী নুরুল আমীনের প্রকাশ্য বিবৃতির পর একটি প্রেস নোটে সত্য সংবাদ বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পূর্ব্ববঙ্গের চতুর্দ্দিকে লৌহ-যবনিকা সৃষ্টির কথা প্রমাণসহ পি. টি. আই নিজেই বলিয়াছেন।

পাকিস্থান যুদ্ধ চায় কিনা তাহার বিচারে দেখা যায় কাশ্মীরে তাহারাই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, পাট বন্ধ করিয়া অর্থনৈতিক যুদ্ধ তাহারাই সুরু করিয়াছে এবং পূর্ব্ববঙ্গে অত্যাচার আরম্ভ করিয়া তাহারাই ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিতে চাহিতেছে। মৌলবী নুরুল আমীনের সুদীর্ঘ বিবৃতিতে নারীহরণের একেবারে কোনরূপ উল্লেখ নাই। ইহাতেই তাঁহার ওকালতির মূল তথ্য ধরা পড়ে।

বর্ত্তমান অবস্থায় লোকবিনিময়

লোকবিনিময়ের কথাটা খুব জোরের সঙ্গে উঠিয়াছে। এক দল লোকের যুক্তি এই যে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মুসলমান অধিবাসীসংখ্যা প্রায় আশি লক্ষের কাছাকাছি হইবে; উহাদিগকে পাকিস্থানে পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে হিন্দুদের লইয়া আসা হউক। পশ্চিবঙ্গ ও আসামের মুসলমানেরা চাষীশ্রেণীর লোক, পূর্ব্ববঙ্গে যে হিন্দুরা রহিয়াছে তাহারাও প্রধানতঃ তাই। সুতরাং উভয় পক্ষই যদি ঘরবাড়ীতে আগুন না দিয়া পরস্পর বদল করিয়া লয় তবে কেন লোকবিনিময় সম্ভব নহে? পাকিস্থানীরা বলিতেছেন লোকবিনিময় করিতে হইলে তাহা আংশিক হইলে চলিবে না, পাকিস্থানের সমস্ত হিন্দুর পরিবর্ত্তে ভারতের সমস্ত মুসলমান বিনিময় করিতে হইবে। ইহাতে পাকিস্থানকে সাড়ে তিন কোটি অতিরিক্ত লোক লইতে হয় বলিয়া তাঁহারা উহাদের জন্য আরও ভূমি দাবী করিয়াছেন। 'আজাদ' লিখিয়াছে যে লোকবিনিময় করিলে অতিরিক্ত সাড়ে তিন কোটি অধিবাসীর জন্য পাকিস্থানকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এবং পূর্ব্ব পঞ্জাবের একাংশ ছাড়িতে হইবে। লোকবিনিময় করিতে গেলে ভারতের সাড়ে চার কোটি মুসলমান ও পাকিস্থানের সওয়া কোটি হিন্দু এই পৌনে ছয় কোটি লোককে পৈত্রিক ঘরবাড়ী, জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়া নূতন সংসার পাতিতে হইবে। উহা সুপরিকল্পিতভাবে করিতে গেলে সময়ের দিক দিয়াও অর্দ্ধ শতাব্দী লাগিবার কথা। সামর্থ্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। পাকিস্থান কর্ত্তৃক আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পঞ্জাবের অংশ দাবীর পক্ষে কোন যুক্তি নাই; কারণ তাঁহারাই দুই জাতি নীতি অনুসারে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান বাস করিতে পারে না বলিয়া পাকিস্থান চাহিয়াছিলেন এবং তাহা পাইয়াছেন। ভারতের সকল মুসলমানকেই পাকিস্থানে লওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাহা না করিয়া অখণ্ড ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমানকে ভারতেরই ঘাড়ে চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষ সেকুলার ষ্টেট বলিয়া মুসলমানদের তাড়ায় নাই কিন্তু পাকিস্থান ভারতের সমগ্র মুসলমানের বাসভূমি হিসাবেই দাবী করা হইয়াছিল। বাস্তব দিক দিয়া এই কথা বলা যায় যে পাকিস্থান যেভাবে কিস্তিতে কিস্তিতে হিন্দুদের তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতের মুসলমানদের বুনিয়াদ ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষকে যদি পাকিস্থানের হিন্দুর জন্য স্থান করিয়া দিতেই হয় তখন ভারতীয়

মুসলমানদের পাকিস্থানে গমন ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না এবং এই সাড়ে চার কোটি মানুষের মহা সর্ব্বনাশের সমস্ত দায়িত্ব হইবে পাকিস্থানের।

বর্ত্তমান অবস্থা ও শান্তিরক্ষা

ভারতরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া যে কত বেশী আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে তাহা পূর্ব্ববঙ্গের গোল-যোগে পরিস্ফুট হইয়াছে। সমগ্র ভারতে পাকিস্থানী গুপ্ত-চরবাহিনী কাজ করিতেছে। ইহারা কতদূর শিকড় বিস্তার করিয়াছে লায়েক আলির পলায়ন তার প্রমাণ। প্রতিদিন ভারতের বহু স্থানে পাকিস্থানী চর ধরা পড়িতেছে। বাহিরে পাকিস্থান, ভিতরে কম্যুনিষ্ট ও প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী এই দুই চাপে ভারতের নিরাপত্তা বস্তুতঃই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে জনসাধারণ এবং সরকারী কর্ম্মচারী উভয়কেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণে যাহাতে সরকারের শক্তি ক্ষয় করিতে না হয় দেশবাসীকে তৎপ্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পাকিস্থানে আইন ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন ও হিন্দু নারী হরণ এখন পাকিস্থানীদের ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে কিন্তু ভারতে যেন ঐরূপ অবস্থা না ঘটে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও জনতা এখন পর্য্যন্ত প্রশংসনীয় ধৈর্য্য দেখাইয়া আসিয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের দিক হইতে কিন্তু এইরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুলিস অতি শোচনীয় ব্যর্থতা দেখাইয়া আসিতেছে। কয়েক সপ্তাহ আগেও মুষ্টিমেয় কতকগুলি কম্যুনিষ্ট পুলিসকে কলিকাতা সহরময় নাচাইয়া বেড়াইয়াছে। এখন ইহারা অদৃশ্য, কারণ অশান্তি সৃষ্টির ভার গ্রহণ করিয়াছে পাকিস্থানীরা। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, ভারত-রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন; এইজন্য বেশ যোগাযোগে কাজ চলিতেছে। ফেরারী কম্যুনিষ্টরা ধরা পড়ে নাই, তাহাদের হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতি অবাধে প্রচারিত হইতেছে, গোয়েন্দা পুলিস কিছু করিতে পারে নাই। সংবাদ-সংগ্রহ (espionage), অপরাধ নিবারণ (prevention) এবং অপরাধী গ্রেপ্তার ও মামলা পরিচালন (detection and prosecution)—পুলিসের এই প্রাথমিক কর্ত্তব্য তিনটিই কলিকাতায় ও বাংলাদেশে উপেক্ষিত হইতেছে। কলিকাতার বর্ত্তমান গোলযোগে পাকিস্থানীদের যথেষ্ট হাত আছে এরূপ বহু প্রমাণ আছে। ইণ্টালির ফুল-বাগান বস্তির নিকটে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পাইয়া পুলিস সেখানে তল্লাসী করিয়া বহু বোমা, ছোরা, কার্ত্তুজ প্রভৃতি উদ্ধার করে। বেলগাছিয়ায় আর একটি বস্তিতে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পাইয়া পুলিশ গিয়া সেখানে বোমা তৈরির সরঞ্জাম ইত্যাদি পায়। এই সমস্ত আবিষ্কার ঘটনাচক্রে হইয়াছে, ইহাতে গোয়েন্দা পুলিসের কোন কৃতিত্ব নাই অথচ প্রতি বৎসর গোয়েন্দা পুলিসের খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে।

অপরাধ নিবারণের কথা না বলাই ভাল। কম্যুনিষ্ট গোল-যোগে দেখা গিয়াছে অল্প কয়েকটি লোকের নিকট কলিকাতার এত বড় এবং অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত পুলিসবাহিনী অসহায়। পাকিস্থানী গোলযোগেও তাহাই। কোথাও কোন ঘটনা ঘটিলে লরীভর্ত্তি পুলিস লাফাইয়া পড়িয়া রাস্তার লোককে লাঠিপেটা করে; এই ভাবে লোককে পুলিসের উপর আরও চটাইয়া দেওয়াই যেন এখন পুলিসের প্রধান কাজ।

অপরাধী গ্রেপ্তারের অবস্থা আরও শোচনীয়। পুলিস কমিশনার মাসে মাসে সাংবাদিক বৈঠক করেন এবং উহাতে মাসের অপরাধ সংখ্যা ও গ্রেপ্তার সংখ্যা দেন। কিন্তু কতগুলি মামলা আদালতে গেল এবং কতগুলিতে সাজা হইল তাহা বলেন না। অথচ এই চারটি তথ্য এক সঙ্গে না দিলে পুলিশের কৃতিত্ব বুঝা যায় না। ময়দানের সভায় পণ্ডিত নেহরুকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং একজন সশস্ত্র পুলিশ কনেষ্টবল নিহত হইয়াছিল। তিন চার জন লোককে ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছে, কাহারও বিরুদ্ধে মামলা টিকে নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া দশ লক্ষ লোকের সভার মধ্যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল, অথচ পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না; যাহাদিগকে হাতেনাতে ধরা হইল তাহারাও প্রমাণাভাবে ছাড়া পাইল, অথচ পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্য সকলেই ইচ্ছুক।

মামলা পরিচালনে অযোগ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মিলিয়াছে গত জানুয়ারী মাসে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বহুবাজারে একটি হিন্দু মেয়ে অপহৃতা হয়। সন্দেহক্রমে রিয়াসৎ বেগ এবং আর কয়েকজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু মেয়েটিকে পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহারা মুক্তি পায়। কিন্তু একজন ডিটেকটিভ সব-ইন্সপেক্টর এই তদন্ত চালাইতে থাকে। প্রায় এক বৎসর পরে পাকিস্থানে রংপুরে মেয়েটির সন্ধান পাইয়া উহাকে সেখান হইতে কৌশলে উদ্ধার করিয়া আনা হয়। মেয়েটি বিভিন্ন স্থানে ধর্ষিতা হইয়া শেষে যে বাড়ীতে থাকে সেটি রিয়াসৎ বেগের শাশুড়ীর বাড়ী। মেয়েটির জবানবন্দী-ক্রমে আবার রিয়াসৎ বেগকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে পুলিশ প্রথমে বলে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে; কিছুদিন বাদে অকস্মাৎ তাহারা ঘুরিয়া দাঁড়ায় এবং রিয়াসৎ বেগের নামে চার্জ্জসিট দাখিল না করিয়া তাহাকে খালাস করিয়া দেয়। স্বাধীন ভারত হইতে হিন্দু নারী অপহৃতা হইল, এক বৎসরের চেষ্টায় তাহাকে পাকিস্থান হইতে উদ্ধার করা হইল, যে ব্যক্তি তাহাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া মেয়েটি জবানবন্দী দিল সে ঐ ব্যক্তির শাশুড়ীর বাড়ী হইতে উদ্ধার

হইল, সমগ্র ব্যাপারটির আনুপূর্ব্বিক পুলিশ ডায়েরী রহিয়াছে, ইহার পরেও কি বলিতে হইবে যে মামলা রুজু করিবার মত প্রাথমিক প্রমাণের অভাব আছে? তবে এই মামলা ডিটেক-টিভ ডিপার্টমেণ্ট ছাড়িয়া দিল কেন?

টাকা এবং লোক বাড়াইলেই যে পুলিশের দক্ষতা বাড়ে না ইহার প্রমাণ প্রয়োজন হইয়া থাকিলে কলিকাতা পুলিশ তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পুলিসের দক্ষতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে উচ্চতম কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর। গত তিন বৎসর কলিকাতা পুলিসের দক্ষতা একেবারে রসাতলে গিয়াছে। স্বাধীনতার প্রথম যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা দেখিয়াই আমরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আমাদের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার সিকিউরিটির উপর ভারতের নিরাপত্তা নির্ভর করে, এই সময়ে শহরের পুলিসের দক্ষতা বাড়াইতে না পারিলে রাষ্ট্র বিপন্ন হইবে।

বর্ত্তমান সঙ্কটে টাকার অভাব

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু সহস্র বাস্তুহারা আসিয়াছে, পাকিস্থান বাস্তুহারা আগমনের কড়াকড়ি হ্রাস করিলে কত লক্ষ আসিয়া পৌছিবে তাহার স্থিরতা নাই। ভারত সরকার টাকা দিলেও প্রাদেশিক সরকারেরও বেশ কিছু খরচ হইবে। এই সময় ট্যাক্স আদায় সম্বন্ধে সতর্ক ও জাগ্রত থাকা কর্ত্তৃ-পক্ষের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সেলস ট্যাক্স বিভাগে তার বিপরীত ঘটিতেছে। কোনও এক প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সেলস ট্যাক্স ধার্য্য করায় বাধা পাওয়ার একটি বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই ট্যাক্সটা আদায় হইলে সরকারের বাজেটের এবারকার ঘাট্‌তির মোটা অংশ একজনের নিকট হইতেই আদায় হইতে পারে ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে সেলস ট্যাক্সের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার শ্রীএন সি রায় একটি কটন মিলের বিক্রয়-কর ধার্য্য করিবার জন্য তাহাদের ম্যানু-ফ্যাকচারিং হিসাব দাখিল করিতে বলেন। তিনি কমিশনারকে বলেন যে কয়েকটি কোম্পানী নিম্নলিখিত উপায়ে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়াছে; ম্যানুফ্যাকচারিং হিসাব পরীক্ষা করিলে ঐগুলি ধরা যাইত:—

(১) অস্তিত্বহীন ব্যক্তিগণ হইতে মাল ক্রয়ের ভুয়া হিসাব লিখিয়াছে।

(২) উৎপাদনের হিসাব গোপন রাখিয়াছে এবং বেনামীতে ঐ মাল বিক্রী করিয়াছে।

(৩) কাল্পনিক রেজিষ্টার্ড ডিলারের নামে মাল বিক্রী দেখাইয়াছে।

(৪) তাহাদের বড় বড় ব্যবসা হইতে টাকা ধার দিয়া নূতন সাবসিডিয়ারি কোম্পানী স্থাপন করিয়াছে এবং এগুলির মারফত খরিদ বিক্রী করিয়াছে ও ট্যাক্স আদায়ের পূর্ব্বে ঐ-গুলিকে লিকুইডেশনে দিয়াছে।

(৫) ফ্যাক্টরী প্রসার ও বাড়ী তৈরির জন্য বহু পরিমাণ লোহা ও বাড়ী তৈরির মালমসলা ক্রয় করিয়া পরে গোপনে ঐগুলি বিক্রী করিয়াছে এবং ফ্যাক্টরী ও বাড়ী ঘর তৈরির খাতে এই ব্যয় দেখাইয়াছে।

(৬) ফাটকা বাজারের মারফতে তাহাদের নিজেদের সৃষ্ট কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সহিত কারবারে ব্যবসায়ের ন্যায্য লাভের টাকা লোকসান দেখাইয়া দিয়াছে।

উপরোক্ত কটন মিল এই চাপে পড়িয়া প্রথমে বলিল তাহারা ম্যানুফ্যাকচারিং হিসাব রাখে না। ম্যানুফ্যাকচারিং হিসাব না রাখিলে উৎপন্ন কাপড়ের পড়তা ফেলা অসম্ভব বলিয়া ইহা অবিশ্বাস্য; এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ইহা লইয়া ক্রমাগত চাপ দিতে লাগিলেন। ঐ ব্যবসায়ী দল তখন ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল যে তাহারা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিবে। ৮ই এপ্রিল হইতে ২২শে জুন পর্য্যন্ত এইরূপ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ২৩শে জুন তারিখে এসিষ্টাণ্ট কমিশনার নিম্নলিখিত পত্রটি কমিশনারের নিকট হইতে পাইলেন—"আমি মৌখিক যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছি সেই মতে অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনি উক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংক্রান্ত এসেসমেণ্ট কিম্বা অন্য কোন বিষয় যাহাতে তাহাদের উপস্থিতি বা কৈফিয়তের প্রয়োজন হইতে পারে এমন যে সব ফাইল আপনার হাতে আছে তাহাতে কোন কাজ করিবেন না।"

৬ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি পুনর্গঠিত হয় এবং ডাঃ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের মিলন হওয়াতে মন্ত্রি-মণ্ডল পুনর্গঠনের কথা উঠে। ঐ দিনই বি, পি, সি, সি নির্ব্বাচনের সংবাদপ্রাপ্তির পরমুহূর্ত্তে কমিশনার তাঁহার পূর্ব্ব-লিখিত আদেশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর এসিষ্টাণ্ট কমি-শনার ঐ ব্যবসায়ীদের অন্য এক প্রতিষ্ঠানের উপর ২৬,১৫,৬৭০ টাকা কর ধার্য্য করেন। কিন্তু প্রথমোক্ত কটন মিল কিছুতেই ম্যানুফ্যাকচারিং একাউণ্ট দিতে চায় না। ম্যানুফ্যাকচারিং একাউণ্ট সম্বন্ধে জোর তাগাদা দিলে তাহারা এবার বলিল যে, তাহাদের খাতাপত্র পুড়িয়া গিয়াছে।

মন্ত্রিমণ্ডলের ফাঁড়া কাটিয়া যাওয়ার পর কমিশনার আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এসিষ্টাণ্ট কমিশনার শ্রীএন সি

রায়কে মফস্বলে বদলী করা হইল এবং শ্রীএস কে বসুকে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত করা হইল। বসু মহাশয় আসিয়া ফাইল দেখিয়া উক্ত ব্যবসায়ী দল কর্তৃক প্রদত্ত হিসাবের উপর এসেসমেণ্ট করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তিনিও ম্যানুফ্যাকচারিং একাউণ্টই আর এক ভাবে চাহিলেন। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রথমোক্ত কটন মিল সে হিসাব দেয় নাই। ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল হইতে ১৯৫০-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দুই বৎসরকাল একটি কোম্পানী হিসাব দাখিল করিতে অস্বীকার করিতেছে এবং যে হিসাব পাইলে ৪০ লক্ষ টাকা একটি মাত্র কোম্পানীর নিকট হইতে আদায় হইবে বলিয়া এসিষ্টাণ্ট কমিশনার বলিতেছেন সেই হিসাব চাপা দিতে কোম্পানীকে সাহায্য করা হইতেছে ইহা বিচিত্র ব্যাপার। এ বিষয়ে ডা: রায়ের নিজের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

বিহারে বাঙালী অঞ্চলের সমস্যা

গত মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় আমরা ভারতরাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বিহার প্রদেশে অবস্থিত বাঙালীর নানা অভিযোগ সম্বন্ধে একটু অবহিত হইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার নিজ প্রদেশে গিয়া রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন। সেই সময়ে তিনি কেবলমাত্র মানপত্র ও তার রৌপ্যের এবং স্বর্ণের আধার কুড়াইয়াছিলেন, এরূপ অভিযোগে কর্ণপাত করিতে আমাদের মন চায় না। আমরা আশা করি বিহারের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের বাঙালী-প্রধানগণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার সহযাত্রীগণ, তাঁহাদের ভাষার উপর যে অত্যাচার চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এরূপ আলোচনার ফলাফল কি হইয়াছে, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু বিহারের মন্ত্রিমণ্ডলী ও কংগ্রেসী-প্রধানগণ তাঁহাদের ব্যবহারে যে সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন, তৎপ্রতি রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

বিহারের বাঙালী-প্রধানগণ কি ভাবিতেছেন তাহা আমরা জানি। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে "সত্যাগ্রহ" আন্দোলন তার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছে। কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে সাত মাস পূর্ব্বে সেই আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। এই অনুরোধের উদ্দেশ্য ছিল আলাপ-আলোচনা করিয়া এই ভাষা ও সংস্কৃতি সমস্যার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করা। এই সাত মাসের মধ্যে কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই; তাঁহারা কুচবিহার-রাজ্যকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার অবসর পাইলেন। কিন্তু গত ৩৮ বৎসর হইতে যে সমস্যা বাঙালী ও বিহারীর সম্পর্ককে প্রতিনিয়ত বিষাক্ত করিতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে তাঁহাদের অবসর হইতেছে না!

এইরূপ টালবাহানা করার ফলে বাঙালী সমাজের মন কংগ্রেসী আদর্শ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহাতুর হইতেছে। এই বিপদ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছেন। বাঙালী তাহার সংস্কৃতির জন্য কি করিতে পারে, গত ৪৫ বৎসরের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কংগ্রেস নেতৃবর্গের তাহা ভুলিলে চলিবে না। মানভূম পরিষদের সম্পাদক শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিবৃতি "সারথি" (সাপ্তাহিক) পত্রিকার গত ১৫ই ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র বাঙালী সমাজের মনোভাব এইবিবৃতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ কারণ আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—

"জনসাধারণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার পর মানভূমের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়াছে, যদিও ইহা শুনা গিয়াছিল যে, মানভূমের জনগণের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলি পূরণের নিমিত্ত কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বিহার সরকারকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, এমন কি জেলার মাতৃভাষা সম্পর্কেও বিহার সরকার কেন্দ্রের নির্দ্দেশ যথাযথ পালন করেন নাই। তাহা ছাড়া দুঃখের বিষয় যে, মানভূম সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত চারিজনের সাব-কমিটি এই সুদীর্ঘ সাত মাসের মধ্যেও নাকি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করার সময় পান নাই, যদিও ডা: প্রফুল্ল ঘোষ ও পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র গত জুন মাসেই তাঁহাদের অকিঞ্চিৎকর অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়াছেন। ইহা সত্য যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বর্ত্তমানে বহু গুরুতর সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত আছেন; কিন্তু মানভূম সমস্যাও এমন একটি গুরুতর সমস্যা যাহার সমাধানে মোটেই বিলম্ব ঘটা উচিত নহে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের এবম্বিধ নীরবতার সুযোগ লইয়া বিহার সরকার মানভূমের জনগণের উপর যথেচ্ছ পীড়ন চালাইতেছেন। সেখানে এমন এক নিরাপত্তা আইন এখনও বহাল রাখা হইয়াছে যাহার বলে এমন কি সাহিত্য বা সংস্কৃতি সম্মেলনও বিনা অনুমতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"পরিস্থিতি ক্রমশ: এতই জটিল হইয়া উঠিতেছে যে, মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পক্ষে আর নীরব দর্শক হইয়া থাকা সম্ভব নহে। আমি জানিতে পারিলাম যে, গত ৪ঠা ও ৫ই জানুয়ারীতে মাঝিহীড়া সম্মেলনে তাঁহারা এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে মানভূম সমস্যার সমাধান না করিলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করা হইবে। ইহা সত্য হইলে ওয়ার্কিং কমিটির সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে, কারণ তাঁহাদের অনুরোধেই গত এপ্রিল মাসে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছিল; যথাশীঘ্র ওয়ার্কিং কমিটির একটা ব্যবস্থা করা উচিত।

"আমার মতে মানভূম সমস্যার একমাত্র সমাধান হইল মানভূমের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তি। শাসক যদি শাসিতের

প্রতিভূ না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্র কাজ করিতে পারে না এবং মানভূমের ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত প্রকট সত্য। তাহা ব্যতীত ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগঠন ছাড়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনও অর্থহীন। অনেকে প্রচার করিয়া থাকেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যার চাপ অপনোদনের জন্য কিংবা বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতির জন্য মানভূমের বঙ্গভুক্তি প্রয়োজন। কিন্তু ইহার চেয়ে বড় সত্য হইল মানভূম একান্তভাবে বাংলা ভাষাভাষী এলাকা এবং সকল বাংলা ভাষাভাষী এলাকার বাংলায় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে শাসক শাসিতের যথার্থ প্রতিভূ হইতে পারে।"

ভারতরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে একটি নূতন বিধান সংযোজিত হইয়াছে। তদনুসারে (৩য় বিধান) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কোন প্রদেশের পুনর্গঠন হইবে না। তিনি সংশ্লিষ্ট আইন সভার মত লইবেন। বিহারে অন্তর্ভুক্ত বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহের ভবিষ্যৎ স্থির করিবার জন্য বিহারের ব্যবস্থাপক সভার মত লইলে ফল কি হইবে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙালী সমাজের মনে এই সন্দেহও দেখা দিয়াছে যে এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিরপেক্ষ হইতে পারিবেন না। এইরূপ সন্দেহ উভয় পক্ষের পক্ষে লজ্জাজনক। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা বিস্তার-লাভ করিতেছে, এবং তাহার জন্য দায়ী কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ। ভাষার ভিত্তিতে ভারতরাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত হইবে কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতি লইয়া যেভাবে ছল-চাতুরী চলিতেছে, তাহার ফলেই এইরূপ সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হইয়াছে।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের শেষ চেষ্টা

প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গত ১২ই ফাল্গুন নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছে: সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সর্বোচ্চ কর্ম্মনির্ব্বাহক সমিতি নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) সভায় এই পরিষদের ফেব্রুয়ারী মাসের সভাপতি ডা: কার্লো ব্রাঙ্কো একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি এইরূপ—

"১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী এবং ২১শে এপ্রিল তারিখে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্থানের জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল, পরিষদ সেই কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়াছেন। ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া জেনারেল এ জি এল ম্যাকনটন যে রিপোর্ট দিয়াছেন পরিষদ তাহাও বিবেচনা করিয়াছেন।

"১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট এবং ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে কাশ্মীর কমিশনের প্রস্তাবে জম্মু ও কাশ্মীরের সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া, যুদ্ধ বিরতি এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোটের ভিত্তিতে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছিল, তাহাতে একমত হওয়ার জন্য পরিষদ ভারত ও পাকিস্থানের রাজনীতিকোচিত কার্য্যের প্রশংসা করিতেছেন।

"নিরাপত্তা পরিষদ ভারত ও পাকিস্থান গবর্ম্মেণ্টকে এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর পাঁচ মাসের মধ্যে নিজেদের অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া জেনারেল ম্যাকনটনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে অথবা ঐ প্রস্তাবে বর্ণিত নীতি সংশোধন সম্পর্কে পরস্পর একমত হইয়া তদনুযায়ী সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করিতে অনুরোধ করিতেছেন। পরিষদ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিতেছেন—(ক) তিনি যেখানে প্রয়োজন মনে করিবেন সেইখানেই তাঁহার কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত সেনাদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য এবং সেই কর্ম্মপন্থা কার্য্যে পরিণত করার বিষয়ে তত্ত্বাবধান। (খ) ভারত ও পাকিস্থান গবর্ম্মেণ্টকে তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য করিবেন, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য লইয়া উভয় গবর্ম্মেণ্টের মধ্যে যে বিরোধ বাধিয়াছে তাহার সমাধানকল্পে তিনি যে সকল উপায় ভাল বলিয়া মনে করিবেন সংশ্লিষ্ট গবর্ম্মেণ্টদ্বয় অথবা নিরাপত্তা পরিষদে তাহা উত্থাপন করিবেন। (গ) কাশ্মীর কমিশনের উপর যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সেই সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন। (ঘ) সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কাজ চলিতে থাকার কালে উপযুক্ত সময়ে গণভোট পরিচালক এডমিরাল চেষ্টার নিমিৎস কর্তৃক কার্য্যভার গ্রহণের ব্যবস্থা করা।"

পরের সংবাদে প্রকাশ, নরওয়ে, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির প্রতিনিধিবর্গ এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করিয়াছেন। সকলেই এই উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসের সভাপতি ক্যানাডার জেনারেল ম্যাকনটন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার মূল নীতি সমর্থন করিয়াছেন। জেনারেল ম্যাকনটন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন্ নীতি বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে এই সংবাদে কোন উল্লেখ নাই। পরের আলোচনায়ও তাহার স্পষ্ট কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। নীতি হইতে পারে যে কাশ্মীর আক্রমণের জন্য দোষ-গুণ বিচার করিয়া যখন লাভ নাই ("unprofitable")—এই শব্দটিই জেনারেল ম্যাকনাটন ব্যবহার করিয়াছিলেন—তখন এই আক্রমণে লাভবান যে রাষ্ট্র—পাকিস্থান—তাহার দোষ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। ২৪শে ফাল্গুন যে আলোচনা হয় তাহাতেও আমরা অন্য কোন যুক্তি দেখিলাম না।

সুতরাং আলোচনার ধারা লক্ষ্য করিয়া মনে হয় যে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান

করিতে পারিবে না। ন্যায়ের প্রতিশোধের স্থান একটা বিশ্ববিধানে আছে; মানুষ অনেক সময় প্রায়শঃই তাহা ভুলিয়া যায়। রাবণ ভুলিয়া গিয়াছিল, হিটলার ভুলিয়া গিয়াছিল। সীতাকে আশ্রয় করিয়া বিধাতার রোষ রাবণের উপর পড়িল, ক্ষুদ্র পোলাণ্ডকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া চেম্বারলেনের হিটলার তোষণনীতির প্রতিশোধ আমাদের চক্ষের সামনে ঘটিয়াছে। সেইরূপ কাশ্মীর-জম্মুর উপর অত্যাচার করিয়া পাকিস্থান রেহাই পাইবে না, এবং তাহাদের কৌশল ব্যর্থ হইবে, যাহারা পাকিস্থানকে তোষণ করিবে, ক্ষণিক স্বার্থের প্রেরণায় এই অত্যাচারের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে বিচার করিতে অস্বীকার করিবে—১৯৪৭ সালের আগষ্ট-অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত যে অন্যায় প্রশ্রয় পাইয়াছে তার বিচারে অসম্মত হইবে—লাভ নাই ("unprofitable") বলিয়া।

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ-সম দহে"—বিশ্বকবির এই সাবধানবাণী মানুষের ইতিহাসে প্রতিপদে প্রমাণিত হইতেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে নানা দৈনিক সংবাদপত্রে একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভারত গবর্ন্মেণ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করিবার জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন; সেই উপলক্ষে একটি কমিটি নিয়োগের কথা এবং কয়েকজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের নামও করা হইয়াছিল। গত ২৩শে ফাল্গুন ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংসদ বা ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই বিষয়ে একটা চূড়ান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। নিম্নে তাহা তুলিয়া দিলাম:

"সর্ব্ববিধ সম্ভাবিত সূত্র হইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং সেই সব সংগৃহীত তথ্য হইতে মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত-সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানের উপাদান সংগৃহীত হওয়ার পর একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের লইয়া একটি প্রাথমিক কমিটি গঠিত হইয়াছে:—

(১) ভারত-সরকারের শিক্ষা-সম্পর্কিত উপদেষ্টা ডাঃ তারাচাঁদ—পদাধিকার বলে সভাপতি, (২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, (৩) দেশরক্ষা দপ্তরের ঐতিহাসিক বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর বিশ্বেশ্বর প্রসাদ, (৪) শিবগঙ্গার রাজা দোরাই সিঙ্গম স্মৃতি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী সি. এস. শ্রীনিবাসাচারী, (৫) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, (৬) তথ্য ও বেতারসচিব শ্রীআর. আর. দিবাকর এবং (৭) ডক্টর জি. সি. নায়াঙ্গ।

সরকারী তত্ত্বাবধানে ইতিহাস রচনার চেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা সন্দেহ বরাবরই আছে। সেই সন্দেহের কারণাদি বর্ত্তমানে উল্লেখ না করিলেও এই কথা বলিতে পারি যে, সরকারী অনুপ্রেরণায় ইতিহাস রচনার সময় এখনও আসে নাই, এবং কমিটির সভ্যবৃন্দের যে সব নাম ঘোষিত হইয়াছে, তাঁদের সম্বন্ধেও যথেষ্ট আপত্তির কারণ আছে। সময় আসে নাই এইজন্য যে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন এরূপ সাহিত্যিক ও লেখক যাঁহারা আছেন এই সংগ্রামের ব্যাপকতা সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন; কেহ কেহ অসম্পূর্ণ তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়াই পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতরাষ্ট্রের ১৪টি প্রধান ভাষায় এরূপ বহু বই প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহা শেষ হইলে সংগৃহীত তথ্যাদির সমালোচনা হইবে, বিচার হইবে; তাহার সত্যাসত্য, অত্যুক্ত্যাদি পরীক্ষা করিয়া তবেই প্রকৃত ইতিহাস রচনার উপযোগী সময় আসিবে। আমাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে যোগদান করিয়াছেন বা যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতি-বৃন্দের সাহচর্য্যের সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সহযোগ ব্যতিরেকে এই মহৎ ও বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এরূপ কার্য্যের জন্য একটা ঐতিহ্যের প্রয়োজন, একটা অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবগ্রাহিতার প্রয়োজন যাহা সরকারী মনোনয়নের কল্যাণে লাভ করা যায় না। বর্ত্তমান কমিটির সভ্যবৃন্দের সকলের পরিচয় আমরা জানি না। কিন্তু যাঁহাদের কথা জানি তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজনই আমাদের প্রস্তাবিত মানদণ্ডের যোগ্য হইতে পারিবেন। তাঁহারা ইতিহাসে পণ্ডিত, পাথুরে ও তাম্রলিপির প্রমাণ সংগ্রহ ও উদ্ধারে এক একজন দিকপাল হইতে পারেন। কিন্তু ভারতের গত ১২৫ বৎসরের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—পাথুরে বা ধাতব প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাহা জীবন্ত প্রাণবান মানুষের রক্তে ও চোখের জলে লেখা। তাহার মর্ম্মার্থ উদ্ধার করিতে হইলে সরকারী দপ্তরখানার বাহিরে আসিতে হয়।

চিনির কথা

গত যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের লোক-সমষ্টিকে অনেকভাবে বঞ্চিত জীবন-যাপন করিতে হইয়াছিল। ভাত, কাপড় ও নিত্য-প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যাদির জন্য সরকারের নিকট হাত-ধরা হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে বাংলাদেশে খাদ্যের অনটন ঘটে; প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক মারা যায়। এই অপমৃত্যুর নানাবিধ কারণ

আলোচনা করিয়া উড্‌হেড কমিশন সিদ্ধান্তে পৌছেন (১৯৪৪ সালে) যে ব্যবসায়ীদের ফাট্‌কাবাজীর জন্য এই লোকক্ষয় হইয়াছে। এই দুর্নামের স্মৃতি এখনও লোকের মনে জাগিয়া আছে এবং ভারতবর্ষের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় এবং সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের একাংশের সহযোগিতায় যে "কালো-বাজার" এখন পর্য্যন্ত আমাদের জীবন বিপন্ন করিতেছে, তৎসম্বন্ধে গণ-মন বিষাক্ত হইতেছে ও গবর্ন্মেণ্টের অকৃতকার্য্যতায় তাহা প্রায় দিগ্‌-বিদিকশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

এই যে বিষ আমাদের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীশ্রেণীর ব্যবহারে নিত্য ফুটিয়া উঠিতেছে তার প্রমাণ মিলিয়াছে শর্করা শুল্ক অনুসন্ধান বোর্ডের সুপারিশসমূহে। সুগার সিণ্ডিকেট নামে একটি শর্করা শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে ১৯৪৯ সালের প্রথম হইতে চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার পর এই সমিতি কালো-বাজারের সৃষ্টি করিয়া চিনির বাজারে কোটি কোটি টাকা অন্যায় মুনাফা করিয়াছে। দুই বৎসর দেশের লোকের মন এই গলা-কাটাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে গুমরিয়াছে; গবর্মেণ্ট ঢিমে-তেতালাগিরি করিয়া তাহা নিবারণ করিতে অপারগ হইয়াছেন। এখন শুল্ক-কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা গত ২২শে ফাল্গুন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন:

"(১) আখ মাড়াইয়ের বার্ষিক লাইসেন্স পাইবার জন্য পূর্ব্ব-সর্ত্ত হিসাবে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের সকল কারখানাকে অবশ্য সিণ্ডিকেটের সদস্য হইতে হইবে বলিয়া যে নিয়ম প্রবর্তিত ছিল তাহা বাতিল করা হইবে। (২) সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক অতি দ্রুত এবং অত্যধিক পরিমাণে চিনির বরাদ্দ (কোটা) ছাড় দেওয়ার জন্যই মুখ্যত: জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৯-এ শর্করা (শিল্পে) সঙ্কট দেখা দিয়াছিল; এবং (৩) শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থা ৩১শে মার্চ্চ ১৯৫০ তারিখের পর বলবৎ রাখা হইবে না। সংরক্ষণ শুল্কের স্থলে সরকার 'প্রয়োজন অনুযায়ী' রাজস্ব খাতে কর ধার্য্য করিবেন। গত সপ্তাহে ভারতীয় সংসদে যে ফিনান্স বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার একটি সর্ত্তে এই পরিবর্ত্তন সাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

এই সিদ্ধান্তসমূহ কার্য্যকালে কি ফল প্রসব করিবে তাহা এখন বলিতে পারি না। এই শর্করা শিল্পটির ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে অন্যান্য অনাচার ও অব্যবস্থাও জড়িত আছে। শুল্ক কমিশন তাহার উল্লেখও করিয়াছেন।

অত্যধিক মালগাড়ী সরবরাহ সম্পর্কে বোর্ড সুপারিশ করেন যে 'জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবিষয়ে পূর্ণ তদন্ত হওয়া আবশ্যক'।

'১৯৪৯ সালে ভারতে ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট চিনি প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানে যথেষ্ট পরিমাণ চালান দেওয়া হইয়াছে' বলিয়া অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের তদন্ত করা উচিত।

গত ১৮ বৎসর ভারতবর্ষের লোকসমষ্টি এই শিল্পকে রক্ষা করিতে গিয়া বেশী দামে চিনি কিনিয়াছে যেমন করিয়াছিল গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ বস্ত্রশিল্পের রক্ষাকল্পে। যুদ্ধের সময় যখন সব জিনিষের দাম বাড়িয়াছিল, তখন চিনির মূল্য এই রক্ষা-ব্যবস্থার কল্যাণে খুব বেশী বাড়ে নাই; দ্বিগুণ মাত্র বাড়িয়াছিল। আজ আমরা ১৯৩৯ সালের তিনগুণ মূল্য দিতেছি। কিন্তু চিনির ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা আখের চাষী দেশবাসীর এই ত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝে নাই। সুতরাং তাহাদের প্রতি দেশের লোকের দরদ থাকিতে পারে না।

এই রক্ষা-শুল্ক প্রত্যাহার করিবার স্বপক্ষে শিল্প-কমিশন যুক্তি দিয়াছেন এইরূপ: ভারতে উৎপন্ন চিনির দর (২৮৷০) এবং বিদেশী চিনি আমদানীর আনুমানিক মোট খরচের (২২৷৷০) মধ্যে প্রতি মণ ৬৲ হিসাবে পার্থক্য আছে। সুতরাং দেশীয় শর্করা শিল্পের সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকিলে, প্রতি মণ ৬৲ হিসাবে বর্ত্তমানে যে কর ধার্য্য আছে তাহাই পর্য্যাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যে আমদানীকৃত চিনির দর হ্রাস পাইবার (এবং সে কারণে প্রতিযোগিতার) আশঙ্কা নাই। কারণ 'খোলা বাজারে' (অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে) প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্ত চিনির পরিমাণ কম থাকিবে বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত বৈদেশিক বাণিজ্যের খতিয়ানে ঘাটতির জন্য ভারত সরকার প্রচুর পরিমাণ চিনি আমদানীর অনুমতি দিবেন না।

শুল্ক বোর্ড আরও বলিয়াছেন যে, ভারতে উৎপন্ন চিনির ছায্য কারখানার দর (বর্ত্তমানে ২৭৲) ১৯৫০-৫১ সালে ২৪৸০ দরে হ্রাস করা যাইবে বলিয়া মনে করি। গত ১৮ বৎসর ধরিয়া শর্করা শিল্পে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে, শর্করা শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব যাঁহাদের তাঁহারা অর্থাৎ সরকার, শর্করা-শিল্প এবং চাষী সকলের মধ্যেই শৈথিল্য দেখা দিয়াছে।

দামোদর ক্যানেল

"সত্যাগ্রহ" পত্রিকা নিম্নলিখিত অভিযোগের প্রতি দেশবাসী ও গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে:

"দামোদর ক্যানেলের কার্য্য বাংলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনের সময়ে আরম্ভ হয়। ইহা বর্দ্ধমান জেলার নিম্ন অঞ্চলের ধান্য উৎপাদন ব্যাপারে অত্যন্ত সাহায্য করে। দামোদরের জলকে এনিকাটের দ্বারা উচ্চ করিয়া তাহাকে একটি পার্শ্বস্থ খালের ভিতরে ঢুকাইয়া নিম্নাভিমুখীকরত: মাঝে মাঝে রেগুলেটার ও স্লুইসের দ্বারা নিম্নস্থ ক্ষেত্রগুলিতে পৌছাইয়া দিয়া শস্যোৎপাদনে সাহায্য করাই ইহার কার্য্য। এই ক্যানেল ২৮ মাইল লম্বা, ইহার দ্বারা এক লক্ষ আশি হাজার

একর জমির উপকার হয়। ইহা বর্দ্ধমান জেলার একটি অমূল্য সম্পদ। যাহারা ইহার জল পাইতে পারে, অথচ পায় না, তাহারা ইহার জল পাইবার জন্য দরখাস্ত করে। সেচ বিভাগ তদন্ত করিয়া দুঃখের সহিত বলেন যে, আর অতিরিক্ত জল দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ যে এলাকায় তাঁহারা জল দেন তাহাতে জল তাঁহারা যথোপযুক্ত রূপে সরবরাহ করিতে পারেন না।

ইহা সত্য হইলেও দরখাস্তকারীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, অভাব হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে জল দিবে এই বিবেচনায় কৃষকেরা জল সংরক্ষণ করে না। তাহাদের জমিতে কোন আইল থাকে না, কিংবা যদি থাকে তাহা যথোপযুক্ত উচ্চ নহে। যদি আইল থাকিত এবং কৃষকেরা যদি যথেচ্ছ জল ছাড়িয়া না দিত, তাহা হইলে দরখাস্তকারীদের বিবেচনায় ঐ অতিরিক্ত জলের দ্বারা আরও অধিকতর জমিতে জল দেওয়া যাইতে পারিত। অভিযোগটি গুরুতর।

বর্দ্ধমানের প্রায় সমগ্র উত্তর সীমা ব্যাপিয়া অজয় নদ ছড়াইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব সীমা বাহিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত এবং দক্ষিণ সীমায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত। আবার দামোদরের শাখা বরাকর ইহার পশ্চিমের সীমাটুকুকে প্রায় ঘিরিয়া রহিয়াছে। কুনুর, খড়ি, বাঁকা প্রভৃতি নদী ইহার অঙ্গে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দামোদর ও ইডেন ক্যানেল ইহার শস্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতেছে। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে এই জেলার প্রকৃত উপকার হইবে।

কিন্তু এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সময় যাইবে। ইতিমধ্যে পুরাতন পুকুরগুলিকে ঝালাইয়া লওয়া, ছোট ছোট সেচ ও জল নিকাশ পরিকল্পনাকে কার্য্যে রূপায়িত করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য।"

হুগলী জেলায় স্বাবলম্বন

"প্রবাসী" পত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যায় সরকার-নিরপেক্ষ গঠনমূলক কার্য্যের বিবরণ আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি। দেশের লোকে নিজের ভাবনা, নিজের কাজ নিজে করিতেছেন, নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন, তদপেক্ষা মহৎ উদ্দীপনার কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে হইতে এই ভাবের ভাবুক হইয়া বাঙালী চিন্তা-নায়কগণ ভারতবর্ষে যুগান্তরের সূচনা করেন। সেই কথা আমাদের দেশের রাজনীতির ব্যবসায়ীরা ভুলিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবনাদর্শ যাঁহাকে তাঁহারা "জাতির জনক" বলিয়া নিজের দলে টানিতে চান। আমরা ৫০ বৎসর পূর্ব্বের অনুপ্রেরণায় চলিতে চেষ্টা করি বলিয়া দেশের লোকের মধ্যে স্বাবলম্বনের চেষ্টা দেখিলে উৎফুল্ল হই, সেই কীর্ত্তিকথা প্রচার করিয়া আনন্দ পাই। এ মাসেও এরূপ একটি ক্ষুদ্র কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিবরণ শ্রীরামপুরের "নির্ণয়" (৬ই ফাল্গুন) হইতে তুলিয়া দিলাম:

"হরিপালের অন্তর্গত হড়াগ্রামে কাণানদী হইতে একটি খাল কাটিয়া কয়েক মাইল দূর পর্য্যন্ত চষদ্ জমিগুলির সেচ করিবার এক পরিকল্পনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় জনসাধারণ গ্রহণ করেন। জনসাধারণ নিজেরাই প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত খালের খানিকটা কাটিয়া রাখেন। এই প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য সরকারী কৃষি বিভাগ এই পরিকল্পনাটি আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া এ বৎসর (১।৩ ভাগ চাঁদা সমেত) ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ৪ঠা পৌষ ১৩৫৬ সাল হইতে পুনরায় খাল খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

এই কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য একটি সক্রিয় পরিচালক সমিতি গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীশরৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় হিন্দু মহাসভার সম্পাদক ডাঃ রবীন্দ্রকুমার ঘোষাল সমিতির সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন।

এই মাসের (ফাল্গুন) মধ্যে খননকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।"

ঐ পত্রিকার এই সংখ্যায়ই আরামবাগ মলয়পুর ইউনিয়নের একটি কর্ম্মবিবরণীর চুম্বক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা বাঙালীর জানিয়া রাখা প্রয়োজন; মলয়পুর ইউনিয়নে যাহা সম্ভব হইয়াছে তাহা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও সম্ভব:

"ইউনিয়ন বোর্ডের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্য পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, ট্যাক্স আদায় করিয়া আবশ্যক ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাতে বিশেষ কিছু কাজ করা সম্ভব হয় না। অথচ পল্লীর অভাব বহু প্রকারের—এইরূপ অবস্থায় সহৃদয় ব্যক্তির আর্থিক সাহায্য ও কর্ম্মীবৃন্দের সহযোগিতা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অত্যন্ত আনন্দের কথা, মলয়পুর ইউনিয়নে ইউনিয়নবাসীর সহযোগিতার লেশমাত্র অভাব ঘটে নাই। মলয়পুর ইউনিয়নের সুসন্তান জনাব মির্জ্জা আবদুর রসিদ ও শ্রীশৈলধর ঘোষের সাহায্য বিবরণটিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। জনাব রসিদ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে নির্ম্মিত ১০টি নলকূপ ও শ্রীশৈলধর ঘোষ ৫টি নলকূপ খননের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কেশব-পুর শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লী সমিতির সভ্যগণের সাহায্যের কথাও বিবরণীতে বিশেষভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। নলকূপ স্থাপন খাতে জনাব রসিদ সাহেবের নিকট হইতে ৩৫৭০৲ টাকা, শ্রীশৈলধর ঘোষের নিকট হইতে ১৭৪৬৸৶৬ ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ মারফত ১০০৲ টাকা, সর্ব্বসাকুল্যে ৫৪১৬৸৶৬ পাই সংগৃহীত হইয়াছিল ও সমস্ত অর্থই ব্যয়িত হইয়াছে।"

বাস্তুত্যাগীর বাস্তুর ব্যবস্থা

বারাসত, বসিরহাট ও বনগাঁ মহকুমার মুখপত্র "সংগঠনী" পত্রিকার ১৬ই ফাল্গুন সংখ্যায় এই বিষয়ে যে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সকলে বিচার করিলে ভাল হয়। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে এরূপ সহৃদয়তার সহিত "বাস্তুত্যাগীদের" আশ্রয় ও চাষের জমির ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং বাস্তুত্যাগীরাও দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা উন্নততর কৃষির কৌশল জানেন ; এই বিষয়ে প্রথম কাজ হওয়া উচিত—গ্রামের সংখ্যা ও কত শত বা সহস্র বাস্তুত্যাগীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা। কেহ যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল মাত্র এই বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন, তবেই এই প্রস্তাবের প্রকৃত পরীক্ষা হইবে :

"গ্রামবাসীদের নিকট আমাদের প্রস্তাব যাহারা কর্ম্মক্ষম অথচ কাজ করিবে না তাহাদিগকে কোন সাহায্য দিবেন না। আপনাদের নিকট আমাদের অনুরোধ বাস্তুত্যাগীদের সাহায্যের জন্য আপনারা কমিটি গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করুন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের ও বাস্তুত্যাগীদের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতি গ্রামে ৫।৭টি বাস্তুত্যাগী পরিবারকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রস্তুত হউন। ৫।৭টি পরিবারের বেশী লইতে যাইবেন না। কারণ তাহাতে গ্রামবাসীদের উপর অত্যধিক চাপ পড়িলে আপনাদেরই অন্নসংস্থানের কষ্ট দেখা দিবে ও তাহাতে বাস্তুত্যাগী ও আপনারা উভয়েই মারা পড়িবেন। আর আমাদের বিশ্বাস সম্প্রতি যে সংখ্যক বাস্তুত্যাগী পরিবার এখানে আসিয়াছে তাহাদের যদি পুনর্ব্বসতি ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিতে হয় তাহা হইলে বনগাঁ, বারাসত ও বসিরহাট মহকুমার প্রতি গ্রাম পিছু ৫।৭টি করিয়া পরিবারকে আশ্রয় দিলেই চলিবে ও ইহাতে গ্রামবাসীদের উপরও চাপ অত্যধিক পড়িবে না এবং উহারা গ্রামবাসীদের সহায়তায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।"

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কার্য্যপদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গের নানা সরকারী বিভাগের কার্য্যপদ্ধতি লইয়া অনেক সময় নানা অভিযোগ শোনা যায়। ইহা শুনিয়া শুনিয়া বিভাগের লোকেরা কানে তুলো ও পিঠে কুলো দিবার অভ্যাসে পটুত্ব লাভ করিয়াছে এবং জনমত রুদ্ধ আক্রোশে দিন গুনিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে খাদ্যশস্যের ফসল বাড়াইবার কাজে সরকারের সময় ও অর্থ ব্যয় হইতেছে বলিয়া শুনিতেছি। কিন্তু তজ্জন্য সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম্মতৎপরতা বাড়িয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। সংবাদপত্রে চাষীর পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, যেখানেই বীজ ও সারের জন্য কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেখানেই সময়মত বীজ বা সার মিলে না। তার পরে কৃষি-বিভাগ কাগজের উপর কৈফিয়তের আঁচড় কাটিয়া কর্ত্তব্য পালন করেন।

বর্দ্ধমানের "দামোদর" পত্রিকার ১৫ই ফাল্গুন সংখ্যায় "হাড়ের গুঁড়ার হদিশ" শীর্ষক একটি মন্তব্যে জনমতের একটা প্রকাশ পাইতেছি। লেখক "হলধরের" ছদ্মনামে মনের জ্বালা ব্যক্ত করিয়াছেন :

"ফাগুনের অর্দ্ধেক তো পগারপার। বাঁশের ঝাড়ে আগুন দেবার সময় এলো এদিকে বেগুনও বুড়িয়ে গেল। দু'চার ফোঁটা বৃষ্টিও হয়ে গেল। এইবার ধূলায় চাষ আরম্ভ দিতে হয়েছে—হাড়ের গুঁড়াও এই সময় থেকেই দিতে হবে। কি হাড়ের গুঁড়ার পাত্তা পাওয়া ভার। কোন্ দরগায় কোন্ পীরের কাছে গেলে মিলবে চাষীদিগের এখনো পর্য্যন্ত হদিশ দেওয়া হয় নাই। ভাদ্র মাসে জমির গাঁজ মারবার জন্য সরকারী তুঁতে এলো কার্তিক মাসের ৮ই। অতএব সেই অনুপাতে হাড়গুঁড়ো যে ফাগুনের স্থলে আষাঢ়ে আসবে না তাই কে বলতে পারে! লাফানে হেলের মত এইরূপ ঝটিতি কাজ করবার জন্যেই আমাদের বিগত কৃষি-মন্ত্রীর মাইনে বাদে যেটের কোলে মাত্র আট হাজার টাকা সফর খরচ! তবু আমরা বলি, আমাদের জীবনযাপনের মান উন্নত হয় নাই!!"

মিষ্ট কথা বলিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। সেই কথাই "খাদ্য-উৎপাদন" (পাক্ষিকের) সম্পাদক মহাশয় গত ১লা ফাল্গুনের সংখ্যায় বড় দুঃখে আমাদের শুনাইয়াছেন : "কৃষি ও খাদ্য বিভাগের সমুদয় পরিকল্পনা, প্রত্যেক পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী ও তাহার ফলাফল, কোন্ সময়ে কি কি বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র, ইত্যাদি কি মূল্যে বা কি সর্ত্তে সরবরাহ করা হয়, কোন্ অঞ্চলে কৃষি-বিভাগের প্রচেষ্টায় স্থানীয় কৃষির কতদূর উন্নতি হইয়াছে ইত্যাদি অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন এবং অনেকেই এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট চিঠি পত্র লেখেন এবং দেখা করিতে আসেন। আমাদেরও প্রবল ইচ্ছা যে, এ বিষয়ে প্রত্যেককে যথাযথ ও সঠিক সংবাদ দিই। কিন্তু আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে কৃষি ও খাদ্য বিভাগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারি নাই ; সময়ে সময়ে তাঁহাদের নিকট পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। এমন কি আমাদের অনুরোধসত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের 'প্রেস নোট' আমাদিগকে পাঠান না। "খাদ্য-উৎপাদনের" প্রত্যেক সংখ্যায় আমরা কৃষি ও খাদ্য বিভাগের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের সহযোগিতার কথা প্রায়ই বলিয়া থাকেন—কিন্তু সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অনেকেই সহযোগিতা করিতে পারেন না। আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দ্দেশও সকল সময়ে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক পালিত হয় না।"

সোভিয়েট কৃষির প্রথম অধ্যায়

ব্রিটিশ প্রচার বিভাগ আর্নল্ড ইয়র্ক লিখিত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষি-উন্নতির ইতিহাস প্রচার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে :

"সোভিয়েট 'এনসাইক্লোপিডিয়া'য় প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে ১৯১৯ সালে লেনিন ক্ষুদ্র চাষীদের সমবায়-পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন। সমবায় সমিতির সদস্য পরস্পর চাষের যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং প্রয়োজন হলে শ্রমিক দিয়েও সাহায্য করত। চাষীরা এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বিশেষ আপত্তি করে নি, কারণ সমবায় পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করারও সুবিধা ছিল। লেনিনের এরূপ পরিকল্পনা ছিল যে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হলে সমস্ত সমবায় সমিতিকে যৌথ-কৃষি ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা সম্ভব হবে ; সে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই কৃষিকার্য্যের সমস্ত যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং গবাদি পশুর একমাত্র মালিক হবে।

এই পরিকল্পনার নাম ছিল 'লেনিন সমবায় পরিকল্পনা' তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সমবায় পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করা নয়, সমগ্র রাশিয়ার কৃষি-ব্যবস্থাকে সোভিয়েট অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা। বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের উচ্ছেদ করা হ'ল, কিন্তু কৃষিকার্য্যে প্রচুর অভিজ্ঞতার জন্য কুলাকদের (ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র ভূম্যধিকারী) কিছুকালের জন্য বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন হ'ল। চাষীদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ দেওয়া হ'ল।

কিন্তু ষ্টালিনের শীঘ্রই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। ১৯২৬ সালে 'লেনিনবাদের সমস্যা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে মজদুর ও কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ষ্টালিন বলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়াতে যখন মজদুররাজ অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্ব্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন কৃষি-ব্যবস্থাকেও অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রাধীনে নিয়ে আসতে হবে।

সুতরাং ১৯২৬ সালে পুরাতন ভূম্যধিকারীদের স্থলে নূতন সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ আরম্ভ হ'ল। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্টি কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুলাক (বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূম্যাধিকারী) বিতাড়ন এবং প্রোলিটারিয়েট আমলাতন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক কৃষি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সুরু হতে বিলম্ব হ'ল না। ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে ষ্টালিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি-ব্যবস্থা গঠন করার জন্য শহর থেকে ২৫,০০০-এরও অধিক সংখ্যক শ্রমিক গ্রামে প্রেরিত হ'ল। তাদের উদ্দেশ্য প্রধানত: রাজনৈতিক হলেও তারাই কৃষকশ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করল।

ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ষ্টালিন মার্কসবাদীদের এক সম্মেলনে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি কুলাক-শ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার নীতি ঘোষণা করেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে কুলাকদের বিতাড়ন এবং তাদের জায়গা জমি, গবাদি পশু ও চাষের সাজসরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর শীতকালের মধ্যেই প্রায় ৫,০০,০০০ কুলাককে নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। এদের মধ্যে অনেককেই সুদূর সাইবেরিয়ার খনিমধ্যে বা অন্য কোন কষ্টসাধ্য কার্য্যে শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। পরবর্ত্তী দু'বৎসর অর্থাৎ ১৯৩২ সালের মধ্যে মোট ২০,০০,০০০ কুলাক ও অবস্থাপন্ন জোতদারকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়।

এর ফলে কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ চাষীদের অভাব ঘটল ; আমলাতন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলন করার প্রত্যক্ষ ফল হ'ল গুরুতর উৎপাদন হ্রাস এবং ইউক্রেন ও দক্ষিণ রাশিয়ায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থার পুন:প্রবর্ত্তন করতে বাধ্য হলেন। শহরগুলিতে কৃষিজাত দ্রব্যাদির অবাধ ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হ'ল। যৌথ ফার্ম্মগুলি ও স্বতন্ত্র চাষীরা সরকারকে নির্দ্দিষ্ট কোটা অনুযায়ী শস্য দেওয়ার পর অবশিষ্ট শস্য বাজারে বিক্রয় করার স্বাধীনতা পেল।

এই ব্যাপার ঘটে ১৯৩৫ সালে, কিন্তু বর্ত্তমানেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি।"

চীন-সোভিয়েট মৈত্রী-চুক্তি

গত ২রা ফাল্গুন মস্কো রেডিও প্রচার করিয়াছিল যে, সেই দিন চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টের নায়ক মাও-সে-তুং সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে এক মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিশ্বের মোট অধিবাসী-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ এই চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। দুই মাস আলাপ-আলোচনার পর সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব আঁদ্রে ভিসনস্কি ও মাও-সে-তুং এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

গত ১৬ই ডিসেম্বর বর্ত্তমান চীনের রাষ্ট্র-নায়ক মাও সে-তুং রাশিয়ায় উপনীত হন। এক মাস পরে নয়াচীনের পররাষ্ট্র সচিব চৌ এন লাই তাঁহার সহিত মিলিত হন।

চুক্তির সর্ত্তাবলী

"চুক্তিপত্রে পোর্ট আর্থার নৌ-ঘাঁটি হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণ এবং মাঞ্চুরিয়ার চাং-চুং রেলওয়ে চীনের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রত্যর্পণ করা হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হইবার পর উক্ত সর্ত্ত দুইটি কার্য্যকরী হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য রাশিয়া চীনকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করিবে।

"১৯৪৫ সালের চীন-সোভিয়েট চুক্তি বাতিল করিয়া উভয়

রাষ্ট্রের মধ্যে বার্ত্তা-বিনিময় হইয়াছে। নূতন চুক্তিতে বহির্মোঙ্গোলিয়ার পূর্ণ সার্ব্বভৌম অধিকার স্বীকার ও অনুমোদন করা হইয়াছে।

"মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হস্তগত জাপানী মালিকদের সম্পত্তি রাশিয়া চীনের নিকট কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকেই হস্তান্তরিত করিবে। উভয় রাষ্ট্রই জাপান ও অন্যান্য শক্তির সাম্রাজ্যবাদ ও পররাজ্য অধিকার লিপ্সার পুনঃপ্রকাশ প্রতিরোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

"যদি চুক্তি-সম্পাদনকারী দেশ দুইটির যে কোনটি জাপান বা জাপানের মিত্রপক্ষীয় কোনও রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে অপর দেশটি আক্রান্ত দেশকে অবিলম্বে যথাশক্তি সামরিক ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবে।

"উভয় দেশই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সম্মিলিত পক্ষের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সহিত ও একযোগে জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত চীন বা সোভিয়েট রাশিয়া বিরোধী কোনও চুক্তিতে তাহারা আবদ্ধ হইবে না বলিয়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই চুক্তি ত্রিশ বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর যদি কোন পক্ষই এক বৎসরের মধ্যে উহা বাতিল না করে, তাহা হইলে উহা আরও পাঁচ বৎসর বলবৎ থাকিবে এবং পরে ইহার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করা যাইবে।

"চীনকে প্রদত্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের ঋণ (৩০০ কোটি ডলার—প্রায় এক হাজার কোটি টাকা) দশটি বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর হইতে কিস্তির মেয়াদ গণনা করা হইবে। ছয় মাস পর পর সুদ দিতে হইবে।

"মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব লইয়া উভয় রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌম ক্ষমতাকে সম ও পূর্ণ মর্য্যাদাদানের ভিত্তিতে চীন ও রাশিয়া অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিতেছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নিবিড়তর করার জন্য এবং পরস্পরকে সর্ব্বপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে।"

এই সংবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ সেই রাষ্ট্রের কূট-রাজনীতিকগণ বলিতেছেন যে, মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনের কয়েকটি বন্দরের প্রতিদানে বর্ত্তমানে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় চীন রাষ্ট্র কোন কোন সুবিধা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে। অবিশ্বাস ও আক্রোশ কোন কারণে মনে দানা বাঁধিলে গত দিনের বন্ধু আজ শত্রু হইয়া পড়ে। চিয়াংকাই-শেকের চীন আর মাও-সে-তুং-এর চীন যখন ভিন্ন রাজনীতিক-পন্থী, তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও মত ও ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এটম্‌ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭ অধিবেশন পুনা নগরীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে অনেক বিদেশী বিজ্ঞানশাস্ত্রী নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ফ্রান্সের কুরী দম্পতি—অধ্যাপক জলিয়ট কুরী ও ম্যাডাম আইরেন কুরী—ও যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক কম্‌টন এটম্‌ বোমার আবিষ্কারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। অধ্যাপক কম্‌টন পুনায় এক বক্তৃতা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে ফ্রান্সেই প্রথম পরমাণু-ভঙ্গের কাজ আরম্ভ হয়; তার পর জার্ম্মানীতে, তার পর বিলাতে ও যুক্তরাষ্ট্রে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে এই আবিষ্কার ত্বরান্বিত হয় এবং তার শক্তি পরীক্ষা হয় দুইটি জাপানী নগরের উপরে; তাদের নাম নাগাসাকি ও হিরোশিমা।

এই পরীক্ষায় এটম্‌ বোমার যে প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বজগৎ কাঁপিয়া উঠে এবং এই জনপদবিধ্বংসী অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান জন্মাবধি এই বিষয়ে ব্যাপৃত আছে। কিন্তু সফলতার সদুপায় সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারে নাই। কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইতেছে যে এই অস্ত্রের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ হউক, যুক্তরাষ্ট্র বলিতেছে যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করুক। এই তর্কের এখনও শেষ হয় নাই।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা এটম্‌ বোমা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন; ফলে যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বিনষ্ট হইয়াছে। এই ঘোষণার পরে যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণ জগতের শান্তি সম্বন্ধে আরও চিন্তান্বিত হইয়াছেন। তাঁদের এই মনোভাব দুই জন বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করি।

আমেরিকার অন্যতম প্রধান পরমাণু বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ডাঃ হ্যারল্ড সি উরি একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন, রাশিয়া সম্ভবতঃ আগামী দুই বৎসরের মধ্যে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারক জাতি হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের অবসান ঘটাইবে।

ডাঃ উরি "হেভি হাইড্রোজেন" আবিষ্কর্ত্তা এবং বোমা প্রস্তুত বিষয়ে অগ্রদূত, তিনি নোবেল পুরস্কারও পাইয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে ডাঃ উরি আরও বলিয়াছেন, বিগত যুদ্ধের পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোমা উৎপাদনের কাজের গতি কতকটা মন্থর হইয়া গিয়াছে; অপর পক্ষে রাশিয়ায় যুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেরূপ গতিতে কাজ হইয়াছে সেইরূপ গতিতে কাজ চলিতেছে।

তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে "অপর্য্যাপ্ত এবং নৈরাশ্যজনক" বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি

বলেন, খুঁটিনাটি নিরাপত্তা বিধান ও কম্যুনিষ্ট মনোভাবাপন্ন বলিয়া অভিযোগ আনয়নের ফলে বহু প্রতিভাবান পরমাণু-বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বিরক্ত হইয়া কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকবৃন্দ এটম্ বোমার ধ্বংসের ক্ষমতা লইয়াই ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা ইহাও বলিতেছেন যে তদপেক্ষা মারাত্মক অস্ত্র প্রস্তুত করিবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আছে। তন্মধ্যে হাইড্রোজেন বোমার নাম উঠিয়াছে এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান নাকি তাহা প্রস্তুত করিবার ঢালাই আদেশ দিয়া দিয়াছেন। আমাদের পুরাণে দ্বাদশ সূর্য্যের তেজের অধিকারী সৃষ্টিবিধ্বংসী শক্তির কথা আছে। আমরা কি সেই অবস্থায় আসিতেছি?

শরৎ চন্দ্র বসু

গত ৮ই ফাল্গুন এই রাজনীতিক নরশ্রেষ্ঠ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন; নেতাজীর জীবনের স্মৃতিপূত, নেতাজীর তন্ত্রধারক একজন তাঁহার আরব্ধ কাজ অপূর্ণ রাখিয়া মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে চলিয়া গেলেন। দেশের দুর্ভাগ্য, জাতির দুর্ভাগ্য।

বর্ত্তমান যুগের মধ্যবিত্ত ভারতবাসী শিক্ষা-দীক্ষায় যেসব সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শরৎ চন্দ্রের পক্ষে সহজলভ্য হইয়াছিল, পিতা জানকীনাথের সুব্যবস্থায়। কিন্তু শরৎ চন্দ্রের কৈশোরে জাতির জীবনে এমন একটি নবজাগরণের বন্যা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, যাহার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর অনেকের পক্ষে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা অসহ হইয়া উঠিল। যাঁহারা নিজে এই বন্যায় ঝাঁপ দিতে পারিলেন না, তাঁহারা "পাড়ানীর কড়ি" যোগাইতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। অর্থে ও পরামর্শে তাঁহারা তান্ত্রিক দেশ-সেবকদের মৃত্যুগহন যাত্রাপথের সহায়ক ছিলেন। শরৎ চন্দ্রের জীবন সেইরূপ কনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্রের "খাজাঞ্চী" হইয়া আরম্ভ হয়।

ইংরেজ রাজের রোষবহ্নিতে পড়িয়া তাঁহার জীবনের শেষ ২৫ বৎসর কাটিয়াছিল। তাহাতে কষ্ট ছিল, ত্যাগ ছিল সমগ্র পরিবারের। কিন্তু শরৎ চন্দ্র এই আঘাতে মুহ্যমান হইলেন না; বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মন তাঁহার কঠোর হইতে কঠোরতর হইল। সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে যে অনমনীয় মনোভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহার মেজদার জীবনেও তাহা দেদীপ্যমান ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, স্বাধীনতার আদর্শে সর্ব্বস্ব বলিদান তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়িল।

বাঙালী চরিত্রের দোষ-গুণ তাঁহার জীবনকে একটা বৈশিষ্ট্য-দান করিয়াছিল। আমাদের অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, যে ঐতিহ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, স্পর্শকাতর আত্মসম্মানবোধ, তার ধারা, বোধ হয়, শরৎ চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল। দরাজ মন, মুক্ত হস্ত, বন্ধু-বাৎসল্য, চরিত্রের শুচিতা এই বৈশিষ্ট্যগুলি শরৎ চন্দ্রের জীবনকে মহিমময় করিয়াছিল; তাহা বাঙালী-জীবন হইতে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে। সেই কথা ভাবিয়াই আমরা তাঁহার তিরোধানে আত্মীয়জন-বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি।

সচ্চিদানন্দ সিংহ

বিহারের এই নাগরিক-প্রধান ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহাকে নব-বিহারের একজন স্রষ্টা বলিয়াছেন, যে বিহার ১৯১২ সালে সৃষ্টি করা হইয়াছিল বাংলা দেশ হইতে বিহার ও উড়িষ্যাকে বিযুক্ত করিয়া। তাহার ফলে ১৯৩৭ সালে বিহার হইতে উড়িষ্যাকে আবার বিযুক্ত করিয়াছিল ইংরেজ; তাহার একমাত্র কারণ ছিল যে বিহারীর ও উড়িয়ার ভাষা এক নয়।

কিন্তু বিহারকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশে সংগঠিত করিবার প্রথম ও প্রধান অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন ৺মহেশনারায়ণ। সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার অনুগামী, এবং সৈয়দ আলি ইমাম বড়লাটের—হার্ডিঞ্জের—আইন সচিব ছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল যখন কার্জনের বঙ্গ-বিভাগ রদ করা প্রয়োজন মনে করা হইয়াছিল ইংরেজের স্বার্থরক্ষার জন্য।

সচ্চিদানন্দ সিংহ ছিলেন একনিষ্ঠ সাংবাদিক। তাঁহার "কায়স্থ পত্রিকা" রূপান্তরিত হইয়াছিল "হিন্দুস্থান রিভিউ" নামে। প্রায় ৫০ বৎসর এই মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে সচ্চিদানন্দ সিংহ দেশের সেবা করিয়াছেন "নরমপন্থী" রাজনৈতিকরূপে। ব্রিটিশ আমলে তিনি সর্ব্বাবস্থায় এই শাসনকার্য্যে সহযোগ করিয়াছেন।

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ

গত ২৬শে ফাল্গুন আকুমার বিপ্লবী এই জননেতা ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিপ্লবের প্রয়োজনে সামরিক জ্ঞান অপরিহার্য্য। তাহা অর্জ্জনের জন্য হরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় বিলাতে ৯১৪ সালে ইংরেজের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই মন লইয়াই তার পর সমস্ত জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগ দেন। গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত আন্দোলনাদিতে হাওড়া জেলার সংগঠনে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনুরূপভাবের প্রেরণায় যখন সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহার সহকর্ম্মীবর্গের মধ্যে, "ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে, হরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট স্থান ছিল। শেষ জীবনে সেইজন্য তাঁহাকে দেখিতে পাই কংগ্রেসী রাজনীতির বিরোধী। এই বিদ্রোহী মনোভাবই হরেন্দ্রনাথের জীবনের প্রকৃত পরিচয়। তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

বুদ্ধের বিদ্রোহী শিষ্য দেবদত্ত

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শাক্যবংশীয় অভিজাত ক্ষত্রিয়কুলে দেবদত্তের জন্ম হয়।১ শাক্যরাজ ভদ্দিয়, তাঁহার বন্ধু অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভগু ও কিম্বিল নামে কয়েকজন সমশ্রেণীর সহচর ও তাঁহাদের নাপিত উপালির সহিত দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট দীক্ষা লইয়া সংঘে প্রবেশ করেন।২

তিনি শক্তিমান এবং প্রতিভাবান ছিলেন। নিষ্ঠাও তাঁহার কম ছিল না। শীঘ্রই তিনি বুদ্ধের একাদশ জন প্রধান শিষ্যের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য সারিপুত্র পর্যন্ত এককালে তাঁহার গুণগান করিয়া বেড়াইতেন।৩ বুদ্ধ নিজেও তাঁহার এই এগার জন শ্রেষ্ঠ শিষ্যের প্রত্যেকের প্রশংসা করিতেন।

এক দিন যখন এই একাদশ জন শিষ্য বুদ্ধের নিকট আসিতেছিলেন তখন বুদ্ধ বলিয়া উঠেন: "ভিক্ষুগণ, দেখ! ঐ ব্রাহ্মণগণ আসিতেছেন।"

ইহা শুনিয়া একজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভিক্ষু প্রশ্ন করেন: "ভগবান্ ব্রাহ্মণ কে? কোন্ গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়?"

বুদ্ধ তাহার উত্তরে বলেন—

"যাঁহারা অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন
যাঁহারা স্মৃতিযোগে বিচরণ করেন
বন্ধন যাঁহাদের ছিন্ন হইয়াছে
সেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণই এই জগতে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন।"৪

বুদ্ধের এইরূপ একজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য হইয়াও এক দিন তিনি সংঘ হইতে বাহির হইয়া নূতন সংঘ গঠন করেন। অজাতশত্রু তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হন।

বুদ্ধের সহিত দেবদত্তের বিচ্ছেদের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং সংঘের নিয়মকানুন বিষয়ে মতভেদই ঐ বিচ্ছেদের কারণ।

বিনয়ে দেখিতে পাই [বুদ্ধের পরিনির্বাণের আট বছর পূর্বে] দেবদত্ত কয়েকজন ভিক্ষুর সহিত বুদ্ধের নিকট নিম্নোক্ত রূপ প্রস্তাব করেন:৫ (১) ভিক্ষুগণ সমস্ত জীবন বনে বাস করিবেন। (২) তাঁহারা কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না, কেবলমাত্র ভিক্ষাপ্রাপ্ত অন্নের দ্বারাই জীবন ধারণ করিবেন। (৩) পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্র সীবন করিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবেন, গৃহস্থের প্রদত্ত নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিবেন না। (৪) তাঁহারা সর্বদা বৃক্ষতলে বাস করিবেন।৬ (৫) আমিষ আহার সর্বথা পরিত্যাগ করিবেন। (৬) এই সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেন যে, তিনি এই সমস্ত নিয়ম বাধ্যতামূলক করিতে চান না। তবে যাঁহার ইচ্ছা তিনি এই নিয়মগুলি পালন করিতে পারেন। কেবল বর্ষাকালে বৃক্ষতলে জীবন যাপন তিনি অনুমোদন করেন না।৭

ইহাতে দেবদত্ত সংঘ হইতে বাহির হইয়া যান। বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণী তাঁহার নবগঠিত সংঘে যোগদান করেন।৮

বৌদ্ধ সাহিত্যে নানা কল্পিত, পরস্পরবিরুদ্ধ ও অতিরঞ্জিত কাহিনী হইতে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই তথ্যটুকু নিরপেক্ষ পাঠকের চোখে পড়ে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে দেবদত্ত সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে তাঁহার সম্বন্ধে বহু বিস্তারিত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত বর্ণনার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়—দেবদত্ত ধর্মদ্রোহী, সংঘভেদক, বুদ্ধের বধকামী, নারীহত্যাকারী, পরস্ত্রীপরায়ণ—এক কথায় যাহা কিছু জঘন্য তাহার সমন্বয় হইলেন তিনি।

বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে—বুদ্ধ যখন দেবদত্তের প্রস্তাবিত এই পাঁচটি নিয়ম আবশ্যিক করিতে অস্বীকার করিলেন তখন দেবদত্ত পাঁচ শত নবদীক্ষিত ভিক্ষুকে দলে টানিয়া গয়াতে চলিয়া গেলেন। ইহার পর বুদ্ধের আজ্ঞাক্রমে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ভিক্ষুগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য গয়া রওনা হইলেন। দেবদত্ত তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেদিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত ধর্মব্যাখ্যা করিতে করিতে দেবদত্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে ধর্মব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধু কোকালিক বলিয়া উঠেন: "ভন্তে দেবদত্ত, আপনি ইহাদের বিশ্বাস করিবেন না। ইহাদের দুষ্ট অভিপ্রায় রহিয়াছে।"

বন্ধু এইভাবে সতর্ক করিয়া দিলেও দেবদত্ত তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ধর্মব্যাখ্যানের জন্য আহ্বান করিলেন এবং নিজে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সমস্ত ভিক্ষুকে স্বমতে আনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ইহা দেখিয়া কোকালিক ব্যস্ত হইয়া দেবদত্তকে জাগাইলেন। জাগ্রত হইয়া দেবদত্ত রক্ত বমন করিতে লাগিলেন।৯

পরবর্তী কালে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে—অন্তিম কালে দেবদত্তের অত্যন্ত অনুতাপ হয়। তিনি বুদ্ধের দর্শনার্থী হইয়া শকটারোহণে যাত্রা করেন। জেতবনের সমীপে আসিয়া তিনি শকট হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে বুদ্ধের বাসস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন—পথিমধ্যে মেদিনী বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করে। তিনি অবীচিতে প্রবেশ করেন।১০

বুদ্ধের গোঁড়া ভক্তবৃন্দ তো এইভাবে দেবদত্তকে মাটি চাপা দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিলেন এবং ইহা পাঠ করিয়া পাঠকদেরও ধারণা হইল দেবদত্ত এবং তাঁহার প্রবর্তিত সংঘ কয়েক দিনের জন্য মাথা তুলিয়া চিরতরে অতলে তলাইয়া গেল।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। দেবদত্তের মৃত্যুর পরেও সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ তাঁহার সংঘ প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকেও শ্রাবস্তীতে তাঁহার সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে।

৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফা হিয়েন বলিতেছেন: "দেবদত্তের এখন পর্যন্ত অনেক ভক্ত ভিক্ষু রহিয়াছেন। তাঁহারা শাক্যমুনির পূজা না করিয়া অতীত তিন বুদ্ধের পূজা করেন।"

সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সং বলিতেছেন: "কর্ণসুবর্ণতে (পূর্ববঙ্গে) হীনযান সম্প্রদায়ের দশটি সংঘারাম আছে যেখানে ভিক্ষুগণ দুগ্ধ বা ঘৃত ব্যবহার করেন না। ইঁহারা দেবদত্ত প্রচারিত ধর্ম অনুসরণ করেন।"১১

যাঁহার প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায় বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও সহস্রাধিক বর্ষকাল জীবিত ছিল, তিনি যে নিতান্ত জঘন্য অসার এবং অপদার্থ ব্যক্তি ছিলেন ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়?

২

দেবদত্ত সম্বন্ধে প্রাচীন পালিসাহিত্যে কোথায় কি পাওয়া যায় এবং তাহা কতদুর নির্ভরযোগ্য এইবার আমরা তাহা বিচার করিব।

দীঘনিকায় ও সুত্তনিপাতে কোথাও দেবদত্তের উল্লেখ পর্যন্ত নাই। মজ্ঝিমনিকায়ে মাত্র দুই বার তাঁহার উল্লেখ আছে।

(১) "দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে" ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে ভিক্ষুদের আহ্বান করিয়া লাভ সম্মান শীল জ্ঞানাদি হইতে যে অভিমান উৎপন্ন হয় তাহার বিপদ এবং তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দেন। দেবদত্তের প্রসঙ্গেই এই ভাষণ, কিন্তু সমস্ত পরিচ্ছেদে দেবদত্তের আর উল্লেখ নাই।

মজ্ঝিম (পি, টি, এস্) ১ম, ১৯২ পৃষ্ঠা

(২) অভয় রাজকুমার সূত্র

কথিত আছে, বুদ্ধকে জব্দ করিবার জন্য মহাবীর অভয় নামক এক রাজকুমারকে তাঁহার নিকট পাঠান। অভয়কে বলা হয়—তুমি বুদ্ধকে নিম্নোক্তরূপ প্রশ্ন করিবে: যে বাক্য অন্যের অপ্রিয়, বিরাগজনক, তাহা বুদ্ধ বলেন কি না? যদি বুদ্ধ উত্তর দেন যে তিনি ঐরূপ বাক্য বলিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে বলিবে—"তাহা হইলে আপনার সঙ্গে প্রাকৃত জনের প্রভেদ কোথায়?"

আর বুদ্ধ যদি উত্তর দেন—তিনি ঐরূপ বাক্য বলেন না তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে—কেন তবে তিনি দেবদত্তকে অপায়িক, নৈরয়িক, অচিকিৎস্য ইত্যাদি বলিয়াছেন?

অভয়ের প্রশ্নে বুদ্ধ বলেন—"অভয়, তোমার ক্রোড়স্থ এই বালকটি (অভয়ের ক্রোড়ে তখন একটি বালক ছিল) যদি কাঠি বা কাঁকর মুখে পুরে, তবে তুমি কি করিবে?"

অভয় বলেন—"আমি উহা তখনই ইহার মুখ হইতে বাহির করিয়া আনিব। ভালভাবে না হয় জোর করিয়াও তাহা করিব। তাহাতে রক্তপাত হয় তাহাও স্বীকার। কারণ এই বালক আমার স্নেহের পাত্র।"

বুদ্ধ বলিলেন—"হে রাজকুমার, ঠিক এই ভাবেই তথাগত যে বাক্য সত্য বলিয়া জানেন তাহা শ্রোতার অপ্রিয় ও বিরাগজনক হইলেও (তাহার হিতের জন্য) তিনি তাহা বলিয়া থাকেন।" (মজ্ঝিম, ১ম, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

সংযুত্তনিকায়ে তিন বার দেবদত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।

১। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে এক সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আসিয়া এই গাথা উচ্চারণ করেন।

কদলীর ফল কদলীকে নষ্ট করে। বেণু ও নলকেও তাহাদের ফল নষ্ট করে। ঠিক এই ভাবেই সৎকার (সম্মান) অসৎ পুরুষকে ধ্বংস করে। যেমন অশ্বতরীর গর্ভ তাহার ধ্বংসের কারণ হয়। সংযুত্ত (পি, টি, এস্) ১ম খণ্ড, ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা।

২। ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় সারিপুত্র, মহামৌদ্গল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, পুন্ন মন্তানিপুত্ত, উপালি, আনন্দ এবং

দেবদত্ত প্রত্যেকে বহু ভিক্ষুর সহিত অদূরে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

ঐ সময় বুদ্ধ, উক্ত প্রধান শিষ্যবৃন্দ ও উঁহাদের অনুচর ভিক্ষুগণ সম্বন্ধে তাঁহার সমীপস্থ শিষ্যদের নিকট পৃথক পৃথক মন্তব্য করেন। যেমন সারিপুত্র ও তাঁহার শিষ্যগণকে বলেন—'মহাপ্রজ্ঞ'; মৌদ্গল্যায়ন ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বলেন—'মহা-ঋদ্ধিসম্পন্ন' ইত্যাদি। দেবদত্ত ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন—"এই ভিক্ষুগণ পাপাভিসন্ধ"। (ঐ, ২য়, ১৫৫-৫৬ পৃ.)

৩। লাভ ও সম্মানের প্রসঙ্গ চলিতেছিল। কিভাবে লাভ ও সম্মান মানুষকে নষ্ট করে তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে দেবদত্তের কথা উঠিল। ভগবান বলিলেন—"লাভ ও সম্মানের দ্বারা দেবদত্তের শুক্লধর্মের উচ্ছেদ হইয়াছে। লাভ ও সংকারের দ্বারা অভিভূত হইয়া খিন্নমনা দেবদত্ত সংঘভেদ করিয়াছে।"

ইহার পরই আছে :

দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে এক সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে ভগবান ভিক্ষুগণের নিকট দেবদত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

"হে ভিক্ষুগণ! নিজের বধের জন্যই দেবদত্তের লাভ ও সংকার লাভ হইয়াছিল। পরাভবের জন্যই তাহার লাভ ও সংকার লাভ হইয়াছিল" ইত্যাদি।

এখানেও কদলী, বেণু, নল ও অশ্বতরীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর আছে :—

ভগবান যখন রাজগৃহে বেণুবনে কলন্দক নিবাপে বিরাজ করিতেছিলেন সেই সময় কুমার অজাতশত্রু পঞ্চশত রথ লইয়া প্রতিদিন প্রভাতে এবং সন্ধ্যায় দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং পঞ্চশত পাত্রে নানা সুখাদ্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বহু ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, তোমরা দেবদত্তের এই লাভ ও সংকারের প্রতি স্পৃহা করিও না। ইহাতে দেবদত্তের কুশলধর্মের হানিই হইবে।

"কোনো ভীষণ প্রকৃতি কুকুরের নাকের উপর পিত্তের থলি কাটাইলে[১২] সে যেমন অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠে এই লাভ ও সংকার দেবদত্তের পক্ষেও তেমনি হইবে। ইহাতে দেবদত্তের কুশলধর্মের প্রতি আগ্রহ কমিতে থাকিবে।" ঐ, ২য়, ২৪০-৪২ পৃষ্ঠা।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে আছে :

১। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। তিনি দেবদত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লাভ ও সংকারের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

"আত্মপদের জন্যই দেবদত্তের লাভ ও সংকার লাভ হইয়াছিল।" "কদলীর ফল যেমন কদলীকে নষ্ট করে" ইত্যাদি পূর্ববৎ। (অঙ্গুত্তর (পি, টি, এস্) ২য়, ৭৩ পৃষ্ঠা।)

২। ভগবান যখন কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ককুধ নামে মৌদ্গল্যায়নের একজন সদ্যোমৃত অনুচর-শিষ্য দিব্যরূপ ধারণ করিয়া মৌদ্গল্যায়নকে বলেন—"ভন্তে! 'আমি ভিক্ষুসংঘকে চালনা করিব'—দেবদত্তের এইরূপ অভিলাষ হইয়াছে। এবং এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ঋদ্ধিহানি হইয়াছে।"

এই সংবাদ মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধের গোচরে আনেন। বুদ্ধ ইহা শুনিয়া বলেন—"মৌদ্গল্যায়ন, তুমি কি ককুধের চিত্তে প্রবেশ করিয়া বুঝিয়াছ যে সে যাহা বলিয়াছে তাহাই হইবে তাহার অন্যথা হইবে না।" মৌদ্গল্যায়ন বলিলেন, "হাঁ ভগবান"। তখন বুদ্ধ বলিলেন—"এই বাক্য গোপন রাখ। সেই মূর্খ নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিবে।" (ঐ, ৩য়, ১২২-২৩ পৃষ্ঠা)।

৩। ভগবান বুদ্ধ তখন কোশল দেশে। এক জন ভিক্ষু এক দিন আনন্দকে প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান যে দেবদত্তকে অপায়িক, নৈরয়িক, অচিকিৎস্য বলিয়াছেন—উহা কি তিনি ধ্যানযোগে জানিয়াছেন কিংবা কোন দেবতা তাঁহাকে উহা বলিয়াছেন?"

এই কথা আনন্দ বুদ্ধকে জানাইলে বুদ্ধ প্রশ্ন করেন—"আনন্দ ঐ প্রশ্নকারী কি অল্পদিন প্রব্রজ্যাগ্রাহী নূতন ভিক্ষু, স্থবির অথবা বালক? (অর্থাৎ আমার এই উক্তিতে তাঁহার সংশয় জন্মাইল কেন?) আমি যাহা বলি তাহার অন্যথা হয় কি?"

"কেশাগ্রপ্রান্তে যতটুকু বস্তু থাকা সম্ভব, যতদিন আমি দেবদত্তের মধ্যে ততটুকু ধর্মও দর্শন করিয়াছি ততদিন পর্যন্ত আমি বলি নাই—দেবদত্ত অপায়িক ইত্যাদি। কিন্তু যখন দেখিলাম কেশাগ্রপ্রান্তে যতটুকু বস্তু থাকা সম্ভব ততটুকু ধর্মও তাহার মধ্যে নাই তখনই আমি বলিলাম—দেবদত্ত অপায়িক ইত্যাদি"।[১৩] অঙ্গুত্তর, তৃতীয়, ৪০২-৩ পৃ.

৪। দেবদত্তের সংঘত্যাগের অব্যবহিত পরে ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। সেই সময় এক দিন তিনি দেবদত্তের প্রসঙ্গে বলিলেন—"লাভের দ্বারা, যশের দ্বারা, সম্মানের দ্বারা, অলাভের দ্বারা, অযশের দ্বারা, অসম্মানের দ্বারা, পাপাভিসন্ধির দ্বারা, পাপমিত্রের দ্বারা অভিভূত হইয়া খিন্নমনা দেবদত্ত অপায়িক, এক কল্পকাল নরকগামী ও অচিকিৎস্য হইয়াছে।…এই সব অসৎ

ধর্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া খিন্নমনা দেবদত্ত এইরূপ হইয়াছে।"১৪ ঐ, ৪র্থ, ১৬০ পৃষ্ঠা।

ঐ খণ্ড অঙ্গুত্তরের ১৬৩ পৃষ্ঠাতেও এই প্রসঙ্গেরই পুনরাবৃত্তি আছে।

৫। এই গ্রন্থের উক্ত খণ্ডের ৪০২-৩ পৃষ্ঠায় দেবদত্তের একটি ধর্মভাষণের উল্লেখ আছে। ঐ ভাষণে তাঁহার একটি ধর্মমতের পরিচয় পাওয়া যায়?—"ধ্যানযোগে চিত্তের সমাধির দ্বারাই [আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের শিক্ষার দ্বারা নহে] মানুষ অর্হৎ হয়।"১৫

মজ্ঝিম্‌ সংযুত্ত, ও অঙ্গুত্তরের যেখানে যেখানে দেবদত্তের উল্লেখ আছে মোটামুটি সেই সমস্তই এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুধীগণ দেখিবেন দেবদত্ত কর্তৃক বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার কোনও নিদর্শন এগুলিতে নাই।

বুদ্ধের বধপ্রচেষ্টার ন্যায় এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারের উল্লেখ পর্যন্ত [দীঘ] মজ্ঝীম, সংযু, অঙ্গুত্তর [সুত্ত নিপাত] করিলেন না—ইহা কি আশ্চর্য ব্যাপার নহে? বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে একই বিষয়ের পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়। একই কথা ফেনাইয়া বলাই তাহাদের রচনাশৈলী। এমন অবস্থায় এত বড় ঘটনার উল্লেখ পর্যন্ত তাহারা করিবে না—ইহার কারণ কি?

প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে বিনয় পিটকের চুল্লবগ্‌গে দেবদত্তের অকীর্তিবিষয়ক বিস্তৃত বর্ণনা (বুদ্ধের বধপ্রচেষ্টাও) পাওয়া যায়। আমরা এখানে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

[প্রথম অংশ]

ভগবান বুদ্ধ তখন কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দেবদত্ত নির্জনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল—এখন আমি কাহার উপর আধিপত্য করিব? কাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিলে আমার প্রচুর লাভ ও সম্মানলাভ হইবে?

তাঁহার মনে হইল কুমার অজাতশত্রু এখন যুবক। ভবিষ্যৎ উঁহার উজ্জ্বল—উঁহার উপরই আধিপত্য করা যাক।

ইহা স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রাজগৃহ যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি তাঁহার ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা একটি শিশুর রূপ ধারণ করিলেন—কটিদেশে তাঁহার সর্পের মেখলা। এই শিশুর রূপেই তিনি অজাতশত্রুর ক্রোড়ের উপর আবির্ভূত হইলেন। অজাতশত্রু ইহাতে ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। তখন দেবদত্ত বলিলেন—"কুমার তুমি কি আমাকে ভয় করিতেছ?"

কুমার উত্তর দিলেন—"হাঁ! কে আপনি?"

"আমি দেবদত্ত!"

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন—"যদি আপনি সত্যই দেবদত্ত হন—তবে অনুগ্রহপূর্বক নিজ রূপ ধারণ করুন!"

দেবদত্ত তখন সেই শিশুরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন। দেহে তাঁহার কাষায় বস্ত্র এবং হস্তে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র। অজাতশত্রু তাঁহার ঋদ্ধিশক্তির এইরূপ পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

(১) তখন হইতে প্রতিদিন প্রভাতে এবং সায়ংকালে তিনি দেবদত্তের নিকট পঞ্চশত রথ লইয়া উপস্থিত হইতেন। প্রতিদিন পঞ্চশত পাত্রে আহার্য লইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতেন।

(২) এইরূপ লাভ ও সংকারলাভ করিয়া দেবদত্তের চিত্তে এই চিন্তার উদয় হইল—"আমারই ভিক্ষুসংঘের নেতা হওয়া উচিত।" এই চিন্তা উদয় হইবামাত্র তাঁহার ঋদ্ধি-শক্তি অন্তর্ধান করিল।

(৩) সেই সময় ককুধ নামে মৌদ্গল্যায়নের একজন অনুচর-ভিক্ষুর মৃত্যু হইয়াছিল। সেই ককুধ একদিন দিব্য-রূপ ধারণ করিয়া মৌদ্গল্যায়নকে দেবদত্তের ঐ মনোভাবের বিষয় এবং তাঁহার ঋদ্ধিহানির কথা বলিয়া গেলেন। মৌদ্গল্যায়ন তাহা বুদ্ধের গোচরে আনিলেন।

বুদ্ধ মৌদ্গল্যায়নকে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কি ওই দিব্যরূপধারী ককুধের চিত্তে প্রবেশ করিয়া জানিয়াছ যে, সে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য, তাহার অন্যথা হইবে না।"

মৌদ্গল্যায়ন বলিলেন, "হাঁ।"

বুদ্ধ বলিলেন, "ইহা গোপন রাখ। ঐ মূর্খ নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিবে।"

(৪) ইহার পর বুদ্ধ রাজগৃহে গেলেন। সেখানে বহু ভিক্ষু তাঁহার সমীপে নিবেদন করিল যে, কুমার অজাতশত্রু প্রতিদিন প্রাতে এবং সায়ংকালে পঞ্চ শত রথসহ দেবদত্তের নিকট যান এবং প্রতিদিন পঞ্চ শত পাত্রে আহার্য-সামগ্রী তাঁহাকে নিবেদন করেন।

বুদ্ধ বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, ঈর্ষা করিও না। দেবদত্তের লাভ সম্মান ও যশ দেখিয়া হিংসা করিও না। যত দিন এই ভাবে অজাতশত্রু উঁহার সংকার করিবেন তত দিন দেব-দত্তের উন্নতি হইবে না—তাহার ধার্মিক প্রবৃত্তির হানি হইবে।

"কেনো ভীষণ প্রকৃতির কুকুরের নাকের উপর পিত্তের থলি ফাটাইলে সে যেমন অধিকতর ভীষণ হয়, দেবদত্তও সেইরূপ হইবে। এই লাভ ও সংকার দেবদত্তের ধ্বংসের কারণ হইবে। যেমন কদলীর ফল কদলীর ধ্বংসের কারণ হয়" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

[দ্বিতীয় অংশ]

বুদ্ধ বহু ভিক্ষু, রাজা এবং তাঁহার অনুচরগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্মোপদেশ দান করিতেছিলেন। এমন সময় দেবদত্ত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভগবান এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন তাঁহাকে আমাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত। তিনি শান্তিতে বাস করুন। ভিক্ষু-সংঘের চালনার ভার আমার উপর দেওয়া হউক।"

ভগবান ইহার উত্তরে বলিলেন, "তুমি যথেষ্ট বলিয়াছ। ভিক্ষু-সংঘের নেতা হইবার ইচ্ছা করিও না। সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যায়নকে পর্যন্ত আমি ভিক্ষু-সংঘের ভার দিব না। তোমার মত জঘন্য ব্যক্তিকে কেমন করিয়া দিই।"

দেবদত্ত ইহাতে ক্ষুণ্ণ হন। তিনি মনে মনে বলেন, "রাজা এবং তাঁহার অনুচরবর্গের সম্মুখে ভগবান আমাকে জঘন্য (নিষ্ঠীবনতুল্য)১৬ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন।"

অপ্রসন্ন ক্রুদ্ধ চিত্তে তিনি বুদ্ধকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দেবদত্ত বাহির হইয়া যাইবার পর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু-সংঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "রাজগৃহে দেবদত্তের বিরুদ্ধে এই কথা ঘোষণা কর যে, দেবদত্তের প্রকৃতি পূর্বে এক রূপ ছিল এখন অন্য রূপ হইয়াছে। এখন হইতে সে যাহা কিছু করিবে তাহার জন্য সে স্বয়ং দায়ী। বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ তাহার দায়িত্ব লইবেন না।"

এই বিষয় ঘোষণা করিবার জন্য বুদ্ধ সারিপুত্রকে আদেশ দেন। সারিপুত্র তাহার উত্তরে বলেন, "পূর্বে আমি রাজগৃহে 'দেবদত্ত মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, দেবদত্ত মহা শক্তিমান' বলিয়া তাঁহার গুণগান করিয়াছি। এখন আমি কেমন করিয়া সেই রাজগৃহে দেবদত্তের বিরুদ্ধে এমন কথা বলিব।"

অবশেষে বুদ্ধের আজ্ঞায় এবং সংঘের নির্দেশে এই সারিপুত্রকেই উক্তরূপ ঘোষণা করিতে হয়।

এই ঘোষণা শুনিয়া এক দল লোক বলিতে লাগিল, "এই শাক্যপুত্র শ্রমণগণ ঈর্ষাপরায়ণ। দেবদত্তের লাভ ও সৎকার দেখিয়া ইহাদের হিংসা হইয়াছে।" অন্য এক দল বলিতে লাগিল, "সমস্ত রাজগৃহে ভগবানের নির্দেশে যখন এইরূপ ঘোষণা করা হইতেছে তখন ইহা কখনও সামান্য ব্যাপার নহে।"

অতঃপর দেবদত্ত অজাতশত্রুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "আপনি আপনার পিতাকে হত্যা করিয়া রাজা হউন। আমি স্বয়ং বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হই।"

অজাতশত্রুর আজ্ঞায় এবং দেবদত্তের নির্দেশে কয়েক জন তীরন্দাজ বুদ্ধকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই তাঁহার প্রভাবে অভিভূত হইয়া (সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া) তাঁহার নিকট দীক্ষা লয়। একজন শুধু ফিরিয়া গিয়া দেবদত্তকে বলে, "বুদ্ধকে হত্যা করিতে পারি নাই। তিনি ঋদ্ধিসম্পন্ন এবং শক্তিমান।"

তখন দেবদত্ত নিজেই বুদ্ধকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। পর্বতের শিখরদেশ হইতে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড তিনি বুদ্ধের উপর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু বুদ্ধের প্রভাবে দুইটি পর্বতশৃঙ্গ সহসা আবির্ভূত হইয়া ঐ শিলাখণ্ডের গতিরোধ করে। কেবল এক খণ্ড শিলাচূর্ণ তাঁহার চরণে আসিয়া লাগে এবং তাহাতে রক্তপাত হয়। বুদ্ধ দেবদত্তকে দেখিতে পাইয়া ভর্ৎসনা করিতে থাকেন।

ইহার পর রাজহস্তী নালাগিরির দ্বারা দেবদত্ত তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঋদ্ধি ও মৈত্রীর প্রভাবে হস্তী বুদ্ধের বশীভূত হইয়া যায়।

এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া দেশবাসী সকলেই দেবদত্তের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহাতে দেবদত্তের লাভ ও সৎকার বন্ধ হয় এবং বুদ্ধের লাভ ও সম্মান বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অতঃপর দেবদত্ত তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত সংঘভেদের পরামর্শ করেন। তিনি বলেন, "আমরা ভিক্ষু-সংঘের জন্য পাঁচটি নিয়মের প্রস্তাব করিব। শ্রমণ গৌতম উহা স্বীকার করিবেন না। তখন দেখিবে সাধারণ লোক আমাদের পক্ষে আসিবে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বন্ধুপরিবৃত দেবদত্ত ভগবান বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া ঐ পাঁচটি নিয়মের প্রস্তাব করিলেন। বুদ্ধ তাহা স্বীকার করিলেন না। দেবদত্ত রাজগৃহের সর্বত্র জনগণের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "শ্রমণ গৌতম এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহাই পালন করি।"

ইহাতে এক দল লোক তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই শ্রমণগণ পাপ দূর করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ বশে আনিয়াছেন, কিন্তু শ্রমণ গৌতম বিলাসী এবং প্রাচুর্যের পক্ষপাতী।"

অন্য এক দল দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবদত্ত ভগবান বুদ্ধের সংঘভেদের চেষ্টা করিতেছেন।"

ভিক্ষুগণ ইহা বুদ্ধকে জানাইলেন।

বুদ্ধ দেবদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবদত্ত ইহা কি সত্য যে তুমি সংঘভেদের চেষ্টা করিতেছ?"

দেবদত্ত উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবান।"

বুদ্ধ বলিলেন, "দেবদত্ত, সংঘভেদে যেন তোমার

অভিলাষ না হয়। এরূপ সংঘভেদ অত্যন্ত শোচনীয়। হে দেবদত্ত! সংঘে যখন শান্তি বিরাজ করিতেছে তখন যে সংঘভেদের চেষ্টা করে সে এক কল্প ধরিয়া নরকে পচিতে থাকে। আর সংঘে যখন ভেদ উপস্থিত হয়, তখন যে তাহাতে শান্তি স্থাপন করে সে এক কল্প কাল স্বর্গে সুখে কালযাপন করে। অতএব সংঘভেদে যেন তোমার অভিলাষ না হয়।"

অতঃপর এক উপোসথের দিন প্রভাতে আয়ুষ্মান আনন্দ যখন ভিক্ষার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন দেবদত্ত তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "বন্ধু আনন্দ, আজ হইতে আমি ভগবান এবং ভিক্ষুসংঘ হইতে পৃথকভাবে উপোসথ এবং সংঘকর্ম করিব।"

রাজগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আনন্দ আহারাদির পর এই কথা ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন। ভগবান ইহা শ্রবণ করিয়া এক গাথা উচ্চারণ করিলেন :

সাধুর পক্ষে সাধুকর্ম সুকর।
সাধুকর্ম পাপীর পক্ষে দুষ্কর।
পাপীর পক্ষে পাপকর্ম সুকর।
আর্যের (সাধুর) পক্ষে পাপকর্ম দুষ্কর।১৭

সংঘভেদ রোধ হইল না। দেবদত্ত পঞ্চ শত নব-দীক্ষিত ভিক্ষুসহ চলিয়া গেলেন। ইহার পর সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন গয়ায় গিয়া কৌশলে ঐ ভিক্ষুগণকে লইয়া আসেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর এই সংবাদ শুনিয়া দেবদত্ত রক্ত বমন করিতে থাকেন।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন—বিনয়-বর্ণিত বিবরণের প্রথম অংশ, মজ্ঝিম, সংযুত্ত ও অঙ্গুত্তরের উদ্ধৃত পাঠসমূহের সহিত মিলিতেছে। প্রথম অংশের প্রত্যেকটি ঘটনা যথা (১) দেবদত্তের প্রতি অনুরক্ত অজাতশত্রুর প্রতিদিন দেবদত্তের সহিত সাক্ষাৎকার ও আহার্য নিবেদন (২) দেবদত্তের ভিক্ষু-সংঘের নেতা হওয়ার অভিলাষ (৩) প্রেতাত্মার সে বিষয় মৌদ্গল্যায়নের এবং মৌদ্গল্যায়নের বুদ্ধের গোচরে আনয়ন (৪) অজাতশত্রু কর্তৃক দেবদত্তের পরিচর্যার বিষয় ভিক্ষুগণের বুদ্ধকে নিবেদন এবং তৎসম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ প্রায় হুবহু অঙ্গুত্তরাদিতে পাওয়া যাইতেছে। পাওয়া যাইতেছে না কেবল বিনয়-উদ্ধৃত পাঠের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার কোনও কাহিনী।

দেবদত্তের সংঘ চালনার অভিলাষ, প্রেতাত্মা কর্তৃক তাহা মৌদ্গল্যায়নের এবং মৌদ্গল্যায়ন কর্তৃক তাহা বুদ্ধের গোচরে আনার ন্যায় সামান্য সামান্য ঘটনাও ঐ গ্রন্থসমূহে সংকলিত হইয়াছে আর সংকলিত হয় নাই কেবল বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার ন্যায় গুরুতর বিষয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে বুদ্ধের বধ-প্রচেষ্টার কাহিনীসমূহ পরে রচনা করা হইয়াছে।

দেবদত্তের নেতা হইবার প্রস্তাব, বুদ্ধের তাহা প্রত্যাখ্যান, দেবদত্তের প্রস্থান—তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোষণা অর্থাৎ সংঘ কর্তৃক তাঁহাকে অস্বীকার বা বহিষ্কার—বিনয়-বর্ণিত কাহিনীর এই অংশ পর্যন্ত কোনো অমিল লক্ষ্য হয় না। কিন্তু ইহার পর [তারকা-চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য] বুদ্ধকে বধ করিবার বহুবিধ ষড়যন্ত্র করিয়া, বধ-প্রচেষ্টার সময় বুদ্ধ-কর্তৃক দৃষ্ট ও ভর্ৎসিত হইয়া, সংঘ-বহিষ্কৃত দেবদত্ত পুনরায় বুদ্ধের নিকট আসিয়া সংঘের অন্তরঙ্গ ভিক্ষুর ন্যায় পাঁচটি নিয়মের প্রস্তাব করিতেছেন—উহা কিরূপ কথা! উহাকে কি একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না?

ধর্মসম্বন্ধে এবং সংঘের নিয়মকানুন বিষয়ে বুদ্ধ ও দেবদত্তের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল—সেই মতভেদেরই পরিণতি হয় সংঘভেদে। দেবদত্ত-প্রবর্তিত সংঘে পাঁচটি সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংঘভেদের পূর্বে সম্ভবত দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট ঐ পাঁচটি সংস্কারের প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। সংঘভেদের পর ঐরূপ কোনো প্রস্তাবের কথাই উঠিতে পারে না।

ঐ পাঁচটি সংস্কার বা নিয়ম কি—সে সম্বন্ধে কিন্তু পালি ও তিব্বতী বিনয়ে যথেষ্ট অনৈক্য দৃষ্ট হয়। আমরা এখানে তিব্বতী বিনয়োক্ত ঐ পাঁচটি নিয়ম উদ্ধৃত করিলাম :—

দেবদত্ত তাঁহার অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাননীয় মহোদয়গণ! শ্রমণ গৌতম দধিদুগ্ধাদি আহার করিয়া থাকেন (১) আমরা আজ হইতে উহা আহার করিব না। কেননা, দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া আমরা গো-বৎসের অনিষ্ট করি। শ্রমণ গৌতম মাংসাহার করেন (২) আমরা উহা আহার করিব না। কেননা মাংসাহারের জন্য জীবহত্যা করিতে হয়। শ্রমণ গৌতম লবণ ব্যবহার করেন (৩) আমরা উহা ব্যবহার করিব না। শ্রমণ গৌতম বস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহা হইতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করেন (৪) আমরা উহা করিব না। কেননা বস্ত্রকে ঐরূপ খণ্ড খণ্ড করিলে শিল্পীর শিল্পকার্য নষ্ট হয়। শ্রমণ গৌতম গ্রাম হইতে দূরে বনে বা প্রান্তরে বাস করেন (৫) আমরা গ্রামে বাস করিব। কারণ গ্রামে বাস না করিয়া বনে বাস করিলে (দান-ধ্যানের দ্বারা) লোকসেবার সুযোগ লাভ হয় না।
—Rockhill, *Life of Buddha*, pp. 87-88.

ইহার মধ্যে একমাত্র মাংস বর্জন সম্বন্ধীয় নিয়মটিতেই উভয় বিনয়ের ঐক্য রহিয়াছে। পালি বিনয়োক্ত বনবাস

সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব দেখিতেছি তিব্বতী বিনয়ে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় নিয়মেও উভয় বিনয়ে কোনও মিল নাই।

দেবদত্ত-প্রবর্তিত সংঘে যে দুগ্ধ ও তজ্জাতীয় খাদ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল তাহা আমরা হুয়েনসাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে পাইতেছি। দেবদত্তের ভক্তগণ বৃক্ষতলে বাস করিতেন না, তাঁহাদের সংঘারাম ছিল—ইহাও আমরা উক্ত ভ্রমণ-কাহিনী হইতে অবগত হই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, তিব্বতী বিনয়োক্ত নিয়মগুলি কাল্পনিক নহে উহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ঐতিহাসিক নথিপত্রের সহিত উহা (অন্তত অংশত) মিলিতেছে।

কোথাও কোথাও দেবদত্তকে ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণার হত্যাকারী[১৮] বলা হইয়াছে। উহাও ভুল। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে লিখিত উৎপলবর্ণার যে দুইটি জীবনী পাওয়া যায় তাহার কোনটিতেই উহার উল্লেখ নাই।

মহাবস্তুতে আছে—বুদ্ধের গৃহত্যাগের পর দেবদত্ত যশোধরার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করেন[১৯]। উহাও কল্পিত, পালি সাহিত্যের কোথাও উহার উল্লেখ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দেবদত্ত যদি বুদ্ধের বধচেষ্টা করেন নাই, নারীহত্যা করেন নাই, এবং পরদারাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন না তবে তাঁহাকে "অপায়িক" "এক কল্পকাল নরকস্থায়ী" বলা হইয়াছে কেন?

ইহার উত্তর এই যে, সংঘভেদের (দল ভাঙার) জন্যই তাঁহাকে "অপায়িক" "এক কল্পকাল নরকস্থায়ী" বলা হইয়াছে। চুল্লবগ্‌গের ঐ উদ্ধৃত অংশেরই এক স্থানে রহিয়াছে, "হে দেবদত্ত, সংঘে যখন-শান্তি বিরাজ করিতেছে, তখন যে সংঘভেদের চেষ্টা করে, সে এক কল্পকাল ধরিয়া নরকে পচিতে থাকে।"

মতান্তর হইতে পরম বন্ধুদের মধ্যেও মনান্তর উপস্থিত হয়। স্বমতবিরোধীর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার, তাঁহাকে হীন, জঘন্য বলিয়া চিত্রিত করা অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি পৃথিবীর সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। সংঘে (দলে) থাকিতে যে দেবদত্তকে ব্রাহ্মণ বলা হইল, সংঘ (দল) ত্যাগের পর সেই দেবদত্তই "অপায়িক" "এক কল্পকাল নরকস্থায়ী" ও অচিকিৎস্য হইয়া গেল।

কালস্রোত যখন মহাপুরুষের সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি ধৌত করিয়া তাঁহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন সেই দেবতার ভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহার তৎকালীন প্রতিপক্ষ সাক্ষাৎ শয়তান বলিয়া গণ্য হন। মহাপুরুষের বিরুদ্ধবাদী প্রতিপক্ষও যে সাধু হইতে পারেন একথা সেই ভক্তবৃন্দের কোনরূপেই বিশ্বাস হয় না।

দেবদত্ত বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী হইলেও সৎ লোক ছিলেন, অন্তত কোন এক সময়েও জিতাত্মা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন[২০]—ইহা পরবর্তী বৌদ্ধগণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধু ছিলেন, এমন কি জন্মজন্মান্তরেও তিনি অসৎ ছিলেন ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার সম্বন্ধে পল্লবিত নানা কাহিনী রচিত হইতে লাগিল। পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে।

দক্ষিণী ও উত্তরী, পালি ও সংস্কৃত, বৌদ্ধধর্মের দুই শাখায় ইহা লইয়া যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল।

শৈশবে আমরা দেবদত্তের বাল্যকালের "হাঁস মারার কাহিনী" পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছি। আজও আমাদের ছেলেমেয়েরা উহা পড়িতেছে। অথচ পালিসাহিত্যের কোথাও উহার উল্লেখ নাই। সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে "হাঁস মারা" হইতে "হাতী মারা" পর্যন্ত দেবদত্তের বাল্যলীলার বহু উদ্ভট কাহিনী কল্পিত হইয়াছে।

১। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে দেবদত্তের পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় না। পরবর্তী গ্রন্থে যথা মহাবংশ [পি, টি, এস, ২।২১] মহাবংশ টীকা [পি, টি, এস, ১৩৬ পৃষ্ঠা] ধম্মপদ-অট্‌ঠ কথায় [পি, টি, এস, ৩য় খণ্ড, ৪৪-৪৭ পৃ] তাঁহাকে শুদ্ধোদনের শ্যালক সুপ্রবুদ্ধের পুত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু তিব্বতী [Rockhill, *Life of Buddha*, p. 13] মতে দেবদত্ত শুদ্ধোদনের ভ্রাতা অমৃতোদনের এবং মহাবস্তুর [পি, টি, এস, ৩য়, ১৭৬ পৃ] মতে শুক্লোদনের পুত্র।

বিনয়ে এক স্থানে [Oldenberg সম্পাদিত, ২য়, ১৮৯ পৃ; চুল্লবগ্‌গ, ৭।৩২] দেবদত্তকে গোধিপুত্র বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় তাঁহার মাতার নাম ছিল গোধি বা গোধী। অন্যত্র তাঁহার মাতার নাম পাওয়া যাইতেছে অমৃতা বা অমিতা (পালি)। ইঁহাকে শুদ্ধোদনের ভগিনী বলা হইয়াছে। মহাবংশ, ২।১১-২২।

মহাবংশ, ধম্মপদ-অট্‌ঠ কথাদির মতে দেবদত্তের ভগিনী ভদ্রা কাত্যায়নীর (ভদ্দকচ্চানা) সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ হয়।

২। ঠিক কোন্ সময় তিনি সংঘে প্রবেশ করেন প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে তাহা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ (Malalasekera) সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের দ্বিতীয় বৎসরে আবার কেহ কেহ (Rhys Davids) বিংশতি বৎসরে তিনি সংঘে প্রবেশ করেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। বিনয়, ২য়, ১৮৯ পৃষ্ঠা (চুল্লবগ্‌গ, ৭।৩।২)। ধম্মপদ-অট্‌ঠ কথা, ১।৬৪।

৪। বাহিত্বা পাপকে ধম্মে যে চরন্তি সদা সতা।
খীণ সংযোজনা বুদ্ধা তে বে লোকস্মিং ব্রাহ্মণা। উদান, ১।৫
স্মৃতি বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ বিষয়ের যথাযথ স্মরণের নাম স্মৃতি।

৫। চুল্লবগ্‌গ, ৭।৩।১৫।

৬। যাহা চক্ষে দেখেন নাই; যাহার কথা শোনেন নাই। যাহা তাঁহার জন্য হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া তিনি সন্দেহ করেন না—সেইরূপ মৎস্য মাংস বুদ্ধশিষ্য আহার করিতে পারেন। উহা দোষমুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ এইরূপ বিধান দিয়াছিলেন। মহাবগ্‌গ ৬।৩১।১৪।

৭। মহাবগ্‌গ তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। চুল্লবগ্‌গ, ৭।৪।১

৯। চুল্লবগ্‌গ ৭।৪।১-৩

১০। ধম্মপদ-অট্‌ঠকথা ১।১৩৩-৫০ পৃষ্ঠা। মিলিন্দ পঞ্‌হ, ১০১, ১০৮।

১১।

These heretics were seen by Fa-hien at Sravasti in or about 405 A.D. "There are also companies of the followers of Debadatta still existing. They regularly make offerings to the three previous Buddhas but not to Sakyamuni Buddha" (*Travels*, Ch. XXII in Legge's Version; all the versions agree as to the fact).

In the Seventh Century Hiuen-Tsang found three monasteries of Debadatta's Sect in Karnasuvarna, Bengal. Smith's *Early History of India* (4th edition) P. 33.

Debadatta, too, has still a number of priests who make offerings to the past three Buddhas but not to Sakyamuni. Giles, *Travels of Fa-Hsien*, pp. 35-36.

There are about ten *Sangharamas* here (*viz.*, Karnasuvarna) and 300 priests. They study the little Vehicle belonging to the Sammatiya School. Besides these there are two (2) *Sangharamas* where they do not use either butter or milk. This is the traditional teaching of Debadatta.

S. Beal, *The Life of Hiuen Tsang*, P. 131.

Besides these there are three *Sangharamas* in which they do not use thickened milk (*U Lo*) following the direction of Debadatta (*Ti-p'o-ta-to*).

Beal, *Records of Western Countries*, Vol. II. P. 201.

১২। চণ্ডস্স কুক্কুরস্স নাসায় পিত্তং ভিন্দেয্যুং।

১৩। এখানে ভগবান উদাহরণ স্বরূপ বলিয়াছেন—মলপরিপূর্ণ কূপে, কোনো মানুষ নিমজ্জিত হইলে তাহার শরীরের বিন্দু পরিমাণ (কেশাগ্র-প্রান্তের দ্বারা বিদ্ধ করা যায় এতটুকু) স্থানও যেমন শুদ্ধ থাকে না, দেবদত্তকে যখন আমি ঠিক সেইরূপ দেখি—তখনই তাহাকে বলি—"অপায়িক, একক্কপ্পক নরকগামী" ইত্যাদি।

১৪। তুলনীয়: চুল্লবগ্‌গ, ৭।৪।৭

১৫। চেতসা চিত্তং সুপরিচিতং হোতি। তস্স এতং ভিক্খুনো কল্লং বেয়্যাকরণায়:—খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং কতং করণীয়ং নাপরম্ ইত্থত্তায়াতি পজানামীতি।

১৬ তিক্ষ্ণ বিনয়=নিষ্ঠীবনভক্ষক

১৭ তুলনীয়: উদান ৫।৮

১৮ Rockhill, *Life of Buddha*, pp. 106-7

১৯ মহাবস্তু, ২য় খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা; Rockhill p. 107

২০ পণ্ডিতোতি সমঞ্ঞাতো ভাবিতত্তোতি সম্মতো।

জলং ব যসসা অট্‌ঠা দেবদত্তোতি মে সুতং।

চুল্লবগ্‌গ, ৭।৪।৮; ইতিবুত্ত, ৮৯ এবং পূর্বোক্ত, উদান, ১।৫ দ্রষ্টব্য।

স্মৃতিরক্ষা

শ্রীকালিদাস রায়

স্মারক তোমার গড়বে শুনি তাই ত গুরু ভাবি,
তোমার স্মৃতি বোধন করার কতটা তার দাবি।
গেলে তুমি এই ধরারে নতুন ক'রে গ'ড়ে,
এই ধরাতে থেকে তোমায় ভুল্‌ব কেমন ক'রে?
গঙ্গাধারার প্রতিটি ঢেউ স্মরায় তোমায়, কবি।
উষায় হেসে দিনের শেষে স্মরায় রাঙা রবি।
ঘাটের মেয়ে, বাটের বাউল, মাঠের রাখাল দূরে,
স্মরায় তোমায় সারাটি দিন আপন আপন সুরে।
স্মরায় তোমায় বনের ঝিঁঝিঁ, কোণের পারাবত,
স্মরায় তোমায় ঘরছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ।

বন-বাগানে যুঁই সুরভি, লাল করবী, জবা,
প্রতিদিনই করছে কবি তোমার স্মৃতিসভা।
তালতরুদের মৌন ধেয়ান শাল-বীথিকার ছায়া,
সঞ্চারিছে স্বপনঘোরে তোমার স্মৃতির মায়া।
মেঘ সারা রাত পড়ে তোমার স্মৃতিশতক শ্লোক,
বৃষ্টিধারা সৃষ্টি করে তোমার স্মৃতিলোক।
বাতাস দুলায় পাখীর কুলায়—ভুলায় মোরে সবি,
মনে পড়ায় উদাস ধরায় শুধু তোমায়, কবি।
স্মরায় তোমায় সবার আদর, সবার ভালবাসা,
স্মরায় তোমায় এই জীবনের সকল তৃষা আশা।
তাই মনে হয় তোমার স্মৃতির স্তম্ভ যারা গড়ে,
তারা আপন দম্ভটাকেই দীর্ঘজীবী করে।

পতঙ্গ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সকাল বিকাল সেই ভদ্রলোক হুঁকা হাতে করিয়া প্রায়ই আসিতেন—তাঁহার নাম মহেশ ভট্টাচার্য্য। ধীরে ধীরে শচীনবাবুর সঙ্গে তাঁহার বেশ অন্তরঙ্গতা হইল। লোকটি সহানুভূতিশীল, গাছের দুটি ফল, কখনও একটু রাঁধা তরকারি হাতে করিয়া আসিয়া গল্প করিতে বসিতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, কেন অন্যত্র যাবেন, এখানেই থাকুন। আপনার সঙ্গে কথা বলে যেন বেশ আনন্দ পাই—

শচীনবাবু বলেন, কিন্তু সে ভগবানের হাত, যেখানে চাকরি পাব সেইখানেই মাথা গুঁজবার একটুখানি ঠাঁই করে নিতে হবে। ঠিক বাড়ী বলতে যা বুঝায় তা আর এ জীবনে হবে না।

মহেশবাবু বলেন, কেন?

শচীনবাবু হাসিয়া বলেন, বাড়ী মানে ত কেবল কয়খানি ঘর নয়। বাড়ীর সঙ্গে থাকে নাড়ীর যোগ—পূর্ব্বপুরুষের আর নিজের শৈশবের শত স্মৃতি বিজড়িত হলে তবেই বাড়ী হয়—

শচীনবাবু ভাবেন নিজের বাড়ীর কথা,—পিতামাতা আত্মীয় পরিজন বাড়ীতে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের কথা। তাঁহার মাতা অপত্যস্নেহে একটি নারিকেলগাছ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাহার অস্তিত্ব নাই। শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন…

'কিছু না, কিছু না—মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে আবার নূতন করে আরম্ভ করুন'—বলিয়া মহেশবাবু সন্ধ্যার অন্ধকারে বিদায় গ্রহণ করেন। শচীনবাবু একলা বসিয়া থাকেন পুঞ্জীভূত বেদনার বোঝা বুকে লইয়া। অতীতের কত স্মৃতি, দুঃখ আনন্দের কত কথা মনের মাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়—বার বার মনে হয়, ফিরিয়া যান সেই চিরপরিচিত উদার মাঠের পথে আম্রকানন ঘেরা আপনার গৃহে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, সে গৃহ আর গৃহ নাই, তা লাঞ্ছনার কণ্টকশয্যা। দুঃখ হয়—যে দেশের জন্য তাঁরা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে সে দেশে তিনি অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত, অনুগ্রহপ্রার্থী মাত্র। মহেশবাবুর সান্ত্বনাকে ছাপাইয়া কত লাঞ্ছনা আসে নিত্য জীবনের মাঝে। তবুও মন্দের ভাল যে, ঐ লোকটি সহৃদয় প্রতিবেশী। ইঁহার সান্নিধ্য হৃদয়ের ক্ষতস্থানে একটুখানি শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়।

* * * *

শচীনবাবু কলিকাতা যাইবার জন্য একটা রেলের মাসিক টিকিট করিয়াছেন।

প্রত্যহ সকালে রাঁধিয়া খাইয়া তিনি কলিকাতা রওনা হন। সেখানে পৌঁছিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যার্থ যে সকল আপিস খোলা হইয়াছে সেগুলিতে ঘোরাফেরা করেন, চাকরির জন্য দরখাস্ত পেশ করেন এবং সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে বড়বাজার হইতে বাজার করিয়া ফিরিয়া আসেন। রোজই আশা লইয়া যান, হয় ত একটা চাকরির সংবাদ পাইবেন, কিন্তু অত্যন্ত নিরাশায় দুঃখিত অন্তরে ফিরিয়া আসেন।

এমনই করিয়া তিনটি মাস কাটিয়া গিয়াছে—হাতে টাকা যা ছিল ধীরে ধীরে তাহা ফুরাইয়া আসিতেছে—শীঘ্রই হাত একেবারে খালি হইয়া যাইবে, ইহার পূর্ব্বে যদি একটু জমি সংগ্রহ না করা যায় তবে মাষ্টারী করিয়া আর তাহা হইবে না। তিনি জমি কিনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

পাঁচুবাবু সংবাদ লইয়া আসিলেন—বাবুরা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের কয়েক বিঘা জমি বিলি বন্দোবস্ত করিবেন। শচীনবাবু ভাবিয়া দেখিলেন এখানে তবুও এক ঘর আত্মীয় আছে, এখানে জায়গা কিনিলে শচীনবাবুর অবর্ত্তমানেও খোকা একজন আত্মীয় পাইবে, কিন্তু অন্যত্র খোকা একেবারেই অসহায়। যেরূপ আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে তাহাতে অচিরেই জমির মূল্য আগুন হইয়া উঠিবে, অতএব হাতে টাকা থাকিতে থাকিতে কিছু জায়গা কিনিয়া রাখা প্রয়োজন। দুই মাসে না হোক ছয় মাসে একটা চাকরি হইবেই। শচীনবাবু অনেক চিন্তা করিয়া মন স্থির করিলেন—সেলামী বিঘাপ্রতি আট শত টাকা—খাজনা বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা। আশেপাশে জমি এই দরেই বিলি হইয়াছে—বিলম্ব করা হয়ত সমীচীন হইবে না। শচীনবাবু সেদিন সারাদিন ঘুরিয়া চার শত টাকা সেলামী ও পচিশ টাকা বার্ষিক খাজনায় দশ কাঠা জমি বন্দোবস্ত করিয়া ক্লান্ত দেহে ফিরিয়া আসিলেন।

বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল তাই হাত-পা ধুইয়া একটু গুড় ও জল খাইয়া ডাকিলেন, খোকা!

খোকা কহিল, কি বাবা?

—ওই যে বড় তেঁতুলগাছ ওর পাশে বাঁশঝাড়ের পরে যে জায়গাটুকু ওখানে তোর বাড়ী হবে।

খোকা উজ্জ্বল চোখ দুইটি মেলিয়া কহিল, আমার বাড়ী!

—হ্যাঁ, দুখানি পাকা ঘর, সামনে ফুলের বাগান, আর পিছনে—

—জামরুলগাছ বাবা। আর পেয়ারা গাছ—

—হ্যাঁ—

—কবে হবে বাবা?

—এই ত চাকরি হলেই আরম্ভ করব—

—মা আসবে ত ?

শচীনবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তাহার পর কহিলেন, হ্যাঁ—আসবে বৈ কি !

বাহিরে কে যেন ডাকিল 'শচীনবাবু' 'শচীনবাবু'। হুঁকার শব্দ ও কণ্ঠস্বরে বুঝা গেল মহেশবাবু। শচীনবাবু কহিলেন, বসুন, যাচ্ছি—

মহেশবাবুর ধূমপানের রকম দেখিয়াই শচীনবাবু অনুমান করিলেন তিনি উত্তেজিত। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমাগত হুঁকা টানিতেছেন। শচীনবাবু সহাস্যে কহিলেন, বসুন মহেশবাবু—

মহেশবাবু ধুপ করিয়া বারান্দায় বসিয়া বলিলেন, মশায়, আপনার বাড়ী কোন্ জেলায়—

—যশোর—

মহেশবাবু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আপনারা সব মরতে এখানে এসেছেন কেন বলুন দেখি—আপনাদের সবাইকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করলে মনের দুঃখু যায়।

—কি হ'ল ?

—'আবার কি হবে ?' মহেশবাবু অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'আপনারা বড় সহজ পাত্র নন মশাই। কয়জন আশ্রয়প্রার্থী আমাকে এসে ধরলে যে এখানে বাড়ী করবে, সব শিক্ষিত ভদ্রলোক, কিছু জায়গা দিতে হবে। আমিও ভাবলুম সত্যিই তারা বিপাকে পড়েছে, তাই এক ভদ্রলোককে পাঁচ বিঘা জমি দিলাম। সে নাকি তার আত্মীয়স্বজনকে বণ্টন করবে, ভাল। লাভ-লোভসান ভাবি নি, দয়া হ'ল দিলাম নইলে জমি দেওয়ার দায় কি। এক শ টাকা বিঘে, আড়াই টাকা খাজনা প্রতি বিঘায়—

—তারপর—

—সেই নচ্ছার পাজী কি করেছে শুনবেন, কাঠা পঞ্চাশ টাকা আর খাজনা কাঠাপ্রতি আড়াই টাকায় তার দেশভায়েদের বিলি করেছে, প্রচুর মুনাফা নিয়ে বাড়ী আরম্ভ করেছে। কিন্তু আমি দেখে নেব, কালই উকিলের কাছে যাচ্ছি, দেখি বেটার কত টাকা আছে—

—তাতে কি হবে—জায়গাটা কোথায় ?

—ঐ ত তেঁতুলতলার পরের বাঁ হাতি জমিটা—একটা জঙ্গলে জায়গা। বিজয়নগর কলোনি হচ্ছে—ধুত্তোর নিকুচি করেছে—

শচীনবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আমিও ত ওরই পাশে জমি কিনেছি দশ কাঠা—চার শ টাকা সেলামী, ২৫৲ টাকা খাজনা—

—ঠিক হয়েছে, কেন নেবে না। আপনাদের টাকা চুষে নেবে, দোষ কি ? বাড়ীভাড়া পঞ্চাশ টাকা নেবে—এই বাজারে আমিই ভালমানুষি করে ঠকলাম।

শচীনবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, আপনার কথায় একটা জিনিষ পরিষ্কার হ'ল।

—কি ? কি হ'ল ?

—এক দল লোক জগতে এমনি লাভ করে, করবার বুদ্ধি আছে বলে; আর এক দল লোক আছে যারা আপনার মত ঠকে। ভালমানুষি করে এরা নিজের সর্ব্বস্ব খোয়ায়, আর তাদের ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে অন্যেরা বড়লোক হয়।

মহেশবাবু ক্ষণিক চিন্তা করিয়া কহিলেন, ঠিক, ঠিক বলেছেন শচীনবাবু। নইলে বাড়ী একজনে পঞ্চাশ টাকা বলে গেল, তাকে ভাড়া দিলুম না কেন জানেন ? কারণ আর একজনকে কথা দিয়েছি তিরিশ টাকা ভাড়ায় থাকতে দেব বলে।

—ঠিক তাই। আমিও আপনারই মত, এক শ টাকায় জমি কিনে হাজার টাকায় বিক্রি করিনি বলে পঞ্চাশ টাকার জমি পাঁচ শ' টাকায় কিনলাম—আমাদের মত বোকা যারা, তাদের পক্ষে ঠকাটাই স্বাভাবিক—

মহেশবাবু আরও কিছুক্ষণ নির্ব্বাপিত হুঁকা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—কিন্তু যাই বলুন আমি উকীলের পরামর্শ নিয়ে দেখব, দু-চার নম্বর দেওয়ানী করে দেখবই—

—অন্যায়ের প্রতিকার কোনকালে হয় নি, হবেও না। ওর জন্যে বৃথা টাকা খরচ করে কি হবে !

—না হোক—দেখবই কি হয়—

মহেশবাবু উত্তেজিত ভাবেই চলিয়া গেলেন।

আরও দুই-এক মাস চলিয়া গেল।

শচীনবাবু কলিকাতায় চাকুরির সন্ধানে ঘোরাঘুরি করিতে করিতে প্রায় নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু কোন সুবিধা এখনও হয় নাই। একজন হোমরা-চোমরা সেদিন একটা মাষ্টারীর জন্য তাঁহার একখানা দরখাস্ত বিশেষভাবে অনুমোদন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন—সেই চাকুরী অবশ্যই হইবে এইরূপ ধারণা তাঁহার জন্মিয়াছিল, তাই অত্যন্ত আশান্বিত হইয়া সোৎসাহেই তিনি আজ কলিকাতা রওনা হইলেন।

আশ্রয়প্রার্থীদিগের সাহায্যার্থ প্রতিষ্ঠিত সরকারী আপিসে ভিড় ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শচীনবাবু উক্ত অফিসারের সহিত দেখা করিবার জন্য বসিয়াছিলেন। বেয়ারা জানাইল, তিনি লঞ্চ খেতে গিয়াছেন দুইটার পরে সাক্ষাৎ হইবে—

অপেক্ষা করিতেই হইবে, তাই একটা বেঞ্চিতে বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ একজন খদ্দরমণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, শচীনবাবু নমস্কার !

শচীনবাবু চাহিয়া দেখেন, তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত মণিবাবু। তিনি নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেলেন।

—কি চিনতে পারছেন না ?

—চিনতে পেরেছি, কিন্তু—

—অবাক হয়ে যাচ্ছেন এই ত, তা হোন্, ক্ষতি নেই—কিন্তু এখানে কেন ? আসুন আমার ঘরে। কার সঙ্গে দেখা করবেন ?

—কমিশনার সাহেব না কে, এই ঘরে বসেন—

—অনেক দেরি আছে তাঁর আপিসে আসবার। এখনও আসেন নি—

—তিনি লাঞ্চ খেতে গেছেন—

—ওটা আমরা বলে থাকি, কিন্তু আপিসেই আসি দুটোয়—যাক্ আসুন—

শচীনবাবু মণিবাবুর পিছন পিছন চলিলেন। মণিবাবু একজন বিশিষ্ট অফিসার, ঘর আলাদা। তিনি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—বসুন শচীনবাবু—বোধ হয় চাকরির জন্য, না ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু লাখো লাখো লোকের চাকরির ব্যবস্থা কোন সরকারই করতে পারে না। আর আমরা আপনাদের দরখাস্ত পাঠালে তাতে কাজ হবে এমন কোন ভরসা তো দিতে পারছি না—কাজেই···

—হ্যাঁ, এত দরখাস্ত দিলুম, একটা চাক্‌রি পঞ্চাশ ষাট্ টাকার জুটল না !

—কি করে জুটবে ! কোন সাহায্য পেয়েছেন সরকার থেকে—

—না, শুনছি, স্কিম হচ্ছে—

—হ্যাঁ স্কিম হচ্ছে বৈকি ? স্কিম হতেই ধরুন সরকারের লাখ লাখ টাকা খরচ হ'ল। সোজা কথা ত নয়। তবে যারা কংগ্রেসের কাজ করেছে, ধরুন আমাদের মত যারা, তারা কিছু সুযোগ সুবিধা অবশ্য পেয়েছে।

শচীনবাবুর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছিল—লোকটা সজ্ঞানে কথা বলিতেছে ত ?

মণিবাবু হাসিয়া বলিলেন—কি বল হে বটু—

বটু পাশের টেবিল হইতে মাথা তুলিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—

মণিবাবু একটু থামিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন—আমরা আপনাদের রিলিফের ব্যবস্থা করতে পারি আর নাই পারি অন্ততঃ এই সব ছোটখাটো চাকরি পেয়ে নিজেরা যথেষ্ট রিলিফ বোধ করছি।

শচীনবাবুর মনটা এমন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে মণিবাবুর সহিত তাহার আর বাদ-প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন—আমি উঠি, কাজ আছে—

—বসুন—আমি নিয়ে যাবো আপনাকে তাঁর কাছে—

—থাক্, আজ আর দেখা করব না—

শচীনবাবু উঠিয়া আসিলেন। সাহায্যের কোন আশা নাই বুঝিলেও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া যাইবেন মনে করিয়া তাঁহার মুরুব্বী অফিসারের ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। একটু পরেই একটি যুবক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল—সত্য।

—সত্য !

—হ্যাঁ—স্যর, আপনি এখানে !

—হ্যাঁ, চাক্‌রীর চেষ্টায়।

—থাক্, আপনি আর এখানে আসবেন না। চলুন—আমার সঙ্গে—

—কোথায় ?

—চলুন না, অনেক কথা আছে—অনেক সংবাদ আছে। এখানে ঘুরে কিছু হবে না—চলুন।

—চল—

* * *

ডালহৌসী স্কোয়ারের একটা নিরালা জায়গায় বসিয়া সত্য কহিল—বসুন স্যর—ভাল আছেন ? খোকা ?

শচীন বাবু বসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, ভালই।

—কোথায় আছেন ?

—এই মাইল পনর দূরে—একটা ভাঙ্গা বাড়ী ভাড়া করে আছি। যা এনেছিলাম সব গেছে—

সত্য প্রশ্ন করিল—চাকুরীর চেষ্টায়, বা সাহায্যের আশায় এখানে আসেন ত ?

—হ্যাঁ।

—আর আস্‌বেন না।

—কেন ?

—মণিবাবুকে দেখেও কি বুঝতে পারেন নি ? সাহায্য করার উদ্দেশ্য ওঁদের নেই—আপনি এটুকু বুঝবেন আশা করেছিলাম।

—তা ত বুঝি নি।

—হ্যাঁ, চাকরিও এরা দিতে পারে না। চাক্‌রির সন্ধানে বৃথা ঘোরাঘুরি করে নিঃসম্বল হয়ে কি লাভ ? যাক্ সেকথা, আমাদের ওখানে চলুন আজ—

—আমাদের মানে, তোমরা কে কে এখানে আছ এখন ?

সত্য একটু লজ্জিত ভাবে বলিল—আপনি জানেন না,

অঞ্জলিকে আমি বিয়ে করেছি। সে মাষ্টারী করছে—বাসা হাওড়ায়, আমি আপাততঃ কিছু করি না—যাবেন আজ? আমরা সত্যিই খুশী হব—

—আজ ত হয় না সত্য! বাসায় খোকা একা, সন্ধ্যায় পৌঁছুতেই হবে আমাকে।

—তবে থাক্, এক দিন সকাল সকাল যাবেন। সত্য আগ্রহ সহকারে ঠিকানা ও যাইবার রাস্তা বলিয়া দিল।

শচীনবাবু বলিলেন, কিন্তু বড়ই বিপন্ন বোধ করছি আজ। আর এক মাসের মাঝে চাকরি না পেলে খোকাকে আর আমাকে অনাহারে মরতে হবে—

সত্য হাসিয়া বলিল, আপনার মত সরল যাঁরা, তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অনাহারে মৃত্যু—

—কেন?

—সরকারের উপর আপনার আস্থা আছে বলেই একথা বলতে হ'ল। এঁদের কাছে বেশী আর কি আশা করতে পারেন। অথচ এঁদেরই কথায় আমরা জেলে গিয়েছিলাম—আপনি গৃহহীন। কিন্তু আমরা আজ সব দিক দিয়ে বঞ্চিত। জমির দাম দশগুণ, ঘরের ভাড়া বিশগুণ, ধনিকরা বেশ দু'পয়সা করে নিয়েছে আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করে, তারা ফেঁপে উঠছে আমাদের শোষণ করে। নেতারা দেশসেবায় মূলধনকে সুদশুদ্ধ আদায় করে ঘরে তুলছেন, কিন্তু আজ আমরা আশ্রয়প্রার্থী মাত্র, এ ছাড়া আমাদের অন্য পরিচয় নেই, আমরা অত্যন্ত করুণার পাত্র, ভিখারী।

বলিতে বলিতে সত্য উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। শচীনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, কিন্তু কয়েকজনের অনাচারের জন্য এতবড় একটা মহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি এমনি দোষারোপ করতে পার না তুমি—এ তোমার অভিমান!

—অভিমান নয় স্যর। আমি সাহায্য পাই নি, চাকরি পাই নি, টাকা পাই নি বলে আমার অভিমান নয়। যেদিন আপনার পদধূলি নিয়ে পুলিসের লাঠির সামনে মাথা পেতে দিয়েছিলাম সেদিন চেয়েছিলাম দেশের মুক্তি, তার বিনিময়ে যশ খ্যাতি অর্থ কিছুই আমার কাম্য ছিল না। আজও নিজের জন্যে কিছু চাই না, কিন্তু দুর্ব্বলের শোষণদ্বারা কাউকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া কাপুরুষতা। আমরা জীবনপণে তার প্রতিরোধ করব—পুঁজিবাদীর স্পর্দ্ধা স্বীকার করব না, তার অহমিকাকে ধূলিসাৎ করব—যেমন করে একদিন বলেছিলাম ভারতকে স্বাধীন করব···

—তোমার কথা শুনে আজ সন্দেহ হয় যে···। তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সত্য বলিল, আমি সাম্যবাদী। যে নামই আমাকে দিন, কিন্তু আমি জানি আমরা এসেছি মরতে। তবে আপনি মরবেন অনাহারে, আমরা মরব গুলির আঘাতে, এই তফাৎ।

—তার মানে?

—এই পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় আমাদের মত যারা নিঃশেষে নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে যায়। তাদের রক্তের উপরে গড়ে ওঠে নূতন সম্পদ, নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র—তারা তার ফলভোগ করে না। তারা আত্মবলি দিতেই জন্মায়, কিন্তু তাদেরই শোণিতে পৃথিবীর গ্লানি দূর হয়, আর যারা সুবিধাবাদী তারা সেই সুযোগে নিজেদের আখের গুছিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে। জগতের এই নিয়ম—

—জগতের এই নিয়ম?

—হ্যাঁ, যে সমস্ত সৈনিকের রক্তপাতের ফলে নেপোলিয়নের বিজয়স্তম্ভ গড়ে উঠেছিল তারা কি পেয়েছে জগতে? যিশুর মানবপ্রেমের পুরস্কার ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু। এমনি আরো কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। তাই বলছি ক্ষমতার মোহে যারা আজ মত্তপ্রায় তাদের কাছে আপনি কি আশা করেন?

শচীনবাবু চিন্তান্বিতভাবে বলিলেন, কিন্তু এত লোককে সরকার কি করে সাহায্য করতে পারেন?

—কেন? যুদ্ধ হলে লক্ষ লক্ষ লোককে সৈন্যবাহিনীতে ভর্ত্তি করা হয় না? সে যাক্, যারা আমাদের মাথায় একদিন লাঠি মেরেছে তারাই আজ স্বাধীন দেশের পুলিসরূপে শান্তি রক্ষা করছে। পঞ্চাশ টাকার জন্য আত্মহত্যাকে খুন ও খুনকে আত্মহত্যা প্রতিপন্ন করছে, যে হাকিমেরা ব্রিটিশের গোলামী করবার সময় বিচারের নামে চূড়ান্ত অবিচার করেছেন তাঁরাই আজও হাকিমরূপে বিরাজ করছেন; সেই আদালতে সেই কেরাণীকুলই রয়েছে। সেই কালোবাজার সমানে চলেছে—তারা আজ সুন, কাল চিনি লোপাট করে ফেঁপে উঠছে—সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে উঠছেন কর্ত্তারা। এ অবস্থায় পুনরায় বিপ্লব অনিবার্য্য—আপনি এদের কাছে কিছু আশা করবেন না স্যর। যদি বাঁচতে চান তা হলে আত্মক্ষমতায়ই বাঁচতে হবে—সাহায্যপ্রার্থী হলে অনাহারেই মরতে হবে।

—আবার বিপ্লব?

—হ্যাঁ, যদি এঁরা জনগণকে ভালবাসতে না পারেন, নিজেদের স্বার্থ ও সুখকেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন তবে গণশক্তির বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত।

অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কথাগুলি বলিয়াই সত্য যেন হাঁপাইয়া উঠিল। সে দ্রুত নিশ্বাস লইতে লাগিল। মানসিক উত্তেজনা একটু শান্ত হইলে পুনরায় বলিতে লাগিল—কেন ভারতে অনাবাদী জমির তো অভাব নেই। বিদেশ থেকে খাদ্য না এনে রেফুজিদের দিয়ে সেই পতিত জমি আবাদ করান

যায় না? তা হলে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হতে কত দিন লাগে? কিন্তু সে সদিচ্ছা কোথায়? আমরা তাদের চোখে ভিখারী মাত্র।

শচীনবাবু কহিলেন, শিশুরাষ্ট্র কত দিকে সামলাবে? আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—

সত্য অধিকতর উত্তেজিতভাবে কহিল, শিশুরাষ্ট্র বলেই ত অন্তর্বিপ্লবকে ভয় করা দরকার, এমন ভাবে দেশকে গড়ে তোলা দরকার যাতে বিপ্লবের সুযোগ না থাকে, লোকের মনে অসন্তোষ না জাগে। কিন্তু নিজেদের উদরপূর্ত্তি করতে গিয়ে এরা আর পুঁজিবাদীরা এমন অসন্তোষের বহ্নি জ্বালিয়েছে যে মানুষ অতিষ্ঠ এবং অধীর হয়ে উঠেছে।

শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, সে যাক্, আজকাল কি করছ?

—যা বললাম ওই করছি স্যর। আমাদের অভিযান এই সব দেশদ্রোহীর বিরুদ্ধে—তাদের এই চোরাকারবারলব্ধ টাকা, ঘুষের টাকা ভোগ করতে দেব না। নিজেদের জীবন দিয়েও এই অনাচার প্রতিরোধের চেষ্টা করব।

—বিপ্লব করবে?

—হ্যাঁ, আপনার অজানা নেই—দিদিমণির কাছে যা ছিল তা এখনও আছে আরও সংগ্রহ করেছি। আমরা বিপ্লব করব, সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে আসি নি সংসারে। তাই মরব কিন্তু অন্যায়ের কাছে, অবিচারের কাছে মাথা নীচু করব না। আপনার মত বিনা প্রতিবাদে অনাহারে মরতে পারব না আমরা। জীবন তুচ্ছ, তা আহুতি দেব আমরা, আমি একা নয়—বহু জন···

—কিন্তু—

—কিন্তু নেই স্যর। আপনার স্ত্রীর রক্তে যে দেশের মাটি রঞ্জিত হয়েছে, সে দেশ আপনাকে কি দিয়েছে? আপনি মরবেন অনাহারে, খোকা ভিখারীর মত অসহায় হবে পৃথিবীতে—

শচীনবাবু চম্‌কাইয়া উঠিলেন—খোকা অসহায় হবে পৃথিবীতে!

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে সত্য উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ আপনার তালুতে মুষ্টির আঘাত করিয়া কহিল—প্রতিশোধ নেব, অত্যন্ত নির্ম্মম প্রতিশোধ নেব ওই মণিবাবুদের উপর, মাথা নীচু করব না। সেইজন্যেই অঞ্জলিকে···যাবেন, আমাদের ওখানে, দেখবেন কত ব্যাপক আমাদের আয়োজন—

সত্য উন্মাদের মত দ্রুতপদে চলিয়া গেল, একবারও পিছন পানে চাহিল না। সশব্দে গেটের দরজাটা ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। শচীনবাবু সবিস্ময়ে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই সেই সত্য! শান্ত স্থির সমবেদনা-কাতর সদাহাস্যময় সত্য! এ কি হইয়া উঠিয়াছে—ও যেন উন্মত্ত প্রলয়ঝটিকা বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া হাঁপাইতেছে।

শচীনবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার জন্য হাঁটিয়াই হাওড়া রওনা হইলেন। সত্যর এতগুলি উত্তেজনাপূর্ণ কথার কোনটিই তাহার হৃদয়কে দোলা দেয় নাই কিন্তু একটা কথা তাঁহার অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাকে যেন উন্মথিত করিয়া দিয়াছে। তার মৃত্যুর পরে খোকা হইবে ভিখারীর মত অসহায়! সত্যই ত আজ যদি আকস্মিক ভাবে তাহার মৃত্যুই হয় তবে মীরার এত আদরের খোকা কোথায় দাঁড়াইবে! কোথায় যাইবে, তাহার অবর্ত্তমানে খোকার কি গতি হইবে—তাঁহার চোখ দুইটি বার বার জলে ভরিয়া উঠিতেছিল—

অন্যমনস্কভাবে সেকথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিলেন—একখানা মোটর প্রায় তাঁহার গা ঘেঁসিয়া যাইতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। এমনি করিয়া অকস্মাৎ যদি মোটর চাপা পড়েন!

শচীনবাবু আর ভাবিতে পারেন না—

এক জন বাস্তত্যাগী ভিক্ষার্থী ট্রেনে ভিক্ষা করিতেছিল। শচীনবাবুর মনে হইল তিনিও যেন ভিখারী হইয়া পড়িয়াছেন, খোকা অনাহারে রহিয়াছে।

সত্যর কথা কয়টি ক্রমাগত তাঁহার মনে আনাগোনা করিতেছিল, তদুপরি যে মোটরটি তাঁর গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল সেটি যেন ভাবী অশুভ ঘটনার আভাস দিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অন্তরের বেদনার ভার গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল। কোনমতেই তিনি তাহাকে চাপিয়া আত্মস্থ হইতে পারিতেছিলেন না—বার বার চোখ ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল···

সহসা তাঁহার মনে হইল, বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, সৎ অসৎ যে কোন উপায়ে হোক্ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। খোকাকে এমনি অনুদার পৃথিবীতে একাকী ফেলিয়া কোনমতেই অকালে মরা যায় না।

ভাবিতে ভাবিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বাঁচিতেই হইবে। সত্যদের বৈপ্লবিক কার্য্যের সহায়ক হইয়াও বাঁচিতে হইবে। তিনি কোনমতেই মরিতে পারেন না। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করিয়া তাঁহাকে বাঁচিতেই হইবে।

শচীনবাবু নিঃশব্দে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এক দিকে মহেশবাবুর সেই প্রজা ও স্থানীয় বাবুরা অসহায় দরিদ্রদের শোষণ করিয়া নিজেদের উদর স্ফীত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না, অন্য দিকে সত্য উন্মাদের মত ছুটিয়াছে কাহার আহ্বানে কে জানে! তাহার মত পতঙ্গধর্ম্মীরা আদর্শের আগুনে নিজেদের পোড়াইয়া ভস্ম করিতেছে, আর অন্যেরা সেই ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া উৎসব করিতেছে বাস্তব পৃথিবীর অনুদার আঙ্গিনায়। এই পৃথিবী! ইহাই পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস—

শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া বাহিরের ঘনীভূত অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিলেন।

আরও একমাস পরের কথা—

তিনি চাকুরির জন্য কয়েকখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটিতে ফল হইল। বর্ত্তমানে নিকটেই একটি স্কুলে তিনি একটি মাষ্টারী পাইয়াছেন, বেতন ৫০৲ টাকা, একটি টিউসনিও জুটিয়াছে স্কুলের পরে পড়াইয়া আসেন, তাহাতে রোজগার হয় ১৫৲ টাকা। বাড়ীভাড়া দিলে বাকী চল্লিশ টাকায় দুই জনের কোনমতে চলিতে পারে।

কয়েক মাসে হাতের জমানো টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, কয়েকটি মাত্র টাকা ছিল তাই দিয়া টায়টোয় মাসের কয়েকটি দিন কাটাইতে হইবে, তারপরই মাহিনা পাইবেন। দিন একরূপ চলিয়া যাইবে। টিউশনি দুই একটা পাইলে ভালই চলিবে।

তাঁহাকে যাইতে হয় গাড়ীতে, মাসিক টিকিট আছে কিন্তু এদিক ওদিক দুই মাইল হাঁটিতে হয়, তাহাতে ক্লান্তি আসে। সকালে তাড়াতাড়ি রাঁধিয়া খাইয়া ৯টায় গাড়ী ধরেন, বৈকালে ৭টায় ফেরেন। খোকা আপনমনে খেলা করিয়া বেড়ায়; একটু পড়াশুনাও করে।

বর্ষাকাল। বেশী বৃষ্টি হইলে ফাটলধরা ছাদ দিয়া জল পড়ে, সারারাত্রি বিছানা এদিক ওদিক টানিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়। গতরাত্রি তাই শচীনবাবুর ঘুম হয় নাই, ঘরের মাঝে ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়াছিলেন।

সকালে যৎসামান্য কিছু রাঁধিয়া ও বৈকালের রুটি তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া তিনি নয়টায় গাড়ী ধরিয়াছেন। মাঝে মাঝে বৃষ্টি, আর ভাপসা গরমে শরীরে একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন, বৈকালে যাহা তিনি খান তাহাতে অত্যধিক খরচ হইতেছে, এত পয়সা খরচ করিলে চলিবে না।

বৈকালে চায়ের দোকানে যাইবার পথে দেখিলেন বেগুনি ফুলুরীর দোকান, বেশ সস্তায় পেট ভরে, তিনি চার পয়সার বেগুনি খাইয়া ও চা পান করিয়া পড়াইতে গেলেন।

ফিরিবার মুখে পেটে অসহ্য বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। ষ্টেশনে নামিয়া আষাঢ়ের অশ্রান্ত বর্ষণে ভিজিয়া কোনমতে বাসায় পৌছিলেন, কিন্তু এত দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

বর্ষণে ঘর ভিজিয়া গিয়াছে, বিছানা পাতিবার স্থান নাই। খোকা ছাতা মাথায় দিয়া লণ্ঠন জ্বালাইয়া একাকী বসিয়া আছে নির্ভীক ভাবে। আজ কোন আত্মীয় আর আসেন নাই খোঁজ করিতে, এমনি বর্ষণে বাহির হওয়া যায় না।

শচীনবাবু বলিলেন, খোকা, বড্ড পেটে অসুখ করেছে, তুই রুটি দুখানা খেয়ে শুয়ে পড়, আমি রাত্রে আর খাব না।

ঘরের যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক সেই স্থানটায় সংক্ষিপ্ত বিছানা পাতিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন, খোকা গুড় রুটি খাইয়া একপাশে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার, ঘন বর্ষণের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে বাতাসের গর্জ্জন—সমস্ত গ্রাম নিঝুম, যেন অন্ধকার-সমুদ্রের তলদেশে ঘুমাইয়া আছে। কিছুক্ষণ বাদে শচীনবাবু শরীরে একটা অসম্ভব জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন, সারা দেহের ভিতরে বাহিরে কে যেন লঙ্কাবাটা লাগাইয়া দিয়াছে। হাতে পায়ে খিল ধরিয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে অপরিসীম অব্যক্ত যন্ত্রণা।

শচীনবাবু সম্ভবতঃ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, জাগিয়া অনুভব করিলেন ছাদ হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে। জলের ছাটে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। তিনি একটু সরিয়া শুইতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না, হাত-পা অবশ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি কি মরিতে বসিয়াছেন! সঙ্গে সঙ্গে অজস্র অশ্রুধারায় গণ্ড ভাসিয়া গেল, খোকা, অসহায় নিঃসম্বল—ও জগতে কেমন করিয়া বাঁচিবে? ওর যে আর কেহ নাই।

খোকাকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ, ডাকিবার শক্তি নাই। পরক্ষণে ভাবিলেন—থাক্, ঘুমাইয়া থাক্, যদি তিনি মরিয়াই যান তবে নিশীথ রাত্রের এই অন্ধকারে মাতৃহীন শিশু ভয়ে ভাবনায় অসাড় হইয়া যাইবে, কেমন করিয়া মৃত পিতাকে লইয়া ও রাত্রি কাটাইবে। এই দুর্য্যোগে কোথায় যাইবে!

—হায়! হায়! এই কি তাঁহার জীবনের শেষ, এমনি করিয়া তাঁহার আদরের খোকাকে তিনি পথের ভিখারী করিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—ভগবান কয়েকটি বৎসর আমায় পরমায়ু ভিক্ষা দাও—আমার নিজের জন্য নয়,—খোকার জন্য, মীরার জন্য, যে মীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য মরিয়াছে—

বুকের উপর টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে, হিমশীতল দেহকে নাড়িবার ক্ষমতা নাই তাঁহার। প্রাণপণ শক্তিতে তিনি ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, খোকা! কিন্তু কণ্ঠস্বর চির দিনের মত শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দেহ চিরতরে নিষ্ক্রিয়, নির্জ্জীব, অসাড়।

ভোরবেলা বাদলের মাতন থামিয়াছে—

পূবের আকাশ পরিষ্কার, খোলা জানালা দিয়া আলো আসিয়াছে, ঘরের মাঝে স্পষ্ট দেখা যায়। পাখীরা ভিজা ডানা ঝাড়িয়া ডাকিতেছে। খোকা জাগিয়াছে—কিন্তু বিছানা

ভিক্ষা, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আপনমনেই কহিল, সব ভিজে গেছে—

ডাকিল, বাবা! বাবা!

পিতা উত্তর দিলেন না। সে উঁবু হইয়া বসিয়া ডাকিল, বাবা!

পিতা নিরুত্তর।

বাবা কেমন করিয়া তাকাইয়া আছে, দেখিলে ভয় হয়, চোখ দুইটি যেন যাতনায় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। চোখের কোণে গালের উপরে অশ্রুর দাগ শুকাইয়া রহিয়াছে।

খোকা কহিল, বাবা কাঁদছ কেন? বাবা!

কোন উত্তর নাই। খোকা তাঁহার গায়ে একটা ধাক্কা দিল, দেহ হিমশীতল, বাবা কথা বলে না, কেমন করিয়া যেন তাকাইয়া আছে।

ভয়ে দুঃখে খোকা কাঁদিয়া ফেলিল।···

চোখ মুছিয়া দেখে বাহিরে সুস্পষ্ট দিনের আলোক! একটি অজানা ভয় ও দুর্জ্ঞেয় অস্বস্তিতে সে বাহিরে আসিল, বৃষ্টিধৌত আলোকিত রাস্তা, সে তাহাই বাহিয়া চলিতে আরম্ভ করিল—তার পর বড় রাস্তা। বড় রাস্তায় কত গাড়ী চলিয়াছে। সে চারি পাশের ঘরবাড়ী, গাড়ী, যানবাহন দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিল। সুন্দর, রঙীন গাড়ী, দো-তলা তিন তলা বাড়ী, বড় বড় গাছ, রাশি রাশি তার কত দূরে গিয়াছে;– কত দূর···

আপন খেয়ালে চলিতে চলিতে সে আসিল একটা স্থানে—বিরাট ঘর, বহু লোকজন। রেলের গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া আসিয়া চলিয়া গেল। কত বড় গাড়ী, কত বেগে যাইতেছে, মাটি কাঁপিয়া উঠিতেছে এত তার শক্তি।

খোকা একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া দেখিতে লাগিল।···

একখানা গাড়ী আসিল, সকলে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ীতে উঠিতেছে। মজার ব্যাপার, অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে সেও গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গাড়ী গড় গড় করিয়া চলিবে—কি আনন্দ, কি মজা!

গাড়ী চলিয়াছে—বন, মাঠ, গ্রাম, শহর অতিক্রম করিয়া। খোকা জানালায় বসিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখে,—গাছ ছুটিয়াছে, মাঠ ছুটিয়াছে গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া···

কিন্তু ক্ষুধা পাইয়াছে বেজায়, কাল রাত্রিতে দুইখানি মাত্র রুটি খাইয়াছে সে। এখন বেলা হইয়াছে। কে এক জন হাঁকিতেছে, চানাচুর,—গরম গরম—

খোকা লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। লোকে এক-এক আনা দিয়া কিনিয়া তাহারই সামনে বসিয়া খাইতে লাগিল। পাশের লোকটি বসিয়া চোখ বুজিয়া চিবাইতেছে, দাঁতে দাঁতে কট্‌মট্ শব্দ হইতেছে।

খোকা কহিল, আমায় চারটা পয়সা দেবেন—ঐ খাবো—

খোকার ভাষায় দেশজ টান ছিল। একজন যাত্রী বলিল, না, এই রিফুজিগুলোর জন্যে আর চলা যায় না। পথে-ঘাটে সব জায়গায় ভিক্ষে—

খোকা সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। লোকটা কি বলিল, সে বুঝিতে পারে নাই। অন্য ব্যক্তি কহিল—ওঁরা এসেছেন দয়া করে—এখন মাথায় করে রাখো। গাড়ীতে চলবার যো নেই, পথে চলার যো নেই···তিনি আরো কি বলিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু অন্য এক ভদ্রলোক বাধা দিলেন। তিনি একটি চানাচুরের প্যাকেট কিনিয়া খোকার হাতে দিলেন, খোকা তাহা চিবাইতে চিবাইতে জানালার বাহিরে তাকাইয়া ধাবমান গাছপালা দেখিতে লাগিল, কৌতুকভরে—পরম বিস্ময়ে—

ওদিকে রেফুজি সমস্যা লইয়া দুই ভদ্রলোকের মধ্যে বচসা সুরু হইয়াছে।

খোকার এসবে আগ্রহ ছিল না—সে কিছু বুঝিতেও পারে না। সে জানালার কাছে ঘন হইয়া বসিল—সম্মুখে উদার মাঠ, উন্মুক্ত প্রান্তর—ধাবমান বৃক্ষশ্রেণী!

পৃথিবী ঘুরিতেছে আপন অক্ষের উপর—অবিরাম, অশ্রান্ত গতিতে।

গতির সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসে যুক্ত হইতেছে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়ার অনন্ত কাহিনী। মানুষের বুকের রক্তে সিক্ত হইতেছে পৃথিবীর ঊষর মৃত্তিকা, মানুষ বিত্ত অর্জ্জন করিতেছে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। যারা পতঙ্গধর্ম্মী তারা ছুটিয়া চলিয়াছে আদর্শের ভাস্বর বহ্নিশিখার পানে—তাহারা নিজেরা পুড়িয়া, পোড়াইয়া পৃথিবীকে দিতেছে আবর্ত্তনের শক্তি। পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহাদের বুকের রক্তে উর্ব্বর হইতেছে ধূসর মৃত্তিকা, শ্যামল হইতেছে পাণ্ডুর মাঠ। ভস্মীভূত পতঙ্গস্তূপের উপর যুগে যুগে উঠিয়াছে মণিবাবুদের মর্ম্মর প্রাসাদ। এমনি করিয়া গিয়াছে মীরা, শচীনবাবু। সত্য ছুটিয়াছে সম্মুখের পানে পৃথিবীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে··· ভবিষ্যৎকে সুন্দর করিতে···ভাবীকালের আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে।

পৃথিবী ছুটিয়াছে—

জানি না এই অনুদার নিষ্ঠুর স্বার্থান্ধ পৃথিবীর বুকে খোকা আজও বাঁচিয়া আছে কি-না।

সমাপ্ত

বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোথায় ?

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ডি

কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশন হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে ও পরে সম্মেলনের প্রতিনিধিদিগকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মেলনে পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বিশেষ সম্মান ও সমাদরলাভ করিয়াছেন। কিন্তু 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব্ কালচার'এর কলিকাতাস্থ ভবনে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনা সভায় কয়েক জন খ্যাত-নামা পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনিয়া ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, এরূপ সম্মেলনের সার্থকতা সম্বন্ধে অনেকের মনে ঘোরতর সন্দেহ আছে। যাঁহারা এ বিষয়ে সন্দিহান তাঁহাদের মতে ইতিহাসের দিক হইতে আলোচনা করিলে অথবা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় যে, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যুদ্ধবিরতি ও বিশ্বশান্তি যে আসিতে পারে এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে শান্তি অপেক্ষা যুদ্ধের উপকারিতা কম নহে। যুদ্ধে অনেক লোকক্ষয় ও ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু তাহার ফলে মানবসমাজের অনেক মঙ্গলও হয়। বিগত মহাযুদ্ধ সমুদ্রমন্থনের ন্যায় অনেক বিষোদ্গার করিলেও ভারত ও অন্যান্য দেশের মুক্তিরূপ অমৃতফলও প্রসব করি-য়াছে। অতএব বলিতে হয় যে, বিশ্বশান্তি সম্ভবও নহে আর বাঞ্ছনীয়ও নহে। যদি তাহাই হয় তবে এই বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা কোথায় ?

দার্শনিক দৃষ্টিতে এই বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে এবং তাহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি সম্ভব ও কি অসম্ভব তাহা বোধ করি কোন সাধারণ মানুষ বলিতে পারে না। অনেক জিনিষ এককালে অসম্ভব ও অভাবনীয় বলিয়া মানুষের মনে হইত। কিন্তু এখন এরূপ অনেক কিছু শুধু সম্ভব হয় নাই, একেবারে কার্য্যকরী দৈনন্দিন ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কে ভাবিত যে মানুষ আকাশে উঠিতে ও বিচরণ করিতে পারিবে ? কিন্তু আজ কে না জানে যে কিছু অর্থব্যয় করিলেই আকাশে ভ্রমণ করিতে পারা যায় ? সেইরূপ আজ ইতিহাস বা মনুষ্য প্রকৃতি দেখিলে বিশ্বশান্তি সম্ভব বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে কোনকালে সম্ভব নয় সেকথা বলা যাইতে পারে না। দেশ ও কালের আদি নাই, অন্ত নাই, শেষ নাই। যাহা এদেশে হয় না তাহা অন্য দেশে হইতে পারে; যাহা একালে হয় না তাহা অন্যকালে হইতে পারে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা বলিবেন যে স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলে অনেক জীবাত্মা ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করে এবং সেখানে কোন দ্বন্দ্ব, কলহ বা অশান্তি ভোগ করে না। লোকান্তরিত জীবাত্মারা যে আমাদের মত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে তাহা একটু কটুকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। অতএব বিশ্বশান্তি যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলা যায় না। অবশ্য একথা সত্য যে মানুষের এখনকার প্রকৃতি দেখিলে বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া একেবারে অসঙ্গত নয়। কিন্তু এবিষয়ে দুইটি কথা বলা যাইতে পারে। মনুষ্য-প্রকৃতিতে দুইটি ভাব আছে। উহাদের মধ্যে একটি পাশবিক, অপরটি প্রজ্ঞাত্মক ও বিচারবুদ্ধিগত। একটি মানুষকে পশুত্বের নিম্নস্তরে টানিতেছে, অপরটি দেবত্বের উচ্চস্তরে আকৃষ্ট করিতেছে। এই দুইটিকেই মানুষের মধ্যে স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা ভাল মানুষ মন্দ মানুষ, পাপী ও পুণ্যাত্মা লোক প্রভৃতি প্রচলিত ব্যবহারিক শ্রেণীভেদ নিরর্থক হইয়া পড়িবে। যত দিন মানুষের মধ্যে পাশবিকতা (animality) থাকিবে তত দিন পশুদের মত মানুষ হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিবেই।

কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে। ইহা তাহার প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি (rationality)। ইহা যে মানবেতর প্রাণীর মধ্যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না, কারণ পশুরাও তাহাদের ভালমন্দ, ইষ্টানিষ্ট, কতকটা বুঝে বলিয়াই মনে হয়। মানুষ তাহার বিচারবুদ্ধির সাহায্যে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তির চেষ্টা করে। কোন মানুষই দুঃখ চাহে না। সকলেই সুখ ও শান্তি কামনা করে। যদি মানুষের পশুস্বভাব অপেক্ষা এই বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাস্বভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ দেবত্বের স্তরে উঠিতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, মানুষের কোন্ দিকটা প্রবল আর কোন্ দিকটা দুর্ব্বল। যদি মানুষের পশুপ্রকৃতিই প্রবল হয়, তবে বিশ্বশান্তি যে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর যদি তাহার বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দিকটা প্রবল হয় বা প্রবল হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে বিশ্বশান্তিও সম্ভব হইবে। আর এক কথা এই যে, ক্রমবিকাশের (evolution) নিয়ম অনুসারে মানুষ ক্রমোন্নতির দিকে চলিয়াছে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণতা ও প্রসারতালাভ করিয়া তাহাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নত করিয়াছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির যতটা উন্নতি হইয়াছে তাহার নৈতিক চরিত্র বা আধ্যাত্মিক ভাবের সে পরিমাণ স্ফুরণ হয় নাই। বোধ হয় এইজন্যই আজ মানুষ

বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের অপপ্রয়োগ করিয়া শান্তির পরিবর্ত্তে পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাসের এরূপ ঘটনাবলী দেখিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইবার কারণ নাই। যেমন কোন বালকের হাতে একটা অস্ত্র দিলে সে প্রথমে তাহার অনাবশ্যক ব্যবহার বা অনুচিত প্রয়োগ করে এবং তাহার জ্ঞানবুদ্ধি হইলে তাহাতে নিবৃত্ত হইয়া অস্ত্রটির সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ সভ্যতার বর্ত্তমান স্তরে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ হইলেও উহার উচ্চতর স্তরে যে উন্নত-চরিত্র ও বিজ্ঞ-মনুষ্যকুলের আবির্ভাব হইবে তাহাতে বিজ্ঞানকে মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত প্রয়োগ করা হইতে পারে। অতএব বর্ত্তমানকালের বিভীষিকা দেখিয়া চিরকালের জন্য বিশ্বশান্তির আশা-ভরসা ত্যাগ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না, কারণ বর্ত্তমান যুগ অনন্তকালের এক ক্ষণ মাত্র।

এখন বিশ্বশান্তি যে সম্ভব তাহা স্বীকার করিলেও কোন বিশ্বশান্তি সম্মেলন দ্বারা এই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারা যায় কিনা তাহা বিবেচ্য। কারণ তাহার উপরই এরূপ সম্মেলনের সার্থকতা স্থূলত: নির্ভর করে। এ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সাফল্য চতুর্বিধ অবস্থা বা সর্ত্তসাপেক্ষ।

প্রথমত:, এই বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে যাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহাদের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিবর্গের প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। অবশ্য দুর্ব্বল বা পরাধীন দেশগুলির প্রতিনিধি থাকিবেন না একথা বলিতেছি না। পৃথিবীতে যুদ্ধের বিরতি ঘটাইয়া শান্তি স্থাপন করিবার দায়িত্ব প্রধানত: শক্তিমান জাতিগুলিরই। যাহারা দুর্ব্বল বা অশক্ত তাহারা ত এমনিই শান্তি কামনা করে। কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি থাকিবে, না যুদ্ধবিগ্রহ চলিবে তাহা তাহাদের ইচ্ছা বা কথার উপর নির্ভর করে না। যাহাদের যুদ্ধ করিবার শক্তি আছে, তাহাদেরই যুদ্ধ বিরতির ও শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার অর্থ হইতে পারে। যেমন শক্তিমান ও শাস্তিদানে সক্ষম ব্যক্তির মুখেই ক্ষমা ও অহিংসার কথা সাজে, কিন্তু হীনবল ও কাপুরুষের পক্ষে উহা হাস্যাস্পদ হয়, সেইরূপ বিশ্বের শক্তিমান জাতিগুলির পক্ষেই শান্তির কথা বা প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে। এইজন্যই বলিতেছি বিশ্বশান্তি সম্মেলনে সকল শক্তিমান জাতির প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত:, বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দেশের জনসাধারণের ও শাসকশ্রেণীর যথার্থ প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যায় কিনা তাহা দেখিতে হইবে। কারণ এসব ব্যক্তির শান্তিপ্রচেষ্টায় যদি তাঁহাদের দেশের লোকের ও সরকারের সহানুভূতি ও সমর্থন না থাকে তবে তাঁহাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া কথায় পর্য্যবসিত হইবে। অবশ্য তাঁহারা তাঁহাদের দেশের সরকারের নিকট হইতে কোন লিখিত সনদ আনিবেন এমন কথা নয়। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যে দেশের ও দশের সহানুভূতি ও অনুমোদন থাকা আবশ্যক, নতুবা তাঁহাদের শান্তিপ্রচেষ্টা সফল হইবে না।

তৃতীয়ত:, সম্মেলনের প্রতিনিধিরা যে সব দেশ হইতে আসিয়াছেন সে সব দেশের সরকারের শান্তি-সম্মেলনের প্রস্তাবাদি মানিয়া লইয়া তদনুসারে কাজ করিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক। তাঁহারা যাহা ভাল বলিয়া মনে করিবেন এবং যে সব পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিবেন, তাঁহাদের দেশের শাসকবর্গকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে ; নতুবা তাঁহাদের সব কাজই বিফল হইবে।

শান্তি-সম্মেলনের সাফল্যের জন্য আর একটি জিনিষ অত্যাবশ্যক। যে সব প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করিবেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু না হইয়া বিশ্ব-শান্তিমাত্রই হওয়া দরকার। ইহার মধ্যে কোন ছল-চাতুরী বা কূটনীতি থাকিলে চলিবে না। এমন না হয় যে, শান্তি-সম্মেলনের নাম করিয়া কোন দেশ বা জাতির স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে বা একটা রাষ্ট্রগোষ্ঠী (bloc) সৃষ্টি করিয়া নিজ দেশের সাপক্ষে দল ভারি করিবার ফন্দী হইতেছে এবং পরে আবশ্যকমতে উহার সদ্ব্যবহার করা হইবে। আবার এমনও না হয় যে শান্তির বাণী প্রচার করিয়া কোন কোন দেশ বা জাতিকে অস্ত্র ত্যাগ করাইবার বা তাহার দেশরক্ষা-প্রচেষ্টা শিথিল করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অবশ্য বর্ত্তমান বিশ্বশান্তি সম্মেলনে এমন কিছু হইতেছে তাহা বলিতেছি না, কেবল এরূপ সম্মেলনের সাফল্য যে বহুলাংশে প্রতিনিধিদের সাধু উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে তাহাই বুঝাইতেছি।

এখন আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, বিগত বিশ্বশান্তি সম্মেলনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারিটি সর্ত্ত প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা। প্রথম তিনটি সর্ত্ত যে পূরণ করা হয় নাই তাহা নি:সন্দেহে বলা যায়। কারণ সম্মেলনে যে সব প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পৃথিবীর কোন কোন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তির কোন লোক ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়নের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক দেশ হইতে কোন প্রতিনিধি স্থানীয় শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। তাহার পর যাঁহারা সম্মেলনে আসিয়াছিলেন তাঁহারা নিজ নিজ দেশের ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার কোন দাবি রাখেন না। তাঁহারা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবেই সম্মেলনে যোগদান করেন। তৃতীয় কথা, যে সব দেশ হইতে এক বা একাধিক ব্যক্তি এই সম্মেলনে

আসিয়াছিলেন সেখানকার জনসাধারণ বা শাসকশ্রেণী ইহার প্রদর্শিত পথে চলিতে বা নির্দ্দেশ মানিতে প্রস্তুত নহেন, এমন কি এই সম্মেলনের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য বা সহানুভূতি দেখা যায় না। অবশ্য চতুর্থ সর্ত্ত, অর্থাৎ সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই বুঝিতে পারি না। অতএব এ বিষয়ে আমাদের কোন দিকে কিছু না বলাই ভাল। এ সব কথা ভাবিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, এরূপ সম্মেলনের সাফল্য বা উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন কোন লোকের মনে সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ একজন বিশিষ্ট শান্তিবাদী ও শান্তি-সম্মেলনে আস্থাবান ব্যক্তি। বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের কলিকাতায় যে অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি যে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষ যদি পাকিস্থানের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হইতে না পারে, তবে আমাদের একতরফা শান্তিরক্ষার (unilateral steps) কথাও ভাবিয়া দেখা উচিত, যদিচ তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে।" ইহার সরলার্থ এই যে, পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিলেও আমরা শান্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকিব। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যখন কংগ্রেস আমলাতন্ত্রের আমলে সামরিক অর্থাৎ দেশরক্ষার খাতে এত অত্যধিক ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে তখন আর কোন বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীর মুখে শান্তি ও অহিংসার কথা শোভা পায় না। ডঃ ঘোষের এসব কথায় কাহারও কাহারও মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে এবং সেটা বোধ হয় খুব অসঙ্গত নহে। কারণ আমাদের দেশের ও পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে দেশের স্বাধীনতা এবং দেশবাসীর ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা করিবার জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত বই অসঙ্গত মনে হইবে না। বিশেষ করিয়া এ যুগের মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এবং ভারতের যমজ স্বাধীন রাষ্ট্রের রীতি-নীতি ও মতিগতি ভাবিয়া দেখিলে দেশরক্ষাখাতে ভারত-সরকারকে ব্যয়-সংকোচ করিতে বলা কোন বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদের উচিত হইবে না। অহিংসা সম্বন্ধে ডঃ ঘোষ যে কথা বলিয়াছেন তাহা যেন অতি অদ্ভুত মনে হয়। তাঁহার কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, যদি অহিংসার কথা বলি তবে আবার দেশরক্ষার জন্য সামরিক ব্যবস্থা করিব কেন? বেশ কথা। কিন্তু অহিংসা কথাটার অর্থ কি তাহা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, কোন অবস্থায় ও কোন কারণে কোন জীব হত্যা করা চলিবে না, তবে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া তাহা ঠিকভাবে সাধন করিতে গেলে অল্পক্ষণের মধ্যেই দেহত্যাগ ও মোক্ষলাভ করিতে হইবে। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, মানুষকে বাঁচিতে হইলে কোন না কোন রূপে কোন না কোন জীব হত্যা করিতে হয়। এখনকার রাষ্ট্রনেতারা যাহাই বলুন না কেন, অহিংসা শব্দটা মূলে হিন্দুশাস্ত্রের কথা। হিন্দুশাস্ত্রকারদের মতে অহিংসা কথার অর্থ অবৈধ পশুবধ বা জীবহিংসা না করা। ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়, যখন হিন্দুধর্ম্মে পশুবধের অত্যধিক প্রাবল্য হইয়াছিল তখন উহার প্রতিক্রিয়া রূপে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে অহিংসাকে অতি কঠোর আকারে একটি মহাব্রত বলিয়া প্রচার করা হয়। জৈনধর্ম্মে অহিংসা-ব্রতের যে কঠোর ও অবাস্তব রূপ দেওয়া হয় তাহাই বোধ হয় আমাদের দেশের কোন কোন নেতৃস্থানীয় মহাজনের অহিংসানীতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এরূপ ধারণা হিন্দুশাস্ত্রে অনুমোদিত নহে। হিন্দুধর্ম্মের মূল বেদ ও উপনিষদের সার-সংগ্রহ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিলে একথার সত্যতা বেশ বুঝা যায়। হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাতে বৈধ হিংসার কথাও আছে। দেশ কাল পাত্র ভেদে হিংসা শুধু যে বৈধ তাহাই নহে পরন্তু উহাই ধর্ম্ম। অহিংসার নামে পাপ ও পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়াই অধর্ম্ম, তাহাদের সমুচিত শাস্তিবিধানই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। অহিংসা-নীতির প্রকৃত অর্থ কি তাহা এখন আমাদের দেশের লোকের ভাবিয়া দেখা উচিত এবং উহা সর্ব্ব ক্ষেত্রে ও সর্ব্ব অবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত কিনা তাহাও অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে যে সব কথা বলা হইয়াছে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আলোচ্য বিশ্বশান্তি সম্মেলন দ্বারা পৃথিবীতে যুদ্ধনিবৃত্তি ও স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। তথাপি এরূপ সম্মেলনের কোন উপযোগিতা নাই একথা বলিতে পারি না। পৃথিবীতে এখন যে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহের মনোভাব এবং হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের বিলক্ষণ প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহা কোনক্রমেই মনুষ্যজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। পক্ষান্তরে ধরাবক্ষে যদি অপেক্ষাকৃত শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে তবেই মানুষ সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতে পারে এবং তাহার সেই প্রচেষ্টাও ফলবতী হইতে পারে। বিশ্বশান্তি সম্মেলন এই দিক দিয়া জগতের মহৎ কল্যাণ করিতে পারে।

মানুষ কোন্ ভাবে ভাবিত হইলে এবং কোন্ পথে চলিলে তাহার প্রকৃত কল্যাণ হইবে এবং উহার প্রতিকূল অবস্থা দূর করিতে ও অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী আবশ্যক তাহা এরূপ সম্মেলনের সাহায্যে স্থির করিয়া দেশে দেশে প্রচার করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সাধারণভাবে বলিতে গেলে পৃথিবীর ইতিহাস এক বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী, যাহাতে যুদ্ধ ও শান্তির কথা আছে, সাম্রাজ্যের ও

সভ্যতার উত্থান-পতনের বিবরণ আছে। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর পাশ্চাত্ত্য খণ্ডে যত যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তি অনাচার হইয়াছে, প্রাচ্যখণ্ডে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে তাহা ঘটে নাই। এই দুই ভূখণ্ডের ইতিহাসের এরূপ পার্থক্য কেন হইল? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, উহা দুই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিণতি। পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির মধ্যে পররাজ্য ও পরধন হরণ করিবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি এক প্রকার ব্যাধিরূপেই কোন কোন স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সেইজন্যই তাঁহারা পৃথিবীর অনেক দেশের সুখশান্তি নষ্ট করিয়া যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এইরূপ অবিশ্রান্ত যুদ্ধোদ্যম ও পররাজ্য জয় করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সব মূলমন্ত্র তাহা হইতে এগুলির সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ভারতের সনাতন আর্য্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলসূত্রের কথা এখানে আলোচনা করিলেই আমাদের বক্তব্য বুঝা যাইবে। প্রথম, ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনে এই সত্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে সর্ব্বজীবশরীরে একই প্রাণশক্তির বিকাশ হইয়াছে। একই বিশ্বব্যাপী প্রাণের স্পন্দন আব্রহ্মস্তম্ভ সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। যদি তাহাই হয় তবে সকল প্রাণীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া উচিত, কাহাকেও অবৈধ ও অনাবশ্যক হিংসা করা অবিধেয়। এজন্য ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলিতে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর ভারতীয় দর্শনমালার 'কৌস্তভমণি' বেদান্তে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, সব জীবে এক আত্মা বিরাজিত আছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যের নাম-রূপ ভেদমাত্র। অতএব বেদান্তের দৃষ্টিতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এক ভগবান বহু নরনারীরূপে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান আছেন এবং এই পৃথিবীর সকল নরনারীকে যিনি ভালবাসিতে পারেন, তাহাদের দৈন্য দুঃখ দূর করিয়া সুখশান্তি দিতে পারেন কিংবা দিবার চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা ও পূজা করেন। যদি ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই মূল শিক্ষাগুলি সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে প্রচারিত হয় এবং তাহাদের উপর যথাযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে পৃথিবীতে কতকটা সুখ-শান্তি আসিতে পারে, বিশেষ করিয়া পৃথিবীর যে যে দেশ ও জাতি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও সুখ-সম্ভোগের জন্য অন্য দেশ ও অন্য জাতির প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার করে, ধর্ম্মোন্মত্ততা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া হিংস্র পশুর ন্যায় অন্যান্য দেশ, জাতি ও ধর্ম্মের লোকের প্রতি অমানুষিক আচরণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না এবং ধর্ম্ম বা জাতীয়তার নামে মানবতার অবমাননা করে, সেই সেই দেশের ও জাতির মধ্যে বেদান্তের ঐক্যের বাণী, মিলনের মন্ত্র এবং লোকসেবার আদর্শ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে তাহাদের তমসাচ্ছন্ন অন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হইবে এবং তাহারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া এক নূতন জগৎ, নূতন সমাজব্যবস্থা এবং সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইবেন। এই নূতন লোক-ব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল জাতি এক যৌথ পরিবারের অঙ্গরূপে গণ্য হইবে এবং সকল নরনারীর কল্যাণ সাধনে যে তাহাদের সমান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে তাহা স্বীকৃত হইবে। পৃথিবীর বর্ত্তমান প্রতিকূল ও বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায় যদি বিশ্বশান্তি সম্মেলনের একাধিক অধিবেশনে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলমন্ত্রগুলি এবং বেদান্তের জীবনাদর্শ দেশে দেশে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনের সার্থকতা ও সাফল্যলাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে মনে করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সংশয়-সমস্যা-ভরা শতাব্দীর বিবর্ত্তন চলে,
কোথা যাই? কোন্ পন্থা? বার বার ধ্বনিছে জিজ্ঞাসা।
নির্ভর কিসের 'পর? কার মাঝে রাখি পূর্ণ আশা?
সে প্রশ্নের সমাধান হ'ল নাকো মনীষার বলে।
বুদ্ধি তারে যুক্তি দিয়া আবরিত করে নানা ছলে।
তৃষার্ত্ত মানব, তার শুষ্ক তর্কে মেটে না পিপাসা।
জীবন্ত উত্তর তুমি, উপলব্ধি পায় যেথা ভাষা,
অমৃতের স্পর্শ লভি' আনন্দে যে অন্তর উচ্ছলে।

মুনিদের নানা মত। যত মত তত পথ আছে,
লক্ষ্য এক, অনন্য সে, দিলে তুমি পথের সন্ধান।
মুদ্রা আর মৃত্তিকার মূল্যে ভেদ নাহি কার কাছে?
শিহরিয়া শোনে বিশ্ব অনাহত স্বর্গের আহ্বান।
প্রণমি শ্রীরামকৃষ্ণ, বিস্মিত যুগান্ত হেরিয়াছে
মর্ত্ত্যের মানব-তীর্থে মিলে যায় ভক্ত-ভগবান।

নাইনিতাল

শ্রীমনোরঞ্জন সেন

কুমায়ুন পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত নাইনিতাল শহরটির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রথম দৃষ্টিপাতেই দর্শককে মুগ্ধ করে। প্রকৃতি আপন ঐশ্বর্য্যসম্ভার এখানে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন। নাইনিতালে প্রবেশ করে প্রথমেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তার স্ফটিকস্বচ্ছ সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা দেখে। চারদিকে শৈলমালাবেষ্টিত সেই নিস্তরঙ্গ নীল হ্রদের সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। হ্রদের জলে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে পাহাড় ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত আকাশের ছবি।

নাইনিতাল হইতে চীনা শৃঙ্গের দৃশ্য

হ্রদটিকে স্পর্শ করে আছে একটি তৃণাবৃত ভূমিখণ্ড—যেন সরোবরের সঙ্গেই তার মিতালী। সেই সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাটির রসে পরিপুষ্ট হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওক ও সাইপ্রাস বৃক্ষের শ্রেণী। তাদের উন্নত মস্তক মানুষের দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। কিছুদূরে দেখা যায় টিনের ছাদ দেওয়া ছোট ছোট ঘর। প্রকৃতির বক্ষে এগুলিকে যেন শান্তির নীড় বলে মনে হয়। কর্ম্মময় জীবনের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে অনেকেই ছুটে আসে এই স্নিগ্ধ পার্ব্বত্য আবেষ্টনীতে।

নাইনিতাল উপত্যকার উত্তর দিক বেষ্টন করে আছে ৮৫৬৪ ফুট উচ্চ চীনা শিখর। উপত্যকা থেকে ৩০০০ ফুট উঁচুতে উঠে হিমগিরির বিরাট মহিমা দর্শন করলাম। রজত-শুভ্র বরফে আচ্ছাদিত হিমালয়ের সে সৌন্দর্য্য চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। রামায়ণ, মহাভারতেও কুমায়ুনের উল্লেখ রয়েছে। নাইনিতাল কুমায়ুনেরই অংশ। পৌরাণিক যুগে হিমালয়ের এই অঞ্চলে গর্গমুনির আশ্রম ছিল বলে এ জায়গাটা গর্গাচল নামেও অভিহিত হয়। যে হ্রদটির কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইটি "ত্রিরিমিতল" নামে পরিচিত ছিল। এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। অতীত যুগে একদা অত্রি, পৌলস্ত্য ও পুলহ নামে তিন জন ঋষি এই উপত্যকার ভিতর দিয়ে কৈলাসের পথে যাত্রা করেছিলেন। দ্বিপ্রহরে আহ্নিকের সময় হয়ে গেল; অথচ স্নান করে শুচিশুদ্ধ হবার জন্য জল পাওয়া গেল না। কি করা যায়! তিন জন ঋষি মিলে তখন একটি গর্ত্ত খুঁড়লেন ও নিজেদের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে মানস সরোবরের জল এনে তাতে জলস্রোত বইয়ে দিলেন। এই হ'ল "ত্রিরিমিতলে"র জন্মরহস্য।

বর্ত্তমান নাইনিতাল শহরটির পত্তন হয়েছে ১৮৪১ সালে। ১৮১৫ সনে গুর্খা যুদ্ধের বৎসরে ইংরেজ সৈন্যদল আলমোরা থেকে এই উপত্যকার পূর্ব্বদিকে বামরী গিরিপথে (বর্ত্তমান কাঠগোদাম) কতবারই

চীনা শৃঙ্গের পথে

না যাতায়াত করেছে। তাদের চলাচলের পথের এত কাছেই যে এমন সুন্দর একটি হ্রদ অবস্থিত একথা তারা কল্পনাও করতে পারে নি। তাই সেই যুদ্ধের প্রচণ্ড কোলাহল সেদিন এই নিভৃত অঞ্চলের শান্তি ভঙ্গ করতে পারে নি।

সাধারণের বিশ্বাস এই উপত্যকা ভূমিতে নারায়ণী দেবী নিদ্রাসুখ উপভোগ করে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্য-ভাগ পর্য্যন্তও এই স্থানটি জনকোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে নি। শুধু সেপ্টেম্বরের শেষে বা অক্টোবরের প্রথমে বিভিন্ন পার্ব্বত্যজাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই হ্রদের তীরে এসে নারায়ণী দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করে যেতেন। বৎসরের অন্য সময় এখানে জনমানবের চিহ্ন কদাচিৎ দেখা যেত।
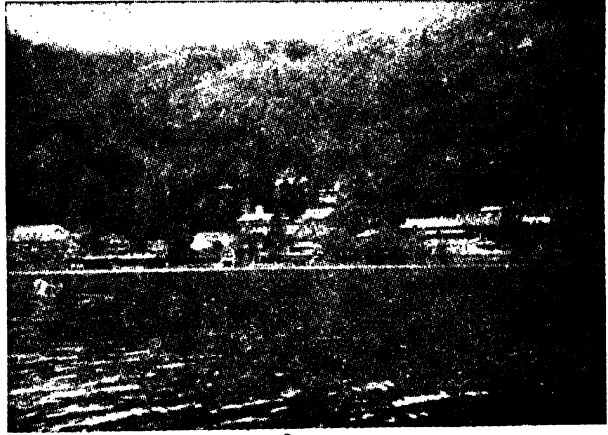
নাইনিতাল হ্রদের একাংশ

দুই জন ভুটিয়া নাইনিতাল বাজারে কয়লা বিক্রয় করিতে আসিয়াছে

১৮৪১ সনে মিঃ ব্যারণ হিমালয়ের এই প্রদেশে আগমন করে আকস্মিকভাবে কুমায়ুনের নিভৃত অঞ্চলে অবস্থিত এই হ্রদটিকে আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম হ্রদটির বর্ণনা করে ও এখানে একটি শহর গড়ে তুলবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে "আগ্রা আকবরে"র সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির মারফতেই এই সৌন্দর্য্য-নিকেতনের কথা চারদিকে প্রচারিত হ'ল। ধীরে ধীরে এখানে শহর গড়ে উঠতে লাগল, দলে দলে লোকেরা এখানে এসে বাস করতে সুরু করল। অল্পদিনের মধ্যেই নাইনিতাল এক জন-কোলাহলমুখরিত শহরে পরিণত হ'ল।

একটি সবল সুস্থ শিশু

১৮৫৭ সনে সিপাহী-যুদ্ধের কালে শহরটির জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে লোকেরা দলে দলে পাহাড়ের এই শান্ত পরিবেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল। এখন এখানে নাগরিক জীবন আরও সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে লাগল। যুক্তপ্রদেশের লেঃ গবর্ণরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী নাইনিতালে স্থাপন করার পরিকল্পনা হ'ল। ১৮৬২ সনে ষ্টোনলেতে প্রথম গবর্ণরের বাসভবন নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউস, সেক্রেটারিয়েট

নাইনিতালে সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যটক

বিল্ডিংস ১৯০০ সনে এণ্টনি ম্যাকডোনাল্ডের সময় তৈরি করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে এখানে নানারকম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নাগরিক জীবনের অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাও হ'ল। স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

গোড়ার দিকে যাতায়াতের জন্যে কেবল ঘোড়া, টাঙ্গা ও ডাণ্ডীর ব্যবস্থাই ছিল। অন্য কোন রকম যানবাহন চলাচলের সুবিধা ছিল না। ১৯১৫ সনে প্রথম কাঠগোদাম ও নাইনিতালের মধ্যে মোটর চলাচলের ব্যবস্থা হয়। ১৯২২ সনে ব্যাপক ভাবে জল ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। যাতায়াতের পথ সুগম হওয়ায় অনেক রকম ব্যবসা-

জনৈক সবজী বিক্রেতা

বাণিজ্যও এখানে গড়ে ওঠে। এখানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা—সবকিছুই আছে, কোনদিকেই কোন ত্রুটি নেই।

কয়েক বছর আগে যখন নাইনিতালে আসি, তখন এখানকার ধনসম্পদের প্রাচুর্য্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু এবার এসে দেখছি, যে নাইনিতাল একদা ঐশ্বর্য্যের ছটায় নবাগত দর্শকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করত আজ সেখানে আর্থিক দুর্গতি দেখা দিয়েছে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দনির্ঝর যেন সহস্র ধারায় উৎসারিত হচ্ছে না। কেন এমন হ'ল, তার কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম অনেক ইংরেজ ব্যবসায়ী এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা পড়ে গেছে। নাইনিতাল এখন আর প্রাদেশিক সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী নয়। কাজেই এখন আর তার আগেকার জৌলুস নেই। জনসংখ্যা কমে যাওয়ার দরুন হোটেলওয়ালা, রিকসাওয়ালা প্রভৃতির অর্থ উপার্জ্জনের পথে বাধা পড়েছে।

খাদ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিকল্পনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত যুদ্ধের সময় হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাংলাদেশ কোন প্রকার খাদ্য সম্বন্ধেই আত্মনির্ভরশীল নহে ; এমন কি বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে প্রধান খাদ্য অন্নের জন্যও বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাংলাদেশ বিভক্ত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্যবিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, আমরা প্রায় সকল প্রকার খাদ্য সম্বন্ধেই পরনির্ভরশীল ; তাঁহার হিসাব এইরূপ :

খাদ্যের নাম	প্রয়োজন	উৎপাদন
(১) ডাল	৬,৩৮,৯০০ টন	২,৪০,১০০ টন
(২) চিনি ও গুড়	৪,২৬,০০০ „	৯২,০০০ „
(৩) আলু	১,২৭৭,৮০০ „	৩,১২,৭০০ „
(৪) সরিষার তৈল, ঘি	৪,২৬,০০০ „	৯,৯০০ „
(৫) দুধ	২১,২৯,০০ „	৩৫৩,৫০০ „
(৬) জান্তব প্রোটিন জাতীয় খাদ্য	৬,৩৮,৯০০ „	মাংস ৩০,০০০ „
		মাছ ২,৪৩,০০০ „
		মুর্গী ও হাঁস ২৭০০ „
(৭) তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যশস্য—(চাউল ও গম)	৪২,০০,০০০ „	৩৮,০০,০০০ „

কৃষি-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, আই-সি-এস মহাশয় তাঁহার পুস্তকে (*Prospectus of Agriculture in W. Bengal*) খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ এইরূপ দিয়াছেন :

খাদ্যের নাম	আভ্যন্তরিক উৎপাদন	বাহির হইতে আমদানী	মোট প্রয়োজন	ঘাটতি
(১) ডাল	২৪০১০০	১০০০০০	৬৩৮৯০০	২৯৮৮০০
(২) চিনি ও গুড়	৯২০০০	১৮৬৫০০	৪২৬৩০০	১৪৭১০০
(৩) আলু	৩১২৬০০	১২০০০০	১২৭৭৮০০	৮৪৫২০০
(৪) ফল (আম ও কমলা লেবু)	৩৭৩২০০	৩২০০০	৬৩৮৯০০	২৩৩৭০০
(৫) ঘি ও মাখন	৬৯০০	৬০০০	৪২৬০০০	৩৬৬২০০
(৬) সরিষার তৈল	১০৯০০	৩৭০০০		
(৭) দুধ	৩৫৩৫০০		২১২৯৯০০	১৭৭৬৪০০
(৮) মাংস (ভেড়া, ছাগল, গরু)	৩০০০০		৬৩৮৯০০	৫৪৮৮০০
(৯) মাছ	২৪৩০০			
(১০) পোলট্রি	২৭০০			
(১১) ডিম	৪৭৭ (মিলিয়ন)	৮০ (মিলিয়ন)	৭৬৩৩·৫ মিলিয়ন	৭৫০৫·৮ মিলিয়ন

উপরোক্ত হিসাবে দে মহাশয় চাউলের ঘাটতির পরিমাণ দেন নাই। যাহা হউক, দুইটি হিসাব হইতে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ করা যাইবে।

খাদ্য সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার জন্য বড়, মাঝারী, ছোট দীর্ঘমেয়াদী, অল্পমেয়াদী প্রভৃতি অনেক রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে ; এবং ইতিমধ্যেই উহাদের মধ্যে কতকগুলি পরিকল্পনা (মাঝারী ও ছোট) ফলপ্রসূ হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু উহাদের ফলের পরিমাণ এত অল্প যে, উহা সাধারণের দৃষ্টি মোটেই আকর্ষণ করে নাই কিম্বা ঘাটতি পূরণে বিশেষ সহায়ক হয় নাই। বড় বড় পরিকল্পনার ফলে কবে দেশ কিভাবে আবার শস্য-শ্যামলা হইবে তাহা বলা খুবই কঠিন। মনে হইতেছে এক 'প্রেস নোটে' দেখিয়াছিলাম যে, কর্তৃপক্ষের মতে ছোট ছোট পরিকল্পনার দ্বারা স্থায়ী উন্নতি বা ফল পাওয়া যাইবে না। বড় বড় পরিকল্পনা যখন সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হইবে তখনই পশ্চিমবঙ্গে আবার "সোনা ফলিবে"। মোট কথা, ছোট ছোট পরিকল্পনা কেবল "জোড়াতালি" মাত্র। আমাদের মতে এই "জোড়তালির"ও প্রয়োজন আছে ; তবে "জোড়াতালি"টা 'টেঁকসই' হওয়া দরকার। অনেকের মতে এই "জোড়াতালি"কে টেঁকসই করিবার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি নাই ; বহু ক্ষেত্রেই অনেক রকমে অনর্থক প্রচুর অর্থের অপচয় হইতেছে। উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের আকার বাড়াইতে ইচ্ছা করি না।

এখন কথা হইতেছে এই যে, সকল প্রকার খাদ্য সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, না কেবল কয়েক প্রকার খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে ? সকল প্রকার খাদ্য সম্বন্ধে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করা যায় কিনা, এবং যদি না যায় তো কোন্ কোন্ খাদ্য সম্বন্ধে কত দিনে কি পরিমাণে করা যায় সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া কোন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে কিনা তাহাও সাধারণ লোকের জানা নাই।

প্রায় সরকারী, বে-সরকারী সকল বিবৃতি, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, বিবরণী প্রভৃতিতে পাশ্চাত্য দেশের নানাবিধ ফসলের পরিমাণের উল্লেখ থাকে এবং তাহার সহিত তুলনা করিয়া বলা হয় যে, আমাদের দেশের ফসলের পরিমাণ খুবই অল্প। জ্ঞান লাভের জন্য এইরূপ তুলনা ভাল বটে, কিন্তু উহা হইতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না। পাশ্চাত্য দেশের অবস্থা ও আমাদের দেশের অবস্থা সমান নহে ; মাটি, জল-বায়ু, কৃষি-পদ্ধতিও বিভিন্ন ; ইহা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে বৈজ্ঞানিক কৃষি,

জ্ঞানের বিস্তার, সরকারের প্রচেষ্টা ও কার্য্য-প্রণালী এবং সর্ব্বোপরি কৃষকদের শিক্ষা, শক্তি, সামর্থ্য প্রভৃতিও বিবেচনার বিষয়। সুতরাং এইরূপ তুলনা অনুসারে আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করা ঠিক হইবে না। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অবস্থায় সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ফলন নির্ণয় করিবার জন্য তেমন সুচারুরূপে ও ব্যাপকভাবে কোন পরীক্ষা করা হয় নাই। কিন্তু এইরূপ পরীক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে এখনও কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ কোন সার প্রয়োগ দ্বারা কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন না করিয়া কেবল স্থানীয় পদ্ধতিতে স্থানীয় বীজ বপন করিয়া ও জলের জন্য স্বাভাবিক বারিপাতের উপর নির্ভর করিয়া বিঘা প্রতি চৌদ্দ-পনর মণ ধানের ফলন পাওয়া যায়। কি কারণে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান বিশেষ আবশ্যক। শুনিতে পাই বর্দ্ধমান জেলার কোন কোন অঞ্চলে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বিঘা প্রতি বিশ-বাইশ মাণ ধান পাওয়া যাইত। সরকারী হিসাব মতে বর্ত্তমানে বিঘাপ্রতি ধানের গড় ফলন হইতেছে মোটামুটি ছয় মণ।

এই প্রসঙ্গে একটি পরিকল্পনার আভাস কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবার চেষ্টা করিব। কর্তৃপক্ষ ত অনেক বিষয়েই অনেক রকমের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিতেছেন এবং সকল পরীক্ষাই যে অর্থব্যয়ের তুলনায় ফলপ্রদ হইতেছে তাহা নয়। সুতরাং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় কিছু অর্থব্যয় হইলে অন্ততঃ কোন কোন অঞ্চলের খাদ্য সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে। পরিকল্পনাটি এইরূপ :

১। দুই-তিনটি ইউনিয়ন লইয়া একটি কর্ম্মকেন্দ্র গঠিত হইবে।

২। এই কেন্দ্র সম্বন্ধে অতি যত্নপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসন্ধান করিতে হইবে :

(ক) বিভিন্ন বয়সের অধিবাসীর (পুরুষ, স্ত্রী) সংখ্যা : পেশা :

(খ) অধিবাসীদিগের সুসম খাদ্যের জন্য কোন্ প্রকার খাদ্য কত পরিমাণ প্রয়োজন :

(গ) বর্ত্তমানে কোন্ প্রকার খাদ্য কত পরিমাণ উৎপন্ন হয়।

(ঘ) প্রত্যেক রকম খাদ্যের বাড়তি ও ঘাটতির পরিমাণ : [বাড়তি কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি ভাবে রপ্তানী হয়, এবং ঘাটতি কোন্ কোন্ অঞ্চল হইতে কি ভাবে আমদানী করিয়া পূরণ করা হয় : উৎপাদনকারীদের মূল্যের সহিত মধ্যস্থ ব্যবসায়ীগণের মূল্যের প্রভেদ]

(ঙ) কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে প্রত্যেক প্রকার খাদ্যের পরিমাণ কত দিনে কতদূর বাড়ানো যায়। [প্রত্যেক রকম খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ, কার্য্যপ্রণালী, মোট ব্যয়, বাৎসরিক ব্যয়, প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে হইবে]

(চ) কেন্দ্রের কুটীরশিল্পের, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত বিস্তৃত পরিকল্পনা ও আনুমানিক ব্যয়।

(ছ) কেন্দ্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, যানবাহন প্রভৃতির বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদের প্রত্যেকের উন্নতিসাধনের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা ও আনুমানিক ব্যয়।

(জ) স্থানীয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিগণের ঋণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত প্রত্যেক দফার অনুসন্ধানের জন্য পৃথকভাবে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের উন্নতিসাধনের জন্য বর্ত্তমানে যে সকল অন্তরায় বিদ্যমান আছে তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং সেই অন্তরায়গুলি কি ভাবে দূর করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রস্তুতের প্রয়োজন।

একটি বেসরকারী সমিতি Statistical Institute ও সরকারী কর্ম্মচারিগণের পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে উপরোক্ত অনুসন্ধানকার্য্য চালাইবেন এবং পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন। কেন্দ্রের প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ দুই জন কর্ম্মী থাকিবেন। পাঁচ-ছয়টি গ্রামের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য এক জন পরিদর্শক থাকিবেন। প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য এক জন তত্ত্বাবধায়ক এবং কেন্দ্রের জন্য এক জন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক থাকিবেন। সাধারণতঃ কর্ম্মী, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রধান তত্ত্বাবধায়কগণ স্থানীয় ব্যক্তি হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে। সরকারের নিকট হইতে বেসরকারী সমিতি বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য (grant) পাইবেন। সেই সাহায্য হইতে সকলকে পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। এক জন সরকারী হিসাবপরীক্ষক সমিতির হিসাব নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরীক্ষা করিবেন।

কয়েকটি ইউনিয়নের কথা আমি জানি, যেখানে স্থানীয় ব্যক্তিগণ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত স্থানীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কয়েকটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল ইউনিয়নে কাজ আরম্ভ করিলে উহা শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। উদাহরণস্বরূপ হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার জাঙ্গিপাড়া, কোতলপুর, রাধানগর ইউনিয়নের কথা বলিতে পারি। প্রথমে একটি অঞ্চলে কাজ আরম্ভ করাই বাঞ্ছনীয়, এবং উহা হইতে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইবে তাহা পরে অতি সহজে অন্য অঞ্চলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাংলার পালরাজাদের 'জয়স্কন্ধাবার'

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি

সকল রাজ্যেরই রাজধানী থাকে; কিন্তু পালরাজাদের রাজধানী ছিল, এমন বিবরণ কোন পুঁথি, প্রস্তর-লেখ বা তাম্রশাসনাদিতে এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু বিভিন্ন তাম্রশাসন দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বাংলার এই পালরাজাদের জয়স্কন্ধাবার নামক রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্র থাকিত। রাজারা ভাগীরথী-তীরস্থ (ভাগীরথীর তীরস্থ বলার কারণ পরে লিখিতেছি) এই সকল জয়স্কন্ধাবার হইতে দান করিয়া তাম্রশাসন প্রদান করিতেন এবং এই জয়স্কন্ধাবার হইতে আরও অন্যান্য কার্য্যও হইত।

একই রাজার নিজ রাজত্বকালে বিভিন্ন জয়স্কন্ধাবার থাকিত। আবার একের নির্ব্বাচিত জয়স্কন্ধাবারের স্থান পরবর্ত্তী রাজাদের ও জয়স্কন্ধাবারের স্থান হইত; কেহ আবার নবতর স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া অভিনব জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিতেন।

এই জয়স্কন্ধাবারের বর্ণনায় যে শ্লোকটি তাম্রশাসনগুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এই—

সখলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমাননানাবিধ নৌবাটক সম্পাদিত সেতুবন্ধনিহিত শৈলশিখরশ্রেণীবিভ্রমাৎ নিরতিশয় ঘন-ঘনাঘন ঘটাশ্যামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমারব্ধসন্ততজলদসময় সন্দেহাৎ। উদীচীনানেকনরপতিপ্রাভৃতী কৃতাপ্রমেয়হয়বাহিনী খরখুরোৎখাত ধূলীধূসরিত দিগন্তরালাৎ পরমেশ্বর সেবা-সময়াতাশেষ জম্বুদ্বীপভূপালানন্ত পাদাতভরনমদবনে: ১······ নগরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতোমহারাজাধিরাজ শ্রী২·········পালদেবপাদানুধ্যাত পরেশ্বরপরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রী৩·········পালদেব কুশলী।

উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ—

যেখানে ভাগীরথীপথে প্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক দ্বারা সম্পাদিত সেতুবন্ধনিহিত হওয়ায় শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া বিভ্রম হইতেছিল, নিরতিশয় ঘনমেঘবর্ণাশ্রিত বাসরলক্ষ্মীকে (দিনশোভাকে) তমসাচ্ছন্ন করায় যেন জলদ সময় সমাগত বলিয়া সন্দেহ হইতেছিল, যেখানে উত্তরাঞ্চলবাসী নরপতিপ্রদত্ত অসংখ্য হয় (অশ্ব) বাহিনীর খর খুরাঘাতে উৎখাত ধূলিরাশি দ্বারা দিগন্তরাল ধূসরিত হইতেছিল, যেখানে পরমেশ্বরের সেবার জন্য আগত অশেষ জম্বুদ্বীপ-ভূপালগণের অনন্তপদভরে পৃথিবী মথিত হইতেছিল, সেই১······নিকট স্থাপিত জয়স্কন্ধাবার (বিজয়ী শিবির) হইতে (এই দান প্রদত্ত হইল)। পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রী২·········পালদেব পাদানুধ্যান করিয়া পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান৩·········দেব কুশলে (অবস্থান করুন)

এই বর্ণনার অতিশয়োক্তি কতকটা কমাইয়া দিলেও ইহাই অনুমান করা যাইতেছে যে রাজা নৌকা দ্বারা সম্ভবতঃ নদী দিয়া চলাচল করিতেন। এই ভাবে সমগ্র রাজ্য পরিদর্শন ও শাসনাদি করিতেন। সমগ্র না হউক, অধিকাংশ খাস রাজকর্ম্মচারী এই সময় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত; করদরাজারা আসিয়া প্রণতি জানাইতেন; রাজপুরনারীরা রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন; ইঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া শুনাইবার জন্য রাজা ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেন [মদনপালের মনহলি-লিপিতে আছে যে পট্টমহিষী চিত্রমতিকা কর্ত্তৃক বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত পাঠের উদ্‌যাপনের দক্ষিণাস্বরূপ শ্রীবটেশ্বর শর্ম্মাকে সংশ্লিষ্ট দান প্রদত্ত হইয়াছিল : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫ ১৫৭ পৃঃ]; সময় সময় এক একটি বড় বন্দর, দুর্গ, রাষ্ট্রকেন্দ্র বা ধর্ম্মক্ষেত্রে কিছুদিন তিষ্ঠিয়া থাকিতেন এবং সেইটি জয়স্কন্ধাবারের অবস্থানরূপে বর্ণিত হইয়া তাম্রশাসনে উল্লেখিত হইত। তাম্রশাসন হইল দলিল। সুতরাং আধুনিক দলিলে যেহেতু রেজেষ্ট্রী আপিসের নাম রাখিতে হয় তেমনি তাম্রশাসনে সেকালে সেই জয়স্কন্ধাবারের অবস্থানের নাম দিতে হইত যেখান হইতে রাজা ঐ দান প্রদান করিতেন।

যুগে যুগে গঙ্গানদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—কিন্তু অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী (পালরাজাদের আমল) পর্য্যন্তই আমাদের আলোচ্য। এই সময় মধ্যে এই নদীতীরে যে সকল বড় বড় স্থান ছিল তাহাতেই জয়স্কন্ধাবারগুলির অধিষ্ঠানের সন্ধান করিতে হইবে। (গঙ্গা ও ভাগীরথীকে কেন অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতেছি তাহা পরে লিখিতেছি।)

পালরাজাদের নাম, তাঁহাদের প্রদত্ত তাম্রশাসনগুলির মধ্যে যেগুলি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার জয়স্কন্ধাবারগুলির নাম এখানে প্রদত্ত হইল—

১ এখানে জয়স্কন্ধাবারের নাম থাকে।
২ এখানে দাতা রাজার পিতার নাম থাকে।
৩ এখানে দাতা রাজার নাম থাকে।

১ এখানে জয়স্কন্ধাবারের নাম থাকে।
২ এখানে দাতারাজার পিতার নাম থাকে।
৩ এখানে দাতারাজার নাম থাকে।

দাতার নাম	লিপির পরিচয়	জয়স্কন্ধাবারের নাম
ধর্ম্মপালদেব নবম শতক	খালিমপুর১	পাটলীপুত্র সমাবাসিত
দেবপালদেব নবম শতক	মুঙ্গের২	শ্রীমুদ্গগিরী সমাবাসিত
নারায়ণপালদেব	ভাগলপুর৩	ঐ
দ্বিতীয় গোপাল	জাজিলপুর৪	বটপর্ব্বতিকা সমাবাসিত
মহীপাল	বাণগড়৫	বি [লা] সপুর সমাবাসিত
মহীপাল	বেলওয়া৬	শ্রীসাহসগণ্ডনগর সমাবাসিত
তৃতীয় বিগ্রহপাল	আমগাছি৭	শ্রীমুদ্গগিরি সমাবাসিত
তৃতীয় বিগ্রহপাল	বেলওয়া৮	বিলাসপুর সমাবাসিত
মদনপালদেব	মনহলি৯	শ্রীরামাবতীনগর পরিসর সমাবাসিত

এই সব জয়স্কন্ধাবারের নাম উল্লেখ করার সময়ই প্রতিবার উপরোক্ত "ভাগীরথীপথ প্রবর্ত্তমান······" শ্লোকটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

সুতরাং যদি কোন অপপ্রয়োগ করা না হইয়া থাকে তবে এই জয়স্কন্ধাবারের স্থান ভাগীরথীতীরেই খুঁজিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই জয়স্কন্ধাবারগুলির স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

এই উদ্দেশ্যে আমরা নানা তথ্য সন্নিবেশ করিতেছি। ইহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয়।

সমস্যা

(১) পাটলীপুত্র নগর যখন ভাগীরথী তীরে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তখন বর্ত্তমান পাটনা পাটলীপুত্র হইয়া থাকিলে গঙ্গা ও ভাগীরথী, কেবল বর্ত্তমানের ভাগীরথী বা হুগলীনদী এখানে বর্ণিত হইতেছে না ধরিয়া লইতে হয়। আবার গঙ্গার যে বিপুল জলরাশি পূর্ব্ববঙ্গের দিকে যাইয়া পদ্মানদী আখ্যা পাইয়াছে তাহার কোথায় গঙ্গা নাম শেষ হইয়া কবে হইতে পদ্মা নাম সুরু হইল তাহাও (রেনেল পূর্ব্ববঙ্গীয় পদ্মাকেও গঙ্গা নদী বলিতেছেন) ধরিতে পারিলে সুবিধা হয়। কারণ তাহা হইলে আর পদ্মার তীরে বৃথা খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না। শুধু ইহাতেই সমস্যা শেষ হইল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গঙ্গার তটরেখা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং সেকালে যাহা নদীর গর্ভ ছিল হয়তো একালে তাহা বিল বা জলাভূমি অথবা সমতল জনবসতির ক্ষেত্র।

(২) সন্ধ্যাকর নন্দীকৃত রামচরিতে আছে যে বরেন্দ্রী হইল পালরাজাদের 'জনকভূ' অর্থাৎ পিতৃভূমি। সেই বরেন্দ্রীতে গোপাল মাৎস্যন্যায় দূরীকরণার্থ প্রজাগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত প্রথম নরপতি হইয়াছিলেন (ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর লিপি; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২; মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভিঃ লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ—শিরসাং চূড়ামণি-স্তত্ ভুতঃ।) এবং এই রাজবংশ পশ্চিমে পাটলীপুত্র অতিক্রম করিয়া রাজ্যসীমা প্রসারিত করিয়াছিল। ইহাদের পূর্ব্বে অন্য রাজারা এই সব স্থানে রাজত্ব করিতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ ও দেশী এবং বিদেশী প্রাচীন গ্রন্থে তাহাদের বিবরণ পাওয়া যায় (যদিও ইহার অনেক পুঁথি পরবর্ত্তীকালে সর্ব্বদা যোজিত ও বর্দ্ধিত হওয়াতে ঠিক কোন্ অংশ প্রারম্ভেই রচিত ছিল তাহা বলা শক্ত)। তাহাদের প্রদত্ত গঙ্গী-তীরের উন্নত স্থানগুলির নাম কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রাচীন উন্নত স্থানগুলি পরে এতকাল ধরিয়া উন্নত থাকা সম্ভব নয় এবং সব প্রাচীন অনুন্নত স্থানগুলি আবার যুগ যুগ ধরিয়া অনুন্নত কেমন করিয়া থাকিবে? নদীর গতি পরিবর্ত্তন, রাজার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ সবই নূতন স্থান গঠনে ও প্রাচীন স্থান পরিত্যাগে সহায়তা করি-য়াছে। আবার হিন্দু আমলের নাম মুসলমান আমলে পরি-বর্ত্তনের চেষ্টা সর্ব্বদাই ছিল—যেমন ইংরেজের দেওয়া নাম আমরা এই স্বাধীনতার দিনে ছাড়িয়া দিয়া পুরাতন ভারতীয় নাম বা জাতীয়তাবোধক নাম গ্রহণ করিতেছি। সুতরাং যুগ যুগ ধরিয়া এই পরিবর্ত্তন অনুসরণ করা সহজ নহে।

(৩) উপরোক্ত ফর্দ্দ অনুযায়ী জয়স্কন্ধাবারগুলির রাজাদের রাজত্বকাল মোটামুটি এখানে লিখিতেছি (সঠিক নির্ণয় হয় নাই); জয়স্কন্ধাবারগুলির স্থান নির্ণয়কালে এই রাজত্ব-কালের কিছু পূর্ব্বেকার বা পরবর্ত্তীকালের উপকরণে এই জয়স্কন্ধাবারের স্থানের উল্লেখ পাইলেই আমাদের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইবে।

---

১ গৌড়লেখমালা, ১৪ পৃঃ শাসনের ২৫ পংক্তি হইতে

২ ঐ ৩৮ পৃঃ শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে

৩ ঐ ৬০ পৃঃ শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে

৪ ভারতবর্ষ, ১৩৪৪, শ্রাবণ, ২৬৭ পৃঃ, শাসনের ১৬ পংক্তি হইতে

৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫, ১৬৯ পৃঃ, শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে

৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৪ বর্ষ, ৩, ৪র্থ সংখ্যা, ৫০ পৃঃ, শাসনের ২৩ পংক্তি হইতে

৭ গৌড়লেখমালা, ৯৫ পৃঃ, শাসনের ২৪ পংক্তি হইতে

৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এই লেখকের সম্পাদিত পাঠ, টীকা ইত্যাদি সমন্বিত প্রবন্ধ।

৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫, ১৫১ পৃঃ, শাসনের ২৭ পংক্তি হইতে

রেনেল রচিত ৯নং ম্যাপ হইতে বিশ্বভারতী কৃত ব্লকের ছবি

প্রসঙ্গ কথা

(ক) টলেমী ভারতের যে মানচিত্র দিয়াছেন (Murray's *Discoveries & Travels in Asia*, Vol. I, page 481-এর সম্মুখে এই মানচিত্রের ছবি অতি সুন্দর ছাপা আছে) তাহাতে দেখা যায় যে, হিমালয়ের অল্প দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত-মালা, তাহার দক্ষিণে অগভীর অল্প প্রশস্ত (কোন কোন স্থানে ২০।২৫ মাইল) সমুদ্র ; তাহার দক্ষিণে তাপ্রোবেন (Taprobane) নামক বিরাট দ্বীপ। হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে সমুদ্র-তীরে জম্বুদ্বীপ। গঙ্গানদী হিমালয় হইতে বাহির হইয়া বিন্ধ্য-পর্ব্বতমালার দিকে নামিয়া আসিয়াছে এবং উহারই পার্শ্ব দিয়া উড়িষ্যার কাছে সমুদ্রে মিশিয়াছে।

(খ) মহাভারতে বনপর্ব্বে বর্ণনা আছে যে, অগস্ত্য ঋষি বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়া দক্ষিণে উপস্থিত হন··· তিনি সমুদ্র পান করিয়া নিঃশেষ করেন ও জীর্ণ করেন। (ইহা কি ভারত ও তাপ্রোবেনের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রশোষণের রূপক বর্ণনা ?—লেখক)

(গ) ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস (*India & Jambu Island*) মনে করেন যে, ভারত ও তাপ্রোবেন দ্বীপটির মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে স্থল সৃষ্টি হইয়া ঐ অগভীর সমুদ্রটি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ও উহাই দাক্ষিণাত্য।

(ঘ) ভূভাগগঠন, নদীর গতিপরিবর্ত্তন ইত্যাদি কাজ কেমন করিয়া ঘটে তাহার এক বিবরণের তাৎপর্য্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাসের উপরোক্ত পুস্তকের ভূমিকা হইতে এখানে দিতেছি।

(১) সমুদ্রতীরের স্রোত তীরের অমসৃণ গায়ে জিনিস-পত্র বহিয়া আনে। ইহা মূল ভূভাগের সঙ্গে তাপ্রোবেন যুক্ত করায় সহায়তা করিয়াছে।

(২) সমুদ্রের জোয়ার দুই দ্বীপের মধ্যস্থলে বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া আঘাতে আঘাতে পলি জমায়। যদি আঘাত না করিয়া স্রোত একমুখী হয় তবে ঘুরিয়া গিয়াও যে দিকে যে ক্রিয়া করে তাহাতেই পলি জমিয়া স্থলভাগ সৃষ্টি হওয়ার কাজ চলিতেই থাকে। এমনই করিয়া ভারত ও তাপ্রোবেন এবং ব্রহ্মদেশ ও লঙ্কার (এই লঙ্কা কোন্ লঙ্কা ?—লেখক) মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে স্থলভাগ গঠনের কাজ চলিয়াছিল।

(৩) সমুদ্রের স্রোতবেগ তীরদেশে বিপুল চাপ প্রয়োগ করে। এই তীব্র চাপে তীরদেশে পর্ব্বতমালা সৃষ্টি হয়—বিশেষতঃ যদি ওদিকে আবার জলের চাপ থাকে তবে এই পর্ব্বতমালা সৃষ্টির আরও সুবিধা হয়।···এই হেতু এই ভাবে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার দিকে যে সব নদী বহিয়া আসিত তাহাদের দ্বারা বিন্ধ্যগিরি ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়াছে এবং সেহেতু আবার ঐ নদীগুলির গতিপথ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণগুলিতে বারংবার ইহার উল্লেখ আছে। এই ভাবে টলেমীর পরবর্ত্তীকালে বোম্বাই হইতে কানারা পর্য্যন্ত পশ্চিম ঘাটের সৃষ্টি হইয়াছে।···

(৪) কোন পর্ব্বতমালার মধ্যে কোন সরু নিম্নভূমি দিয়া যখন নদী বহিয়া যায় তখন পথের মধ্যে কোন দুর্ব্বল স্থান পাইলে সেই স্থান দিয়া আবার স্রোত চলিবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বৃষ্টিদ্বারা নিকটের পাহাড়ধোয়া জল যদি বেশী না হয় এবং উজানের দিকে যদি প্রচুর জলের সমাবেশ না হয় তবে এই পথ ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যায়। বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া গঙ্গার যে পথ ছিল তাহা পরিবর্ত্তনের ইহাই কারণ।

গঙ্গা ও ভাগীরথীর অভিন্নতা

প্রসঙ্গ কথায় যেরূপ আলোচনা হইল তাহারই সূত্র ধরিয়া বিহার বঙ্গে আসিলে পালরাজ্যের পশ্চিম সীমায় সম্ভবতঃ পাটলীপুত্র সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। এই অঞ্চলের ভূমি, নদীপথ ইত্যাদির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা ও বাঙালীর পক্ষে ভাগীরথীর অভিন্নতাও বর্ণিত হইতেছে।

(ক) গ্রীক্-বর্ণিত পালিবোথরাকে কেহ বলিতেছেন—
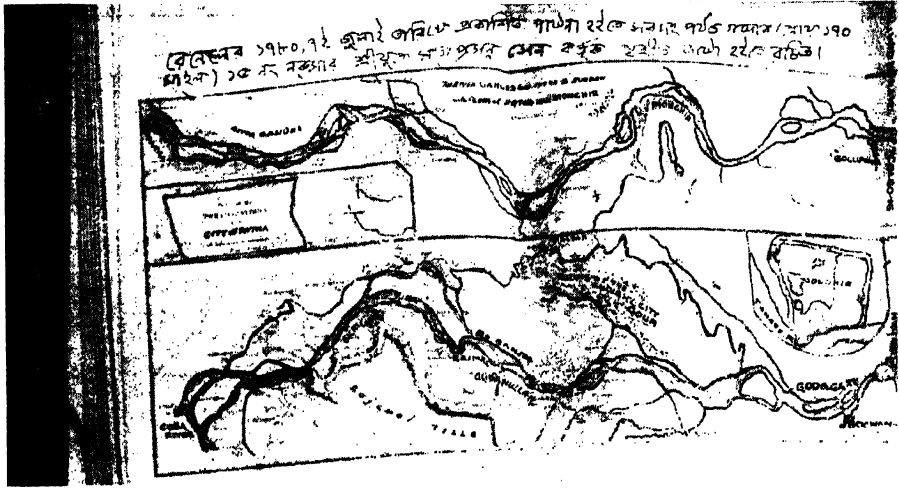
পাটলীপুত্র = পাটনা ; শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস মহাশয় ইহাকে নানা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া পালামৌ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় যে পালিবোথরায় ভূমিকম্প ও বন্যাহেতু সহসা গঙ্গার গতিপথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং গঙ্গার প্রচুর জলরাশি সমস্ত ভূভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে। টলেমী-প্রদত্ত ম্যাপে পালিবোথরা গঙ্গা নদীর তীরে।

(গ) মহাভারতে বনপর্ব্বে আছে যে, সগর রাজার ছেলেরা অশ্বমেধের ঘোড়া লইয়া কপিল মুনির কোপে পাতালে বন্দী হন। এঁদের উদ্ধার করার জন্য সগরের নাতি ভগীরথ গঙ্গাকে আবাহন করিয়া স্বদেশে আনেন। এই রূপকের অর্থ এই যে, সগর দ্বীপ (এই সেদিনও অর্থাৎ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় সেবাষ্টিন ম্যানরিক যখন এদেশে ধর্ম্মপ্রচারে আসিয়াছিলেন তখন সগর দ্বীপ ঘিরিয়া যে ধর্ম্মসংস্কার ও নরবলি ইত্যাদি ছিল তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়—Murray's *Discoveries & Travels in Asia*, Vol II, page 102) সমুদ্রের নীচে তলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে গঙ্গার পলিদ্বারা উঁচু করার উদ্দেশে খাল কাটিয়া গঙ্গার জল গঙ্গাসঙ্গমের দিকে আনা হয়। বিশেষ করিয়া এই কারণেই দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার নাম ভাগীরথী। সুতীর গঙ্গা ও ভগবানগোলার জলঙ্গী বর্ত্তমানে ইহার দুই বাহু—ইহাই ভাগীরথী, ইহাই হুগলী নদী।

(গ) উপরোক্ত বন্যার সময় ঐ বিপুল জলরাশি বিন্ধ্যপর্ব্বতের পথে আর সমুদ্রের দিকে যাইতে পারে না ; সে পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, উহা বাংলার বুকে আসিয়া সব ভাসাইয়া দেয়। পরে ঐ জলের খানিক মাটির নীচে চলিয়া যায় এবং পথ করিয়া দ্রুত মাটির নীচ দিয়া দক্ষিণে সাগরে চলিয়া যায়। (তাই কি গঙ্গার অপর নাম ভোগবতী ?) এই ভাবে নল বাহিয়া বেশী জল প্রবল বেগে বাহির হইলে যেমন সম্মুখে গর্ত্ত হইয়া যায়, বঙ্গসাগরে বাংলার দক্ষিণে তেমনই গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সমুদ্রের তীরদেশ যেমন ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে, এই স্থানের তীর সেরূপ নহে, সহসা এক বিপুল গর্ত্ত। এদিকে নীচের জলপথে অনেক জল বাহির হইয়া যাইবার পর উপরের মাটি ধ্বসিয়া যায় এবং সেহেতু নিম্নবঙ্গে অজস্র নদীমালা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সমুদ্রে গিয়াছে।

(ঘ) রেনেলের ম্যাপে আমরা দেখি, গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে রাজমহল। তাহার উল্টা দিকে পূর্ব্বতীরে গৌড়। এখানে মহানন্দা উত্তর হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। তারপর গঙ্গার পথ ছিল বর্ত্তমান স্রোতের উত্তর দিক দিয়া—যে গর্ত্ত বদল হওয়ায় বেতুরিয়া রাজ্যের (?) বিলগুলি (মউগু ও নওগাঁর নিকটবর্ত্তী বিরাট বিলগুলি, চলনবিল, বিলাবকরী প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জলা ও নিম্নভূমি) সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিল ও নিম্নভূমির উপর দিয়া যাইবার পর গঙ্গা তিল্লীর উপর দিয়া সোজা বিক্রমপুর (বাংলার অন্যতম রাজধানী) চলিয়া গিয়াছিল। [রেনেলের ম্যাপের ৯ ও ১৬ নম্বর নক্সা দ্রষ্টব্য] গঙ্গার ইহাই আসল গতিপথ ছিল, পরে এখানে ক্ষুদ্র স্রোত রাখিয়া দক্ষিণে নামিয়া, তাহাই আসল জলধারা হইয়াছে—এই মতও প্রচলিত আছে।

(ঙ) প্রাচীনকালে সমগ্র বাংলাদেশে জনবসতি কম ছিল। যাহা ছিল তাহা নদীতীরেই ছিল। বস্তুতঃ নদীর তীরে ও উচ্চভূমি না হইলে তাহা বসবাসের যোগ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত

হইত না। বিশেষত ভগীরথের স্বদেশে গঙ্গা আনয়নের পুরাণ-কাহিনী বাঙালীর মনে এতখানি আলোড়ন আনিয়াছিল যে, ভাগীরথীকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ করিতেন। সেই হেতু যিনি ভাগীরথী-তীরবাসী ছিলেন তিনি অধিকতর সম্মানিত ছিলেন এবং নিজেকে অপর অপেক্ষা পুণ্যবান্, সম্ভ্রান্ত ও সভ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই হেতু সমগ্র গঙ্গানদীকেই (পদ্মাসমেত) পালরাজাদের পক্ষে (যাহাদের জনকভূ অর্থাৎ পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্রী), তৎকালে ভাগীরথী নাম দেওয়া অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ গঙ্গার পূর্ব্বাংশের পদ্মানাম তো অনেক পরবর্ত্তীকালের (ডাঃ নীহার রায়ের বাংলার নদনদীতে আলোচনা দ্রষ্টব্য : ২৬ পৃঃ হইতে)।

জয়স্কন্ধাবারগুলির অবস্থান

এই ভাবে আমরা পালরাজাদের জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান নির্ণয়ের পটভূমিকা স্থির করিয়া লইলাম। এখন একে একে পৃথক পৃথক জয়স্কন্ধাবারগুলির অবস্থান বর্ণনা করিব।

পাটলীপুত্র

কেহ বলিয়াছেন, ইহা পাটনার প্রাচীনতম নাম এবং গ্রীক সাহিত্যে ইহারই নাম ছিল পালিবোথরা (রামপ্রাণ গুপ্তের প্রাচীন রাজমালা পৃঃ ৯০ এবং রামপ্রাণের প্রাচীন ভারত, পৃঃ ১২৯)। আবার পালিবোথরা যে পালামৌ, তৎকালে গঙ্গা পালামৌ দিয়া প্রবাহিত হইত, এই মতও আছে। (অমরনাথ দাসের *India and Jambu Island*, page 135, etc.)। আবার পাটনার অতি নিকটে Dr. D. B. Spooner সম্রাট্ অশোকের প্রাসাদ, সভাগৃহ প্রভৃতির (তাহা নাকি দারায়ুসের সভাগৃহের অনুকরণে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়) ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করিয়াছেন [J. R. A. S. (Bombay), 1917, pages 457-532]। সুতরাং পাটলীপুত্র (ইহা সম্রাট্ অশোকের রাজধানী ছিল) যে বর্ত্তমান পাটনার সমীপেই ছিল তাহা ধরিয়া লওয়া যায়।

মুদ্গগিরি

পাটলীপুত্রের পর গঙ্গা দিয়া বাংলার দিকে আসিতে গঙ্গাতীরস্থ পর্ব্বতোপরি প্রথম যে প্রধান দুর্গটি পড়ে সেই স্থানটির বর্ত্তমান নাম মুঙ্গের। এই দুর্গটি অতি প্রাচীন। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের চিহ্ন ইহার স্তরে স্তরে। (১) ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে কীকট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মুঙ্গরোড নামক নগরের উল্লেখ আছে। (২) অতি প্রাচীন কালে মুদ্গল ঋষি এই স্থানে তপস্যা করিতেন বলিয়া কথিত আছে। তাই এই স্থানের নাম মুদ্গলগিরি হইয়াছে। (৩) হরিবংশে জানা যায় যে গাধিসুত বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে মুদ্গল নামে এক রাজা এই স্থানে (?) রাজত্ব করিতেন। (৪) কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে কর্ণরাজ এখানে বাস করিতেন। (৫) কানিংহাম ইহাকেই হিউএনসঙের হিরণ্য পর্ব্বত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, রাবণবধের পাপ এখানে গঙ্গাস্নানদ্বারা হরণ করায় যে ঘাট 'কষ্টহারিণী'র ঘাট হয় তাহা কালে 'হরণ' হইতে 'হিরণ্য' নাম পায় (Arch, S. Rep. XV pp. 15-18 & Anc., Geo. p. 476)

দুর্গটি একটি পার্ব্বত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫ হাজার ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন হাজার ফুট। প্রাচীরটি প্রায় ১৫ হাত উঁচু। একদিকে গঙ্গা, অপরদিকে সুগভীর পরিখা বিদ্যমান আছে। দুর্গদ্বারে কতকগুলি লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধমূর্ত্তি (পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন) বিরাজমান। এই বিষয় *Transactions of the Asiatic Society*, Vol. IX, pages 56-57-এ বর্ণনা আছে এবং নন্দলাল দে কৃত *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India*-র ১৩২ পৃষ্ঠাতে বিবরণ আছে।

বটপর্ব্বতিকা

মুঙ্গের ছাড়িয়া গঙ্গা বাহিয়া পূর্ব্বদিকে বঙ্গাভিমুখে চলিবার পথে কহলগাঁওর (ভাগলপুর জেলা) নিকট বটপর্ব্বত নামক এক পর্ব্বতশিখর আছে। ইহাতে বটেশ্বর নামক শিব আজও প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং নদীতীর দিয়া পর্ব্বতোপরি বিস্তীর্ণ স্থানব্যাপী ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। (১) উত্তর পুরাণে বটেশ্বর নাথের পর্ব্বতগাত্রের ভাস্কর্য্যের অনেক বিবরণ আছে (*Ancient Geography*—N. L. Dey, page 27), (২) ১১৭৭ সন অর্থাৎ এখন হইতে ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়রাম সেন তাঁহার গঙ্গাপথে তীর্থভ্রমণের বিবরণ লিখেন। ইনি জলঙ্গী-ভাগীরথী দিয়া নৌকাযোগে বড় গঙ্গা দিয়া (সুতীর পথে নহে) ভগবানগোলা, গোদাগাড়ী ও রাজমহল হইয়া কাশীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত তাঁহার পুঁথি 'তীর্থমঙ্গলে' ৪৬, ৪৭, ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে গঙ্গাপ্রসাদ তেল্যাগাড়ি বামে রাখিয়া…লক্ষ্মীপুর শ্রামপুর বামে রাখিয়া—

সম্মুখে আছেন এক বটেশ্বর পর্ব্বত।
দেখিয়া চালায় নৌকা চলে যেন রথ॥
তাহার নিকট আছেন দেবতা বিস্তর।
যাত্রী লয়া মহাশয় চলিলা সত্বর॥

* * *

কুঠরের মধ্যে দেব করিলা প্রণাম।
বিস্তর পাথর হেতু পাথরঘাটা নাম॥

* * *

পাহাড়্যা রাজার বাটি কাহল গ্রামেতে
মন্দ মন্দ চলে নৌকা রাখি বাম ভিতে॥

(৩) বটেশ্বর পর্ব্বত, পাথরঘাটা ও কহলগ্রাম—এই বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া চারিদিকে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন পড়িয়া

আছে (ভারতবর্ষ, ১৩৫০, জ্যৈষ্ঠ, ৪০৫ পৃঃ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার উপরোক্ত উপকরণ সাহায্যে বটপর্ব্বতিকার অবস্থান নির্ণয় করিতেছেন)। (৪) রাজা ধর্ম্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা বিহারের স্থান বিষয়ে নানা তর্ক আছে। কেহ বলিতেছেন উহা নালন্দার নিকট; কেহ বলিতেছেন উহা ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জের নিকট জাঙ্গিরা পর্ব্বতে; কেহ বা পাথুরেঘাটার সন্নিহিত খননদ্বারা প্রাপ্ত বিবিধ বুদ্ধমূর্ত্তি ও অন্যান্য নিদর্শন দ্বারা ইহাকেই বিক্রমশীলার অধিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতেছেন (J.A. S. B. X. 1914. p. 342)। (৫) মনহলি লিপির দাতা মদনপালদেব যে পণ্ডিতকে দান করেন তিনি হইলেন চম্পহিট্টি গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীভূষণ (উপাধিধারী) বটেশ্বর স্বামিশর্ম্ম। সুতরাং সেকালে যে বটেশ্বর কোন খ্যাতিসম্পন্ন দেববিগ্রহের নাম ছিল তাহাও লক্ষ্য করার বিষয়। (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ, ১৫৭ পৃঃ)

বিলাসপুর ও সাহসগণ্ড

মহীপাল দেবের দুই জয়স্কন্ধাবার—বিলাসপুর ও সাহসগণ্ড। বটপর্ব্বতের পর যে স্থানগুলি স্থানগুণে খ্যাত তাহা হইল তেড়িয়াগলি, সিকড়িগলি (ইহাই কি মুসলমান আমলের Gurhy ?), রাজমহল (সুতীগঙ্গা সঙ্গম সন্নিহিত), গৌড় (মহানন্দা গঙ্গা সঙ্গম সন্নিহিত) ও গোদাগাড়ী (জলঙ্গী [ভগবানগোলা] গঙ্গা সঙ্গম সন্নিহিত)।

তেড়িয়াগলি ও সিকড়িগলির গঙ্গার তটরেখা (পর্ব্বত-সঙ্কুল এই দেশ) খুব পরিবর্ত্তন হইয়াছে মনে হয় না, এবং এই সকল স্থানে অল্প অল্প প্রাচীন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত অন্যান্য জয়স্কন্ধাবারগুলির অধিষ্ঠানে যেরূপ বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিহ্ন আছে সেরূপ বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিহ্ন এই সকল স্থানে দেখা যায় না। কিন্তু অতি বিস্তীর্ণ প্রাচীন চিহ্ন দেখা যায় রাজমহল পর্ব্বতে।

(১) উপরোক্ত 'তীর্থমঙ্গল' পুস্তকে আছে—পৃঃ ৪২, ৪৩

যুদ্ধস্থান উদয়নালা বামভাগে রাখি।
শীঘ্রগতি চলে নৌকা উড়ে যেন পাখি ॥১৯৬
দুই দণ্ড বেলা যখন গগনে আছয়।
রাজমহল আসা নৌকা উপস্থিত হয় ॥১৯৭
* * *
রাজমহল নগরের অপূর্ব্ব কথন।
কত শত বালাখানা আশ্চর্য্য রচন ॥১৯৯
পাচ ক্রোশ সহরখান ঘন ঘন ঘর।
কতো কতো মুদিখানা দেখিতে সুন্দর ॥২০০
হাট বাজার স্থানে স্থানে রহে ঘড়ীখানা।
সর্ব্বদা নহবত বাজে তাহা নাহি মানা ॥২০১
ঘোষালের আগমন ফৌজদার শুনিয়া।
আশ্চর্য্য পালকীতে চড়ি মিলিল আসিয়া ॥২০২

(২) কেবল এই ফৌজদার নহে, তাহার অনেক আগে মুসলমান আমলে সুজার সময়ে ইহা তাহার রাজধানী ছিল। মানসিংহ ইহাকেই উড়িষ্যা বিজয়ান্তে (১৫৯২ খ্রীঃ) বাংলার রাজধানীরূপে (অগমহাল) মনোনীত করেন। মানসিংহ-নির্ম্মিত জুমামসজিদের চিহ্ন এখনও আছে। [রামপ্রাণগুপ্ত সম্পাদিত রিয়াজ-উস্-সালাতিনে রাজমহল বা আগবরনগর উল্লেখে ইহার বিবরণ আছে। ৩৫ পৃঃ। (৩) কিন্তু তাহার অনেক আগে হিন্দুরাজত্বের আমলে এই রাজমহলের স্থানমহিমা কি রাজাদের নজরে পড়িয়া কোন রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিষ্ঠান হইতে পারে নাই ? ইহা আমাদের মনে হয় না। ফানডেন ব্রোকের নক্সাতে (১৬৬০ খ্রীঃ) দেখা যায় যে, এখনকার মত দুইটি (সুতীর ভাগীরথী ও ভগবানগোলার জলঙ্গী) নহে, তখনকার দিনে রাজমহলের পূর্ব্বদিকে গঙ্গা হইতে অন্ততঃ তিনটি স্রোত দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসিয়া কিছু দক্ষিণে ধীরে ধীরে একের সঙ্গে অন্যে মিলিত হইয়া পরে একদেহ-ভাগীরথী হইয়াছে। অর্থাৎ সুতীর পশ্চিমে রাজমহলের গায়ে আর একটি দক্ষিণবাহী স্রোত ছিল এবং তাহা এই পর্ব্বতাকীর্ণ রাজমহলকে অধিকতর বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল।

আমরা অনুমান করিতেছি যে মহীপালের সময় (একাদশ খ্রীষ্টাব্দে) রাজমহল তাহার অন্যতম জয়স্কন্ধাবার হইবার যোগ্যতা ধারণ করিত। তখন ইহার নাম কি ছিল ? তখন ইহার নাম ছিল হয় বিলাসপুর নতুবা সাহসগণ্ড। অধিকতর প্রমাণ অভাবে ইহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। [যে সকল স্থানে মুসলমান রাজাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্র দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে হিন্দুরাজত্বের চিহ্ন, নামধাম বড় বেশী মুছিয়া গিয়াছে বা চাপা পড়িয়াছে। দিল্লী যদি হস্তিনাপুর হইয়া থাকে তবে যুধিষ্ঠিরের চিহ্নাদি ও নামধামওয়ালা চিহ্ন সেখানে এতদিন পরে সন্ধান করিয়া বাহির করা শক্ত।]

রাজমহল যদি বিলাসপুর হইয়া থাকে তবে সাহসগণ্ড কোথায় ? রাজমহলের পরই গঙ্গানদী বাংলাদেশে পড়িয়া নরম মাটি পাইল এবং তখন তাহার তটরেখা আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এক রহে নাই। এই বিষয় পূর্ব্বে কতক আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সাহসগণ্ড যদি বিস্তীর্ণ ১২।১৪ মাইল ব্যাপী গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইয়া না থাকে তবে তাহার গঙ্গাতীরস্থ ধ্বংসাবশেষ কোথায় গেল ? তাহার নামটি তো আর এখন শুনিতে পাই না। প্রাচীন কোন্ নামই বা অবিকৃত আছে যে শুনিতে পাইব ?

(১) গণ্ড হইতে গড়—গড় হইতে বাঙালী গাড়ী নাম বানাইতে পারিবে বৈ কি ? যিনি সাহসী ও বলী তিনি সর্দ্দার হইয়া থাকেন। যিনি দলের সর্দ্দার তিনিই পালের গোদা। তাই কি কালে কালে সাহসগণ্ড গেঁয়োলোকের

মুখে গোদাগাড়ী নাম লইয়াছিল ? গোদাগাড়ী জলঙ্গী-গঙ্গার সঙ্গমস্থলের নিকট গঙ্গার উত্তর পারে অবস্থিত। এই স্থানটি এখন বড় বন্দর—রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশন—এখান হইয়াই গৌড়-মালদহ যাইবার পথ। সাহসগঞ্জ যে কালে কালে গোদাগাড়ী হইয়াছে তাহা আমার অনুমান মাত্র। পরবর্তীকালে কোন ভাগ্যবান্ সন্ধানী ইহার সমর্থক আরও অধিক উপকরণ পাইতে পারেন, ইহাই আমাদের আশা। (২) এই প্রসঙ্গে একটু তথ্যও পাওয়া যায়। বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন পাল-রাজাদের নিকট হইতে বাংলার রাজলক্ষ্মী কাড়িয়া লন। তিনি বিজয়পুরে রাজাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিজয়পুর উল্লিখিত গোদাগাড়ীর সন্নিহিত বিজয়নগর গ্রাম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে (J. R. A. S. 19 4 p. 101)। এখানে বিরাট টিলার মধ্যে প্রাপ্ত প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে রক্ষিত আছে। ইহাই স্বাভাবিক যে, একদা যে গোদাগাড়ী পালরাজাদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র ছিল বিজয়লাভ করিয়া বিজয়সেন স্বনামে তাহার উপর জলঙ্গী-গঙ্গার সঙ্গমস্থল বরেন্দ্রভূমির এই দ্বারদেশে রাষ্ট্রকেন্দ্র বিজয়পুর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ রাজধানীই পরে বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন আরও পশ্চিমস্থিত মহানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলস্থ রামাবতী নগরের (রামপালের রাজধানী) সান্নিধ্যে স্থানান্তরিত করিয়া স্বনামে 'লক্ষ্মণাবতী' নামকরণ করেন। (৩) পূর্ববঙ্গে নদীতীরস্থ প্রাচীন সম্পন্ন গ্রামগুলির স্থান পরিবর্তন হয়, আমরা দেখিয়াছি। নদী গতি-পরিবর্তন করিতে থাকে, বাসিন্দারা পূর্ববাসস্থান ত্যাগ করিয়া নিকটেই নদীতীরে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া বাস সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু গ্রামের নামটি পরিত্যাগ করে না, নূতন স্থানে পুরাতন গ্রামের নামটি আনিয়া ব্যবহার করে। নদীর গতি পরিবর্তনে যদি প্রাচীন জনপদ ভাঙ্গিয়া তাহার কীর্তিনাশ হয় তবে আর তাহার প্রাচীন চিহ্ন থাকে না, যদি নদী কেবল দূরে সরিয়া যায় তবে পরিত্যক্ত হৃতশ্রী নগরের চিহ্ন দেখিবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের গোদাগাড়ী সাহসগঞ্জের সেইরূপ নূতন সংস্করণ হওয়া অসম্ভব নহে।

রামাবতী

গঙ্গা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলের কাছে গঙ্গার উত্তর তীরে গৌড়ের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। ইহা অতি বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিবার কারণ এই যে, নদীর গতি সম্ভবতঃ দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছিল, তাই জনপদটি ক্রমশঃ নদীর তীর ঘেঁসিয়া বিস্তৃত হইতেছিল এবং প্রাচীন বসতি অঞ্চলের স্থান-মাহাত্ম্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল।

মুসলমান আমলে গৌড়নগরের নামও পরিবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু গৌড় গৌড়বঙ্গের রাজধানী হওয়ার দরুন গৌড়নাম লুপ্ত হয় নাই, এবং গৌড় লক্ষ্মণসেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর অধিষ্ঠান হওয়াতে তাহার 'লক্ষৌতি' নামও দীর্ঘকাল (মুসলমান আমলেও) এইখানে চলিয়াছিল। নিকটেই রামাবতীর অধিষ্ঠান ছিল। তাই আইন-ই-আকবরীতে তখনও 'রামৌতি' উল্লেখে ইহা পরিচিত হইয়াছে। [শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ৭১ পৃঃ।]

পূর্বরাগ

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

অসূর্যম্পশ্যার মতো যদি কিছু মেঘ ভেসে এসে
জলকন্যার কোনো যৌবনের গোপন সৌরভ—
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় যদি একা সেই মেঘনার দেশে :
যেখানে তোমার মন নীল-রাতে ফিরে পায় সব।
আলো-মাখা শাল-তাল-পিয়ালের অরণ্য-বাতাস
অনেক রোদের ভিড়ে যারা সব হয়েছে শ্যামল,
যেখানে ঘুমের দেশে মিশেছিল শত বালুহাঁস
সেখানেও সেই মেঘ স্বপ্নের মতো ঝলমল।

তোমার বকুলতলে তারি যদি হাওয়া এসে লাগে
এলোমেলো উদ্দাম—সীমাহীন আকাশের গায়।
ধূসর বালুর চরে সুনিবিড় প্রাণের সোহাগে
খুশী হবে জানি তবে বাদলের কোনো সন্ধ্যায়।
—শ্রাবণের মেঘে মেঘে ভেসে-আসা মেঘনার গান
এনে দেবে নির্জনে এই সব স্মৃতির উজান।
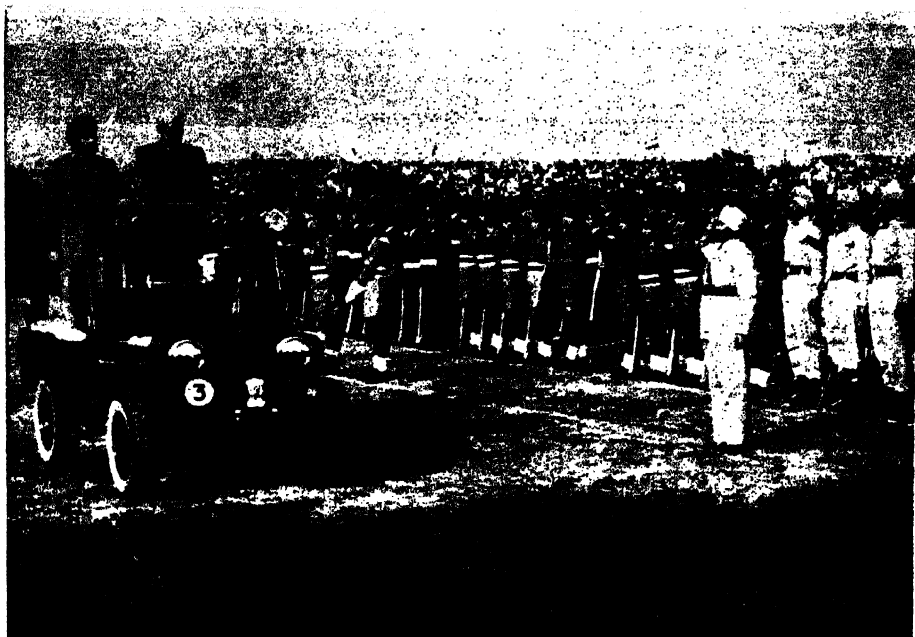
রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নয়াদিল্লীতে সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিতেছেন

কনখলে সতীর মন্দির, হরিদ্বার — ফটো—শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লছমনঝোলা সেতু

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট

ফটো—শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেশিনী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

ছোট্ট গ্রাম—মাসীদি। এ গ্রামের মধ্যে বিমলাকে না জানে এমন লোক নাই। সবাই খাতির করে তাকে—আবার ভয়ও করে। বিমলা বলে, খাতির কি আর আমাকে করে, খাতির করে আমার গতরকে। যেখানে যাব—গতর খাটাব, দু'মুঠো ভাত—আর পরনের একখানা দশি—এ কেউ না দিয়ে পারবে না। আমার আবার—আপন-পর কি! সারা গেরামটাই তো আমার ঘর। যে ডাকবে আদর করে, তারই বাড়ীতে যাব। যেচে কারও বাড়ীতে পা দেবে—হেন ব্যক্তি আশু চক্কত্তির মেয়ে বিমলী নয়।

সেটা অত্যুক্তি নয়। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়ে বাপের যত্নে ও বড় হয়ে ওঠে। বাবা ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দিতে পারেন নি। ভাল ঘরে বিয়ে দেবার সাধ্যও ছিল না তাঁর। তিনি ছিলেন যাজনিক ব্রাহ্মণ—ভাল লেখাপড়া শেখেন নি, বড় বড় ক্রিয়াকর্ম্মে কেউ তাঁকে ডাকত না। ষষ্ঠী পূজা—মনসা পূজা, ইতু, মঙ্গলচণ্ডী—বড়জোর জলচৌকিতে পাতা ধান্যরূপিণী লক্ষ্মী বা পুস্তকরূপিণী সরস্বতীর আরাধনা তাঁর ভাগ্যে জুটত। এসব পূজার দক্ষিণা—তাম্রমুদ্রা, পাওনা—নৈবেদ্যের চাল কলা—উপরি জলখাবার বা ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ। কালেভদ্রে নান্দীমুখে—দু'একখানা গামছা বা আট হাতি ধুতি শাড়ী মিলত। ইউরোপের যুদ্ধ তখন পৃথিবীতে দুর্ভাগ্য ছড়ায় নি—মোটা ভাত কাপড়ের দুর্ভোগও ঘটে নি তাঁর—তাই কোন রকমে বিমলার সঙ্গে আরও তিনটি ছেলেকে মানুষ করে তুলতে পেরেছিলেন।

বিমলা বলে, পাখীরা যেমন আহার জোগায় না বাচ্চার মুখে—তেমনি আর কি। নেহাৎ ভগবানের দয়া তাই কোন রকমে খুঁটে খেয়ে বেঁচেবর্ত্তে রইলাম সব। ছেলে মানুষ করবার ক্ষ্যামতাই যদি থাকত বাবার—তো ভাইয়েরা জজ ব্যালিষ্টার হ'ত না? অমন ঠিকে দোকানদারি করবে কেন—ভাইনে আনতে যার বাঁয়ে টান ধরে। আমারই বা এ দুর্গতি কেন! একটা বুড়ো ঘাটের মড়া ধরে—আইবুড়ো নাম খণ্ডন কল্লেন বাবা। হতে হ'ল কি—ছের কালটা থান কাপড় পরে বাপের ঘরেই রইলাম। বোঝা নামাব বললেই নামানো যেত যদি তা হলে আর ভাবনা থাকত না!

স্বামীর জন্য বিমলা কোন দিন খেদ করে নি। ে প্রসঙ্গ উঠলে বলে—ভারি সুখে রেখেছিল কিনা—তাই তার জন্যে কাঁদব! পোড়া কপাল! ছের জন্য একাদশী করতে রেখে গেল যে ঘাটের মড়া তার সঙ্গে আমার সুবাদটা কি!—ধম্ম? ও যার ধম্ম তার সাজে—অন্ধের মাথায় লাঠি বাজে।

২

বাবা গত হলে বিমলা ভায়ের সংসারেই ছিল। তখন সবে বিয়ে হয়েছে বড় ভাইয়ের; ছেলেমানুষ বউ—তাকে ঘর-সংসার চিনিয়ে না দিলে লোকেই বা বলত কি? কিন্তু বউ যখন ভাল করে ঘর-সংসার চিনল তখন বিমলা এসে উঠল মেজ ভায়ের সংসারে। অর্থাৎ আসতে বাধ্য হ'ল সে। বাপের সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক না থাকায় সব কাজই সে স্বাধীন ভাবে করত। তার গিন্নীপনা ছিল নিরঙ্কুশ। সেই কারণে তার মুখের আটক ছিল না—কোন কাজ দিয়ে কেউ আটকে রাখতে পারত না তাকে বাড়ীর মধ্যে। হয়ত উনুনে ভাত চাপিয়ে সে পাড়ায় যেত গল্প করতে, হয়ত বা নিজের সংসারের রোগী ফেলে পরের বাড়ীতে যেত রোগের খবরদারি করতে।

এক দিন বড়বউ স্বামীকে একান্তে বলেছিল, এমন ঘর জ্বালানী—পর ভোলানী নিয়ে সংসার করা পোষাবে না আমার—তুমি বাপু আমাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।

কথাটা বিমলার কানে যায়। না যাবার কোন হেতু ছিল না। পাশাপাশি শোবার ঘর—মাঝখানে দরমার বেড়া। যত নীচু গলায় গোপন আলোচনাই হোক—একটু কান পাতলে প্রত্যেক বর্ণই শ্রুতিগোচর হবে। বিমলা আড়ি পাতে—এ কথা ওর সামনে বলতে সাহস করবে না কেউ, কিন্তু পাশাপাশি ঘরে বাস করে কৌতূহল দমন করে রাখতে পারে এমন সাধু সন্ন্যাসী বিমলার নজরে আজ অবধি পড়ে নি।

সেই রাত্রিতেই তুলকালাম ঝগড়া।

বড়বউ গলা ছেড়ে বললে—মরণ আর কি! বড় ভাই পিতৃতুল্যি—তার ঘরে আড়ি পাততে লজ্জা করল না তোর!

বিমলাও সতেজে জবাব দিলে—তোরা বলতে পারিস—আর যত দোষ আমার শুনতেই! বেহায়া—কালামুখী কোথাকার—গতর জল করে খাটব—আবার খোঁটাও শুনব? কেন? বলে,—লাভ নেই ভুতো,

কাঠ পাড়ার গুঁতো!—

সাত ঝাঁটা মারি তোর সংসারের মুখে!—

মেজ ভাইয়ের সংসারেও স্থায়ী হতে পারলে না সে। নিজে মেয়ে সন্ধান করে তার বিয়ে দিলে—তার বউকে নিয়ে যথেষ্ট সাধ-আহ্লাদ করলে—কিন্তু বউ এলে ভায়েরা সব একদম বদলে যায়। তারা তখন মানুষ থাকে না, পরের মেয়েদের লাগানি ভাঙ্গানিতে—তারা জানোয়ার বনে যায়। জানোয়ার কখনও আত্মকুটুম্ব নিয়ে বাস করতে পারে! কি একটা সামান্য কথায়—মেজ ভাই লাঠি নিয়ে তেড়ে এল—

উত্তম মধ্যম ঘা কয়েক বসিয়েও দিলে বিমলাকে। কাঁদতে কাঁদতে অভিশাপ দিয়ে সে এসে উঠল ছোট ভাইয়ের কাছে।

ছোট ভাইটা বাউণ্ডুলে গোছের—বিয়ে থাওয়া করে নি, এ-দেশ সে-দেশ করে ঘুরে বেড়ায়। দু' পাঁচ দিনের জন্য বাড়ী আসে, হৈ হৈ করে, আবার উধাও হয়ে যায় কিছু দিনের মত। তারই সংসার (অর্থাৎ শূন্য ঘর) আগলে পড়ে থাকে বিমলা। সংসার আগলানো মানে রাত্রিতে শোবার একটা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা আর কি! নইলে সারাদিন—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত টো টো করে এবাড়ী সেবাড়ী ঘুরে বেড়ানোর কামাই তার নাই। কারও বাড়ীতে বিয়ে—ডাক বিমলাকে; কারও প্রসবকাল উপস্থিত—বিমলাকে তাঁর চাই, মেয়ের ঘটকালি করতে আর মেয়ের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ী যেতে বিমলা ছাড়া গাঁয়ে আর আছেই বা কে! আবার দুর্দ্দিনেও বিমলা বুক দিয়ে গিয়ে পড়বে। কেউ গেলেন বিদেশে—বাড়ী-ঘর বিমলার জিম্মায় রইল—কারও অসুখে মুখে জল দেবার লোক নেই—বিমলা সেখানে হাজির। সারা গাঁয়ের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বিমলা যেন অপরিহার্য্য। কিন্তু নিত্য পাওয়া সূর্য্যের আলোর মত সহজ বলেই ওর মূল্য বিশেষ করে চোখে পড়ে না। সেজন্য ক্ষোভ নাই বিমলার মনে। পরনের কাপড়খানা নিত্য তুলে ধরে কে আর বলে—খাসা জমি—চমৎকার পাড়! কাপড় তো প্রশংসার লোভে মানুষের লজ্জা নিবারণ করে না। বিমলাও ভাল কথার প্রত্যাশায় আপদে বিপদে বিনা আহ্বানে গিয়ে দাঁড়ায় না। তার স্বভাবে যা প্রতিষ্ঠিত—তাই তার ধর্ম্ম, সুতরাং তা থেকে তাকে বিচ্যুত করা সহজ নয়।

৩

গাঁয়ের মধ্যে মিত্রদের অবস্থা ভাল। দুই ভাই—উপায় করে; একজনের গোলদারি দোকান—একজন বড় চাকুরো। একান্নবর্ত্তী পরিবার। সম্প্রতি চাকুরোর চালের সঙ্গে ব্যবসায়ীর চালের সামঞ্জস্য হচ্ছে না। গরমিলটা মাঝে মাঝে প্রকট হয়—কিন্তু সেটা মারাত্মক নয়। ভায়েদের সামনে—বউদের মুখ খোলে না—তবু বাইরের কেউ না বুঝলেও বাড়ীর দু' পক্ষ বুঝেছে এ ভাবে বেশী দিন একান্নবর্ত্তিতা বজায় রাখা চলবে না। দুই বউয়ের মধ্যে কাজেকর্ম্মে গা ঢালা গোছ ভাব এসেছে, পারতপক্ষে কেউ শ্রমসাধ্য কাজগুলি করতে চায় না।

এক দিন বড়বউ সুহাস বিমলাকে ডেকে বললে, ভাই ঠাকুর-ঝি—দিনকতক থাকবি আমার কাছে? বাতের ব্যথা নিয়ে হাজার বার ওপর নীচে করতে বড় কষ্ট হয়—ভাঁড়ার সামলাতে পারি না।

বিমলা বললে, এ আর বেশী কথা কি বড়বউদি, তোমরা কি আমাদের পর?

ভাঁড়ার বার করে দেওয়া নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে খিটিমিটি বাধল বিমলার। ঠাকুর আপত্তি তুললে, এক বাটি ঘি তরকারিতে দিতে কুলোয় না তা জলখাবারের লুচি কিসে হবে?

বিমলা বললে, কায়দা করে অল্প ঘিয়ে লুচি ভাজতে না পার ত কিসের রাঁধুনি তুমি?

ঠাকুর রাগ করে চলে গেল।

বিকালে ছোটবাবুর ছেলেমেয়েরা জলখাবার খেলে না ভাল করে। ছোটবউ কিরণের কাছে নালিশ জানালে অল্প ঘিয়ে ভাজা টানা পরোটা নাকি খাওয়া যায়!

ছোটবউ কিরণ ঠাকুরকে ধমক দিলে, ঠাকুর ছেলেদের জন্যে লুচি করা হয় নি কেন?

ঠাকুর বললে, আজ্ঞে ঘিয়ের বরাদ্দ কমালে আমি কি করব বলুন?

কেন—বরাদ্দ কমান হ'ল কেন? কে কমালে?

আজ্ঞে পিসি ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করুন।

কিরণ বড়লোকের মেয়ে—স্বামী বড় চাকুরো। পান থেকে চুণ খসলে ওর মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। বললে এ বাড়ীর জনে জনে কর্ত্রী নয়—এ কথাটা তোমার পিসি-ঠাকরুণকে বল। সংসার-খরচ কিছু কম দেওয়া হয় না—ছেলেদের লুচি খাবার ঘিয়ের অভাব হবার কথা নয়।

বিমলা উপর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বললে, কেন অভাব হবে ঘিয়ের? ওই ঘিয়ে আমি দশ জন ছেলেকে লুচি ভেজে খাওয়াতে পারি।

ছোটবউ বললে, অত টানাটানি করে ঘি বার করে দেবার মানে কি ঠাকুরঝি? ওতে আর কত সাশ্রয় হবে!

ওরে ভাই পাঁচফুলে সাজি ভরে। সংসারে অঢেল আছে বলেই যে অপচো করতে হবে তার মানে নেই। লক্ষ্মী অনাদরের নন—

থাক তোমাকে আর সাউখুরি করতে হবে না—কিসে কি হয় আমি বুঝি।

এ ভাবে মুখঝামটা খাওয়া বিমলার স্বভাব নয়। সেও অকস্মাৎ রুখে উঠল, মুখ করছিস যে ছোটবউ! আমি কি কারও কেনা বাঁদী যে চোপা সয়ে হেনস্তার অন্ন মুখে তুলব?

না তুমি রাজরাণী—

গোলযোগ বেড়ে উঠতেই বড়বউ সুহাস উপর থেকে নেমে এল। মোটা-সোটা মানুষ, তাড়াতাড়ি আসতে হয়েছে বলে হাঁপাচ্ছে। বললে, তোমাদের ব্যগ্রতা করি বাপু—চুপ কর।

ছোট বউ কিরণ বললে, ব্যগ্রতার কথা নয় দিদি, নিজের সংসারে চোর হয়ে বাস করব—তেমন মেয়ে আমি নই।

'তবে করবি কি ?' সুহাস শাসনের সুরে বললে, 'ঠাকুরঝি যা করেছে আমাদের ভালর জন্যেই।'

তা জানি, না হলে এত লোক থাকতে ওকেই বা ডাকবে কেন! কথায় বলে না সাত কুটুমের নাম গেল—হিদে জোলার নাতি! তোমারও হয়েছে তাই।

কথাটা বড় কর্তার কানে উঠল। তিনি বড় বউকে ডেকে বললেন, বিমলিকে বিদেয় কর—ওর জন্য তো যত অশান্তি।

বড়বউ বললে, অশান্তি আজ নতুন হয় নি। তোমরা পুরুষ মানুষ—বাইরে থাক—জান না কোথায় কি হচ্ছে।

'জানি।' বড়কর্তা ধমক দিলেন, 'তাই বলে বাইরে লোক হাসাবে নাকি ?'

বড়বউ চোখের জল ফেলতে ফেলতে উঠে গেল—সে রাত্রিতে সে আর অন্ন স্পর্শ করলে না।

৪

পরের দিন ছাড়া কাপড়খানা বগলদাবা করে বিমলা বললে, চললাম বড়বউদি, তোমার ভাঁড়ারের চাবিটা নাও—আর জিনিসপত্তর—

বড়বউ বললে, তোমাকে অবিশ্বাস করব এমন সাহস আমার নেই ঠাকুরঝি। কিছু মনে কর না।

না—আমরা ভাই জোয়ারের ময়লা, এক জায়গায় থাকতে পারি কৈ! একটু হেসে বললে, এমন পোড়াকপাল বড়বউদি যে, সবাই বলে এস লক্ষ্মী যাও বালাই। তোমরা ত পর নও—আসব বৈ কি।

হাসতে হাসতে বিমলা চলে গেল।

সে চলে গেলেও মিত্রদের চিড়-ধরা কাচের সংসার আর জোড়া লাগল না। ছ' মাসের মধ্যে দুই ভাই পৃথক হয়ে গেল। ছোট ভাই জমিজমা বাড়ী বাগানের ভাগ বুঝে নিয়ে বউ ছেলেকে রেখে চাকরিস্থলে চলে গেলেন। ওদেরও বিদেশে নিয়ে যেতে পারতেন—কিন্তু সদ্য ভাগকরা জমিজমার স্বত্বটা পাকা করে নেবার জন্যই পরিবারবর্গকে দেশের বাড়ীতে রেখে গেলেন।...

সংসার ঘাড়ে পড়তেই ছোট বউ কিরণ চোখে অন্ধকার দেখল। সাহায্যকারিণী কাউকে না পেয়ে সে একদিন বিমলার বাড়ীতে এসে হাজির।

সেদিন বিমলার ছোট ভাই বলাই বাড়ী এসেছে। বিমলা বহুদিন পরে ঘটা করে রাঁধতে বসেছে। আজ কোন রকমে ভাতে ভাত সিদ্ধ করে ক্ষুধা নিবৃত্তি চলবে না। আজ পাড়া-বেড়ানোর স্বাদের চেয়ে সংসারের দাবি হয়েছে স্বাদুতর। বহুদিন আগেকার কথা মনে পড়ছে বিমলার। তখন সবে ছ'একখানা তরকারি রাঁধতে শিখেছে। বাপের সামনে থালা সাজিয়ে প্রায়ই বলত, একটি জিনিস যদি ফেলে রাখবে ত অনখ করব বাবা। আর কেমন হয়েছে রান্না ঠিক ঠিক বলবে কিন্তু।

বাবা হেসে বলতেন, তোর রান্নার নিন্দে করতে পারলাম না কোনদিন—কার কাছে এত শিখলি বল ত ?

এই কথায় প্রখরা বিমলার মুখে সলজ্জ মেদুর ছায়া নামত। মুখ নীচু করে বলত, রান্না আবার মেয়েমানুষকে শিখিয়ে দিতে হয় বুঝি!

তা বটে।

আজ রাঁধতে রাঁধতে আপন মনে স্মরণ করছিল সেই ভুলে-যাওয়া দিনগুলির ঘটনা। রান্না মেয়েদের জন্মগত জিনিস—কিন্তু তাও যে ভুলতে বসেছে সে। শুধু নিজের উদরপূরণের জন্য যে আয়োজন তাতে আর কতটুকু আগ্রহ জাগে! কাউকে খাইয়ে তার তৃপ্ত মুখখানি না দেখলে—তার মুখ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসাবাণী না শুনলে নারী-জীবনের সার্থকতা কি ?

কিরণ এসে বললে, আজ যে ঠাকুরঝির রান্নার ভারি ঘটা। বলাই বাড়ী এসেছে বুঝি ?

হাঁ ভাই বোস। পিঁড়িখানা বাঁ হাতে ঠেলে দিয়ে বললে, থাকে বিদেশ বিভুঁয়ে, কি ছাইভস্ম খায় কে জানে! ক্ষামতা ত নেই ভাল-মন্দ কিনে খাওয়াবার—

তা ঠাকুরঝি একটা কথা রাখ ত বলি।

ভণিতা কেন—বল না।

আমার কাছে দিনকতক থাকতে হবে। শরীর খারাপ—সংসারের কিছু দেখতে শুনতে পারি না।

কিছুদিন আগেকার অপ্রীতিকর ব্যাপারটা বিমলার মনেই এল না—সে হেসে বললে, ওমা একথা এতদিন বলনি কেন ? আমরা থাকতে—

সে মুখ আমার নেই ঠাকুরঝি। তোমার কাছে কত অপরাধ যে করেছি—

ওমা—কথা দেখ! দোষঘাট দু' পক্ষেরই হয়—কথায় বলে না—এক সঙ্গে থাকতে গেলে হাঁড়িতে-কলসীতে ঠোকাঠুকি হবেই—তাই বলে সে সব আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখলে কি সংসার চলে! বলে না আপন যে জন সে মেরেও যায়—আবার ফিরেও যায়—তা ভাই এ ক'দিন ত পারব না—ছোঁড়া চলে গেলেই।

তাই যেয়ো ভাই, তুমি না গেলে সংসার আমার চলবে না।

দিন দুই পরে একখানা গামছা জড়ানো কাপড় বগলে করে বিমলা কিরণের সংসারে এসে আশ্রয় নিলে।

বড়বউ স্বগতোক্তি করলে :

বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান।
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।

আমাদের বিম্‌লির হয়েছে তাই।

কথাটা বিমলার কানে যেতেই সে ফোঁস করে উঠল, যে দুর্জ্জন তার আবার লাজলজ্জা কি বড়বউদি। তা ছাড়া যে আমায় আদর করে ডাকবে—

বড়বউ বললে, আদর গোবর থাকলেই ভাল!

বিমলা বললে, আদরের কপালই যদি হবে তো সোয়ামীর ঘর বরাতে সইল না কেন? কেন ভায়েরা বিদেয় করে দিলে? সে পিত্যেশ আমি করি না বড়বউদি। তবে তোমরা পাচ জনে ভালবাস—আদর করে ডাক তাই।

বড়বউ বললে, তবে পায়ে তোমার কাক বাঁধা ঠাকুরঝি, বেশী দিন এক জায়গায় তো থাক না—

সে আমার বরাত ভাই। কপালে তর্জ্জনী ঠেকিয়ে বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

দিনকয়েক পরে বিমলা বড়বউকে বললে, এক কুপি কেরাছিন তেল দেবে বড়বউদি? কাল বাড়ী ফেরবার সময় আঁধারে হোঁচট খেয়ে মরি।

আচ্ছা নিয়ে যাস।

কেরোসিন নিতে এসে বিমলা বললে, উরে বাসরে এত তেলের টিন তোমাদের ঘরে! তবে যে সবাই বলে তেলের অভাবে সারা গেরাম নিঝ্‌ঝুম?

চুপ কর্‌, একথা কোথাও যেন গল্প করিস নে।

কেন বড় বউদি, দাদা বেলাকে তেল বেচে বুঝি?

জানি না ভাই—তবে বলতে নিষেধ আছে। নদীর ওপারের গাঁয়ে কোম্পানী নাকি তেল দেয় না—ওনারা সেই-খানে বেচে দেন। খবরদার আর কাউকে যেন বলিস্‌ নে!

না গো না—আমি তেমনি মেয়ে কিনা।

কিন্তু বাড়ী এসে বিমলার ভারি অস্বস্তি বোধ হ'ল। খবর দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি তা থেকে কে যেন ওকে জোর করে বঞ্চিত করছে। ওর জীবনের সবচেয়ে সেরা উপভোগ হ'ল এই বৃত্তি। এ বৃত্তিকে রোধ করা—তার চেয়ে মৃত্যু শতগুণে ভাল। অতি আপনার জন ভাবা যায় যাদের তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজের ভাল-মন্দকে না জড়ালে মনুষ্যজন্মই তো বৃথা। আপন জনের ভালটা বলে যেমন মনটা ফুলে ওঠে—তেমনি আপন জনের মন্দ খবরটা পাঁচ জনকে ভাগ করে দিয়ে বুকের বোঝাটা হাল্কা হয়ে যায়। আর এত বড় একটা খবর—সারা গাঁ অন্ধকারে থমথম করে—আর মিত্তির বাড়ীর চোর-কুটুরিতে ঠাসা টিনের মধ্যে আছে তেল! এত তেল যে, এক মাস ধরে সারারাত চালালেও ফুরিয়ে যাবে না।

খবরটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছল কেউ বলতে পারে না—দিন কয়েক বাদে মিত্তির-বাড়ি লাল পাগ্‌ড়ীতে ঘিরে ফেললে। অল্প খুঁজতেই চোরকুটুরি থেকে অনেকগুলি চকচকে টিন বার হ'ল এবং বড় কর্ত্তা পুলিসের মোটরে চেপে বহু পরিতৃপ্ত দৃষ্টির ঘন আস্তরণ ভেদ করে থানার দিকে রওনা হলেন।

৫

ব্যাপারটা ঘটেছিল বেলা দশটায়। বিমলা ইতিমধ্যে বার-দুই সমবেদনা জানাতে এসে ফিরে গেছে। আত্মীয়পরিপূর্ণ বাড়ীতে এত কোলাহলের মধ্যে সান্ত্বনার ভাষা যোগায় না মুখে—হাটের হট্টগোলে দুঃখের মর্য্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয় বার—তখন প্রায় অপরাহ্ণ বেলা—এসে বিমলা দেখলে হিতার্থী ও আত্মীয় দল পাতলা হয়ে গেছে। যারা সকালে 'হায়' 'হায়' করছিল—তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করছে—বিকালে আবার সমবেদনার বেসাতি খুলবে হয়ত। ইতিমধ্যে তারও কিছু বলা দরকার। যেখানে স্তব্ধ বড়বউ বসেছিল—তার কাছে গিয়ে বললে, শুনে ভয়ে তো আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে বড়বউদি।

সুহাস ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, সাপ হয়ে কামড়ে রোজা হয়ে ঝাড়তে আসে যারা তাদের কি ঘেন্নাপিত্তি কিছু আছে! বলে :

বেহায়ার বালাই দূর,
কাটা কানে চাঁপা ফুল।

বিমলা কেঁদে বড়বউয়ের হাত ধরে বললে, তোমার দিব্যি বড়বউদি—আমি এর বিন্দুবিসগও জানি না!

বটে—খাকা?

রূঢ় স্বরে পিছন ফিরে চাইলে বিমলা। বড় কর্ত্তা কখন এসে দাঁড়িয়েছেন পিছনে। হাতে তাঁর একগাছি লিক্‌লিকে সরু বেত। কুঞ্চিত ভ্রূ আর দন্তধৃত ওষ্ঠের ভঙ্গিতে বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধ ফুটে বেরুচ্ছে। সেই ক্রোধের আবেগে হাতের মুঠোয় ধরা বেত কাঁপছে থর থর করে।

বড় কর্ত্তা আর একটু এগিয়ে এসে বেত উঁচু করে তুললেন। শয়তানী—সঙ্গে সঙ্গে সপাং করে বেতের ঘা বসালেন বিমলার পিঠে।

বিমলা চীৎকার করে উঠল, উঃ—মাগো।

বড়বউ ছুটে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরলেন।

এক ধাক্কা মেরে বড়বউকে ঠেলে দিয়ে বড় কর্ত্তা যন্ত্রের মত বেত চালাতে লাগলেন, সপাং—সপাং—

পাড়ার লোক ছুটে এল, খবর পেয়ে বিমলার দুই ভাইও ছুটে এল। বড় ভাই কানাই মিত্তিরদের গোলদারি দোকানে কাজ করে—সে বিশেষ কিছু বললে না। মেজ ভাই নিতাই কাজ করে মাইলখানেক দূরে গঞ্জের বাজারে একটা সাইকেল

মেরামতির দোকানে। সে হুমকি দিয়ে উঠল, তাই বলে মানুষ খুন করবে?

মিত্রদের সৌভাগ্যদ্বেষী কয়েকজন মাতব্বর প্রতিবেশী এগিয়ে এসে তাকে যথাসাধ্য উৎসাহ দিতে লাগল। ওরা বললে, এখুনি থানায় ডায়েরি করা হোক, ডাক্তারের একটা রিপোর্ট নেওয়া হোক—যা খরচ লাগে সবাই চাঁদা করে দেব। গ্রাম তো অরাজক হয়ে যায় নি যে একজন সহায়হীন অবলাকে মেরে যাদু পার পেয়ে যাবেন! ব্ল্যাক মার্কেটের পয়সায় বড় তেল হয়েছে মিত্তিরের!

অতঃপর বিমলাকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হ'ল।

নিতাই বললে, দিদি—দারোগাকে খবর দিতে লোক গেছে—যথার্থ বৃত্তান্ত বলবে তার সামনে।

বিমলার কাতরানি মুহূর্তে থেমে গেল। সে অসহায় কণ্ঠে বললে, হাঁরে নিতে—তোরা কি এমনি নির্দ্দয়—পাষাণ? একটুও দয়ামায়া নেই তোদের?

কেন দিদি—দোষীর সাজা হোক এ তোমার ইচ্ছে নয়?

বিমলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, দোষীর সাজা দেবার তুই আমি কে রে? সে সাজা দেবেন ভগমান। তাঁর রাজ্যে কে দোষী নয়? তুই নোস? আমি নই?

নিতাই বললে, ভাল রে ভাল—আমার দোষটা কি হ'ল!

না—তোরা সব সাধু পুরুষ! একটু থেমে বললে, এত যদি তোদের মানের গুমোর তো অনাথা দিদিকে দু'মুঠো দিতে পারিস্ নে কেন? পরনে একখানা দশি দেবার যুগ্যতাও তো নেই! বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর!

নিতাই রেগে গিয়ে বললে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!

থাক—তোকে আর সাউখুরি করতে হবে না, তুই যা।

নিতাই বললে, থানায় খবর দেয়া হয়েছে—যা বলবার দারোগার সামনেই বলবি।

বলবই তো। ভাইবুনে যেন ঝগড়া হয় না—যেন মারামারি হয় না? এই তো সেদিন—লাঠি দিয়ে মেরে আমার গতর গুঁড়ো করে দিয়েছিলি—তখন কোন্ থানায় নালিশ করেছিলাম রে ডাকরা? নালিশ করলে তোরা থাকতিস্ কোন্ চুলোয় শুনি?

নিতাইয়ের পৃষ্ঠপোষক প্রবীণ বসু মহাশয় এগিয়ে এসে বললেন, নিজের ভাই—আর পাড়াপড়সী সমান হ'ল বিমলা? এক হাট লোকের সামনে মারলে—বলি তোমারও তো মান-মর্য্যাদা আছে।

এই কথায় বিমলা কাঁদতে লাগল।

বসু মহাশয় উৎসাহিত হয়ে বললেন—দারোগা আসুক, সব বলবে। দুর্জ্জনের শাস্তি হওয়াই ভাল।

বিমলা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললে—না কায়েত-কাকা—ওর সাজা হলে আমার মান তো ফিরে আসবে না; আর আমার আবার মান!—তোমাদের পাঁচ জনের খেয়েই তো মানুষ। আমার কানু—নিতুও যে—আপনারাও তাই।

বসু মাথা নেড়ে বললেন—তা হয় না বিমলা—সত্যি কথা না বললে—দারোগা তোমাকেই সাজা দেবে।

তা দিক্। বিমলা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বসু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—তা কি বলে ঢাকবে শুনি? তোমার পায়ের দাগগুলো তো ঢাকতে পারবে না।

তা কেন ঢাকব! বলব ওকে গালমন্দ করেছিলাম বলে ও আমায় মেরেছে। ভাই বুনে এমন মারামারি হয় না? যান আপনারা—কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দেবেন না।

বিমলা ডুকরে কেঁদে উঠল।

বসু মশাই নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার বোনের উচিত সাজাই হয়েছে বাপু—তা ভালই বল—আর মন্দই বল। এমন একগুঁয়ে মেয়েছেলে আমি দেখিনি।

৬

সন্ধ্যার পর পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়েছে। বিমলার যন্ত্রণাও কিছু কমেছে—অন্ততঃ কাতরানি না থাকাতে তাই মনে হয়। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে তার আড়ষ্ট ব্যথা—পাশ ফিরতে কষ্ট বোধ হয়। পাড়ার কে একজন এসে চুনে-হলুদে গরম করে প্রলেপ দিয়ে গেছে এক সময়। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে বিমলা বহু দিন আগেকার কথা ভাবছিল। ভাবছিল তার মান-সম্ভ্রমের কথা। যাজনিক ব্রাহ্মণের মেয়ে সে—নিত্য পূজার জন্য বহু লোক তার বাপকে ডেকে নিয়ে গেছে বটে—সে আহ্বানে কোন দিন তো সম্ভ্রমের সুর বাজে নি। তিনি গামছায় চাল-কলা বেঁধে বাড়ী ফিরেছেন। একখানা গামছা কি ন'হাতি কাপড় পাওনা হলে—পাওনার লোভটাকে বহু বার জাঁকিয়ে প্রকাশ করেছেন ছেলেমেয়েদের কাছে। নৈবেদ্যের ফল মূল বাতাসা চিনি দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের হাতে—লোভীর মত তারা গোগ্রাসে গিলেছে সে সব। মান-সম্ভ্রম কোথা থেকে জন্মায়—কাদের ঘরে তার বাসা—কি তার আকৃতি—বিমলার ধারণায় আসে না। তার বাড়ী—আর তার গ্রাম—মুখুজ্জেদের অন্দর মহল আর নাপিত বউয়ের বেড়াহীন উঠান, শাল-আলোয়ান গায়ে নায়েব মশায়—আর ছেঁড়া কোঁচার খুঁট গায়ে ছিদাম গোয়ালা—কোনটার প্রভেদই তার কাছে স্পষ্ট নয়। বায়ুর মতই সে সর্ব্বত্রগতি—বাতাসের কি মান-মর্য্যাদা আছে?

অন্ধকারে শুয়ে নানান কথা ভাবছিল বিমলা, মনে হ'ল কে যেন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। কাপড়ের খস খস, শব্দ খুব আস্তে চলা পায়ের শব্দ আর মানুষ জন কাছে এলে তার গায়ের গন্ধ যেমন পাওয়া যায়—তেমনি উপলব্ধিতে বিমলা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, কে?

আমি—বড়বউ। মূর্ত্তি ধীরে ধীরে এসে বিমলার শিয়রে দাঁড়াল।

ও, বড়বউদি। বিমলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

বড়বউ বিমলার মাথায় একখানি হাত রেখে বললে, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে ঠাকুরঝি, রাগ—না চণ্ডাল। উনি খালি কাঁদছেন আর বলছেন, কেন আমার এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল—কেন ওর গায়ে হাত তুললাম। আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না।

অশ্রুবাষ্পে বিমলার দু' চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল। ধরা গলায় সে বললে, ওনার দোষ কি ভাই—আমার কর্ম্মফল।

না ভাই, কর্ম্মফল বললে ত আমাদের পাপ হাল্কা হবে না, আমাদের প্রাশ্চিত্তির করতেই হবে।

বিমলা বললে, কি প্রাশ্চিত্তি করবে ভাই?

বড় বউ আঁচলের গ্রন্থি খুলতে খুলতে বললে, তিন পুরিয়া ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন উনি, হরিশ ডাক্তারের ওষুধ—খেলে নাকি গায়ের ব্যথা জল হয়ে যাবে।

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বিমলা বললে, দাও।

তার হাতখানি ধরে বড়বউ বললে, আর ভাই এই দশ টাকার নোটখানি উনি দিয়েছেন—ভাল ফল-টল কিনে—

চকিতে বিমলার হাতখানা সরে গেল—কান্না-ভেজা কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল রুক্ষ। সে বললে, যাও—যাও তুমি বড়-বউদি— গরু মেরে আর জুতো দান করতে হবে না।

বড়বউ কাতর অনুনয় করলে, অবুঝ হোস নে ভাই—একটা কথা আমার রাখ—

যাও—যাও তুমি। বিমলা চীৎকার করে উঠল। না যাও যদি আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকব—কেঁদে অনত্থ করব। তোমরা কসাই—তোমরা চামার—ইতর—

বিমলা পাগলের মত বুক চাপড়াতে লাগল। ওর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা ঠেলে ঠেলে উঠছে, বুকখানা খালি খালি বোধ হচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে এই মাত্র ওর পিতৃবিয়োগ হ'ল। যাদের ও আপন মনে করে—তারা কেউ আপনার নয়—বহু দূরের অনাত্মীয়—টাকা দিয়ে লাঞ্ছনার ক্ষত পুরিয়ে দিতে চায় তারা—তারা পর—পর—

বালিশে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে উঠল বিমলা।

ব্রহ্মদেশের সমাজ-জীবন

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশ ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। ব্রহ্ম-সংস্কৃতি মূলতঃ ভারতীয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় এবং ব্রহ্ম সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রহ্মদেশের সমাজ-সংগঠন এবং রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বংশানুক্রমিক আভিজাত্য ব্রহ্মদেশের সমাজ-জীবনে অপরিজ্ঞাত হইলেও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান। প্রাক্-ইংরেজ যুগে দীনতম ব্যক্তিরও যোগ্যতা থাকিলে উচ্চপদ লাভের পথে কোন অন্তরায় ছিল না। কিন্তু সে যুগে উচ্চপদ, বিস্তীর্ণ জায়গীর এবং বংশানুক্রমিক খেতাব ইত্যাদি সমস্তই রাজানুগ্রহের উপর নির্ভর করিত।

আধুনিক ব্রহ্মদেশের শহরবাসী এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বৃহত্তর জগতের সহিত পরিচিত। নিম্নব্রহ্মের ইরাবতীর ব-দ্বীপবাসী এবং কারেণগণ উত্তরব্রহ্মের অধিবাসীগণ অপেক্ষা ধনাঢ্য। প্রথমোক্তগণ যে অন্ততঃ বেশী টাকা-কড়ি লেনদেন করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। উত্তর এবং দক্ষিণ ব্রহ্মের অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থার তারতম্যের জন্যই ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার আইনে ব্যবস্থা হইয়াছিল যে উত্তর এবং দক্ষিণ ব্রহ্ম হইতে ব্যবস্থা-পরিষদের উচ্চতর কক্ষ সিনেটের সদস্য পদ প্রার্থীর বার্ষিক যথাক্রমে অন্ততঃ ৫০০৲ এবং ১০০০৲ রাজস্ব দেওয়া চাই। কিন্তু মোটের উপর বোধ হয় উত্তরব্রহ্মবাসীর জীবনে দক্ষিণ-ব্রহ্মবাসীর জীবন অপেক্ষা অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা কম।

ব্রহ্মদেশীয় বাসগৃহগুলিতে সাধারণতঃ তরজার (চেরা বাঁশের) বেড়া, কাঠের মেঝে এবং খড়ের ছাউনি থাকে। সম্পন্ন গৃহস্থ এবং মোড়লের (Thugyi) বাসগৃহের বেড়া ও চাল অনেক সময় কাঠ এবং টিনের হয়। গ্রাম্য বাস-গৃহ সম্বন্ধেই অবশ্য একথা প্রযোজ্য। রেঙ্গুন ও অন্যান্য শহরে সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মদেশীয়গণের বাসগৃহ তাঁহাদিগের ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রতিবেশীগণের গৃহ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। পল্লী-অঞ্চলে বাসগৃহগুলি সাধারণতঃ ৫ ফুট উচ্চ খুঁটির উপর নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নীচে সুতা কাটিবার এবং কাপড় বুনিবার সাজসরঞ্জাম রাখা হয়। সকন্যা গৃহস্বামিনী এইখানে বসিয়াই বস্ত্র বয়ন করেন। একটু সচ্ছল গৃহস্থের ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলে। উত্তর-ব্রহ্মের গ্রামগুলি সাধারণতঃ বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘেরা থাকে। বেড়ার

গায়ে একটি মাত্র দরজা থাকে। রাত্রিতে এই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গ্রামের বাহিরে গোচারণ ক্ষেত্র অবস্থিত। ইহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি।

প্রত্যেক গ্রামেই দু'চারটি দরজির দোকান আছে। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও দোকান আছে। উত্তর-ব্রহ্মের প্রত্যেক গ্রামেই তৈলের ঘানি আছে। এই ঘানির সাহায্যে তিল হইতে তৈল বাহির করা হয়। বড় বড় গ্রামগুলিতে কামারের দোকানও আছে। এই সমস্ত দোকানে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ এবং মেরামত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত নিম্নব্রহ্মের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একজন চৈনিক অথবা ভারতীয় দোকানদার দেখা যাইত। ইহারা একাধারে গ্রামের দোকানদার, মহাজন এবং দালালের কাজ করিত। যুদ্ধোত্তর যুগে কি উত্তরব্রহ্ম, কি নিম্নব্রহ্ম, সর্ব্বত্রই ভারতীয়গণের সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে।

খুব বড় বা খুব ছোট নহে এই রকম একখানি গ্রামে ২৪ হইতে ৪৮ ঘর গৃহস্থ বাস করে। নিম্নব্রহ্মের কোন কোন বৃহদায়তন গ্রামে ২০০ ঘর গৃহস্থকেও বাস করিতে দেখা যায়। বাংলাদেশ, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামগুলির মত ব্রহ্মদেশীয় গ্রামগুলি পরস্পর সংলগ্ন নহে। এক গ্রাম হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দূরত্ব ন্যূনাধিক ২ মাইল। প্রায় প্রতি গ্রামেই সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি করিয়া কূপ আছে। যে সমস্ত গ্রামে কূপ নাই সে সমস্ত গ্রামের অধিবাসিগণ অনেক সময় সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া জল আনিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করে। সে গ্রাম হইতে দূরে অবস্থিত নদী বা জলাশয় হইতে জল আনিয়া দেয়। গ্রামের প্রান্তে 'ফুঙ্গিচাউং' বা সঙ্ঘারাম অবস্থিত। এই 'চাউং'এ বালক-বালিকাগণ বর্ণমালা এবং গণিতের প্রাথমিক নিয়মগুলি আয়ত্ত করে। তাহাদিগকে সামান্য ভূগোল এবং ইতিহাসও পড়ানো হইয়া থাকে। তবে ভূগোল এবং ইতিহাসের নামে যাহা শিখানো হয়, প্রকৃত তত্ত্ব এবং তথ্যের সহিত তাহার প্রায় কোন সম্পর্কই নাই বলিলেও চলে। 'ফুঙ্গি' বা শ্রমণগণ সমাজের বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। গ্রামের কাহারও অসুখ বিসুখ হইলে এবং গ্রাম্য সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য স্থানীয় 'ফুঙ্গি'র পরামর্শ এবং উপদেশ লওয়া হয়।

ব্রহ্মদেশে জীবন-সংগ্রাম খুব কঠোর নহে, কিন্তু তাহা না হইলেও যে কাজ না করিলে চলে এমন নহে। চীন এবং ভারতবর্ষের মত অন্তহীন শোচনীয় দারিদ্র্য না থাকিলেও সচ্ছল ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য কাজ না করিলে চলে না। অন্ন ব্রহ্মবাসীর প্রধান খাদ্য। ইহারা ভাতের সঙ্গে মাছ, মাংস এবং নানা প্রকার শাকসব্জী খাইয়া থাকে। 'ঙাপ্পি' বা লবণের সাহায্যে রক্ষিত বহু দিনের বাসি এবং উৎকট গন্ধযুক্ত মাছের নামে ইহাদের নোলায় জল পড়ে। উত্তরব্রহ্মবাসী অপেক্ষা দক্ষিণব্রহ্মবাসিগণ মাছের বেশী ভক্ত। সামর্থ্যে কুলাইলে শহরবাসিগণ অনেক সময় বিলাতী খানা খায়। শহরবাসী অপেক্ষা গ্রামবাসীদিগের সাধারণ স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল। ভাজা সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশে এক অদ্ভুত কুসংস্কার আছে। ব্রহ্মদেশবাসীর ধারণা যে ভাজার গন্ধে অসুখ হয়। সেইজন্য ইহারা ভাজা জিনিষ খায় না বলিলেও চলে। কোন জিনিষ ভাজিতে হইলে সাধারণতঃ বাসগৃহ হইতে অনেক দূরে তোলা উনুনে এই কাজ করা হয়।

পূর্ব্বে পুরুষেরা শরীরের হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত অংশ উল্কি চিত্রিত করিত এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পান খাইত। এই উভয় প্রথাই অত্যন্ত দ্রুত লোপ পাইতেছে। চুরুট বা সিগারেটের ধূম পান করে না এমন লোক ব্রহ্মদেশে প্রায় চোখে পড়ে না। মেয়েদের মধ্যে ধূমপান অপেক্ষাকৃত কম। অনেকে মদ্যপানও করিয়া থাকে। মদ্যপান সমাজে নিন্দনীয় নহে। বিলাতী মদ এবং দেশী তাড়ি দুইই চলে। কিন্তু 'বানেসা' অর্থাৎ অহিফেনসেবীকে সকলেই ঘৃণা করে।

প্রাচীনপন্থী এবং দরিদ্র পরিবারে গৃহস্বামী ও অন্যান্য পুরুষদিগের খাওয়ার পর সকন্যা গৃহস্বামিনী আহার করেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই একসঙ্গে আহার্য্য গ্রহণ করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারেই কাঁটা-চামচের ব্যবহার প্রচলিত আছে। ব্রহ্মবাসিগণ সাধারণতঃ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে এবং চা অথবা কফি খাইয়া যে যাহার কাজে চলিয়া যায়। যাহাদিগকে আপিস, স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে যাইতে হয়, তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সকালে যাহারা কাজে বাহির হয়, বেলা ১০।১১টা পর্য্যন্ত কাজ করিবার পর তাহারা একবার ভাত খাইয়া লয়। সন্ধ্যার সময় ইহারা আর একবার ভাত খায়। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া যাওয়ার ফলে মেয়েরা বিশ্রাম এবং রান্নাবান্না ছাড়া অন্য কাজ করিবার অনেক সময় পায়। মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের গৃহিণীর ন্যায় ব্রহ্মদেশীয়া গৃহিণীকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হাঁড়ি কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। মুখে নারী-স্বাধীনতা এবং নারী-প্রগতির বুলি আওড়াইলেও মেয়েরা যে রক্তমাংসের জীব, তাহাদেরও যে বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন আছে কার্য্যতঃ আমরা অনেক সময় তাহা ভুলিয়া যাই। সান্ধ্য ভোজনের পর ব্রহ্মবাসিগণ প্রতিবেশীদিগের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে অথবা বেড়াইতে বাহির হয়। 'পোয়ে' নৃত্য (ব্রহ্মদেশের জাতীয় নৃত্য) এবং অন্যান্য তামাশা দেখিবার জন্য অনেকেই গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে। ব্রহ্মজাতীয়গণ অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। নিয়মানুবর্ত্তিতা ইহাদিগের ধাতসহ নহে। সুতরাং পূর্ব্বে ইহারা সাধারণতঃ সৈন্য বা পুলিস বিভাগের

কাজের জন্য উপযোগী বিবেচিত হইত না। এখন অবশ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

ব্রহ্ম-সভ্যতা মূলতঃ ভারতীয় সভ্যতা হইতে উৎপন্ন হইলেও আধুনিক ব্রহ্ম-সভ্যতার সহিত শ্যামদেশীয় সভ্যতারই অধিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। জাতিভেদ প্রথা ব্রহ্ম-সমাজে অপরিজ্ঞাত। প্রাচ্য মহাদেশের যে কোন অঞ্চলের নারী অপেক্ষা ব্রহ্মরমণী অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। ইংরেজ-পূর্ব্ব যুগেও ব্রহ্মদেশে সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের অধিকার-সাম্য স্বীকৃত হইত। ব্রহ্মদেশে নারী এবং পুরুষের স্বার্থের সংঘাত আজও আরম্ভ হয় নাই। ব্রহ্মনারী সাধারণতঃ গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম এবং ছোটখাট ব্যবসায় করিয়াই সন্তুষ্ট। আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির অধিকার সম্প্রসারণের জন্য কোন আন্দোলন (Feminist movement) সেখানে হয় নাই। ইহার কারণ এই যে মেয়েরা এখনও তাহাদের এবং পুরুষদের স্বার্থ অভিন্ন মনে করে।

অবরোধপ্রথা ব্রহ্ম-সমাজে অজ্ঞাত। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সচরাচর যে বয়সে বিবাহ হয়, ব্রহ্মদেশেও সাধারণতঃ প্রায় সেই বয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশীয় সমাজ-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—গতানুগতিকতার উপর নহে। সেইজন্যই বিবাহ ব্যাপারে বর-কনের মতামত মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। ব্রহ্মদেশীয় জীবনযাত্রার সাধারণ মান চীন, শ্যাম এবং ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত। জন্ম এবং মৃত্যুর হার চীন এবং ভারতবর্ষ হইতে কম। ব্রহ্মদেশীয় পরিবারগুলি প্রায়ই ছোট ছোট। ১৮ হইতে ২০ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ মেয়েদের বিবাহ হয়। যাহারা শহরে থাকে তাহাদের বিবাহ অনেক ক্ষেত্রে ইহার পরেও হয়। পল্লী-অঞ্চলে মেয়েদের বিবাহ অনেক সময় ১৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেও হয়। মেয়েরা একা একাই হাটে-বাজারে, ছবি দেখিতে এবং অন্যান্য স্থানে যায়। ব্রহ্মদেশীয় পরিবারগুলি একান্নবর্ত্তী নহে। ইহাতে হয়ত কিছু অসুবিধা হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের অধিকাংশ একান্নবর্ত্তী পরিবারে আজকাল যে অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মদেশে তাহার সম্ভাবনা নাই। চীন এবং ভারতবর্ষে পুত্র-বধূকে সম্পূর্ণভাবে শাশুড়ীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হয়। ব্রহ্মদেশে ইহার প্রয়োজন হয় না। বহুবিবাহ প্রথা প্রায় অজ্ঞাত। বিধবা নারী ইচ্ছা করিলে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের পর মেয়েদিগের নামের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। স্ত্রী বা পুরুষ কেহই সাধারণতঃ নামের পূর্ব্বে বা পরে পদবী ব্যবহার করে না। সুতরাং লা ব'র পুত্রের নাম হয়ত তান পে এবং তাহার পুত্রের নাম হয়ত বা তং। আধুনিক রুচিসম্পন্ন কোন কোন পরিবারে আজকাল পদবীর ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। আজকাল অনেকে ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে বিবাহোৎসব করিয়া থাকে। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেই এই অনুকরণ-স্পৃহা সমধিক পরিলক্ষিত হয়। নববিবাহিত দম্পতী কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহের পর অল্প কিছুদিন—ন্যূনাধিক এক বৎসর—বর বা বধূর পিতৃগৃহে বাস করিবার পর পৃথক সংসার পাতে। বিবাহ ব্যাপারে ব্রহ্মদেশীয়গণের কতকগুলি অদ্ভুত সংস্কার আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে মেয়ে রবিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে মঙ্গলবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এমন পাত্রকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করা হয়।

বিবাহের পর মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। বিবাহিতা নারী দোকান-পাট বা কুটির-শিল্প-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করে, সে নিজেই তাহার মালিক। কিন্তু অবিবাহিতা নারীর উপার্জ্জিত অর্থে তাহার নিজের অধিকার থাকে না। তাহার মাতাপিতা সেই অর্থ গ্রহণ করে। বিবাহের পূর্ব্বে ব্রহ্মতরুণী সাধারণতঃ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবনযাত্রা আরম্ভ করে না। ব্রহ্মজাতীয়া নারী কারেণ, শান, চিন, এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতীয়া নারী অপেক্ষা অধিক স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। কারেণ নারী ধাত্রী এবং শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী। কিছুদিন পূর্ব্বেও ব্রহ্মদেশের প্রায় সমস্ত সরকারী হাসপাতালেই কারেণ ধাত্রী এবং শুশ্রূষা-কারিণী দেখা যাইত।

বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্রহ্ম-সমাজে বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। স্বামী বা স্ত্রী যে কেহ বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। পল্লী-অঞ্চলে গ্রামবৃদ্ধগণ বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন। স্বামী এবং স্ত্রীর যদি কোন যৌথ সম্পত্তি থাকে, সরকারী কর্ম্মচারীর সহায়তায় তাহা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সকল ক্ষেত্রেই বিবাহকালে স্ত্রীর যে সম্পত্তি ছিল, তাহা তাহারই থাকে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় স্বামী এবং স্ত্রীর যুক্ত পরিশ্রমে অর্জ্জিত বিত্তের অর্দ্ধাংশ সাধারণতঃ স্ত্রীকে দেওয়া হয়।

সমস্ত পৃথিবীতে ব্রহ্মদেশ বোধ হয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে যৌনমিলনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। ব্রহ্মনারী বিদেশীয়গণের মধ্যে চীনাদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করে। ভারতীয় স্বামী চীনা স্বামীর মত বাঞ্ছনীয় নহে। ইউরোপীয় পুরুষ এবং ব্রহ্মরমণীর মধ্যে বিবাহের সংখ্যা অত্যন্ত কম। উনবিংশ শতকের শেষভাগে ইংরেজ কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিজয় সম্পূর্ণ হইবার পরও শ্বেতাঙ্গিনীগণ বহুদিন পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশে আসিতে সাহসী হইত না। সেই যুগে ব্রহ্মরমণী বহু শ্বেতাঙ্গের বিরহব্যথা দূর করিত।

এই প্রসঙ্গে সত্যের খাতিরে একটি কথা উল্লেখ করিতে

হয়। অনেক ভারতবর্ষীয়—ইহাদিগের মধ্যে বোধ হয় চট্টগ্রামের মুসলমানই বেশী—বৎসরের পর বৎসর ব্রহ্মনারীকে লইয়া ঘর করিবার পর দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ব্রহ্মদেশীয়া পত্নী বা তাহার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা করিয়া যায় না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা একেবারে অকূল পাথারে পড়ে। ইউরোপীয়গণ দেশে ফিরিবার সময় ব্রহ্মদেশীয়া স্ত্রী (রক্ষিতা?) এবং তাহার সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদিগের ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা করিয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমাজ যেন এখনও এই সম্বন্ধে খুব সচেতন নহে। ভিন্ন দেশীয় স্বামী-পরিত্যক্তা নারীকে সমাজ খুব শ্রদ্ধার চোখে না দেখিলেও তাহার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। তাহার পুত্র কন্যাদিগকেও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। গণিকা-বৃত্তি ব্রহ্মদেশে প্রায় অজ্ঞাত। গণিকালয়ে গমনকারীদিগের মধ্যে বিদেশীয়গণের আপেক্ষিক হার ব্রহ্মদেশীয়গণের তুলনায় অধিক।

ব্রহ্মনারী এখনও রাজনীতিতে খুব বেশী আকৃষ্ট হয় নাই। ১৯৩৭ সালে শাসন সংস্কার-প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে সাইমন কমিশন কর্ত্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণ কালে মহিলা সাক্ষীগণ নারীদিগের জন্য পুরুষের সমান অধিকার দাবি করিয়াছিলেন। কমিশনের জনৈক সদস্য নারীর অধিকার সম্প্রসারণের প্রধান সমর্থকের নাম জানিতে চাহিলে মৌলমিনের আইন ব্যবসায়ী মিঃ রফির নাম করা হয়। এই উত্তর যথেষ্ট হাস্যরসের সঞ্চার করিয়াছিল। শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে নূতন শাসন-ব্যবস্থায় নারীদিগের জন্য আইন-পরিষদে তিনটি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু বার্ম্মা রিফর্ম্মস কমিটি-র মহিলা সদস্য ডাঃ মা স সা জানাইয়া দিলেন যে নারীদিগের জন্য এই রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তা নাই। তাঁহার পরামর্শ অবশ্য গ্রহণ করা হয় নাই।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রহ্মনারী যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বহু নারী ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক এবং দন্ত-চিকিৎসকের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদিগের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্ন সরকারী, অর্দ্ধ-সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া অনেক নারী অন্ন-সংস্থান করেন। ব্রহ্মদেশীয়া মহিলাদিগের মধ্যে ড কা টুন সর্ব্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটির সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্রহ্মনেতা উ চিট হলাইঙের ভগ্নী ড হ্লিন মিয়া ১৯৩২ সালে আইন-সভার এবং ড আ মা নামক অপর একজন মহিলা ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে উত্তরব্রহ্ম হইতে হাউস অব রিপ্রেসেণ্টেটিভ্‌স্-এর সদস্য নির্ব্বাচিতা হইয়াছিলেন। ড মিয়া সিন নামক একজন মহিলা ব্রহ্ম গোল-টেবিল বৈঠকের অন্যতম সদস্যরূপে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ড মি মি কিন বহু বৎসর রেঙ্গুন হাইকোর্টের সহকারী রেজিষ্ট্রারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ড ড সু দীর্ঘকাল ব্রহ্ম ভাষায় প্রকাশিত বিখ্যাত দৈনিক 'নিউ লাইট অব বার্ম্মা'র স্বত্বাধিকারিণী এবং প্রকাশিকা ছিলেন। বহু নারী 'তাজি' বা মোড়লের কাজে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া সরকারী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। অনেক নারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

১৯৩১ সালের আদমসুমারির বিবরণী অনুযায়ী ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ নারীদিগের শতকরা ১০ জন এবং খ্রীষ্টান নারীদিগের শতকরা ২৮ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্না ছিল। ১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে সমতলবাসিনী ব্রহ্মরমণীদিগের মধ্যে প্রতিশতে ৩৫ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্না।

জাপ-যুদ্ধের পূর্ব্বে রেঙ্গুনে মহিলাদিগের কয়েকটি ক্লাব এবং নারী-পরিচালিত কয়েকটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সমস্ত ক্লাব এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণের মধ্যে চীন, ব্রহ্ম-দেশ, ইউরোপ, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সর্ব্বদেশীয়া মহিলাই ছিলেন। এই ধরণের নারী-পরিচালিত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে "ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ইন বার্ম্মা", "গার্ল গাইড্‌স্", "সোশ্যাল সার্ভিস লীগ", "রেঙ্গুন ভিজিল্যান্স সোস্যাইটি", "প্রিজনার্স্ এড্ সোসাইটি" প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য।

বহু পরিবারেই কর্ত্তা অপেক্ষা কর্ত্রীর প্রভাব অধিক হইলেও কর্ত্তাকেই প্রধান মনে করা হয়। আজও পল্লী-ব্রহ্মের সর্ব্বত্র পথ চলিবার কালে স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করে। অন্ধকার রাত্রিতে পত্নী প্রদীপহস্তে পতির পথ-প্রদর্শিকার কাজ করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ব্রহ্মদেশীয় জীবনযাত্রার সাধারণ মান চীন, শ্যাম এবং ভারতবর্ষের তুলনায় উন্নত। এইজন্যই ব্রহ্মবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল। ব্রহ্মদেশীয় বাসগৃহ এবং ব্রহ্মদেশের জাতীয় পরিচ্ছদ দেশের আর্দ্র বিষুবীয় জলবায়ুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্মদেশের স্ত্রী এবং পুরুষ দিবসের অধিকাংশ সময় ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে কাটায়। দেশে খাদ্যাভাব নাই। এই সমস্ত কারণ দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র একান্ত অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে যে ব্রহ্মদেশীয় 'ফুঙ্গি' এবং বৈদ্যগণই কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য সর্ব্বপ্রথম চালমুগরার তৈল ব্যবহার করিয়াছিলেন। দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হইলেও রাজধানী রেঙ্গুন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। রেঙ্গুনে যক্ষ্মারোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। যৌনব্যাধির প্রকোপও ব্রহ্মদেশে অত্যন্ত বেশী। ব্রহ্মদেশে শিশুমৃত্যুর হারও ভয়াবহ। ১৯৩৫ সালে প্রতি এক

সহস্র শিশুর মধ্যে পল্লী অঞ্চলে ১৭৬-৫৫টি এবং নগর-অঞ্চলে ২৫৫'২টি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ আক্রান্ত এবং অধিকৃত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমগ্র দেশে ৩১৫টি হাসপাতাল এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। ইহার মধ্যে প্রায় সব কয়টিই সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কয়েকটি এবং রামকৃষ্ণ মিশন একটি হাসপাতাল পরিচালনা করিত। যুদ্ধের পর এগুলির কাজ আবার আরম্ভ হইয়াছে।

আয়তনে ব্রহ্মদেশ ফ্রান্স অপেক্ষা বৃহত্তর। অথচ জাপ আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইংলণ্ডের একমাত্র সারে জেলার চিকিৎসক-সংখ্যা অপেক্ষা সমগ্র ব্রহ্মদেশের চিকিৎসক-সংখ্যা অনেক কম ছিল। এই সময় লণ্ডনের যে কোন দুইটি বড় হাসপাতালের শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীর সংখ্যা ব্রহ্মদেশের মোট শুশ্রূষাকারিণীর সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ছিল। চিকিৎসকদিগের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র ব্রহ্মদেশীয় এবং দুই-তৃতীয়াংশ ভারতীয় ছিলেন।

১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে ভারত সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহের মধ্যে ব্রহ্মদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক অপরাধ অনুষ্ঠিত হইত। খাস ভারতবর্ষে যত চুরি হইত, জনসংখ্যার অনুপাতে ব্রহ্মদেশে তাহার সাড়ে তিন গুণ বেশী চুরি হইত। ডাকাতি, নরহত্যা, গৃহপালিত পশু অপহরণও খাস ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী হইত। ইংরেজশাসনের শেষ ভাগে বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্ম-ভারতীয় দাঙ্গা, ব্রহ্ম-চৈনিক দাঙ্গা, বৌদ্ধ-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে ব্রহ্ম-কারেণ দাঙ্গার কথা শোনা গিয়াছে। ইংরেজ আমলে ব্রহ্মদেশে সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্যকলাপ কোন দিনই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

ব্রহ্মদেশে অপরাধ বাহুল্যের চারিটি প্রধান কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ, ব্রহ্মবাসী খুব সহজেই রাগিয়া যায়। তাহারা নিজেরাও জানে এবং স্বীকার করে যে তাহারা রগচটা। ইহা বোধ হয় মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মদেশে সর্ব্বসমেত ২০,০০,০০০ নবাগত বৈদেশিক আছে। ইহারা অনেকেই নিঃসম্বল অবস্থায় জীবিকার সন্ধানে এদেশে আসিয়াছে। অনেকে আবার স্বদেশে গুরুতর অপরাধ করিয়া শাস্তির ভয়ে দেশত্যাগ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ব্বে ইরাবতীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রতি বৎসর প্রায় ২০০,০০০ বহিরাগত যাতায়াত করিত। ধান কাটিবার মরশুমে উত্তর-ব্রহ্ম হইতে অনেক শ্রমজীবী কাজের সন্ধানে ব-দ্বীপ অঞ্চলে আগমন করিত। অল্পমেয়াদী ভূমি-বন্দোবস্ত প্রথা প্রচলিত থাকিবার ফলে ব-দ্বীপ অঞ্চলের অধিবাসিগণ প্রায়ই বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে অপরাধীকে ধরা এবং তাহার শাস্তিবিধান সহজসাধ্য নহে। পূর্ব্বে গ্রাম ও শহরে মোড়ল এবং পুলিস কর্ম্মচারীদিগের অপরিচিত বহু ব্যক্তিকে প্রায়ই দেখা যাইত। ফলে অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করা একটা কঠিন সমস্যা ছিল। এই সমস্যা এখনও আছে। তৃতীয়তঃ, ১৯৩০ হইতে ১৯৪০ এই ১০ বৎসরের মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন দাঙ্গা এবং বিদ্রোহের ফলেও অপরাধের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। চতুর্থতঃ, সমাজ জেল-খালাস কয়েদীকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে না। সাধারণের ধারণা যে দণ্ডভোগ করিবার ফলে তাহার সমস্ত অপরাধ দূর হইয়া সে শুদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশময় ব্যাপক অশান্তির ফলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অন্তর্বিপ্লবের ফলে সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মদেশে জনসাধারণের ধনপ্রাণ আজ নিরাপদ নহে। স্বাধীন ব্রহ্ম-সরকার সমস্ত দোষ বিদ্রোহীদিগের ঘাড়ে চাপাইয়াই যেন স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে চাহেন।

রেঙ্গুন এবং প্রোমের মধ্যে অবস্থিত তারাওয়াডি জেলা ব্রহ্মদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধপ্রবণ অঞ্চল। ১৯৩১-৩২ সালের সায়া শান বিদ্রোহ এই জেলাতেই আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় তারাওয়াডি দরিদ্র। শান অধিত্যকা এবং সীমান্তের পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ সমতলবাসী ব্রহ্মজাতীয়গণের মত অপরাধপ্রবণ নহে। দণ্ডিত অপরাধী-দিগের মোটামুটি চার-পঞ্চমাংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৭০ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০ অপরাধী প্রাণদণ্ডে এবং প্রায় ২০০ অপরাধী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

কোক-মুখা দুর্গা-প্রতিমা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

এতকাল আমরা মহিষ-মর্দিনী দুর্গা-প্রতিমা দেখিয়া আসিতেছি। বঙ্গদেশে মৎস্য-পুরাণ-বর্ণিত দুর্গা-প্রতিমা নির্মিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রতিমায় মহিষাকৃতি অসুরের উর্দ্ধ দেশ বিদীর্ণ করিয়া নরাকৃতি অসুর বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। ইহার মস্তক ও দুই হাত নরাকার, নিম্নভাগ চতুষ্পদ মহিষ। এইরূপ প্রতিমা পূর্ববঙ্গে ও বাঁকুড়া জেলায় নানাস্থানে অদ্যাপি নির্মিত হইতেছে। দক্ষিণরাঢ়ে অসুর সম্পূর্ণ নরাকৃতি হইয়াছে। মহিষের ছিন্নমুণ্ড পৃথক প্রদর্শিত হইয়াছে। শত বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

কিন্তু কোক-মুখা দুর্গা-প্রতিমা অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া রাইপুরে এইরূপ প্রতিমা দেখিয়া গত ফাল্গুনের প্রবাসীতে "রাইপুরের মহামায়া ও শিখরবংশ" প্রবন্ধে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রতিমায় দুর্গা দুই হস্ত উচ্চ নারীমূর্তি, কিন্তু মুখ অজতুল্য। ষড়্‌ভুজা এবং আয়ুধহস্তা। পরিধান-বস্ত্র সম্মুখে কুঞ্চিত। এইরূপ বস্ত্র-পরিধান উত্তর-ভারতে, মধ্যপ্রদেশে ও দক্ষিণাপথে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। রাইপুরের প্রতিমাটি পূর্বে বৃক্ষতলে ছিল; এক্ষণে এক মন্দিরে স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতেছে।

কিন্তু এই প্রতিমা নূতন নয়। মহাভারতে ভীষ্মপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছেন। তিনি দুর্গাকে কোক-মুখা বলিয়াছেন। কোক নেকড়ে বাঘ অথবা 'বুনা কুকুর' অর্থাৎ বন্য কুক্কুর। নেকড়ে বাঘ, বন্য কুক্কুর, অজ, শৃগাল ও বরাহ, ইহাদের মুখের সাদৃশ্য আছে। মহাভারতের বর্ণনা যত নূতনই হউক, অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন। অতএব রাইপুরের দুর্গামূর্তির কল্পনাও দুই সহস্র বৎসর পূর্বে হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কোথায় কোন্ রূপ প্রতিমা আছে, তাহা অদ্যাপি কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণের ত্রিবান্দ্রমনগর হইতে ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থপাল আমার সহিত পত্র-ব্যবহারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে বামন-প্রতিমা ও বামন-মন্দির আছে কিনা। তাঁহার দেশে বামন-পূজা অতিশয় প্রসিদ্ধ এবং তাহার উত্তম মন্দিরও আছে। আমি তাঁহার জিজ্ঞাস্যের উত্তর করিতে পারি নাই। বিষ্ণুর চারি দিব্য-অবতার, যথা—কূর্ম, বরাহ, বামন ও মৎস্য। মৎস্য পুরাণে আছে, কূর্ম, বরাহ ও মৎস্য অবতারের আকার এই এই প্রাণীর আকারের তুল্য। বামন-অবতারের আকার,—একটি বালক, দক্ষিণহস্তে কমুণ্ডলু, বাম হস্ত দ্বারা মস্তকের উপর ছত্র ধারণ করিয়া আছে। এই চারি অবতারের প্রতিমার পূজা ভারতে নিশ্চয় প্রচলিত আছে। কিন্তু কোথায় কোথায় আছে, তাহার বিবরণ দেখি নাই। বঙ্গদেশেই কোথায় কোন্ কোন্ দেবদেবী প্রতিমা আছে, বোধ হয় তাহাও কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই। বাঁকুড়ায় জৈনমূর্তি প্রচুর। বোধহয়, ইহাও মূর্তি-ঈক্ষণিকেরা অবগত নহেন। বাঁকুড়ায় আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে কূর্মাবতার ধর্মঠাকুর নামে পূজিত হইতেছেন। উত্তর-বঙ্গে এবং দক্ষিণ-ভারতেও নাকি কূর্ম-মূর্তি আছে। কূর্মাবতার অনার্যের কল্পিত নয়। আমি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে বিষ্ণুর বরাহ ও কূর্ম-অবতার, শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে বামনাবতার এবং আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে মৎস্যাবতারের উৎপত্তি দেখাইয়াছি। চারিটির কল্পনাই ঋগ্‌বেদে আছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি কালপুরুষ নক্ষত্র এবং মৎস্যাবতারটি ধ্রুব-মৎস্য অবলম্বনে কল্পিত হইয়াছিল। কালপুরুষ নক্ষত্র আশ্রয় করিয়াই মহিষাসুর এবং আরও অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ-নাশে দক্ষের অজমুখ হইয়াছিল। দক্ষও কালপুরুষ নক্ষত্র। ঋগ্‌বেদে এই দক্ষের নামও আছে, কালপুরুষ নক্ষত্রের মস্তকের তিনটি তারার সন্নিবেশ হইতে কোক-বরাহ-অজ-কুক্কুর-মুখের কল্পনা হইয়াছিল। কালপুরুষ নক্ষত্র আশ্রয় করিয়াই ঋগ্‌বেদে রুদ্রের মূর্তি বর্ণিত হইয়াছে। আমি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে পৌষের 'প্রবাসী'তে দুর্গা প্রতিমা-কল্পনার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছি। রুদ্রের ও রুদ্রাণীর রূপ একই। শুক্ল যজুর্বেদে (১৬।২৮) রুদ্রের মুখ কুক্কুরের তুল্য বলা হইয়াছে।

রাইপুরের কোক-মুখা দুর্গা-প্রতিমা কতকালের তাহা দেব-দেবী-মূর্তি-ঈক্ষণিকেরা বলিতে পারেন। রাইপুরে এই দুর্গার নাম মহামায়া। তাঁহার পার্শ্বে ছোট আকারের আর একটি কোক-মুখা দুর্গা-প্রতিমা আছে। লোকে তাহার নাম তুঙ্গভদ্রা রাখিয়াছে। দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নামে এক নদী আছে। কি কারণে সে নদীর এই নাম হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধেয়।

ফাল্গুনের প্রবন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহামায়ার

দক্ষিণী ছাঁদে বস্ত্র-পরিধান ও পার্শ্বস্থ তুঙ্গভদ্রা নামের প্রতিমা দেখিয়া অনুমান করেন, ইহা দক্ষিণ-দেশে নির্মিত হইয়া রাইপুরে আনীত হইয়াছিল। অসম্ভব নয়। কিন্তু কে আনিয়াছিল এবং কতকাল পূর্বে আনিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

রাইপুর, এই নামকে বাঁকুড়ার লোকে গড়রাইপুর বলে। রাইপুর, রায়পুর নামের অপভ্রংশ এবং রায়পুর রাজপুর ব্যতীত অপর কিছু নয়, অর্থাৎ রাজনগর বা রাজধানী। কোন্ রাজার পুর ছিল, তাহা অজ্ঞাত। নিকটে শিখর-সায়র নামে এক বৃহৎ সায়র আছে। এই নাম হইতে পাইতেছি, এই সায়র শিখর-বংশীয় কোনও রাজার খনিত। পঞ্চকোট রাজবংশের নাম শিখর-বংশ; আর, রাজ্যের নাম শিখরভূম। রায়পুরে পুরাতন গড়ের চিহ্ন আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, গড়ের পরিমাণ ৮০ বিঘা। শিখর-সায়র গড়ের বাহিরে, পরিমাণ ১০০ বিঘা। ইহা হইতে অনুমান হয়, গড়নির্মাণের পরে শিখর-বংশের কোনও রাজা সায়র খনন করাইয়াছিলেন। কতকাল পূর্বে কোন্ রাজা গড় নির্মাণ করাইয়াছিলেন?

আর এক কারণে রায়পুর বিখ্যাত হইয়াছে। দুর্গেশ-নন্দিনী উপন্যাসের ঐতিহাসিক মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩য় সংখ্যা, ৫০ ভাগ) 'আকবরনামা' হইতে লিখিয়াছেন, পাঠান কুৎলু খাঁ উড়িষ্যা হইতে আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গের গ্রাম লুঠপাট করিতেছিল। মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করিবার নিমিত্ত বিহার হইতে আসিয়া জাহানাবাদে, বর্তমান আরামবাগে শিবির-স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন বর্ষাকাল আসন্ন। কুৎলু খাঁ পূর্বদিকে ক্রমশঃ সৈন্যসহ আসিতেছিল। মানসিংহ তাহার গতি প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে এক ফৌজসহ পাঠাইয়া দেন। কুৎলু খাঁ ধরমপুরে আসিয়াছিল এবং জগৎসিংহ রায়পুরে উপস্থিত হইলে তাহার সেনাপতি বাহাদুর কুরুঃ তাঁহাকে আক্রমণ করে। বাহাদুর এক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। রায়পুরে যুদ্ধ হয় (২১ মে ১৫৯০); সে যুদ্ধে জগৎসিংহের সৈন্য পরাজিত হয়। জগৎসিংহ মদ্যপানে মত্তাবস্থায় ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া (হস্তীপৃষ্ঠে) নিজ রাজধানী বিষ্ণুপুরে লইয়া আসেন। সরকার মহাশয় রায়পুর খুঁজিয়া পান নাই। সে রায়পুর এই গড়রায়পুর। ইহারই সন্নিকটে ধরমপুর। লিখিত আছে, আরামবাগ হইতে রায়পুর ২৫ ক্রোশ এবং বিষ্ণুপুর ১২ ক্রোশ। এই অঞ্চলের মানচিত্রে দেখিতেছি, আরামবাগ হইতে রায়পুর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ২৫ ক্রোশ এবং রায়পুর হইতে বিষ্ণুপুর প্রায় ১২ ক্রোশই বটে। রায়পুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক কাঁচা রাস্তা আছে। জগৎসিংহ আরামবাগ হইতে গোঘাট—গোঘাট হইতে গড়বেতা এবং গড়বেতা হইতে রায়পুরে আসিয়া থাকিবেন। রায়পুর কাঁসাই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বর্তমানে ইহা বাঁকুড়ার একটি থানা।

প্রায় ১৫ বৎসর হইল, ঢাকার ঐতিহাসিক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (এক্ষণে স্বর্গগত) আমায় এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, বাঁকুড়া জেলার একস্থানে এক যুদ্ধ হইয়াছিল; এক নদীর তীরে; সেখানে বেতবন ছিল। বাঁকুড়ার কোন্ স্থানে নদী এবং বেতবন আছে, তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন। তৎকালে অনুসন্ধান করিয়া আমি বাঁকুড়া জেলায় বেতগাছ পাই নাই। পরে জানিয়াছি, দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে বেতগাছ আছে। কাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, ভট্টশালী মহাশয় যে যুদ্ধস্থল খুঁজিয়াছিলেন, তাহা এই রায়পুর। সেখানে কাঁসাই নদী আছে। চারি বৎসর হইল আমি জানিয়াছি, কাঁসাই নদীকূলে বেতসগাছ আছে। বোধহয় পূর্বে রায়পুরে অসংখ্য বেতস গাছ ছিল। কাঁসাই নদী তীরবর্তী লোকেরা সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধ বেতসলতাকে বেত বলে (প্রবাসী, ১৩৫৫। মাঘ)।
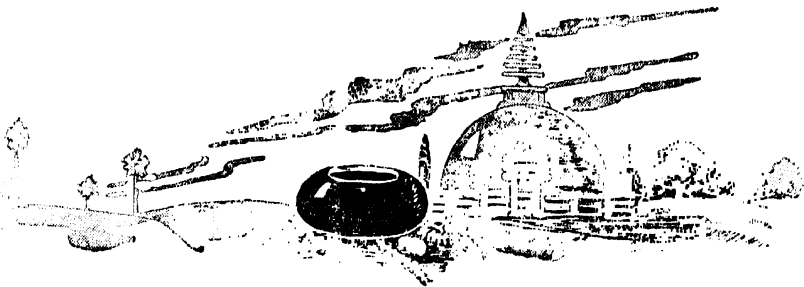
আমীর খসরু

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

'তুতীয়ে হিন্দ' (ভারতের তোতা পাখী) আমীর খসরু ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিস্ময়কর প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আমীর শরফুদ্দীন মাহ্‌মুদ শমসী ছিলেন বল্‌খের অধিবাসী। ভারতে ভাগ্যান্বেষণে আসিয়া তিনি পাতিয়ালায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। আমীর খসরুর মাতা ছিলেন সুলতান গিয়াসুউদ্দীন বলবনের অন্যতম সমর-সচিব ইমদাদুল মুল্‌কের কন্যা।

আমীর খসরুর বয়স যখন নয় বৎসর তখন তাঁহার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। মাতা পুত্রের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বীর্যবতী মাতার তত্ত্বাবধানে ও সজাগ দৃষ্টির ছায়াতলে আমীর খসরু সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার স্ফুরণ হইতে থাকে—চারিদিকের সুন্দর পরিবেশ ও সজীব প্রাণের স্পর্শ তাঁহার কবি-মনকে বিচিত্র ভাব-চেতনায় বিকশিত করিয়া তাঁহার অন্তরে অপার রসমাধুর্য ও রূপসুষমার সৃষ্টি করিল।

দিল্লীর তখ্‌তে তখন ভাঙাগড়া চলিয়াছে—শাহীরক্তে-রঞ্জিত সিংহাসনে একের পর এক সুলতানের আবির্ভাব হইতেছে। যুদ্ধবিগ্রহ, ষড়যন্ত্র, বিপ্লব ও বিদ্রোহ দিল্লীর আবহাওয়া বিষাক্ত ও তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। খসরুর কবি-মন ইহাতে পীড়িত হইলেও যে নিভৃত জগৎ তিনি তাঁহার অন্তর্লোকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ভিতর নিমজ্জিত হইয়া কাব্যরস আস্বাদন ও পরিবেশন হইতে তিনি বিরত হন নাই। কবির নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত মন শত কোলাহল ও বিক্ষোভের মধ্যেও সুন্দরের ধ্যানে সমাহিত থাকিত। প্রকৃতির বিচিত্র লীলার ভিতর চিরসুন্দরের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শের অনুভূতি তাঁহার মনে নিবিড় ও গভীর হইয়া উঠে। এই গভীর উপলব্ধি কবির জীবনে আরও বিচিত্র ও সুন্দর হইয়া দেখা দেয় এক মহাতপা সাধকের সাহচর্যে। তাঁহার কথা যথাসময়ে উল্লিখিত হইবে।

বিশ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার কর্মজীবন সুরু হয়। বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র বাংলার শাসনকর্তা বুখরা খানের সহিত তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। কিন্তু বাংলাদেশের আবহাওয়া তাঁহার সহ্য না হওয়ায় তিনি দিল্লী ফিরিয়া আসেন। দিল্লীতে আসিয়া সুলতান-পুত্র মুহাম্মদের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় শেষে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। মুহাম্মদ ক্রমে খসরুর একজন অনুরক্ত ভক্ত ও সমঝদার হইয়া পড়েন। বন্ধুর সাহচর্য ও অন্তরঙ্গতার ভিতর দিয়া খসরুর দিন কাটিতেছিল। উত্তর ভারতের পথ দিয়া তখন দুর্ধর্ষ মুঘলগণ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছিল। তাহাদের সহিত এক সংঘর্ষে মুহাম্মদ নিহত ও খসরু বন্দী হন। বন্দীদশায় অশেষ দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

এই মুক্তি তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করিল। ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে ও বিক্ষুব্ধ চিত্তে খসরু মায়ের স্নেহশীতল আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলেন। জননীর কল্যাণকর-স্পর্শে তাঁহার দেহমনের সকল গ্লানি দূর হইল, সমস্ত সংশয় ও বেদনার নিরসন হইল। কায়কোবাদ তখন দিল্লীর তখ্‌তে বসিয়াছেন। তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইতেই তিনি খসরুকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সুলতান কায়কোবাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় তাঁহার পিতা বাংলার শাসনকর্তা বুখরা খান বিরক্ত হন এবং পুত্রকে সংযত ও কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে উপদেশ প্রদান করেন। ইহাতে পারিষদবর্গ-চালিত সুলতান কায়কোবাদই পিতার উপর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন, কিন্তু পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই তিনি তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। পিতাপুত্রের মিলন হইল এবং কায়কোবাদের অনুরোধে খসরু এই মিলনকে অমর করিবার জন্য 'কিরানুস্‌-সাদাইনে' এই কাহিনীর কাব্যরূপ দান করেন। এই কাব্যই কবির প্রথম 'মসনভী'।

কায়কোবাদের পর সুলতান জালালুদ্দীন খল্‌জীর দরবারে খসরু উচ্চতম সভাসদ ও সভাকবির পদে অভিষিক্ত হন। পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জীও তাঁহাকে এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় তাঁহার কাব্যপ্রতিভার সম্যক্‌ স্ফুরণ ও ব্যাপ্তি হয়। আলাউদ্দীন খিল্‌জীর কাব্যরসিক পুত্র খিজির খানের সহিত তাঁহার গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করিয়া কবির কাব্যশক্তি ও প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব বিশিষ্টতা লাভ করে। খিজির খানের বীরত্বকাহিনীকে তিনি আপনার অনুপম ছন্দে গ্রথিত করিয়া 'কেস্‌সায়ে খিজির খান' কাব্যে কালজয়ী অমরত্ব দান করেন।

এই পর্যন্ত কবির বিখ্যাত চারিটি 'দিওয়ানে'র মধ্যে 'তুহ্‌ফাতুস্‌ সিগর' বা তরুণের দান ও 'ওয়াসতুল হায়াত' বা মধ্য বয়সের দান—এই দুইখানি দিওয়ান প্রকাশিত হইয়াছে। তরুণ বয়সের স্বপ্ন ও প্রাণচাঞ্চল্য এবং মধ্য বয়সের ভাব-গাম্ভীর্য ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার আনন্দ-বেদনা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় দিওয়ানে স্থান লাভ করিয়াছে। 'গুরবাতুল কামাল' বা পূর্ণ আলোক এবং 'বকেয়া নকেয়া' তখনও

পরিণত বয়সের পরম উপলব্ধি ও প্রেমধর্মের পূর্ণ পরিণতির অপেক্ষায় আছে। পরবর্ত্তী জীবনে সুফী ভাবের যে অনাবিল আনন্দ তাঁহার জীবনকে সার্থক, সুন্দর ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছিল সেই নিবিড় আনন্দরসের আস্বাদ তখন পর্যন্ত মুরশেদের অভাবে তাঁহার অন্তরে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু কবি-জীবনের প্রথম হইতেই চিরসুন্দরের সান্নিধ্যলাভের জন্য তিনি হৃদয়ে যে বেদন অনুভব করিতেন, প্রেমাস্পদের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষার যে ব্যাকুলতা তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কোণে কুঁড়ির বক্ষে অবরুদ্ধ গন্ধের ন্যায় উচ্ছ্বসিত ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত তাহার আভাস ও নিবিড়তার স্পর্শ কাব্যের ছন্দে ছন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত সেই অনুভূতি সুস্পষ্ট পথের সন্ধান বা ইঙ্গিত লাভ করে নাই।

খসরুর কবি-প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর, তাঁহার খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া দ্রাক্ষাকুঞ্জপরিপূর্ণ পারস্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। হাফিজ, সাদি ও রুমির অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা ও কাব্যরসমুগ্ধ পারস্যবাসীদের পক্ষে বিদেশী কবিকে স্বীকার বা গ্রহণ করা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল, কিন্তু খসরুর বিরাট ও সর্বতোমুখী প্রতিভায় বিস্মিত হইয়া পারসিকগণ খসরুকে রুমি, জামি ও সাদির পার্শ্বেই সাদরে স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। আর কোনও ফারসী ভাষার লেখক ভারতীয় কবির এই সৌভাগ্যলাভ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুসলমান মনীষী শিবলী নোমানি বলিয়াছেন, 'গত ছয় শত বৎসরের মধ্যে আমীর খসরুর ন্যায় বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই।' বস্তুতঃ পারস্যদেশের কাব্যক্ষেত্রেও এইরূপ বিরাট কবি-মনীষীর আবির্ভাব খুবই কম হইয়াছে। সাদী, হাফেজ বা ফেরদৌসী কাব্যরচনার এক একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র ও প্রকাশভঙ্গির ভিতর দিয়া নিজ নিজ ভাবধারা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমীর খসরুর মসনভী, গজল, কাসিদা ও রুবাই ফারসী কাব্যরস পরিবেশনের এই প্রধান চারিটি ধারায় বিচিত্র ভাবরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমীর খসরু এক জন বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ এবং সুরকারও ছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত সেতার বাদ্যযন্ত্র ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গত ও সুরবাহনরূপে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার এই সেতার যন্ত্র আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদিন ভ্রমণকালে তিনি দেখিলেন বৃক্ষ-কোটরে বিলম্বিত একটি মৃত বাঁদরের শুষ্ক অন্ত্রে শাখার আঘাত লাগিয়া বিচিত্র ধ্বনি ও সুরসঙ্গতির সৃষ্টি হইতেছে। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া ও সুর শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তিনি সেতার যন্ত্রের রূপদান করেন।

সুফী কবি খসরুর কাব্য পরিক্রমার পূর্বে সুফী ভাবধারার সহিত পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। পারস্যের গুলাবসুরভিত ও দ্রাক্ষারসসিক্ত ভূমি হইতে সুফীবাদের জন্ম। সুফী সাধক-শ্রেষ্ঠ মৌলানা জালালুদ্দীন রুমি, জামি ও হাফেজের কাব্য ও ভাবসাধনায় উহার লালন, পোষণ ও বিকাশ হয় এবং আমীর খসরুর কাব্য-সাধনার ভিতর সেই সুফীবাদ ফারসী ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রসারলাভ করে। সুফীবাদ ইসলামের তাছাওউক্ বা প্রেমধর্মের ভাবরসকে অবলম্বন করিয়াই বিবর্তিত হইয়াছে। সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার, মানুষের সহিত আল্লার, প্রেমিকের সহিত প্রেমাস্পদের যে বন্ধন ও যোগ তাহা মূলতঃ প্রেমের যোগ। সাধক মনে করেন, তাঁহার সহিত আল্লার যে সম্বন্ধ তাহা অহৈতুকী প্রেমের সম্বন্ধ অর্থাৎ যে সম্বন্ধের মধ্যে স্বার্থের সম্পর্ক বা বাধ্যবাধকতা নাই, ভীতি প্রদর্শন বা শাস্তির বিধান নাই—এক মধুর প্রেমের বন্ধনে মানুষ স্রষ্টার সহিত হয় যোগযুক্ত। এই পারস্পরিক প্রীতি ব্যতীত স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুয়েরই অস্তিত্ব নিরানন্দ ও নিরর্থক। প্রেমিক সুফী সাধক প্রেম-সাধনার পথে প্রেমাস্পদ আল্লার সান্নিধ্য ও দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কারণ তাঁহার আত্মা সেই পরমাত্মার আনন্দময় সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে—তাই তাঁহার সহিত মিলনের জন্য সাধকের এত ব্যগ্রতা ও ব্যাকুলতা। দেহের কারায় বন্দী মানবাত্মার ক্রন্দন, প্রেমাস্পদের বিরহ-বেদনায় অধীর সাধক-মনের আকুলতা সুফী সাধকদের রচিত কাব্য ও সঙ্গীতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের প্রেমার্ত হৃদয়ের আবেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে পারস্যের সুফী কবি জামির ভাবগম্ভীর কণ্ঠে:

> আমার মস্তক তোমার দ্বারে করেছি নত—
> পারিশ্রমিকের লোভে নয়—
> তোমার প্রেমের আদেশে।

প্রেমাস্পদের বিরহ-বেদনা এবং তাহার প্রতি প্রেম ভক্তি ও ব্যাকুলতা প্রকাশের জন্য সুফী কবিগণ বহু শব্দ ও ভাব-প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন। পারস্যের সুফীদিগের মত আমীর খসরুও প্রিয়া, সাকী, পিয়ালা, শরাব, গুলাব প্রভৃতি শব্দ প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিয়া আপনার অন্তরের আনন্দ-বেদনা অনুভূতিরসে সিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমীর খসরুর এই সুফী ভাবধারা সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত হইয়া উঠে সাধক-শ্রেষ্ঠ নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার সাহচর্য ও সংস্পর্শে। সুফী-সাধক নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার সান্নিধ্য লাভ করিয়া আমীর খসরুর ভাবোচ্ছ্বাস শতধারায় বিপুল বেগে উৎসারিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ আমীর খসরুর কবি- ও -সাধক-জীবনের পূর্ণ স্ফূর্তি ও পরিণতির ব্যাপারে সাধকপ্রবর নিয়ামুদ্দিন আউলিয়ার আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষ ভাবে কার্যকরী হইয়াছে। যেটুকু দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও জড়তা খসরুর অধ্যাত্ম-জীবনকে আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট করিয়াছিল

খাজা নিয়ামুদ্দীনের সাধনার দীপ্তিতে তাহা অপসৃত হইয়া যায়।

আমীর খসরু ছিলেন নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার নিত্য-সঙ্গী। একদিন খসরু খাজা সাহেবের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। যমুনা নদীতে তখন কয়েকজন পুণ্যার্থী হিন্দু নরনারী স্নান করিতেছিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া খাজা সাহেব মন্তব্য করিলেন, প্রত্যেক ধর্মেরই একটি সহজ পথ আছে। খসরু খাজা সাহেবের দিকে ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আমি কিন্তু 'কায্ কুলাহ্'কে আমার কেবলাহ্ বা লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, খাজা সাহেব 'কায্ কুলাহ্' নামেও খ্যাত ছিলেন, কারণ তিনি সর্বদা মাথার এক দিকে বাঁকা ভাবে টুপি পরিধান করিতেন। 'কায্ কুলাহ্' শব্দের অর্থই হইল 'বাঁকা টুপি'।

আমীর খসরুর কবিতায় বিশেষ করিয়া তাঁহার 'দিওয়ানে' ভাবধারা রসপক্ক আঙ্গুর ফলের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। সুফী সাধকের উদারতা, ভাবতন্ময়তা ও সুদূরের পিপাসা তাঁহার দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে স্বচ্ছ করিয়াছে এবং তাঁহার অন্তরে চিরসুন্দরের বিরহ-বেদনা যে তীব্রতালাভ করিয়াছে, প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে আশা-নিরাশার আনন্দ-বিষাদে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সর্ব-কালের মুক্তিপিপাসু ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে এবং চির অজানার সন্ধানে ভক্তমনকে উদ্বুদ্ধ করে। সাধনার ক্ষেত্রে আমীর খসরু প্রেমের পথকেই বরণ করিয়া-ছিলেন। এই পথে যুক্তি নাই, তর্ক বিচারের স্থান নাই—শুধু আছে প্রেম ও প্রীতির সহিত সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া চিরসুন্দর প্রিয়তমের সন্ধান করা। অন্তরের নিবিড় বেদনা-বোধই সাধককে এই পথের নির্দেশ দান করে। প্রেমাস্পদের জন্য ভক্তপ্রেমিক আমীর খসরুর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—কোন যুক্তিই সে উন্মাদনাকে সংযত করিতে পারিতেছে না :

যুক্তি দিয়ে যায় কি ঢাকা
উন্মাদনা সত্যিকার
বুদ্ধি বিচার সকল কিছু
লোপ পেয়েছে আজ আমার
এ সব বালাই রইলে বিপদ—
নইলে সবি চমৎকার।
প্রেম ও বিচার এই দুটো চিজ
যেন তফাৎ আগুন জল।

একমাত্র একনিষ্ঠ প্রেমই এই পথের পাথেয়। যুক্তিতর্ক মানুষের মনকে নীরস ও শুষ্ক করিয়া তোলে—শুধু প্রেমই দেয় সেই অজানা পথের সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ এই একই সুরে গাহিয়াছেন—

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে যাব কাহার দ্বার
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারই কাছে
কথার কি তার অন্ত আছে
যতই শুনি চক্ষে ততই লাগায় অন্ধকার—
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।

আর ভক্তসাধক কবীর বলিতেছেন—

ডগরা (পথ) মোহে কোন দিখাই···
ডর নাহি কুছো ডগরা না পুছো
বাঁশরী শুনত কবীরা বাঢ় যাঈ
পিতম (প্রিয়তম) বোলাও ত আনহারি (অন্ধকার)
কি পারসে
কৌন বেশরম আজ মোর সাথ যাঈ।

আমীর খসরুও অন্ধকারের পার হইতে প্রিয়ের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন এবং সেই অন্ধকারের নিভৃত কোণে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তিনি আপনার সকল দুঃখের অবসান করিতে চাহেন।

কেমন করে বাঁচবো বলো
জীবন মরণ তোমার হাত,
হয় মরণ আজ দাও তুমি হায়
আর কাটে না দুঃখের রাত।
না হয় এসে বাঁচাও মোরে—
সইতে নারি আর জ্বলন ;
অন্তরালের অন্ধকারে
মিলতে যে চাই তোমার সাথ।

কিন্তু কবি প্রেমাস্পদের দেওয়া দুঃখকে ভয় করেন না—মৌলানা রুমির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তিনি বলিতেছেন,

তোমার হাতে সুখ পাবো না—
জানি আমি সুনিশ্চয়
দুঃখ যদি দেবেই তবে
যেমন তোমার ইচ্ছে হয়।
পরাণ ভরে দুখ্ দিয়ে যাও,
করো নাকো তিল কসুর ;
দুখ্ দিয়ে সুখ পেলে তুমি
এই ভেবে খোশ্ মোর হৃদয়।

এই দুঃখের দাহ কবির অন্তরে প্রেমাস্পদের স্মৃতি ও মিলনাকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত রাখিতেছে, বিরহের বেদনাকে তীব্র করিয়া প্রিয়ের অভাবকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

এই করেছ ভাল নিঠুর
এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।

আমার এ ধূপ না জ্বালালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে,
দেয় না কিছু আলো।

আমীর খসরুও তাঁর বিরহতপ্ত হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিতেছেন—

'মোমের মতো ঝরছে গ'লে
ব্যথা-কাতর মোর হৃদয়,
কেমন করে ভুলবো বলো
তোমার কাজল দীঘল চোখ,
তোমার নীলিম নয়ন, বধূ
ছড়িয়ে আছে আকাশময়।"

এই বিরহের প্রহর গণনা, অনন্ত বেদনা বক্ষে ধরিয়া প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় জীবন যাপন ও কাব্যের ভিতর দিয়া পরম সুন্দরের প্রতি খসরুর আত্মনিবেদনের সাধনা এক দিন সার্থক হইয়া দেখা দেয়। আমীর খসরু সুফী সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়া আত্মসমর্পণের পরম আনন্দে ব লতেছেন,

মন্ তু শুদম তু মন শুদী
মন্ তন্ শুদম্ তু জাঁ শুদী
তা কম্ না গোয়েদ বাদ আবী
মন্ দিগরম্ তু দিগরী।

আমি হই তুমি, তুমি হও আমি
আমি হই তনু তুমি তার প্রাণ।
যেন, ইহার পর কেহ বলিতে না পারে :
তোমাতে আমাতে দূর ব্যবধান।

শুধু সুফী কবি ও সাধক হিসাবে নহে, সর্বপ্রথম উর্দু লেখক ও ঐতিহাসিক রূপেও তাঁহার খ্যাতি আছে। হিন্দী সাহিত্যও তাঁহার দানে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

মুহাম্মদ তুগলকের রাজত্বকালের প্রারম্ভে সাধকশ্রেষ্ঠ পীর নিযামুদ্দীন আউলিয়া দেহত্যাগ করেন। দিল্লীর পশ্চিম প্রান্তে বর্তমান জঙ্গপুরায় তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। নিত্য সহচর সাধকের মৃত্যুতে আমীর খসরু সর্বত্যাগী হইয়া তাঁহার সমাধির পার্শ্বে দিন কাটাইতে থাকেন। কিন্তু বন্ধু বিয়োগের ব্যথা তাঁহাকে আর অধিককাল সহ্য করিতে হইল না। খাজা সাহেবের মৃত্যুর ছয়মাস পরে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনিও পরলোকে তাঁহার অনুগমন করেন।

আমীর খসরু ছিলেন 'আজাদ মাশরাব' বা মুক্ত ঘাটের সাধক অর্থাৎ সেই উদার ও মুক্ত দৃষ্টির সাধক যিনি সর্বঘটে, সর্বস্থানে এবং সর্বলোকে স্রষ্টার অনন্ত মহিমা ও অস্তিত্ব অনুভব করেন। মুক্ত বিহঙ্গমের মত বন-প্রান্তর ও উদ্যানভূমির বিচিত্র বর্ণগন্ধের পুষ্পসম্ভারে তিনি আস্বাদন করেন সেই পরম সুন্দরের উচ্ছ্বসিত প্রেমের শরাব। তাই 'আজাদ মাশরাতে'র সাধকগণ স্পর্শ করিয়াছেন সর্বকালের মানুষের মনকে, প্রকাশ করিয়াছেন প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমের লীলা-বৈশিষ্ট্যকে।

তিমির বিদারি তোমার অভ্যুদয়

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

১

এখানে আকাশ দুর্যোগ-মেঘে আজি হায় ভরপুর,
সবাকার মনে বিষাদ কালিমা কণ্ঠে হতাশা-সুর।
জনগণ আজি দীন হ'তে দীন—
অন্ন-বস্ত্র-শান্তিবিহীন ;
পঙ্কিলতার কণ্টক লতা ঘিরিয়াছে নিঃশেষে,
রোগ-শোক-ক্ষোভ মহামারী সবে আসিছে ভীষণ বেশে !

২

জাতির জীবনে দুর্দিন এলো—খণ্ডিতা দেশমাতা—
হাসিছে ভ্রাতার সর্বনাশে যে তাহারি আপন ভ্রাতা।
সন্তান আজি জননীর কোলে,
মরণের মাঝে পড়িতেছে ঢলে ;
দারিদ্র্য আর অনাহার এসে নিতেছে সকলি লুটি—
পারে না মানুষ বাঁচাতে জীবন দুটি যে অন্ন খুঁটি' !

৩

—তবু হুঁস নাই—ঘিরিছে যে আজ অমানিশা-আন্ধার,
মানব-জীবন লয়ে চলে হেথা চৌর্য্যের কারবার।
অর্থগৃধ্নু পিশাচ-শকুন
মানুষেরে নিতি করিতেছে খুন,—
অধর্ম্ম ও পাপের প্রভাবে হ'ল সবি নিঃশেষ ;
স্বার্থান্বেষীর অনাচারে হায় ভরে গেল সারা দেশ !

৪

অধর্ম্ম যবে ধর্ম্মের গলে ফাঁসি দিবে অবহেলে
—তোমারি অভ্যুদয় যে তখন,—তুমি দেব, বলেছিলে,
আজি ভারতের সেই দুর্দিন,
পাপের আঁধারে হয়েছে বিলীন
মঙ্গল তব পাঞ্চজন্যে জাগাও সবার প্রাণ ;
তমসার ঘোর বিদারি উঠুক শান্তির সামগান !

গোধূলির আলোয়, কাথিয়াওয়ার

শিল্পী হীরাচাঁদ দুগার ও তাঁর চিত্রকলা

শ্রীদ্বিজেন্দ্র মৈত্র

সম্প্রতি কলিকাতায় শিল্পী হীরাচাঁদ দুগারের এক শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে শিল্পীর আসন এত দিন প্রতিষ্ঠিত ছিল শুধু তাঁর সতীর্থ ও অনুরাগীদের মানসলোকে, সুদীর্ঘ পচিশ বৎসর পরে আজ নিজের সমগ্র শিল্পসৃষ্টির ঐশ্বর্য্য সহসা সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করে তিনি শিল্পরসিকদের চমক লাগিয়ে দিয়েছেন।

শিল্পী হীরাচাঁদের প্রাথমিক শিল্পশিক্ষার সূত্রপাত হয় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময়কার প্রথম ছাত্রগোষ্ঠীর তিনি অন্যতম। শান্তিনিকেতনে থাকতেই শিল্পী রূপে তাঁর কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তার পর নানা কারণে সুদীর্ঘকাল তাঁকে শিল্পসাধনা পরিত্যাগ করতে হয়। মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আবার তুলি ধরলেন। বর্ত্তমান প্রদর্শনী তারই ফল।

এই ত হীরাচাঁদের শিল্পী জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করা অসমীচীন যে, শিল্পী শান্তিনিকেতনের ছাত্র সুতরাং তাঁর রচনা সেই শিল্পীগোষ্ঠীর আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যা শান্তিনিকেতন স্কুল অব পেণ্টিং বা শিল্পপদ্ধতি নামে পরিচিত। সেটা হওয়াই হয়ত খুব স্বাভাবিক ছিল। কারণ শিল্পী দুগার যাকে গুরু বলে স্বীকার করেন সেই শিল্পীশ্রেষ্ঠ নন্দলালের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেল শিল্পী দুগারের শিল্পকলায়। গুরুর প্রভাব কোথাও তার স্বকীয়তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। দুগারের ছাত্রাবস্থায় নব্য-বঙ্গীয় শিল্পান্দোলনের ভরা জোয়ার দেখা দিলে, কিন্তু তার কিছুমাত্র নিদর্শনও তাঁর তখনকার শিল্পকলায় পাওয়া গেল না।

শ্রীহীরাচাঁদ দুগার শ্রীনন্দলাল বসু-কৃত স্কেচ

তারপর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পী শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁদের নূতন নূতন মতবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ইউরোপীয়

ফতেসাগর হ্রদ, উদয়পুর

কেশরীয়াজীর মন্দির

আধুনিক শিল্পরীতিও আজ আমাদের শিল্পীদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু শিল্পী হীরাচাঁদ সমসাময়িক যাবতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে শিল্পসাধনায় রত ছিলেন। তাই তিনি আজ আমাদের যা উপহার দিলেন তাতে স্বকীয়তার ও মৌলিকতার ছাপ সুপরিস্ফুট। তাঁর প্রতিভার অনন্য-তন্ত্রতাকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

কিন্তু শিল্পী একান্ত ভাবেই ভারতীয় শিল্পের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কিন্তু সে ভারতীয়ত্ব কোন সঙ্কীর্ণতার আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হয়নি। প্রাচ্য শিল্পের অনেক মাধুর্য্যই তাঁর শিল্পে এসে গিয়েছে। শিল্পীর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন সমালোচকেরা তাঁর শিল্পে, চৈনিক, রাজস্থানী, মুঘল শৈলীর প্রভাব আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু এই সব শিল্পের ঐতিহ্য পটভূমিকায় থেকে দুগারের শিল্প-রচনাকে এক ব্যাপক ও উদার দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, তাকে কোথাও আচ্ছন্ন করে অনুকারকের পর্য্যায়ে ফেলেনি।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে দুগারের শিল্প মিনিয়েচারধর্ম্মী। কিন্তু যাঁরা পারসিক মুঘল অথবা রাজস্থানী মিনিয়েচারের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন সেগুলির সঙ্গে হীরাচাঁদের শিল্পরচনার পার্থক্য কতখানি। কোন জিনিসকে সূক্ষ্ম ও নিবিষ্টভাবে দেখার মধ্যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে। মিনিয়েচারের এই বৈশিষ্ট্যটুকুই শিল্পী

নাহারগড়, জয়পুর শিল্পী—হীরাচাঁদ দুগার

তাঁর শিল্পকলার আঙ্গিক রূপে নিয়োজিত করেছেন, কোথাও শিল্পীর তুলিচালনা ও রেখারচনার দক্ষতার অহঙ্কার তাতে ব্যক্ত হয় নি। তাঁর কয়েকটি রচনা ব্যতীত অধিকাংশ রচনাই আকারের দিক থেকে বিশাল। বিশাল চিত্রপট বিশুদ্ধ মিনিয়েচার-শিল্পের আশ্রয় নয়। কারণ মিনিয়েচারের সাথকতা দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত একাগ্রতায়। কিন্তু চিত্রপট বিরাট হলে প্রতিমুহূর্তে দৃষ্টিকে স্থানান্তরিত করতে হয়। সুতরাং নিবিষ্টভাবে উপভোগের রস থেকে মন বঞ্চিত হয়। শিল্পী দুগার মিনিয়েচারের আশ্রয় নিয়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এই মিনিয়েচারের প্রতি প্রবণতা শিল্পীর অন্তর্নিহিত বাস্তববাদিতা ও ডেকোরেটিভ মানসিকতার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু শিল্পী দুগার যতখানি বাস্তববাদী তার চেয়েও ঢের বেশী আদর্শবাদী। মানসিকতার এই যুগ্মধারা তাঁর শিল্পকে এক বিশেষ মহিমা দিয়েছে। মিনিয়েচার-পন্থীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানেই।

প্রশান্তি, প্রতিকৃতি, জীবনের ঘটনা সব কিছুই শিল্পীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে। ভারত-শিল্পে নিসর্গের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অবশ্য ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা যখন আমাদের দেশে প্রবর্তিত হ'ল তখন অনেকেই প্রকৃতিকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে শিল্পরচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রয়াস শুধু ব্যর্থ অনুকরণেই পর্য্যবসিত হয়েছে, মৌলিক শিল্পরচনা হয়নি। প্রকৃতির মধ্যে যে একটি সহজ ভাবালুতার দিক আছে, সেই দিকেই আমাদের শিল্পীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। যখন প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের শিল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সুরু হ'ল তখন রূপ-জগতের এই অবহেলিত
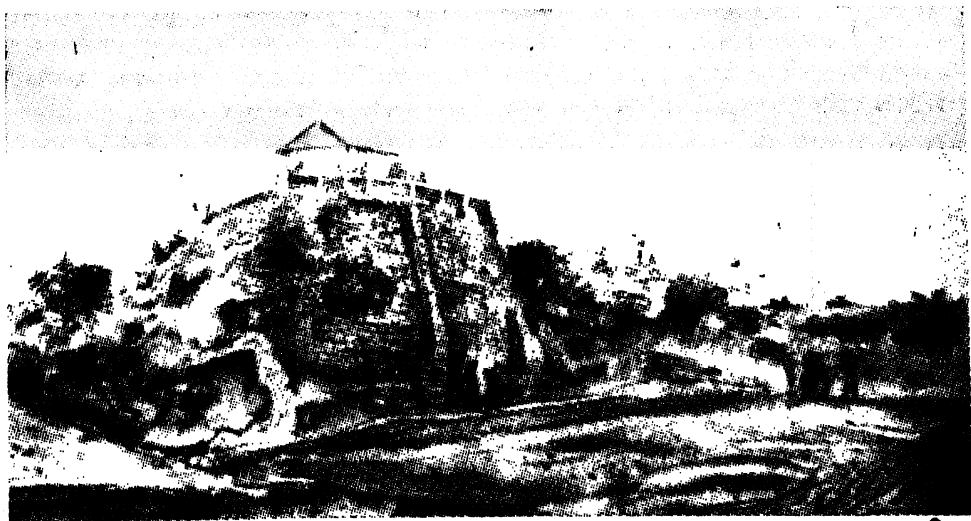
প্রাচীন মন্দির, রাজগৃহ
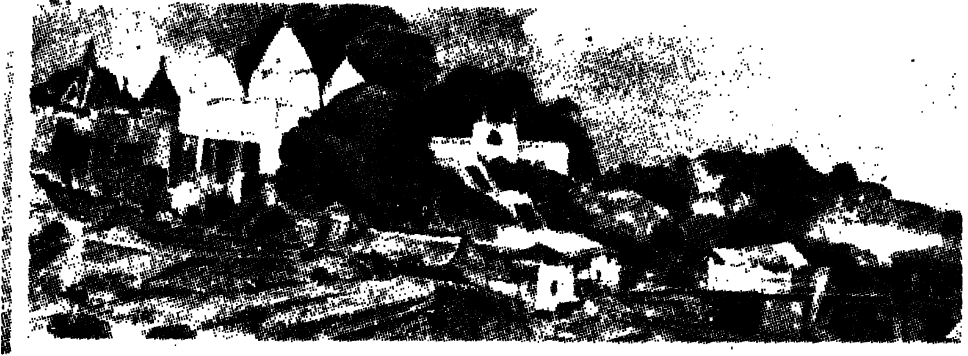
রাজগীর কুণ্ড

দিকটির প্রতি আমাদের শিল্প-চেতনা জেগে উঠল। তারই প্রথম প্রকাশ দেখা গেল অবনীন্দ্রনাথের নিসর্গচিত্রে। তারপর অনেক শিল্পীই নিসর্গ-চিত্রের দিকে নজর দিয়েছেন। কোথাও কোথাও শিল্পীর মৌলিকতাও লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু শিল্পী দুগার নিসর্গ-চিত্রের যে রূপটি আজ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করলেন তা এত সার্থক, এত হৃদয়গ্রাহী যে কি প্রাচীন, কি আধুনিক সমগ্র ভারতশিল্পে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। তাঁর আঁকা কাশ্মীরের চিত্রাবলীর মধ্যে যে রোমান্টিক অথচ স্পর্শ-কাতর শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া গেছে তার মাধুরী সকলের মনেই প্রভাব বিস্তার করবে। তারপর রাজগীর বা রাজগৃহ উদয়পুর ও কাথিয়াওয়াড়ের দৃশ্যাবলী তাদের গাম্ভীর্য্যে, বিশাল-তায় ও মহত্ত্বে এক অভিনব রূপ-জগতের সন্ধান দিয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি, শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দুটি বিপরীত মানসিকতার আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটেছে। শিল্পীর নিসর্গ-চিত্র-গুলিতে এটা আরও স্পষ্ট করে অনুভব করা যায়। একদিকে একটা নিবিড় বস্তুলীনতা (objectivity) চিত্রের মধ্যে সুস্থতা (Sanity) ও স্থিরতা এনে দিয়েছে, আর এক দিকে আত্মলীন (subjective) মানসিকতা বাস্তবকে আত্মসাৎ করে এক অখণ্ড ভাব-জগতের সৃষ্টি করেছে। যাঁরা শিল্পীর মনের এই রহস্যটুকু উপলব্ধি না করে তাঁর চিত্র দেখবেন তাঁদের কাছে তাঁর অনেক চিত্রই ফোটোগ্রাফিক বা আলোকচিত্রধর্ম্মী বলে প্রতীয়মান হবার সম্ভাবনা। শিল্পীর এই বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখবারও একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। তা হচ্ছে প্রকৃতির পরিচ্ছন্ন ও শান্ত রূপের দিক—পাহাড়, গাছপালা, সরোবর সব কিছুই শান্তির বিমল আলোকে স্নিগ্ধ।

যে যুগে আমরা বাস করছি, তার উত্তেজনা ও কোলাহল আজ যাবতীয় শিল্পকলা ও সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। হীরাচাঁদ হয় ত বিগত যুগের শেষ প্রতিনিধি। আধুনিকতার প্রভাবমুক্ত এই শিল্পী চেষ্টা করেছেন সুন্দরকে সুন্দরতর করে প্রকাশ, করতে, তাই তাঁর শিল্পে পাওয়া যায় সূক্ষ্মতা, মননশীলতা সুস্থতা ও শান্তি এই কয়টির সমন্বয়।

বাণগঙ্গা, রাজগৃহ

নব-বোধন

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

ভর্ত্তির উমেদারের তালিকায় নাম ছিল শ'খানেকেরও বেশী। তথাপি সুরবালা আসতে না আসতেই 'বেড' পেয়ে গেল। সেটা তদ্বিরের জোরে নয়, তার নিজের কোন বিশেষ গুণের জন্যও নয়, স্রেফ তার রোগের গুরুত্বের জন্য।

আউট-ডোরের ডাক্তার দু'চারবার তার পেট টিপেই ভ্রূকুটি করে বললে, এত দিন আনেন নি কেন একে? এখন তো দেখছি একেবারে শেষ অবস্থা—অপারেশন ছাড়া কোন উপায়ই নেই। রাজী আছেন আপনারা?

পাছে সুরবালা শেষ মুহূর্ত্তে আবার একটা গোলমালের সৃষ্টি করে বসে সেই আশঙ্কায় রসময় তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে ফেললে, নিশ্চয়—সেইজন্যই তো অত দূর থেকে এখানে আসা।

লেখাপড়ার পর্ব্ব শেষ করে ডাক্তার পাশের কুলিকে সংক্ষেপে বললেন, ফিমেল সার্জ্জিক্যাল।

কুলিটিও তৎক্ষণাৎ সুরবালার কাছে এগিয়ে এসে বললে, চলিয়ে মাইজী—উপর চলিয়ে।

কিন্তু সুরবালা অনড়—সে যেন পাথরের মূর্ত্তি।

ভিড় ঠেলে রসময় নিজেই তার কাছে এগিয়ে গেল, তার হাত ধরে অনুনয়ের কোমল স্বরে বললে, ওঠ, উপরে যাও তুমি—তোমাকে ভর্ত্তি করে নেওয়া হয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে এতক্ষণ আত্মসম্বরণ করেছিল সুরবালা, কিন্তু এবার তার অত যত্নের অত শক্ত বাঁধ একেবারেই ভেঙে পড়ল। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে সে বললে, আবার তোমায় দেখতে পাব তো?

কি পাগল!—রসময় বিব্রত হয়ে বললে।

ঘরভরা লোক, জোড়া জোড়া অনেকগুলি চোখ কুতূহলী হয়ে তাদের উপর এসে পড়েছে। তথাপি স্বামীকে প্রায় জড়িয়ে ধরেই সুরবালা আবার বললে, বড্ড ভয় করছে আমার।

'ছিঃ!'—রসময় ভর্ৎসনার সুরে আশ্বাসের মিশাল দিয়ে উত্তর দিলে, বলি নি তোমায়? খুব ভাল ব্যবস্থা আছে এখানে, স্বরাজ হবার পর আরও ভাল হয়েছে—বাড়ীর চেয়ে কত ভাল!

রসময় বলেছিল সবই। আজন্ম পল্লীবাসিনী স্ত্রীকে কলকাতার হাসপাতালে যেতে রাজী করাবার জন্য জানা সত্য আর কল্পনার সৃষ্টি একত্র মিশিয়ে সরকারী হাসপাতালকে সে স্ত্রীর চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছিল অপূর্ব্ব মনোহর রূপে।

রোগক্লিষ্ট মানুষকে নিরাময় করবার জন্য বিজ্ঞানের যে অপরিমেয় দান তাকেই সাধারণের কাজে লাগাবার সুব্যবস্থার বাহ্যিক রূপই তো হাসপাতাল। বড় ডাক্তারের মোটা দক্ষিণা, ভাল ভাল ওষুধ আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দাম দেবার সাধ্য গরীবের নেই বলেই বড়লোকদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে সেই টাকায় হাসপাতাল গড়া হয়েছে। স্বরাজ হবার পর হাসপাতালের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলেছিল রসময়।

সুরবালার মনে ছিল সবই, কিন্তু স্মৃতি থেকে এক ফোঁটাও সান্ত্বনা পেলে না সে, স্বামীর মুখের কথাগুলি থেকেও নয়। সব কথা কানেও গেল না তার—নিজের বুকেরই অবিরাম ঢিপ ঢিপ শব্দের নীচে যেন চাপা পড়ে গেল সেগুলি।

আরও দুর্দ্দৈব—বিদায়কালে স্বামীর মুখ ভাল করে দেখতেও পেলে না সে।

বুক ফেটে কান্না উঠেছে তার। শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মত উদ্বেলিত অশ্রুর অবিরাম প্রবাহকে ভেদ করে চোখের দৃষ্টি যেতে পারে না। অতগুলি সিঁড়ি ডিঙিয়ে, অতবড় বারান্দা অতিক্রম করে, অতগুলি কামরা পার হয়ে কতক্ষণে কেমন করে যে নিজের ওয়ার্ডে এসে সে পৌঁছল তা সে বুঝতেও পারলে না।

কিন্তু অমন যে অবিরল অশ্রুপ্রবাহ তাও ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই থেমে গেল—এক নিমেষেই বাহির ও ভিতরের সব জলই বাষ্প হয়ে উড়ে গেল যেন। দেখতে না চাইলেও যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তা কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি সে।

বড় হাসপাতালের সার্জ্জিক্যাল ওয়ার্ড। এ যেন আসুরিক প্রক্রিয়ায় যমের সঙ্গে মানুষের মরণপণ সংগ্রামের রক্তাক্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্র।...যেমন সব রোগ তেমনি তাদের চিকিৎসা। মানুষের সহজ, সাবলীল, সুন্দর রূপকে অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়াসে বিকৃতি ও বীভৎসতার প্রয়োগের দুর্ব্বোধ্য পরিকল্পনা।

কোন না কোন অঙ্গে হয় গভীর ক্ষত, না হয় ভগ্ন বা বিকল অস্থি নিয়ে যন্ত্রণাকাতর মুখে অনির্দ্দিষ্ট প্রতীক্ষা—বিভিন্ন অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কুঞ্চিত বা প্রসারিত করে আরামের প্রত্যাশায় পলক গণনা—কাঠের পিঞ্জরের মধ্যে সচল দেহকে বন্দী করে নিষ্প্রাণ জড়তার দুঃসহ ভার বহন—উর্দ্ধবাহু বা উর্দ্ধপদ হয়ে সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্রসাধনার অবাঞ্ছিত অনুকরণ—তুলা ও কাপড়ের বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ দেহগুলি যেন মানবদেহের ক্রমবিবর্ত্তনের এক একটি সযত্নে রক্ষিত নিদর্শন।

ওষুধের তীব্র গন্ধের সঙ্গে গলিত ক্ষতের দুর্গন্ধের সংমিশ্রণে ভিতরের বাতাস বোধ করি বা নরকেরই ক্ষীণ আভাস দেয়।

লোহার ছোট বড় পাত্র ও কাঠের বিভিন্ন আকৃতির নানা সরঞ্জামের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের মধ্যে যেন মানুষের সহনশীলতার চরম পরীক্ষা চলছে সেখানে।

মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল সুরবালার। যন্ত্রচালিতের মত সে উপরে উঠে এসেছিল, মুর্চ্ছিতের মত একটা খাটের উপর এলিয়ে পড়ল সে।

সুরবালার চেতনা ফিরে এল একটা সম্ভাষণে, শুনুন তো,—এ কি—কাঁদছেন কেন?

অচেনা গলা তবে রুক্ষ নয়। শুধু মেয়েলী বলেই কোমল নয়; অনুনয় তো বটেই, একটু যেন আন্তরিকতারও রেশ আছে তাতে। সসঙ্কোচে চোখ তুলে তাকাল সুরবালা।

কাঁচা বয়সের মেয়ে—তারই সমবয়সী হবে হয় তো। অদ্ভুত সাজ—মাথায় সাপের ফণার মত উদ্ধত কি এক রকমের চূড়া; ব্লাউজের সঙ্গে কালোপাড়ের শাড়ী এমন আঁটসাঁট করে পরা যে দেহের প্রায় প্রত্যেকটি রেখাই দেখা যায়। কাপড় যে এত সাদা হতে পারে তা আগে ভাবতেও পারে নি সুরবালা। তাদের গাঁয়ে, তার চেনা-জানা যত মেয়ে আছে তাদের মত একেবারেই নয়। তবে মেমসায়েবও নয় মেয়েটি। একবার চেয়েই দেখতে পেলে সুরবালা যে ঐ নিঃসঙ্কোচ আব্রুহীন মেয়েটির মুখেও বাংলার পল্লীর কচি কলাপাতার স্নিগ্ধ শ্যামলিমা মাখানো রয়েছে—ঠোঁটের উপরেই খেলে বেড়াচ্ছে বেশ মিষ্টি রকমের হাসির চঞ্চল একটি টুকরা।

সে সেবিকা। সুরবালা পরে জানতে পেরেছিল যে তার নাম মীনা সরকার—এই হাসপাতালেই কাজ শিখে পরে চাকরি পেয়েছে।

চোখে চোখ মিলতেই মীনা আগের চেয়েও কোমল কণ্ঠে বললে—কাঁদতে নেই—ছিঃ! কি রোগ হয়েছে আপনার?

পেটে ব্যথা, ঢোঁক গিলে উত্তর দিলে সুরবালা।

পেটে ব্যথা! মীনার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ বেজে উঠল যেন—কৈ, দেখি। বলে তার হাতের কাগজখানা টেনে নিলে সে; আগ্রহের সঙ্গে পড়ল সবটা; কিন্তু পরে আশ্বাসের স্বরে বললে—না, শক্ত কিছু নয়।

কিন্তু উনি যে বললেন, কাটাকুটি করতে হবে?

কে বললেন, ডাক্তার বাবু?

না—আমাদের উনি।

উনি কে? ও—আপনার স্বামী বলেছেন ও কথা?—বলতে বলতে হেসে ফেললে মীনা। সুরবালা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে।

মীনা সহাস্যকণ্ঠেই আবার বললে—ডাক্তারবাবু লেখেন নি সে কথা। আর কাটাকুটি করতেও যদি হয়, তাতে ভয়ের কিছু নেই। কত জনের কত রকম কাটাকুটিই ত এখানে হচ্ছে—রোজই।

তারপর মুখ ফিরিয়ে ডাকলে আর একটি মেয়েকে, 'টগর, নূতন এসেছেন ইনি; এঁর বিছানা, কাপড়-চোপড় ঠিক করে, দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দাও সব।'

কণ্ঠস্বর কর্তৃত্বের, মুখখানা তো আগেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল—আর কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস হ'ল না সুরবালার। কিন্তু মীনা নিজেই চলে যাবার উপক্রম করেও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আবার তাকাল সুরবালার মুখের দিকে, ঠিক আগের মতই মিষ্টি হেসে আশ্বাসের কোমল স্বরে বললে, কিছু ভাববেন না আপনি, এখানে কোন কষ্ট হবে না আপনার। আমরা ত আছি—দিন হোক, রাত হোক, ডাকলেই কোন একজনকে আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।

মীনা চলে যাবার পর টগরের দিকে তাকাল সুরবালা।

নামের সঙ্গে মুখের সাদৃশ্য নেই। প্রৌঢ়া নারী, বয়স ত্রিশের উপর নিশ্চয়ই। দেহের বাঁধুনি আর নেই, চামড়ায় লোল ধরেছে, মেদের বাহুল্য সুস্পষ্ট, রঙও কালো। তবে মুখের গড়নটি মন্দ নয়, ভাবটাও হাসিখুশী। পরিচ্ছন্ন শাড়ীখানার দৃঢ় ও সুবিন্যস্ত বন্ধনের মধ্যে ভালই দেখায় তাকে।

একটু উঠুন ত আপনি, টগর তাকে বললে, বিছানাটা পেতে দিই।

সুরবালা উঠে দাঁড়াল, কিন্তু কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আপনি কেন? ছিঃ! আমিই পাতছি বিছানা।

তা কি হয়! টগর উত্তর দিলে, আপনি হলেন গিয়ে রুগী। আমি থাকতে আপনি বিছানা পাতবেন কেন?

আপনি?

আমি এখানকার ঝি।

ঝি!

হ্যাঁ ঝি—আমায় আপনি 'তুমি' বলবেন,—বলে টগর বিছানায় মন দিলে।

বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল সুরবালা। বাড়ীতে ঝি তার কোনদিনই ছিল না। কথাটার চলতি মানে সে জানে এবং সেই জানাটাই তার বিহ্বলতার কারণ। নিজের বাড়ীতে না হলেও দেশের জানাশোনা বড়লোকের বাড়ীতে এ পর্য্যন্ত যত দাসী সে দেখেছে তাদের কারও সঙ্গেই ঐ রমণীটির কোন সাদৃশ্য নেই। কথাবার্ত্তায়, চালচলনে একে ছোট ঘরের মেয়ে বলে বোঝাই যায় না। ওর পরিচ্ছন্নতাও অসামান্য। দেহের নির্ম্মলতা আর বস্ত্রের শুভ্রতায় গ্রামের ছোট জাতের মেয়েদের কেন, স্বয়ং সুরবালাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ও। বিশেষ করে এই প্রত্যক্ষ সত্যটা উপলব্ধি করেই সুরবালা আরও বেশী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

টগরের হাতের কাজ শেষ হবার আগেই আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললে সে, আপনাকে তুমি বলে ডাকতে পারব না আমি।

কি বললেন ?—চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল টগর।

সুরবালা কুণ্ঠিত স্বরে আবার বললে, আপনি যা'ই হউন না কেন, আপনাকে ডাকতে 'তুমি' মুখে আসবে না আমার।

কেন ?

আর কিছু না হোক, আপনি বয়সে আমার বড় সেইজন্যে। আমি আপনাকে দিদি বলে ডাকব, আর আপনি আমার নাম ধরে তুমি বলে ডাকবেন।

টগর কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে, তারপর হেসে ফেলে বললে, মাঝামাঝি একটা রফা করা যাক তা হলে, কোন পক্ষেই আপনি বলবার দরকার নেই। তুমি আমায় দিদি বলে ডাকতে চাও ত ডেকো, তবে আমিও তোমায় দিদিমণি বলব। এখন এস ত এখানে—না শুলেও বিছানায় উঠে বোস। হাসপাতালের নিয়ম বড় কড়া,—না মানলে নাম কেটে বের করে দেবে।

বেশ যত্ন করে টগর নিজেই গুছিয়ে দিলে সব। চট্ করে একটা পরদা খাটিয়ে তারই আড়ালে সুরবালাকে হাসপাতা-লের শাড়ী ব্লাউজ পরিয়ে দিলে সে। মাথার কাছে ছোট আলমারিটির ভিতরে টুকিটাকি দরকারী জিনিসগুলি এবং উপরে ঢাকা-দেওয়া জলের গ্লাসটা গুছিয়ে রেখে তারপরে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি অসুখ করেছে তোমার দিদিমণি ?

'পেটে ব্যথা', উত্তর দিলে সুরবালা, মোটামুটি উপসর্গগুলির একটা বর্ণনাও দিলে সে।

শুনে বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে টগর বললে, বুঝেছি, আঁতে ঘা হয়েছে তোমার—তলপেট কাটতে হবে।

কিন্তু উনি—মানে, তোমাদেরই ঐ মেয়েটি যে বললেন, কাটতে হবে না ?

ওরা অমন বলেই থাকে, বলে মুখ টিপে হাসলে টগর।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ব্যস্ত হয়ে উঠে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে আবার বললে, ও কি, মুখ শুকিয়ে গেল কেন ? কত রুগীর পেট কাটা হয় এখানে।

হয় !

হয় না ? সপ্তাহে দু'এক জন ত নিশ্চয়ই। ঐ দেখ না, তোমার পাশেই যিনি আছেন, তাঁর পেট কাটা হয়েছে পাঁচ-ছ' দিন আগে।

তাকিয়ে দেখলে সুরবালা—বুক পর্য্যন্ত কম্বলে ঢাকা দিয়ে মেয়েটি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে—মুখ বিবর্ণ, চোখ বোজা।

কিন্তু টগর আবার তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, ভাল হয়ে যায় সবাই, আর খুব বেশী দিন কাউকে ভুগতেও হয় না। এই ওঁকে দেখ না, উনি সেরে উঠেছেন—পুরো তিনটি সপ্তাহও লাগে নি।

আধাবয়সী যে মেয়েটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে টগর কথাগুলি বললে, সে এগিয়ে এল সুরবালার কাছে ; হাসিমুখে তার মুখের পানে চেয়ে বললে, সত্যি, ভয় পাবেন না আপনি। কাটবার সময় জানাই যায় না, আর সেরেও যায় খুব শীগ্‌গির। এ'রা সেবা যত্নও করেন খুব।

অত বাড়িয়ে বল না, দিদি !

ক্ষীণ কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠের প্রতিবাদ কানে এল সুরবালার। তিন জনেই চমকে উঠল, তিন জোড়া অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে গিয়ে পড়ল পাশের খাটে শায়িতা রোগিণীটির মুখের উপর।

কিন্তু একটুও অপ্রতিভ হ'ল না সে ; বরং সুরটা আরও এক পরদা উঁচুতে চড়িয়ে বললে, যত্ন না ছাই ! দশ বার ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না, তার আবার—ঠোঁট বেঁকিয়ে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে সে।

টগরের মুখখানা একটু যেন কঠিন হয়ে উঠল, বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, সত্যি দশ বার ডেকেও সাড়া যদি নাই পাওয়া যেত তবে কথাটা শোনাবার জন্য আপনি দিদি আর বেঁচে থাকতেন না এতদিন।

কিন্তু ফিরে সুরবালার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে সে, বললে, হয়েছিল কি জান দিদিমণি ? নার্স দিদিমণি-দের মীটিং ছিল সেদিন। যার ডিউটি ছিল আসতে একটু দেরী হয়েছিল তার। সেই কথাটাই উনি সুযোগ পেলেই আজও শোনাচ্ছেন।

প্রতিবাদ করলে না রোগিণীটি, কিন্তু সুরবালা হকচকিয়ে গেল। টগরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার মুখের ভাব সহজ হয়ে এসেছিল, কিন্তু আবার যেন সন্দেহের মেঘ নেমে এল তার মুখের উপর।

বোধ করি বা সেটা লক্ষ্য করেই টগর বললে, এস দিদি মণি, স্নানের ঘর-টর সব দেখিয়ে দিই তোমায়।

দেখতে দেখতে সন্দেহ ও আশঙ্কার ভাবটা কেটে গেল সুরবালার। রোগের বিকৃতি এখানে আছে বটে, কিন্তু আশ্বাসের দৃশ্যেরও অভাব নেই।

সত্যই বিপুল আয়োজন,—আজন্ম পল্লীবাসিনী সুরবালার চোখে সে এক বিরাট বিস্ময়।

প্রকাণ্ড ঘর, উঁচু ছাদ, দু'ধারেই প্রশস্ত বারান্দা, দু'দিকেই বড় বড় দরজা আর জানালা—হু হু করে অনবরত বাতাস খেলছে। ভিতরে সারি সারি খাট, তার উপর পরিপাটি করে বিছানা পাতা। ধবধবে শাদা চাদরের উপর টকটকে লাল কম্বল—বর্ণের উদ্ধত বৈচিত্র্য। সুশৃঙ্খল বিন্যাসের জাজ্জ্বল্য

বন্ধনের মধ্যে সংযত শালীনতায় শান্ত। প্রত্যেকটি খাটের মাথার কাছে ছোট, নীচু এক একটি আলমারি, নীচে পিকদানী। খটখটে শান-বাঁধানো মেঝেতে এক তিলও ধুলো নেই—এমন মসৃণ আর এমন পরিষ্কার যে মনে হয়, ওতে আয়নার মত মুখই দেখা যাবে হয় তো!

সত্যি, স্নান প্রসাধন সবকিছুরই ব্যবস্থা এখানে চমৎকার! সুরবালা অবশেষে মুখ ফুটে বলেই ফেললে। তার কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস।

টগর স্মিত মুখে উত্তর দিলে, হ্যাঁ দিদিমণি—সরকারী ব্যবস্থা কিনা! গরীবের জন্য অঢেল টাকা ঢেলে এ সব আয়োজন করেছেন এঁরা।

সুরবালাকে নিজের বিছানায় বসিয়ে দিয়ে টগর বললে, বোস তুমি দিদিমণি, তোমার দুধের কথাটা বলে আসি।

দুধ!

হ্যাঁ গো—ভর্ত্তির দিন রুগীকে দুধ ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় না। আর তোমার যা রোগ—ক'দিন কেবল দুধ খেয়েই থাকতে হয় কে জানে!

সে ভাবনা সুরবালার মনে ওঠে নি। সে ভাবছিল কেবল ঐ দুধের কথা—স্নিগ্ধ, সুমিষ্ট, প্রাণপূর্ণ অমৃতের নিশ্চিত প্রাপ্তির অপ্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতির।

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের বৌ সুরবালা। তথাপি দুধ বস্তুটি তার কাছে দুর্লভ। যৌথ পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার পর গরীব স্বামী তার জন্য দুধের ব্যবস্থা করতে পারে না।···অথচ সেই দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য বস্তুটিই এখানে হবে তার একমাত্র পথ্য!—

দাম লাগবে না তো, দিদি?—সে জিজ্ঞাসাই করে ফেললে।

টগর চমকে ফিরে তাকাল, কিন্তু হেসে ফেলে বললে, না দিদি, ওষুধ-পথ্যের দাম লাগে না এখানে—গরীবদের ওয়ার্ড কি না এটা!

তবু বিশ্বাস হয় না। টগর চলে যাবার পরেও বিহ্বলের মত ভাবতে থাকে সুরবালা।

কিন্তু সত্যই দুধ এল!

ঠিক দুধের স্বাদ অবশ্য নয়। রঙটাও কেমন যেন কালচে ধরণের। তবু তা দুধ, আর সঙ্গে চিনিও—পাড়াগাঁয়ে যা সে চোখেও দেখতে পায় না। পরিমাণে এত বেশী যে সবটা সে খেতেও পারলে না। তলায় অনেকটা থাকতেই গ্লাসটা নামিয়ে রাখলে সুরবালা।

কেমন খেলেন দুধ?

চমকে ফিরে তাকাল সুরবালা। পাশের খাটের সেই মেয়েটি,—একটু আগেই টগরের সঙ্গে যে তর্ক করেছে, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েটির ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ এক টুকরা হাসি।

থতমত খেয়ে সুরবালা বললে, একটু পানসে—কাঁচা গাইয়ের দুধ হবে বা!

'তার জন্য নয়', মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বললে, 'এক সের দুধে তিন সের জল ঢেলে রুগীর পথ্য তৈরী করেছে এরা, পাশকরা, নার্স কি না!'

বড্ড রূঢ় শোনাল কথাটা। সুরবালার মনে হ'ল যেন তারই গায়ে বিঁধছে। টগর বা সেই চূড়া মাথায় মেয়েটি বা আর কেউ শুনতে পেলে কি যে মনে করবে তাই ভেবে নিজেই সে বিব্রত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি চোখ তুলে তাকাল সে।

সামনে, পিছনে, ডাইনে, বায়ে কেউ কোথাও নেই, কেবল রোগিণীরা যে যার খাটের উপর শুয়ে আছে, অনেকেই নিদ্রিত।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে সুরবালা; ফিরে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বললে, টগরদি'কে দেখছি না তো!

'আর কাউকেই কি দেখছেন?' মেয়েটি আগের মতই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কণ্ঠে বললে, 'কাউকেই পাবেন না এখন, যাদের ডিউটি আছে তারাও এখন বিশ্রাম করছেন। এরা আপনার মা, বোন বা মেয়ে কেউ তো নয় যে আপনার মুখের দিকে চেয়ে শিয়রে জেগে বসে থাকবে!'

কঠিন, নির্ম্মম কণ্ঠস্বর। সুরবালার মনের তারে যে সুর বেজে চলেছে তার সঙ্গে ওর একেবারেই কোন সঙ্গতি নেই। তাই উত্তরে বলবার মত কোন কথা ভেবে পেলে না সে।

মেয়েটিই তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু চাই আপনার?

ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে সুরবালা বললে, না।

তবে ঘুমোন। ওরা আসবে সেই সন্ধ্যার একটু আগে।

ভাল লাগে না সুরবালার, না সুর না কথাগুলি। রোগিণীটির উপরেই তার মন বিরক্ত হয়ে ওঠে। বড্ড খিট খিটে ওর স্বভাব, সর্ব্বদাই খুঁৎ ধরবার জন্য যেন ওৎ পেতে রয়েছে।

কি এমন দোষ করেছেন ওঁরা! সুরবালা ভাবে। টগরের হাসিমাখা মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন; মনে পড়ে কচি কলাপাতা রঙের সেই তরুণী সেবিকাটিকেও, সে আসতে না আসতেই কত যত্ন করে তার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ওঁরা। না হয় মুখের উপর চোখ পেতে বিছানার পাশে বসে নেই কেউ। তেমন মা-বোনেরাও তো সব সময় থাকে না, তাদেরও তো দরকার হয় বিশ্রামের। সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তবেই না এখানকার এঁরা বিশ্রাম করতে গিয়েছেন।—

আর কি চমৎকারই না এখানকার ব্যবস্থা! বাইরে থেকে হু হু করে হাওয়া আসছে; ঘরের মধ্যে নিঃসঙ্গ মনে হয় না। ঘরভরা সব লোক—অথচ সব চুপচাপ। পেটের ভিতরটা খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে না, ব্যথাটাও নেই মনে হয়।

আর কি নরম পরিচ্ছন্ন বিছানা! আরামে সুরবালার দু'চোখ বুজে এল।

ঘুম যখন তার ভাঙল তখন বেলা পড়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে অলস মধ্যাহ্নের সে স্তব্ধতা আর নেই, জাগরণের চাঞ্চল্য বাতাসে ধ্বনির ঢেউ তুলেছে। লোকজনের পায়ের শব্দ, শাড়ীর খস্ খস্, দু'একটি ক্ষীণ কাতরোক্তি, অনেকগুলি মৃদু কণ্ঠের সমবেত অস্পষ্ট গুঞ্জন সুরবালার কানে গিয়েই তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।

চোখ রগড়ে উঠে বসল সে। বিহ্বলের মত চারদিকে তাকিয়ে দেখলে। সব কথা স্মরণ করে নিজের অবস্থাটা অনুধাবন করতে বেশ একটু সময় লাগল তার।

না স্বপ্ন নয়, অথৈ জলেও সে পড়ে নি, কিন্তু পরিচিত কোন মুখও তার চোখে পড়ল না।

দুই চোখের সবটুকু দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও টগরকে সে দেখতে পেলে না, মাথায় চূড়াপরা সেই চেনা মেয়েটিকেও নয়। তাদের মত কাজ যারা করছে তাদের সব অচেনা মুখ। ঘরের মধ্যেও অপরিচিত মুখের বাহুল্য। আত্মীয়-আত্মীয়ারা রোগিণীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

সবচেয়ে বেশী চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে বারান্দায়। ধবধবে সাদা শাড়ী আর সাদা চূড়াপরা সেবিকারা তর তর করে যাচ্ছে আর আসছে। বড্ড চঞ্চল তাদের গতি, মুখে চোখে উত্তেজনার সুস্পষ্ট ছাপ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু'তিনটি মেয়ে একত্র কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে।

শুধু মেয়েরা নয়, পুরুষেরাও। সব ক'জনই যুবক, অধিকাংশই পেণ্টলান পরা। অনুমান করা যায় তারা ডাক্তার, তবে একথাও বোঝা যায় যে ওদের সমবেত মাতামাতিটা চিকিৎসা বা শুশ্রূষার মত কোন কাজের উপলক্ষে নয়।

কতকটা বিহ্বলের মতই ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল সুরবালা; হঠাৎ তার কানে এল, কি দেখছেন?

পাশের খাটের সেই রোগিণীটি। তার ঠোঁটে হাসি—তাতে কৌতুকের চেয়ে বিদ্রূপই বেশী।

সুরবালা বিব্রতের মত উত্তর দিলে, না, অমনি দেখছিলাম।

ওরা সব সেবিকা আর হাউস-সার্জন। ওরা কি করছে জানেন?

না, কি?

ষ্ট্রাইক করবার ফন্দী আঁটছেন।

ষ্ট্রাইক কি?

ষ্ট্রাইক জানেন না? বড্ড সেকেলে তো আপনি? রোগিণীটি এবার শব্দ করেই হেসে উঠল।

লজ্জা পেল সুরবালা, মুখ নীচু করে কুণ্ঠিতস্বরে বললে, আমি কলকাতায় থাকি না তো—গ্রাম থেকে এসেছি।

তা হলেও জানা উচিত ছিল, গাঁয়েও তো ষ্ট্রাইক হয় শুনেছি।

তার পর নিজেই বুঝিয়ে বললে, এঁরা সভা করবেন, মিছিল করবেন, তার পর জোট পাকিয়ে কাজ বন্ধ করবেন।

কেন?

নিজেদের মাইনে বাড়াবার জন্য।

মেয়েটির মুখের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল সুরবালা। শোনা কথার সঙ্গে চোখের দেখার মিল হ'ল না। কাজ করছে সবাই। ঘর-মোছা শেষ করে জমাদারনী পিকদানীগুলিকে ধোবার জন্য একত্র করছে। জনৈক পরিচারিকা চলৎ-শক্তিহীনা একটি রোগিণীকে হাত ধরে স্নানের ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আরও আশ্বাসের কথা, সেবিকার চেনা পোশাক পরা অচেনা একটি মেয়ে একটি রোগিণীর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে তার নাড়ী দেখছে।

কৈ, কাজ বন্ধ করেন নি তো এরা! সুরবালা ফিরে তাকিয়ে পাশের মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললে।

মেয়েটি মুখ টিপে হেসে উত্তর দিলে, করেন নি, করবার আয়োজন করছেন। তবে সেজন্য আমার কোনও দুর্ভাবনা নেই। আমার ব্যারাম সেরে গিয়েছে, কাল না হলেও পরশু চলে যাব আমি।

কথাটির মধ্যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত যা ছিল তা কাজ করল সুরবালার মনের উপর। কি একটা অজ্ঞাত বিপদের অস্ফুট আশঙ্কায় তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। এতক্ষণ বসেই ছিল সে, হঠাৎ পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

শুলেন যে? পাশের সেই মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করলে।

সুরবালা ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে, শরীরটা ভাল লাগছে না।

আপনার স্বামী এলেন না আপনাকে দেখতে?

প্রশ্নটা সুরবালার বুকে গিয়ে লাগল একটা আঘাতের মত। সেই মুহূর্তে ঐ কথাটাই ভাবছিল সে। বড্ড একা, নিজেকে যেন বড় বেশী অসহায় মনে হচ্ছিল তার।

প্রশ্নকারিণীর চোখ দুটিকে এড়িয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে সে উত্তর দিলে, তিনি তো এখানে নেই, আমায় ভর্ত্তি করে দিয়েই দেশে চলে গিয়েছেন।

ও! তা কোন আত্মীয়স্বজনও কি আপনার এখানে নেই?

না।

ঘরের মধ্যে বিজলীর আলো জ্বলছে, একটি নয়, অনেকগুলি। তা এত উজ্জ্বল যে মেঝেয় একটি সূচ পড়লেও বোধ করি স্পষ্ট দেখা যাবে। তথাপি সুরবালার চোখের সম্মুখ থেকে সব দৃশ্যই যেন এক সঙ্গেই মুছে গেল। দু'চোখ ফেটে জল এল তার, এতগুলি অপরিচিত মুখের পরিবর্ত্তে একটি চেনা মুখও যদি কাছে থাকত—সেই দেশের বাড়ীতে যেমন ছিল—দুঃসহ রোগের যন্ত্রণা সইতে পারত সে।

চোখের জল লুকাবার জন্ত বালিশে মুখ গুঁজল সে।

চেনা মুখ দেখা গেল পর দিন সকালে।

ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই সুরবালা দেখতে পেলে, কেবল টগরকেই নয়, সেই কচি কলাপাতা রঙের সেবিকা মেয়েটিকেও।

কাল বিকেলে দেখতে পাই নি কেন, দিদি? টগর কাছে আসতে না আসতেই জিজ্ঞাসা করলে সুরবালা।

টগর উত্তরে বললে, ওমা! বিকেলে দেখবে কেমন করে? এ মাসে ওবেলায় ডিউটি নেই তো আমার!

কোথায় গিয়েছিলে?

যাই নি কোথাও, বাসায়ই ছিলাম।

কাছেই বাসা বুঝি?

বাসা আর কি—সরকারী কোয়ার্টার।

টগর বুঝিয়ে বললে, হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যেই তাদের থাকবার জায়গা দেওয়া হয়েছে। জায়গা মানে—ব্যারাক-বাড়ীতে একখানি মাত্র ঘর আর ওরই সঙ্গে রাঁধবার একটু স্থান। স্বামী আর নাবালক ছুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরই মধ্যে তার সংসার।

আমি সারাদিন এখানে পড়ে থাকলে সংসার কে দেখবে, সকৌতুকে বললে টগর।

অপ্রতিভ হয়ে চোখ নামাল সুরবালা; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তা বলি নি আমি। বিকেলে দেখতে পাই নি কিনা—তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

তবু ভাল, টগর মুখ টিপে হাসল, কত রুগী আসে এখানে—তোমার মত খোঁজখবর নেয় না কেউ।

কিছুক্ষণ পর আবার যখন টগর এল তখন তার হাতে এক বাটি দুধ। সবটুকু সুরবালার গ্লাসে ঢেলে দিয়ে সে বললে, তোমার পথ্যটুকু নিজেই নিয়ে এলাম দিদিমণি। বাবুর্চিখানার যা কাণ্ড—দুধের ব্যবসা চলে সেখানে। নাও চট্ করে খেয়ে নাও। সারা দিনে আর কিছু হয়তো খেতে পাবে না।

'কেন?' বলার সঙ্গে সঙ্গে সুরবালার প্রসারিত হাতখানাও কেঁপে গেল, 'ষ্ট্রাইক হবে বুঝি?'

'ষ্ট্রাইক!' বলে টগর সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাল, 'ষ্ট্রাইকের কথা তুমি কার কাছে শুনলে?'

কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই সুরবালা পাশের খাটের দিকে তাকাল। শয্যা খালি—মেয়েটি বোধ করি স্নানের ঘরে গিয়েছে।

উত্তরটা আন্দাজ করে নিয়ে টগর বললে, উনি বলেছেন বুঝি? না, ষ্ট্রাইকের কথা ভেবে বলি নি আমি। নার্স বলছিলেন, সার্জন সাহেবের ঘরে তোমার ডাক পড়েছে। তিনি পরীক্ষা করে তোমার খাওয়া বন্ধও করে দিতে পারেন তো!

সত্যই খাওয়া শেষ হতে না হতেই ওদিক থেকে তার ডাক এল; সেবিকা মীনা তার কাছে এসে বললে, চলুন, সার্জন আপনাকে ডেকেছেন।

সুদীর্ঘ আর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা। নানা রকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে মেয়ে-পুরুষ তিন-চার জন মিলে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তাকে পরীক্ষা করলে। তার পর ওদের মধ্যে বয়সে যিনি সকলের বড় তিনি মীনাকে বললেন, কালকের জন্যই একে 'রেডি' কর।

কালই অপারেশন হবে আপনার, ঘরে ফিরিয়ে এনে মীনা সুরবালাকে বললে, আজ যেন আর কিছু খাবেন না, এখন জোলাপের ওষুধ দিচ্ছি।

সুরবালার মুখে কথা ফুটল না। পরীক্ষার নামে তার শরীরের উপর যে জুলুম হয়েছে সাধারণ নারীদেহের পক্ষে তা-ই অসহ্য। তার প্রতিক্রিয়াই তখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি! তার উপর এই দুঃসংবাদ। ঠিক বিনামেঘে বজ্রপাত না হলেও বজ্রপাতের মতই ভয়ঙ্কর। ঘরে এসেই সে খাটের উপর বসে পড়েছিল, এবার হাত বাড়িয়ে খাটের বাজু আঁকড়ে ধরলে সে।

কিন্তু তার ভাব দেখে মীনা হেসে ফেললে; বয়সে বেমানান হলেও মা-মাসীর মতই সুরবালার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, এত ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি? কিচ্ছু লাগবে না, বিশ্বাস করুন আমায়, কোথায় কাটছে, কি করছে তা আপনি জানতেও পারবেন না।

মিনিট পাঁচেক পর কাচের গ্লাসে করে জোলাপের ওষুধ এনে সে বললে, মিষ্টি করে এনেছি, নিন, খেয়ে ফেলুন:

মিষ্টি ঠিকই, তবু রেড়ির তেল তো! গলায় ঢেলেই মুখ বিকৃত করলে সুরবালা; গিলে ফেলবার পর ওয়াক্ ওয়াক্ করে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল সে।

মীনা এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললে, বড্ড নার্ভাস আপনি। আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাকুন এখন, পা ছুটি ঢেকে রাখবেন।

শুয়েও শান্তি নেই, রেড়ির তেলের প্রতিক্রিয়া তখনও চলছে। বিশ্রী লাগছিল সুরবালার। গা গড়াচ্ছে, জিভে তেলের পিচ্ছিলতার সঙ্গে গন্ধটাও লেগে রয়েছে যেন—অন্ততঃ মনে তো নিশ্চয়ই। আচ্ছন্নের মত বিছানায় পড়ে রইল সে।

পেটের মধ্যে দুঃসহ একটা মোচড় অনুভব করে সুরবালা চোখ মেলে যখন তাকাল তখন তার মনে হ'ল যে ঘুমের মধ্যে এতক্ষণ বোধ করি বা স্বপ্নই দেখেছে সে। তখন ঘর বেশ শান্ত। টগরকে কোথাও চোখে পড়ল না। কিন্তু বাথরুমের দিকে যেতে যেতে মীনাকে দেখতে পেলে সে। বারান্দার একটি কোণে ছোট্ট একটু ভিড় জমেছে—দু'তিনটি

ছেলে আর মীনারই মত সেবিকার পোশাক-পরা কয়েকটি মেয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় কথা বলছে। কিন্তু সকলের মুখে চোখেই উত্তেজিত ভাব।

কিন্তু ফিরতি পথে তাদের আর সেখানে দেখা গেল না। মীনা তখন ঘরের মধ্যে। স্মিতমুখে তার কাছে এসে সে বললে, সুরু হয়েছে বুঝি? এ বেলায় কিছু খাবেন না যেন— আর ও বেলায়ও কেবল বার্লির জল।

একটু থেমে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে সে আবার বললে, ভালই হ'ল কাল অপারেশন হয়ে যাবে আপনার। না হলে হয়তো আর হ'তই না।

কেন? সুরবালা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

মীনা উত্তরে বললে, পরশু থেকে আমাদের ষ্ট্রাইক হবার কথা আছে কি না!—

ষ্ট্রাইক! প্রতিধ্বনির মত কথাটা উচ্চারণ করলে সুরবালা। চকিতে মনে পড়ে গেল পাশের খাটের মেয়েটির সেই ইঙ্গিত, সেই শ্লেষোক্তি। একটা অব্যক্ত অশুভ সম্ভাবনার কল্পনায় বুক কেঁপে উঠল তার।

নানা কারণে গলাটা শুকিয়েই ছিল; কম্পিত, অস্ফুট কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি, দিদি, সবাই মিলে কাজ বন্ধ করবেন আপনারা? কেন?

মুচকি হেসে মীনা উত্তর দিলে, কাজ বন্ধ না করলে মাইনে যে এরা বাড়িয়ে দেয় না!

কত মাইনে পান আপনি?

কত আর? সব মিলিয়ে শ'দেড়েক।

দেড়শ'!

মোটে দেড়শ', বলুন তো, ওতে কি কুলোয়?

কুলোয় না?

ওমা! কুলোবে কেমন করে জিনিসপত্রের যা দাম!

সুরবালা অবাক হয়ে মীনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। ষ্ট্রাইক, মীনার অভাববোধের তীব্রতা, তার বেতনের হার, এর কোনটাই সে বুঝতে পারে না, কারণ এর কোনটাই তার অভিজ্ঞতার জগতের অন্তর্ভুক্ত নয়। দেড়শ' টাকা একত্র জীবনে কোন দিনই সে চোখে দেখে নি, কল্পনাও করতে পারে না কত।

কথাটা মুখ ফুটে বলেই ফেললে সে, আমাদের কিন্তু ষাট টাকা মাইনেতেই চালাতে হয়।

ষাট টাকা!

মীনা হঠাৎ যেন মুষড়ে পড়ল। এতক্ষণ বেশ হাসিখুশি ছিল তার মুখ; ষ্ট্রাইকের কথা বলতে বলতে উৎসাহে উদ্দীপনায় তার শ্যামবর্ণ মুখখানি বেশ একটু লালই যেন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই সবই বদলে গেল। থতমত খেয়ে সে বললে, ষাট টাকা! কি করেন আপনি—মানে, আপনার স্বামী?

মাষ্টারি করেন।

ও, মাষ্টারি!

বলে চুপ করলে মীনা; অকারণেই ফিডিং কাপটা এক জায়গা থেকে তুলে আর এক জায়গায় রাখলে; তার পর সুরবালার মুখের পানে চেয়ে বললে, না, আমাদের চলে না।

পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অপারেশন হয়ে গেল।

সেটা শোনা কথা, ঠিক কি যে হয়েছে সুরবালা তা জানতেও পারে নি। আছে কতকগুলি এলোমেলো স্মৃতি আর অসহ্য যন্ত্রণা।

ব্যথার অনুভূতি অবশ্য নূতন কিছু নয়—পেটের ব্যথাই ত তার রোগ। কিন্তু এবারের অনুভূতি অভূতপূর্ব্ব। পেটের উপরে কে বুঝি একরাশ জ্বলন্ত কয়লা রেখে দিয়েছে, থেকে থেকে দপ দপ করে জ্বলছে সারা জায়গাটা। আর কেবল পেটেই তো নয়—সমস্ত দেহেই অসহ্য যন্ত্রণা! ব্যথার অনুভূতি ছাড়া মনের আর যেন কোন উপলব্ধিই নেই।

তবে ভাসা ভাসা স্মৃতি আছে। স্ত্রী পুরুষ কত রকমের লোক, কত উদ্ভট আওয়াজ আর একটা উৎকট গন্ধমিশ্রিত তীব্র আস্বাদের। আর ওরই সঙ্গে কানে গিয়েছিল ঢাকের বাজনা, শ'খানেক ঢাকের একটা মিছিল যেন দূর থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছিল। তবু ওরই মধ্যে ঘুমও এসেছিল— গভীর সুষুপ্তি।

কিন্তু সে ঘুম সে শান্তি আর নেই—আছে কেবল পেটের মধ্যে অসহ্য জ্বলুনি, মাথার মধ্যে শূন্যতার দুর্ব্বহ এক বোঝা, স্মৃতির পরতে পরতে সেই গন্ধ ও আস্বাদের ঘন প্রলেপ আর তারই প্রতিক্রিয়ায় একটা দুর্দ্দান্ত, অসংবরণীয় বিবমিষা।

ওরই একটা অপ্রতিরোধ্য আক্ষেপের মধ্যে একবার একটা নিবিড় স্পর্শ অনুভব করেছিল সে, একজন তার মুখের মধ্যে এক টুকরা বরফ পুরে দিয়ে স্নেহমাখা কণ্ঠে তাকে বলেছিল, এটা চুষুন তো—কিছু ভয় নেই আপনার—শীগ্‌গিরই সেরে উঠবেন।

সিসার মত ভারী চোখের পাতা দুটিকে টেনে তুলে জবা-ফুলের মত লাল চোখ দুটি দিয়ে তাকিয়ে তাকে চিনতে পেরেছিল সুরবালা, সে মীনা।

কিন্তু সে যেন কত যুগ আগের কথা। সেবিকা মীনার কচি কলাপাতা রঙের সুডৌল মুখখানি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, থেমে গিয়েছে তার মধুর কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে বরফের টুকরা দূরে থাক্, এক ফোঁটা জলও যে কোন দিন পড়েছিল তাও মনে হয় না। আছে কেবল পেটের মধ্যে অসহ্য একটা দপ্‌দপানি, মুখ থেকে বুক পর্য্যন্ত ঊষর মরুভূমির উত্তপ্ত

শুষ্কতা, আর দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে সেই উৎকট বিবমিষার অপ্রতিরোধ্য আক্ষেপ।

জল—ওমা—একটু জল দাও গো!

বমি করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টার অবসানে সুরবালা ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠল।

পাশের খাটের উপর থেকে উত্থানশক্তিরহিত রোগিণীটি আর একজনকে সম্বোধন করে বললে, ওকে একটু জল দাও না দিদি, আহা, বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন উনি।

'এই দিই।' আর একটি মেয়ে বললে। জল নিয়ে এগিয়েও এল সে, ফীডিং কাপের নলটা সুরবালার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, নিন, জল খান।

চোঁ চোঁ করে অনেকটা জল টেনে খেয়ে ফেললে সুরবালা, তারপর চোখ মেলে তাকাল সে।

দিদি কোথায়—টগরদি?—অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তর হ'ল, ও মা—সে কি আর এখানে আছে!

মীনাদি?

তিনিও নেই।

ঠোঁট বেঁকিয়ে কথাটাকে শেষ করলো সে, কেউ নেই, দিদি, সবাই ষ্ট্রাইক করেছে যে!

অ্যাঁ!

হ্যাঁ গো; কথা তো ছিলই, আজ সকাল থেকে কেউ আর কাজ করছে না।

অত কথা সুরবালার কানে গেল না কারণ ঐ ষ্ট্রাইক কথাটাই তার শ্রবণশক্তির সবটুকুকে অধিকার করে নিয়েছে।

সেই অপারেশনের দিন উঁচু টেবিলের উপর শুয়ে যে ঢাকের আওয়াজ শুনেছিল সে সেই ঢাকেরই বাজনা যেন, তবে আরও উঁচু পরদায়, আরও সুস্পষ্ট, ষ্ট্রাইক্, ষ্ট্রাইক্, ষ্ট্রাইক!

আর সেই সঙ্গেই পেটের মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার-স্পর্শের অসহ্য প্রদাহ। উত্তাপে বুকের ভিতরটা আবার শুকিয়ে উঠে, আচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে সব দৃশ্যই একাকার হয়ে যায়।

পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রেখে ভাবতে পারে না সুরবালা। এক এক বার তার মনে হয় যে হয়তো এর কিছুই সত্য নয়—হাসপাতালে সে আসেই নি—টগর-মীনা থেকে সুরু করে পেটের ভিতরের ঐ দপদপানিটা পর্য্যন্ত সবই বোধ করি এক নিরবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ স্বপ্ন।

ললাটের উপরে কোমল হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শটাকেও সে স্বপ্নই মনে করলে—ফিস্ ফিস্ স্বরের ডাকটাকেও।

দিদিমণি—ও দিদিমণি, কি বলছ বিড়বিড় করে?

চোখ মেলে তাকাল সুরবালা—সামনেই টগরের মুখ।

বিশ্বাস করতে পারলে না সে। এক ঝটকায় মাথাটাকে ঘুরিয়ে সুরবালা বাঁদিকে তাকাল, তারপর সামনে, তারপর ডাইনে, তারপর নীচে মেঝের দিকে।

অস্পষ্ট আলোকে চেনা ঘরের পরিচিত জিনিস আর অর্দ্ধ-পরিচিত মানুষগুলিকে আবছারকম দেখা যায়। বড় বড় দরজা-জানালাগুলির অধিকাংশই খোলা, আলমারির উপর অবিন্যস্ত থালাগেলাসের কণ্টকিত বিশৃঙ্খলা, মেঝের উপর স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত জঞ্জাল, খাটে খাটে রোগিণীরা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বাতাসে একটা উগ্র বোটকা গন্ধ। আলোর স্বল্পতা, রাত্রির স্তব্ধতা আর ঐ গন্ধের তীব্রতা—সব মিলে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। কিন্তু স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না,—সবই বড় বেশী বাস্তব।

বিশেষ করে নিজের মুখের সামনে টগরের মুখখানি।

বিহ্বলকণ্ঠে সুরবালা বললে, টগরদি!

চুপ, চুপ—টগর কিন্তু ঠোঁটে আঙুল দিলে, ফিস্ ফিস্ করে বললে, আস্তে দিদিমণি।

সুরবালা আরও বিহ্বল হয়ে বললে, কেন, টগরদি?

ওমা ষ্ট্রাইক হয়েছে যে!

ষ্ট্রাইক!

কেন মনে নেই তোমার?

হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না; কিন্তু নূতন করে মনে পড়ল সবই, গত কয়দিনের অত তোড়জোড়, ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে-পুরুষের আনাগোনা, ফিস্ ফিস্ করে কথা, পাশের খাটের রোগিণীটির বক্রোক্তি, সেবিকা মীনার উত্তেজিত মধুর কণ্ঠের বিশদ ব্যাখ্যা।

শোনা কথাই কেবল নয়, পেটের মধ্যে দপ্ দপানি, মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম ভাব, জিভ, গলা ও বুকের মধ্যে দুঃসহ শুষ্কতার অনুভূতি, বাস্তব জৈবিক সত্তার প্রতি অণুপরমাণুতে পর্য্যন্ত তার নিবিড় উপলব্ধি।

কোনও রকমে একটা ঢোঁক গিলে সুরবালা বললে, একটু জল।

জল খাবে? এই দিই, টগর ব্যস্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু ফিডিং কাপে জল নেই; পাশের কোন আলমারির উপরেও জল পাওয়া গেল না। কুণ্ঠিত স্বরে টগর বললে, একটু সবুর কর, দিদিমণি, আমি জল আনছি।

সে যেন এক যুগের প্রতীক্ষা—তবে জল এল। টগরের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক নিশ্বাসেই সবটুকু জল পান করে ফেললে সুরবালা।...সত্যই যেন একযুগ প্রতীক্ষার পর সুগভীর পরিতৃপ্তি। সে তৃপ্তি সুরবালার দুর্ব্বল কণ্ঠেও ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে, দিদি, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল আমার।

কিন্তু টগর ফিস্ ফিস্ করে বললে, কাউকে কিন্তু বলো না, দিদিমণি।

কেন, দিদি?

ওমা, ষ্ট্রাইক হয়েছে যে! এ সময়ে কি এখানে আমাদের আসতে আছে!

নেই ?

সর্বনাশ ! কেউ দেখলে পা ভেঙে দেবে, মেরেই ফেলবে বা !

সুরবালার কণ্ঠে আর কথা ফুটল না, তার গলাটা আবার যেন শুকিয়ে উঠছে।

কিন্তু টগরই তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে আবার বললে, লুকিয়ে এসেছি, দিদিমণি। তোমার অপারেশন হয়েছে দেখে গিয়েছিলাম, আরও দুটি রোগীর অবস্থা ছিল খারাপ। মন কেমন করতে লাগল, একবার না এসে পারলাম না।

হঠাৎ কি যেন হ'ল সুরবালার ; খপ্ করে দুই হাতে টগরের হাতখানা চেপে ধরে সে বললে, তুমি বড় ভাল, টগরদি !

ধেৎ !

লজ্জা পেয়ে হাত টেনে নিলে টগর। কিন্তু পরক্ষণেই আগের চেয়েও বরং আরও একটু বেশী নত হয়ে সুরবালার কপালের উপর হাত রেখে সহাস্যে, সস্নেহ কণ্ঠে বললে, কিছু ভয় করো না, দিদিমণি ; অপারেশনের পর এমন সকলেরই হয়, আবার ভালও হয়ে যায় সবাই।

কিন্তু সুরবালা খাপছাড়া রকমে প্রশ্ন করে বসল, কিন্তু তোমরা—তুমি টগরদি ?

আমরা কি ?

তোমরা আসবে না ? কবে কাজে আসবে ?

টগর বিব্রত হয়ে পড়ল, চোখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে সে, ষ্ট্রাইক মিটে গেলেই কাজে আসব আমরা, কালও আসতে পারি।—বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে, কিন্তু সুরবালা আর কোন প্রশ্ন করবার আগেই আবার তার মুখের পানে চেয়ে সে বললে, আমরা না এলেও ভাবনা কি তোমার ? তোমার স্বামীও কালই এসে যাবেন হয়তো !

কে ? সুরবালা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল যেন।

টগর হাসিমুখে উত্তর দিলে, তোমার স্বামী।

কি করে জানলে ?

ওমা—ডাক্তাররা তোমার স্বামীকে তার করে দিয়েছে যে—সকলের অভিভাবককেই তার করেছেন এরা !

সুরবালার মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল, মুখে আর কথা ফুটল না তার।

টগর স্মিত মুখে আবার কিছুক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে রইল, তার পর নিতান্ত কচি মেয়েটির মতই সুরবালার গাল-দুটিকে টিপে দিয়ে বললে, কিছু ভেবো না, দিদিমণি। ভাল হয়ে যাবে তুমি—ভাল তো হয়েছই। এখন ঘুমোও।

চোরের মতন পা টিপে টিপে বের হয়ে গেল সে।

আবার নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব।

প্রকাণ্ড হলঘর, বাতাসে কেমন একটা ভাপসা গন্ধ—কোথায় যেন একটি রোগী যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করছে, অস্পষ্ট আলোকের পাতলা পরদার অন্তরালে যেন অতিপ্রাকৃত জগতের অস্ফুট একটা আভাস।

পেটের মধ্যে সেই দপ্ দপানিটা এতক্ষণ চাপা পড়েছিল—আবার চারা দিয়ে উঠল। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম ভাব, দেহে রাজ্যের গ্লানি, জিভটাও আবার যেন শুকিয়ে আসছে। অস্ফুটকণ্ঠে 'মা গো' বলে চোখ বুজল সুরবালা।

কিন্তু মনের চোখ-কান বন্ধ হয় না। সে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার বাড়ী, তার স্বামীর মুখ, টগর, মীনা, পাশের খাটের ছুটি-পাওয়া রোগিণীটি, মোটা কালো ফ্রেমের চশমাপরা সার্জন-ডাক্তার। কানে আসে—ভাল হয়ে যাবে তুমি, সব ভাল হবে···

এংলো-ইণ্ডিয়ানদের পরিচয়

শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বহুদিনের না হলেও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাস বিচিত্র। ভারতের ইতিহাসের এ একটা অঙ্গ। যখন এদের জীবন-প্রভাত হয় তখনও মুঘলবাদশাহীর কেন্দ্রশক্তি লোপ পায় নি। ভাস্কো দা-গামার প্রদর্শিত পথে একে একে পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার ও ওলন্দাজ বণিকেরা এসে জুটে এবং ক্রমেই প্রতিযোগিতাও তীব্রতর হয়ে উঠে। বাদশাহের অনুগ্রহে তখন কেউ কেউ কুঠিস্থাপন করতেও সক্ষম হয়।

বণিকেরা বুঝেছিল সেই সমস্যাসঙ্কুল দিনে, সাত-সমুদ্র তের-নদী পারাপারকালে, 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' নীতিটি খুবই কাজের। কিন্তু দেখা গেল মানুষের ঘর-গড়ার আর জৈবিক তাগিদ থেকেই যায়। ফলে বিভিন্ন কুঠির সাহেবেরা তত্রস্থ ভারতীয় নারীর সান্নিধ্যলাভের চেষ্টায় উন্মুখ হয়ে উঠল। কর্ত্তা-দের চোখে যখন কাণ্ডটা পড়ল, তাঁরা উল্লসিত না হয়ে পারেন নি। কারণ প্রথমত এসব বিবাহ হবে দুটি জাতির মধ্যে মিলনের সেতু ; দ্বিতীয়ত এদের সন্তানেরা হবে খ্রীষ্টান এবং তৃতীয়ত পিতার ধর্ম্ম, ভাষা ও আকৃতি নিয়ে অনেক কাজেই এরা সহায়তা করতে পারবে, যাতে খাঁটি ভারতীয়দের বিশ্বাস করা যায় না।

কর্ত্তারা যে কি রকম খুশী হয়েছিলেন তা বেশ প্রকাশ পায় ১৬৭৮ সালে লেখা এক পত্রে। জন কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা মাদ্রাজের কুঠিয়ালকে পত্রখানা লেখেন :

"The marriage of our soldiers to the women of

Fort St. George is a matter of such consequence to posterity that we shall be content to encourage it with some expense, and have been thinking for the future to appoint a pagoda to be paid to the mother of any child that shall hereafter be born of any such future marriage, upon the day the child is christened, if you think this small encouragement will increase the number of such marriage."

সোজা কথায় কিছু ঘুষ দিয়েও যদি এদের মধ্যে বিয়ের চলন করা যায় তা করতেও কর্ত্তারা রাজী ছিলেন।

কোম্পানীর সাধারণ কর্ম্মচারীরা বা সৈন্যেরা আরও উৎসাহ পেল, যখন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা এবং অভিজাত বংশীয়েরাও এরকম বিবাহ-বন্ধনে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হতে লাগলেন। লর্ড গার্ডনারের ভাইপো উইলিয়ম গার্ডনার বিয়ে করেন কাম্বের নবাবজাদীকে। গার্ডনার পরিবারের এক মহিলা সুসানের বিয়ে হয় মুঘল-সম্রাটের আত্মীয় নবাবজাদা শেখোর সঙ্গে। এ ছাড়া হিয়ারসি ও স্কিনার প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক বিয়ে করেন এক হিন্দু বিধবাকে এবং শোনা যায় বিখ্যাত সেনাপতি সার্ আয়ার কুট সেই চার্ণকেরই এক মেয়েকে বিয়ে করেন। কানপুরের সার হিউ ম্যাসি হুইলার এক হিন্দু রমণীকে বিয়ে করেন। আরও জানা যায় বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি ফিল্ডমার্শাল লর্ড রবার্টসের বিমাতা ছিলেন এক ভারতীয় মহিলা। তালিকাটি শুধু ইংরেজদের সঙ্গেই সম্পর্কিতদের। কিন্তু বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি এভাবে এক বর্ণ-সঙ্করের জন্ম দেয়। এরাই এংলো-ইণ্ডিয়ান। বস্তুত: এদের ইন্দো-ইউরোপীয়ান এমন কি ইউরো-এশিয়াটিক বোধ হয় বলা চলে; সম্পর্কটা এত ব্যাপক হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ-রাই এদেশে টিকে থাকল বা প্রাধান্য পেল বলে এই বর্ণসৃষ্টির খ্যাতি বা অখ্যাতির সঙ্গে তাদের নামটা যুক্ত হ'ল।

এই অবাধ মিলন বেশী দিন চল্‌ল না। ইংরেজ তো জন্ম এদেশে আসে নি। সে তখন যা করেছে, প্রয়োজনের তাগিদে করেছে; বাণিজ্যই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তারপর যখন 'বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্ব্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে', তখন আর কাউকেই গ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই। দাস ভারতীয়ের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন বা তজ্জনিত সন্তানদের পিতৃ-পরিচয় দেওয়া তত দিনে বোধ হয় লজ্জাকর দাঁড়িয়ে গেছে। ব্রিটানিয়া তখন সমুদ্রশাসন করছেন। দেশ থেকে যাতায়াতের পথ আর বিঘ্নসঙ্কুলও নয়। তবুও কুঠির অনাথ অপোগণ্ডদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আপার অর্ফানেজ স্কুল নামে ফোর্ট উইলিয়ামে তাদের জন্যে একটা উচ্চশিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। বিশিষ্ট ছাত্রদের বিলাতেও পাঠানো হ'ত উচ্চতম শিক্ষা দেবার জন্যে।

হঠাৎ ১৭৮৬ সালে কোম্পানীর কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স তা বন্ধ করে দিলেন, পাছে এসব ছাত্র বিলাতে গিয়ে বিয়ে করে আর তার ফলে বিশুদ্ধ ব্রিটন-রক্তে অশুদ্ধি এসে যায়,—

"The imperfections of the children, whether bodily or mental, would in process of time be communicated by inter-marriage to the generality of the people of Great Britain and by this means debase the succeeding generations of Englishmen."

চার বছর পরের কথা। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এক স্থায়ী আদেশ জারী করলেন যে ভারতীয় রক্ত যাদের শিরাতে বইছে তারা অসামরিক, সামরিক ও নৌবিভাগীয় "(Civil, military or marine)" কোন রকম কাজেই ভর্ত্তি হতে পারবে না। আরও রকমারি ওজর-আপত্তি ক্রমশ দেখা দিতে লাগল। শেষে ১৭৯৫ সালে সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেল ঘোষণা করলেন যে মাতৃকুল ও পিতৃ-কুল উভয়ত্র ইউরোপীয় রক্ত যাদের বইছে না, তারা কোম্পানীর কাজে অযোগ্য। আইনটি অনতিবিলম্বে কাজে লাগানো হ'ল আর তখন দেখা গেল, আগেকার নিয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই তা হলে বাতিল করে দিতে হয়। এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা পড়ল বিষম বিপদে। মুশকিল-আসান করলেন ভারতীয় নৃপতিরা। বিভিন্ন কাজে, বিশেষ করে সৈন্য-বিভাগে এদের চাকুরী দিলেন আর অজ্ঞাতসারে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারলেন।

এংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব বেশ বুঝা গেল। আরও স্পষ্ট করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে একেবারে দেখিয়ে দিলেন ভাইকাউণ্ট ভ্যালেন্সিয়া। ১৮১১ সালে লেখা এক পত্রে তিনি বলছেন:

"The most rapidly accumulating evil of Bengal is the increase of half-caste children. In every country where this intermediate caste has been permitted to rise, it has ultimately tended to its ruin. Spanish America and San Domingo are examples of this fact. ....It becomes too powerful to control....With numbers in their favour, with a close relationship to the natives......what may not in future be dreaded from them ?"

এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা কিন্তু দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতেও ভ্যালেন্সিয়াদের বিপদে ফেলে নি।

তখন মরাঠা যুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে। কামানের মুখে দাঁড়াবে কে? ইংরেজের প্রাণ তো অমূল্য! তখন এংলো-ইণ্ডিয়ানদের ডাক পড়ল। আশ্চর্য্য এই যে, সমস্ত অপমান হজম করে কৃতজ্ঞতার মুখে ছাই দিয়ে এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা চলে এল মরাঠাদের ছেড়ে। একজন এংলো-ইণ্ডিয়ান ঐতিহাসিক লিখেছেন:

"They heard the call of the blood and obeyed it with alacrity. Parron and the Marhatta chiefs endeavoured to bribe them with tempting offers, but failed

to shake their loyalty. To a man they remained true to their father's people, preferring death to lifting sword against England."

এরা সব রক্তের ডাক শুনেছিল, শুনে আর স্থির থাকতে পারে নি! জেমস স্কিনার ছিলেন যশোবন্ত রাও হোলকারের সৈন্যদলে একজন পদস্থ কর্মচারী। ১৮০৩ সালে হোলকারের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। ইংরেজ এঁটে উঠতে পারছে না—এমনি একদিনে স্কিনার ইংরেজ শিবিরে পালিয়ে এলেন। আর একজন সেনানায়ক ছিলেন গার্ডনার। তিনিও দলত্যাগের সুযোগের খোঁজ করছিলেন, কিন্তু হোলকার সাবধান হয়ে গেছেন। ফরাসী অস্ত্রশিক্ষক পারঁ খেন দৃষ্টি রাখ্‌ছেন। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় গার্ডনার ঘাস-কাটুনির ছদ্মবেশে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেকের কাছে পালিয়ে গেলেন।

এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা পিতৃকুলের ("Father's people") চিন্তাতেই মশ্‌গুল। এই সব "মান্ধাতা"দের মাতৃকুলের দিকে নজর পড়ে নি; পড়ে নি সে-দেশটির ওপর, যে-দেশ সম্পদে-বিপদে তাদের আশ্রয় দিয়েছে, পালন করেছে। বর্ত্তমান কালেও দেখি তাই। "ক্যাবিনেট মিশন" যখন এদের অগ্রাহ্য করলে, এদের মুখপাত্র সার্ হেন্‌রি গিড্‌নি বুঝলেন কাল বদ্‌লেছে; কিন্তু ভারতীয় নেতাদের কাছে নীচু হতে তাঁর বাধ্‌ল। ফ্রাঙ্ক এণ্টনি তাঁর পরিত্যক্ত আসন নিয়ে রিচার্ড বাট্‌লার প্রমুখ রক্ষণশীল নেতাদের সাহায্য নিতে কসুর করেন নি। আজ অবশ্য তিনি বলেন:

"Gidney's experience made me realize more than ever that the community could survive only by the goodwill and generosity of the Indian leaders and the Indian people."

ভারতীয়দের সত্যই ঔদার্য্য আছে এবং তা নির্ভরযোগ্য। নূতন শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু হিসাবে এরা বহু সুযোগই পাচ্ছে। গত ১৮ই মে তারিখে সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুযোগ রোধের যে নীতি গণপরিষদে ঘোষিত হয়েছে, তাকে পাশ কাটিয়ে এদের রকমারি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, আইন হয়েছে প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতি লক্ষে একজন এবং কেন্দ্রীয় সভায় প্রতি দশ লক্ষে একজন মাত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করা যাবে; কিন্তু বাংলাদেশেই নাকি এরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী, তাও মোটে ৩০,০০০। অর্থাৎ প্রাদেশিক আইন সভায় একজনও প্রতিনিধি এদের থাকতে পারে না। তেমনি সারা ভারতে এখন আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ এংলো-ইণ্ডিয়ান আছে, কাজেই কেন্দ্রেও কোন রকমে এদের লোক যেতে পারে না। তবু অন্য ব্যবস্থায় অর্থাৎ মনোনয়ন প্রথাবলে এদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইংরেজের দেওয়া বিশেষ সুবিধাগুলি এখনই লুপ্ত হবে না। প্রতি দু'বছর অন্তর শতকরা দশ ভাগ কমে দশ বৎসরে তা একেবারে রদ হবে। শিক্ষা এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও তারা অনুরূপ সুযোগ পেয়েছে।

এই সুযোগ দানের পাত্র বিচার করতে গিয়েই চোখে পড়ে যে, ইতিহাসে একমাত্র ইহুদিরা ছাড়া এমন স্বাতন্ত্র্যশীল (exclusive) সম্প্রদায় আর নেই। এরা ভারতীয়দের সঙ্গে মেশে নি এদেরই কটা চামড়া এবং পিতৃ-পরিচয়ের গর্ব্ব নিয়ে আর পিতৃকুলে মেশে নি রক্তদুষ্টির ভয়ে। তবু ভারতীয়দের তুলনায় এরা ইংরেজের কাছ থেকে কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। তা কিন্তু আত্মীয় ইংরেজের নিকট থেকে নয়, শাসক ইংরেজের নিকট থেকে। দাস এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়দের চেয়ে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা যে কত উঁচুতে, তা প্রমাণের জন্য অবনত অর্দ্ধশ্বেতাঙ্গদেরও বিশেষ সুযোগ দিয়ে ধন্য করা হয়েছে! ফলে আজ এদের অবস্থা যেন ছাদে তুলে দিয়ে মই সরিয়ে নেওয়ার মত হয়েছে। কতখানি অসহায় এরা! কত বড় দুর্ভাগ্যই বা যে, এই দু'শ বছরে উক্ত সম্প্রদায় থেকে শিক্ষায়, সামাজিক আন্দোলনে, রাজনীতিতে বা অর্থনীতিতে একটিও প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা বের হ'ল না।

দেরীতে হলেও এখনও যদি এরা ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক বুঝতে পেরে থাকে তবেই মঙ্গল। নূতন দিনে আমরা পরস্পরকে উপেক্ষা করতে পারব না। একদা শক, হূন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ভারতে এসে এদেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল; ভারতও তখন নবীন; তার পর তার সেই সজীবতা এবং স্বাঙ্গীকরণের ক্ষমতা লোপ পায়। জাতি-গঠনের কাজ সেইখানেই অসমাপ্ত থেকে যায়, দেশকে এক বিষম দুর্য্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। আজ নবজীবনের উন্মেষ কালে সেই ক্ষমতা নিয়ে ভারত আবার এগিয়ে যাবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক সবাইকে নিয়ে নূতন এক মহাজাতি অচিরে গড়ে উঠবে। আজও যদি কেউ সরে থাকে 'আপনারে চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান', তবে তার আর গতি নেই।

পশ্চিম বাংলার সালতামামি

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ইংরেজ আমলে বাজেট প্রকাশিত হইলে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত, তাহা লইয়া নানা প্রকার আলোচনা হইত এবং আইন-পরিষদে প্রচণ্ড বিতণ্ডাও হইত। বাজেট উপলক্ষ্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করার চেষ্টা হইত। দলে দলে টানাটানি পড়িয়া যাইত, ভোট ভাঙাভাঙি চলিত। কেহ কেহ নির্ব্বাচনকল্পে যে ব্যয় হইত, তাহা ভোট বিক্রয় করিয়া উশুল করিয়া লইত। আবার ইহাও দেখা যাইত, প্রতিপক্ষেরা এমন যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, যাহা জিদের বশে গবর্ণমেণ্ট এক বৎসর গ্রহণ না করিলে পর বৎসর, সেই ভাবে বাজেট প্রস্তুত করিতেছেন।

বর্ত্তমানে বাজেট সম্বন্ধে সে উৎসাহ দেখা যায় না। তাহার প্রথম কথা, ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, অতএব সর্ব্বপ্রথম যে আপত্তি উঠিত, 'ইংরেজের স্বার্থদুষ্ট বাজেট, তাহার মধ্যে নানা ধূর্ত্তামি আছে, জনসাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া ইংরেজ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিতে হইবে"—সে কারণ আর বিদ্যমান নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদেরই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা দেশের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে। সুতরাং তাহার মধ্যে ত্রুটি থাকিলেও স্বকৃত ত্রুটি হিসাবে, তাহা উপেক্ষা করিলেও চলিতে পারে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাভ নাই। কংগ্রেসের যে দল কিছুদিন হইতে তাহার বিপক্ষে সমস্ত বিরুদ্ধ মত নির্ম্মমভাবে দলন করিয়া আসিতেছে এবং বহু বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ-বিদ্বেষ আমলে তাহার সুযোগ লইয়া যে দল নির্ব্বাচিত হইয়া বসিয়া আছে, তাহা একচ্ছত্র। পরিষদ-কক্ষেও এমন প্রতিপক্ষ নাই, যাহাকে সমীহ করিয়া চলা দরকার, সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যেও যেমন পরমত সহ্য করিবার শক্তি নাই, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টও সেই দোষ ষোল আনা স্থলে আঠারো আনা লাভ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কোনও সমালোচনা আজকাল আর তাঁহারা সহ্য করেন না; যে আমার পক্ষে নয়, সেই বিপক্ষে; কেহ কেহ দলনিরপেক্ষভাবে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের কল্যাণে কথা বলিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তাহা মনে করেন না। অত্যন্ত দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, যাঁহারা সৎসাহসের সহিত এত দিন অন্তরের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককেই এখন নানা ভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষুদ্র বৃহৎ কৃপাপ্রত্যাশী। গবর্ণমেণ্টের বাজেট প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহাদের অনেকেই হয় ত নানা বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না। এই সকল কারণে গবর্ণমেণ্টের বাজেট আজকাল আর চঞ্চলতা এমন কি কোনও উৎসাহ সৃষ্টি করে না।

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এ অবস্থার অবসান হইবে নূতন নির্ব্বাচন হইলে। আজ যাঁহারা নিশ্চিন্তে বসিয়া রাষ্ট্রীয়কার্য্য পরিচালন করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই পরিবর্ত্তে নূতন লোক আসিবে। লোকমত ক্রমেই যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে চলিতেছে সে প্রমাণের অভাব নাই এবং তাহাই যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ আলোচনা তাহা সহজেই গ্রহণ করিতে পারা যায়। বাজেট দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি ধরিতে পারা যায়; তাহা জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে লোকের মনোভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে লোকের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, যে যত লক্ষ পক্ষে বা বিপক্ষে আছে, তাহা অপেক্ষা বহু গুণ, অথবা জনসাধারণের অধিকাংশই, গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে বিরক্তিসূচক তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের বাজেট লইয়া তাহারা বেশী মাথা ঘামাইতে চায় না।

১৯৫০-৫১ সালের হিসাব

আগামী বৎসরের হিসাব উপলক্ষ্যে বর্ত্তমান (১৯৪৯-৫০) সালের শেষের দিকের আর্থিক অবস্থা আলোচিত হইয়া থাকে। আমার মনে হয় লোকে এ দুইয়ের কোনটার দিকেই মন দেয় নাই। তাহারা দেখিল, ভাত, কাপড়, তেল, কয়লা, চিনির কোনও সুরাহা হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে কি না। আমরা বহু আশার কথা পাইয়াছি, গবর্ণমেণ্টের বহু দুশ্চিন্তার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু যাহাতে এই সকল জিনিসের দর কমে, বা দর কমিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার কোনও চেষ্টা হয় নাই, লক্ষণও বর্ত্তমান নাই। পশ্চিম-বাংলা সরকার খুব সন্তুষ্ট যে ট্যাক্স আর বাড়ে নাই; যখন বাড়ে নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া আর যে বাড়াইবার ব্যবস্থা করেন নাই, ইহার জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী অবশ্য খুবই কৃতজ্ঞ। এবার কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট যে নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করেন নাই, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যাহা চাপাইয়া দিয়াছেন, এখন স্বচ্ছন্দে তাহার ফলভোগ করিতে পারিবেন।

ট্যাক্স প্রদানের শক্তি

মানুষের স্থিতিস্থাপকতা শক্তি যে অপরিসীম ইহাতে সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে সমস্ত বাংলা যে ট্যাক্স দিত, আজ এক-তৃতীয়াংশ বাংলা তাহাই দিতে বাধ্য হইতেছে। বাংলা বিভাগের পূর্ব্বে সরকারী আয় ছিল ৩৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা আর ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্দ ৩৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ শতকরা মাত্র ১৫ টাকা কম, অথচ জনসংখ্যা ও আয়তন কমিয়াছে শতকরা ৬৬ ভাগ। সুতরাং

কত অল্পসংখ্যক লোক কত বেশী ট্যাক্স দিতেছে তাহা এই হিসাব হইতে পরিস্ফুট হইতেছে। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় কৃষি আয়কর, অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সালে ছিল না, ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা আয় আন্দাজ করা হয়, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৪৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল, ১৯৪৯-৫০ সালে হঠাৎ তাহা কমাইয়া কেন ৪০ লক্ষ করা হইল বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃত পক্ষে পাওয়া গেল ৬০ লক্ষ টাকা; ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্দ ৬০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। যেখানে ৬০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে, সেখানে মাত্র ৪০ লক্ষ টাকার হিসাব ধরা হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে বাজেটের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবে ট্যাক্স বাড়িয়া যাওয়ায় সাধারণ শস্য-মূল্য যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা ত সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চালাইতে হইলে টাকা চাই!

বিক্রয়-কর

বিক্রয়-কর সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে; ১৯৪১ সালে বিক্রয়-কর আইন পাস করা হয় এবং ১৯৪১-৪২ সালে ১৫'৬ লক্ষ টাকা আয় হয়। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৬-৪৭ সালের বরাদ্দ ছিল ৩ কোটি টাকা; ১৯৪৮-৪৯ সালে কিন্তু বিভক্ত বাংলায় প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ ৪'৩২ কোটি টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে বরাদ্দ ৪ কোটি টাকা; কিন্তু প্রকৃত আদায় ৪'৩০ কোটি টাকা। এখানেও বরাদ্দ বেশ কমাইয়া ধরা হইয়াছিল। আবার ১৯৫০-৫১ সালে ৪'৫ কোটি টাকার স্থলে ৪ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ট্যাক্স দিতে দিতে লোকের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা, অনেক লোকেরই আয়ের পথ রুদ্ধ হইতেছে, সেই হিসাবে আগামী বৎসর আয় কম হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। বিক্রয়-কর ক্রমেই মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের উপর চাপিয়া বসিতেছে, গবর্ণমেণ্টের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কয়েক বৎসর বাৎসরিক মাত্র দুই হাজার টাকা আয়কারী লোকের উপর ত্রিশ টাকা ট্যাক্স আদায় করিয়াছেন; তাহার নাম ছিল 'employment tax'। যাহারা চাকুরী দ্বারা কায়ক্লেশে জীবন যাপন করেন এবং যাঁহারা মাসিক তিন, পাঁচ, দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন, সমদর্শী সরকার মহাশয়ের নিকট ট্যাক্সের ব্যাপারে সকলেই সমান ছিলেন। মুসলিম লীগ আমলেও যে সকল জিনিষের উপর ট্যাক্স ছিল না, তাহার উপরও ট্যাক্স চড়াইয়া আয় হইতেছে। গত বৎসরে সরিষার তৈল, কয়লা, শাকসব্জী, ফল প্রভৃতি নানা দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর ধরা হইয়াছিল; কিন্তু সাধারণের অত্যন্ত বিরুদ্ধ-সমালোচনায় সরিষার তৈল, কম পরিমাণ কয়লা প্রভৃতির উপর ট্যাক্স চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়, কখন নিত্য প্রয়োজনীয় কোন্ বস্তুর উপর বিক্রয়-কর বার্য্য করা হইবে। আমার ত মনে হয়, বিক্রয়-করের তালিকা হইতে অন্ততঃ পক্ষে, প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তক, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, কম দামের জুতা ও ছাতা, কাপড় প্রভৃতি বস্তুগুলি বাদ দেওয়া প্রয়োজন। বিক্রয়-কর প্রভৃতি ক্রমবর্দ্ধমান হিসাবে চাপাইতে থাকিলে আর দ্রব্য-মূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই।

ভূমি রাজস্ব

জনসাধারণের ধারণা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারীতে খাজনা বৃদ্ধির উপায় নাই। একথা কতকাংশে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। পূর্ব্বে কৃষি-আয়করের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পর রোড সেস্, শিক্ষা-কর প্রভৃতি আছে। জমির উপর এই সকল করের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। তাহা ছাড়া অপর দিকও আছে। জমিদারদিগের খাজনা আদায় করিবার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, কারণ কিছু খাস-মহল ও বাকী জমিদারদিগের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত কর আদায়ের জন্য ১৯৪৮-৪৯ সালের গবর্ণমেণ্টের খরচ ২৮'৫৮লক্ষ টাকা; ১৯৫০-৫১ সালে ৪১'৬৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইতেছে। ভূমিরাজস্ব খাতে ১৯৫০-৫১ সালে ২'০৬ কোটী টাকার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয় ১'৩৯ টাকা। ঐ টাকা বাদ গেলে মাত্র ৬৭ লক্ষ টাকা থাকে; তাহার তত্ত্বাবধান করিতে গবর্ণমেণ্টের যে ভাবে ব্যয়ের বহর বাড়িতেছে, তাহাতে এই সময় জমিদারী বিলোপ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি রাজস্ব আদায়ের ভার লন, তাহা হইলে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আদায়ের জন্য যে খরচ বাড়িয়াছে, তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর অতিরিক্ত আয় বলিয়া ধরিয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কি প্রথায় জমি ব্যবস্থা হইবে এবং তাহাতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে জানিলে তবে জমিদারী প্রথা বাতিল করিবার কথা ভাবিতে হইবে।

সরকারী যানবাহন

আয় বৃদ্ধির কথা ভাবিতে গেলে যে সকল বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, পূর্ব্বে সেই দিকে মন দেওয়া দরকার। এরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হইলে, যাহা সন্তোষজনক কাজ দিতেছে, তাহার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সরকারী যানবাহন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে হতাশ হইতে হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে আয় হয় ১০'৭৪ লক্ষ টাকা, খরচ হয় ৫'৯১ লক্ষ টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে আনুমানিক আয় ধরা হইল ৮৭'৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু আদায় হইল মাত্র ৩৪'৫০ লক্ষ টাকা; কিন্তু ব্যয় দাঁড়াইল ৩৩ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ উদ্বৃত্ত থাকিল ১'৬৫ লক্ষ টাকা। ইহা অপেক্ষা হাসির কথা আর কি হইতে পারে? আরও

সুন্দর ব্যবস্থা হইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে আয় হইবে ৯৪'১০ লক্ষ টাকা; প্রকৃত আয় যে কত হইবে তাহার স্থিরতা নাই; খরচ পড়িবে ৯১'৫১ লক্ষ টাকা। পরিচালক দুই জন আছেন, তাঁহাদের ব্যয় ১৯৪৮-৪৯ সালের দুই হাজার টাকা হইতে ১৯৫০-৫১ সালে ৭০২ লক্ষ টাকা হইবে। যানবাহন খাতে ১৯৪৮-৪৯ সালে ২৭'৫৪ লক্ষ, ১৯৪৯-৫০ সালে ৭২ ২৫ লক্ষ টাকা মোট ৯৯'৭৯ লক্ষ অর্থাৎ এক কোটি টাকা খরচ হইয়া ১৯৪৯-৫০ সালে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আয় হইয়াছে; মোট কথা শতকরা ১'৬ বা দেড় টাকা লাভ পড়িয়াছে। যদি লাভের পরিমাণ সত্যই এইরূপ থাকিত, তাহা হইলে আর কেহ বাস্ চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত না। হিসাব লইয়া দেখা গেল, বাস্ প্রভৃতির লাভ শতকরা ন্যূনপক্ষে ১৫ টাকা। আমার মনে হয়, সরকারী কর্ম্মদক্ষতার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে একটি আধা-সরকারী কর্পোরেশন সৃষ্টি করিয়া, এক কোটি টাকা মূলধন দিয়া ছাড়িয়া দিলে ঢের বেশী লাভ পাওয়া যাইত। ইহাই শেষ নয়, ১৯৫০-৫১ সালে আরও ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। কলিকাতায় সরকারী বাস্ দেখিয়া যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা অপব্যয়ের বহর দেখিয়া হতাশা এবং আশঙ্কায় পরিণত হইয়াছে।

আবগারী

মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছে। কোনও কোনও প্রদেশ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। পশ্চিম বাংলার রাজস্বের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সরকার-পক্ষ তাহাতে বিরত আছেন বলিয়া মনে হয়। আবগারীর আয় পশ্চিম বাংলার "লক্ষ্মীর ঝাঁপি" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবিভক্ত বাংলায় সোয়া ছয় কোটি লোকের নিকট হইতে যখন ৬'৮২ কোটি টাকা পাওয়া যাইত, তখন বিভক্ত বাংলায় আড়াই কোটি লোকের নিকট হইতে ৫'৮৮ কোটি অর্থাৎ মাত্র ৫৪ লক্ষ কম পাওয়া কি গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নিতান্ত আনন্দ ও আশার কথা নহে? ইহার উপর ঘোড়দৌড় প্রভৃতি বাজি ধরা খেলা, যাহা জুয়ার নামান্তর, বৎসরে এক কোটি টাকা দিতেছে। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট আবগারী ও জুয়া খেলার কোনটাই বন্ধ করিতে পারিতেছে না। সম্ভবতঃ ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে বহু বৎসর সময় লাগিয়া যাইবে।

শাসন-ব্যবস্থা

আমরা শুনিতে পাই, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর, শাসন-ব্যবস্থায় এত কাজ বাড়িয়াছে, যাহাতে লোক না বাড়াইলে আর উপায় নাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের বহর বাড়িয়া চলিয়াছে বিরাম নাই, অবসাদ নাই। একটি কথা মনে রাখিলে সব বিচার বিতর্ক শুদ্ধ হইয়া যায়। কাজ ত বাড়িয়াছে বুঝিলাম; কিন্তু অবিভক্ত বাংলায় যত টাকা ব্যয় হইত, তাহা অপেক্ষা টাকা ত বাড়ে নাই এবং তখন এক টাকায় যত জিনিষ দ্রব্য বা শ্রম ক্রয় করা যাইত, এখন তাহা অপেক্ষা কমিয়াছে। সুতরাং কাজ যে খুব বেশী বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা মনে করা ভুল। ধরিয়া লওয়া গেল, কাজ বাড়িয়াছে, লোকবৃদ্ধি করিতে হইয়াছে; কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলা বিভাগের পরও খরচ ছিল ১'৮ কোটি টাকা। আর ১৯৫০-৫১ সালের বরাদ্দ ২'৩৮ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩১ টাকা বেশী। হিসাব দৃষ্টে বোঝা যায়, সাধারণ নির্ব্বাচন-রণে প্রস্তুত হইবার জন্য মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। লেখকের ব্যক্তিগত মত এ সময় সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী দশ লক্ষ লোকের সম্মুখে বলিয়া গেলেন বাংলায় সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দুই দুইটা অধিবেশনে তাহা সমর্থন করিলেন। বাংলা গবর্ণমেণ্ট নিরুপায়, তোড়জোড় চলিতে লাগিল। হঠাৎ জ্ঞানোদয় হইল ভারত সরকারের; "ধুড়ি" বলিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন নির্ব্বাচন সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া ভুল হইয়াছে। ইতিমধ্যে বাংলার শূন্যপ্রায় তহবিল হইতে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গেল; তন্মধ্যে ১৯৪৯-৫০ সালে ২৭ লক্ষ পড়িতেছে। ইহার জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে খেসারত দাবী করা প্রয়োজন। পশ্চিমবাংলার অনেকগুলি উপনির্ব্বাচন পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা যে কেন হয় না, তাহা জনসাধারণ আজও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

প্রচার বিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়, ১৯৪৮-৪৯ সালে বরাদ্দ হইল ৮ লক্ষ টাকা; খরচ হইল ১১'৭ লক্ষ টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে বরাদ্দ হইল ১২'৪৭ লক্ষ টাকা, খরচ হইল ১৬'২ লক্ষ। ১৯৫০-৫১ সালের জন্য ১৫'৭৭ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আশা করা যাক কার্য্যকালে ইহা ২০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করিয়া যাইবে।

পুলিস

অনেক বিষয় বলিবার আছে, স্থানাভাবে তাহা সম্ভব নয়। তবে পুলিস সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ইংরেজ আমল হইতে বাজেট প্রকাশিত হইলেই পুলিসের উপর সকলের নজর পড়িত। পুলিসের নজর চোর, ডাকাত, জোচ্চোর, বাটপাড়, রাজদ্রোহী প্রভৃতি অন্যায় আচরণকারীর উপর। আর গবর্ণমেণ্টের মোট আয়ের একটা বড় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে পুলিসের উপর সহজেই লক্ষ্য পড়ে। এবার যেন আরও বেশী করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। অবিভক্ত বাংলার ব্যয় ছিল ৪'৭৮ কোটি টাকা, আগামী বৎসরে (১৯৫০-৫১) তাহা ৪'৮৩ কোটি হইতেছে। বাংলার আয়তন ও জনসংখ্যার

কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মনে রাখা প্রয়োজন। কমিউনিষ্ট উৎপাত বাড়িতেছে তাহাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা, কিন্তু যে ভাবে খরচ বাড়িয়াছে তাহা কোনও প্রকারে সমর্থন করা যায় না। তাহার পর, যে-কোনও কারণে হউক পুলিসের দক্ষতা ও কর্ম্মতৎপরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, তাহার জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা কতটা দায়ী তাহা একবার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। মনে হইতে পারে "কণ্ট্রোল" প্রভৃতি ব্যাপারে পুলিসের কাজ বাড়িয়াছে, তাহাতেই অধিক ব্যয় দেখা যাইতেছে। কিন্তু ঘটনা একটু স্বতন্ত্র; তাহার জন্য অতিরিক্ত ৩৪ লক্ষ টাকা ধরা আছে, অবশ্য তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ খরচ হইয়া গিয়াছে। তদুপরি Extra-ordinary charges হিসাবে পুলিস বিভাগে আরও ২৯'৮ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখা যায়।

শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা বিভাগের ব্যয় যথেষ্ট বাড়িয়াছে; বাংলা বিভাগের পূর্ব্বে ৩'২ কোটি টাকা ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে ২'৯৪ কোটি ধরা ছিল, খরচ হইয়াছে ২'৭৬ কোটি। ১৯৫০-৫১ সালে ৩'০৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি না হইলেও, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যপরিচালনার ব্যবস্থার উন্নতি হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভূত সাহায্য পাইতেছে, তাহা ছাড়া শিক্ষার উন্নতি-কল্পে প্রাথমিক শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি হইতে কারিগরী শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি নানা কারণে সম্মিলিত ব্যয় ১৯৪৯-৫০ সালে ৭৬'৩৪ লক্ষ টাকা; ১৯৫০-৫১ সালে ৭৯ লক্ষ টাকা পড়িবে। দুঃখের বিষয় কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য টাকার বরাদ্দ থাকিলেও কাজ আরম্ভই হয় নাই।

অপরাপর বিভাগ

চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি সকল বিভাগের ব্যয়ই উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে টাকা আছে, কিন্তু কাজ আরম্ভ হয় নাই বা যাহা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয়। অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন আন্দোলনের যাহা ফল হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। ইহার জন্য এযাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্ততঃ ২৫ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। মাননীয় অর্থ-সচিব বলিলেন, সারা ভারতে শস্যের ফলন হ্রাস পাওয়ায় ১৯৪৮ সালে যখন ২'৮ মিলিয়ন (২৮ লক্ষ) টন তণ্ডুল প্রভৃতি আমদানী করিতে হইয়াছিল ১৯৪৯ সালে উহা ৩'৫ মিলিয়ন, অর্থাৎ ৩৫ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে। কৃষি বিভাগ ও তৎসঙ্গে খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন অধিকাংশ কাগজ ও ফাইল মারফত কাজ সমাপন করিয়া থাকেন; মাটি লইয়া যত অধিক কাজ হয় ততই মঙ্গল। কৃষি বিভাগের প্রায় অধিকাংশ টাকা কর্ম্মচারীদের মাহিনা যোগাইতে চলিয়া যায়। প্রতি জেলায় বড় বড় "বাদা" বা ক্ষেতের মাঝে অন্ততঃ দশ বিঘা জমি নিজ তত্ত্বাবধানে চাষ করিয়া যদি কৃষি বিভাগ আপনাদের কাজের সফলতা দেখাইতে পারেন তাহা হইলে প্রচার অপেক্ষা বেশী কাজ হয়। মোটা খরচের মধ্যে বীজ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পরে খাদ্য উৎপাদন খাতে বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করা। তাহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কাজ নাই। শিল্প বিভাগের প্রতি করুণা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। শিল্প ও মৎস্য উৎপাদন বিভাগে মোট ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা; তাহার মধ্যে দুই জন বড় কর্ম্মকর্ত্তা পান ৪১ হাজার টাকা; তাঁহাদের আপিস প্রভৃতির ব্যয় মিলিয়া ১,৯৩,৫০০ টাকা পড়ে। শিল্প শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাহার উল্লেখ না করাই মঙ্গল; অর্থাৎ সমস্ত মাহিনা সমেত মোট সাড়ে আট লক্ষ টাকা, তাহার মধ্যে নানা স্কুলে সাহায্য ৪ লক্ষ টাকা।

সেচ বিভাগ

সমগ্র পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, সেচ বিভাগের উপর এবং আমার মনে হয় ইহার উপর যথা-যোগ্য মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর পরি-কল্পনার জন্য সাড়ে ছয় কোটি টাকা এক বৎসরে ব্যয় হইতেছে; কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা পশ্চিম বাংলা সরকারকে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সময় সময় প্রতিশ্রুত টাকা না আসাতে বা অঙ্গীকার প্রত্যাহার করিবার ভয় প্রদর্শন করায় কাজে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। কিন্তু খাল, বিল, মজা পুষ্করিণী উদ্ধার এবং ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার উপর দেশের বহু মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। সাত মণ তেল পুড়িলে রাধা নাচিয়া থাকেন, ইহাই চলতি প্রবচন। সাত মণ তেল পুড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে, আমরা হয়ত সমস্ত রোশনাই দেখিয়া যাইব না, কিন্তু ছোট ছোট বাঁধ প্রভৃতি দেওয়া, নানাভাবে সেচ প্রভৃতির ব্যবস্থা যাহা চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় অপরাপর বিভাগ হইতে সেচ বিভাগে কাজ ভাল হইতেছে। যে সকল পরিকল্পনা আজ বিশ বা ততোধিক বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট পড়িয়া আছে, যাহা ইঞ্জিনীয়াররা অমত করেন, আর স্থানীয় লোকে যুক্তিদ্বারা তাহার উপযোগিতা প্রমাণ করেন, সেখানে জনসাধারণের মতের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। যদি কোনও প্রত্যবায় ঘটে, তখন লোকে গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেয় না। এরূপ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে গবর্ণমেণ্টের তরফে এযাবৎ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং তাহাতে কাজে অযথা বিলম্ব হইয়াছে। যাহারা বর্দ্ধমানের মোহনপুরের হানার বাঁধ এবং চব্বিশ পরগণার সোনারপুর হইতে বারুইপুরের বাদার জল-নিকাশের ব্যবস্থার কথা জানেন, তাঁহারা আমার যুক্তির সার-বত্তা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সেচের সহিত কৃষি, মৎস্য, জলনিকাশের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য এবং লোকের নানাভাবে উপজীবিকার পন্থা জড়িত; সুতরাং এক্ষেত্রে কোনও কৃপণতা করা উচিত নয়, সম্ভবতঃ তাহা হইতেছেও না।

বাজেট আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যাইত, কিন্তু লোকের ধৈর্য্যের সীমা আছে। ধীরভাবে বাজেট পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে সকল ক্ষেত্রে অহেতুক এবং হঠাৎ ব্যয় বাড়িয়াছে, সে সকল ক্ষেত্রে অপব্যয় যথেষ্ট আছে। যে সকল ক্ষেত্রে বা যাহার জন্য যত ব্যয় করা উচিত নয়, অর্থাৎ কম ব্যয়ে ঢের বেশী কাজ পাওয়া যায়, সেরূপ উপায় সকল প্রতিপালিত হয় বলিয়া মনে হয় না। আজ আমাদের হাতে আয় ব্যয়ের ভার পড়িয়াছে, তাহা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিতে না পারিলে দোষ আমাদেরই, অপরের নহে। যাঁহারা সরকারের কল্যাণ ও দেশের মত চাহেন, তাঁহাদের বাজেটে উন্নতি করা যাইতে পারে, এবং তাহার জন্য সর্ব্ব- প্রকারে চেষ্টা করা উচিত।

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা

স্বামী পরমানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর নেতৃত্বে প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন ব্রিটিশ-শাসিত পূর্ব্ব-আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা টেরিটরি, উগাণ্ডা প্রোটেক্টরেট্ এবং কেনিয়া কলোনী—এই তিনটি দেশের বহু শহরে ও পল্লীতে ব্যাপক ভ্রমণ করিয়া এক বৎসর চার মাস পরে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মিশনের সহনেতা স্বামী পরমানন্দজী পাটনাস্থ প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পূর্ব্ব-আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ বিবৃতি দিয়াছেন :

ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা

বহুকাল যাবৎ পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। রাজনৈতিক কারণে ক্রমেই সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। এইবার উগাণ্ডা ও অন্যান্য স্থানের কার্পাস তুলার ফলন প্রচুর হওয়ায় ভারতীয় তুলাকলের মালিকদের ব্যবসায় সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ প্রতীত হইলেও স্থানীয় শাসকবর্গের সংরক্ষণ নীতির যথোচিত ব্যবস্থার অভাবে উক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় এবং অবধারিত বিপর্য্যয় ঘটে। ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে তুলার কলের মালিকেরাই সর্ব্বাধিক সঙ্গতি-সম্পন্ন; এবার এইভাবে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। ঘটনা দৃষ্টে অনুমান করা কঠিন নয় যে, ইউরোপীয় তুলাকলের মালিক-দিগকে পুনঃসংস্থাপনের ইহা প্রাথমিক পর্ব্বমাত্র। এই সকল তুলাকলের পাশ্চাত্য মালিকগণ এত দিন ভারতীয়দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে উক্ত ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিবার গুপ্ত উপায় অনুসন্ধানে রত ছিল। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা উদ্ভাবিত কঠোর প্রতিযোগিতায় যুগপৎ ইউরোপীয় ও আফ্রিকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের দায়ে পাশ্চাত্য প্রভুরা আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিম সমর্থন দ্বারা আপন উদ্দেশ্যসাধনে উৎসাহিত করিতেছে।

পাদ্রীদের প্ররোচনা

এখন ইহা আর অপ্রকাশ্য নয় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনে তৎপর খ্রীষ্টীয় পাদ্রীগণ শহরে ও সুদূর পল্লীর সর্ব্বত্রই অন্তরাল হইতে আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদিগকে এমন ভাবে উস্কানি দিয়া আসিতেছে যাহাতে তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করে। এই প্রকার চেষ্টার ফল কোথাও কোথাও উগ্র আকার ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আফ্রিকার কতিপয় নেতার যথাকালীন সহানুভূতিপূর্ণ চেষ্টায় এযাত্রা দুর্ঘটনা বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই। নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই সব পাদ্রী সুপরিকল্পিত নির্দ্দিষ্ট পন্থায় অন্তরাল হইতে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার তালে আছেন। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই সব তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পাদ্রীর উপরই মানবকল্যাণ, শান্তিস্থাপন ও সভ্যতা সংস্কৃতি বিস্তারের পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত!

দক্ষিণ-আফ্রিকায় জাতিবিদ্বেষের আগুন

যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় জাতিবিদ্বেষের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া হতভাগ্য প্রবাসী ভারতীয়দের সর্ব্বস্বান্ত করিতে-ছিল তখন পূর্ব্ব-আফ্রিকায়ও ইহার অগ্নিশিখা পৌছিবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণলাভের সুবুদ্ধিতে সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একযোগে প্রশংসনীয় চেষ্টা করেন। এই ভাবে তাঁহারা নূতন ক্ষেত্রে উহার বিষাক্ত প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনায় গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন। ফল

সুন্দর হইল। পূর্ব্ব-আফ্রিকা বাঁচিল। কিন্তু যাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতীয়দের বিতাড়িত করিয়া নিষ্কণ্টকভাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া, তাহারা এইরূপ ভয়াবহ জাতিসংঘর্ষের সুযোগকে স্ব-স্ব উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিবার ফিকিরে আছে। ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রভাবশালী ইউরোপীয়দের মধ্যে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় রহিয়াছেন যাঁহাদের স্বার্থ ও নীতি এরূপ উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্তরাল হইতে পরিচালিত করা হয়, যেন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমৃদ্ধিশালী ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহের জনসংখ্যার অবিচ্ছিন্ন ভারতীয় অংশকে নিঃশেষে চিরতরে বিতাড়িত করা যায়। তথায় ভারতীয়দের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদলাভের যোগ্যতাসত্ত্বেও অধিকার নাই। হাইল্যাণ্ড বা উচ্চ মালভূমিতে শুধু পাশ্চাত্ত্য শ্বেতকায় শাসক জাতিরই অধিকার আছে। এমন কি যাহাদের মাতৃভূমি তাহারাও ঐসব স্বাস্থ্যকর উর্ব্বর অঞ্চল হইতে বিতাড়িত; তাহারা শুধু শ্বেতাঙ্গ সেবার অধিকার পাইয়া প্রভুগণকে অতুল সম্পদের অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্য পরিশ্রম করিতে পারে মাত্র—তাও স্বল্প বেতনে। ভারতীয়দের স্থায়ী জমিলাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবসায়ের পারমিট প্রতি বৎসর নূতন করিয়া লইতে হয়। অশ্বেতাঙ্গ বহিরাগতের পারমিটে নিদারুণ কড়াকড়ি। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাই আফ্রিকার উর্ব্বর ভূমির প্রকৃত অধিকারী। তাঁহারাই আফ্রিকার সোনা, হীরা-জহরৎ প্রভৃতি খনির মালিক।

সামাজিক অবস্থা

ভারতীয়দের দুরবস্থার মূলে আভ্যন্তরীণ কারণও আছে। হিন্দুদের সমাজ দেহের অভ্যন্তরে ধর্ম্মগত এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থবোধের অভাব ও উদাসীনতা পরস্পরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অধিকন্তু পাশ্চাত্ত্যের দাসসুলভ অন্ধ অনুকরণ ও বিলাস-ব্যসনের প্রবৃত্তি প্রবাসী ভারতীয়গণকে প্রবাসে অধীন ও অবনত করিয়া রাখিবার একটি কারণও বটে। তাঁহাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবময় আদর্শকে প্রবাস-জীবনে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বহু শহরে মন্দির বা ধর্ম্মস্থান নাই। জনসাধারণ নিজেদের ধর্ম্ম কি, সংস্কৃতি কি, নীতি কি জানিবার সুযোগ পাইতেছে না। এইরূপ অবস্থায় তাহারা বৈদেশিক শিক্ষা সভ্যতার প্রভাবে কেন প্রভাবান্বিত হইবে না? খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রচারকগণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগকে স্ব-স্ব ধর্ম্ম ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য যথেষ্ট তৎপরতা ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন। এই ক্ষেত্রে হিন্দুগণের কোনও কর্ম্মপন্থা নাই বলিলে অপলাপ হইবে না। তাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিদেশে প্রচারের মহান্ কর্ত্তব্যকে বরাবরই উপেক্ষা করিয়াছেন; ফলে স্থানীয় সমর্থন ইঁহাদের পশ্চাতে কিরূপে থাকিতে পারে? এই ভাবে তাঁহারা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে অধিকাংশ আদিম অধিবাসীরই এইরূপ ধারণা। ইহার ফল মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী হইবে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-আফ্রিকার মত স্থানে। এখন অবস্থার চাপে আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? সময় অতীতপ্রায়। নিজেদের অদূরদর্শিতার জন্য আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়ের দাবিও উপেক্ষিত।

তাহাই যদি হয় তবে ভারতবাসীর প্রবাস-জীবন নিশ্চয়ই দুঃখকর ও দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য

ভারত বিভক্ত হওয়ার পরেই পূর্ব্ব-আফ্রিকাস্থ ভারতীয় মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে উহার বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে—আভ্যন্তরীণ আলোড়ন দেখা দিয়াছে। ফলে, কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রে মুসলমানগণ তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে পৃথক নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে ফল এই হইয়াছে যে, তাঁহাদের বাস্তব জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বিশেষ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রসার লাভ করিতেছে। অবশ্য, পূর্ব্ব আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে উহাকে প্রশমিত করিবার প্রভূত চেষ্টা হইয়াছে। মনে হয়, উহা আর কার্য্যকরী হইবার নয়। স্বল্পসংখ্যক মুসলমান কর্ম্মী ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ভারতের প্রতি পূর্ব্ব আনুগত্য ও প্রেম প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের কোনও প্রভাব বর্ত্তাইতেছে না।

সম্প্রতি তথাকার মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারকল্পে ব্রিটিশ রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ মোম্বাসায় একটি সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এখানে ভবিষ্যতে ইহার ফল বিষময় হইবার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয়গণকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য রাজনৈতিকদের হস্তে ক্রীড়নক না হইয়া কি ভাবে ঐক্যবদ্ধরূপে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাদের ঔপনিবেশিক সত্তাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার

সঙ্ঘ-প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন আফ্রিকার উপরি-উক্ত তিনটি দেশে ভারতীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত বহু শহর ও গ্রামে এক বৎসর চারি মাস কাল ব্যাপক পরিভ্রমণ, প্রচার ও সংগঠন-কার্য্য দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকারার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। মিশনের সভ্যগণ কখনও সমবেত ভাবে, আবার কখনও দুই-তিন দলে বিভক্ত হইয়া, বহু শহর ও গ্রামের স্কুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সহস্রাধিক বক্তৃতা করিয়াছেন। সাংস্কৃতিক, সামাজিক, দার্শনিক, ধর্ম্মবিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক,

নৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গভীর আলোচনা সর্ব্বত্র হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রদর্শনী, উপদেশ, খেলাধুলা, সমবেত প্রার্থনা, ভজনাবলী, যোগশিক্ষা দান, ছাত্রসম্মেলন, শিক্ষক সম্মেলন প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক, সামাজিক দলাদলি ও মতভেদের বিদ্বেষ যাহাতে প্রসারলাভ করিতে না পারে সে বিষয়ে তাঁহারা নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবাসী ভারতীয়দিগকে 'একই সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়া তাঁহারা বিভিন্ন শহরে ও পল্লীতে মিলন-মন্দির পরিচালক কমিটি স্থাপন, এবং নাইরোবী ও মোম্বাসা শহরে দুইটি স্থায়ী কেন্দ্র গঠন করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙালী বালকদের পড়িবার জন্য নাইরোবীতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। কামুলী ও কিটালে শহরে স্থানীয় জনগণের সাহায্যে তাঁহারা দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন; উহাদের সঙ্গে গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতিও সংযোজিত হইয়াছে। জাঞ্জিবার ও টাঙ্গা শহরে বালকদের চরিত্রগঠনোপযোগী বাল-মিলন মন্দির হইয়াছে। মিশনের সভ্যবৃন্দ পূর্ব্ব-আফ্রিকার সর্ব্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। সর্ব্বত্রই অভাবনীয় উৎসাহের সঞ্চার দেখা গিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়গণ মিশনকে প্রতি বৎসর আফ্রিকায় আসিয়া প্রচার ও সংগঠন কার্য্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়া সঙ্ঘপ্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন পূর্ব্ব-আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃতি অভিযান অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

গোরক্ষা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এক্ষণে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে, সকলের নিজ ধর্ম অনুসরণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কোনও সম্প্রদায় নিজ ধর্মমত অন্য কোনও সম্প্রদায়ের উপর জোর করিয়া চাপাইতে পারিবে না। অনেকে মনে করেন, হিন্দুরা যদি বলে যে ভারতে কেহ গোবধ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে হিন্দুর ধর্মমত খ্রীষ্টান, মুসলমান, পার্শি প্রভৃতি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। ইহা অন্যায়। অবশ্য যে গরু দুধ দেয় বা লাঙ্গল টানিতে পারে সেরূপ গরু কাটিলে দেশের আর্থিক ক্ষতি হইবে। আইনের দ্বারা সেরূপ গরু কাটা নিষেধ করা যাইতে পারে। ভারতের বিধান-পরিষদে সেরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু বৃদ্ধ বা রুগ্ন গরুও কেহ কাটিতে পারিবে না হিন্দুরা কখনও এরূপ দাবি করিতে পারে না।

আপাত দৃষ্টিতে এরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ভ্রান্ত। কারণ হিন্দুধর্মে কেবল গরু কাটিতে নিষেধ করা হয় নাই, গরুকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে বলা হইয়াছে, সুতরাং গরুকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে। হিন্দুকে নিজ ধর্ম পালন করিবার সুযোগ দিতে হইলে তাহাকে গোরক্ষা করিতে দিতে হইবে। মনে করুন, একটি প্রস্তরখণ্ডকে হিন্দুরা দেবতা বলিয়া পূজা করে। অন্য ধর্মের লোক মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করে না বলিয়া তাহাকে সেই প্রস্তরখণ্ড ভাঙিতে দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ ইহাতে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবে। সেইরূপ অন্য ধর্মের লোক গরুকে পবিত্র মনে করে না বলিয়া তাহাকে গোবধ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ হিন্দু গরুকে পবিত্র ও পূজনীয় মনে করে। খ্রীষ্টান ও মুসলমান গোমাংস খাইতে ভালবাসে বলিয়াই তাহাকে নির্বিচারে গোমাংস খাইতে দিতে হইবে এরূপ কোনও কথা নাই। গোমাংস খাওয়া যখন হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে এবং সকলের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত হইতে রক্ষা করা যখন ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কর্তব্য তখন খ্রীষ্টান বা মুসলমানকে কিছুতেই হিন্দুধর্মে আঘাতকারী কার্য করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। এক দিকে হিন্দুর ধর্মে আঘাত করা, অপর দিকে অহিন্দুর রসনা-তৃপ্তিতে ব্যাঘাত জন্মানো, রাষ্ট্রকে এই দুয়ের মধ্যে একটা কার্য বাছিয়া লইতে হইবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এবং সভ্য রাষ্ট্রের কোন্ পন্থা বাছিয়া লওয়া উচিত তাহা বলিতে হইবে কি? ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি কোনও ব্যক্তির বা সম্প্রদায়বিশেষের রসনা-তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, তাহাতে রাষ্ট্রশক্তির ইতস্ততঃ করা উচিত নহে।

এক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করার কোনও প্রশ্নই উঠে না। আমাদের খ্রীষ্টান ও মুসলমান ভ্রাতারা সাধারণভাবে যে গোমাংস ভোজন করেন তাহা তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থে বিহিত কোনও ধর্মানুষ্ঠান নহে। এক বকৃরিদের সময় গোবধকে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। কিন্তু বকৃরিদের গোহত্যা বিষয়েও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে কোনও বিধান নাই।

কোরান বা অন্য ধর্মগ্রন্থে ইহা বলা হয় নাই যে, গরু না কাটিলে বকরিদ সম্পন্ন হইতে পারে না। বকরিদের সময় যে সকল প্রাণীকে হত্যা করিতে পারা যায় বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে গরুর উল্লেখ নাই। ছাগ, মেষ, দুম্বা এই সকল পশুর উল্লেখ আছে। যখন গরু ভিন্ন অন্য প্রাণীকে বধ করিয়া বকরিদ সম্পন্ন করা যায় তখন মুসলমানদের তাহাই করা সমীচীন। বাবর, আকবর, বাহাদুর শাহ প্রভৃতি সম্রাটগণ গোবধ নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাতে মুসলমান ধর্ম ক্ষুণ্ণ হইলে তাঁহারা কখনও তাহা করিতেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গোবধ নিষিদ্ধ না করিলে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা হয়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় এরূপ কার্য করা ভারত রাষ্ট্রের নেতাদের কর্তব্য। মুসলমান গো-হত্যা করিলে তাহার প্রতি হিন্দুর প্রীতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারে। হিন্দু এরূপ ভাবিবে, "গরুকে আমি পূজা করি, আমার মুসলমান ভ্রাতা যদি আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত, তাহা হইলে যাহাতে আমার ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে এরূপ কার্য কখনই করিত না।" উদারহৃদয় মুসলমান স্বেচ্ছায় এরূপ কার্য হইতে বিরত থাকিবেন।

বৃদ্ধ বা রুগ্ন গরু যে দেশের কোনও উপকারে আসে না তাহা নহে। সুতরাং তাহাদিগকে কাটিতে দেওয়াও ক্ষতিজনক। ইহাতে আর্থিক ক্ষতি হয় কেহ যদি এ কথা স্বীকার না-ও করেন তাহা হইলেও পূর্বোক্ত ধর্মসংক্রান্ত কারণে গোবধ অন্যায় ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ঈশ্বরকে দেখা যায় না। এজন্য যাহাতে ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ দেখা যায় হিন্দুরা তাহার পূজা করে। ঈশ্বর যেরূপ আমাদিগকে সৃষ্টি করেন এবং জলবায়ু, অন্ন প্রভৃতির দ্বারা আমাদের প্রাণরক্ষা করেন, পিতামাতাও সেইরূপ আমাদিগকে লালনপালন করেন। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে পিতামাতাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে বলা হইয়াছে।* গাভী দুগ্ধ দিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করে, বলদ লাঙ্গল টানিয়া অন্ন উৎপাদনে সহায়তা করে এজন্য গোজাতির সেবা করা উচিত—ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের বিধান। গাভী ও বৃষ অকর্মণ্য হইলেও তাহাদিগকে পালন করা উচিত।

গোবধ বন্ধ হইলে দুধ, ঘি সস্তা হইবে, তাহা হিন্দু গৃহস্থের যেরূপ কল্যাণজনক, মুসলমান গৃহস্থেরও সেইরূপ। বলদ সুলভ হইলে যে কেবল হিন্দু-চাষীরই সুবিধা হইবে তাহা নহে, মুসলমান-চাষীরও ইহা সমান সুবিধাজনক। সুতরাং গোরক্ষা হইলে সমগ্র দেশবাসীরই কল্যাণ হইবে।

ইহলোকে উন্নতি এবং পরলোকে মোক্ষলাভ উভয়ই হিন্দু-ধর্মের উদ্দেশ্য।† হিন্দুধর্মের বিধানগুলি এই দ্বিবিধ কল্যাণ-সাধন করে। গোরক্ষার বিধানও এইরূপ। ইহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, পুণ্যসঞ্চয়ও হয়।

অধিক অন্ন উৎপন্ন করিবার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তৎপর। বলদের সংখ্যা অধিক হইলে এবং সেজন্য মূল্য সুলভ হইলে চাষী বেশী জমি ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিবে, সুতরাং বেশী অন্ন উৎপাদন করিতে পারিবে। গোরক্ষার সহিত অধিক অন্ন উৎপাদনের এই সুস্পষ্ট সম্বন্ধ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কেন দেখিতেছেন না?

* "মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব" তৈত্তিরীয় উপনিষদ।

† যতো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। (কণাদ-বৈশেষিক দর্শন)

তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন, ত্রিপিটকাচার্য্য

[কালিম্পং ইনষ্টিটিউট অব্ কালচারে রাষ্ট্রভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা। ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দাশরথি রায় কর্তৃক অনূদিত এবং বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।]

তিব্বতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উহা কয়েকটি খণ্ড ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তথাকার অধিবাসীরা ছিল সর্ব্বপ্রকার সভ্যতাবর্জ্জিত; না ছিল তাহাদের নিজস্ব লিপি—না ছিল কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতি। সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিহীন এই জাতির মধ্যে, ব্রহ্মপুত্রের নিম্নভাগে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে সামান্য এক সর্দ্দারের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন সরঙ্গ-চান-গাম্বো (Srong chan gambo)—চেঙ্গিজ খাঁনের মতই তাঁহার মনে দেশবিজয়ের বাসনা উদিত হইল। তিনি দেখিলেন তিব্বতীদের মধ্যে যাহারা যাযাবর শ্রেণীর লোক তাহারাই অধিকতর বলশালী এবং কষ্টসহিষ্ণু। এই যাযাবর-শ্রেণীর মধ্য হইতে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিরাট এক সেনা-দল সংগঠন করিলেন। অশিক্ষিত অ-সভ্য কিন্তু প্রতিভাবান এই সেনানায়ক তাঁহার সংগঠিত সেনাদলের সাহায্যে অচিরেই সমগ্র হিমালয় অঞ্চল জয় করিয়া লইলেন। উত্তরে পূর্ব্ব-মধ্য-এসিয়া, দক্ষিণে দার্জ্জিলিং জেলা ও নেপাল, পশ্চিমে গিলগিট এবং পূর্ব্বে চীনদেশীয় প্রাচীর—এই সীমারেখার মধ্যবর্ত্তী বিশাল ভূখণ্ড তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত হইল। তিনি নেপাল এবং চীনের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

তখন তিব্বতে শুধু কথ্য ভাষাই প্রচলিত ছিল, তাহার নিজস্ব বর্ণমালা বা লিপি ছিল না। প্রকাণ্ড রাজ্যের সুব্যবস্থা ও সুশাসনের জন্য সরঙ্গ-চান-গাম্বো লিখিত ভাষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন তিনি থনমী সাম্ ভোটে (Thanmi sam bhote) আখ্যায় অভিহিত এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে—সম্ভবতঃ কাশ্মীরে, প্রেরণ করিলেন। থনমী সাম্ ভোটের প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। তিব্বতী ভাষায় থনমী সাম্ ভোটের অর্থ থন্ গ্রামের মহান্ তিব্বতী। থনমী সাম্ ভোটে ভারতে আসিয়া ভারতীয় লিপি-মালা অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিলেন এবং তিব্বতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া ভারতীয় লিপির ধাঁচে তিব্বতী বর্ণমালা সৃষ্টি করিলেন। দুই রীতির অক্ষর তিব্বতে প্রচলিত হইল—একটি মাত্রাবিহীন ও অপরটি মাত্রাযুক্ত। মাত্রাবিহীন অক্ষরগুলি (সম্ভবতঃ তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধার জন্য) পত্রাদি লিখন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং মাত্রাযুক্ত লিপি পুস্তকাদি লিখনকার্য্যে ব্যবহার করা হয়। মাত্রাযুক্ত অক্ষরগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের প্রচলিত লিপির সহিত সর্ব্বপ্রকারে সাদৃশ্যযুক্ত। তিব্বতী লিপি প্রণয়নে ভারতীয় বর্ণমালার সব কয়টি বর্ণই লওয়া হইয়াছে, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের চতুর্থ বর্ণ যথা ঘ, ঝ, ঢ, ধ এবং ভ এইগুলি বর্জ্জিত হইয়াছে, কারণ তিব্বতী ভাষার উচ্চারণে এই ধ্বনিগুলির প্রয়োজন হয় না।

এভাবে লিপির সৃষ্টি হইলে পর থনমী নিজ ভাষার জন্য দুইটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন—একটির নাম সুম-চুপা (Soom choopa) এবং অপরটির নাম তাগ-চুপা (Tag choopa)।

তিব্বতীরা এবার নিজেদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে প্রযত্নশীল হইল। থনমী ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে ভারতের সাহায্য চাই। তখন আমন্ত্রণ করা হইল ভারতীয় পণ্ডিতগণকে, তাঁহারা এ আহ্বান প্রত্যাখান করিলেন না। হউক কষ্টসাধ্য দুর্গম দীর্ঘপথ—হউক তুষারমণ্ডিত তিব্বত—জ্ঞানবর্ত্তিকা লইয়া কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—ইহা খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর কথা। এই সময় হইতে তিব্বতী ভাষায় ভারতের সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের অনুবাদকার্য্য আরম্ভ হইল। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে অনুবাদকার্য্য পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে এবং দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা চলিয়াছিল। ভারতীয় পণ্ডিত ও তিব্বতীদের সমবেত চেষ্টায় যে ব্যাপক অনুবাদকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল তাহা আজিও জগতের বিস্ময় হইয়া আছে। তান্জুর (Tanjur) এবং কন্জুর (Kanjur) নামক যে দুইটি অনূদিত গ্রন্থের সঙ্কলন আজও তিব্বতে বিদ্যমান তাহাদের আয়তনের বিশালতা দ্বৈপায়নব্যাসকৃত মহাভারতের দশটির সমান। তানজুর ২৩৫ (দুইশত পঁয়ত্রিশ) ভাগে এবং কনজুর ১০৩ (একশত তিন) ভাগে বিভক্ত এবং ইহাদের প্রত্যেক ভাগ ৪০০-৫০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই সকল গ্রন্থে এমন সব ভারতীয় ন্যায় এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ রহিয়াছে যাহার কোনও চিহ্নই আজ ভারতবর্ষে নাই। অনুবাদ অতি নিখুঁত এবং পাছে কোথাও ভুল থাকে এই জন্য প্রত্যেক গ্রন্থ পর পর তিন বার করিয়া অনূদিত হইয়াছে।

এই সকল গ্রন্থ সযত্নে গোম্পায় (Gompa) বা মঠে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে এবং লামা বা তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এগুলি পরম শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মের বিষয়ে ভারতবর্ষ দ্বারা তিব্বত সম্পূর্ণ প্রভাবিত—কারণ তিব্বতীদের ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম। অধিকাংশ তিব্বতী বালিকার নাম ডোলমা (Dolma) (অর্থাৎ ভারতবর্ষের তারা

দেবী) এবং য্যাঙ চান্ মা (Yang-Chan-Ma) (অর্থাৎ ভারতবর্ষের সরস্বতী)।

তিব্বতের শিল্পকলাও ভারতীয় আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। তিব্বতের চিত্রকলায় এবং ভাস্কর্য্যে ভারতীয় প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মূর্ত্তিগুলির নাক-মুখ-চোখের গঠন সম্পূর্ণ ভারতীয়। পরবর্ত্তী যুগে অবশ্য তিব্বতীয় ছাপ পড়িয়াছে, তাহা সত্ত্বেও মূর্ত্তিসমূহের পরিহিত বসনভূষণাদি কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতিতেই অঙ্কিত বা খোদিত হইয়া আসিতেছে।

মিলারেপা তিব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকল তিব্বতীই তাঁহার কবিতাগুলি আবৃত্তি বা গান করিয়া থাকেন। ইঁহার যিনি গুরু তাঁহার নাম মার্পা এবং মার্পার গুরু ভারতবর্ষীয় mystic বা মরমী কবি নারোপা।

ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়দের প্রতি তিব্বতী স্ত্রীপুরুষ কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। লাদাকের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্ত পরিভ্রমণ কালে একদিন প্রার্থনারতা এক বৃদ্ধা তিব্বতী রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "পরজন্মে কোথায় জন্মিবার অভিলাষ কর?" জীবনসায়াহ্নে উপনীতা, শান্ত-সমাহিতচিত্ত বৃদ্ধা শ্রদ্ধাবিকশিত আননে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে—ভগবান্ বুদ্ধের পদরেণুপূত বুদ্ধ-গয়ায়!"

তিব্বতী সংস্কৃতির উৎস ভারত। তিব্বত যাচ্ঞা করিয়াছে প্রকৃত শিক্ষার্থীর মনোভাব লইয়া—ভারত দান করিয়াছে উদার অকুণ্ঠ চিত্তে। দাতা ভারতের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিব্বতকে স্বকীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত করিলেও সে তাহার জাতীয় সত্তাকে বিনষ্ট করে নাই। তিব্বতও ভারতের সে দান গ্রহণ করিয়াছে আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া।

তিব্বত ও ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। যতদিন তিব্বত তিব্বত থাকিবে এবং ভারত ভারত থাকিবে ততদিন এই সম্পর্ক ছিন্ন হইতে পারে না, এবং তিব্বত আসলে কোন্ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাহা যখন আমরা যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব তখন এই সম্পর্ক দৃঢ়তর হইবে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিধান ১৪টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে বা হইতেছে। তিব্বতী ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হইবে কারণ লাদাক প্রভৃতি অঞ্চলের বহু ব্যক্তির মাতৃভাষা তিব্বতী। রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের পরিভাষা ইংরেজীর পরিবর্ত্তে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত হইতেছে। তিব্বতীরাও এই সকল শব্দ অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারিবে।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা-৬ (১৩৫৬)। (১৫০+৮১৪ পৃষ্ঠা)। মূল্য সাড়ে বার টাকা।

এই সুপরিচিত গ্রন্থখানির বিস্তৃত পরিচয় ও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে যে সমুদয় তথ্য পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্যই ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পর্যন্ত তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

'প্রবাসী' পত্রিকার গত কার্ত্তিক সংখ্যায় এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণের সমালোচনা প্রসঙ্গে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধেও তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। ব্রজেন্দ্রবাবু বহু আয়াস সহকারে যে সমুদয় বিবিধ তথ্য আহরণ করিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাস-লেখকের পক্ষে তাহা অমূল্য সম্পদ। বস্তুতঃ এই গ্রন্থগুলি প'ড়িতে পড়িতে শত বর্ষ পূর্ব্বেকার বাঙালী-সমাজের যে চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে, অপর কোন গ্রন্থের সাহায্যেই আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি না।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডেও সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি যথাক্রমে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও বিবিধ এই কয়টি প্রধান ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের শেষে "সম্পাদকীয়" শীর্ষক অধ্যায়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই গ্রন্থে যে সমুদয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখও বর্ত্তমান সমালোচনায় অসম্ভব। তবে দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করি। ৫১৯ পৃষ্ঠায় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৮৩১ সনের প্রারম্ভে "কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাঁচঘর সাকিনে একজন পোদের ভবনে বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহর নিবাসী প্রায় শত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক এক পিত্তলের থাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন।" ঐ স্থানে "ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন।" পত্রপ্রেরক "আশ্চর্য্য হইয়া" এই সংবাদটি 'নিবেদন করিয়াছেন'। আমরাও এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ করি যে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেই এইরূপ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে প্রীতি-সম্মেলনের চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছিল।

অপর দিকে হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এ দেশের যুবকদের মনে প্রাচীন ধর্ম্ম ও সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কত দূর চরমে উঠিয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পূর্ব্বোক্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৩১ সনের ১৪ই মে তারিখে প্রকাশিত একখানি পত্রে (২৩৭ প.) লিখিত হইয়াছে যে, কলিকাতার একজন গৃহস্থ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটের মন্দিরে যান। সকলেই সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্র "উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না। ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্য যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড মার্নিং ম্যাডম্।" তৎকালে প্রকাশ্য দিবালোকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা জোর করিয়া গৃহস্থ-সন্তানকে ধরিয়া লইয়া গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করাইত, তাহারও বিবরণ একখানি পত্রে পাওয়া যায় (২৩৭ পৃঃ)। এইরূপ সেকালের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে আছে। বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করিলাম না। উপসংহারে বক্তব্য যে, সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি বাংলা ভাষার ইতিহাসের দিক হইতেও খুবই মূল্যবান। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষা হইতে কিরূপে চলতি ভাষার উদ্ভব হইল, এই গ্রন্থ পড়িলে সে বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে। মোটের উপর বাঙালীর জাতীয় জীবন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থখানির মূল্য খুবই বেশী। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থমালা সঙ্কলন করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গান্ধীজীর দিল্লী ডায়েরী—শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'হরিজন' পত্রিকা কার্য্যালয়, ২৭।৩ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩:৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।

প্রায় ৩০ বৎসর কাল গান্ধীজীর আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিবার চেষ্টা করিয়া, তাঁর ভাবের আলোকে জীবনের পথে চলিয়া, বাংলা 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেক বিষয়ে তৎভাবভাবিত হইতে পারিয়াছেন। ইংরেজী *Delhi Diary* নামে পরিচিত পুস্তকের বর্ত্তমান অনুবাদের মধ্যে তার অনেক পরিচয় পাই। গান্ধীজীর জীবনের শেষ ২ মাস ১০ দিনের প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলির মধ্যে এমন একটা আবেগ ও মর্ম্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে সর্ব্বকালের ইতিহাসে ও সাহিত্যে তাহা অমর হইয়া থাকিবে।

মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে—এই আদর্শের সাধনায় গান্ধীজীর জীবনের প্রায় ৫০ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন তার সোপান মাত্র। সেই স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িলাম—এই দৃশ্য দেখিয়া গান্ধীজী মরণান্তিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। অনুবাদের সংযত ভাষায় সেই বেদনার প্রকাশ অনেকের মনকে ব্যথিত করিবে। এই কৌশল সাধনালব্ধ। তজ্জন্য অনুবাদক বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১৯৪৬ সালের আগষ্ট ও অক্টোবর মাসে কলিকাতা, নোয়াখালি, বিহারে যে তাণ্ডব আরম্ভ হয় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও

গান্ধীজী মানব-প্রকৃতির উপর শ্রদ্ধা হারান নাই। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগষ্ট-নভেম্বর মাসের মধ্যে পঞ্জাবে মানব-প্রকৃতির যে অবনতি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিমূল কাঁপিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙালী পাঠক এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইবেন।

বর্তমান ভারতে যখন গণ-রাজের জাগরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, তখন এইরূপ অনুবাদ-সাহিত্যের প্রয়োজন যে বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্র—শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ। দি বুক এক্সচেঞ্জ, ২১৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য—২৲ টাকা মাত্র।

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের ২৬শে তারিখে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার একটা চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় এবং প্রায় দুই মাস পরে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই গণতন্ত্রের ঘোষণা করা হয়।

যে গণ-পরিষদ ২ বৎসর ১১ মাস ১৭ দিন ধরিয়া নানা তর্কবিতর্ক শেষ করিয়া শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সম্পন্ন করিয়াছে তাহাতে আছে মোট ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তপশীল। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে অনুরূপ শাসনতন্ত্রের আলোচনা শেষ করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাগিয়াছিল ৪ মাস, কানাডার ২ বৎসর ৫ মাস, অষ্ট্রেলিয়ার ৯ বৎসর, দক্ষিণ আফ্রিকার ১ বৎসর।

ভারতরাষ্ট্রের এই নূতন শাসনতন্ত্রের বাংলা অনুবাদ দুই মাসের মধ্যে শেষ করিয়া অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় ইহার মূল লিপিবদ্ধ হয়। ১৫০ বৎসরের বিজাতীয় শিক্ষার দোষে আমরা আমাদের পুরাতন রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক প্রকার অজ্ঞ ছিলাম। সুতরাং এইরূপ অনুবাদের ভাষায় আড়ষ্টতা মাঝে মাঝে দেখা দিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। অনেক সময় ইংরেজী শব্দই রাখিতে হইয়াছে—যেমন 'খনি বিল,' 'ইউনিয়ন লিষ্ট' 'ষ্টেট লিষ্ট' 'কন্‌কারেণ্ট লিষ্ট' এবং এখনও কোন কোন স্থলে সর্ব্বগ্রাহ্য নাম স্বীকৃত হয় নাই —যেমন এই বইয়ে আছে 'লোক-সভা' শব্দ; সংবাদপত্রে দেখি 'রাষ্ট্র-সংসদ'—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা।

স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকবর্গের সম্মুখে নানা সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের দেশে রাষ্ট্রভাষা সমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যা। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করিতে শিখিয়াছি প্রায় ১২৫ বৎসর; হঠাৎ হিন্দী বা অন্য ১৩টি ভাষার—আসামী, বাংলা, গুজরাতী, কানাড়ী, কাশ্মিরী, মালয়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, উর্দ্দু প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম্ম চালাইতে হোঁচট খাইব, ইহা অস্বাভাবিক নয়। এক পুরুষের—২৫ বৎসরের—মধ্যে এই দোষ সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

কুমারী আর ভ্যারের দিনপঞ্জী—উপন্যাস। অনুবাদক—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—এম, এম, রায় চৌধুরী। ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

এই উপন্যাসের মূল লেখিকা তরু দত্ত। বিদগ্ধ সমাজে তাঁহার পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন অনেকেই হয় তো স্বীকার করিবেন না, কিন্তু সর্ব্বধ্বংসী কালের আকাশে পুরাতন লেখা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসে বলিয়াই মাঝে মাঝে তাহাতে নূতন কালি বুলাইতে

হয়। আধু যুগের আকাশে বাঙালী মেয়ে তরু দত্তের নামটিও তেমনি অপ্রায় পুরাতন লেখা—বাংলা-সাহিত্যের আসরে যাঁহাকে নূতন করিয়া পরিচিত করার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছে। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার মাধ্যমে সুদূর পাশ্চাত্ত্যে তাঁহার সাহিত্যসাধনা সুরু হয়। কতকগুলি কবিতায় ও একখানি উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর জাজ্বল্যমান। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় রচনায় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন—তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এক শতাব্দী আগেকার কথা—তখনও বঙ্গদর্শনের সূত্রপাত হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের তিন চারিখানি উপন্যাস মাত্র বাহির হইয়াছে—সেই যুগে বিদেশী ভাষায় তরু দত্ত এই অপরূপ উপন্যাসখানি রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে মূল ফরাসী ভাষা হইতে খুব কম অনুবাদ হইয়াছে বলিয়াই এই উপন্যাসখানি এতদিন বিস্মৃতির গর্ভে পড়িয়া ছিল। অনুবাদ ইহাকে ভাষান্তরিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। মূল ফরাসী ভাষার সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত নহেন—উপন্যাসখানির অন্তর্নিহিত রস উপলব্ধি করিয়া তাঁহারাও শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে স্বীকার করিবেন বহু যুগসঞ্চিত সংস্কৃতি-সম্পদের অধিকারী না হইলে এমন সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। মারী আর ভ্যারের চরিত্রে নম্র মধুর সংবেদনশীল বাঙালী মনেরই প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। প্রতিভাময়ী লেখিকা জাতিধর্মের গণ্ডীর বাহিরে সর্ব্বকালের কুমারী-অন্তরের মাধুর্য্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ভূমিকায় ডাঃ কালিদাস নাগ সত্যই বলিয়াছেন—"তরু দত্তের উপযুক্ত মর্য্যাদা আমরা এখনও দিতে পারি নি।" স্বাধীন ভারতে এই ত্রুটি সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন।

তিন তারা—শ্রীরমাপদ চৌধুরী। পূর্ব্বাচল প্রকাশক। ৬, কলেজ রো, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

ভূমিকায় লেখক জানাইয়াছেন, ''তিন তারা' ঠিক গল্প বা উপন্যাস নয়। কি, তা ঠিক বোঝাতে হলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রবন্ধ ফাঁদতে হবে।' নূতন শব্দ সৃষ্টি করা নিরর্থক বোধে সে দায়িত্বভার তিনি সমালোচকের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র বইখানি সযত্নে পড়িয়াও আমরা কিন্তু লেখকের সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। আসলে এটি গল্প উপন্যাসের উপাদানেই তৈয়ারী। পূর্ণাঙ্গ গল্প বা উপন্যাস হইবার পথে যেটুকু বাধা সৃষ্টি হইয়াছে—তাহা লেখকের ইচ্ছাকৃত অথবা অক্ষমতাজনিত ত্রুটিতে ঘটিয়াছে বলা অবশ্য কঠিন। ছাড়া ছাড়া ঘটনাগুলিকে সুসংবদ্ধ করার কৌশল লেখকের হয়ত অজানা নহে, অথচ মনে হয়, নূতন সৃষ্টির প্রলোভনে তিনি সে চেষ্টা করেন নাই। তাঁর লেখার মধ্যে ইঙ্গিতগুলি অর্থব্যঞ্জক—দু'একটি টানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ছবির আভাস পাওয়া যায়। সত্য বটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে মানবীয় নীতিধর্ম্মের অপঘাতে মানুষের চিরাচরিত বৃত্তির পরিবর্তন হইয়াছে, বস্তুভারে ভাবের ফেনা ভাঙিয়া গিয়াছে—গৃহরচনার মোহ অর্থগৃধ্নুতার তীব্রতায় শুকাইয়া গিয়াছে; দীপেন, ব্রিজলাল, লখিয়া, সাঁওন হানিফ ইহারাও যুগধর্ম্মের আবর্তে পাক খাইয়া চলিয়াছে—ইহাদের হাসিকান্নায় ক্লেদে-লালসায় পৃথিবী পরিপূর্ণ। তবু এই পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া আকাশের গায়ে জাগিয়া থাকে তারা—যে তারার পানে চাহিয়া পুরাতন পৃথিবীর মানুষেরা স্বপ্ন দেখে এবং নূতন পৃথিবীর মানুষেরা সেই স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াও তৃপ্তি পায় না। অবহেলায় ছড়ানো জিনিসগুলি একত্রে গাঁথিয়া তুলিবার চেষ্টা করুন না লেখক—তাঁহার হাতে সৃষ্টির কাজটি ভালই জমিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ব‌ুদ—শ্রীরাখালদাস সোম। এস্. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ। ৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য দুই টাকা।

মাত্র ১১৩ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের বই। তিনটি প্রবন্ধ আছে—ইজ্‌ম্, ফুটবল ও বেতার। রচনা স্নিগ্ধ হাস্যরসে মণ্ডিত এবং স্থানে স্থানে গল্পের আমেজ আসিয়াছে। আধুনিক সমাজের চাপল্যকে লেখক সকৌতুক অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। ভাবিবার কথাকে এমন সরস, উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারা কম কৃতিত্বের কথা নহে। চিন্তাশীলতার সহিত মার্জিত কৌতুক বোধ মিলিয়া গ্রন্থখানিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতের রণনীতি ও সমরসজ্জা—প্রথম খণ্ড। শ্রীবিশ্বেশ্বর চৌধুরী। ইউনিভারস্যাল পাবলিশার্স, ২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৩৲ টাকা, পৃষ্ঠা ১৮৬।

খণ্ডিত ভারতে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে ভারতের সামরিক ও দেশরক্ষার সমস্যা সেগুলির অন্যতম। লেখক এই বিশেষ সমস্যাটি বিশদভাবে বর্ত্তমান গ্রন্থে মোট সাতটি অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন যথা—(১) আমাদের দেশ, (২) দেশ রক্ষার দায়িত্ব, (৩) আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি, (৪) এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, (৫) আক্রমণকারী ও আক্রমণপথ, (৬) দেশরক্ষা সমস্যা এবং (৭) দেশরক্ষা সংগঠন—প্রথম দুইটি অধ্যায়ে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও দেশবাসীর স্বাধীনতা রক্ষার গুরুদায়িত্বের কথা আলোচিত হইয়াছে। লেখক সত্যই বলিয়াছেন—"স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব মানুষের জন্মগত।" আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি এবং এশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশের আলোচনায় গ্রন্থকার দার্শনিক মতবাদ ও ধর্ম্মবিশ্বাসের দিক হইতে বিভিন্ন দেশকে বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং চীন, জাপান, পাকিস্থা সোভিয়েট রুশিয়া, মধ্য-প্রাচ্য (সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান, মি ইরাক, সৌদি আরব), তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান এবং ইহুদী রাজ্যে বস্থান, সামরিক শক্তি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করিয়া ভারতের নিকট ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক বিশ্বাস করেন না যে কেবল মাত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতেই পৃথিবীর মধ্য এশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি দল বাঁধিয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই—এমন কি ধর্ম্মের নামে সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্রগুলিরও এক হইবার সম্ভাবনা বেশী নহে। আরব লীগ আরব-রাষ্ট্রের অন্তর্গত দেশসমূহকে এক করিলেও তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্থান ও সোভিয়েট রুশিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে দলে টানিতে পারে নাই। পাকিস্থানের প্রচারও এই দিকে বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে নাই। লেখকের মতে "ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের বি এবং ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব অন্যান্য মুসলমান অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্ব।"

ভারত কি ভাবে এবং কোন রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে এবং ভারত রাষ্ট্র রক্ষার সমস্যা ও সংগঠনের বিষয় শেষের তিন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধ হইতে পারে একথা গ্রন্থকার স্বীকার করেন, কিন্তু পাকিস্থানের পক্ষে বাহিরের সাহায্য ব্যতীত ভারত আক্রমণ সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। মধ্য চীনের সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তনের কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। সাম্প্রতিক চীন ও পাকিস্থানের ঘটনাবলী অনুধাবন করিলে অবশ্য ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়।

ভারত-রাষ্ট্রকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিলেই যথেষ্ট নহে, ইহাকে -বিরোধী রাষ্ট্র বলা চলে। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় এবং ভারতকে খণ্ডিত করিয়া হিংসায় বিশ্বাসী এবং আক্রমণমূলক মনোভাবসম্পন্ন পাকিস্থান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে উহার পরিণা

কাথায় তাহা অনুমান করা গেও সঠিক ভাবে বলা শক্ত। গ্রন্থকার না স্থানে দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করিলেও বাস্তবের ভিত্তিতেই বিষয়বস্তু বিচার করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই পুস্তক পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মুসাফির (নাটক)—শ্রীবিমল সেনগুপ্ত। গীতা এণ্ড কোং, জেইল রোড, শিলং। মূল্য—দেড় টাকা।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের জন্য নতুন ধরণের নাটক রচনার দাবি দর্শকদের ভিতর ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে এবং কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উদাসীনতা সত্ত্বেও নতুন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু অবলম্বনে নাটক-রচনায় কয়েকজন নূতন লেখক ব্রতী হয়েছেন। 'মুসাফির' এই ধরণের প্রচেষ্টার একটি ফল। বিগত মহাযুদ্ধ, রাষ্ট্র আন্দোলন, মন্বন্তর এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়াকে নাট্যকার নাটকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছেন। নূতন কথা ও নূতন আঙ্গিকের দিকে লেখকের ঝোঁক খুব বেশী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহু ছিন্ন, ক্ষুদ্র দৃশ্যের সাহায্যে তিনি নাটক গড়ে তুলেছেন। এতে সিনেমার প্রভাব খুব বেশী মনে হয়। তা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্য সংস্থাপনের ফলে রস ঘনীভূত হওয়ার আগেই তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। আজকাল কলিকাতার ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ পর্যন্ত দৃশ্যের স্থায়িত্বের দিকে অধিক দৃষ্টি দিচ্ছে এবং অধুনা অভিনীত একখানি নাটকে মাত্র দুটি দৃশ্য ফেলা করা হয়েছে অর্থাৎ পুরো নাটকটি দুই দৃশ্যে বিভক্ত। সুতরাং 'মঞ্চ গেল' এই আঙ্গিক নতুন লেখকদের অন্ততঃ ঘন ঘন ব্যবহার করা উচিত নয়। নূতন নাট্যকারকে নিরুৎসাহ করবার জন্য এই ত্রুটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি তা নয়—বরং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নূতন চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতাও তাঁর আছে, কিন্তু আঙ্গিক বিন্যাসের ত্রুটীর জন্য নাটকখানির রস ততটা নিবিড় হয় নি। নতুবা যে বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন—তা আরও জোরালো নাটক হতে পারত এবং রঙ্গমঞ্চেও সমাদর লাভ করত।

দিন আগত ঐ (নাটক)—শ্রীবিমল সেনগুপ্ত। গীতা এণ্ড কোং, জেইল রোড, শিলং। মূল্য—বারো আনা।

'দিন আগত ঐ' 'শুভলগ্ন' এবং 'সংঘাত' এই তিনটি ক্ষুদ্র নাটিকার সমষ্টি। বিলাতে মূল নাটক শুরু হওয়া আগে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয়ের রীতি আছে—যাকে বলা curtain riser. বাংলায় অভিনয়যোগ্য ভালো ক্ষুদ্র নাটিকা খুব কমই লেখা হয়েছে। বিমলবাবুর এই নাটিকা সে অভাব পূরণে কিছু সাহায্য করবে। 'শুভলগ্ন' একটি ভালো নাটিকা। সংলাপরচনায়ও লেখকের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'সংঘাত' নাটিকায় স্বগতোক্তির সাহায্যে পাত্রপাত্রীর প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। অবচেতন মনকে প্রকাশ করবার এই কৌশলটি তিনি সম্ভবতঃ প্রখ্যাত নাট্যকার ইউজিন্ ও'নিলের 'স্ট্রেঞ্জ ইন্টারলিউড' নাটক থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের মঞ্চ এই অভিনব আঙ্গিককে কার্যকরী করবার যান্ত্রিক কুশলতা দেখাতে এখন পর্যন্ত সক্ষম হয় নি। অবশ্য প্রগতিবাদী নাট্যকাররা যে মঞ্চকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন—তাতে আর সন্দেহ কি! 'দিন আগত ঐ' নাটক হিসেবে সার্থক হয় নি। লেখক যদি আঙ্গিকের দিকে বেশি নজর না দিয়ে লিখতে চেষ্টা করেন—তবে তাঁর কাছে আমরা ভবিষ্যতে ভাল নাটক পাব। কারণ তাঁর লেখবার ভাষা ও দেখবার দৃষ্টি—দুই-ই আছে।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

জীবন সংগ্রাম—শ্রীযতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। কমলা বুক ডিপো। ১৫ নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ২।•

উপন্যাস। বহু পুরুষ ও নারী পুস্তকে ভিড় করিয়া আছে, কিন্তু একটি চরিত্রও সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়া উঠে নাই যদিও সেগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য বর্ণনায় মাঝে মাঝে লেখক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন।

নায়ক বিলাসের চরিত্রের পরিণতি অত্যন্ত বেমানান এবং অস্বাভাবিক মনে হইল। শব্দপ্রয়োগও ত্রুটিবহুল।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্ব্বানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। (৪+৩৮২ পৃ.) মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ নিবেদন ও প্রস্তাবনা ছাড়া দ্বাদশটি নিবন্ধে পরমহংস রামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ ত্যাগী শিষ্য মহাপুরুষ শিবানন্দ স্বামিজীর জীবনালেখ্যে সুসম্পূর্ণ। মহাপুরুষজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম তারকনাথ ঘোষাল। গুরুভ্রাতৃমণ্ডলীতে তিনি তারকদা বলিয়াই অভিহিত হইতেন। যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহ করিয়া অর্থার্জ্জনের জন্য চাকরীও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল এবং তখনই পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ, সান্নিধ্য ও অনুপম কৃপালাভ তাঁহার ঘটে। অল্প দিনের ভিতরই পত্নীবিয়োগ হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগান্তে সম্পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। গুরুদেবের নিকট হইতে জননীর মত স্নেহযত্ন পাইয়া সাধনভজন শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে তাঁর দেহরক্ষা পর্য্যন্ত গুরুসেবায় ব্রতী ছিলেন। গুরুর তিরোভাবের পর চলিল প্রব্রজ্যা ও কঠোর সাধনভজন। পরে গুরুভ্রাতৃমণ্ডলীকর্ত্তৃক সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা ও দ্বিতীয় সঙ্ঘনায়করূপে দীর্ঘকাল মিশনের গুরুদায়িত্ব বহন করিতে করিতে তিনি পরিপূর্ণ বার্দ্ধক্যে মহাপ্রয়াণ করেন।

গ্রন্থকার এই জীবনালেখ্যের ভিতর স্তরে স্তরে সুষ্ঠু ভাবে দেখাইয়াছেন —শৈশব-কাল হইতে ক্রমে 'বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ' এই মহাপুরুষের মহৎজীবন কি ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে, কত অসংখ্য ত্যাগী শিষ্য, গৃহী শিষ্য-শিষ্যা তাঁহার অভয় আশ্রয়ে ধন্য হইয়াছেন এবং কি অনুপম সাধনা ও কর্ম্মশক্তি তাঁর জীবন-ব্রতকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। সাধু মহাপুরুষদের জীবনী প্রণয়ন অতীব দুরূহ ব্যাপার, গ্রন্থকার প্রভূত যত্নসহকারে এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহাপুরুষজীর বিভিন্ন সময়কার ছয়টি চিত্র এবং জ্যাকেটের সুন্দর প্রচ্ছদপট গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চরকাশেম—শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ। বুক ওয়ার্ল্ড লিঃ। ৫, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য তিন টাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের চাষা-ভুষো মাঝি-মাল্লা জেলে-জোলা প্রভৃতি তথাকথিত নীচশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহাদের সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে লেখক যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাই তিনি এই উপন্যাসখানিতে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রাক্ষসী পদ্মার বুকে জাগিয়া উঠা একটি চরকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। মেছো হাসেমের ছেলে কাসেম। তার মনিবের কন্যা ফুলমনকে সে ভালবাসে, সে তাকে বার বার প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু বাপের গোলামের এই আস্পর্দ্ধা ফুলমনের নিকট দুঃসহ বলিয়া মনে হয়। কাসেম তার নিকট হইতে পায় শুধু লাঞ্ছনা আর অপমান। অবশেষে নসীবের জোরে সহায়-সম্বলহীন কাসেম পদ্মার বুকে জাগিয়া নিরানব্বই কানি জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে। তার

নির্জ্জন চরে গড়িয়া উঠে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উপনিবেশ—মসজিদের পাশে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুর মন্দির,—ক্রমে ক্রমে ধূ ধূ করা বালুচরে ফসল ফলে, জাগে প্রচণ্ড জীবনকল্লোল, চরের শূন্যতা ভরিয়া উঠে নবঅঙ্কুরিত ফসলের শ্যাম সমারোহে। তারপর একদিন অপরিসীম দুঃসাহসে ভর করিয়া ফুলমনের বিয়ের রাত্রিতে কাশেম তাহাকে কৌশলে চুরি করিয়া চরে লইয়া আসিয়া ঘর বাঁধে। অভিজাত পরিবারের কন্যা ফুলমন চরকাশেমের বিচিত্র জীবনপ্রবাহের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলাইয়া দেয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছোঁয়াচ আসিয়া এই নবগঠিত উপনিবেশের জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়।

উপন্যাসখানির মধ্যে মনকে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে লেখকের ভাষা আর প্রকৃতিবর্ণনার নৈপুণ্য। [কা]হিনীর তুলনায় পটভূমিকাটি যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পদ্মার চরে প্রকৃতির [illegible] বৈচিত্র্য লেখকের শিল্পীমনকে মুগ্ধ [কর]িয়াছে এবং উপন্যাসখানিতে [তিনি] নিপুণ তুলিকায় ছবির পর ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন আর এই চরের বাসিন্দা নীচ শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানকাহিনী বর্ণনায় তিনি দরদী মনের পরিচয় দিয়াছেন। তবে উপন্যাসখানির একটি বড় ত্রুটি এই যে ইহাতে চরিত্রগুলির development বা প্রকাশ ঠিকমত দেখানো হয় নাই এবং কাহিনীটি স্বচ্ছন্দ গতিতে স্বাভাবিক পরিণতির পথে [illegible] হইতে পারে নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

অনাদি মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা সাউথ ক্লাবের সম্পাদক ও ভূতপূর্ব্ব কাষ্টমসের এপ্রেজার অনাদি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তাঁহার অমায়িক ও সরল ব্যবহারে সকলে তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। অনাদিবাবুর পিতা স্বর্গকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অনাদিবাবু পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে বহু সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি অপরিসীম ছিল। কলিকাতা সাউথ ক্লাবের উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা। তিনি অমায়িক ও সরল ব্যবহারের জন্য সকলের প্রীতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অনাদি মুখোপাধ্যায়

আমরা সন্ধান পাইয়াছি, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশ্বেশ্বর দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক-পত্রে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সাহিত্য-জীবনের গোড়ার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'রামেন্দ্র-রচনাবলী' সম্পূর্ণ করিবার জন্য ঐ প্রবন্ধগুলির নকল আবশ্যক। যদি কাহারও সংগ্রহে বা সন্ধানে 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। ইতি—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৫, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।